মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

অনূদিত

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর

ইসলামের যাকাত বিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)
অনূদিত

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী'র

ইসলামের যাকাত বিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

[কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকের যাকাত বিধান ও
তার দার্শনিক পটভূমির তুলনামূলক অধ্যয়ন]

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র : বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন : ৭১১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১৩-০৩৪২৩০

ইসলামের যাকাত বিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল ঃ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী
অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

প্রকাশ কাল ঃ
প্রথম ঃ ১৯৮৩ ইং
৪র্থ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইংরেজী
মহররম ১৪২৭ হিজরী
মাঘ ১৪১৩ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা আমীনুল হুসাইন
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৩০০. ০০

ISBN : 984-8455-03-5

প্রসঙ্গ-কথা

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশেষত গরীব, নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান নিঃসন্দেহে একটি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় কিছু 'কল্যাণধর্মী' পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সে সব পদক্ষেপ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে নি। ফলে কল্যাণধর্মী বলে খ্যাত রাষ্ট্রগুলোতেও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী এখনো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দৃশ্যত কিছু কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ সে সব দেশে চরম দুরাবস্থার মধ্যে বসবাস করছে।

ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে যাকাত-এর একটি চমৎকার কর্মসূচীর বিধান রাখা হয়েছে। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল লোকদের বাড়তি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, এটি যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, তেমনি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদতও। তাই পবিত্র কুরআনের বহুতর স্থানে নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানেরও আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাকাত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণার অভাবে এই কল্যাণময় ব্যবস্থাটি থেকে আমাদের সমাজ যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারছে না।

আরব জাহানের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুপণ্ডিত আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী প্রণীত 'ফিক্‌হুয যাকাত' নামক বিশাল গ্রন্থটি এদিক থেকে আমাদের জন্যে এক পরম সম্পদ। যাকাত আদায়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো অত্যন্ত পুংখানুপুংখভাবে বিবৃত করা হয়েছে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই মূল্যবান গ্রন্থে। এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) 'ইসলামের যাকাত বিধান' শিরোনামে এই অনন্য গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে সময়ের এক বিরাট দাবি পূরণ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটির প্রকাশনায় ধারাবাহিকতা না থাকায় এর অপরিমেয় কল্যাণ থেকে যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারেননি আমাদের বিদগ্ধ পাঠক সমাজ, বরং গত কয়েক বছর ধরে গ্রন্থটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আগ্রহী পাঠকরা সরাসরি অভিযোগ করেছেন আমাদের কাছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)-এর গ্রন্থাবলী প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত 'খায়রুন প্রকাশনী' এখন থেকে 'ইসলামের যাকাত বিধান' শীর্ষক গ্রন্থটির যথাযথ প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তদনুসারে এর প্রথম খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ডটিও সহৃদয় পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হল।

গ্রন্থটির এ সংস্করণে আমরা পূর্বেকার মুদ্রণ-প্রমাদগুলোর সংশোধনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যকেও উন্নত করার ব্যাপারে যত্ন নেয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির এ সংস্করণ পাঠকদের কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকার ও অনুবাদককে এই অনন্য খেদমতের উত্তম প্রতিফল দান করুন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

ঢাকা ঃ জানুয়ারী ২০০১

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের কথা

'যাকাত' দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিধানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কিন্তু এ পর্যায়ে আধুনিক সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত কোন গ্রন্থ দুনিয়ার কোন ভাষায় আছে বলে আমার জানা ছিল না।

তবে এ যুগের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও গভীর ব্যাপক পান্ডিত্যের অধিকারী কাতারের রাজধানী দোহায় বসবাসকারী ও তথাকার শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী লিখিত 'ফিকহুয যাকাত فقه الزكواة' নামক আরবী গ্রন্থটির নাম শুনে আসছিলাম তার প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯ সন থেকেই। কিন্তু দুটি খন্ডে বিভক্ত এ বিরাট গ্রন্থখানি পড়ার কোন সুযোগ পূর্বে আমি পাইনি।

১৯৭৯ সনের রমযান মাসে ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব শামসুল আলমের কাছে এ বইখানি দেখতে পাই। তিনি এর বাংলা অনুবাদ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তখনই আমি সেই অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর এ এক তুলনাহীন অমর সৃষ্টি। আমার জানামতে আরবী ভাষায়ও এ পর্যায়ে বা এর সমতুল্য গ্রন্থ আর একটি নেই। ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের ক্ষেত্রে যাকাত যেমন মহান আল্লাহ্র একটি বিশেষ অবদান, দুনিয়ার চিরকালের বঞ্চিত মানবতার জন্যে দারিদ্র্য মুক্তিরও এ এক অনন্য ও অনবদ্য ব্যবস্থা, তার বিস্তারিত ও ব্যাপক গভীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ গ্রন্থখানি অনুরূপ এক মহামূল্য সম্পদ। ইসলামের বিশেষজ্ঞ মনীষিগণ এ গ্রন্থখানিকে যাকাত বিষয়ে বিশ্বকোষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ গ্রন্থখানি রচনা করে তিনি দ্বীন-ইসলামের এক অতুলনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং সেই সাথে গোটা মুসলিম জাহানের মহাকল্যাণ সাধন করেছেন।

আমি আশা করি এ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে পাঠকবৃন্দ যাকাতের গুরুত্ব ও মানবতার কল্যাণে তার কল্পনাতীত বিরাট ভূমিকার কথা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন।

'ফিকহুয যাকাত' নামক এ বিরাট গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্পন্ন করে বাংলাভাষী জনগণের সম্মুখে পেশ করতে পারা আমার জন্যে একটি অনুপম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি এবং এজন্যে মহান আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করছি অশেষ শুকরিয়া।

(মাওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

মুস্তাফা মনযিল
২০৮, নাখালপাড়া

সূচীপত্র

ইসলামের যাকাত বিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র বিধান

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ- اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ- وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

লোকদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তার দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর এবং তাদের জন্যে কল্যাণের দো'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার এই দো'আ তাদের জন্যে পরম সান্ত্বনার কারণ। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথম অধ্যায়

যাকাত ব্যয়ের খাত

- ফকীর ও মিসকীন
- (যাকাত আদায় ও বন্টন কাজে) নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ
- যেসব লোকের মন জয়ের প্রয়োজন
- দাস মুক্তকরণ
- ঋণগ্রস্ত লোক
- আল্লাহ্‌র পথে
- নিঃস্ব পথিক
- যাকাত পাওয়ার অধিকারী বিভিন্ন প্রকার লোকদের সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন আলোচনা
- যেসব ব্যক্তির জন্যে যাকাত ব্যয় করা হবে না

ভূমিকা

কুরআন মজীদে যাকাত প্রসঙ্গ নামায অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটিভাবে আলোচিত হয়েছে। কোন্ সব ধন-মালে যাকাত ফরয হবে, তাতে কত পরিমাণ হলে কত পরিমাণ যাকাত ধার্য হবে, কুরআনের আয়াতসমূহে তা বলা হয়নি। এ পর্যায়ে যেসব শর্ত রয়েছে—যেমন মালিকানার একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার, নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়া এবং তার কম পরিমাণের ওপর যাকাত ধার্য না হওয়া—ইত্যাদি বিষয়েও কুরআন মজীদে কিছুই আলোচিত হয়নি।

আইন প্রণয়নমূলক 'সুন্নাত' এ পর্যায়ে বিরাট অবদান রেখেছে। তা যেমন রাসূলে করীম (স)-এর কথার দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি তাঁর কাজও এক্ষেত্রে অকাট্য ও স্পষ্ট। তা যাকাত পর্যায়ের অবিস্তারিত কথাকে সবিস্তারে উপস্থাপিত করেছে, যেমন সুস্পষ্ট করে দিয়েছে নামায সংক্রান্ত যাবতীয় কথা। আর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সুবিন্যস্ত মহান ব্যক্তিগণ নবী করীম (স) থেকে তা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ ধরে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সহকারে চলে এসেছে।

এ কারণে নবী করীম (স)-এর সুন্নাতের প্রতি ঈমান আনা ও রাখা একান্তই জরুরী এবং সে ঈমান অনুযায়ী সুন্নাতকে গৃহীত হতে হবে ইসলামের শিক্ষার আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে। বস্তুত ইসলামী আইন বিধানের জন্যে কুরআনের পরে পরে ও সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্নাতই হচ্ছে তার উৎস, তার ব্যাখ্যাকারী, বিস্তারিত বর্ণনাকারী, প্রতিটি বিষয়কে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্তকারী এবং সুনির্দিষ্টকারী। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَـا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

এবং আমরা তোমার প্রতি আল-কুরআন নাযিল করেছি, যেন তুমি—হে নবী—লোকদের জন্যে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্য করে বলে দাও তা যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তাতেই আশা করা যায়, তারা সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবে।
(সূরা নহল ঃ ৪৪)

আবূ দাঊদ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে এক ব্যক্তি বললেন, "হে আবূ নুজাইদ, আপনি কেন এমন কিছু হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, যার কোন ভিত্তি কুরআন মজীদে খুঁজে পাওয়া যায় না?" এ কথা শুনে হযরত ইমরান রাগান্বিত হলেন এবং লোকটিকে বললেন, "প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম বা এতটি ছাগী বাবদ এই-এই এবং এতটি উটের মধ্যে এতটি দিতে হবে, এসব কথা কি তোমরা কুরআন মজীদে পেয়েছ?" বললে, 'না' তা পাইনি।" বললেন, "হ্যাঁ "কুরআনে তা পাওনি, তাহলে এসব কথা কোত্থেকে জানতে পারলে?" তোমরা

এসব কথা জানতে পেরেছ আমাদের নিকট থেকে এবং আমরা তা জানতে পেরেছি স্বয়ং নবী করীম (স) থেকে।" —বর্ণনাকারী বলছেন, এ পর্যায়ে সাহাবী আরও অনেক কয়টি জিনিসের উল্লেখ করেছেন।

কুরআনে যাকাত ব্যয়ের খাতের উল্লেখ

পূর্বে যেমন বলেছি, কুরআন মজীদে যাকাতের ব্যাপারটি সংক্ষিপ্ত ও অবিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে যাকাত কোথায় এবং কার জন্যে ব্যয় করা হবে, কুরআনে তা উদ্ধৃত হয়েছে। এই ব্যাপারটি কোন প্রশাসকের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। আর সেসব লোভী লোকদের জন্যে তা করায়ত্ত্ব করার সুযোগও রাখা হয়নি, যাদের জন্যে যাকাতে কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই। ফলে তারা তা পাওয়ার প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের সাথে কোনরূপ প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তখন কতিপয় লোভী ও দুষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষভাবে লালায়িত হয়ে উঠেছিল। সাদকা বা যাকাতের মালের লোভে তাদের মুখে পানি জমেছিল। মনে করেছিল, রাসূলে করীম (স) তাদের আগ্রহ-উৎসাহ দেখে তাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন ও কিছু-না-কিছু দিয়ে তাদের লালসা প্রতিনিবৃত্ত করবেন। কিন্তু নবী করীম (স) তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না, তাদের ভাগে যাকাতের কোন অংশ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন না। তখন তারা রাসূলে করীম (স)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করে দিল। এমন কি নবীর উচ্চতর ও মহানতর মর্যাদার ওপরও কটাক্ষ করতে কুণ্ঠাবোধ করল না। এই অবস্থায় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে তাদের মুনাফিকী মনোবৃত্তি উদ্‌ঘাটিত করে দিল। তাদের কুৎসিৎ মন-মানসিকতা লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরল। তাদের ব্যক্তি-স্বার্থের লোলুপ জিহ্বার ফণা চূর্ণ করে দিল। সেই সাথে যাকাত ব্যয়ের সঠিক ক্ষেত্র ও খাতসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখও করা হল।

কুরআনের সে আয়াতটি এই ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ج فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ- وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ لا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ لا اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ- اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

লোকদের মধ্যে কেউ কেউ যাকাতের ব্যাপারে—হে নবী—তোমাকে জ্বালাতন করে। তা থেকে কিছু তাদের দেয়া হলে তারা খুব খুশী ও সন্তুষ্ট হয় আর কিছু দেয়া না হলে ঠিক তখনই তারা হয় অসন্তুষ্ট। অথচ আল্লাহ্ এবং রাসূল তাদের যা কিছু দেন, তা পেয়েই তারা যদি সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অনুগ্রহ আমাদের দেবেন এবং তাঁর রাসূলও; আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহশীল! আসল কথা হচ্ছে, সাদকাত—যাকাত—গরীব মিসকীন, তাঁর জন্যে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে হবে, যাদের গর্দান দাসত্ব শৃংখলে বন্দী, যারা ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র পথে এবং নিঃস্ব পথিক—এ সবের জন্যে নির্দিষ্ট। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ধার্য। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী। —(সূরা তওবা ঃ ৫৮-৬০)

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার ফলে যাকাত সম্পদের প্রতি সর্বপ্রকার লোভ-লালসা যেমন নিঃশেষ হয়ে গেল, তেমনি তার ব্যয় ও বন্টনের ক্ষেত্র বা খাতসমূহ সুস্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই জানতে পারল তাতে কার কি হক্ বা অধিকার রয়েছে।

আবূ দাউদ জিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সাদায়ীর সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং অতঃপর তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। এ পর্যায়ে তিনি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন—এ সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং বলল ঃ আমাকে যাকাত থেকে দান করুন। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বললেন ঃ যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবী বা অন্য কারুর কথা বলার অবকাশ রাখতে রাজী হন নি। বরং এ পর্যায়ে তিনি নিজেই চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত সম্পদকে আটটি ভাগে বিভক্ত করার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাই তুমি যদি সেই আট ভাগের কোন ভাগে গণ্য হও, তা হলে আমি তোমার প্রাপ্য হক দেব।[১]

যাকাত-ব্যয় খাত পর্যায়ে কুরআনী ঘোষণার তাৎপর্য

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ববিদ মনীষিগণ বলেছেন, ধন-সম্পদের ওপর কর ধার্যকরণ ও তা আদায় বা সংগ্রহকরণের ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকার মাত্রই নানা উপায় ও পন্থার মাধ্যমে নানাবিধ কর আদায় করতে সক্ষম। অবশ্য তা অনেক ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, সংগ্রহ ও আদায় করার পর তা কোথায় ব্যয় করা হবে? এখানেই বিচারের মানদণ্ড একদিকে ঝুঁকে পড়ে, মানুষের লালসা শয়তানী খেলায় মেতে ওঠে। তখন ধন-মাল সেই লোক গ্রহণ করে থাকে, যে তা ন্যায়ত পাওয়ার যোগ্য বা অধিকারী নয়। আর বঞ্চিত থেকে যায় সেসব লোক, যারা তা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী। এই কারণেই কুরআন মজীদ এ ব্যাপারটির ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে এবং ব্যাপারটিকে কিছু মাত্র অস্পষ্ট

১. এই হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবদুর রহমান ইবনে জিয়াদ ইবনে আনউম আল-আফ্রিকী। অনেক হাদীসবিদ তাঁর সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন।

করে রাখেনি—যাকাত সংক্রান্ত বহু ব্যাপারই যেমন সুন্নাতের ব্যাখ্যার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে; কিন্তু এই মূল ব্যাপারটি সে রকম রাখা হয়নি—এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

ইসলামের পূর্বকালীন বহু প্রকারের কর ধার্যকরণের অর্থনৈতিক ইতিহাস সর্বজনজ্ঞাত। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রের নিকট থেকে তখন নানা প্রকারের কর আদায় করা হত; করা হত কোথাও জোর-জবরদস্তি করে, কোথাও লোকদের রাজী ও সন্তুষ্ট করে। তা সঞ্চয় করা হত অহংকারী রাজা-বাদশার খাজাঞ্চিখানায়। তারা তা নিজেদের ও তাদের নিকটাত্মীয়দের খাহেশ ও খেয়াল খুশীমত ব্যয় ও ভোগ-ব্যবহার করত। তাদের বিলাসিতা ও বড়লোকী বৃদ্ধি পেত, তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রকাশ পেত। আর ওদিকে গরীব-মিসকীন, দুর্বল, শ্রমজীবী চাষী-মজুররা চরমভাবে শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকতে বাধ্য হত।

কিন্তু ইসলাম এসে সর্বপ্রথম এই অভাবগ্রস্ত জনগণের প্রতি কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তাদের জন্যে বিশেষভাবে যাকাত সম্পদে একটা পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশ নির্দিষ্ট করে দিল। আর সাধারণভাবে সমগ্র জাতীয় সম্পদের আবর্তনেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। অর্থনৈতিক জগতে কর ধার্যকরণ ও সরকারী ব্যয় বণ্টন ক্ষেত্রে ইসলামের এই সামষ্টিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ সর্বাগ্রে গৃহীত ব্যাপার। মানবতা দীর্ঘকাল পর এই বিষয়ে জানতে ও অবহিত হতে পেরেছে।

যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোকদের পর্যায়ে কুরআনুল করীম যা কিছু বলেছে, রাসূলে করীম (স)-এর ও খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাতে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার আলোকে আমরা আটটি যাকাত ব্যয় খাত সম্পর্কে পরবর্তী সাতটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব। অষ্টম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোকদের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে। আর যাদের জন্যে যাকাত ব্যয় করা আদৌ জায়েয নয় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে সর্বশেষে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
ফকীর ও মিসকীন

['ফকীর' এক বচন, বহুবচনে 'ফুকারা'।'মিসকীন' এক বচন, বহুবচনে 'মাসাকীন'।]

উপরে উদ্ধৃত সূরা তওবা'র আয়াতটি যাকাত ব্যয়ের খাত বা ক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সে খাত হচ্ছে আটটি। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি খাত হচ্ছে ঃ ফকীর ও মিসকীন। যাকাত সম্পদে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথমে তাদের জন্যেই অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, দারিদ্য ও অভাব-অনটন দূর করাই যাকাতের প্রথম লক্ষ্য। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কোন স্থিতি থাকতে পারে না।

তার বড় প্রমাণ, এ পর্যায়ে কথা শুরু করে কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম ফকীর ও মিসকীনদের কথাই বলেছে। আর আরবী কথন রীতি হচ্ছে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা সর্বপ্রথম বলা। দারিদ্র্য দূর করা ও ফকীর-মিসকীনদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানই যাকাত ব্যবস্থার প্রথম লক্ষ্য—যাকাতের আসল উদ্দেশ্য। সেই কারণে নবী করীম (স)-ও কোন কোন হাদীসে শুধু এ কথাটিরই উল্লেখ করেছেন। তিনি হযরত মুয়ায (রা)-কে যখন ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বললেন ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ-

তাদের জানিয়ে দেবে যে, তাদের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, যা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

'ফকীর' ও 'মিসকীন' বলতে কাদের বোঝায় ?

কুরআনের আয়াতে উদ্ধৃত 'ফকীর' ও 'মিসকীন' বলতে কাদের বোঝায় ? এরা কি দুই ধরনের লোক না একই পর্যায়ের এবং অভিন্ন ? হানাফী মতের ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মালিকী মাযহাবের ইবনুল কাসেম মত প্রকাশ করেছেন যে, ফকীর ও মিসকীন বলতে আসলে একই লোক বোঝায়। কিন্তু জমহুর ফিকাহবিদদের মতে এরা আসলেই দুই ধরনের লোক—একই প্রজাতিভুক্ত। আর সে প্রজাতি হচ্ছে অভাব-অনটন লাঞ্ছিত জনগণ। তবে শব্দ দুটির তাৎপর্য নির্ধারণে তাফসীরকার ও ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একটি আয়াতে একই প্রসঙ্গে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাৎপর্য নির্ধারণে এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ঠিক

'ইসলাম' ও 'ঈমান' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের মত। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ দুটি শব্দ এক স্থানে ব্যবহৃত হলে তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। তখন প্রতিটি শব্দের একটা বিশেষ অর্থ হবে। আর এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে অভিন্ন অর্থাৎ একটার উল্লেখ হলে অপরটির অর্থও তার মধ্যে শামিল আছে বলে মনে করতে হবে। এই দৃষ্টিতেই প্রশ্ন উঠেছে, এখানে 'ফকীর' ও 'মিসকীন' এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত তাৎপর্য কি ?

শায়খুল মুফাসসিরীন ইমাম তাবারী লিখেছেন, 'ফকীর' অর্থ ঃ

اَلْمُحْتَاجُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِى لَايَسْأَلُ-

সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যে নিজেকে সর্বপ্রকারের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে চলছে, কারুর নিকটই কিছুর প্রার্থনা করে না।

আর 'মিসকীন' হচ্ছে, লাঞ্ছনাগ্রস্ত অভাবী ব্যক্তি, যে চেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

তার এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি বলেছেন,—'মাসকানা'—'দারিদ্র্য'-শব্দটিই এই কথা বোঝায়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ-

তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।[১] (সূরা বাকারা ঃ ৬১)

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

সে মিসকীন নয়, যাকে একটি বা দুটি খেজুর দিয়ে দেয়া হয়। বরং মিসকীন সে, যে নিজেকে পবিত্র রেখে চলে।[২]

তবে এটা 'মিসকীন' শব্দের আভিধানিক অর্থ নয়। অথচ আভিধানিক অর্থই তাদের নিকট গ্রহণীয়। এই কথাটি এ পর্যায়ের, যেমন বলা হয়েছে, 'কুস্তিগিরি দ্বারা শক্তিমত্তার পরিচয় হয় না, শক্তিধর সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলাতে পারে।'

এই কারণে ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ লোকেরা বাহ্যত তাকেই মিসকীন বলে মনে করে, যে ভিক্ষার জন্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু নবী করীম (স) তাকে মিসকীন বলেন নি। কেননা সে তো ভিক্ষা করে প্রয়োজন পরিমাণ—অনেক ক্ষেত্রে তার চাইতেও অধিক-আয় করে থাকে। তখন তার অভাব মিটে যায়। দারিদ্র্যের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। তবে যে ব্যক্তি দরিদ্র হয়েও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেনি, তার অভাব ও দারিদ্র্য অক্ষুণ্নই থেকে যায়। কেউ তার কষ্টের কথা বুঝে না, দেয়ও না তাকে কিছু।[৩]

ফিকাহবিদগণও বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই দুই ধরণের দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে অধিক দুরবস্থা কার।—ফকীরের, না মিসকীনের ?

---

১. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣٠٨

২. বুখারী ও মুসলিম—বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)।

৩. معالم السنن ج ٢ص ٢٣٢

শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে ফকীর-এর অবস্থাই অধিক খারাপ। মালিকীদের নিকট ব্যাপারটি উল্টো—হানাফীরাও এই মত গ্রহণ করেছেন বলে সকলে জানেন। উভয় পক্ষের নিকট অভিধান ও শরীয়াত—দুই দিক দিয়েই দলীল রয়েছে।

শব্দ দিয়ে তাৎপর্য নির্ধারণে উপরিউক্ত মতদ্বৈততার ব্যাপারটি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, তারা নিজেরাই চূড়ান্ত করে বলেছেন যে, এর কোন দীর্ঘসূত্রিতা নেই, আর এর তত্ত্বানুসন্ধানের পরিণতিতে যাকাতের ব্যাপারে আহরণযোগ্য কোন ফলই পাওয়া যাবে না।[১]

হানাফী মতে 'ফকীর' ও 'মিসকীন'

এখানে যে কথা উল্লেখ্য তা হচ্ছে, হানাফীদের মতে যে লোক শরীয়াতভিত্তিক যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়, সে-ই ফকীর অথবা যে-লোক মালিক হবে ঘরের দ্রব্যসামগ্রী, সাজ-সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড়, বই-কিতাব ইত্যাদি জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার্য এবং মৌল প্রয়োজন পরিপূরণে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির, যার মূল্য নিসাব পরিমাণ কিংবা তার অধিক হবে।

আর তাঁদের মতে 'মিসকীন' হচ্ছে সে যার কিছুই নেই। সাধারণভাবে এটাই প্রসিদ্ধ কথা।

তবে হানাফী আলিমগণের মধ্যে 'নিসাব' বলতে কি বোঝায় তা নির্ধারণে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে দু'শ দিরহামের নিসাব ধরা হবে; কিংবা যে কোন মালের প্রচলিত নিসাব ধরে হিসাব করলেই চলবে ?[২]

---

১. প্রাচ্যবিদ শাখত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ 'ফকীর' ও 'মিসকীন' শব্দদ্বয় প্রসঙ্গে আলোচনাকালে দুঃখজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, 'ফুকারা' ও 'মাসাকীন' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তা খুবই অবিচারমূলক। ফিকাহর আলিমগণ সর্বাবস্থায়ই সংজ্ঞার এমন ব্যাখ্যা দিতে অভ্যস্ত হয়েছেন, যেন তারা নিজেরাই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে কোন একটির মধ্যে প্রধান হিসেবে গণ্য হতে পারেন। (১০ম খণ্ড, ৩৬০ পৃ.) কিন্তু আলিম চরিত্রসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকট থেকেই এরূপ দুর্বলতা প্রকাশিত হওয়া নিতান্তই অবাঞ্ছিত। হানাফী মাযহাবের সরখসী বা মালিকী মাযহাবের ইবনুল আরাবী, শাফেয়ী মাযহাবের নব্বী, হাম্বলী মাযহাবের ইবনে কুদামাহ, জাহিরী মতের ইবনে হাজম প্রমুখ ইসলামী মাযহাব সমূহের ফিকাহবিদগণ। দারিদ্র্য বা অনটনগ্রস্ত হওয়ার ভান করে যাকাতের অংশ গ্রহণের লোভ করবেন—এমন কথা চিন্তাই করা যায় না। সংজ্ঞাসমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কোন বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবেন, তাও নিতান্তই অকল্পনীয়। কেননা এসব ফিকাহবিদ দানকারী ধনী ও আত্মসম্মান রক্ষাকারী দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ছিলেন। তাঁদের জীবনচরিত সম্পর্কে অবহিত সকল লোকের নিকটই তা স্পষ্ট। আর যে অবিচারমূলক পার্থক্য সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তাতে একই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত এসব শব্দের মধ্যে সূক্ষ্মতর পার্থক্যের কথা চিন্তা করা যায় না। আসলে এটা প্রথমে আভিধানিক ব্যাপার। ফিকাহ পর্যায়ের বির্তক তো পরে। এজন্যেই আভিধানিক ও তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে তেমনই অনুসন্ধিৎসা চালিয়েছেন, যেমন চালিয়েছেন ফিকাহবিদগণ। আর একথা তো অকাট্য যে, এই মতপার্থক্যের কোন প্রভাবই যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নয়।

২. مجمع الانهر؛ در المنتقى দ্রষ্টব্য

অতএব তাঁদের মতে দারিদ্র্য বা অভাবের দিক দিয়ে যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোক হচ্ছে এরা ঃ

১. নিঃস্ব—যার কিছুই নেই, সে মিসকীন।

২. যার ঘর, দ্রব্য ও ঘরের কিছু না-কিছু সামগ্রী রয়েছে, যা দিয়ে উপকৃত হওয়া যায় বটে কিন্তু তা দারিদ্র্য মোচনে যথেষ্ট হয় না—তার মূল্য যা-ই হোক না কেন।

৩. নগদ সম্পদের নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ অপেক্ষা কম সম্পদের যে মালিক—দু'শ দিরহাম নগদ সম্পদের কম পরিমাণের মালিক।

৪. নগদ সম্পদ ছাড়া অন্যান্য সম্পদের নিসাব পরিমাণের কম সম্পদের যে মালিক—যেমন চারটি উটের মালিক কিংবা উনচল্লিশটি ছাগলের মালিকও 'ফকীর' গণ্য হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তার মূল্য যেন দু'শ দিরহাম পর্যন্ত না পৌঁছায়।

আরও একটি ব্যাপারে মতদ্বৈততা রয়েছে। তা হচ্ছে, নগদ সম্পদ ছাড়া অন্যান্য সম্পদের নিসাব—যেমন পাঁচটি উট বা চল্লিশটি ছাগলের মূল্য যদি নগদ সম্পদের নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে এরূপ অবস্থায় কারো মতে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয এবং তাকে নিজেকেও যাকাত আদায় করতে হবে। আর অপররা বলেছেন, সে তো ধনী ব্যক্তি, তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে না।[১]

কি পরিমাণের ধনাঢ্যতা যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক তা স্পষ্ট করার জন্যে আমরা শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

অপর তিনজন ইমাম 'ফকীর' ও 'মিসকীন' সম্পর্কে যে মত দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা ছাড়া অপর তিনজন প্রধান ইমামের দৃষ্টিতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা না থাকার ওপর দারিদ্র্য ও মিসকীনী নির্ভরশীল নয়। বরং প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ না থাকাই দারিদ্র্য প্রমাণ করে।

অতএব 'ফকীর' সে, যার কোন মাল-সম্পদ নেই, নেই তার উপযোগী হালাল উপার্জন, যদ্দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, যার খাওয়া-পরা ও থাকার স্থান বা ঘর এবং অন্যান্য জরুরী জিনিসপত্র নেই। না তার নিজের জন্যে, না তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্যে। খুব অপচয়ের প্রশ্ন নয়, নিম্নতম প্রয়োজনের কথাই বলা হচ্ছে। যেমন যার দৈনিক প্রয়োজন দশ টাকা, অথচ সে পাচ্ছে চার বা তিন কিংবা দু'টাকা মাত্র—সে তো নিঃসন্দেহে ফকীর।

আর মিসকীন হচ্ছে সে, যার এমন পরিমাণ সম্পদ বা হালাল উপার্জন সম্পূর্ণ মাত্রায় আছে যদ্দ্বারা তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে বটে; কিন্তু তা হচ্ছে না। যেমন যার প্রয়োজন দশ টাকার সে পাচ্ছে সাত বা আট টাকা—যদিও সে নিসাব পরিমাণ কিংবা একটা মোটা সম্পদের মালিক হয়ে আছে।

---

১. مجمع الانهر - در المنتقى

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন, অর্ধেক বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। এরূপ অবস্থায় এই যথেষ্ট পরিমাণের অর্ধেক বা তার চাইতে বেশির মালিক হলেও সে মিসকীন। আর ফকীর হচ্ছে, তার অর্ধেকেরও কম পরিমাণ সম্পদের মালিক।

এই সংজ্ঞার সারনির্যাস হচ্ছে,দারিদ্র্য ও মিসকিনীর নামে যাকাত পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত তিন পর্যায়ের যে-কোন এক পর্যায়ের লোক ঃ

প্রথম ঃ যার কোন সম্পদ নেই, নেই আসলেই কোন উপার্জন।

দ্বিতীয় ঃ যার কিছু মাল বা উপার্জন আছে বটে; কিন্তু তা তার ও তার পরিবারের লোকদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট নয়।

তৃতীয় ঃ যার মাল-সম্পদ আছে বা অর্ধেক কিংবা ততোধিক প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ উপার্জন আছে, যদ্দ্বারা তার ও তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের প্রয়োজনের অর্ধেক পূরর্ণ হয়; তার প্রয়োজন পুরা মাত্রায় পূরণ হয় না।

ফকীর বা মিসকীনের জন্যে 'যথেষ্ট পরিমাণ' বলতে মালিকী ও হাম্বলী মতে একটি বছরের জন্যে যথেষ্ট হওয়া বোঝায়। আর শাফেয়ী মতে তার সম্মানের লোকদের 'জীবনের বেশির ভাগ সময়ের জন্যে যথেষ্ট' বোঝায়। যদি সাধারণ বয়সের গড় ষাট বছর হয় এবং সে হয় ত্রিশ বছর বয়সের লোক, আর তার নিকট বিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত সম্পদ থাকে, তাহালে অবশিষ্ট দশ বছরের প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে যাকাত গ্রহণের অধিকারী হবে।

শামসুদ্দীন রমলী বলেছেন, সংজ্ঞার এই বিশ্লেষণে অধিক সংখ্যক ধনী লোকেরই যাকাত গ্রহণের সুযোগ ঘটবে, এমন কথা বলা যায় না। কেননা আমরা তার জবাবে বলব, যার এমন মাল আছে যে, তার মুনাফাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে; কিংবা এমন পরিমাণ জমি আছে যার উৎপাদন তার জন্যে যথেষ্ট হবে, সে-ই ধনী ব্যক্তি। অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই এরূপ।[১] তাই এই ধনী ব্যক্তিরা কখনই যাকাত পেতে পারে না।

কোন ফকীর বা মিসকীন ব্যক্তির উপযুক্ত একখানা ঘর থাকলেই তার দারিদ্র্য ও মিসকিনী থেকে মুক্তি ঘটেছে বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এ ঘর তার জন্যে প্রয়োজনীয়, তা বিক্রয় করে দিয়ে প্রয়োজনের জন্যে ব্যয় করতে তাকে বাধ্য করা যায় না। আর যার এমন পরিমাণ জমি রয়েছে যে, তার ফসল তার প্রয়োজন পূরণ করে না, সে নিশ্চয়ই 'ফকীর' বা 'মিসকীন'। তবে সে জমি যদি খুব উত্তম হয়, যা বিক্রয় করে দিলে তার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ ফসল ক্রয় করা সম্ভবপর হয়, তাহলে তা বিক্রয় করে দেয়াই তার কর্তব্য—বাহ্যত তা-ই মনে হয়।

ঘরের মতই তার মালিকানার কাপড়-চোপড়ও, বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে শোভা বর্ধনের জন্যে তার ব্যবহার প্রয়োজনীয় হলেও। এই কাপড়ের মালিকানা থাকলেই সে দরিদ্র থাকবে না, ধনী গণ্য হবে, এমন কথা নয়।

---

১. نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٥١-١٥٢

নারীর জন্যে উপযুক্ত অলংকারাদির কথাও তাই। স্বভাবতই সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তার প্রয়োজন। তা থাকলেই তার দারিদ্র্য ও মিসকিনী থেকে মুক্তি ঘটেছে, তা বলা যেতে পারে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-কিতাব, যা খুবই প্রয়োজনীয়, বিরল বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি—বছরে মাত্র একবারই তার প্রয়োজন দেখা দিলেও তা শরীয়াত সম্পর্কিত ফিকাহ, তাফসীর—হাদীসের গ্রন্থাদিই হোক, কিংবা অভিধান বা সাহিত্যের ন্যায় সাহায্যকারী গ্রন্থাদিই হোক। অথচ বৈষয়িক উপকারী গ্রন্থাদি—যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় বই, এ সবের দরুনও কারুর দারিদ্র্য বা মিসকীনী ঘুচে যায় না।

পেশা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, শিল্পের পাত্রাদি—যা শিল্পোৎপাদন কার্মে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, তাও এ পর্যায়েই গণ্য।

যেসব ধন-মাল ব্যবহার অনুপযোগী, দূরবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত বলে অথবা নিকটে উপস্থিত মাল হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন কোন স্বৈরতান্ত্রিক সরকার তা আটক করেছে বা তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে; কিংবা তাকেই বন্দী করে রেখেছে।

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ থাকলেও অনুরূপ অবস্থাই হয়। কেননা যদ্দিন মেয়াদ শেষ না হচ্ছে, তার দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না।

ফকীর-মিসকীনের অংশ থেকে কোন ধনীকেই কিছু দেয়া যেতে পারে না

দারিদ্র্য ও মিসকিনী পর্যায়ে ফিকাহবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য দুই প্রকারের লোকদের পরিচিতি পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দটির ওপরও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। কেননা এর বিপরীত গুণের লোক তো আর যাকাত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাই 'ফকিরী' ও 'মিসকিনী' এই দুইয়ের বিপরীত গুণসম্পন্ন শব্দ 'ধনী'র ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে।

ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ফকীর ও মিসকীনের প্রাপ্য যাকাতের অংশ কোন ধনী লোককেই দেয়া যেতে পারে না। কেননা যাকাতকে আল্লাহ তা'আলা ফকীর ও মিসকীনদের জন্যেই চিরতরে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। ধনী লোক যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে গণ্য নয়। নবী করীম (স) তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ لِيُرَدَّ اِلَى فُقَرَائِهِمْ-

তা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে, তাদের মধ্যকার গরীব লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করার উদ্দেশ্যে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'যাকাত ধনী লোকের জন্যে হালাল নয়।'

(আবূ দাউদ, তিরমিযী)

কেননা ধনী লোকেরাই যাকাত নিয়ে নিলে তা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। তাহলে তা ফরয করার আসল উদ্দেশ্য—গরীব লোকদের দারিদ্র্য মোচন—মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে পড়বে। ইবনে কুদামা তাই বলেছেন ঃ[১]

কিন্তু 'ধনী' কে—ধনীর সংজ্ঞা কি ?

ধনীর যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ

যে ধনাঢ্যতা যাকাত গ্রহণ করার প্রতিবন্ধক, তার সংজ্ঞা কি, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

আমরা বলেছি, ধনাঢ্যতা যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক, কেননা ধনাঢ্যতাই যাকাত ফরয হওয়ার কারণ। এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ মোটামুটি অভিন্ন মত পোষণ করেন। আর তা হচ্ছে, সর্বজনবিদিত ক্রমবৃদ্ধিশীল ধন-মালের নিসাব পরিমাণের মালিকানা—কয়েকটি বিশেষ শর্তের ভিত্তিতে। অথচ এই ফিকাহবিদগণই যাকাত গ্রহণে প্রতিবন্ধক পরিমাণ ধনাঢ্যতার সংজ্ঞায় বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এখানে আমরা সেই বিভিন্ন মত উল্লেখ করছি ঃ

ইমাম সওরী প্রমুখের অভিমত

সুফিয়ান সওরী, ইবনুল মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই বলেছেন, যে ধনাঢ্যতা থাকলে যাকাত—সাদকা গ্রহণ করতে বাধা দেয়—নিষেধ করে, তা হচ্ছে পঞ্চাশ দিরহাম বা এই মূল্যের সমান পরিমাণ স্বর্ণের মালিকানা অর্থাৎ নগদ সম্পদের নিসাবের এক-চতুর্থাংশের অর্ধেক।[২]

দলীল হিসেবে তাঁরা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَئَالَ وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمُوْشٌ اَوْخُدُوْسٌ اَوكُدُوْحٌ فِىْ وَجَهِهِ -

যে ব্যক্তি তার যথেষ্ট 'সম্পদ' থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন তার মুখাবয়বে আচড়ানো ক্ষতচিহ্ন থাকবে।

এ কথা শুনে বলা হল, ইয়া রাসূল! ধনাঢ্যতা বলতে কি বোঝায় ? বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম নগদ সম্পদ কিংবা এই মূল্যের স্বর্ণের মালিকত্ব থাকা।[৩]

ইমাম আহমাদ থেকেও এই মতের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য নগদ সম্পদের মালিকানা ও অ-নগদ সম্পদের মালিকানার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। যে-লোক

---

১. معالم السنن ج ٢ ص ٢٣٦ .২ المغنى ج ٦ ص ٥٢٢ .১

৩. ابوداؤد، نسائى، ترمذى، ابن ماجه

অ-নগদ সম্পদের একটা পরিমাণের মালিক হবে, যা তার জন্যে যথেষ্ট নয়, সে 'ধনী' বলে অভিহিত হতে পারে না—তার মূল্য যত বেশিই হোক-না-কেন। আর যে লোক পঞ্চাশ দিরহাম নগদ সম্পদ বা এই পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণের মালিক হবে, সে ধনী বিবেচিত হবে। কেননা নগদ সম্পদ ব্যয়ের জন্যে প্রস্তুত সামগ্রী। উপরে উদ্ধৃত হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসেও এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু হাদীসের মূল্যায়ন ও যাচাই-পরখকারীরা উক্ত হাদীসটিকে 'দুর্বল' বলে অভিহিত করেছেন। এ দুর্বলতার কারণও নির্দেশ করেছেন।

হাদীসটিকে সহীহ মেনে নিয়েও অনেক মনীষী তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, রাসূলে করীম (স) এ কথাটি ঠিক সেই জাতির লোকদের জন্যে বলেছেন, যারা পঞ্চাশ দিরহামের মূলধন নিয়ে ব্যবসা করত এবং তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হতো।[১]

অন্যরা বলেছেন, নবী করীম (স) উক্ত কথা বলেছিলেন তখন, যখন এই পঞ্চাশ দিরহাম সাধারণভাবেই যথেষ্ট হয়ে যেত।[২]

অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন, কথাটি আসলে ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত; কাজেই যে-লোক পঞ্চাশ দিরহামের মালিক হবে, ভিক্ষা চাওয়া তার জন্যে হারাম হবে; কিন্তু গ্রহণ করা হারাম হবে না।[৩]

ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, হাদীসবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন, হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, যে-লোক পঞ্চাশ দিরহামের মালিক হবে, তার জন্যে যাকাত-সাদকা হালাল নয়। তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া অপসন্দনীয়, এ কথাই শুধু বলা হয়েছে। কেননা ভিক্ষা চাওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজনেই হয়ে থাকে, কিন্তু যে-লোক উপস্থিত প্রয়োজন মেটানোর পরিমাণ সম্পদের মালিক, তার ভিক্ষা চাওয়ার কোন প্রয়োজন হতে পারে না।[৪]

হানাফী মাযহাবের মত

হানাফী আলিমগণ মনে করেন, যে ধনাঢ্যতা যাকাত-সাদকা গ্রহণের প্রতিবন্ধক, তা নিম্নোক্ত যে-কোন একটি মাত্রার হবে ঃ

প্রথম, যে-কোন মালের যাকাতের নিসাব পরিমাণের মালিকত্ব। যেমন মুক্তভাবে পালিত পাঁচটি উট অথবা দু'শ' দিরহাম নগদ; কিংবা বিশ দীনার নগদ (এক্ষণে তার মূল্য ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ মনে করা হয়েছে)। কেননা শরীয়াত মানুষকে দুই ভাগে-বিভক্ত করেছে। এক প্রকার হচ্ছে ধনী লোক, যাদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে আর অন্য প্রকার হচ্ছে গরীব, মিসকীন—তাদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করা হবে। আর একজন লোক একই সময় ধনী ও গরীব উভয়ই হতে পারে না। যেমন, কারুর নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে সেই সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু তার যদি

---

১. الانصاف ج ٢ ২. الانصاف ج ٢

৩. معالم السنن ج ٢ ص ٢٣٦ ৪. معالم السنن ج ٢ ص ٢٣٦

বিপুল সংখ্যক সন্তান-সন্ততি থাকে, যাদের জন্যে বহু পরিমাণ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে সে যাকাত দিতে পারে না আর যাকাত গ্রহণও তার জন্যে জায়েয হয় না।

অপর কোন কোন হানাফী আলিমের মত হচ্ছে, যে-কোন মালের নিসাব পরিমাণ থাকাটাই গণনাযোগ্য—সেই একই জাতীয় মাল দ্বারা নিসাব পূর্ণ হোক আর না-ই হোক।

তাই যে লোক চল্লিশটি ছাগীর মালিক—ছাগীর নিসাবও তাই—তার মূল্য যদি দু'শ' দিরহামের সমান না হয়, তাহলে উপরিউক্ত মত অনুযায়ী সে গরীব ব্যক্তি। এমতাবস্থায় তাকে যাকাত দিতেও হবে এবং সে যাকাত গ্রহণও করতে পারবে।

এই মতের সমর্থনে কেউ কেউ দলীল হিসেবে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ

কোন ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে যদি ভিক্ষা চায়, তাহলে সে (কুরআনে অপসন্দনীয় বলে ঘোষিত ভাবে) লোকদের পাকড়াও করে ভিক্ষা চাইল।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ 'যথেষ্ট পরিমাণ' বলতে কি বোঝায় ? বললেন ঃ 'দু'শ' দিরহাম' নগদ।

কিন্তু হাদীসটি যয়ীফ। তাসত্ত্বেও তা ভিক্ষা নিষেধকারী দলীল হিসেবে গণ্য হতে পারে। তা সে-সব হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের বিরুদ্ধে পেশ হতে পারে না, যারা মনে করেন যে, যার নিকট দু'শ' দিরহাম রয়েছে, অথচ তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা যে ধনাঢ্যতা ভিক্ষা চাওয়াকে হারাম করে, তা যাকাত গ্রহণকে হারাম করে না।

এই উভয় মতের কোন একটির ওপর নির্ভরতা গ্রহণের ক্ষেত্রে হানাফী আলিমগণের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ রয়েছে। এই মতবিরোধের কথা তাদের লিখিত গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়, যেসব মালে যাকাত ফরয হয় না সেসব মালের মালিকানা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণের হয় এবং তার মূল্য দু'শ' দিরহামের বেশি হয়—যেমন কাপড়, বিছানা, তৈজসপত্র, বই-কিতাব, ঘড়-বাড়ি, দোকান ঘর, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি—প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি থাকে, অথচ এর সবগুলোই ব্যয়-ব্যবহারের জন্যে, বিক্রয় করে ব্যবসা করার জন্যে নয়। সেগুলো যদি দু'শ' দিরহাম মূল্যের হয়, তা হলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ হারাম হয়ে যাবে। কারুর দুইখানি ঘর থাকলেও একখানি ঘর দ্বারাই তার প্রয়োজন পূর্ণ হলে—যা বিক্রয় করা হলে নগদ সম্পদের নিসাব পরিমাণ মূল্য পাওয়ার আশা হবে, তার জন্যেও যাকাত গ্রহণ জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে কারুর নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বই-কিতাব বা কাজের পাত্র-ভাণ্ডার তৈজসপত্র থাকলে—যার মূল্য নিসাব পরিমাণ হবে অথচ সেগুলো তার জন্যে প্রয়োজনীয় নয়, কেননা সে নিজে কোন লেখাপড়ার ব্যক্তি নয়, নয় সে সেই কাজের যোগ্য যার পাত্রগুলো রয়েছে—তা হলেও তার যাকাত গ্রহণ জায়েয হবে না।

ইমাম আল-কাসানী বলেছেন ঃ

ইমাম করখী 'প্রয়োজন পরিমাণ পর্যায়ে' বলেছেন ঃ যার একখানি ঘর আছে, আছে ঘরের দ্রব্য-সামগ্রী-সরঞ্জাম, আছে একজন খাদেম, বিছানা-পত্র, পরিধানের কাপড়, শিক্ষিত হলে বই-পত্র, তার এই অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য যদি এমন পরিমাণ হয় যার দরুন তার মালিকের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা হারাম হয়ে যায়, তাহলে তাকেও যাকাতের অংশ দেয়ায় কোন দোষ নেই। কেননা হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবিগণ এমন ব্যক্তিকেও যাকাত দিতেন যে ঘোড়া, হাতিয়ার, খাদেম ও ঘর ইত্যাদি দশ হাজার দিরহাম মূল্যের সম্পত্তির মালিক ছিল। কেননা এই জিনিসগুলো তো মৌল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত—এগুলো মানুষের জন্যে একান্ত আবশ্যক। তাই এগুলোর থাকা না থাকা সমান।[১]

'আল-ফাতওয়া' কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে, যার দোকান ও শস্যাদি রাখার ঘর আছে, কিন্তু সে শস্য তার ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয় না, সে 'ফকীর'—দরিদ্র ব্যক্তি। তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ এই মত দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফের মতে এই ব্যক্তির পক্ষে যাকাত হালাল নয়। অনুরূপভাবে কারুর যদি ফলের বাগান থাকে এবং তার ফসল তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে....।

যদি কারুর নিকট এমন পরিমাণের খাদ্য মজুদ থাকে যার মূল্য দু'শ' দিরহাম, তা যদি তার এক মাসের প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয হবে। যদি এক বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে—বলা হয়েছে—হালাল হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হালাল হবে। কেননা প্রয়োজন পরিমাণ পাওয়ার তার অধিকার আছে। তাই মনে করতে হবে যে, তার কিছুই নেই। খোদ নবী করীম (স) তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে এক বছর কালের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য জমা করে রেখেছিলেন।

যদি কারুর শীতকালীন কাপড় থাকে, যা গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনীয় নয়, (এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণও হয় তাহলেও) তার পক্ষেও যাকাত গ্রহণ করা হালাল।

'তাতারখানীয়া' ফতোয়ার কিতাবে লিখিত রয়েছে, কারুর বসবাসের একখানা ঘর থাকলে আর তা সবাইর বসবাসের জন্যে যথেষ্ট না হলে তার পক্ষেও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

তাতে আরও উদ্ধৃত হয়েছে, ইমাম মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করা হয়, একজনের জমি আছে, সে তা চাষাবাদ করে, কিংবা দোকান রয়েছে, যা দ্বারা সে মুনাফা পায়, অথবা তিন হাজার মূল্যের একখানা ঘর রয়েছে; কিন্তু তার নিজের ও তার পরিবারবর্গের খরচপত্রের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ আয় না থাকে, তাহলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা

---

১. البدائع والصنائع ج ٢ ص ٤٨

জায়েয কিনা ? জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ জায়েয, তার মূল্য কয়েক হাজার হলেও। এই মতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে হালাল নয়।

ফিকাহবিদ ইবনে আবেদীনের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে মেয়েটিকে দান-জিহাজ সহকারে তার স্বামীর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে, সে কি ধনবতী গণ্য হবে ? জবাবে বলেছিলেন, বাহ্যত দেখা যায়, ঘরের দ্রব্য-সরঞ্জাম, পরনের কাপড়-চোপড় ও ব্যবহার্য ভাণ্ড বা তৈজসপত্রাদি মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে গণ্য, একান্তই অপরিহার্য। তাই তার অতিরিক্ত অলংকারাদি, তৈজসপত্র ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী সামগ্রীসমূহ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার মালিক ধনী গণ্য হবে।

তিনি আরও বলেছেন, 'তাতারখানীয়া' গ্রন্থের 'ফিতর সাদকা' অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে ঃ যে-মেয়েলোকটির হীরা-জহরত রয়েছে, যা সে ঈদ ও অন্যান্য উৎসবাদিতে পরিধান করে, স্বামীর জন্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সেগুলো ব্যবসায়ের জন্যে নয়, তার ওপর ফিতরে সাদকা দেয়া ওয়াজিব কিনা, হামান ইবনে আলীকে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ, ঐসব জিনিস নিসাব পরিমাণের হলে তা ওয়াজিব হবে। আর উমর-আল-হাফেযকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তার ওপর তেমন কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইবনে আবেদীন বলেছেন, এই আলোচনার সারকথা হচ্ছে আলংকারাদি আসল ও মৌল প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য অ-নগদ সম্পদ।[১] (প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন)

ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহ্মাদের মত

যে-সম্পদ দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়, তা-ই ধনাঢ্যতা। একজন লোক যখন পরমুখাপেক্ষী নয়, তখন যাকাত গ্রহণ তার জন্যে হারাম, কোন জিনিসের মালিকানা না থাকলেও। আর অভাবগ্রস্ত ও পরমুখাপেক্ষী হলেই তার জন্যে যাকাত গ্রহণ হালাল—সে নিসাব পরিমাণ বা বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বর্ণনানুযায়ী ইমাম আহমাদের এই অভিমত। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, ধনাঢ্যতার কোন সীমা বা সংজ্ঞা সুপরিচিত নয়। ব্যক্তির সচ্ছলতা ও অর্থশক্তির প্রেক্ষিতেই তা নির্ধারণ করতে হবে। ব্যক্তির নিকট যা আছে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয হবে না। অভাবগ্রস্ত হলে তা জায়েয হবে।[২]

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যক্তি কখনও দিরহামের মালিক হয়ে ধনী গণ্য হয়—উপার্জন চালু থাকলে। আর কোন ব্যক্তির হাজার টাকার মালিকানা থাকলেও তার অক্ষমতা ও বিপুল সংখ্যক সন্তানাদি থাকার কারণে সে ধনী গণ্য হবে না।

---

১. حاشيه ردالمختار ج ۲ ص ۸۸

২. معالم السنن ج ۲ ص ۲۲۷

শরীয়াত তার দলীলাদি দ্বারা এই মতকেই সমর্থন করে। শরীয়াতের মৌল ভাবধারাও তাই। অভিধান ও তার প্রয়োগ থেকেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়।

নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো থেকেও এ মতের যথার্থতা প্রমাণিত হয় ঃ

ক. হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) কুবাইচা ইবনুল মাখারিকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন ঃ তিনজনের যে কোন একজনের পক্ষে ভিক্ষা করা জায়েয ঃ যে ব্যক্তি অভুক্ত রয়েছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনে বেঁচে থাকার সম্বল না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষা চাইতে পারে।

খ.দারিদ্র্য হচ্ছে অভাবগ্রস্ততার অপর নাম। আর ধনাঢ্যতার বিপরীত। কাজেই যে-লোক অভাবগ্রস্ত, সেই দরিদ্র এবং কুরআনী আয়াতের আওতায় পড়ে প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। আর যে-লোক পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত, সে যাকাত হারাম হওয়ার সাধারণ ঘোষণার মধ্যে পড়বে অর্থাৎ যাকাত গ্রহণ তার জন্যে হারাম। অভাবগ্রস্ততাই যে দারিদ্র্য, তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

يَـايُّـهَا النَّـاسُ اَنْـتُمُ الْفُقَرَاۤاِلَى اللّٰهِ -

হে মানুষ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী।

এই কথার ভিত্তিতে দুটি বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে ঃ

প্রথম, যে-ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ ধন-মাল আছে—তা যাকাত দেয়া মাল হোক কিংবা অন্য ধরনের; অথবা তার উপার্জিত কর্মের বিনিময়ে বা মজুরী হিসেবে পাওয়া জমি হোক কিংবা অন্য কিছু—তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়। ধন-মালের যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি বিবেচ্য হবে তার নিজের, তার ওপর নির্ভরশীল তার সন্তানাদি ও অন্যান্যদের প্রেক্ষিতে। কেননা এদের সকলেরই প্রয়োজন পূরণ করা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের লক্ষ্য। তাই এক ব্যক্তির জন্যে যা প্রয়োজন বিবেচিত হবে তা-ই বিবেচিত হবে অন্যদের জন্যেও। সাধারণ শ্রমজীবী ও বেতনভুক লোকেরাও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য এবং তাদের নিত্য নব উপার্জনের কারণে ধনী বলে বিবেচিত। তার ধন ও পুঞ্জীভূত সম্পদের দরুন নয়। অতএব যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হওয়ার দরুন গরীব ও দরিদ্র বিবেচিত হবে, তারা সবাই যাকাত পাওয়ার যোগ্য হবে..... কিন্তু এ কথা অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়, যে-লোক যাকাত দেয়া মালের নিসাব পরিমাণের বা তার অধিকের মালিক হবে, যা তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্যে যথেষ্ট নয়, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ বৈধ। কেননা সে ধনী নয়। কাজেই যার হাজার দীনার বা ততোধিক মূল্যের পণ্যদ্রব্য রয়েছে, কিন্তু তা থেকে লব্ধ মুনাফা তার প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয় না—বাজারের মন্দা অবস্থার কারণে; কিংবা তার অধিক সংখ্যক সন্তান-সন্তুতি থাকার কারণে—তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ জায়েয।

যার পাঁচ 'অসাক' পরিমাণ কৃষি ফসল রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, তার পক্ষেও যাকাত নেয়া জায়েয। অবশ্য এই অবস্থা তার ওপর যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা যে ধনাঢ্যতা যাকাত ফরয হওয়ার কারণ হয় তা হচ্ছে শর্তাধীন নিসাবের মালিকানা। যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক ধনাঢ্যতা হচ্ছে তা, যদ্দারা প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ হবে। এ দুটির মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।[১]

মাইমূনী বলেছেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম ঃ এক ব্যক্তির উট ও ছাগল রয়েছে, যার ওপর যাকাত ফরয হয়, অথচ তা সত্ত্বেও সে ফকীর-দরিদ্র। তার চল্লিশটি ছাগী থাকতে পারে, আছে কৃষিজমি; কিন্তু তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, এই ব্যক্তিকে কি যাকাত দেয়া যাবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ 'এদের দাও, তাদের এত এত উট থাকলেও।'[২]

ইমাম আহমাদ বলেছেন, কারুর ভূ-সম্পদ বা জমি থাকলে—যার ফসল হয় দশ হাজার বা ততোধিক, কিন্তু তা-ও তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, সে যাকাত নেবে।[৩]

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ফসল রয়েছে, কিন্তু তা কাটার সরঞ্জাম নেই, সে কি যাকাত নেবে ? বললেন ঃ হ্যাঁ।

যার মুখস্থকরণ ও অধ্যয়নের জন্যে জরুরী বই-পত্র রয়েছে অথবা ব্যবহারে বা ভাড়া দেয়ার অলংকারাদি রয়েছে যা জরুরী, তার এই থাকাটা যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক নয়।

উপার্জনক্ষম দরিদ্র

যাকাত পাওয়ার অধিকার হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে অভাব-ব্যক্তির অভাব তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণের। এক্ষণে কোন নিষ্কর্মা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে—যে সমাজের ওপর বোঝা, সাহায্য ও দান নিয়ে বেঁচে থাকছে—যাকাত দেয়া জায়েয হবে কিনা ? অথচ সে লোকটি শক্ত-সুঠাম দেহসম্পন্ন, উপার্জন করতে সক্ষম এবং শ্রমোপার্জনের মাধ্যমে সে নিজেকে পরমুখাপেক্ষীহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত বানাতে পারে, তা সত্ত্বেও তাকে যাকাত দেয়া যাবে কিনা ?

এ পর্যায়ে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করে বলেছেন, যাকাত ফকীর ও মিসকীনের প্রাপ্য, তার কোন অংশ কোন ধনী ব্যক্তিকে দেয়া জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যে উপার্জনের মাধ্যমে তার নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম, তাকেও তার অংশ দেয়া যেতে পারে না। আমার বিবেচনায় এ মতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[৪]

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٦٤ ২. سرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٣٥
৩. المجموع ج ٦ ص ٢٢٨ ৪. شرح الغية ج ٢ ص ١٣٥

শরীয়াতের অকাট্য দলিল ও নিয়মাদিও এই মতকেই শক্তিশালী করে। যদিও কোন কোন হানাফী আলিম উপার্জনশীল দরিদ্র ব্যক্তিকেও যাকাত দেয়া জায়েয মনে করেন, অবশ্য তার নিজের উচিত নয় তা গ্রহণ করা। কেননা গ্রহণ জায়েয হলেও তা গ্রহণ করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন কোন ধনী ব্যক্তিকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দেয়া হলে তা গ্রহণ না করাই তার উচিত। তাই দেয়া জায়েয হলেও গ্রহণ করা হারাম। আর জমহুর হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, গ্রহণ করাও হারাম নয়। তবে গ্রহণ না করা অধিক উত্তম সেই ব্যক্তির পক্ষে, যার পক্ষে জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে নির্বাহ করা সম্ভব।[১]

কোন কোন মালিকী মাযহাবপন্থী ফিকাহবিদ মত দিয়েছেন যে, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।[২]

উপরিউক্ত মতটি শরীয়াতের দলিল ও নিয়মাদিও সমর্থন করে। এই কথা বলছি এজন্যে যে, ইসলাম প্রত্যেক শক্তিমান ব্যক্তির জন্যে কাজ করে উপার্জন করা ফরয করে দিয়েছে। সেই সাথে তার জন্যে কাজ করে উপার্জন করা সহজ করে দেয়া কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। ফলে সে স্বীয় শ্রম ও কাজের বিনিময়ে উপার্জন দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَاأكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّأْ كُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه (بخارى)

স্বীয় উপার্জনে খাওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য কেউ কখনও খায়নি।

কেউ যখন যথেষ্ট উপার্জনের কাজ পায়, তার পক্ষে সে কাজ অগ্রাহ্য করা—দান-সাদকা গ্রহণ বা মানুষের নিকট ভিক্ষা চাওয়ার আশায়—কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

এ কারণেই আমরা দেখছি, নবী করীম (স) সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন ঃ

لاتَحِلُّ الصَّدَ قَةُ لِغَنِىٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ - (الخمسة)

ধনী ব্যক্তির জন্যে যাকাত-সাদকা জায়েয নয়, সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তির জন্যেও নয়।

তাবারী জুহাইরুল আমেরী থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরুবনিল-আ'সকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'তা কোন্ ধরনের মাল'? বললেন ঃ পংগু, আহত, অন্ধ, দুর্বল, বিপদগ্রস্ত ও উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রাপ্য মাল। পরে বললেন, এই কাজের কর্মচারী ও মুজাহিদদেরও তাতে অংশ বা অধিকার রয়েছে। আবদুল্লাহ বলেছেন, মুজাহিদ লোকদের জন্যে জিহাদের প্রয়োজন ও সে

১. مجمع الانهر ص ٢٢٠
২. حاشية الدسوقى ج ١ ص ٤٩٤

কাজে সাহায্যকারী সম্পদ যাকাত থেকে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ জায়েয করে দেয়া হয়েছে। আর কর্মচারীরা তাদের কাজের পরিমাণ অনুযায়ী নিতে পারবে। অতঃপর বলেছেন, ধনী ও শক্তিমান ব্যক্তিদের জন্যে যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়।[১]

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের এই কথাটি বহু সংখ্যক সাহাবী স্বয়ং নবী করীম (স) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

তবে দৈহিক শক্তি ও উপার্জনে শারীরিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কার্যত যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার কোন মূল্য বা গুরুত্ব নেই। কেননা উপার্জনহীন শক্তি-সামর্থ্য ক্ষুধার্তের অন্ন ও বস্ত্রহীনের বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে না। ইমাম নববী বলেছেন, উপার্জনকারীকে কাজে নিয়োগ করার কেউ না থাকলে (অন্য কথায় বেকার ব্যক্তির পক্ষে) যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। কেননা সে তো কার্যত অক্ষম।[২]

উপরিউক্ত হাদীসে শুধু 'সুস্থ পূর্ণাঙ্গ দেহ' বলেই শেষ করা হয়েছে। কিন্তু অপর একটি হাদীসে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, ক্ষমতা থাকলেই হবে না, উপার্জন করতে হবে, তবেই তার জন্যে যাকাত গ্রহণ না-জায়েয হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী বলেছেন, তাঁকে সংবাদ দেয়া হয়েছে, দুজন লোক নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যাকাতের অংশ প্রার্থনা করল। নবী করীম (স) তাদের দুজনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখতে পেলেন, দুজন লোকই সুস্থ শক্তিমান। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা চাইলে আমি যাকাতের মাল তোমাদের দেব। কিন্তু জেনে রাখবে, ধনী ব্যক্তির জন্যে তাতে কোন অংশ নেই। অংশ নেই শক্তিমান উপার্জনশীলের জন্যেও।[৩]

নবী করীম (স) এ দুজন লোকের আসল অবস্থা জানতেন না বিধায় উক্তরূপ কথা বলে তাদেরকে যাকাত গ্রহণ করা-না-করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কেননা তারা বাহ্যত শক্তিমান হলেও বাস্তবভাবে বেকার ও অ-উপার্জনকারী হতে পারে। অথবা উপার্জন করেও যথেষ্ট পরিমাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে পারে। আর তা হলে তাদের জন্যে যাকাত গ্রহণ না-জায়েয হবে না।

এই প্রেক্ষিতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রাষ্ট্রকর্তা বা যাকাতদাতার উচিত, যাকে যাকাতের মাল দেয়া হচ্ছে, তার প্রকৃত অবস্থা না-জানার দরুন তাকে উক্তরূপ নসীহত করা। একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, যাকাতের মাল ধনী লোকের প্রাপ্য নয়, উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যেও নয়। তা-ই হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শ।[৪]

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٩١ ২. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣١

৩. الحمد، ابو دلؤد، نسائى । আহমাদ বলেছেন, হাদীসটি উত্তম। নববী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। আবূ দাউদ ও মুনযেরী কিছুই বলেন নি। ৪. نيل الاوسار ج ٤ ص ١٧٠

উপার্জনের অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন। তা না করতে পারলে যাকাত গ্রহণ জায়েয হবে। আসলে উপার্জনের অক্ষমতাই সেজন্যে শর্ত নয়। আর কেবল অক্ষম, রোগাক্রান্ত লোকদের মধ্যেই যাকাত সম্পদ বিতরণ করতে হবে, এমনও কোন কথা নেই।

ইমাম নববীর কথানুযায়ী উপার্জন এমন হতে হবে, যা তার অবস্থা ও মর্যাদার উপযোগী। তা না হলে তাকে উপার্জনহীনই মনে করতে হবে।[১]

তবে যে হাদীসে সুস্থ শক্তিমান ব্যক্তির ওপর যাকাত হারাম বলা হয়েছে, তা শক্তিসম্পন্ন অথচ সর্বক্ষণ বেকার ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

সারকথা হচ্ছে, যে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর যাকাত গ্রহণ হারাম, তাতে নিম্নোদ্ধৃত শর্তাবলী পুরামাত্রায় বর্তমান থাকতে হবে ঃ

১. উপার্জন করার মত কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. এই কাজ শরীয়াতসম্মত ও হালাল হতে হবে। কেননা শরীয়াতে হালাল নয় এমন কাজ থাকলেও তা না থাকার মতই মনে করতে হবে।

৩. সাধ্য ও শক্তির অতিরিক্ত কোন কাজের বোঝা গ্রহণ করতে হবে না। কেননা সাধারণত সাধ্যায়ত্ত কাজই মানুষ করতে পারে। (সাধ্যাতীত কাজের ব্যবস্থা থাকলে তাতে বেকারত্ব ঘুচে না।)

৪. কাজটি তার মত লোকের অনুকূল; তার অবস্থা, মর্যাদা ও সামাজিক পজিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৫. উপার্জন এতটা পরিমাণ হতে হবে, যদ্দারা তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে।

তার অর্থ হচ্ছে, উপার্জনক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিই শরীয়াতের আশা এই যে, তার নিজের প্রয়োজন সে নিজে পূরণ করবে। সেই সাথে সাধারণভাবে সমাজ ও বিশেষভাবে রাষ্ট্রনায়ক এই কাজে তার সহযোগিতা করবে। এটা তার অধিকার এবং সমাজ ও রাষ্ট্রনায়কের তা কর্তব্য। তাই যে-লোক এরূপ উপার্জনে অক্ষম হবে—ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে, যেমন বালকত্ব, বার্ধক্য, রোগ ও পঙ্গুত্ব ইত্যাদি অথবা কর্মক্ষম হয়েও তার উপযোগী কোন হালাল উপার্জন পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে কিংবা উপার্জনের ক্ষেত্র ও সুযোগ পেয়েও তার নিজের ও পরিবারবর্গের জন্যে প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট পরিমাণের উপার্জন করতে পারছে না, এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ জায়েয। তা গ্রহণ করলে তাতে তার কোন দোষ হবে না আল্লাহ্র দ্বীনের বিচারে।

বস্তুত এ-ই হচ্ছে ইসলামের মহান শিক্ষা। এতে যেমন ইনসাফ ও সুবিচারের দিকটি প্রকট, তেমনি দয়া-অনুগ্রহের ভাবধারাও পূর্ণরূপে কার্যকর। একালে যে স্লোগান

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٩٠۔

উঠেছে : 'যে কাজ করবে না সে খাবেও না'—তা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কথা যেমন, তেমনি নৈতিকতা পরিপন্থী এবং অমানবিকও। বস্তুত পাখি ও জন্তু জগতে এমন অনেকই রয়েছে যেখানে শক্তিমান দুর্বলকে বহন করে, কর্মক্ষম অক্ষমকে সাহায্য করে। মানুষ কি এসব ইতর প্রাণীর অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর ?

ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি যাকাত পাবে না

ইসলামের ফিকাহ্‌বিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি কামাই-রোজগার ছেড়ে দিয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তা হলে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে না, তার পক্ষে তা গ্রহণ করাও জায়েয নয়। কেননা তার ইবাদতের কল্যাণই তাকে সংকুচিত করে ফেলেছে। কাজ ও শ্রমে সে অংশগ্রহণ করেনি।[১] অথচ শ্রম করার ও জমির পরতে পরতে রিজিকের সন্ধান করার জন্যে তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় আদেশ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু ইসলামে এ ধরনের কোন 'রাহবানিয়াতের' একবিন্দু স্থান নেই। বরং এরূপ অবস্থায় হালাল উপার্জনে নিয়োজিত হওয়া এই সব ইবাদতের তুলনায় অনেক উত্তম কাজ, অবশ্য নিয়ত যদি যথার্থ হয় এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন না করে।

ইল্‌ম শেখার কাজে একনিষ্ঠ ব্যক্তি যাকাত পাবে

তবে কেউ যদি কল্যাণকর ইল্‌ম শেখার—বিদ্যার্জনের কাজে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত হয়, তাহলে তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। তাকে ইলমের প্রয়োজনীয় কিতাব খরিদ করে দেয়া যেতে পারে যাকাতের টাকা দিয়ে। কেননা তা তার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে সত্যিই কল্যাণকর।

ইল্‌ম শিক্ষার্থীকে যাকাত দেয়া যায় এ কারণেও যে, সে 'ফরযে কেফায়া' আদায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে আছে। এই ইল্‌ম শেখার কল্যাণটা তার নিজের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে না। তা গোটা জাতির জন্যেই কল্যাণবহ। তাই তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। আসলে যাকাত ব্যয় করা যায় মুসলিম অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে। এমন কাজেও ব্যয় করা যায় যা মুসলিম উম্মতের জন্যে জরুরী।

কেউ কেউ শর্ত করেছেন যে, তাকে উত্তমতায় শ্রেষ্ঠ হতে হবে এবং তার দ্বারা মুসলিম জনগণকে উপকৃত হতে হবে। নতুবা সে যাকাত পাওয়ার অধিকারী বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উপার্জনক্ষম থাকবে।[২] এ কথাটি যুক্তিসম্মত। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ এই নীতি অনুযায়ী কাজ করে এবং সমাজের উত্তম ও অগ্রসরমান লোকদের জন্যেই অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাদের জন্যে বিশেষ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে কিংবা উচ্চতর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের জন্যে তাদের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক প্রতিনিধিত্বে শরীক করে।

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٩١- والروضة للنووى ج ٢ ص ٣٠٩

২. شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٢٧ ঐ এবং
المجموع ج ٦ ص ١٩٠ - ١٩١

প্রচ্ছন্ন আত্মসম্মান রক্ষাকারী দরিদ্ররা সাহায্য পাওয়ার অধিকারী

ইসলামে সমান শিক্ষার ভুল প্রয়োগের কারণে সাধারণত লোকেরা ধারণা করে যে, যাকাত পাওয়ার অধিকারী সেসব গরীব মিসকীন, যারা কোন উপার্জনের কাজ করে না বা করবে না কিংবা যারা লোকদের নিকট প্রার্থনা করা, ভিক্ষা চাওয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা নিজেদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রচার করে ও দেখিয়ে বেড়ায়। পথে-ঘাটে-হাটে, বাজারে, মসজিদের দুয়ারে লোকদের সম্মুখে প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করে। সম্ভবত মিসকীনের এই চিত্র ও ছবিই দীর্ঘকাল ধরে লোকদের মন-মানসে ভাসমান হয়ে আছে। এমন কি স্বয়ং নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ও এরূপ অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃত মিসকীন কে তা বহু লোকই বুঝতে পারত না। তাই তিনি প্রকৃত মিসকীন ও সমাজ সমষ্টির সাহায্য পাওয়ার যোগ্য লোক কে সে বিষয়ে বলে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন। বলেছে ঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَتَعَفَّفُ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

প্রকৃত মিসকীন সে নয় যাকে তুমি একটা বা দুটো খেজুর দিয়ে অথবা এক মুঠি বা দু'মুঠি খাবার দিয়ে বিদায় কর। বরং প্রকৃত মিসকীন সে যে দরিদ্র হয়েও প্রার্থনা থেকে বিরত থেকে আত্মমর্যাদা বজায় রাখে: তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার, কুরআনের আয়াত ঃ যারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না....[১]

অর্থাৎ যারা কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় না, ভিক্ষা দিতে লোকদের বাধ্য করে না, লোকদের কষ্ট দেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চূড়ান্তভাবে ঠেকে না যায়। যে-লোক নিজের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা চায়, সে তাই করে। এই পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে সে ফকীর-মুহাজির লোকদের, যারা নিজেদের যথাসর্বস্ব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে চলে গেছে। এখন তাদের ধন-মাল বলতে কিছু নেই, নেই উপার্জন করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের কোন উপায়।[২] আল্লাহ এদের সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

দান-সাদকা-যাকাত সে-সব ফকীরদের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, পৃথিবীতে কামাই-রোজগার করে বেড়ানোর সামর্থ্যবান নয়, মূর্খ লোকেরা

---

١. البقره - ٢٧٣ ٢. تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٢٤

তাদের ধনী মনে করে, তারা ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে, অথচ তুমি তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই চিনতে পার, তারা লোকদের নিকট কাঁদ কাঁদ হয়ে জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না।

বস্তুত এসব লোকই সাহায্য পাওয়ার তুলনামূলকভাবে অধিক উপযুক্ত অধিকারী। নবী করীম (স) পূর্বোক্ত হাদীসে এ কথাই বলেছেন।

অপর একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَايَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَايَفْطَنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْئَالُ النَّاسَ -

লোকদের নিকট ঘুরে ঘুরে যে-লোক ভিক্ষা চায়—যাকে তুমি এক বা দুমুঠি খাবার বা একটি বা দুটো খেজুর দিয়ে বিদায় কর—সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন সে, যে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের উপায় পায় না, লোকেরাও তাদের দারিদ্র্য বুঝতে পারে না বলে তাদের দেয়ও না কিছুই। আর তারা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাইতেও দাঁড়ায় না। (বুখারী, মুসলিম)

এই মিসকীনই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত অধিকারী। যদিও লোকেরা এই মিসকীন সম্পর্কে উদাসীনই থাকে। বুঝতে পারে না যে, এই লোককে সাহায্য দেয়া উচিত। এজন্যে নবী করীম (স) এই লোকের প্রতিই জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। বিবেক-বুদ্ধি নিয়োগ করতেও বলেছেন তাদের জন্যেই। তাহলেই বহু প্রচ্ছন্ন দরিদ্র ও আত্মসম্মান রক্ষাকারী পরিবার প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে অভাবমুক্ত হতে পারে। এদের অনেক লোকই অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে গেছে বা অক্ষমতা তাদের দরিদ্র বানিয়েছে। অথবা সন্তান-সন্ততির আধিক্যের কারণে তাদের সম্পদ কম পড়ে যাচ্ছে। হয়ত উপার্জন করে এত সামান্য যে, তা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

ইমাম হাসানুল বাসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির ঘর-বাড়ি আছে, আছে সেবক-খাদেম, সে কি যাকাত গ্রহণ করতে পারে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, সে যদি অভাব বোধ করে তাহলে নিতে পারে, কোন দোষ নেই তাতে।[১] পূর্বে উল্লেখ করেছি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ফতোয়া দিয়েছিলেন, এক ব্যক্তির চাষের জমি রয়েছে, অথবা আছে দোকান ব্যবসা করার; কিংবা তার আয় তিন হাজার টাকা; কিন্তু তা তার নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। যদিও তার আয় কয়েক হাজার পর্যন্ত পৌছায়। এই মতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। ইবনে আবেদীন এই কথা উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম আহমাদের

---

১. كتاب الاموال لابى عبيد ২. ردالمحتار ج ٢ ص ٨٨

অনুরূপ একটি ফতোয়ার কথা উল্লেখ করেছি এর পূর্বে। তার মর্ম এই যে, যে-ব্যক্তির ফসল ফলানোর জমি আছে, যার আয় দশ হাজার দিরহাম বা তার কম-বেশি পরিমাণ হবে, কিন্তু তা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না, সেও যাকাত গ্রহণ করতে পারবে।[১]

শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের মত হচ্ছে, কারুর জমি থাকলে ও তার আয় তার প্রয়োজন পরিমাণের তুলনায় কম হলে সে 'ফকীর' বা 'মিসকীন' গণ্য হবে। তাকে যাকাত দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। তাকে তার জমি বিক্রয় করে দিতে বাধ্য করা যাবে না।

মালিকী মাযহাবের লোকদের মত হচ্ছে, যে-লোক নিসাব পরিমাণ বা তার বেশি সম্পদের মালিক, তার খাদেম এবং ঘর-বাড়ি আছে; কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হয় না, তাকেও যাকাত দেয়া জায়েয।[২]

তার অর্থ, যার কিছুই নেই, যে কোন কিছুরই মালিক নয় এমন নিঃস্ব ফকীরকেই যাকাত দেয়া লক্ষ্য নয়। বরং প্রয়োজন পূরণের কতকাংশ যার আছে, তার পূর্ণমাত্রায় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দেয়াও লক্ষ্য। কেননা সে তার যথেষ্ট মাত্রার সম্পদের অধিকারী নয়।

ফকীর ও মিসকীনকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবে ?

ফকীর ও মিসকীনকে কতটা পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবে, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এ মতপার্থক্যকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে দুটি ভাগে ভাগ করে বলতে পারি ঃ

প্রথম, তাদের দেয়া হবে প্রচলিত নিয়মে এতটা পরিমাণ, যদ্দারা তাদের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূর্ণ হয়—বিশেষ কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা ছাড়াই।

দ্বিতীয়, তাদের দেয়া যাবে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল, যা তাদের অনেকের নিকট সামান্য আবার অনেকের নিকট অধিক বিবেচিত হবে।

আমরা প্রথমটি নিয়ে প্রথমেই আলোচনা করব। কেননা ইসলাম—কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে যাকাতের লক্ষ্য পর্যায়ে তা-ই অতীব নিকটবর্তী মত। এই দিকটিতেও দুটো মত রয়েছে ঃ

১. একটি মত, আয়ুষ্কাল পর্যন্তকার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দেয়া,

২. আর একটি মত, এক বছরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দেয়া।

প্রথমত জীবনকালের প্রয়োজন পরিমাণ দান

এ মত অনুযায়ী ফকীরকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে, যদ্দারা তার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। তার অভাব-অনটন দূর হওয়ার কারণ ঘটে এবং স্থায়ীভাবে

---

১. المغنى مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٢٥

২. شرح الخرشي بحاشية العدوى ج ٢ ص ٢١٥

যথেষ্ট মাত্রায় তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। আর দ্বিতীয়বার যেন তার যাকাত গ্রহণের মুখাপেক্ষিতা না থাকে।

ইমাম নববী বলেছেন, ফকীর-মিসকীনকে দেয় পরিমাণ পর্যায়ে ইরাকী ও বিপুল সংখ্যক খোরাসানী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাদের এমন পরিমাণ দিতে হবে যা তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনাঢ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ যা তাদেরকে স্থায়ীভাবে সচ্ছলতা দান করবে। ইমাম শাফেয়ী নিজেও এই মত দিয়েছেন। কুবাইচা ইবনুল মাখারিক আল হিলালী বর্ণিত একটি হাদীস দলিল হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তিনজনের যে-কোন একজনের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েয। একজন, যার ওপর এমন বোঝা চেপেছে যে, তার জন্যে ভিক্ষা করা জায়েয হয়ে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেই পরিমাণ না পাচ্ছে। তা পেয়ে গেলে সে তা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয়, এক ব্যক্তি বড় দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, বিপদে পড়ে গেছে, তার সব ধন-মাল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েয যতক্ষণ পর্যন্ত সে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মাত্রার মালিক না হচ্ছে। আর তৃতীয় ব্যক্তি সে, যে অনশনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমন কি তার সমাজের জনগণের মধ্য থেকে অন্তত তিন ব্যক্তি বলতে শুরু করেছে যে, অমুক ব্যক্তি অনশনে দিন কাটাচ্ছে। এই ব্যক্তির পক্ষেও ভিক্ষা চাওয়া জায়েয, যতক্ষণ না সে তার যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ লাভ করছে। এই তিনজন ব্যত্তীত অপর লোকদের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া—হে কুবাইচা—একান্তই ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ ভিক্ষা করলে তা ঘুষ হবে। (মুসলিম)

অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভিক্ষা চাওয়ার অনুমতি নবী করীম (স) দিয়েছেন।

যদি সে উপার্জনের কোন পেশা ধরতে পারে, তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বা হাতিয়ার-যন্ত্রপাতি তাকে ক্রয় করে দিতে হবে, তার মূল্য বেশি হোক বা কম, যেন তৎলব্ধ মুনাফা এমন পরিমাণ হয় যা তার প্রয়োজন যথাসম্ভব পূরণ করে দেবে। তবে পেশা, দেশ, শহর-স্থান, সময়-কাল ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হতে পারে।

আমাদের সঙ্গীদের অনেকেই বলেছেন, যে-লোক সবজি বিক্রয় করতে পারে, তাকে পাঁচ বা দশ দিরহাম দেয়া যেতে পারে। যার পেশা হীরা-জহরত ও স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রয়, তাকে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে, যদি তার কম পরিমাণ দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ আয় করা না যায়। আর যে ব্যবসায়ী, রুটি প্রস্তুতকারী, আতর প্রস্তুতকারী বা মুদ্রা বিনিময়কারী, তাকে সেই অনুপাতে যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। যে দরজী কাজে পটু, কাঠ মিস্ত্রী, কসাই বা যৌগিক পদার্থ সৃষ্টিকারী হবে, কোন শিল্পকর্মে পারদর্শী হবে, তাকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে যদ্দারা সে তার কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি খরিদ করতে পারবে।

যদি সে কৃষিজীবী হয়, তাহলে তাকে জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে এমন পরিমাণ, যেখানে ফসল ফলিয়ে সে চিরজীবন স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে কাটাতে সক্ষম হবে।

যদি এই ধরনের পেশা গ্রহণে সক্ষম না হয়, কোন শিল্প দক্ষতারও অধিকারী না হয়, ব্যবসা ইত্যাদি কোন উপার্জনযোগ্য মাধ্যম অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে তার বসবাসের স্থানের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহের আয়ুষ্কালীন ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

শামসুদ্দীন রমলী নববী লিখিত 'আল-মিনহাজ্জ' গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ফকীর ও মিসকীন উপরিউক্ত ধরনের কোন উপার্জন পন্থা, কোন পেশা বা ব্যবসায় অবলম্বন করতে যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তার সারাজীবন কাটাবার জন্যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ তাকে দিতে হবে। কেননা উদ্দেশ্য হল লোকটিকে মুখাপেক্ষিতা থেকে বিমুক্ত করা। আর তা করা না হলে এই মুখাপেক্ষিতা থেকে তার মুক্তি সারাজীবনে সম্ভব হবে না। আর বয়স যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে এক এক বছরের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিতে হবে।

যে লোক উপার্জন করতে সক্ষম নয়, তাকে যাকাত দিতে বলার অর্থ এই নয় যে, তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে নগদ অর্থ তাকে দিতে হবে, বরং তার অর্থ তাকে এমন জিনিস ক্রয় করে দিতে হবে, যার আয় থেকে তার প্রয়োজন পূরণ হবে এবং ভবিষ্যতে সে যাকাত গ্রহণ থেকে বেঁচে যেতে পারবে। তাহলে সে সেই জিনিসের মালিক হতে পারবে ও উত্তরাধিকারসূত্রে তা বণ্টিতও হতে পারবে তার বংশধরদের মধ্যে।

জরকাশী যেমন আলোচনা করেছেন, সরকারী ব্যবস্থাধীনেই সেই জিনিস ক্রয় হওয়া উচিত অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বাধ্য করা দরকার সেই জিনিস ক্রয় করার জন্যে এবং তা কোন অবস্থায়ই হস্তান্তর না করার জন্যে।

এই মালিকানা যদি তার জীবনব্যাপী প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট না হয় তাহলে যাকাতের অর্থ দ্বারাই তা পূর্ণ করে দিতে হবে। তখন সে দরিদ্র ও মিসকীন কিনা তা শর্ত করার আবশ্যকতা নেই।

মা-অর্দী বলেছেন, যদি তার নব্বই থাকে, আর একশ' না হলে তার প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, তাহলে এই দশ তাকে দিয়ে দিতে হবে। আর কোন উপার্জন ব্যতিরেকেই এই নব্বই যদি তার জন্যে যথেষ্ট হয় তাহলে হয়ত তার সমগ্র জীবনব্যাপী প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে না।

এই সব কথাই বলা হচ্ছে সে লোক সম্পর্কে, যে ভাল উপার্জন করছে না। যে-লোক উপযুক্ত কোন পেশা গ্রহণ করতে পারবে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হবে, তাহলে তাকে তার পেশার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মূল্য দেয়া যেতে পারে তা যত বেশিই হোক না কেন। তাই যে-লোক ভাল ব্যবসা করতে পারে, তাকে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন দেয়া যেতে পারে, যেন ব্যবসায়ের মুনাফা দ্বারা সে তার প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়। আর এই মূলধন দেয়ার ব্যাপারটি ব্যক্তি ও স্থানের তারতম্যের দরুন কমবেশিও হতে পারে।

যদি সে বেশির ভাগ উত্তম পেশা গ্রহণে সক্ষম হয় আর সবটাই তার জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে তাকে মূল্য বা মূলধন যতটা কম দিলে চলে, তা-ই দিতে হবে। যদি তাকে কতকাংশ দিলে যথেষ্ট হয়, তাহলে তা-ই তাকে দেয়া যাবে। তার একাংশ যদি একজনের জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে সেই একজনকে দিতে হবে এবং তার বেশি বেশি জমি ক্রয় করে দেয়া যাবে, যার আয় তার অসম্পূর্ণ প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূর্ণ করবে।[১]

ইমাম শাফেয়ী তাঁর الام গ্রন্থে এই কথাগুলো লিখেছেন। তাই তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী-সাথীও এই মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর ওপর ভিত্তি করে তার অনেক শাখা-প্রশাখা বের করেছেন। আর এ পর্যায়ে তিনটি বিস্তারিত সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা করেছেন, যা আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

ইমাম আহমাদের মতও ইমাম শাফেয়ীর প্রায় অনুরূপ। তিনি দরিদ্র ফকীর ব্যক্তির পক্ষে তার চিরজীবনের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর তা নেয়া যেতে পারে ব্যবসায় মূলধন বা কোন শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে। হাম্বলী মতের কোন কোন ফিকাহবিদও এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[২]

ইমাম খাত্তাবী উপরে উদ্ধৃত কুবাইচা বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সাদকা বা যাকাত দানের চূড়ান্ত প্রান্তিক পরিমাণ হচ্ছে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট পরিমাণ, যদ্দারা জীবনের প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূরণ হবে, জীবিকা সমস্যার সমাধান হবে এবং দারিদ্র্য মোচন হবে। আর তার হিসেবটা হবে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার ও জীবন জীবিকা মানের প্রেক্ষিতে। তাতে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার তারতম্যের বিচারেরই তা নির্ধারণ করতে হবে।[৩]

যখন দিবেই, তখন সচ্ছল করে দাও

উপরিউক্ত মতটি হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে বর্ণিত মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত উমর ফারূকের রাজনীতি এই খাতেই প্রবাহিত দেখতে পাচ্ছি এবং এ নীতি অতীব যুক্তিসঙ্গত, নিখুঁত ও সুষ্ঠু সন্দেহ নেই। হযরত উমর ফারূকেরই অপর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ

اِذَا اَعْطَيْتُمْ فَاغْنُوا-

যখন দিবেই, তখন ধনী বানিয়ে দাও—সচ্ছল বানিয়ে দাও।[৪]

হযরত উমর (রা) যাকাত সম্পদ দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে বাস্তবিকই ধনী ও সচ্ছল বানিয়ে দিতেন। সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে কিংবা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে তা ক্ষুধা বা উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না।

---

১. نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ٦ ص ١٥٩ ২. الانصاف ج ٣ ص ٢٢٨
৩. معالم السنن ج ٢ ص ٦٦٥ ৪. الاموال ص ٥٦٥

তখনকার সময়ের ঘটনা, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে বসলো। তিনি তাকে তিনটি উট দিয়ে দিলেন। এটা ছিল তাকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচানোর জন্যে। তিনি যাকাত বণ্টনকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বারবার তা বণ্টন কর—তাতে এক-একজন একশ'টি করে উট পেয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।[১]

দরিদ্রদের ব্যাপারে তার নীতি ঘোষণা করলেন উদাত্ত কণ্ঠে ঃ

لَأُكَرِّرَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ-

আমি তাদের বারবার যাকাত দেব, তাদের একজন একশ'টি করে উট পেয়ে গেলেও।

তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ আতা বলেছেন, 'কোন মুসলিম ঘরের লোকদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করলে পূর্ণমাত্রায় দাও। তা-ই আমার নিকট পসন্দ।'

এই মত অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত-সম্পদ দ্বারা বড় বড় কল-কারখানা, খামার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে, যার মালিক হবে কেবলমাত্র গরীব লোকেরা—তার সবটার অথবা তার কিছু অংশের। যেন তার আয় দ্বারা তাদের যথেষ্ট মানে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারা এই সবের মালিক হলেও তা বিক্রয় করার বা মালিকানা হস্তান্তর করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান 'প্রায় ওয়াকফ' সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় মত ঃ এক বছরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে

এখানে দ্বিতীয় একটি মত রয়েছে। মালিকী, হাম্বলী ও অন্যান্য মতের সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণ এ মতটি উপস্থাপিত করেছেন। এ মতের বক্তব্য হল, ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত সম্পদ থেকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে, যা তার ও তার ওপর নির্ভরশীলদের এক বছরের জন্যে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে। এ মতের লোকেরা সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট—এমন পরিমাণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। অনুরূপভাবে এক বছরের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণের কম দেয়ারও যৌক্তিকতা তাঁরা স্বীকার করেন নি।

তাঁরা এক বছর সময়ের জন্যে দেয়ার পক্ষপাতী এজন্যে যে, সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমাজ তথা রাষ্ট্রের নিকট থেকে এই মেয়াদকালে জৈবিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। রাসূলে করীম (স)-এর অনুসৃত নীতিতেও তার সমর্থন ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। একথা সহীহ্ সূত্রে জানা গেছে যে, তিনি তার পরিবারবর্গের জন্যে এক বছর কালের খোরাক মজুত করে রাখতেন।[২]

---

১. الاموال ص ٥٦٥

২. বুখারী, মুসলিম

ওপরন্তু যাকাতের মাল তো সাধারণত বার্ষিক হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। কাজেই তা থেকে কাউকে সারা জীবনের রসদ যোগাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রতি বছরই যাকাত সম্পদ সংগৃহীত হবে এবং তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বার্ষিক হিসেবে বন্টন করা হবে, এটাই যুক্তিযুক্ত কথা।[১]

এ মতের লোকেরা একথাও মনে করেন যে, এক বছরের জন্যে কতটা যথেষ্ট, তার কোন পরিমাণ—সীমা নির্দিষ্ট নয়। বরং যথাসম্ভব পাওয়ার যোগ্য লোকদের এক বৎসরের সচ্ছলতা বিদানকারী মান অনুযায়ীই বন্টন করতে চেষ্টা করা উচিত।

যদি কোন ফকীর বা মিসকীনের এক বৎসরের প্রয়োজন যথেষ্টভাবে পূরণ হতে নিসাব পরিমাণেরও বেশির প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে তা-ই দিতে হবে। তাতে যদি সে ধনী হয়ে যায়, তবু কোন দোষ নেই। কেননা দেয়ার সময় তো সে ফকীর বা মিসকীনই ছিল এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য ছিল।

বিয়ে করিয়ে দেয়াও পূর্ণমাত্রার যথেষ্ট পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত

'যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হবে'—এই নীতির আলোকে আমি আরও একটি কথা এখানে বলতে চাই। তা হচ্ছে, ফকীর বা মিসকীনের জন্যে 'যথেষ্ট পরিমাণে'র পূর্ণ মাত্রার বাস্তবায়ন ও সম্পূর্ণতা দান। ইসলামী ফিকাহ্ তাই মনে করে। এই প্রেক্ষিতে ইসলামের আলিমগণের এ কথা বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় যে, শুধু পান-আহার-পোশাকই কেবল মানুষের মৌল প্রয়োজন নয়। মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন ও তাগীদ আরও রয়েছে। যা না হলে মানুষের জীবন পূর্ণত্ব পেতে পারে না। সে প্রয়োজনের চরিতার্থতা একান্তই আবশ্যক। আর তা হচ্ছে প্রজাতি সংরক্ষণ ও যৌন প্রবণতার চরিতার্থতা বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী আবাদকরণ ও মানব বংশ সংরক্ষণে আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়নে এ বিষয়টিকে চাবুকের মত বানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ এর দ্বারাই চালিত হয় সেই লক্ষ্যের পানে। ইসলাম এই স্বভাবজাত ভাবধারার প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করে নি; বরং এই জিনিসকে সুসংগঠিত করেছে এবং আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে তার সীমা ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছে।

অপরদিকে ইসলাম অবিবাহিত জীবন যাপন, নারীবিহীন অবস্থায় জীবন কাটানো বা পুরুষত্ব হনন-হরণের কাজকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মানুষের যৌন ও প্রজনন শক্তি দমনের কোন চেষ্টা-ভাবধারাকেই আদৌ সমর্থন দেয়নি এবং প্রত্যেক দৈহিক সামর্থ্যসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছে। আদেশ হচ্ছে ঃ

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ - فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ -

'তোমাদের যে-কেউ সামর্থ্যবান হবে, সে-ই যেন বিয়ে করে। কেননা এই বিয়েই

১. মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, যাকাত বার্ষিক হিসেবে বন্টন করা না হলে এক সঙ্গে এব বছরের প্রয়োজনের অধিকও দেয়া যেতে পারে।

তার দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং তার যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ করবে অতীব উত্তমভাবে।[১]

অতএব সমাজের বিবাহেচ্ছুক (বিবাহক্ষম) নর-নারী মহরানা ইত্যাদি দিতে আর্থিকভাবে অক্ষম হলে তাদের সাহায্য করা যে একান্তই কাম্য, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

এই কারণে বিশেষজ্ঞদের এ কথা বিস্ময়োদ্দীপক নয় যে, ফকীর মিসকীন ব্যক্তি বিবাহিত না হলেও বিয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া ও তাকে যথেষ্ট পরিমাণে যাকাত দেয়ার অন্তর্ভুক্ত কাজ।[২]

শুধু তা-ই নয়, তারা এতদূর বলেছেন যে, যদি কারুর একজন স্ত্রী যথেষ্ট না হয়, তাহলে দুইজন স্ত্রী যোগাড় করে দিতে হবে। কেননা 'যথেষ্ট পরিমাণে' দেয়ার মধ্যে এটিও গণ্য।[৩]

খলীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আজীজ লোকদের মধ্যে ঘোষণা করতেন ঃ 'কোথায় মিসকীনরা, কোথায় ঋণগ্রস্ত লোকেরা, কোথায় বিবাহেচ্ছু লোকগণ .... ।' তার এই ডাকের উদ্দেশ্য ছিল এ পর্যায়ের সকল লোকের প্রয়োজন বায়তুলমাল থেকে পূরণ করার ব্যবস্থা করা।

এ পর্যায়ের আসল ভিত্তি হচ্ছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি আনসার বংশের একটি মেয়ে বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"কত মহরানা নির্দিষ্ট করলে ?" বললে "চার আউকিয়া (৪×৪০=১৬০ দিরহাম)।" নবী করীম (স) বললেন, "মাত্র চার আউকিয়া ? মনে হচ্ছে, তোমরা এই পাহাড়টি ফেলানোর জন্যে রৌপ্য খোদাই করছ। এখন তো আমাদের নিকট কিছু নেই। কিন্তু খুব শীগগীরই আমরা তোমাকে এমন প্রতিনিধিত্বে পাঠাব, যাতে তুমি অনেক কিছুই পেয়ে যাবে।"[৪]

হাদীসটি থেকে জানা গেল, এই অবস্থায় নবী করীম (স)-এর বিরাট দানের কথা লোকদের ভালভাবে জানা ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ এখন তো আমার নিকট দেবার মত কিছু নেই, তবে তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা হবে, যা থেকে তুমি প্রচুর পেয়ে যাবে।

ইলমের বই-পত্র দানও 'যথেষ্ট দানে'র অন্তর্ভুক্ত

ইসলাম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ দানকারী দ্বীন। তা মানুষকে ইলম শেখার আহ্বান জানিয়েছে, বিদ্বান লোকদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচু করে তুলেছে, বরঞ্চ,

---

১. বুখারী কিতাবুস্ সাওম

২. شرح كتاب الفيل وشفاء العليل.৩ حاشيه الروض المريع ج ١ ص ٤٠٠

৪. نيل الاوطار ج ٦ ص ٣١٦

ইলমকে ঈমানের কুঞ্চিকা এবং কর্মের প্রেরণাদায়ক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্ধ অনুসরণকারীর ঈমান ও অজ্ঞ-মূর্খের ইবাদতের কোন মূল্য ইসলামে গণ্য করা হয়নি। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তুলেছে ঃ

'যারা জানে,আর যারা জানে না, তারা উভয় কি সমান হতে পারে' ?[১]

বিজ্ঞ ও মূর্খ এবং ইলম ও মূর্খতার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

'অন্ধ ও দৃষ্টিমান—পুঞ্জীভূত অন্ধকার ও আলো কখনই অভিন্ন হতে পারে না।'[২]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

'ইলম সন্ধান—অর্জন মুসলিম মাত্রের জন্যেই ফরয়।'[৩]

এখানে যে 'ইলম'-এর কথা বলা হয়েছে, তা প্রচলিত ধরনের দ্বীনি ইলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল প্রকার কল্যাণকর ইল্‌মই এর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সমাজ তার এই জীবনে যত কিছু জ্ঞানের মুখাপেক্ষী তা সবই শিখতে হবে। তাতে স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সমাজ-সভ্যতা পরিচালন ও সংগঠন সংক্রান্ত সব ইল্‌ম শামিল রয়েছে। শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্যে সামরিক বিদ্যাও এর বাইরে নয়। এ সবই 'ফরযে কিফায়া'। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই মত দিয়েছেন।

এ কারণে ইসলামের ফিকহ্‌বিদগণ যাকাত বন্টনের বিধানে ঘোষণা করেছেন, ইল্‌ম অর্জনে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে তার অংশ দিতে হবে—দেয়া যাবে। অথচ ইবাদতের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগকারীর জন্যে তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তার কারণ, ইবাদতের জন্যে উপার্জন বিমুখ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু ইল্‌ম ও তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন একনিষ্ঠ ও একান্ত হয়ে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। ওপরন্তু ইবাদতে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজ নিজের জন্যে আর ইলম শিক্ষার্থীর কাজ তার নিজের জন্যে যেমন, তেমনি সমগ্র মানবতার কল্যাণেও।[৪]

ইসলাম এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। ফিকহ্‌বিদগণ এও বলেছেন যে, ফকীর-মিসকীন ব্যক্তির ইলম অর্জনে প্রয়োজনীয় কিতাবাদি খরিদ করার উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহণ করতে পারে, যদি তা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৫]

হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের মতে যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে নির্দ্বিধায় স্থানান্তরিত করা জায়েয, যদিও এটা নিয়মের পরিপন্থী—যদি তা ইলম শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হয়।[৬]

---

১. سورة الزمر -٩ ২. ٢٠ - سوره فاطر ١٩

৩. (رض) ابن عبد البرعن انس ৪. ١٩٠ المجموع ج ٦ ص

৫. الانضاف فى الفقه الحنبلى ج ٣ ৬. الدر المختار وحاشيه ج ٢ ص ٩٤.

কোন্ মতটি গ্রহণ করা উত্তম ?

ইসলামী ফিকাহ্‌র উপরিউক্ত দুটি মতের বিস্তারিত আলোচনার পর প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ মতটি অনুসরণ করা উত্তম ?.... একটি মত অনুযায়ী ফকীর-মিসকীনকে একবারে সারা জীবনের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর অপর মতটি হচ্ছে, মাত্র একটি পূর্ণ বছরের জন্যে সেই ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে করে দিতে হবে। এ উভয় মতের স্বপক্ষে কারণ এবং দলীলও ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে। .... বিশেষ করে, ইসলামী রাষ্ট্র যখন যাকাত বণ্টনের দায়িত্ব পালন করবে, তখন এ দুটি মতের কোন্‌টি অনুসরণ করবে সে প্রশ্নটি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ পর্যায়ে এই গ্রন্থকারের মত হচ্ছে, প্রতিটি মতই যুক্তিযুক্ত, অতএব এক এক অবস্থায় এক একটি মত অনুযায়ী কাজ করা যেতে পেরে।

তার কারণ হচ্ছে, ফকীর ও মিসকীন দুই প্রকারের ঃ এক প্রকারের ফকীর-মিসকীন শ্রম ও উপার্জন করতে পারে, যা তার প্রয়োজন পূরণেও যথেষ্ট হতে পারে—যেমন শিল্পকর্মে অভিজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী। তার হয়ত শিল্পকর্মের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা মূলধন অথবা জমি কিংবা বীজ বা কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব পড়েছে। এরূপ অবস্থায় তাথে যাকাত ফাণ্ড থেকে এমন পরিমাণ সাহায্য দেয়া উচিত, যা পেয়ে সে তার জীবনব্যাপী প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণের ব্যবস্থা করে নিতে পারে, দ্বিতীয়বার সে কখনও যাকাতের মুখাপেক্ষী হবে না। কেননা তার পেশার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সে পেয়ে গেছে ও তার মালিক হয়ে বসেছে। অতঃপর সে উৎপাদন করবে, মুনাফা করবে, ফসল ফলাবে। তাই সে আর কখনও যাকাতের মুখাপেক্ষী থাকবে না।

আর দ্বিতীয় প্রকারের ফকীর-মিসকীন উপার্জনে অক্ষম। যেমন পঙ্গু অন্ধ, থুরথুরে বুড়ো এবং বিধবা, ইয়াতীম, বালক শিশু। এ ধরনের ফকীরকে তো এক বছর কালের প্রয়োজন অনুপাতে যাকাতের অংশ দেয়া উচিত। তাদের দিতে হবে বার্ষিক হিসেবে নিয়মিতভাবে। এক বছরের জন্যে সে নিয়ে যাবে এবং বছরান্তর পুনরায় পাওয়ার জন্যে আসবে। বরং সারা বছরেরটা এক সাথে দিলে সে অপব্যয় করে বসবে—অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করবে—এই ভয় থাকলে তাকে মাসিক হিসেবে দেয়া উচিত। এ কালে এই নীতিই অনুসরণীয়। কর্মচারীদের যেমন মাসিক বেতন হিসেবে দেয়া হয়, এই আর্থিক সাহায্যও মাসিক হিসেবে দিতে হবে।

এই মতের সমর্থন আমি হাম্বলী মতে লিখিত কোন কোন কিতাবেও পেয়েছি।

'গায়াতুল মুন্‌তাহা' নামক গ্রন্থ ও তার শরাহ্ কিতাবে এ পর্যায়ে ইমাম আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বলের মতের উল্লেখ রয়েছে। এক ব্যক্তির চাষের জমি আছে, বাগান আছে ; তাতে দশ হাজার বা তার অধিক উপার্জন হয় বটে; কিন্তু তা তার জন্যে 'যথষ্ট' হয় না। ইমাম আহ্‌মাদের মতে এ ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করে তার প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ করতে পারবে। এরূপ অবস্থায় পেশাদারকে তার পেশার যন্ত্রপাতি দেয়া যাবে—তা যত বেশিই হোক, ব্যবসায়ীকে যথেষ্ট মাত্রায় মূলধন দেয়া যাবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য

ফকীর-মিসকীনকে তাদের ও তাদের বংশাবলীর প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া যাবে। প্রতি বছর বার্ষিক হিসেবে তারা যাকাত পাবে। আমার অবলম্বিত মতের অতীব নিকটবর্তী এ মত, যদিও সারাজীবনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ নেই। কিন্তু মূলধন ও যন্ত্রপাতির মূল্য দেয়ার তাৎপর্য তো তাই।

ফকীরকে দেয় পরিমাণ পর্যায়ে অন্যান্য মত

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, ফিকাহ্‌বিদগণ ফকীর ও মিসকীনকে কি পরিমাণ দেয়া হবে—কম ও বেশি এর মধ্যবর্তী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওয়াজিব বলে মনে করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও তার সঙ্গী-সাথিগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, একজনকে দেয় এই পরিমাণটা দু'শ' দিরহাম—নগদ সম্পদের নিসাব—এর অধিক হওয়া উচিত নয়। কারুর স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকলে তাদের প্রত্যেকের জন্যেই এই নিসাব পরিমাণ গ্রহণ করা জায়েয হবে।

অপর কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এর চাইতে কম পরিমাণের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা পঞ্চাশ দিরহামের অধিক দেয়া জায়েয মনে করেন না। আবার একদিন ও একরাতের খাওয়ার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেয়া পসন্দ করেন নি অনেকে।

তবে ইবনে হাজম প্রমুখ জাহিরী মতের ফিকাহ্‌বিদ এসব মত প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন ঃ যাকাত থেকে কমও দেয়া যেতে পারে, বেশিও দেয়া যেতে পারে, তার কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। কেননা এই ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ কোন সীমা বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়নি।[১]

ইমাম গাজালীর মত

ইমাম গাজালী তাঁর প্রখ্যাত ইহ্য়াউল-উলূম গ্রন্থে ফকীর ও মিসকীনকে 'এক বছরের জন্যে যথেষ্ট' পরিমাণ যাকাত দেয়ার মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই পরিমাণটা তাদের প্রয়োজন পূরণের নিকটবর্তী বলে মনে করা যায়। রাসূলে করীম (স)-এর তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে এক বছরের খোরপোষ সংগ্রহ করে রাখার কাজটি এ পর্যায়ে সুন্নাতরূপে গণ্য।

তিনি আরও লিখেছেন, 'যাকাত ও সাদকা' থেকে গ্রহণীয় পরিমাণ পর্যায়ে আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে।

দেয় পরিমাণ কম করার ক্ষেত্রে একদিন এক রাতের খোরাক পরিমাণ হচ্ছে সর্বনিম্ন মান। এ পরিমাণের দলীল হিসেবে ইবনুল-হানজালা বর্ণিত হাদীসটির উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ধনাঢ্য থাকা অবস্থায় ভিক্ষা চাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। 'ধনাঢ্যতা' বলতে কি বোঝায়, জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ 'তার দুপুর ও রাত্রিকালীন খাবার থাকা।[২]

---

১. المحلى ج ٦ ص ١٦ ২. আবূ দাউদ ও ইবনে হাব্বান

অন্যরা বলেছেন, ধনাঢ্যতার পরিমাণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে। আর ধনাঢ্যতার সীমা হচ্ছে যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ফরয করেছেন কেবলমাত্র ধনী লোকদের ওপর। তাই আলিমগণ বলেছেন, একজন ফকীর বা মিসকীন তার নিজের ও তার পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করতে পারে।

অপরাপর লোকদের বক্তব্য হচ্ছে, পঞ্চাশ দিরহাম কিংবা এই মূল্য পরিমাণ স্বর্ণের মালিকানা ধনাঢ্যতার সীমা। ইবনে মাস্‌উদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন, যার যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা চাইবে, কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হবে। পরে জিজ্ঞাসা করা হল, তার 'যথেষ্ট পরিমাণ' বলতে কি বোঝায় ? বললেন, 'পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার মূল্যের স্বর্ণ।' এ বর্ণনাটির বর্ণনাকারী খুব শক্তিশালী নয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।[১]

কিছু লোক বলেছেন, চল্লিশ দিরহাম। আতা ইবনে ইয়ামার এ কথাটির বর্ণনা করেছেন।

অনেকে এই পরিমাণটিকে অধিক প্রশস্ত করে বলেছেন, যাকাত থেকে এমন পরিমাণ গ্রহণ করবে যদ্দারা সে জমি ক্রয় করতে পারবে, যেন সে তার আয় দ্বারা সারা জীবন ধনী হয়ে থাকতে পারে অথবা এমন পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। কেননা ধনাঢ্যতা বলতে তো তা-ই বোঝায়। এ পর্যায়ে হযরত উমরের কথা—'যখন দেবে তো ধনী বানিয়ে-ই দাও' পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

এমন কি, কেউ কেউ এতদূর উদারতা পোষণ করেন যে, কেউ যদি গরীব হয়ে যায়, তাহলে সে এতটা গ্রহণ করতে পারবে যদ্দারা সে তার পূর্বানুরূপ আর্থিক অবস্থা পুনরায় লাভ করতে সক্ষম হবে। তার পরিমাণ দশ হাজার হলেও ক্ষতি নেই। তবে স্বাভাবিকতার সীমা লংঘিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত আবূ তাল্‌হা (রা) যখন তাঁর বাগানের কাজে এতই মশগুল হয়ে পড়লেন যে, নামায পর্যন্ত চলে গেল, তখন তিনি বললেন : 'আমি এই বাগান সাদ্‌কা করে দিলাম।' নবী করীম (স) তাকে উপদেশ দিলেন : 'তুমি বাগানটি তোমার নিকটাত্মীয় কোন লোককে দিয়ে দাও। তোমার জন্যে তাই ভাল হবে।' তাই তিনি তা দিয়ে দিলেন হাস্‌সান ও আবূ কাতাদাহকে। পরে দেখা গেল, বাগানটিতে এতই খেজুর ধরেছে যা দুজন লোকের জন্যে অনেকটা বেশি এবং তা তাদের ধনী বানিয়ে দিল। হযরত উমর (রা) একজন বেদুঈনকে একটি উট দান করলেন, তার বাচ্চাটিও তার সঙ্গে ছিল।

এ পর্যায়ে এরূপ বর্ণনাই উদ্ধৃত হয়েছে। আর কম করে একদিনের খোরাক দেয়া বা 'আউকিয়া' দেয়ার কথাও বলা হয়েছে, ভিক্ষা করা ও দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোকে ঘৃণা করা হয়েছে বলে। কেননা এটা বাস্তবিকই অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। এ পর্যায়ে আরেকটি প্রস্তাবনা রয়েছে। তা হচ্ছে, একটি জমি ক্রয় করে দেয়া। সম্ভবত তার দ্বারা সে ধনী ও

---

১. احياء علوم الدين ج ١ ص ٢٠١

সচ্ছল হয়ে যেতে পারবে। এটাও অবশ্য অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি মনে হয়। অধিক ভারসাম্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এক বছরের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দিয়ে দেয়া, এর অধিক হলে বিপদের আশংকা। আর কম হলে সংকীর্ণতা আরোপিত হয়।[১]

ইমাম গাজ্জালী যাকাত গ্রহণের নিয়ম-কানুন বর্ণনা প্রসঙ্গে এসব কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত দারিদ্র্য ও মিসকীনীর নামে যা কিছু গ্রহণ করা হয় সেই পর্যায়ে বিবেচনা করা হয় যা ওয়াজিব মনে হয়, তারও তিনি উল্লেখ করেছেন।

'ইহইয়াউ উলুম' নামের এই কিতাবখানি তাসাউফপন্থী ও পরহেযগার লোকদের জন্যে লিখিত। তাতে যাকাত গ্রহণে বিশেষ সংকীর্ণতার পন্থাই নির্ধারিত হবে, এটাই ধারণা করা যায়। কিন্তু আমরা দেখছি, আবূ হামেদ আল-গাজ্জালী এ পর্যায়ে ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই উপস্থাপিত করেছেন; বরং বলা যায়, অধিক প্রশস্ততার কথাই বলেছেন। বরং তিনি মনে করেন, একখণ্ড জমি ক্রয় করে দেয়া—অধিক উত্তম। সংকীর্ণকারীদের তুলনায় এ মতের বিশ্বাসীদের তিনি অধিক নিকটবর্তী বলে মনে করেছেন। আর তা সবই হযরত উমর ও আবূ তাল্হা থেকে বর্ণিত দলীলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। নবী করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীরবেষ্টিত বাগান নিয়ে যা করা হয়েছে, তাও সামনে রয়েছে।

দানে প্রশস্ততার মতকে অগ্রাধিকার দান

ইসলামী অর্থব্যবস্থা পর্যায়ে অকাট্য দলীল পারদর্শী ফিকাহ্‌বিদ ইমাম আবূ উবাইদ মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি দান করার ব্যাপারে কোনরূপ রক্ষণশীলতা ও সীমা নির্ধারণ ব্যতিরেকেই প্রশস্ততার মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি আবূ তাল্হা আবূ কাতাদাহ ও হাস্সানকে প্রাচীর বেষ্টিত বাগানটি দিয়ে দেয়ার কথারও উল্লেখ করেছেন। পরে বলেছেন, প্রাচীরবেষ্টিত বাগানটি তো খেজুর, গাছপালা ও কৃষি ফসল সমন্বিত ছিল। তাহলে তার কম-সে-কম মূল্য কত হওয়া উচিত?

আবূ তাল্হা দানের খ্যাতি লুকাতে পারবেন না বলে ভয় পেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি তা মাত্র দু'জনকে দিয়েছিলেন। তৃতীয় কাউকে তাতে শরীক করেন নি।

আবূ উবাইদ বলেছেন, এটাই হচ্ছে প্রকৃত দান বা সাদ্‌কা। যদিও তা নফল। তাহলে ফরয দানের পন্থা এর চাইতে ভিন্নতর কিছু হতে পারে না। কেননা যে ফরয যাকাত ধনীদের ধনে কেবল ফকীর-মিসকীনদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার বেশি পরিমাণ গ্রহণ করা যদি হারাম গণ্য হয়, তাহলে নফল দানে—যা ওয়াজিব বা ফরয নয়—অধিক পরিমাণ গ্রহণ অধিক সংকীর্ণ ও হারাম হবে নিশ্চিতভাবেই। আর তা যদি হালাল হয় আর নফল দানের দানকারী যদি হয় অনুগ্রহকারী কল্যাণকারী, তাহলে ফরয দানে সে অবশ্যই অধিক উদার ও বেশি বেশি দানকারী হবে।[২]

---

১. এই হাদীসটি সম্পর্কে ইরাকী বলেছেন, সুনান গ্রন্থাবলীতে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। তিরমিযী এটিকে 'হাসান' বলেছেন। আর নাসায়ীও বলেছেন দুর্বল।

২. الاموال الابى عبيد ص ٥٦١

পরে আবূ উবাইদ হযরত উমর ও আতা প্রমুখ থেকে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তারপর লিখেছেন, এসব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, যে অভাবগ্রস্তকেই যাকাত থেকে কিছু দেয়া হবে, তার জন্যে মুসলিমদের প্রতি এমন কোন পরিমাণ বা সীমা নির্দিষ্ট নেই যে, তা লংঘন করা অন্যায় হয়ে যাবে—অবশ্য দানকারী যদি কৃপণ না হয়; বরং ভালবাসা ও বদান্যতা সম্পন্ন হয়, তবেই এ কাজটি হবে। যেমন কেউ কোন নেক্‌কার মুসলিম পরিবারবর্গকে দারিদ্র্য ও অভাব নিপীড়িত দেখতে পেল, সে নিজে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী। ঐ লোকদের কোন ঘর-বাড়ি নেই যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে এবং নিজেদের একাকীত্ব ও গোপনতা রক্ষা করতে পারে। তখন সেই ধনী লোকটি তাদের জন্যে তার যাকাতের মাল থেকে একটি বাড়ি ক্রয় করে দিল। সেখানে তারা বসবাস করবে—শীতের আক্রমণ ও গ্রীষ্মের তাপ থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে অথবা তাদের দেখা গেল উলঙ্গ—পরিধানে কাপড় নেই। তখন তাদের জন্যে পরিধেয় কাপড় কিনে দিল, যা দিয়ে তারা তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে নামায পড়বে এবং শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট থেকেও রক্ষা পাবে অথবা দেখল, একজন ক্রীতদাস খারাপ মনিবের হাতে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। তাকে সেই মনিবের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে খরিদ করে মুক্ত করে দিল। কিংবা কোন দূরদেশের পথিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বাড়ি-ঘরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন। তখন টাকা খরচ করে তাকে ও তার সঙ্গী তার পরিবারবর্গকে তার দেশে পাঠিয়ে দেয়া হল। এ সব এবং এ পর্যায়ের কোন কাজই বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হতে পারে না। আর যে এ কাজ করবে, সে তার নফল দান দিয়েও এ কাজ করতে রাজী হল না। তখন সে তার মালের যাকাত দিয়ে এ ধরনের বড় বড় কাজ করল। তাহলে তাতে কি তা ফরয যাকাত আদায় হয়ে যাবে ?.... হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাকাত আদায় হবে। আর সেই সাথে সে বড় দয়াবান বলেও স্বীকৃত হবে।

উপযুক্ত মানের জীবিকা ব্যবস্থা

এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাকাত দেয়ার লক্ষ্য ফকীর-মিসকীনকে একটি বা দুটি দিরহাম দিয়ে দেয়া নয়। আসলে লক্ষ্য হচ্ছে উপযুক্ত মানের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়া। লক্ষ্য রাখতে হবে, সে একজন মানুষ। আল্লাহ্ তাকে সম্মানার্হ ও মর্যাদাবান বানিয়েছেন, পৃথিবীর বুকে তাকে আল্লাহ্ তাঁর খলীফা বানিয়েছেন। ওপরন্তু অনুগ্রহ ও সুবিচারের প্রবর্তক দ্বীন ইসলামে সে বিশ্বাসী—একজন মুসলিম। সে সেই উত্তম উম্মতের একজন, যাকে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে তৈরি করা হয়েছে।

এই মান অনুপাত কম-সে-কম যে ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, তা হচ্ছে, ফকীর-মিসকীন ব্যক্তি ও তার পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য, সুপানীয়, শীত-গ্রীষ্মের পোশাক এবং উপযুক্ত সুবিধাজনক একটি বাসস্থান। ইবনে হাজম তার আল-মুহাল্লা গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমরাও অষ্টম অধ্যায়ে তার

উল্লেখ করব। ইমাম নববী তাঁর المجموع ও الروضه গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। এভাবে বহু সংখ্যক আলিমই এ বিষয়টির উপস্থাপন করেছেন।

ইমাম নববী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে যাকাত ফাণ্ড থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দেয়ার কথা বলে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আমাদের সাথীরা বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের—এবং সেই সাথে আরও যা একান্ত দরকার তার ব্যবস্থা তার উপযুক্ত করে করা আবশ্যক। অবশ্য কোনরূপ অপচয় বা বেহুদা খরচ না হয়, সেই সঙ্গে কার্পণ্যও দেখানো না হয়, সেই দিকে নজর রাখতে হবে। এই ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যেমন হতে হবে, তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্যেও।[১]

অবশ্য একালের লোকদের প্রত্যেকের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াও একান্তই প্রয়োজন। যে শিক্ষায় দ্বীনের হুকুম-আহকাম শেখা হবে, সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে। মূর্খতার অন্ধকার থেকে বাঁচা, ভদ্র শালীন জীবন যাপনের পদ্ধতি জানা, বৈষয়িক দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলার জন্যে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মুসলিম ব্যক্তির মৌল প্রয়োজন পর্যায়ের আলোচনা আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শিক্ষার প্রয়োজন মূর্খতা দূর করার জন্যে। কেননা মূর্খতা জ্ঞান ও সংস্কৃতি উভয় দিক দিয়েই মৃত্যুর সমান। মূর্খ ব্যক্তি তাৎপর্যগতভাবে মৃত।

এ যুগে প্রত্যেকের জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়াও আবশ্যক। কোন ব্যক্তির বা তার পরিবারবর্গের কারুর রোগ হলে তাকে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করা দরকার। রোগকে উন্মুক্ত করে ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যহীন করে রাখার সুযোগ দেয়া যায় না। অন্যথায় প্রাণী হত্যার অপরাধ হবে, ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করা হবে ধ্বংসের মুখে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

تَدَاوُوْا يَاعِبَادَ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً-

হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। কেননা আল্লাহ্ এমন কোন রোগেরই সৃষ্টি করেন নি, যার জন্যে কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নি।[২]

আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ-

তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।[৩]

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٩١

২. حاكم، مسند الحمد، ابن احبان

৩. البقره – ١٩٥

وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا-

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনেক দয়াবান। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ -

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করতে পারে না, তাকে অসহায় করে ছেড়েও দিতে পারে না।

কাজেই কোন মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ-সমষ্টি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে অসহায় করে ছেড়ে দেয়, রোগ তাকে ধ্বংস করতে থাকে এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে তাকে অসহায় করে ফেলে দেয়া হবে, তাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করা হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আসলে লক্ষণীয় বিষয় হল, ব্যক্তির জন্যে সাধারণ জীবনমান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় করে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা তা সময় ও অবস্থার পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে অনিবার্যভাবে। প্রত্যেক জাতির আর্থিক অবস্থা ও আয়ের তারম্যের কারণেও এ পার্থক্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

অনেক জিনিস এমনও আছে যা এক যুগে বা এক অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ বিবেচিত হয়। এক সময় একটা জিনিস অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু অপর এক যুগে ও অবস্থায় তা সেরূপ বিবেচিত হয় না।

স্থায়ী ও সুংসবদ্ধ সাহায্য ব্যবস্থা

যে ফকীর বা মিসকীন কোন ভাল পেশা অবলম্বনে সমর্থ নয়, এমন কোন শ্রমও করতে পারে না যা তার পরিবারবর্গের জন্যে উপযুক্ত ও যথেষ্ট পরিমাণে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করতে পারবে, যাকাত বন্টনের ভিত্তি হিসেবে তার জন্যে একটি পূর্ণ বছর ব্যাপী যথেষ্ট পরিমাণে দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই হচ্ছে যাকাতের লক্ষ্য। এ ব্যবস্থা এক মাস বা দুই মাসের জন্যে হলে চলবে না। বরং এ ধরনের যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের জন্যে একটা স্থায়ী ও সুসংগঠিত ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলেই দারিদ্র্য সচ্ছলতায় রূপান্তরিত হতে পারে এক ব্যক্তি বা একটি পরিবারের জীবনে। তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা দূর হয়ে শক্তি ও সামর্থ্য এবং মর্যাদা লাভ সম্ভবপর হতে পারে। বেকারত্ব দূর হয়ে কর্মব্যস্ততা ও সুষ্ঠু উপার্জনের তৎপরতা শুরু হতে পারে। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ উবাইদ যে বর্ণনার অবতারণা করেছেন তা এখানে বিবেচনা করতে পারি।

একদা হযরত উমর (রা) মধ্যাহ্নকালে একটি গাছের ছায়ার শায়িত ছিলেন। এ সময় একজন বেদুঈন মহিলা এসে উপস্থিত হল। লোকেরা অবশ্য তা লক্ষ্য করছিল।

মহিলাটি বলল, “আমি একজন মিসকীন মেয়েলোক আর আমার ছেলেপেলেও রয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দেন নি। এরূপ অবস্থায় সম্ভবত আপনি আমার জন্যে তার কাছে সুপারিশ করতে পারেন।”

এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে ডেকে পাঠালেন।

মহিলাটি বললে ঃ আমার জন্যে সাফল্যজনক ব্যবস্থা এই হতে পারে যে, আপনিই আমাকে নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হবেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাই করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা উপস্থিত হয়ে সালাম দিয়ে বললেন ঃ আমি হাযির, নির্দেশ করুন হে আমীরুল মু'মিনীন! এ কথা শুনে মহিলাটি ভয়ানক লজ্জা পেল। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ! আমি তো তোমাদের কল্যাণ চাইতে ত্রুটি করি না। কিন্তু আল্লাহ্ যখন তোমাকে এ মেয়েলোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন তুমি কি জবাব দেবে ?..... এই কথা শুনে মুহাম্মাদের দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। পরে হযরত উমর বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি তার নবী করীম (স)-কে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁকে সত্য নবীরূপে মেনে নিয়েছি আর অনুসরণ করেছি। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। তিনি সাদকা-যাকাত মিসকীনদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পরে হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হল। তিনি রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তারপর আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আমি তো তোমাদের মধ্য থেকে উত্তম লোকদেরই নানা কাজে নিযুক্ত করেছি। আমি যদি তোমাকে পাঠাই, তাহলে এক বছরের যাকাত পরিমাণ এই মহিলাকে দেবে। আর আমি জানি না, সম্ভবত আগামী বছর আমি তোমাকে পুনরায় পাঠাব কি না। পরে মেয়েলোকটির জন্যে কিছু ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাকে এক উট বোঝাই ময়দা জায়তুন দেয়া হল। তাকে বললেনঃ এখনকার মত তুমি এসব নিয়ে যাও।

পরে খায়বরে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি খায়বর যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। পরে মহিলাটি খায়বরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি মহিলাটিকে দুটি উট দিয়ে দিলেন। বললেন, এই উট দুটো নিয়ে যাও। সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার আগমন পর্যন্ত এ দিয়ে তোমার চলে যাবে। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি, তোমাকে বিগত এক বছর কালের জন্যে ও আগামী বছরের জন্যে হক দিয়ে দিতে।[১]

এই কাহিনী এবং এ কথোপকথন থেকে কি প্রমাণিত হয় ? এ ঘটনার বিবরণ থেকে অনেক মূল্যবান মৌল নীতি জানা যায়।

১. ইসলামী রাজ্যের অধিবাসী প্রতিটি নাগরিকের প্রতি শাসক ও প্রশাসকের কঠিন

১. الاموال ص ٥٩٩

দায়িত্ব ও জবাবদিহি রয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক—খলীফাতুল মুসলিমীন—প্রচণ্ডভাবে সচেতন ছিলেন।

২. ইসলামী রাজ্যের নাগরিকগণ তাদের উপযুক্ত জীবিকা পাওয়ার অধিকার রাখে এবং সে বিষয়ে তারা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। রাষ্ট্রই এ অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. ইসলামী সমাজে জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে যাকাত হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের দান বা আর্থিক সাহায্য।

৪. এই সাহায্য ছিল সুসংগঠিত এবং স্থায়ী। যদি কেউ তার অংশ না পায়, তাহলে সেজন্যে ফরিয়াদ করতে পারে, তার প্রতিকার চাইতে পারে, এই অধিকার প্রতিটি যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরই রয়েছে।

৫. হযরত উমরের রাষ্ট্রনীতি ছিল রাশেদা—সত্য ও সৎপথ অনুসরণকারী। তা এতটা পরিমাণ দেয়ার পক্ষপাতী ছিল যা প্রাপকদের জন্যে যথেষ্ট হয়, তাদের পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত ও ধনী বানিয়ে দেয়। তিনি মহিলাটিকে ময়দা ও জয়তুন বোঝাই উট দিয়ে দিলেন। পরে তার সঙ্গে আরও দুটো উট মিলিয়ে দিলেন। আর এই গোটা দানকে তিনি সাময়িক দান হিসেবে গণ্য করেছিলেন, যতক্ষণ না মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এসে তাকে বিগত বছর ও আগামী বছরের জন্যে এক সাথে দিচ্ছে।

এসবের শেষে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর (রা) এ কাজ সর্বপ্রথম করেন নি। এক্ষেত্রেও তিনি নবী করীম (সা) ও প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুসারী ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'যাকাত' কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী

যাকাতের অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনা

কুরআনে নির্দিষ্ট যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছে 'এজন্যে নিয়োজিত কর্মচারী'। এর পূর্বে ফকীর ও মিসকীনের কথা বলা হয়েছে। 'যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারী' বলতে বোঝায় যাকাত আদায়, সংরক্ষণ ও ব্যয়-বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্যে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। এর মধ্যে যাকাত আদায়কারী, সংরক্ষণকারী, পাহারাদার, লেখক, হিসাব রক্ষক এবং তার বণ্টনকারী—সব লোকই গণ্য। এসব লোকের পারিশ্রমিক যাকাত সম্পদ থেকে দেয়ার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই করে দিয়েছেন,—যেন তারা মালের মালিকদের নিকট থেকে যাকাত ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ না করে, তার প্রয়োজনও তারা বোধ না করে। উপরন্তু এই ব্যবস্থা দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যাকাত একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা ও সংস্থা। এর নিজের আয় দ্বারাই তাকে চলতে হবে। অপর কোন আয়ের উৎসের ওপর নির্ভরশীল হবে না। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রয়োজন এখান থেকেই পূরণ করতে হবে।

কুরআন মজীদে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাতরূপেই তাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা একটি অকাট্য দলীল। যাকাত পাওয়ার যোগ্য আট প্রকারের মধ্যে এরাও এক প্রকারের প্রাপক। এদের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ফকীর ও মিসকীনের পর। কেননা এরাই প্রথম প্রাপক ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লোক। এই সব কিছু প্রমাণ করে যে, যাকাত-ব্যবস্থা ইসলামে ব্যক্তির ওপর অর্পিত কাজ নয়। বরঞ্চ এটা আসলে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রই এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, গঠন ও পরিচালন করবে। যাকাত আদায়কারী, খাজাঞ্চী, লেখক ও হিসাবরক্ষক সব কিছু নিযুক্ত করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বস্তুত যাকাতের একটা আয় রয়েছে, আছে একটা বিশেষ বাজেট বা আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা। যারা এখানে কাজ করবে, তাদের মাসিক বেতন এখান থেকেই দেয়া হবে।[১]

যাকাত আদায়কারী প্রেরণ সরকারের দায়িত্ব

এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণ ঘোষণা করেছেন, যাকাত গ্রহণের জন্যে লোক পাঠানোর কাজটি রাষ্ট্রপ্রধানকে বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করতে হবে। নবী করীম (স) এবং তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদুন যে তাই করেছেন, এ কথা সর্বজনবিদিত। বুখারী ও

১. 'যাকাতের সাথে সরকারের সম্পর্ক' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'নবী করীম (স) হযরত উমর (রা)-কে যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।' হযরত সহল ইবনে সায়াদ (রা) থেকেও বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ নবী করীম (স) ইবনে লাত্‌বিয়াকে যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এ পর্যায়ে হাদীসের সংখ্যা বিপুল। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এ কারণে যে, লোকেরা ধন-মালের মালিক হয়ে বসে; কিন্তু সেজন্যে তাদের ওপর কি কর্তব্য দাঁড়িয়েছে তা তারা জানে না, বুঝে না। অনেকে আবার বুঝেও কার্পণ্য করে। এজন্যেই যাকাত আদায়কারী পাঠানো একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে।[১]

রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কৃষি ফসল ও ফল-মূলের যাকাত আদায় করার জন্যে লোক প্রেরণ করবে। এসবের যাকাত বছর হিসেবে আদায় করা হয় না, হয় ফসল হিসেবে; যখনই তা দেয়া ফরয হয়, তখন। কাজেই ফসল ও ফল কাটা ও মাড়াইর সময়ই তার যাকাত গ্রহণের জন্যে লোক যেতে হবে। এ ছাড়া গৃহপালিত গবাদি পশুর যাকাতে বছরের হিসাব গণ্য হবে। সেজন্যে বছরের একটি মাস নির্দিষ্ট করে নেয়ার প্রয়োজন। আদায়কারী বছরান্তর নির্দিষ্ট মাস বা সময়ে সেজন্যে উপস্থিত হবে। সেজন্যে মুহাররম মাসটি নির্দিষ্ট হওয়া ভাল; শীতকাল হোক কি গ্রীষ্মকাল। কেননা শরীয়াতী হিসেবে এটিই হচ্ছে বছরের প্রথম মাস।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের কর্তব্য

যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের বহু প্রকারের দায়িত্ব ও বিভিন্ন রকমের কাজ রয়েছে। তা সবই যাকাত সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন্ লোকের ওপর এবং কোন্ মালে যাকাত ধার্য হবে, যাকাতের পরিমাণ কত হবে, যাকাত কে কে পেতে পারে, তাদের সংখ্যা কত, তাদের প্রয়োজনের চূড়ান্ত মাত্রা বা পরিমাণ কত—কত পেলে তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়, প্রয়োজন মেটে, এসব নির্ধারণ তাদেরই বড় কাজ।

যাকাতের জন্যে দুটো প্রতিষ্ঠান

আমাদের এ যুগে যাকাতের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্যে দুটো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অধীন বহু কয়টি শাখা সংস্থাও গড়ে উঠতে পারে ঃ

প্রথম ঃ যাকাত আদায় বা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ।

দ্বিতীয় ঃ যাকাত বন্টনকারী প্রতিষ্ঠান।

১. যাকাত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ও তার বিশেষত্বসমূহ

যাকাত সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাজ আসলে 'কর' সংগ্রহ পর্যায়ের কাজ। এ পর্যায়ে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় ও তার ওপর যে গুরুত্ব

---

১. المجموع للنووی ج ٦ ص ١٦٧

আরোপ করতে হয়, তাকে আমরা বলতে পারি 'কর আদায়ের দায়িত্ব'। তাদের বড় কাজ হল, যাদের ওপর ফরয যাকাত ধার্য হতে পারে, তাদের তালিকা তৈরী করা, তাদের ধন-মালের প্রকার এবং কত পরিমাণ যাকাত ফরয হয় তা নির্ধারণ করা, নিকটে গিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করা, মালিকদের নিকট থেকে তা সংগ্রহ করা, অতঃপর তার পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করা—যাকাত ব্যয় ও বণ্টকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সমর্পণ করা পর্যন্ত। ধরে নেয়া যায়, এজন্যে বিভিন্ন স্থানে, শহরে নগরে, অঞ্চলে বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

তবে এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষত্ব আধুনিক কালের কর আদায়ের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে অধিকতর প্রশস্ত ও বিশাল। কেননা কর আদায়কারী প্রতিষ্ঠান সাধারণত নগদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, কোথাও তা স্বর্ণ ও রৌপ্যরূপেও হতে পারে। কিন্তু যাকাত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ—স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়াও বহু প্রকারের ফল ও ফসল গ্রহণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে হয়। বহু গবাদি-পশুও থাকে যাকাত বাবদ গৃহীত সম্পদের মধ্যে। যদিও এসব ক্ষেত্রেই নগদ মূল্য গ্রহণেরও অবকাশ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও তার সঙ্গী-সাথিগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করব।

যাকাত বাবাদ সংগৃহীতব্য ধন-মালের বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে। এক-একটি প্রতিষ্ঠান এক-এক ধরনের মাল গ্রহণ করবে এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

ক. রিকাজ, খনিজ সম্পদ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ দেয়।

খ. শস্য ও ফল-মূল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। এগুলোতে এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক গ্রহণীয় ১০% বা ৫%।

গ. গবাদি-পশুর যাকাত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। উট, গরু-মহিষ ও ছাগল ইত্যাদি এই পর্যায়ের পশু। এর একটা বিশেষ ধরনের হিসাব রয়েছে।

ঘ. নগদ সম্পদ ও ব্যবসা পণ্যের যাকাত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ—শতকরা আড়াই—আদায় করতে হয়।

২. যাকাত বন্টনকারী প্রতিষ্ঠান ও তার বিশেষত্ব

এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম 'সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান' পর্যায়ের। একালের পরিভাষায় তাই বলতে হয়, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের চিনবার ও জানবার জন্যে নির্ভুল ও উত্তম পন্থা উদ্ভাবন এ বিভাগটির অন্যতম দায়িত্ব। এদের সংখ্যা নির্ধারণ, পাওয়ার অধিকারের গুরুত্ব ও তাগিদ অনুভব করা, তাদের প্রয়োজনের প্রমাণ নির্ধারণ, কত পরিমাণ দিলে কার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে—তার সব প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণের ব্যবস্থা হতে পারবে তা জানতে হবে। এজন্যে একটা সুস্থ ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, যা তাদের সংখ্যা, পাত্রত্ব ও সামাজিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ইমাম নববী বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান, যাকাত সংগ্রহকারী এবং যাকাত বণ্টনের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হচ্ছে, পাওয়ার যোগ্য লোকদের তালিকা সংরক্ষণ, তাদের সংখ্যাটা জানা, তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া, যেন সংগৃহীত সব যাকাত সুষ্ঠুরূপে বণ্টন করে স্বস্তি লাভ করা যায়, পাওনাদারদের পাওনা দিয়ে দেয়া যায় এবং তাদের নিকট পড়ে থেকে যাকাত সম্পদ যেন বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়।[১]

এ থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, ইসলামের বিশেষজ্ঞ মনীষিগণ যাকাত বণ্টন ব্যবস্থা সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেজন্যে চিন্তা-ভাবনাও করেছেন ব্যাপকভাবে। পাওয়ার যোগ্য লোকদের প্রতি চূড়ান্তভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছেন যেন তাদের প্রাপ্য অল্প সময়ের মধ্যে তাদের হাতে পৌঁছে যায়। তাদের চাওয়া বা দাবি করার যেন অপেক্ষা না থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানটিরও বহু কয়টি শাখা-সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিটি জেলা, মহকুমা বা থানা, ইউনিয়ন হিসেবে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের কাজকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

ক. অক্ষমতার কারণে কাজ ও উপার্জন থেকে বঞ্চিত ফকীর-মিসকীনের সংস্থা। থুরথুরে বুড়ো, বিধবা, ইয়াতীম, কাজের ব্যাপদেশে বিপদের সম্মুখীন হওয়ায় অক্ষম হয়ে পড়েছে, স্থায়ী রোগের দরুন অক্ষমতা দেখা দিয়েছে, যারা সাময়িকভাবে বেকার, কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত, আকস্মিক দুর্ঘটনায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া লোক, বিবেকবুদ্ধির দুর্বলতা-অক্ষমতা দেখা দেয়ার দরুন কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়া লোক, বোকা-নির্বোধ ধরনের লোক প্রভৃতি এ পর্যায়ে গণ্য হবে। তবে তারা যে ধনী ও সচ্ছল নয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বা পূর্ব-অর্জিত সম্পদের দরুন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

খ. যথেষ্ট পরিমাণের কম আয়ের অধিকারী লোক। এরা উপার্জন করে বটে, কিন্তু তাদের উপার্জন তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাদের জন্যে যথেষ্ট নয়—হয় মজুরী পরিমাণ কম হওয়ার দরুন কিংবা তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকদের বিপুল সংখ্যক হওয়ার কারণে অথবা দ্রব্যমূল্যের আকাশ-ছোঁয়া অবস্থা হওয়ার কারণে। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এই লোকদেরই 'মিসকীন' নামে চিহ্নিত করেছেন।

গ. ঋণ-ভারাক্রান্ত লোকদের সংস্থা। দুর্দৈব-দুর্দশাগ্রস্ত লোকও এর মধ্যে গণ্য হবে। পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন ও বিবাদ মীমাংসাকরণের কাজের দরুন যারা ঋণগ্রস্ত হয়েছে, এ ধরনের অন্যান্য কল্যাণমূলক ও সামাজিক সামষ্টিক কাজে জড়িত হওয়ার দরুন যারা ঋণী হয়ে পড়েছে তারা সকলেই এই সংস্থার অধীন গণ্য হবে।

ঘ. মুহাজির, স্বদেশ-তাড়িত ও রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণকারী লোক, যারা কুফর ও অশান্তিপূর্ণ দেশ ত্যাগ করে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ইসলামের খেদমতে বিদেশে

১. الروضه ج ٢ ص ٢٣٧

প্রেরিত ছাত্র বা লোক প্রভৃতি এই সংস্থাভুক্ত হবে। শেষোক্তরা ফী-সাবীলিল্লাহ পর্যায়ে গণ্য বলে তাদের জন্যে যাকাত ব্যয় করা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

ঙ. কাফিরী দেশে ইসলাম প্রচার সংস্থা। বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কাজ, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, ইসলামী দেশকে কাফিরদের কর্তৃত্ব ও আদিপত্য থেকে মুক্তকরণ, কাফিরী শাসনের অবসান করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজ এই সংস্থার অধীনে চলবে। এটাও 'ফী-সাবীলিল্লাহ' পর্যায়ে গণ্য। এ বিষয়েও পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কোন্‌টিতে কত ব্যয় করা হবে, তাও নির্ধারণ করতে হবে। এজন্যে যাকাতের একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরী করা আবশ্যক হবে। রাষ্ট্রকর্তার ইজতিহাদ এক্ষেত্রে কাজ করবে পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা পরিষদের অধীন। এজন্যে পরিসংখ্যান বিভাগ চালু করতে হবে। অবশ্য যেখান থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হয়েছে সেই স্থানের কল্যাণের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখতে হবে ইসলামের সামগ্রিক কল্যাণ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। একটা বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াতের ব্যবস্থা করার ওপরও লক্ষ্য রাখতে হবে। সারা দুনিয়ার মুসলমানের কল্যাণও এই কল্যাণদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উম্মত একথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না।

যাকাত পাওয়ার যোগ্যতা নির্ণয়ের ওপর গুরুত্ব

যাকাতের মাল যার যার জন্যে ও যে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে, সে সে ব্যক্তি ও সংস্থার যাকাত পাওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার নির্ণয় করা এই বিভাগের একটা বড় কাজ। এ পর্যায়ে বহু নিয়ম-কানুন রয়েছে, ফিকাহ্‌বিদগণ নবী করীম (স)-এর হাদীস থেকে তা 'ইস্তেম্বাত' করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে আমরা এখানে কতিপয় শর্ত ও নিয়ম-কানুনের উল্লেখ করছি ঃ

ক. ফকীর-মিসকীনের অংশ পাওয়ার জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত এই যে, তার নিজের কোন মাল বা উপার্জন এমন থাকবে না যদ্দারা তার ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ হতে পারে। উপার্জনে একেবারেই ও আসলেই অক্ষম হওয়া শর্ত নয়। যেসব উপার্জনক্ষম লোক কাজ পাচ্ছে না, বেকারত্বে ভুগছে, তাদের জন্যও যাকাতের মাল সম্পূর্ণ হালাল। এরূপ অবস্থায় সেও অক্ষম বিবেচিত হবে। আর যে লোক উপার্জন করে, কিন্তু সে উপার্জন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, সে তার প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণের জন্য যাকাত গ্রহণ করতে পারবে।

খ. ব্যক্তির অবস্থা ও সামাজিক বা বংশীয় মর্যাদার সাথে সংগতি সম্পন্ন পরিমাণ উপার্জনই গণ্য হবে। যার উপার্জন এরূপ নয়, সে 'কিছুই নেই'র মধ্যে গণ্য হবে। আলিম, কবি, সাহিত্যিক, লেখক প্রভৃতি যারা দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নয়, তারা ফকীর-মিসকীনের অংশ থেকে গ্রহণ করতে পারে, যদ্দিন না তারা উপযোগী কোন উপার্জন-উপায় পাচ্ছে।

গ. উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইল্‌ম অর্জনে ব্যস্ত হওয়ার দরুন প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না, কেননা উপার্জনে আত্মনিয়োগ করলে তার ইল্‌ম হাসিল করা হয় না, তার জন্যেও যাকাত হালাল হবে। যেলোক প্রকৃতই ইল্‌ম অর্জনে নিয়োজিত, তার জন্যেই এ কথা প্রযোজ্য। কেননা তার অর্জিত ইল্‌ম দ্বারা গোটা মুসলিম সমাজ উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু যেলোক প্রকৃতই ইল্‌ম হাসিল করছে না, করার যোগ্যতা নেই, অথচ উপার্জন করার ক্ষমতা আছে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ হালাল নয়, যদিও সে কোন মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী হিসেবে অবস্থান করছে।

ঘ. যার কোন চাষযোগ্য জমি থাকবে, কিন্তু তার আমদানী যথেষ্ট পরিমাণ হয় না, সে ফকীর বা মিসকীন গণ্য হবে এবং যাকাত থেকে তার প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ করে দেয়া যাবে। তাকে সেই জমি বিক্রয় করে দিতে বাধ্য করা যাবে না—শিক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকেও বাধ্য করা যাবে না তার বই-পুস্তক বিক্রয় করে দিতে। কেননা বই-পুস্তক তো তার জন্যে অপরিহার্য অন্য লোকের তুলনায়।

চ. কোন ব্যক্তির যাকাতের মাল চিহ্নিত হওয়ার পর সে যদি দাবি করে যে, সে 'ফকীর' হয়ে গেছে, তাহলে তার দারিদ্র্য প্রমাণ না করা পর্যন্ত সে মাল তার কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ধনাঢ্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর তার দারিদ্র্য প্রমাণ না করা পর্যন্ত তার দাবি মেনে নেয়া যায় না। যেমন কারুর যাকাতের মাল চিহ্নিত হওয়ার পর কারুর দেয় ঋণ তার ওপর সাব্যস্ত হলে, এক্ষণে সে স্বীয় অভাব ও আর্থিক সংকটের কথা পেশ করল, তখনও তাই করতে হবে।

ছ. যার মাল চিহ্নিত করা হয়নি, সে যদি স্বীয় দারিদ্র্য ও অনটনের কথা প্রকাশ করে, তাহলে তার কথা মেনে নিতে হবে। এতে কোন মতদ্বৈততা নেই। কেননা দারিদ্র্য একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার। কোন দলীল দিয়ে তা প্রমাণ করা সহজ নয়।

জ. কেউ দাবি করল যে, তার কোন উপার্জন নেই—সে বেকার, তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে যদি তাই মনে হয়—যেমন থুরথুরে বুড়ো কিংবা স্বাস্থ্যহীন কর্মক্ষমতাহীন যুবক—তা হলে কোনরূপ কিড়া-কসম ছাড়াই তার দাবি মেনে নিতে হবে। কেননা বাহ্যত এবং কার্যত তার কোন উপার্জন নেই।

শক্তিশালী যুবকও যদি স্বীয় দারিদ্র্যের কথা বলে, তাহলে তার কথাও গ্রহণ করা হবে; কিন্তু তাকে কিড়া-কসম করতে বলতে হবে কিনা, এ পর্যায়ে দুটো কথা রয়েছে ঃ

শাফেয়ী এবং এ মতের অন্যান্য লোকদের কথা হচ্ছে, কিড়া করতে বলা যাবে না। ইমাম আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন, দুই ব্যক্তি এসে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে যাকাত চাইল। নবী করীম (স) চোখ তুলে তাদের দেখলেন ও চোখ নিচু করে নিলেন। তিনি দেখলেন, দুজনই বেশ স্বাস্থ্যবান। তখন বললেন ঃ তোমরা চাইলে আমি দেব। তবে কথা হচ্ছে, কোন ধনী সচ্ছল ব্যক্তির জন্যে এটা প্রাপ্য নয়, শক্তিসম্পন্ন উপার্জনক্ষমের জন্যেও নয়।

এ হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স)-এর সুন্নাত অনুসরণার্থে যাকাত বণ্টনকারীর কর্তব্য প্রত্যেক শক্তিসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের অংশ দেয়ার সময় এরূপ নসীহত করা। এটা হবে মূর্খকে শিক্ষাদান এবং অসতর্ককে সতর্ককরণ।

ঝ. ফকীর বা মিসকীন যদি দাবি করে যে, তার সন্তানাদি রয়েছে এবং তাদের সকলের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দরকার, তাহলে দলীল-প্রমাণ ছাড়া তার সন্তানাদির কথা মেনে নেয়া যাবে না। কেননা সাধারণত সন্তানাদি না থাকার কথা আর থাকলে তা প্রমাণ করাও কঠিন নয়।

ঞ. কেউ নিজেকে ঋণগ্রস্ত হওয়ার দাবি করলে প্রমাণ ছাড়া তা মেনে নেয়া যাবে না।

ট. এসব ক্ষেত্রে বিচারকের দলীল শ্রবণ করা এবং দাবি দায়ের করা ও অস্বীকার করা ও সাক্ষ্য জানানোই যথেষ্ট নয়। বরং দুজন ন্যায়বাদী সত্যবাদী চরিত্রবান বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যদান অবশ্যক। সাক্ষীদ্বয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবির সত্যতার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। জনশ্রুতি বা জনগণের মধ্যে ব্যাপক-বিস্তৃতি দলীল-প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত। কেননা যতটা জানা দরকার, তা এভাবে হয়ে যায়। স্পষ্ট ধারণা করতেও কোন অসুবিধা হয় না। এমন কি কেউ কেউ এদ্দুর বলেছেন, একজন লোকও যদি প্রকৃত অবস্থা জানাতে পারে, তবে তাই যথেষ্ট হবে।[১]

ভিক্ষা চাওয়া কার জন্যে জায়েয, সে বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। একটি হাদীসের কথা ঃ 'যে ব্যক্তি অনশন জর্জরিত'। তার আশপাশের জানে-শুনে—এমন অন্তত তিনজন লোক বলবে ঃ হ্যাঁ লোকটি সত্যই অনশনে রয়েছে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষা করা জায়েয। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ এ হাদীসটির প্রয়োগ হবে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার মালিকানা প্রমাণিত এবং বাহ্যিক সচ্ছলতা সুপরিচিত, সে যদি দাবি করে যে, তার ধন-মাল ধ্বংস হয়ে গেছে চোর-ডাকাতের লুণ্ঠনে, অথবা আমানতদারের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন অথবা এ ধরনের এমন কোন ঘটনার ফলে যার পর্যবেক্ষণীয় কোন চিহ্ন থাকে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দাবির সত্যতা সম্পর্কে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তা হলে তার অবস্থা সুস্পষ্ট হওয়া ও তার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে তাকে যাকাত থেকে কিছুই দেয়া যাবে না। সেজন্যে প্রয়োজন হলে তার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ঠিক এ কথাই হাদীসের শেষে বল হয়েছে এই ভাষায়ঃ যতক্ষণ না তার আশপাশের জানে-শুনে এমন অন্তত তিনজন লোক তার দুরবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে...। জানাশোনা লোক হওয়ার শর্ত হয়েছে এজন্যে যে, যারা জানে না, বুঝে না তাদের কথার কোন মূল্য নেই। ব্যাপারসমূহের অন্তর্নিহিত প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারটি সাক্ষ্য দানের ব্যাপার নয়, প্রমাণ করা ও পরিচিতি লাভের ব্যাপার। তাই তার প্রতিবেশী বা স্বজাতীয় স্ব-সমাজী জানে-শুনে এমন তিনজন লোক তার অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। বলবে যে, তার দাবি সত্য, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।[২]

---

১. এই সমস্ত আলোচনা ইমাম নববী রচিত المجوع ج ٦। থেকে গৃহীত।

২. معالم السنن للخطابى ج ٢ ص ٣٨

যাকাত-কর্মচারী হওয়ার শর্ত

যাকাতের কাজে কর্মচারীরূপে নিযুক্ত পাওয়ার জন্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষণীয়ঃ

১. তাকে মুসলিম হতে হবে। কেননা এই কাজটা মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি করার পর্যায়ের। অতএব ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া জরুরী শর্তরূপে গণ্য—অপরাপর সব প্রতিনিধিত্বের মতই। তবে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে এই শর্ত নেই। যেমন পাহারাদার, দারওয়ান, গাড়ি চালক ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ-এর একটি বর্ণনায় যাকাতের কর্মচারী অমুসলিমও হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কুরআনী ঘোষণা নিঃশর্তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম ও অমুসলিম—কাফির উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উপরন্তু কর্মচারী যা পাবে, তা হচ্ছে তার শ্রম বা কাজের মজুরী মাত্র। তাই অন্যান্য কাজের মজুরী গ্রহণে যেমন এ ধরনের কোন শর্ত নেই, এখানেও তাই।

২. আসলে এটা ইসলামের পরম উদারতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা যেহেতু একটি ইসলামী ফরয কাজ, তাই এ কাজে অমুসলিম লোক নিয়োগ না করাই উত্তম।

ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন ঃ যেহেতু এ কাজের জন্যে আমানতদারী ও পরম বিশ্বস্ততা থাকা জরুরী শর্ত বিশেষ, তাই কর্মচারীরও মুসলিম হওয়া জরুরী। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে যেমন এই শর্ত রয়েছে। এটা মুসলমানদের একটা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বও বটে। তাই কোন কাফিরকে এ কাজে নিযুক্ত করা জায়েয হবে না। তা ছাড়া যে লোক নিজে যাকাত ফরয হয় এমন লোকদের মধ্যে গণ্য নয়, তাকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া উচিত নয়। কাফির ব্যক্তি আমানতদার গণ্য হতে পারে না। এ কারণে হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ 'এই লোকদের তোমরা আমানতদার বানিও না। কেননা তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা আশআরীর দফতরে কেরানীপদে একজন খৃস্টানকে নিয়োগ করাকে পসন্দ বা সমর্থন করেন নি। আর যাকাত হচ্ছে ইসলামের একটা ফরয। তাতে এই নীতি অবশ্যই বাধ্যতামূলক হবে।[১]

২. পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।

৩. বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। কেননা মুসলিম জনগণের আমানত তার নিকট রাখা হবে। তাই কোন ফাসিক ও খিয়ানতকারীকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে না। কেননা এই পরিচিতির লোকদের আমানতদারী বিশ্বাস্য নয়। তারা লালসার বশবর্তী হয়ে ফকীর-মিসকীনের অধিকার হরণ করতে পারে, উপস্থিত স্বার্থ লোভের বশবর্তী হয়ে যেতে পারে, এই ভয় বা আশংকা থেকেই যায়।

৪. যাকাতের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা।

ফিকাহবিদদের আরোপিত আর একটি শর্ত হচ্ছে যাকাত সংক্রান্ত শরীয়াতী

---

১. المغنى ج ٢ ص ٤٦١

হুকুম-আহকাম ও আইন-বিধান সম্পর্কে অবহিত ও ওয়াকিফহাল হওয়া, যদি সে সাধারণ কার্যাবলীর দায়িত্বশীল হয়। কেননা সে এসব বিষয়ে অজ্ঞ হলে সে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না, তার ভুল বেশি হবে সঠিক কাজের তুলনায়।[১] কেননা কি তাকে গ্রহণ করতে হবে, আর কি গ্রহণ করা চলবে না, তাও তার জানা থাকা আবশ্যক। এজন্যে তার আংশিক ইজতিহাদ করার প্রয়োজনও দেখা দেবে যাকাত সংক্রান্ত নিত্য সৃষ্ট মাসলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে।

তবে তার কাজই যদি হয় আংশিক, সুনির্দিষ্ট একটা বিশেষ পরিধির মধ্যে, তাহলে অন্তত তার কাজের পরিমাণটুকু সম্পর্কে তার জানা থাকতে হবে।

৫. কাজের যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে।

যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে, নিয়োগকৃত কর্মচারীর মধ্যে সে কাজটুকু আঞ্জাম দেয়ার মত কর্মক্ষমতা থাকতে হবে, তার যোগ্য হতে হবে। কেননা শুধু বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর গুণ প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতার বিকল্প বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْ جَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -

তুমি যাকে কাজে নিযুক্ত করবে, সেজন্যে শক্তিসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই উত্তম।

—(সূরা কাসাস ঃ ২৬)

এ কারণে হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন বাদশাহকে ঃ

اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَ ائِنِ الْاَرْضِ ج اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -

আমাকে পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের ওপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করুন। আমি নিঃসন্দেহে সংরক্ষণকারী সুবিজ্ঞ। —(সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫)

তাই সংরক্ষণ অর্থাৎ আমানতদারী এবং ইল্‌ম অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কাজ উত্তমভাবে ও যথেষ্ট মাত্রায় করার জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকতে হবে কর্মচারীর মধ্যে। বস্তুত প্রত্যেক সফল কাজের এ দুটোই হচ্ছে ভিত্তি।

৬. নিকটাত্মীয় নিয়োগ করা কি জায়েয?

অনেকে এও শর্ত করেছেন যে, নবী করীম (স)-এর নিকটাত্মীয় বনু হাশেমের লোক এই কাজে নিযুক্ত না হওয়া উচিত। কেননা ফযল ইবনে আব্বাস ও মতলব ইবনে রবীয়া দুই ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট যাকাত সংক্রান্ত কাজে বিনিয়োগের প্রার্থনা করেছিলেন। একজন বললেন, 'হে রাসূল! আমরা আপনার নিকট এসেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমাদেরকে যাকাত সংক্রান্ত এই কাজে নিযুক্ত করবেন। তাহলে অন্যান্য লোকের ন্যায় আমরাও এ থেকে সুবিধা ও মুনাফা লাভ করতে পারব। লোকেরা যেমন আদায় করে দেয় আপনার নিকট, আমরাও তেমনিভাবে আদায় করে দেব।' তখন

---

১. المجموع النوى ج ٦ ص ١٦٧

তিনি বললেন, 'যাকাত (সংক্রান্ত কাজ) মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশাবলীর পক্ষে শোভন নয়। তা তো আসলে মানুষের আবর্জনা বিশেষ।' হাদীসটি আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। অপর একটি বর্ণনার ভাষা হচ্ছে ঃ 'যাকাত মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশাবলীর জন্যে হালাল নয়।'[১]

হাদীসটি মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরদেরকে যাকাতের মালের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও নিষেধ করছে। তা থেকে উপকৃত হওয়াও অনুরূপ নিষিদ্ধ। কথাটির শেষ দিক তুলনামূলক। যাকাত হচ্ছে লোকদের ধন-মাল ও মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা বিধানের মাধ্যম। আল্লাহ্ বলেছেন, 'তুমি তাদের পবিত্র করবে, পরিশুদ্ধ করবে এই যাকাত দ্বারা', এ কারণে তাকে আবর্জনা (Dirt-filth) বলা হয়েছে।

বস্তুত যাকাতের মাল সাধারণ জনগণের মাল। অতএব তা কোনরূপ অধিকার ছাড়া পাওয়া যেতে পারে না। সেরূপ পাওয়া ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহ। নবী করীম (স) এই মাল থেকে তাঁর নিকটাত্মীয়দের দূরে রাখার ও ভীত করার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিনি এ বিষয়ে লোকদের সাবধান করেছেন তার খোঁজ-খবর লওয়ার আগ্রহ থেকে, তা বেশি পরিমাণে পাওয়ার লোভ থেকে।

আহলি বাইত-এর ফিকাহ্‌বিদ নাসের মনে করেছেন, বনু হাশিমের লোকদের কাজে নিযুক্ত করে যাকাত থেকে বৃত্তিদান বা মাসিক বেতন দান জায়েয। ইমাম শাফেয়ী এবং আহমাদেরও তা-ই মত। কাযী আবূ ইয়ালা যাকাত সংক্রান্ত কাজে বনু হাশিমের লোকদের নিয়োগ করা পর্যায়ে বলেছেন ঃ যার পক্ষে যাকাত-সাদকা গ্রহণ করা হারাম রাসূলের নিকটাত্মীয়দের ক্রীতদাসদের মধ্যে থেকে, তাকে এই কাজে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করা জায়েয। কেননা সে যা পাচ্ছে তা তার পারিশ্রমিক, যাকাত নয়। এই কারণে তার কাজ অনুপাতে তার প্রাপ্যও নির্ধারিত হবে। আর খারকী বলেছেন, বনু হাশিম, কাফির ও গোলামকে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে তারা যদি এই কাজের কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাজ অনুপাতে তাদের দেয়া যাবে।[২]

অন্য কথায় হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, এই পর্যায়ের কাজ পেতে চাওয়া থেকে বনু হাশিমের লোকদের দূরে সরিয়ে রাখা—এ বিষয়ে তাদের মনে বিতৃষ্ণা ও অনীহা জাগিয়ে তোলা—তা হারাম করে দেয়া হয়নি তাদের জন্যে।

হাদীসটি দ্বারা বনু হাশিমের লোকদের জন্যে এই কাজ হারাম করা হয়েছে বলে যারা মনে করেছেন, তাদের মত হচ্ছে, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের যাকাত থেকে বেতন বা মজুরী গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তারা যদি এ কাজে নিযুক্ত কর্মচারী হয়ে যাকাত ছাড়া অন্য ফাণ্ড থেকে বেতন গ্রহণ করে,তাহলে তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয হবে। হযরত আলী (রা) বনু আব্বাস লোকদের যাকাত সংক্রান্ত কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।[৩]

---

১. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٧٥ ২. الا حكام السلطانيه للقاضى ابو يعلى ص ٩٩
৩. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٧٥ المجموع النووى ج ٦ ص ١٦٧

৭.পুরুষ হওয়া কি শর্ত ?

অনেকে শর্ত আরোপ করেছেন যে, যাকাত সংক্রান্ত কাজে পুরুষ লোকদেরকে কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে, মহিলাদের এ কাজে নিযুক্ত করা তাঁদের মতে জায়েয হবে না কেননা এই কাজটি হচ্ছে যাকাত-সাদকার ওপর কর্তৃত্বকরণ। কিন্তু এই মতের সমর্থনে নবী করীম (স)-এর একটি কথাই শুধু দলীল হিসেবে পেশ করা সম্ভব হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে ঃ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا امْرَ هُمْ امْرَأَةً -

যে জাতি তাদের সামষ্টিক কার্যাবলীতে স্ত্রীলোকদের কর্তৃত্বশীল বানায়, সে জাতি কখ্খনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না। (বুখারী)

কিন্তু এই হাদীসটি তো সাধারণ জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেখানে মহিলাকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে আদেশ ও নিষধকরণের কাজে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু সাধারণ চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে—যাকাত সংক্রান্ত কর্মচারী তন্মধ্যেই গণ্য—এই হাদীসটি প্রযোজ্য নয়।

অনেকে যুক্তি দেখিয়েছেন, যাকাত সংক্রান্ত কাজে কোন মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার কোন নজীর নেই। আগের কালের লোকেরাও তা করেন নি, শেষের দিকের লোকেরাও নয়। অতএব নিছক এই ব্যাপারই প্রমাণ করে যে, তা জায়েয নয়।

কিন্তু এটা কোন দলীল হল না। ইসলামের স্বর্ণযুগে মহিলারা অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক কাজে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। কিন্তু কার্যত তাদেরকে নিয়োগ না করা একথা প্রমাণ করে না যে, তা হারাম।

কেউ কেউ বলেছেন আল্লাহ্র ব্যবহৃত শব্দ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا মহিলাদের শামিল করো না। কেননা এটা পুংলিঙ্গের শব্দ।[১] এই দলীলটি মোটেই যথার্থ নয়। কেননা তাই যদি গৃহীত হত তাহলে 'ফকীর' 'মিস্কীন' 'গারেমীন' ইত্যাদি শব্দও পুংলিঙ্গ, মহিলাদেরকে তাতেও শামিল করা যাবে না। কিন্তু তা তো ইজমার পরিপন্থী। কেননা এসব ক্ষেত্রেই মহিলারা পুরুষদের অধীন অনুষঙ্গ হিসেবে শামিল রয়েছে। সম্বোধন ও ব্যবহৃত শব্দসমূহ বাহ্যত পুরুষদের জন্যে হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। সত্যি কথা হচ্ছে এ পর্যায়ে যাকাত সংক্রান্ত কাজে মহিলাদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন দলীলই নেই। তবে সাধারণ নিয়ম-কানুন হচ্ছে মহিলাদেরকে পুরুষদের ভিড় ও অবাধ মেলামেশার স্থান ও কেন্দ্র থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। বিনা প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের যাওয়াই অনুচিত। এ কারণেই এ কাজে মহিলাদের অপেক্ষা পুরুষদেরই নিযুক্ত করা উচিত। তবে সীমিত পরিবেষ্টনীতে মহিলাদেরও এ কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন বিধবা ও অক্ষম মহিলাদের নিকট যাকাতের মাল পৌঁছে দেয়ার কাজ তারা করতে পারে। অন্ততপক্ষে এ কাজে মহিলারা যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন। অনুপাতে তারা মজুরীও পেতে পারবে। মহান উদার শরীয়াতে এ ধরনের সুযোগ না দেয়ার মত কোন সংকীর্ণতা নেই।

---

১. شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٣٧

৮. অনেকে শর্ত আরোপ করেছেন, কর্মচারী হিসেবে স্বাধীন মুক্ত নাগরিককেই নিয়োগ করতে হবে, ক্রীতদাস নয়। কিন্তু অন্যরা এই মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা দলীল হিসেবে আহমাদ ও বুখারী বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِىٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ -

তোমরা শোন, আনুগত্য কর, তোমাদের ওপর চেপ্টা মাথার কোন ক্রীতদাসকে প্রশাসক বানিয়ে দেয়া হলেও।

আর যেহেতু ক্রীতদাস হলেও তার দ্বারা কাজ সুসম্পন্ন করানো যেতে পারে, তাই সেও ঠিক মুক্ত স্বাধীন নাগরিকদের মতই।

কর্মচারীকে কত দেয়া হবে

কর্মচারী মাসিক বেতনভুক্ত। কাজেই তাকে এতটা পরিমাণ বেতন বা ভাতা দিতে হবে যা তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে। এটা তার মজুরী মাত্র। তা তার সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টিতে নিম্নমানের হওয়া উচিত নয় যেমন, তেমনি খুব বেশি বাড়তিও হওয়া উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত, যাকাত ফাণ্ড থেকে কর্মচারীদের বেতন দ্রব্যমূল্য অনুপাতে দেয়া উচিত। তার এই মতটি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যমূল্যে সমতা বিধানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বেতন যদি দ্রব্যমূল্যের তুলনায় অধিক দিতে হয় তা হলে তা যাকাত ছাড়া অন্য ফাণ্ড থেকে দেবে।

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ মনে করেন, যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন যাকাত থেকেই দিতে হবে। কুরআনের কথা থেকে তাই মনে হয়। তারা যাকাত থেকেই পেতে পারে, দ্রব্যমূল্যের তুলনায় অধিক হলেও।

ইমাম শাফেয়ী থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাও তাই বলে। তবে তাঁর এ মতটি যুক্তিভিত্তিক কেননা তাতে ফকীর ও যাকাত পাওয়ার যোগ্য অন্যান্য লোকদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 'কর' সংক্রান্ত হাদীসের সাথেও তার মিল রয়েছে। তাতে সংগ্রহ-ব্যয়ে মধ্যম নীতি অবলম্বন করাকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।

নিযুক্ত কর্মচারী ধনী হলেও তাকে তার ভাতা বা বেতন দিতে হবে। কেননা সে তো তার কাজের মজুরী গ্রহণ করছে তার প্রয়োজনে, কোনরূপ সাহায্য বাবদ নয়। আবূ দাউদ নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

যাকাত পাঁচ জন লোক ছাড়া অপর কোন ধনী ব্যক্তির জন্যে জায়েয নয়। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকারী, তার কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কেউ যদি তা স্বীয় মালের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়, অথবা এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী মিসকীন ছিল, সে অপর এক মিসকীনকে দান করল। এই মিসকীন ব্যক্তি কোন ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দিল—এই হচ্ছে পাঁচ জন।[১]

---

১. ইমাম নববী তাঁর المجموع। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ এ হদীসটি হাসান বা সহীহ। আবূ দাউদ এটি দুইটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যাকাতের মালের প্রতি লোভের ওপর রাসূলের কঠোরতা

কোন কর্মচারী যদি যাকাত সংক্রান্ত কাজে সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল বেতনভুক্ত হয়, তাহলে তাকে যাকাত সংগ্রহের কাজ নির্দেশমতই করে যেতে হবে। তা ব্যয় ও বণ্টনও করতে হবে বিধান অনুযায়ী। যাকাতের কোন মাল স্বীয় মুনাফা বা সুবিধা অর্জনের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না, করা জায়েয হবে না। যা সংগৃহীত হয়েছে তার থেকে কম কি বেশি—কোন পরিমাণের মালই সে গোপন করতে পারবে না। কেননা তা জনগণের মাল। তার ওপর কারুর লোভ হওয়া বা বিনা অধিকারে তা থেকে কিছু গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। এ পর্যায়ে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে তা পড়লে কলিজা কেঁপে ওঠে, পরিণামের ভয়ে শরীর শিউরে ওঠে। যে মালে কারুর হক নেই তার প্রতি তার কোনরূপ লোভ হওয়াটা কঠিন আযাবের কারণ হবে।

হযরত আদী ইবনে উমাইরাতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غَلُوْلاً يَا
تِىْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ -

আমরা যাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেছি, সে যদি একটি সূচও বা তার চাইতেও বড় জিনিস গোপন করে রাখে, তাহলে তা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। কিয়ামতের দিন তা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

এ কথা শুনে আনসার বংশের এক কালো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে—আমি তার প্রতি তাকিয়েছিলাম—বললেন ঃ হে রাসূল। আপনি আপনার কাজ আমার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিন। রাসূল (স) বললেন ঃ কেন, তোমার কি হয়েছে ? লোকটি বললেন, আমি শুনলাম, আপনি এই এই বলেছেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি এখনই বলেছি; আমরা তোমাদের মধ্য থেকে যাকেই কোন কাজে নিযুক্ত করেছি, সে যেন তার সামান্য বা বেশি—সবই সুসম্পন্ন করে মালসমূহ নিয়ে আসে। তাকে যা দেয়া হবে, সে তাই নেবে, আর যা নিতে নিষেধ করা হবে, তা থেকে সে বিরত থাকবে।' (মুসলিম, আবূ দাউদ)

আবূ রাফে' থেকে বর্ণিত হয়েছে—তিনি রাসূলে করীমের সঙ্গে 'জান্নাতুল বাকী'তে চলছিলেন। নবী করীম (স) সহসা বলে উঠলেন ঃ তোমার জন্যে দুঃখ, তোমার প্রতি ঘৃণা। আবূ রাফে' বলেন ঃ আমি মনে করলাম, রাসূলে করীম (স) আমাকে লক্ষ্য করেই বুঝি এরূপ উক্তি করলেন। তাই আমার পক্ষে এই উক্তি খুবই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আমি চলার গতিতে একটু মন্থরতা অবলম্বন কলাম। রাসূলে করীম (স) আমার এরূপ অবস্থা দেখে বললেন ঃ কি হয়েছে তোমার বল। আমি বললাম ঃ আপনি কি কোন কথা বলেছেন ? বললেন ঃ তাতে তোমার কি ? বললাম ঃ আপনি আমার জন্যে দুঃখ আরোপ করেছেন। বললেন ঃ না, তোমাকে নয়। অমুক ব্যক্তিকে অমুক গোত্রের যাকাত আদায়ের জন্যে আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম। সে যাকাতের

মাল থেকে একটা সুতির কাজ করা পশমী চাদর চুরি করেছে। ফলে সে ঐ রকমেরই একটা আগুনের চাদর পরিধান করেছে।' নাসায়ী ও ইবনে খুজাইমা নিজ নিজ সহীহ্ সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

উবাদাহ্ ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) তাঁকে যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করে পাঠিয়েছিলেন। তখন বলে দিলেন ঃ হে আবূ অলীদ! আল্লাহ্কে ভয় কর, তুমি কিয়ামতের দিন এমন উট নিয়ে আসতে পারবে না, যা উটের আওয়াজ দিতে থাকবে, কিংবা এমন গাভী যার হাম্বা রব হবে অথবা এমন ছাগী যার মি, মি আওয়াজ হবে। বললেন ঃ হে রাসূল! সত্যই কি তাই হবে নাকি ? বললেন ঃ হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম করে বলছি। একথা শুনে উবাদাহ বললেন ঃ যে আল্লাহ্ আপনাকে পরম সত্যতা সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আপনার কোন কাজ করব না। বর্ণনাটি তাবারানী তার 'আল-কবীর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদ সহীহ্।

উবাদাহ এরূপ ঘোষণা দিলেন কেন, তিনি তো একজন মুসলিম ? বলেছেন, তাঁর নিজের দ্বীনী সালামতী রক্ষার জন্যে, বিপদের আশংকা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে, খারাপ পরিণতির ভয়ে—তিনি হয়ত তার মধ্যে পড়ে যাবেন, অথচ তিনি টেরও পাবেন না এই আতংকে।

বেতনভুক কর্মচারীদের জন্যে দেয়া উপঢৌকন ঘুষ

যাকাত কার্যে নিয়োজিত বেতনভুক কর্মচারীদের জন্যে যেমন যাকাতের এক বিন্দু জিনিস লুকিয়ে রাখা বা হস্তগত করা জায়েয নয়,—তা একটি সুঁচই হোক না-কোন, অনুরূপভাবে মালদার লোকদের প্রদত্ত কোন উপঢৌকন গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে জায়েয হতে পারে না, তা ব্যক্তিগতভাবে তাকেই দেয়া হলেও। কেননা এটা ঘুষ গণ্য হবে, যদিও নাম হবে হাদিয়া বা তোহফা—উপঢৌকন। যেহেতু সে তো তার কাজের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বেতন-মজুরী গ্রহণ করছে সরকারের নিকট থেকে। অতএব যাকাতদাতাদের কাছ থেকে তার অতিরিক্ত একবিন্দু জিনিসও গ্রহণ করতে পারবে না। গ্রহণ করলে কুরআনে নিষিদ্ধ বাতিল উপায়ে লোকদের মাল ভক্ষণ করা হবে। উপরন্তু মালদারদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণে সে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, তাতে ফকীর-মিসকীনের হক নষ্ট হবে। সেই সাথে সে খারাপ দোষের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। আর যে লোক নিজেকে সন্দেহের অবস্থায় ফেলে দেয় তার প্রতি লোকদের ধারণা খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হতে হবে তাকে।

আবূ হুমাইদ সায়েদী থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) আজদ গোত্রের ইবনে লাত্‌বিয়া নামের এক ব্যক্তিকে যাকাত সংক্রান্ত কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। সে যখন কর্মস্থল থেকে ফিরে এলো, তখন কিছু ধন-মাল দিয়ে বললে ঃ এগুলো তোমাদের জন্যে। আর অপর কিছু ধন-মাল দেখিয়ে বললে ঃ এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। শুরুতে যথারীতি হামদ ও সানা পড়লেন। পরে বললেন ঃ অতঃপর কথা হচ্ছে, আমি তোমাদের

একজনকে একটা কাজের জন্যে নিযুক্ত করি সেই অধিকারের বলে যা আল্লাহ্ আমার ওপর অর্পণ করেছেন। লোকটি কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে বলে ঃ এ মাল তোমাদের জন্যে আর এ মাল আমাকে তোহ্ফা-হাদিয়া দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তার এ কথা সত্য হলে তার পিতামাতার ঘরে তার বসে থাকার পরও তার নিকট হাদিয়া তোহ্ফা আসতে থাকা উচিত। (কিন্তু তা তো হবার নয়।) আল্লাহ্র শপথ, তোমাদের কেউই তার হক ছাড়া কিছু গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন তাকে সেই জিনিস বহন করে নিয়ে এসে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। আমি সেই লোককে নিশ্চয়ই চিনব না যে আল্লাহ্র সম্মুখে উট বহন করে নিয়ে আসবে। আর উট চিৎকার করতে থাকবে। কেউ গাভী বহন করে নিয়ে আসবে, তা হাম্বা রব করতে থাকবে। অথবা কেউ একটা ছাগী নিয়ে আসবে, সেটিও মি, মি, করতে থাকবে। তারপর তিনি দুই হাত উপরে তুললেন এমনভাবে যে, তার দুই বগলের শ্বেত দৃশ্যমান হয়ে পড়ল। তিনি বলছিলেন ঃ হে আমাদের আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়েছি ? বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

যাকাত সংগ্রহকারীদের প্রতি নবী করীমের উপদেশ

যাকাত আদায়ে নিযুক্ত লোকদের প্রতি নবী করীম (স) বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে উপদেশ দিতেন, লোকদের প্রতি নম্র ব্যবহার, দয়া প্রদর্শন ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করার জন্যে তাগিদ সহকারে বলতেন। ওদিকে তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে বাছাই করা উত্তম লোকদেরই এই কাজে নিযুক্ত করতেন। কৃষি ফসল ও ফলের যাকাত সংগ্রহের জন্যে তিনি সাহাবীদের মধ্য থেকে সেই লোকদের নিযুক্ত করতেন যারা ফল যা ফসলের যাকাত-পরিমাণ অনুমান করে বলতে পারতেন অর্থাৎ ফল ও ফসল কাটাই মাড়াইর পূর্বেই আনুমানিকভাবে বলে দিতেন এতে এতটা ফসল হবে এবং তার যাকাত-পরিমাণ আনুমানিক এত। ইবনে আবদুল বার-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এরূপ আগম আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণের বড় ফায়দা হত, মালের মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর কোনরূপ যাকাত-বিরোধী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা। আনুমান করার পর তার চাইতে যদি কম হয় তাহলে সে কমতির দাবি অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হবে না। এতে করে ফকীর-মিসকীনের পাওনাটা নিশ্চিত হতে পারবে এবং যাকাত আদায়কারীর দাবি থাকবে পরিমিত পরিমাণের মধ্যে।

ফল-ফাক্ড়ার পরিমাণ অনুমান পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। নবী করীম (স) ফলের পরিমাণ অনুমান করার জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের বলেছিলেন ঃ পরিমাণটা কম করে ধর, কেননা ধন-মালের ক্ষেত্রে ওসিয়ত থাকে, ধার উদ্ধার থাকে, পড়ে যায় অনেক, পাখ-পাখালীরা অনেক খেয়ে যায়, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার ব্যাপার ঘটে। বস্তুত এটা হত নবী করীমের সাবধান ও সতর্কবাণী, যাকাতদাতাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখার জন্যে যাকাত আদায়কারীদের প্রতি এটা ছিল তাঁর শুভ আচরণ গ্রহণের আহ্বান। তাদের এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হত যে, ধন-মালের ওপর যাকাত ছাড়া আরও অনেক দাবি-দাওয়া থাকে। মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে

না, এর মধ্যে কোন কোন দাবি ব্যক্তি নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক বানিয়ে নেয়। কতগুলো স্বাভাবিক অবস্থার পরিণতিতে হয়ে থাকে।

মালের মালিকদের জন্যে দো'আ

বস্তুত যাকাত ধন-মালের মালিকরা দেয় স্বীয় আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রেরণায়। সে তা দিয়ে মহান আল্লাহ্র নিকট তা কবুল হোক, এটাই চায়। ঠিক এ কারণেই ফরয যাকাত ও সাধারণ কর এবং খাজনা-ট্যাক্স ইত্যাদির মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য হয়ে থাকে। যাকাত সংগ্রহকারীরা যাকাতদাতার জন্যে দো'আ করার জন্যে নির্দেশিত। কুরআনের আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধতা দিয়ে এবং তাদের জন্যে দো'আ কর। কেননা তোমার এই দো'আ তাদের জন্যে বিরাট সান্ত্বনার কারণ।'

আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট তাঁর নিজের ধন-মালের যাকাত নিয়ে উপস্থিত হল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আবূ আওফার বংশধরদের প্রতি পূর্ণ মাত্রার রহমত নাযিল কর।[১]

মুসলিম জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যতিব্যস্ত লোকদের কি যাকাত কাজের কর্মচারী মনে করা হবে

ইবনে রুশদ উল্লেখ করেছেন, ফিকাহ্‌বিদগণ যাকাত সংক্রান্ত কর্মচারীদের জন্যে তা থেকেই বেতন ভাতা গ্রহণ করা জায়েয; তারা ধনী হলেও সেই সাথে বিচারক এবং যাদের দ্বারা সাধারণ মুসলিম জনগণের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে, তাদের সকলের জন্যে যাকাত ফাণ্ড থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন।[২]

আবাজিয়া ফিকাহ্র কিতাব 'আন্ নাইল' এবং তার শরাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যাকাত দেয়া যাবে তার কাজে নিযুক্ত কর্মচারী এবং এই ধরনের অন্যান্য লোকদেরও যেমন বিচারক, প্রশাসক, মুফতি ও অন্যান্য যারা সামষ্টিক কাজে ব্যস্ত থাকে। এই মাসলাটার রায় ঠিক করা হয়েছে 'কর্মচারীদের' ওপর কিয়াস করে। অতএব তাদের দায়-দায়িত্ব, ব্যস্ততা ও ইসলামের দিক দিয়ে তাদের কাজের কল্যাণকামিতা অনুপাতে—তারা যদি ধনী লোক হয় তবুও। কেননা মুসলিম জনগণের কাজে একান্তভাবে ব্যস্ত থাকার কারণে তারা নিজেদের জন্যে আয় করার কাজে মনোনিবেশ করতে পারেনি।[৩]

কিন্তু সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণ এই লোকদিগকে যাকাত ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আয়—যা 'ফাই' বা খারাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত—থেকে বেতন দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে যাকাতের অন্যতম ব্যয় ক্ষেত্র 'ফী সাবীলিল্লাহ্'-এর পরিধি অধিকতর বিশাল ও বিস্তীর্ণ করে ধরে নেয়া হলে সেটা সম্ভব। তাতে প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজই অন্তর্ভুক্ত হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

---

১. আহমাদ, বুখারী, মুসলিম। ২.বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃ ঃ

৩. النيل وشرحه ج ٢ ص ١٣٤

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাদের মন সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন

এই পর্যায়ে সেই লোক গণ্য যাদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে, কিংবা ইসলামের ওপর তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে অথবা যাদের দুষ্কৃতি থেকে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করার জন্যে বা তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে তাদের আনুকূল্য লাভের আশায় অথবা মুসলমানদের শত্রুদের ওপর কোনরূপ বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য প্রয়োজনীয় বলে এদের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হবে, যাকাত ফাণ্ড থেকে তা করা যাবে।

এই খাতটির ফায়দা

এই খাতটি পূর্বে বলা কথাকে অধিকতর স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দেয় যে, যাকাত কোন ব্যক্তিগত দয়া-অনুগ্রহের ব্যাপার নয়। নিছক ইবাদতও নয় তা, যা শুধু ব্যক্তিগতভাবেই আদায় করলে চলবে। কেননা এই খাতটি সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে পালন পর্যায়ে নয়। আসলে তা রাষ্ট্রপ্রধানের কিংবা তার প্রতিনিধির করণীয় কিংবা জাতির কর্তৃত্বসম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তির পালনের ব্যাপার। এই লোকেরাই বুঝতে পারে, কোন্ লোকদের মন সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন কিংবা কাদের তা করতে হবে না। কাদের মন সন্তুষ্ট করতে হবে এবং সেজন্যে অর্থব্যয় করতে হবে ইসলামের অগ্রগতি ও মুসলিম জনগণের কল্যাণের জন্যে, তাদের গুণ-পরিচয় নির্ধারণ করাও তাদেরই করণীয়।

এই লোকদের কয়েকটি ভাগ

এ পর্যায়ের লোক যেমন কাফির সমাজের মধ্যে থাকবে, তেমনি থাকতে পারে মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের মধ্যেও ঃ

ক. যাকে অর্থ দিলে সে বা তার গোত্র বা বংশের লোকেরা ইসলাম কবুল করবে বলে আশা করা যায়, তারা এই পর্যায়ে গণ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (স) সাফওয়ান ইবনে ইমাইয়্যাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন এবং তার দাবি অনুযায়ী তার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণের জন্যে চারটি মাস সময় নির্ধারিণ করেছিলেন। পরে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুনাইন যুদ্ধকালে উপস্থিত হয়ে সে মুসলমানদের সাথে যোগদান করে, অথচ তখন পর্যন্ত সে ইসলাম কবুল করেনি। নবী করীম (স) এই যুদ্ধে যাত্রা করার পূর্বে তার অস্ত্রশস্ত্র ধার নিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে বিপুল সংখ্যক উট দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ এটা সেই দান যা পাওয়ার পর দারিদ্র্য সম্পর্কে কোন ভয় থাকে না। মুসলিম ও তিরমিযী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা

করেছেন, সাফওয়ান বলেছে ঃ নবী করীম (স) পূর্বে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে ক্রমাগতভাবে দান করেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে এই অব্যাহত দান পেয়ে পেয়ে এমন অবস্থা হলে যে, তিনিই হয়ে গেলেন আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।[১]

এই লোকটি পরে ইসলাম কবুল করে খুবই ভাল মুসলমান হয়েছিল।

ইমাম আহমাদ সহীহ্ সনদে হযরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) -এর নিকট ইসলামের নামে যা কিছু প্রার্থনা করা হত, তিনি তা অবশ্যই দান করতেন। এক ব্যক্তি এসে তাই প্রার্থনা করেছিল। নবী করীম (স) তাকে বহু সংখ্যক ছাগল দিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। এগুলো যাকাত ফাণ্ডের ছিল এবং উপত্যকায় পালিত হচ্ছিল। লোকটি এই ছাগলগুলোসহ যখন তার নিজের গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হল, বলল ঃ 'হে লোকেরা, তোমরা ইসলাম কবুল কর। কেননা মুহাম্মাদ (স) লোকদের এত বেশি দান করেন যে, অতঃপর আর দরিদ্র বা অনশনের ভয় করতে হয় না।'[২] এ দানও এই পর্যায়ে শামিল।

খ. যে লোকের দুষ্কৃতির ভয় করা হয়, তাকে টাকা-পয়সা দিলে তার দুষ্কৃতি এবং তার সাথে সাথে অন্যদের ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, তাকেও এই যাকাত থেকে দেয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, কতগুলো লোক নবী করীম (স)-এর নিকট বারে বারে আসত। তিনি যদি যাকাতের সম্পদ থেকে কিছু দিতেন, তাহলে তারা ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত। বলত, এ উত্তম দ্বীন। আর কিছু না দিলে তারা দোষ গেয়ে বেড়াত ও গালমন্দ বলতে শুরু করত। এই ধরনের লোকদেরও যাকাত ফাণ্ড থেকে দেয়া যায়।[৩]

গ. নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা (অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় বলে) তাদের আর্থিক সাহায্য করতে হয়। তবেই তারা ইসলামে স্থির ও অটল হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

'আল-মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'—শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা ইমাম জুহরীর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, যে ইয়াহুদী বা খৃস্টান ইসলাম কবুল করবে, সে-ই এর মধ্য গণ্য। জিজ্ঞেস করা হল, সে যদি ধনী লোক হয়? বললেন, সে যদি ধনী লোক হয়, তবুও তাকে এই ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেয়া যাবে।[৪] হাসান বলেছেন, যারা (নতুনভাবে) ইসলাম কবুল করবে, তারা সকলেই সাহায্য পাওয়ার অধিকারী।[৫]

কেননা নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি তার পূর্বতন ধর্ম ত্যাগ করেছে, তার পিতামাতা ও বংশ-পরিবারের নিকট তার প্রাপ্য ধন-মালের দাবিও প্রত্যাহার করেছে।

---

১. تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٦٥ ২. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٦٦

৩. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣١٣ ৪. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣١٤ المصنف

৫. لابى شيبة ٣ ص ٢٢٢ الاكليل للسيوطى ص ١٤٩ المصنف الابى شيبة

তার বংশের বহু লোকই তার সাথে শত্রুতা করতে শুরু করে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে তার জীবিকার সব পথ ও উপায় বন্ধ বা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরূপ দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগকারী ও আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে বিক্রয়কারী ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিকট থেকে বিপুল উৎসাহ ও সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ঘ. মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ও কর্তা ব্যক্তিদের পক্ষে অনেক কাজের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা এবং চিন্তার আদান-প্রদান করার সুযোগ ঘটে। অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে। এই সময় তারা যদি তাদের কিছু দান করে, তাতে তারা ইসলামের প্রতি খুবই আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) আদী ইবনে হাতেম ও জারকার ইবনে বদরকে অনেক দান-উপঢৌকনে ধন্য করে দিয়েছিলেন। তাদের নিজ জাতির লোকদের নিকট তাদের উচ্চতর মর্যাদার কারণে ইসলামের প্রতি তাদের আচণ খুবই উত্তম ছিল।[১]

ঙ. দুর্বল ঈমানের নেতৃস্থানীয় মুসলমানরাও এই শ্রেণীভুক্ত। তারা জনগণের নিকট অনুসৃত, তাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তাদেরকে অর্থদান করা হলে তারা ইসলামে স্থিত থাকবে, তাদের ঈমান দৃঢ় ও শক্তিশালী হবে এবং কাফিরদের সাথে জিহাদে তাদের নিকট থেকে মূল্যবান আনুকূল্য পাওয়া যাবে বলে খুবই আশা করা যায়। নবী করীম (স) সামাজের এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'হাওয়াজিন' যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল থেকে বিপুল পরিমাণ দান করেছিলেন। এরাই মক্কার সেসব লোক ছিল, যাদেরকে নবী করীম (স) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। পরে তারা খুবই পাক্কা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, যদিও পূর্বে তারা হয় মুনাফিক, না হয় দুর্বল ঈমানের লোক ছিল। পরবর্তীকালে ইসলামী আদর্শ পালনে তাদের দৃঢ়তা আদর্শস্থানীয় হয়েছিল।[২]

চ. অনেক মুসলমান শত্রুদেশের সীমান্তে একেবারে মুখের কাছে অবস্থিত থাকে। শত্রুদের আক্রমণ হলে তারা প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে। এদেরকেও যাকাত ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেয়া যেতে পারে।

ছ. অনেক মুসলমান সমাজে এমন প্রভাবশালী হয়ে থাকে যে, তাদের বাস্তব সহযোগিতা না হলে—তারা প্রভাব বিস্তার না করলে ও চাপ সৃষ্টি না করলে—যাকাত সংগ্রহ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় সেজন্যে যুদ্ধ করার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। এই কারণে তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখে তাদেরকে সরকারের সহযোগী ও সাহায্যকারী বানিয়ে রেখে কাজ করা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তা করা দুটো মারাত্মক কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কাজ, দুটো কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কল্যাণ পথ। এই কাজটি আংশিক হলেও অনেক সময় সাধারণের জন্যে অধিক কল্যাণের কারণ হতে পারে।[৩]

---

১. تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٧٩ ২. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٧٤

৩. غاية المنتهى ج ٢ ص ١٤١؛ المجموع ج ٦ ص ١٩٦

এই সকল পর্যায়ের লোকেরা اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ।-এর অন্তর্ভুক্ত—তারা কাফির হোক, কি মুসলিম।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যারা ইসলামে দাখিল হল তারাই এর মধ্যে গণ্য হবে। কোন মুশরিক ব্যক্তির হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে যাকাত ফাণ্ড থেকে দেয়া যাবে না। কেউ যদি বলে যে, খোদ নবী করীম (স) হুনাইন যুদ্ধের বছর কোন কোন মুশরিকের হৃদয় সন্তুষ্ট করার জন্যে দান করেছেন, তাহলে আমি বলব, হ্যাঁ, তা দেয়া হয়েছিল 'ফাই' সম্পদ থেকে, বিশেষভাবে নবী করীম (স)-এর জন্যে নির্দিষ্ট অংশ থেকে, যাকাত থেকে নয়।

ইমাম শাফেয়ী এই বলে দলীলের ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যাকাত তাদের মধ্যেই বন্টন করে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন, দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের দেয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নি।[১] তিনি হযরত মুয়ায বর্ণিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'যাকাত মুসলমানদের ধনী লোকদের নিকট থেকে নেয়া হবে এবং তাদের মধ্যকার ফকীরদের মধ্যে বন্টন করা হবে।'

ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে ওয়াহিদী থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হৃদয় সন্তুষ্ট বা আকৃষ্ট করার কাজ থেকে মুসলমানকে রক্ষা করেছেন। মুসলিম রাষ্ট্রনেতা যদি মনে করেন, কোন কল্যাণের জন্যে—যার ফায়দাটা মুসলমানরাই পাবে—যেমন তারা যদি মুসলিম হয়ে যায়, তা হলে যাকাত ফাণ্ড থেকে কাফির মুশরিকদের অর্থ সাহায্য দেয়া যাবে। কিন্তু কোন মুশরিকের জন্যে যাকাতের মাল ব্যয় করার দরকার হলে তা 'ফাই' সম্পদ থেকে করতে হবে, যাকাত থেকে নয়।।

শেষে তিনি লিখেছেন, ওয়াহিদীর এই কথা—আল্লাহ্ মুশরিকদের হৃদয় সন্তুষ্ট করার ঝামেলা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছেন—এই ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, অনেক সময় সন্দেহ হয়, নবী করীম (স) যাকাতেরই একটা অংশ মুশরিকদের দিয়েছেন। কিন্তু তা কখনই প্রমাণ করা যাবে না। আয়াতটিতেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না যা থেকে বোঝা যাবে যে, আল্-মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' বলে বুঝি মুশরিকদেরই বুঝিয়েছেন। বরং এ কথার মধ্যে সাধারণভাবেই মুসলিম-অমুসলিম সব শ্রেণীর লোকই শামিল রয়েছে।

কাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা পাওয়া গেছে, 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' কথাটি এক শ্রেণীর মরু বেদুঈন লোক বোঝায়। সেই সাথে তাদের ছাড়াও লোকজন ছিল, যাদের হৃদয় নবী করীম (স) সন্তুষ্ট করেছেন দানের সাহায্যে, যেন পরবর্তীকালে তারা ইসলাম কবুল করে।

হযরত আনাস বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেছে, নবী করীম (স) যে ব্যক্তিকে যাকাত বাবদ আদায়কৃত ছাগল দিয়েছিলেন, সেই লোকটি নিজের গোত্রের লোকদের সম্বোধন

১। الأم ج ٢ ص ٦١.

করে বলেছিলেন, 'হে লোকেরা, ইসলাম কবুল কর। কেননা মুহাম্মাদ (স) এমন দান করেন যে, তারপর আর অভুক্ত থাকার কোন আশংকাই থাকে না।' এ থেকে মনে হয়, দান পাওয়ার সময় সে মুসলিম ছিল না।

বস্তুত কোন কাফির ব্যক্তির অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার বা তার অন্তরে ইসলামের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দেয়া যাকাত থেকে কাফিরকে দান করা খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কেননা—ইমাম কুরতুবী যেমন বলেছেন—এটাও এক প্রকারের জিহাদ। কেননা মুশরিকরা তিন প্রকারের। এক প্রকারের মুশরিক লোক অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেয়ে শিরক ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করতে পারে। আর এক প্রকারের মুশরিক বল প্রয়োগ ও শক্তি বিনিয়োগের ফলে ইসলাম কবুল করবে। আর এক প্রকারে মুশরিক দান ও অনুগ্রহের বশবর্তী হয়ে ইসলাম কবুল করতে পারে। আর ইসলামী রাষ্ট্রকর্তা সচেতন থেকে সর্বদিকে নজর রেখে এসব শ্রেণীর মুশরিকদের ওপর অর্থ ব্যয় করতে পারবে, যার পরিণতিতে তারা কুফরি ও শিরক থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং এই অর্থ ব্যয়ই তার কারণ হবে।[১]

রাসূলের ইন্তেকালের পর এই খাতটি কি পরিত্যক্ত

ইমাম আহমাদ এবং তাঁর সঙ্গিগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাত ব্যয়ের কুরআন নির্দেশিত এই খাত—'আল-মুল্লাফাতু কুলুবুহুম'—যথাপূর্ব কার্যকর আছে, তা বাতিল বা মনসূখ হয়ে যায়নি, তাতে কোনরূপ পরিবর্তনও আনা হয়নি। ইমাম জুহরী এবং আবূ জাফর আল-বাকেরও এই মতই প্রকাশ করেছেন। এই শেষোক্ত মতটি জাফরী ও জায়দীয়া মাযহাবের।[২]

ইউনুস বলেছেন, ইমাম জুহরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এটা মনসূখ হওয়ার কোন কথাই আমার জানা নেই।

আবূ জাফর আন-নুহাম বলেছেন, তার অর্থ, এই খাতটি পুরোপুরি সক্রিয় এবং কার্যকর রয়েছে। এ কালেও কারুর মন সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং তার থেকে মুসলমানদের কোন ক্ষতি বা বিপদ হওয়ার আশংকা থাকলে অথবা উত্তরকালে তার ভাল মুসলিম হওয়ার আশা করা গেলে তাকে এই ফাণ্ড থেকে দেয়া যাবে।

কুরতুবী মালিকী মাযহাবের কাযী আবদুল ওহাবের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'কোন কোন সময় প্রয়োজন দেখা দিলে তোমরা তা দাও।'

কাযী ইবনুল আরাবী বলেছেন, 'আমার মত হচ্ছে, ইসলাম শক্তিশালী হলে এই খাতে আর অর্থ ব্যয় করা যাবে না। তবে এই খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা দেয়া যাবে, যেমন নবী করীম (স) নিজে তা দিতেন। কেননা সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে, আবার অপরিচিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে—যেমন শুরু হয়েছিল।'

---

১. تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٧٩

২. البحر ج ٢ ص ١٧٩؛ شرح الازهار ج ١ص ٥١٢

'নাইল' কিতাবে এবং তার শরাহ্ গ্রন্থে আবাজীয়া ফিকাহ্র মত লিখিত হয়েছে : 'আমাদের মতে এই খাতটি পরিত্যক্ত থাকবে যদ্দিন ইসলামী রাষ্ট্রকর্তা শক্তিশালী থাকবে ও এই লোকদের কিছু দেয়ার প্রয়োজন থাকবে না----- প্রয়োজনে এই খাতে ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে, মুসলিম সমাজকে তাদের শত্রুভাবাপন্ন লোকদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করার জন্যে; কিংবা কোন সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে।'

তাবারী হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এ কালে এমন কেউ নেই, যার হৃদয় সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন হতে পারে।[১] আমের আশ্-শা'বী বলেছেন, 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' কার্যকর ছিল রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে। পরে যখন হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হল তখন এই 'ঘুষের ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে গেল।'[২]

ইমাম নববী ইমাম শাফেয়ীর মত উদ্ধৃত করেছেন—তা হল কাফিরদের মনস্তুষ্টির জন্যে অর্থ ব্যয় করার অনুমতি হলেও তা করা হবে 'ফাই'(রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের) সম্পদ থেকে কল্যাণের কাজের জন্যে, যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। কেননা যাকাতে কাফিরদের কোন অধিকার বা হক স্বীকার করা হয়নি।

আর মুসলমানদের মধ্যে যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেবে, তাদেরকে নবী করীম (স)-এর দেয়ার ব্যাপারে তাঁর দুটো কথা রয়েছে। প্রথম কথা দেয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে শক্তিশালী বানিয়ে দিয়েছেন বলে টাকা-পয়সা দিয়ে লোকদের মন জয় করার প্রয়োজন থাকেনি। এবং দ্বিতীয় কথা, দেয়া যাবে। কেননা যে ধরনের লোকদের আগে দেয়া হয়েছে, নবী করীম (স)-এর পরও সেই ধরনের লোক থাকতে পারে। যদি দেয়া হয়, তাহলে কোথেকে—কোন ফাণ্ড থেকে দেয়া হবে?

এখানেও তাঁর দুটো মত জানা গেছে। একটি মতে বলা হয়েছে, যাকাতের ফণ্ড থেকে দেয়া হবে। কেননা কুরআনের আয়াতে তাই রয়েছে। আর দ্বিতীয় মত, 'ফাই' সম্পদের কল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে দিতে হবে। কেননা এরূপ অবস্থায় তাদের জন্যে অর্থ ব্যয় করা গোটা মুসলিম সমাজেরই কল্যাণ সাধন।[৩]

মালিকী মাযহাবের দুটো মত জানা গেছে। একটি মত, এই খাতটাই ছিন্ন হয়ে গেছে ইসলামের শক্তিশালী হওয়া ও পূর্ণত্ব প্রকাশ পাওয়ার দরুন। আর অপর মত অনুযায়ী, এই খাতটি অবশিষ্ট আছে। কাযী আবদুল ওহাব ও কাযী ইবনুল আরাবীর মত ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

'খলীল' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ খাতটি কার্যকর আছে, এটি মনসূখ হয়ে যায়নি। কেননা যাকাত দেয়ার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা,

---

১. تفسير الطبرى ج ١٤ص ٣١٥ ২. تفسير الطبرى ج ١٤ ص ٣١٥

৩. المهذب وشرحه للنووى ج ٦ ص ١٩٧

৪. تفسير القرطبى معالسنن ج ٢ ص ٢٣١

তাদের কোন সাহায্য লাভ করা নয়। শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিস্তীর্ণ হয়ে পড়লে তখন তা শেষ হয়ে যাবে। মতের এ পার্থক্য হচ্ছে এই কথায় যে, যার সন্তুষ্টির জন্যে টাকা দেয়া হবে সে লোকটি কাফির। তাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী বানাবার উদ্দেশ্যে দেয়া হবে। ইবনে হুবাইবও এই মত দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা, সে ব্যক্তি মুসলিম হবে। খুব অল্প সময় হয়েছে, সে ইসলাম কবুল করেছে। তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে, যেন সে ইসলামের ওপর দৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় এ খাতটি অবশ্যই কার্যকর মনে করতে হবে। তাতে কোন দ্বিমতের স্থান নেই।[১]

জমহুর হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের বক্তব্য হল, এ খাতের অংশটি মনসূখ হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। নবী করীম (স)-এর পর এ পর্যায়ে কোন জিনিসই দেয়া হয়নি, এখনও এ পর্যায়ে কোন কিছুই দেয়া যাবে না।

'বাদায়ে-ওয়াস-সানায়ে' গ্রন্থে এ মতটিকে সহীহ্ বলা হয়েছে। যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে যাকাত থেকে কাউকে কিছুই দেন নি। কোন সাহাবীও তাঁদের এই না দেয়ার কাজের প্রতিবাদ করেন নি। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর এই শ্রেণীর লোকেরা হযরত আবূ বকরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের অংশ চাইলে তিনি একখানি সরকারী পত্র লিখে দিলেন তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দেয়ার জন্যে। পরে তারাই হযরত উমরের নিকট এসে সেই পত্র দেখিয়ে তাদের প্রাপ্য চাইলে তিনি তাদের নিকট থেকে পত্রটি নিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। বললেন ঃ রাসূলে করীম (স) তোমাদের দিতেন তোমাদের হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী বানানোর জন্যে। কিন্তু এক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি ইসলামে স্থিত থাক তো ভাল নতুবা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে তরবারিই মীমাংসা করে দেবে, তারা আবার হযরত আবূ বকরের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, 'খলিফাতুল মুসলিমীন' আপনি, না উমর ?'..... বললেন, হ্যাঁ সেও হবে আল্লাহ্ চাইলে, তিনি তাদের কথার প্রতিবাদ করলেন না, পরে সাধারণ সাহাবীদের মধ্যে কথাটি প্রচারিত হয়ে পড়ে। তারাও এ ব্যাপারে কোন উচ্চ-বাচ্য করলেন না। তাহলে দেখা গেল, এ খাতটির অকেজো হয়ে পড়ার ব্যাপারে সমস্ত সাহাবীই একমত এবং এ মতেই ইজ্‌মা হয়ে গেছে, মনে করতে হবে।

তাছাড়া এ কথা তো সর্বসম্মত যে, নবী করীম (স) তাদেরকে দিতেন ইসলামের ব্যাপারে তাদের মন তুষ্ট করার জন্যে। আল্লাহ্ এজন্যেই নাম দিয়েছেন 'আল-মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'। তখনকার সময়ে ইসলাম শক্তিশালী ছিল না। মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। আর ওরা ছিল সংখ্যায় বিপুল এবং শক্তিশালী। আল্লাহ্‌র শোকর, আজকের দিনে ইসলাম অনেক শক্তিশালী। তাদের সংখ্যাও অনেক। তাদের শক্তি-সামর্থ্যও কম নয়—ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। মুশরিকরা বরং অনেক হীন ও লাঞ্ছিত। এই বিধানটি যখন বিশেষ অর্থে যুক্তিসঙ্গত, তখন সেই বিশেষ অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে বিধানটিও থাকতে পারে না।[২]

---

১. حاشيه الصاوى على بلغه السالك ج ا ص ٢٣٢

২. بدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٥

'বাদায়ে-ওয়াস্-সানায়ে' গ্রন্থে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সার হচ্ছে দুটি কথা।

একটি এই যে, বিধানটি মনসূখ হয়ে গেছে। সাহাবীদের ইজমাই এটিকে মনসূখ করেছে।

দ্বিতীয়টি এই যে, সন্তুষ্টির জন্যে অর্থ ব্যয়ের নির্দেশটি ছিল একটি বিশেষ অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ। আর তা হচ্ছে এরূপ কাজের প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক প্রসারতা ও প্রাধান্য লাভের দরুন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তার অর্থ, একটা কারণের দরুন একটা কাজের হুকুম দেয়া হলে সেই কারণটি যখন থাকবে না, তখন হুকুমটিও বাতিল হয়ে যাবে। তাই যে কারণে এই লোকদের যাকাতের অর্থ দেয়া হত, সেই কারণটি যখন থাকল না—দেয়ার বিধান করা হয়েছিল দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী বানানোর জন্যে, এক্ষণে তা অর্জিত হয়েছে। কাজেই তখন সেই হুকুম অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

মনসূখ হওয়ার দাবি অগ্রহণযোগ্য

সত্য কথা, উপরিউক্ত দুটো কথাই অসত্য। কেননা একে তো আয়াতটি মনসূখ হয়নি এবং দ্বিতীয়ত মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়োজন কিছুমাত্র ফুরিয়ে যায়নি।

হযরত উমরের উপরিউক্ত কথার ভিত্তিতে এ কথা মনে করা 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' খাতটি বুঝি সম্পূর্ণ মনসূখ হয়ে গেছে, আদৌ ঠিক নয়। কেননা আসলে সেটা কোন দলীল নয়। তিনি তাঁর কথার দ্বারা নবী করীম (স)-এর সময়ে এক শ্রেণীর লোকদের যাকাত দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হত, তাদের প্রতি এই খাতটি নিষিদ্ধ ও অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করেছেন মাত্র। তিনি মনে করেছেন, এদেরকে যাকাত দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার আর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এক্ষণে আল্লাহ্ ইসলামকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। এদের ওপর নির্ভরশীলতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি যা বলেছেন, তাতে তিনি প্রকৃত সত্যকে একবিন্দু অতিক্রম করে যান নি। কেননা সন্তুষ্ট রাখার কাজটি কোন সদাসক্রিয়, প্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। এককালে যাদের এ খাত থেকে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হত, চিরদিন তাদের সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে এমন কোন কথা নেই। সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্ধারণ করা সাম্প্রতিক রাষ্ট্র পরিচালকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামের উন্নতি ও মুসলমানদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার পরিমাণ নির্ধারণও তারই কাজ।

ফিকাহ্র মৌল নীতি বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বিশেষ একটা হুকুমকে এমন একটা গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া যা অপর একটি অবস্থা থেকে নিঃসৃত, যা ঐ নিঃসৃতির কারণের সাথে জড়িত। এখানে যাকাত ব্যয়ের কাজটি জড়িত করা হয়েছে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'-এর সাথে। তা থেকে বোঝা গেল যে, মনস্তুষ্টি সাধন 'কারণ' বা 'ইল্লাত' হচ্ছে যাকাত ব্যয়ের। তাই এ কারণটি যখন পাওয়া যাবে—সে কারণ হল মন সন্তুষ্ট রাখার মত লোক থাকা—তখন তাদের অবশ্যই তা দেয়া হবে। আর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে দেয়া হবে না।

কারুর মন সন্তুষ্ট রাখার জন্য যাকাতের অর্থ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার কার ? প্রথমত তা মুসলিম রাষ্ট্রকর্তার। কেননা সে-ই মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাজ করার অধিকারী এবং দায়িত্বশীল। কাউকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য টাকা দেয়া—পূর্ববর্তী শাসকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেয়া হত, পরে তা বন্ধ করা—এসব কিছুর ইখ্‌তিয়ার তারই। কোন শাসকের আমলে এ রকমের লোক থাকার দরুন একবার দেয়ার সিদ্ধান্ত করা, আবার যখন সে রকমের লোক থাকবে না বা তার প্রয়োজনও হবে না, তখন তা না দেয়া তার ইচ্ছাধীন। কেননা এগুলো ইজতিহাদী ব্যাপার, যা কাল, স্থান ও অবস্থার তারতম্যের কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। হযরত উমর যখন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন তিনি কুরআনের অকাট্য দলিলকে অকেজো করে দেন নি, শরীয়াতের কোন বিধানকে মন্‌সূখও করেন নি। কেননা যাকাত আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী আটটি খাতে বণ্টন করা হবে যখন প্রত্যেকটি খাত পাওয়া যাবে। যখন যে খাতের লোক পাওয়া যাবে না, তখন তার অংশ মুলতবি হয়ে গেছে মনে করতে হবে। কিন্তু তখন এ কথা বলা যাবে না যে, এ অংশটি রহিত করে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধানকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বলা যাবে না যে, তা মন্‌সূখ করা হয়ে গেছে।

'যাকাতের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী' একটা খাত। ইসলামী হুকুমত না থাকলে এ খাতটিও থাকবে না। কেননা যাকাতের জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করা ইসলামী হুকুমতের কাজ ও দায়িত্ব। তাই যখন তা পাওয়া যাবে না, তখন যাকাত জমাও করা হবে এবং পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বণ্টনও করা হবে। এ কাজে যারা দায়িত্বশীল হবে, তাদেরও মাসিক বেতন দেয়া হবে। কিন্তু ঠিক العاملين عليها। বলে যে খাতটির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অংশ প্রত্যাহার করা হবে।

যেমন—في الرقاب। বলে যাকাত ব্যায়র যে খাতের কথা বলা হয়েছে, যদি তা না পাওয়া যায়—যেমন বর্তমান কালে দাস প্রথার অস্তিত্ব নেই—তা হলে এ খাতটি মুলতবী মনে করতে হবে। এ মূলতবী করার অর্থ নিশ্চয়ই এই হবে না যে, কুরআনের আয়াত মন্‌সূখ করা হয়েছে কিংবা একটা বিধানকে অকজো করে দেয়া হয়েছে।[১]

---

১. এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, সমসাময়িক কালের যেসব লোক বলেন যে, কুরআনের বিধান অকেজো করা এবং প্রয়োজন দেখা দিলে তার বিরোধিতা করা জায়েয এবং হযরত উমরের মুয়াল্লাফাতুল কুলুব সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করা সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। সাবহী মাখমাবানী তার فلسفة التشريع। গ্রন্থ ১৭৮ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন যে, শরীয়াতী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বা মুসলিম জনগণের কল্যাণ চিন্তায় কুরআনের অকাট্য দলিলের বিরোধিতা করতে হযরত উমর দ্বিধা করেন নি—একটু বিলম্বও করেন নি। আর তার দলিল হিসেবে তিনি 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' সংক্রান্ত পদক্ষেপের উল্লেখ করেছেন। তার এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। উস্তাদ মাহমুদ আল-লাবাবিদী 'রিসালাতুল ইসলাম' নামক কায়রো থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ৮। السلطة التشريعية في الاسلام। শীর্ষক এক প্রবন্ধে দাবি করেছেন যে, 'জাতি' তার সার্বভৌমত্ব নিঃসৃত শূরার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে কুরআনের কোন কোন অকাট্য দলীলকে অকেজো করে রাখা বা তার বিরোধিতা করার অধিকারী যদি তারা তাতেই কল্যাণ নিহিত বলে মনে করে। এবং এই মতের স্বপক্ষে হযরত উমরের কথিত পদক্ষেপকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এটাও সম্পূর্ণ ভুল কথা। জামে আজহারের

এ থেকে স্পষ্ট হল যে, হযরত উমর যা করেছেন, তা 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'কে যাকাত দেয়ার নির্দেশকে কোন না কোন কারণ দর্শিয়ে বাতিল বা মনসূখ করে দেয়ার কাজ নয়, তার ওপর 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হওয়া তো অনেক দূরের কথা। হাসান, শা'বী প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদও বলেছেন ঃ আজকের দিনে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' নেই। কোন অবস্থায়ই কুরআনের হুকুম মনসূখ করার কথা বলা হয়নি; বরং সেকালের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে মাত্র।

'মনসূখ করা' কাকে বলে ? আল্লাহ্‌র শরীয়াতের কোন বিধানকে যদি বাতিল করা হয়—বলা হয় এই কাজটা করা হবে না, তাহলে মনসূখ করা বোঝায়। আর যে সত্তা বা সংস্থা আইন প্রণয়ন করে, সে-ই তা মনসূখ বা বাতিল করতে পারে, অন্য কেউ তা পারে না। ইসলামে আইন প্রণয়নকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি রাসূলের প্রতি অহী নাযিল করার পন্থায় এই কাজটি করেছেন। কাজেই কোন বিধান মনসূখ হতে পারে রাসূলে করীমের জীবদ্দশায় ও অহী নাযিল হওয়া কালে। আর তা আসল আইন প্রণয়নকারীর নিজের ঘোষণা থেকেই জানা যেতে হবে। অথবা দুটো কুরআনী বিধানের মধ্যে যদি চূড়ান্ত মাত্রার পারস্পরিক বিরোধিতা বা বৈপরীত্য দেখা দেয় এবং একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার মত অবস্থাও না থাকে—দুটো বিধানের ইতিহাসও যদি জানা থাকে, ঠিক তখনই বলা যাবে যে, শেষের হুকুমটি আগের হুকুমটিকে মনসূখ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে কি সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে ? এখানে কুরআনের বা সুন্নাতের কোন বিধান কি 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' বিধানটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ? না, তা হয়নি। শুধু তা-ই নয়। এখানে মনসূখ হওয়ার কোন দলিল আদৌ নেই। উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবে এই দৃঢ় নেতিবাচক কথাই বলা যেতে পারে। তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি সুস্পষ্ট আয়াত প্রদত্ত হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে বলে কি করে দাবি করা যেতে পারে ? রিসালাতের আমলে তো এই নীতি অনুযায়ী কাজ হয়েছে। সেই আমল নিঃশেষে অতীত হয়ে যাওয়ার পর এখন মনসূখ হওয়ার কথা কোনক্রমেই বলা যেতে পারে না।

এ অবস্থাকে সামনে রেখেই ইমাম শাতেবী বলেছেন ঃ শরীয়াত পালনে বাধ্য ব্যক্তির শরীয়াতের আইন কার্যকর হওয়ার পর উহার মনসূখ হয়ে যাওয়ার দাবি কেবলমাত্র প্রমাণিত দলিলের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে। কেননা তা আগেই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শরীয়াত পালনকারী তা পালনও করেছে। কাজেই প্রমাণিত ও কার্যকর হওয়ার কথা জেনে নেয়ার পর তার প্রত্যাহৃত হওয়ার কথা অনুরূপ জ্ঞানের ভিত্তিতেই মেনে নেয়া যেতে পারে। এ কারণে বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়ে বলেছেন, 'খবরে ওয়াহিদ'(হাদীস) কুরআনকে মনসূখ করতে পারে না, পারে না 'মুতাওয়াতির' হাদীস তা মনসূখ করতে। কেননা তা পারলে নিছক অনুমানভিত্তিক কথার বলে 'অকাট্য নিশ্চিত কথা'কে প্রত্যাহার করা শামিল হবে।[১]

আলিমগণ এই মতের প্রতিবাদ করেছেন। মরহুম শেয়খ মুহাম্মাদুল মাদানীও তার এক রচনায় উপরিউক্ত মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

১. الموافقات ج ٣ ص ٦٤

'খবরে ওয়াহিদ' যখন কুরআনকে মনসূখ করতে পারে না—যদিও তা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত, তখন একজন সাহাবীর কথা বা আমলের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কুরআনের আয়াত মনসূখ হওয়ার কথা আমরা কি করে বলতে পারি ?.... একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, হযরত উমরের উপরিউক্ত কথাকে 'মনসূখ' করার অর্থে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। শাতেবীর পূর্বে ইবনে হাজম বলেছেন, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কোন বিষয় সম্পর্কে তা মনসূখ হয়ে গেছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া দাবি করা আদৌ হালাল বা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَمَاأَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আনুগত্য ও অনুসরণ করা হবে—এ উদ্দেশ্যেই আমরা রাসূল পাঠিয়েছি।[১]

বলেছেন ঃ اِتَّبِعُوْا مَاأُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ -

তোমরা মেনে চল তা, যা তোমাদের আল্লাহ্র নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।[২]

অর্থাৎ আল্লাহ্ কুরআনে কিংবা নবীর জবানীতে যা কিছুই নাযিল করেছেন, তা সবই মেনে চলা ফরয। কেউ যদি তার কোন জিনিস মনসূখ হয়েছে বলে দাবি করে, তাহলে সে সেই বিধান না মানাকে নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিচ্ছে, তা পালনের বাধ্যবাধকতাকে সে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করছে। বস্তুত এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র নাফরমানী ও সুস্পষ্ট আল্লাহ্দ্রোহিতা। তবে কেউ যদি তার এ ধরনের কথা যথার্থতা প্রমাণের পক্ষে অকাট্য দলিল পেশ করতে পারে, তবে তার কথা নিশ্চয়ই বিবেচ্য হবে। অন্যথায় সে অহংকারী দাম্ভিক ও বাতিলপন্থী প্রমাণিত হবে। এই যা কিছু বলা হল তার বিপরীত কথা যদি কেউ নিয়ে আসে, তাহলে তার কথার তাৎপর্য হবে আল্লাহ প্রদত্ত সমগ্র শরীয়াতকে অকেজো করে দেয়া। কেননা কোন আয়াত বা হাদীস মনসূখ হয়েছে বলে কারুর দাবি করা ও অপর ব্যক্তির অপর কোন আয়াত বা হাদীস মনসূখ হয়েছে বলে দাবি করার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ, এ রূপ অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্র কোন বিধানই সহীহ্ অবস্থায় থাকতে পারবে না। আর তাকেই বলা হয় 'ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া'। উপরন্তু যা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রমাণিত তা অনুমানের সাহায্যে বাতিল করা যেতে পারে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তার মনসূখ হওয়ার কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত—যাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকবে না—সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে না।[৩]

তাহলে এক্ষণে যথার্থ সহীহ্ কথা হচ্ছে, যাকাত বণ্টনের খাত হিসেবে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' খাতটি যথাযথভাবে বর্তমান এবং কার্যকর রয়েছে। তা মনসূখ হয়ে যায়নি,

---

১. النساء – ٦٤ ২. الاعراف – ٣ ৩. الاحكام فى اصول الاحلام ١ ص ٤٥٨

অকেজো করেও রাখা হয়নি। সূরা তওবার আয়াত তা সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে।

আর কুরআনের সর্বশেষ সূরাই হচ্ছে এই সূরাটি। আবূ উবাইদ বলেছেন, এতদ্‌সংক্রান্ত আয়াতটি সুদৃঢ়। তার মনসূখ হওয়া সম্পর্কে কোন কথাই কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে জানা যায়নি।

তাই কোন জাতির লোকজনের অবস্থা যদি এই হয়—ইসলামে কোন আল্লাহ নেই শুধু কিছু পাওয়ার লোভ ছাড়া, আর তাদের মুরতাদ হয়ে যাওয়া ও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিণামে যদি ইসলামের ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়—যদি তাদের দরুন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয় ও প্রতিরোধ মজবুত হয় এবং রাষ্ট্রনেতা তাদেরকে যাকাত ফাণ্ডের কিছু অর্থ বা সামগ্রী দেয়া ভালো মনে করে, তাহলে তার পক্ষে তা করা সম্পূর্ণ জায়েয হবে তিনটি কারণে ঃ

একটি, তাতে কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল হবে।

দ্বিতীয়, মুসলমানের স্থিতি লাভ হবে। এবং

তৃতীয়, তাদের প্রতি কোন নৈরাশ্য দেখা দেবে না, তারা ইসলামে দাঁড়িয়ে থাকলে ইসলামের উপলব্ধি অর্জন করতে পারবে ও ইসলামের প্রতি তাদের উত্তম আগ্রহও হবে।[১]

ইবনে কুদামাহ্ 'আল মুগনী' গ্রন্থে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত হিসেবে এই খাতটির স্থায়ী, অপরিবর্তিত ও কার্যকর থাকার হাম্বলী মাযহাবের মত সমর্থন প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'আমাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত। আল্লাহ যাদের জন্যে যাকাত নির্ধারণ করেছেন তাদের মধ্যেই 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'দের কথাও বলেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন, 'আল্লাহ্ই যাকাত পর্যায়ে বিধান দিয়েছেন, তার আটটি অংশ নির্দিষ্ট করেছেন।' বহু কয়টি সর্বজনবিদিত হাদীসে 'আল মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' এর কথা উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত তা পুরোমাত্রায় কার্যকর ছিল। আর আল্লাহ ও রাসূলের কোন বিধান মনসূখ না হওয়া পর্যন্ত তা পালন ত্যাগ করা যেতে পারে না। সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে কোন কিছুর মনসূখ হওয়া কোনক্রমেই প্রমাণিত হতে পারে না।

উপরন্তু শরীয়াতের কোন কিছুর মনসূখ হওয়া সম্ভব ছিল নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়। কেননা সে জন্যে অকাট্য দলীলের প্রয়োজন। কিন্তু নবীর ইন্তেকালের পর এ ধরনের অকাট্য দলীল কোথাও পাওয়া যেতে পারে না। অহীর নাযিলকাল শেষ হওয়ার পর সে দলীল কোত্থেকে আসবে? তাছাড়া কুরআনের আয়াত কুরআন দ্বারাই মনসূখ হতে পারে। কিন্তু কুরআনের উক্ত আয়াতটির মনসূখ হওয়ার কোন কথা নেই। হাদীসেও কিছু নেই। তা হলে শুধু কিছু লোকের মত, জোর-জবরদস্তি কিংবা কোন সাহাবীর কথার দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহর বিধান কেমন করে তরক করা যেতে পারে?

---

১. الاموال ص ۲۰۷

সাহাবীদের কথা এমন দলিলও নয় যদ্দারা 'কিয়াস' পরিহার করা যেতে পারে। তাহলে এই লোকেরা কুরআন ও সুন্নাহ কেমন করে পরিহার করতে পারে একজন সাহাবীর কথার ভিত্তিতে ?

ইমাম জুহরী বলেছেন, 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' মনসূখ হওয়ার কোন কথাই আমার জানা নেই।[১]

তবে যে তাৎপর্যের কথা ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, তা এবং কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা তাদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা এই হুকুমটির মুলতবী হওয়া জরুরী করে না। আর কেবলমাত্র তখনই এই খাতে দেয়া বন্ধ করা যেতে পারে, যখন তাদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা দূর হয়ে যাবে। অতএব যখনই তাদেরকে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে, তাদের দিতে হবে। যাকাতের অন্যান্য খাত সম্পর্কেও এই কথা। সে কয়টির মধ্যে কোন একটি খাতের প্রয়োজন কোন সময় ফুরিয়ে গেলে ঠিক সেই সময়ের

---

১. 'আল-মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' বিধানটি মনসূখ হয়েছে অথচ তা অকাট্য কুরআনী দলীল দ্বারা প্রমাণিত—হানাফীদের এই মতে কে মনসূখ করল, তাই নিয়ে তাদের মধ্যেই মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ দাবি করেছেন, এ বিষয়ে 'ইজমা' হয়েছে। হযরত উমর তাঁর আমলে এই খাতটি 'অকেজো' করেছিলেন এবং সাহাবীদের কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি, এটিকেই ইজমা বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ যে কত অন্তঃসারশূন্য কথা, তা আমরা আগেই জানতে ও বুঝতে পেরেছি। কেউ কেউ ইজমাকে সনদযুক্ত প্রমাণ করে তাকেই মনসূখকারী বলে ধরে নিয়েছেন। পরে আবার তার সনদ যুক্ত হওয়ার নির্ধারণে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। ইবনে নজীম البحر। গ্রন্থে সূরা কাহাফের আয়াত ঃ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر টিকে হযরত উমর 'আল মুয়াল্লাফাতু' আয়াতের মুকাবিলায় দাঁড় করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবেদীন বলেছেন ঃ 'ইজমা'কে উক্ত আয়াতের নাসেখ মনে করা হয়নি। কেননা তা সহীহ নয়। মনসূখ হওয়া তো সম্ভব ছিল রাসূলের জীবদ্দশায়। আর ইজমা হতে পারে রাসূলের ইন্তেকালের পর। কেউ কেউ হযরত মুয়াযকে ইয়েমেনে প্রেরণ সংক্রান্ত হাদীসকে 'নাসেখ' গণ্য করেছেন। তাতে রাসূলে করীম (স) ধনীদের নিকট থেকে যাকাত নিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে বলেছেন। দেখ ঃ (الدر المختار وحاشيه ابن عابدين ج ٢ ص ٨٢) সত্য কথা হচ্ছে, এই ধরনের ঘটনা দ্বারা কোন অকাট্য আয়াত মনসূখ হতে পারে না। সূরা 'কাহাফে'র যে আয়াতটির উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মক্কী সূরা। তার দ্বারা কি করে মদীনায় অবতীর্ণ একটি সর্বশেষকালের আয়াত মনসূখ হতে পারে—প্রথমটির দীর্ঘ কয়েক বছর পরে নাযিল হয়েছে।

তা ছাড়া আয়াত দুটোর মধ্যে কোন পারস্পরিক বৈপরীত্যও নেই। তাই একটির দ্বারা অন্যটিকে মনসূখ করারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। হযরত মুয়ায সংক্রান্ত হাদীসও তাই। তাতে শুধু এইটুকু কথাই বলা হয়েছে যে, যাকাত জনগণের নিকট থেকে নিয়ে জনগণের মধ্যেই বন্টন করতে হবে। তা পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের ধার্য করা কর বা খাজনার মত নয়। তা তো গরীবদের নিকট থেকে নিয়ে ধনীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। উক্ত হাদীসে শুধু 'ফুকারা'—গরীব লোকদের মধ্যে বন্টনের কথা বলার দরুন 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'-এর খাত মুছে যায় নি। তাহলে তো অন্যান্য—তার জন্যে নিয়োজিত কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত, দাস প্রভৃতির অংশও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত হয়। কিন্তু তাতো হয়নি, কেউই সে মত দেন নি।

এজন্যে হানাফী মতের ফিকাহ্‌বিদ আলাউদ্দীন ইবনে আবদুল আজীজ বলেছেন, উত্তম হচ্ছে এরূপ বলা ঃ এ হচ্ছে নবী যুগের কর্মপদ্ধতির প্রতিবেদন তাৎপর্যগতভাবে। 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'-দের যাকাতের অংশ দেয়ার মূলে লক্ষ্য ছিল ইসলামকে শক্তি দান করা, কেননা তখন তা দুর্বল ছিল,

জন্য এই খাতটি মুলতবি থাকবে। আবার যখন প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন আবার তা দিতে শুরু করতে হবে।[১]

মন তুষ্ট করার প্রয়োজন কখনই ফুরায় না

যাঁরা বলেন, ইসলামের ব্যাপক প্রচার সাধিত হওয়ার কারণে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুবুহুম' খাতে যাকাতের অংশ ব্যয়ের ও এ পর্যায়ের লোকদের তা দেয়া প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এক্ষণে ইসলাম দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের এই কথা তিনটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

১. মালিকী মাযহাবের কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ যেমন বলেছেন, 'মুয়াল্লাফ'বা সন্তুষ্ট করার জন্যে যাকাতের অংশ দেয়ার কারণ আমাদের জন্যে তাদের সাহায্য করা নয়। কাজেই তা ইসলামের বিস্তৃতি ও আধিপত্য লাভের দরুন বাতিল হয়ে যাবে না। বরং এই দেয়ার উদ্দেশ্য হল তাদের মনে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলা। আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দান।

এই মতে মনে করা হয়েছে, এ খাতটি কার্যকর থাকলে তা ইসলামী দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার একটা উপায় হতে পারে যা কোন কোন লোকের নিকট পাওয়া যেতে পারে এবং তার দ্বারা তাদেরকে ইসলামের নিকটে আনা ও কুফর থেকে তাদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। আর যে কোন উপায়ে গণমানুষকে হেদায়েত দান দুনিয়ায় তাদেরকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে এবং পরকালের জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচানো সম্ভব, তা বাস্তবে প্রয়োগ করা—এই ধরনের উপায়কে অকেজো করে না রাখা মুসলমানদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। একথা সত্য যে, বৈষয়িক স্বার্থের জন্যেও কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু এওতো সম্ভব যে, ইসলামে এসে সে পাক্কা ও প্রকৃত

তখন কুফর ছিল প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী। কিন্তু পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, ইসলাম বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন না দেয়াতেই ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা রক্ষিত হয়। সেকালে দেয়া ও একালে না দেয়া উভয়ই দ্বীন-ইসলামকে শক্তিসম্পন্ন করার একটা 'উপায়' ছিল। আর তা-ই ছিল লক্ষ্য। তা সর্বাবস্থায়ই হতে পারে। কাজেই তা মনসূখ হয়ে যায়নি।..... বলেছেন, এ ব্যাপারটি গোটা গোত্রের ওপর খুনের দিয়েত দেয়ার দায়িত্ব চাপানোর মত। কেননা তা নবী করীম (স)-এর যুগে গোটা কবীলার ওপর ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীকালে তা আহলি দিওয়ানের ওপর বর্তায়। কেননা দিয়েত দেয়ার দায়িত্ব গোত্রের ওপর চাপানোর উদ্দেশ্য ছিল সকলের সাহায্য গ্রহণ। এ সাহায্য কর্মে নবীযুগে গোত্রই এগিয়ে আসত। পরবর্তীকালে আহলি দিওয়ানের সঙ্গে জুড়িয় দেয়া হয়। তার অর্থ এই নয় যে, পূর্বেরটি মনসূখ হয়ে গেছে বরং সেই তাৎপর্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যার দরুন দিয়েত ওয়াজিব করা হয়েছিল।

আর তা হচ্ছে 'সাহায্য চাওয়া।' 'নিহায়া' গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাকে পসন্দ ও সমর্থন করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের সারকথা হল, ইসলাম যদি কখনও দুর্বল অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়—যেমন আমাদের এই যুগে—তাহলে যাকাত থেকে 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'দের অংশ দিয়ে তাকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা পাওয়া উচিত। তবে হানাফী মতে এটা জায়েয নয়। এই কারণে ইবনুল হুম্মাম তাদের সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, হানাফীরা যেমন বলেন, তা আসলে মসসূখ হয়ে যায়নি। কেননা তাদের দেয়াটা শরীয়াতের বিধান, সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। পরে তার প্রয়োজন থাকে না। (তাফসীর 'রুহুল মায়ানী'—আ-লুসী, ৩য় খণ্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১. المغنى ج ٢ ص ٦٦٦

মুসলিম হয়ে যাবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি এমনও হত যে, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে সালাম করত, কেবল তাকেই সালাম দিত, তাহলে পরে এমন অবস্থা দেখা দিত যে, ইসলাম তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে গেছে। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'কোন ব্যক্তি যদি নবী করীম (স)-এর নিকট বৈষয়িক জিনিস চাইত, তাহলে তিনি তাকে তা দিতেন......পরবর্তী কথা উক্তরূপ। কোন কাফির ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী বানাবার জন্যে দেয়া হলে তবেই এই কথা বলা যাবে। কিন্তু এ পর্যায়ের সব লোকই সেরকম নয়। এমন অনেক লোকই আছে, যাদের মন সন্তুষ্ট করা হয়েছে, তারা তাদের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছে। তখন সে তার পরিবারবর্গ ও সেই ধর্মের লোকদের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা, শত্রুতা, নির্যাতন ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এরূপ অবস্থায় তাকে যাকাতের অত্র অংশ দিয়ে সাহায্য করা, সাহসী বানানো ও বিপদমুক্ত করা একান্তই কর্তব্য, যেন সে ইসলামে শক্ত হয়ে টিকে থাকতে পারে, ইসলামে তার কদম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. কারুর মন সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন হয় ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে—এই মত যারা পোষণ করেন, তাদের এই মতের ওপর ভিত্তি করেই এই খাতটির মনসূখ হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অপর লোকদের মত হল, যার মন সন্তুষ্ট করার জন্যে যাকাতের অংশ দেয়া হবে, তাকে অবশ্যই ফকীর ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি হতে হবে—এটা শর্ত। অথচ এসব বলে বিনা দলীলে আল্লাহ্‌র সেই কথাকে শর্ত সম্পন্ন বানিয়ে দেয়া হয়, যার ওপর তিনি নিজে কোন শর্ত আরোপ করেন নি। এতে করে বিনা কারণে শরীয়াতের একটা কর্মনীতির বিরোধিতা করা হয়। আমাদের এই যুগে আমরা দেখছি, বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র বা জাতিকে সন্তুষ্ট করা বা স্বপক্ষে রাখার জন্যে বিপুল দান বা ঋণ দিয়ে যাচ্ছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে দিচ্ছে, দিচ্ছে উন্নতিশীল বহু প্রাচ্য অঞ্চলের রাষ্ট্রকে। রাশিয়া দিচ্ছে বহু দুর্বল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে। ইমাম তাবারী এ পর্যায়ে যা বলেছেন তা খুবই সুন্দর। কথাটি হচ্ছে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা দুটো মহাসত্যের প্রেক্ষিতে যাকাতের ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন ঃ

একটা হচ্ছে, মুসলিম জনগণের দারিদ্র্য বিদূরণ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসলামকে সহায়তা দান এবং তাকে শক্তিশালী করা। যাকাতের যে অংশ ইসলামের সহায়তা এবং তার কার্যকারণসমূহকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে নিয়োজিত হবে তা দেয়া যাবে ধনী, গরীব নির্বিশেষে। কেননা তা তো ইসলামেরই প্রয়োজনে দেয়া হবে তাকে। দ্বীনের সহায়তার জন্যেই দেয়া হবে তা। এই দেয়াটা ঠিক তেমনি, যেমন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্যে দেয়া হয়। তা দেয়া হয় সে ব্যক্তি ধনী হোক কি দরিদ্র। দেয়া হয় যেন সে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, দারিদ্র্য মুক্তির উদ্দেশ্যে নয়। 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে

যাকাত দানের ব্যাপারটি ঠিক তেমনি। তা দেয়া যাবে তারা পারিভাষিক অর্থে ধনী হলেও। এ দেয়াটা ইসলামের স্বার্থে, তাকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে, সহায়তার জন্যে।

নবী করীম (স) বহু যুদ্ধে বিজয় লাভের পরও এই দেয়ার কাজ চালু রেখেছেন। অথচ তখন ইসলাম ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল, মুসলিম জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কাজেই যদি কেউ বলে যে, আজ ইসলামের জন্যে কারুর মন সন্তুষ্ট করা যাবে না—তা চাওয়ার লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে, তবে তার এই কথার যৌক্তিকতা স্বীকার্য হবে না। কেননা নবী করীম (স) বর্তমানের এই গুণের অধিকারী লোকদেরকেই তা দিয়েছেন।[১]

৩. অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, দুনিয়া তার পৃষ্ঠকে মুসলিমদের প্রতি ঘুরিয়ে দিয়েছে, তারা পূর্বের ন্যায় দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করতে পারেনি। বরং ইসলাম আবার অপরিচিত হয়ে পড়েছে, যেমন শুরুতে ছিল। দুনিয়ার জাতিসমূহ মুসলিমদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেমন করে হিংস্র দানব সন্ত্রস্ত শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হৃদয়-মনে একটা কঠিন ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ই সব ব্যাপারের পরিণতির মালিক। ইসলাম ও মুসলিমের চরম দুর্বলতার দিন আবার ফিরে এসেছে। এসেই দুর্বলতা যা 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে যাকাত ব্যয়ে 'ই'ল্লাত' বা কারণ হতে পারে এবং তা দেয়া সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে। যাকাতের অংশ 'মুয়াল্লাফাতু কুলবুহুম'কে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। দেয়া জায়েয যেমন ইবনুল আরাবী প্রমুখ বলেছেন।[২]

মন সন্তুষ্টকরণ ও মুয়াল্লাফাতু'র জন্যে যাকাত ব্যয়ের অধিকার কার

আমি বলব, মন সন্তুষ্টকরণ এবং তার প্রয়োজন নির্ধারণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মুসলিম রাষ্ট্রনেতার ওপর অর্পিত। এ কারণে নবী করীম (স) নিজে এবং খুলাফায়ে রাশেদুন নিজেরাই এ কাজটি আঞ্জাম দিতেন। ব্যাপারটির প্রকৃতির সাথে এই নীতিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এ ব্যাপারটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সেই সাথে দ্বীন-ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণ চিন্তাও

---

১. تفسير الطبرى بتحقيق شاكر ج ١٤ ص ٣١٦

২. তবে হানাফীরা নিজেরাই বলেছেন, মন সন্তুষ্টকরণ একটা কারণের ভিত্তিতে হবে, এই কারণ দর্শনোও নিঃশেষ হয়ে গেছে, এই কথা কোন কারণভিত্তিক নির্দেশ বন্ধ করার দলীল হতে পারে না। কেননা কোন কারণের ভিত্তিতে দেয়া হুকুম তার স্থায়িত্বের জন্যে সেই কারণের স্থায়িত্বের মুখাপেক্ষী নয়। কেননা অতঃপর সে হুকুমটি কারণের প্রয়োজনীয়তামুক্ত হয়ে গেছে। যেমন দাসপ্রথা, ইহ্রামের কাপড় পরার ধরন ও রমল করার নিয়ম। তাই শর্তাধীন বিধিবদ্ধ করা কোন হুকুমের স্থায়িত্ব সেই কারণের স্থিতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে একটা দলিলের প্রয়োজন। তাঁরা আরও বলেছেন, এই ব্যাপারটিকে ইজমার ক্ষেত্রে স্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। দলিল প্রমাণিত হলে আমরা তার ভিত্তিতে হুকুম প্রকাশ করতে পারি। যদিও তা আমাদের জন্যে প্রকাশমান নয়। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, ৮২-৮৩ পৃ.) তা সত্ত্বেও হানাফীরা তাদের মতের দুর্বলতা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

বিশেষভাবে বিবেচ্য থাকবে।[১] আর একালে যেমন, রাষ্ট্র যদি যাকাত সংগ্রহ-বণ্টন এবং সাধারণভাবে ইসলামী বিধান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে ইসলামী সামষ্টিক সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

রাষ্ট্র বা সামাজিক সংস্থা কোনটাই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে এবং কোন ব্যক্তি মুসলিমের নিকট যাকাতের মাল অতিরিক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার পক্ষে এই খাতে যাকাত ব্যয় করা জায়েয হবে কিনা, এ একটা শক্ত প্রশ্ন।

এই গ্রন্থকারের মতে তা জায়েয নয়। তবে অন্য কোন ব্যয় ক্ষেত্র যদি পাওয়াই না যায়, তাহলে অবশ্য জায়েয হবে। যেমন যে সব মুসলমান অনৈসলামী রাষ্ট্রে বাস করে এবং তথায় যাকাত পাওয়ার যোগ্য কোন মুসলমান পাওয়া না যায় এবং দেখতে পায় যে, এমন কাফির লোক রয়েছে যাদের এ টাকা দিলে তাদের মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়বে, মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বসম্পন্ন হবে, তাহলে ঠিক এরূপ অবস্থায়—প্রয়োজনের কারণে—তা দেয়া যেতে পারে, যদিও এরূপ অবস্থায় ইসলামের প্রচার কার্যে যাকাতের টাকা ব্যয় হওয়া উত্তম—যদি তা কোন ইসলামী রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া সম্ভবপর না হয়।

এ যুগে 'মুয়াল্লাফাতু' খাতের টাকা কোথায় ব্যয় করা হবে ঃ

'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতটি বাতিল হয়নি এবং যাকাতের অংশ এই খাতে ব্যয় করার অবকাশ এখনও আছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান যুগে এই খাতের টাকা কোন্ কাজে ব্যয় করা হবে?

এই প্রশ্নের জবাব আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরীয়াতের বিধানদাতা যে উদ্দেশ্যে এ খাতটি রেখেছেন, ঠিক সেই উদ্দেশ্যে এ যুগেও তা ব্যয়িত হবে। আর তা হচ্ছে, লোকদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা এবং ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করে রাখার কাজে এই টাকা ব্যয় করা অথবা ইসলামে যারা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, তাদের শক্তিশালী করার জন্যে ব্যয় করা। ইসলামের সাহায্যকারী লোক সংগ্রহ কিংবা ইসলামী দাওয়াতী আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুদের অনিষ্ট প্রতিরোধ করার কাজেও ব্যয়িত হতে পারেবে। কোন কোন সময়ে কোন অনৈসলামী রাষ্ট্রকে মুসলমানদের স্বপক্ষে রাখার জন্যেও তা ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কোন কোন সংস্থা, গোত্র বা দল কিংবা শ্রেণীকে ইসলামের সহায়তা করার দিকে উৎসাহী বানানো বা রাখার জন্যেও তা ব্যয় করার দরকার হতে পারে। ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজে কোন কোন লেখনী বা মুখপাত্র নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং সেজন্যেও এই খাতটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্যে এবং তাদের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্যেও তা লাগানো যেতে পারে।

---

১. شرح الازهار ১ম খণ্ড ৫১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে, সন্তুষ্টকরণের কাজটি কেবলমাত্র রাষ্ট্রনেতারই করণীয় দ্বীনী কল্যাণের দৃষ্টিতে, অপর কারুর পক্ষে তা জায়েয নয়। জায়দীয়া ফিকাহর ভিন্নমত রয়েছে।

যেমন, প্রতিবছর লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে, কিন্তু কোন ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট থেকে তারা কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পায় না, তাদেরকে একবিন্দু উৎসাহিতও করা হয় না। তাদেরকে এই খাত থেকে সাহায্য দেয়া একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তা হলে তাদের কোমর শক্ত হবে, তারা ইসলামে অবিচল হয়ে থাকবে। ইমাম জুহরী ও হাসান বসরী বর্ণিত, খৃস্টান মিশনারীরা এই ব্যবস্থা নিয়েছে যে, যে লোকই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন এবং বস্তুগত ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক আনুকূল্য দেয়ার দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করে। এসব মিশনারী তাদের বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করে। এভাবে প্রতিবছর বহু সংখ্যক খৃস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান সাহায্য দানের কাজ করে যাচ্ছে। দ্বীন ইসলামের ন্যায় তাদের মধ্যে যাকাতের মত কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের পক্ষেই এটা সম্ভব যে, আমরাই যাকাতের একটা বড় অংশ লোকেদের মন সন্তুষ্ট রাখা ও ইসলামের ওপর অবিচল রাখার জন্যে ব্যয় করতে পারি।

বস্তুত ইসলামে সুস্থ প্রকৃতি ও সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যসম্পন্ন সুস্পষ্ট ভাবধারা রয়েছে। তাই তা স্বতই দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে প্রচারিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা এমন কোন বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা পায় না, যার ফলে তারা দ্বীন-ইসলামে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে না। যার দরুন তারা এর হেদায়েতে সত্যিকারভাবে উপকৃত হতে পারছে না। তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার কিছুরও প্রতিবিধান করা হচ্ছে না কিংবা তার প্রতিপক্ষ বা অত্যাচারী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসা কঠিন নির্যাতন সে ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে, তা থেকে কিছুমাত্র নিষ্কৃতি দেয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে না।

বিভিন্ন দেশে অবশ্য এমন বহু সংস্থা আছে, যেগুলো এই অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে; কিন্তু সেগুলো প্রয়োজন পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে না। এটা খুবই দুঃখের কথা।

আফ্রিকা মহাদেশে ভয়াবহ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিত্যকার ঘটনা-দুর্ঘটনা হয়ে রয়েছে। তথায় বিভিন্ন শক্তি, গোত্রপতি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। একদিকে মিশনারী সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী মিশনারীরা চেষ্টায় লেগে আছে, অপরদিক দিয়ে ইসরাইলী ইয়াহুদী সাম্রাজ্যবাদ সর্বাত্মক শক্তি এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে রেখেছে। আর তৃতীয় দিক দিয়ে মার্কসীয় কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদও ওঁৎ পেতে আছে। প্রত্যেকেই আফ্রিকা দখল করে স্বীয় রঙে রঙীন করে তোলার চেষ্টায় রত আছে।

এসব আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ইসলাম নির্বাক, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে মুসলিম জাতিকে অনুমতি দেয় না। তাই এ সময় এমন একটি রাষ্ট্র থাকা একান্তই জরুরী, যা তার এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে, দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত প্রচার করবে এবং আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করবে।

ইসলাম একদিন 'আক্রমণাত্মক' বা সম্প্রসারণের ভূমিকায় ছিল। আর বর্তমানে তা প্রতিরক্ষার ভূমিকায় চলে গেছে। চারদিক থেকে তা আক্রমণের সম্মুখীন, তার নিজের ঘর রক্ষার কঠিন দায়িত্বেও ব্যতিব্যস্ত।

অতএব আজকের দিনেও লোকদের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া অধিক কর্তব্য। সাইয়েদ রশীদ রিজা লিখেছেন—কাফিররা মুসলমানদের মনস্তুষ্টি সাধন করে তাদের স্বপক্ষে কিংবা তাদের ধর্মে শামিল করে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মুসলমানকে দাস বা গোলাম বানাবার চেষ্টায় রত আছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ। সেই সাথে তাদের ধর্মের প্রতিরক্ষার কাজও তারা করে যাচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে তারা বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মনস্তুষ্টি সাধনের কাজে অপরিমেয় ধনসম্পদ ও কলাকৌশল ব্যয় ও প্রয়োগ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ মুসলমানদের ইসলামের সীমার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত করে তাদের সাহায্যে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সমর্থনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই কাজ করছে অনেকগুলো সংস্থা। মুসলিমদের ঐক্য ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ধ্বংস করাই তাদের চরম লক্ষ্য। এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের কি উচিত নয় তাদের সঠিক দায়িত্ব পালনে নেমে যাওয়া?[১]

যাকাতের মাল ছাড়াও এ কাজ করা জায়েয

উপরের এই দীর্ঘ আলোচনার পরও আমরা বলে রাখতে চাই যে, প্রয়োজনীয় মনস্তুষ্টি সাধনের এ কাজটি কেবলমাত্র যাকাত দ্বারাই করতে হবে, অন্য কোন উপায়ে করা যাবে না, এমন কথাও নয়। বায়তুল মালের যাকাত সহ অন্যান্য আয় দ্বারাও এই কাজ করা যাবে। এজন্য একটা স্বতন্ত্র ফাণ্ডও গঠন করা যাবে। বেশী অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা তাদের সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা করা ছাড়া উপায় থাকে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ফিকাহবিদ এ মত দিয়েছেন। তার অর্থ জনকল্যাণমূলক ফাণ্ড দ্বারা 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে কাজ করা। আসলে আদর্শবাদী সুবিচারক রাষ্ট্রকর্তার অভিমতের ওপরই তা একান্তভাবে নির্ভর করে। পরিমাণটা উপদেষ্টা পরিষদের নির্ধারিতব্য। শু'রা সদস্যদের পরামর্শক্রমেই এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম পেতে পারে।

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٧٤

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফির-রিকাব—দাসমুক্তি

কুরআনে খাত নির্ধারণে অক্ষর প্রয়োগের পার্থক্য

পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, কুরআনের আয়াতে যাকাত ব্যয়ের আটটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতিপূর্বেই চারটি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে ঃ ফকীর, মিসকীন,যাকাত কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী এবং মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম—ইসলামের জন্যে যাদের মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়োজন। এখনও চারটি খাতের আলোচনা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তা হচ্ছে

১. ফির-রিকাব—দাসমুক্তি, আটটির মধ্যে পঞ্চম খাত।

২. আল-গারেমীন—ঋণগ্রস্ত লোক, আটটির মধ্যে ষষ্ঠ খাত।

৩. ফী সাবীলিল্লাহ্— আল্লাহ্র পথে, আটটির মধ্যে সপ্তম খাত।

৪. ইবনুস-সাবীল—নিঃস্ব পথিক, আটটির মধ্যে অষ্টম ও সর্বশেষ খাত।

কুরআনের উক্ত আয়াতটি যাকাত ব্যয় ক্ষেত্রকে আটটি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। প্রথমে চারটি এবং শেষে চারটি। প্রথম চারটি খাতের কথা বলেছে এ ভাষায় ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ-

সাদকা-যাকাত কেবলমাত্র ফকীর, মিসকীন, যাকাত সংক্রান্ত কর্মচারী ও যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট করা দরকার এদের জন্যে।

আর শেষের চারটি খাতকে বলা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

وَفِىْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের কাজে এবং আল্লাহ্র পথে ও নিঃস্ব পথিকের কাজে।

পূর্বে বলার ধরনে ও এ পর্যায়ের বলার ধরনে এই পার্থক্য কেন ? প্রথম চারটির শুরুতে ل 'লাম' অক্ষরটি লাগানো হয়েছে, যা মূলত تمليك বা 'মালিক বানানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর শেষের চারটির পূর্বে فى বসানো হয়েছে যা পাত্র বা ক্ষেত্র বোঝায়। এরূপ বলার মূলে কি তাৎপর্য নিহিত আছে ?

কুরআন নিশ্চয়ই একটি অক্ষরের স্থলে অপর একটি অক্ষর ব্যবহার করে না। একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য দেখতেও দ্বিধা করে না। বরং তার অলৌকিক কালামের সাহায্যে তাতে নিহিত যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত করে দেয়।

কিন্তু এই পদ্ধতি কেবল বিদ্বজ্জনেরাই বুঝতে পারে। তাহলে সেই প্রশ্নই থেকে যায়—এখানে সেই যৌক্তিকতাটি কি?

প্রখ্যাত কুরআন ব্যাখ্যাকার ইমাম যামাখশারী এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, শেষের চারজন যাকাত প্রাপকদের ক্ষেত্রে ل এর পরিবর্তে فى ব্যবহার করা হয়েছে একথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যে, যাকাত পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম চারজনের তুলনায় শেষোক্ত চারজনের অধিকার অত্যধিক দৃঢ়। কেননা فى পাত্র বোঝায়। এ দিয়ে জানানো হয়েছে যে, তাদের ক্ষেত্রে যাকাত স্থাপন অধিক প্রয়োজন, তারা অন্যদের তুলনায় বেশি অধিকারী—এদিক দিয়ে যে, যাকাত তাদের মধ্যেই রাখা ও বণ্টন করা হবে, যেন তারাই তার ক্ষেত্র ও প্রাপক।[১]

ইবনুল মুনীর তাঁর الانتصاف নামের গ্রন্থে যামাখশারীর উপরিউক্ত বক্তব্যের ওপর সমালোচনা করে অধিকতর সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব উঘাটিত করেছেন। বলেছেন, এখানে আরও একটি তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। তা যেমন অধিক প্রকাশমান, তেমনি অধিকতর নিকটবর্তী। আর তা হচ্ছে, প্রথমোক্ত চার প্রকারের ব্যয়ক্ষেত্র প্রাপ্ত যাকাতের মালিক। তারা তা মালিকানার অধিকারে পেয়েও গ্রহণ করে থাকে। এ কথা বোঝাবার জন্যে শুরুতে ل অক্ষরটির ব্যবহারই যথাযথ। কিন্তু শেষোক্ত চারজন প্রাপ্ত যাকাতের মালিক হয় না—তাদের জন্য ব্যয় নাও হতে পারে। তবে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় হবে। যে মাল দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে, তা পাবে তার মালিক, তার বিক্রেতা বা চুক্তিকারী মালিক পক্ষ। ফলে তাদের ভাগের যাকাত-অংশ তারা নিজেরাও নিজেদের হাতে পেল না। এই কারণে তাদের কথা বলতে গিয়ে ل অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়নি। কেননা তা তাদের মালিক হওয়া বোঝায় সেই জিনিসের, যা তাদের জন্যে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে এই শেষোক্ত চারজন হল যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র, তাদের কল্যাণে তা ব্যয়িত হবে। তবে তার মালিক হবে না।

'ঋণগ্রস্ত লোকেরা'ও আনুরূপ। তাদের প্রাপ্য যাকাত দেয়া হবে তাদের নিকট যারা পাওনাদার, তাদেরকে, তাদের ঋণ শোধ করার জন্যে। তা ঠিক তাদেরকে দেয়া হবে না। আর 'আল্লাহ্র পথে'-এর ব্যাপারটি তো এদিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট।

'ইবনুস্-সাবীল'—নিঃস্ব পথিক—যেন ঠিক আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত। এই কথাটি এক বচনে বলা হয়েছে তার বিশেষ বিশেষত্বের কারণে। এর ওপর ل বা فى কোনটিই ব্যবহৃত হয়নি। বরং ل এর পরবর্তী শব্দ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু তা অধিক নিকটবর্তী।[২]

এই গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে, নিঃস্ব পথিকের জন্যে যা ব্যয় করা হবে, তাকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে না। তা তার কল্যাণে ব্যয়িত হবে মাত্র। তা দিয়ে তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সফরের ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।

---

১. الكشاف ج ٢ ص ٤٥ – ٤٦ ،مصطفى الجلبى ٥١٣٦٧

২. الانتصاف من الكشاف، وهو على هامش المصدر السابق

তা দিয়ে যানবাহনের ভাড়া দেয়া যাবে, যাতে চড়ে সে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। যানবাহন নৌকা, বাস, রেল-গাড়ি বা উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ—যাই-ই হোক না কেন।

ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযীও এ ধরনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতকে প্রথমোক্ত চার প্রকারের প্রাপকদের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন ل অক্ষর দিয়ে, যা 'মালিক' বানিয়ে দেয়া বোঝায়। যেমন বলা হয়েছে।। انما الصدقات للفقر ......

কিন্তু فى الرقاب দাসমুক্তির কথা বলতে গিয়ে ل -এর পরিবর্তে فى বসিয়েছেন। এই পার্থক্যকরণে একটা সুফলতা নিশ্চয়ই রয়েছে। আর সে সুফলতা হচ্ছে, প্রথমোক্ত চার প্রকারের প্রাপকদের হাতে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেয়া হবে। তারা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় ও ব্যবহার করবে। কিন্তু দাসমুক্তির ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য অংশ তাদের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তকরণের কাজে ব্যয় করা হবে। তা তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না। তারা তা নিজেদের ইচ্ছেমত কাজে লাগাতে বা ব্যয়-ব্যবহার করতেও পারবে না। তাদের পক্ষ থেকে তা দিয়ে তাদের মুক্ত করা হবে।

ঋণগ্রস্ত লোকদের পর্যায়েও এই কথা। তাদের ঋণ শোধের কাজে তা ব্যয় করা হবে। আর যোদ্ধাদের যুদ্ধ কাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহে তা ব্যয় করা হবে। পথিকের ব্যাপরটিও এমনি।

সার কথা হচ্ছে, প্রথম চার প্রকারের প্রাপকদের প্রাপ্য তাদের হাতেই তুলে দেয়া হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত তা ব্যয় ও ব্যবহার করতে পারবে। আর শেষোক্ত চারজনকে তাদের প্রাপ্য দেয়া হবে না, যে কারণে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, সে কারণটা দূর বা পূরণ করার কাজে তা ব্যয় করা হবে।[১]

তাফসীরে খাজেনেও এ কথাই বলা হয়েছে।[২]

যাকাত পাওয়ার আটটি খাত বর্ণনায় এই যে পার্থক্য করা হয়েছে, تفسير المنار এর লেখক তা দুই ভাগে—দুটি পরিবৃত্তে বিভক্ত করেছেন।[৩] শায়খ শালতুত তা সমর্থন করেছেন।[৪]

বলেছেন ঃ 'এরা হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তি এবং কয়েকটি কল্যাণমূলক কাজ। 'কতিপয় ব্যক্তি' হচ্ছে প্রথমোক্ত চারজন—ঋণগ্রস্ত লোক ও পথিকসহ। আর কল্যাণময় কাজের দুটো ক্ষেত্র ঃ দাসমুক্তি ও নিঃস্ব পথিক। এই দুটো ক্ষেত্রের পূর্বস্থানে فى বসানো হয়েছে। ঋণগ্রস্ত লোক ও নিঃস্ব পথিক এই দুইজনকে অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে গণ্য করা হয়নি। বরং এই দুটোর বর্ণনা গুণবাচক যা

---

১. تفسير الكبير للرازى ج ١٦ ص ١١٢ ২. الجمل فى حاشية على الجلالين
ج ٢ ص ٢٩٢ ৩. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٨٢
৪. الاسلام عقيدة وشريعة ص ١١١.

প্রথম পর্যায়ের লোকদের রয়েছে, যাদের পূর্বে ل বসানো হয়েছে। এটা হয়েছে এজন্যে যে, ছয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য রয়েছে। এরা বিশেষ গুণের দিক দিয়ে যাকাত পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। 'ফকীর'রাও দারিদ্র্যগুণে যাকাত পাওয়ার অধিকারী আর ঋণগ্রস্ত লোকেরা ঋণগ্রস্ততার গুণে। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, প্রতিটি প্রকারকে তার নিকটস্থ প্রতিবেশীর সঙ্গে যুক্ত করে বলা দূরবর্তীর সাতে যুক্ত করে বলার তুলনায় অনেক উত্তম। কুরআনের ভাষালংকারের দৃষ্টিতে অধিক উপযুক্ত বর্ণনাভংগী হচ্ছে, যে যে প্রকারের লোকদেরকে যাকাত দিয়ে দেয়া হবে, সে সে প্রকারের লোকদের উল্লেখ এক সাথে পর পর করা বাঞ্ছনীয়। আর যে যে দিকে যাকাত বিতরণ বা ব্যয় করা হবে, সেগুলোর উল্লেখ পাশাপাশি হওয়া উচিত। জামাখশারী, ইবনুল মুনীর, রাযী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছে।

ইমাম রাযী প্রথম চার প্রকার ও শেষের চার প্রকার যাকাত পাওয়ার লোকদের পার্থক্য বোঝাবার জন্য যা বলেছেন 'আল মুগ্নী' প্রণেতা তার সমর্থন করেছে। বলেছেন এভাবে ঃ

চার প্রকারের লোক যাকাত গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে। দেয়ার পরে তারা তা নিয়ে কি করে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। তারা হচ্ছে ঃ ফকীর, মিসকীন, কর্মচারী ও মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম। তারা যখনই যাকাত গ্রহণ করল, তারা তখনই তার মালিক হয়ে বসল স্থায়ী ও চিরকালীন মালিক হিসেবে। ফিরিয়ে দেয়া কোন অবস্থায়ই তাদের কর্তব্য হবে না। আর অন্যান্য চারজন—ঋণগ্রস্থ লোক, দাসমুক্তি, পথিক ও আল্লাহ্র পথে—যাকাত গ্রহণ করে বিশেষ প্রয়োজন পূরণের জন্যে। যদি যে কারণে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়েছে, সেই কাজে তা ব্যয় করে, তবে তারা তা যথার্থভাবেই গ্রহণ করল। নতুবা তা তাদের নিকট থেকে ফেরত নেয়া হবে।

এই কয় প্রকার প্রাপক ও পূর্ববর্তী কয় প্রকারের প্রাপকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই শেষোক্ত লোকেরা যাকাত গ্রহণ করেছে এমন এক লক্ষ্যে যা যাকাত গ্রহণের সাথে সাথেই অর্জিত হয়ে যায়নি। অথচ প্রথম প্রকারের প্রাপকদের লক্ষ্য যাকাত গ্রহণ করাতেই অর্জিত হয়ে গেছে। আর তা হচ্ছে ফকীর মিসকীনদের স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন, যাদের মন সন্তুষ্ট করার তাদের মন সন্তুষ্টকরণ, এবং যারা এজন্যে কাজ করেছে তাদের পারিশ্রমিক দান। কিন্তু শেষাক্ত চার ধরনের লোকদের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর যাকাতের মাল তাদের নিকট উদ্বৃত্ত হয়ে থাকলে ওসব ব্যয় হয়ে না গেলে যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা ফিরয়ে দিতে হবে। অবশ্য মুজাহিদকে তা দিতে হবে না। তার নিকট কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা তারই হয়ে যাবে। তাতে অবশ্য সে সব জিনিস গণ্য নয় যা যুদ্ধের পরও স্থায়ীভাবে থেকে যাবে। যেমন অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এ পর্যায়ের উদ্বৃত্ত জিনিসসমূহ বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিতে হবে।

'আল্-মুগনী' গ্রন্থকার ইবনে কুদামাহ দুই পর্যায়ের প্রাপকদের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনস্বরূপ যা বলেছেন, তা যথার্থ, সহীহ। আর আসলে তা-ই সমর্থনযোগ্য। কেননা

---

১. ج ٢ ص ٦٧٠.

কুরআন মজীদই এই দুই পর্যায়ের লোকদের মধ্যে বর্ণনা ভঙ্গীর মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে হাম্বলী আলিম غاية المنتهى গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখক এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছেন।[১]

'ফির-রিকাব'-এর তাৎপর্য

الرقاب। বহুবচনের শব্দ। একবচনে رقبة —কুরআনের পরিভাষায় তার অর্থ দাস বা দাসী। তা বলা হয় তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকালে। কুরআন মজীদ এই শব্দটি বলে পরোক্ষভাবে একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, মানুষের জন্যে দাসত্ব গলায় বাঁধা শৃংখলের মত অথবা বলদের ঘাড়ে বাঁধা জোয়ালের মত। আর দাসকে এই শৃংখল থেকে মুক্ত করা যেন গলায় বাঁধা রশি খুলে ফেলা। মানুষ যে জোয়ালের তলায় পড়ে থাকে, তা থেকে তা সরিয়ে দূর করে দেয়া। যাকাত-ব্যয়ের ক্ষেত্র বলতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وفي الرقاب তার অর্থ, মানুষের গলা মুক্তকরণের কাজে যাকাত ব্যয় করা হবে। আর এই কথা দাস বা দাসীকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তকরণ বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট। এ কাজটি দু'ভাবে হতে পারে ঃ

১. যে দাস বা দাসী মনিবের সাথে চুক্তি করেছে যে, সে তাকে এত টাকা দিয়ে দিলে সে তাকে মুক্ত করে দেবে, যাকাত দিয়ে তার এই চুক্তি পূরণে সাহায্য করা হবে। তাই এ টাকা দেয়া হলেই সে তার ঘাড়কে মুক্ত করে নিতে পারল, সে স্বাধীনতা পেল।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জনগণকে তাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারাই এরূপে বিনিময় দানের শর্তে চুক্তি করতে ইচ্ছুক, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্যে যা বাধ্যতামূলক বানিয়ে নিয়েছে তা পরিপূরণে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য দান করতেও বলেছেন, যেন মালিক মনিবরা তাদের মুক্তিপথ সহজ করে দেয়, তাদের দেয় পরিমাণ হ্রাস করে। গোটা মুসলিম সমাজই যেন দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্তি লাভের এই চেষ্টায় তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ فَكَا تِبُوْ هُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا - وَّاٰتُوْ هُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتَاكُمْ -

তোমাদের মালিকানাভুক্ত যেসব ক্রীতদাস বা দাসী চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তোমরা তাদের সাথে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতে পার..... এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সেই মাল থেকে দাও যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। (সূরা নূর ঃ ৩৩)

অতঃপর যাকাতের একটা অংশ তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী অর্থ দিয়ে দাসত্বমুক্তির এই চেষ্টায় তাদের সাহায্য করা হবে। এটাই এই নির্ধারণের লক্ষ্য।

---

১. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٥١

দাসত্ব মুক্তির এই পদ্ধতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী এবং তাঁদের সঙ্গিগণ। লাইস ইবনে সায়াদও এ মত সমর্থন করেছেন।

তাঁরা দলিল হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা وفى الرقاب বলে 'মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস বা দাসী' বুঝিয়েছেন। আর তা আরও দৃঢ় হয়েছে আল্লাহ্‌র কথা শেষাংশ واتوهم من مال الله الذى اتاكم দিয়ে।[১] (এবং তাদের দাও আল্লাহ্‌র সেই মাল থেকে যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন।)

২. ধনবান ব্যক্তি তার মালের যাকাত—সম্পদ দিয়ে একজন দাস বা দাসীকে ক্রয় করবে এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেবে।

অথবা আরও কয়েকজন একত্রিত হয়ে এই ক্রয় ও মুক্তি দানের কাজ করবে। রাষ্ট্রকর্তাও সংগৃহীত যাকাতসম্পদ দিয়ে দাস বা দাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে—এটাও সম্ভব। ইমাম মালিকের এই মতটি প্রখ্যাত। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইবনুল আরাবী বলেছেন ঃ বস্তুত এটাই যথার্থ ও সঠিক পদ্ধতি। তার সমর্থনে তিনি কুরআনের বাহ্যিক বাচন-ভঙ্গীকেই দলিল হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যে দাসত্বের উল্লেখ করেছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তিদান। যদি চুক্তিবদ্ধ দাসদাসীর সাহায্যই লক্ষ্য হত, তাহলে তিনি তাদের এই বিশেষ নাম সহকারেই উল্লেখ করতেন। তা না বলে যখন الرقبة। বলেছেন, তখন বোঝা গেল, তিনি মুক্তিদানই বোঝাতে চেয়েছেন। আর তাৎপর্যগত কথা হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ লোকেরা আসলে ঋণগ্রস্ত লোকদের গোষ্ঠীর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। এখন তাদের ওপর এটা একটা ঋণ বিশেষ। কাজেই তারা فى الرقاب পর্যায়ে গণ্য হবে না। আর সাধারণভাবে চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসীও এর মধ্যে গণ্য ধরা হয় বটে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের মুক্তই করা হবে।[২]

আসলে সত্য কথা হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসীর সাহায্যকরণ ও ক্রয় করে দাস মুক্তকরণ—উভয় কাজই আয়াতটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইবরাহীম নখয়ী ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ থেকে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনই যাকাতের টাকা দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্তকরণ অপসন্দ করতেন। কেননা তাতে যাকাতদাতার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে। তা হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুক্তকারীর নিকট দাসের এক ধরনের সম্পর্ক যুক্ত থাকা এবং মুক্তকারীর কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে 'মুক্ত দাস' مولى তার উত্তরাধিকারী হতে পারে—এই সুবিধা। এ দৃষ্টিতেই ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক তার মালের যাকাত দিয়ে দাস মুক্ত করবে, তার মুক্তকরণ সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার সমস্ত মুসলিম জনগণের জন্যে হবে অর্থাৎ বায়তুলমালের সম্পদ হবে।[৩]

---

১. التفسير الكبير للفخر الرازى ج ١٦ ص ١١٢. الهداية وفتح القدير ج ٢ ص ١٧

২. احكام القران ج ٢ ص ٩٥٥ ৩. الاموال ص ٦٠٨ - ٦٠٩

কিন্তু আবূ উবাইদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, কোন মুসলিম তার মালের যাকাত দিয়ে কোন দাসকে মুক্ত করবে—তাতে তিনি কোন দোষ দেখতে পান নি। নখয়ীও ইবনে জুবাইরের মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন ঃ এ পর্যায়ে আমাদের নিকট এ পর্যন্ত যত মতই পৌঁছেছে, তন্মধ্যে ইবনে আব্বাসের মতই সর্বোত্তম। তিনি খুব বেশি অনুসরণীয়, কুরআনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও মর্মোদ্ধারের কাজেও তিনি অধিক পারদর্শী। হাসান বসরীও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞও এ মতেই রয়েছেন।[১]

তিনি আরও বলেছেন, এ মতটি আরও বলিষ্ঠতা পায় এ দিক দিয়ে যে, মুক্তকারীর যদি ভয় থাকে যে, তার মীরাস মুক্তকরণ সম্পর্কের দরুন الولاء মুক্ত দাসই পেয়ে যাবে, তাহলে তার এ-ও ভয় থাকতে পারে যে, সে এমন কোন ফৌজদারী অপরাধ করে বসবে যার রক্তমূল্য বা ক্ষতিপূরণ দেয়া তার বা তার গোত্রের লোকদের জন্যে কর্তব্য হয়ে পড়বে। আর তাহলে তারা দু'জন পারস্পরিক সম্পর্কিত হয়ে গেল।[২]

এসব কথাই সে অবস্থায় প্রযোজ্য, যখন যাকাত বণ্টনের কাজ ব্যক্তিগতভাবে বা সম্পদ মালিকের প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। কিন্তু এ কাজ যদি মুসলিম শাসক বা ইসলামী সরকার কর্তৃক সম্পন্ন হয়—যাকাতের মৌল ব্যবস্থাপনাই তাই—তাহলে আর এ সব মতপার্থক্যের কোন কারণ থাকবে না। অতএব এক ব্যক্তি তার মালের যাকাতে যতটা কুলায় দাস ক্রয় করে মুক্ত করতে পারে যাকাত ব্যয়ের অপরাপর ক্ষেত্রকে লংঘন করা ছাড়াই। (ইমাম শাফেয়ী অবশ্য যাকাত পাওয়ার যোগ্য আট প্রকারের লোকদের মধ্যে সমান পরিমাণে বণ্টন করা ওয়াজিব মনে করেন। তা হলে আট ভাগের এক ভাগে নেহায়েত কম পড়বে না।) উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে, রাষ্ট্রকর্তা দুটি ব্যাপারকে একত্রিত করবে। চুক্তিবদ্ধ দাসদের সাহায্য করবে এবং দাস-দাসী ক্রয় করেও মুক্ত করবে। ইমাম জুহরী খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজকে তা-ই লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'দাস মুক্তকরণের অংশটি দুই ভাগে বিভক্ত হবে, অর্ধেক ব্যয়িত হবে মুসলিম চুক্তিকারী দাসদের সাহায্যার্থে। আর অপর অর্ধেক দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারী ও নামায-রোযা পালনকারী দাসদের ক্রয় করে মুক্ত করার কাজে। তা হলে এই উভয় প্রকারের দাস-দাসীই যাকাতের সাহায্যে মুক্তি লাভ করবে।[৩]

কিন্তু কোন ইসলামী রাষ্ট্রকর্তা অর্ধেক বা অপর কোন হার মেনে চলতে বাধ্য এ কথা আমরা মনে করি না। সে যেভাবেই ভাল মনে করবে সেভাবেই তা করতে পারবে। অবশ্য পরামর্শদাতাদের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে ইসলামের পরামর্শ গ্রহণ নীতি অনুযায়ী।

দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণে ইসলামের অগ্রবর্তিতা

এ কথা বলা যায়, ব্যক্তিদের দাসকরণের প্রথা দুনিয়া থেকে এখন বিলুপ্ত প্রায়। এই প্রেক্ষিতে একথা ঘোষণা করার আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে যে, দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণ

---

১. الاموال ص ٦٠٨ - ٦٠٩ ২. الاموال ص ٦٠٨ - ٦٠٩ ৩. الاموال ٦٠٩

এবং ক্রমশ তা নিঃশেষে উৎখাত করার জন্যে ইসলামই সর্বপ্রথম সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে ও সর্বপ্রকারের কার্যকর প্রন্থা অবলম্বন করেছে।

দুনিয়ায় দাসপ্রথা চালু হওয়ার বহু পথ ও পন্থা ছিল। ইসলাম তন্মধ্যে কতগুলো প্রশস্ত দ্বার চিরদিনের তরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। স্বাধীন মুক্ত মানুষকে হাইজ্যাক করে নিয়ে তাকে দাস বানানোকে কঠিন ও কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। মানুষ ছোট শিশু হোক, কি বড় ও পূর্ণ বয়স্ক। মানুষকে কোন অবস্থায়ই বিক্রয় করা জায়েয নয়। কেউ নিজেকে বা নিজের সন্তান বা স্ত্রীকে বিক্রয় করার অধিকার রাখে না। কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণের বিনিময়ে—যদি সে ঋণ শোধ করতে অক্ষম হয়—দাস বানিয়ে রাখার কোন বিধান নেই। কোন অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপও দাস বানানো যেতে পারে না। এই আদর্শ যেমন পূর্ববর্তী ধর্ম-বিধানসমূহের, প্রাচীন অন্ধকার যুগের গোত্র বা জাতিসমূহের পক্ষেও বৈধ ছিল না অপর গোত্র বা জাতিকে দাস বানিয়ে রাখা শত্রুতা বা বিদ্রোহের প্রতিবিধানস্বরূপ।[১]

দাসপ্রথা প্রচলিত হওয়ার যেসব কারণের সাথে বিশ্বমানব পরিচিত তার কোন একটিও অবশিষ্ট ছিল না। কেবলমাত্র একটি পন্থা বা কারণই ছিল চূড়ান্তভাবে ও একান্তরূপে। এই পথে দাস বানানো জায়েয বরং ইচ্ছাদীন ছিল, আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক নয়। আর তা হচ্ছে, শরীয়াতসম্মত ইসলামী যুদ্ধে বন্দীদের দাস বানানো হত। এই পন্থাটিও অবশ্য ইসলাম কর্তৃক সূচিত হয়নি সীমালংঘন করার দরুন। এটা ইসলামে সম্ভব হতে পারে যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তাতেই উম্মত ও মিল্লাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত বলে মনে করে ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাও তখন যখন শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দীদের দাস বানিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত করে। এরূপ অবস্থায় সমতাপূর্ণ নীতি গ্রহণেই কল্যাণ নিহিত বলে মনে করতে হয়। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সুবিচারক প্রধান যদি কোনরূপ বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে তবে তাও করার অধিকার রয়েছে। সে বিনিময় কোন বস্তুগত জিনিস হতে পারে, হতে পারে কোন তাৎপর্যগত বা বস্তু উর্ধ্ব জিনিস। মুশরিক শত্রু পক্ষ মুসলিম বন্দীদের ছেড়ে দিলে তার বিনিময়ে কাফির বন্দীদের ছেড়ে দেয়া যায়। যুদ্ধরত কাফির বন্দীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে ঃ

حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً - (محمد)

শেষ পর্যন্ত তোমরা তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দীদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। অতপর তোমাদের ইচ্ছা–অনুগ্রহ প্রদর্শনপর্বক তাদের ছেড়ে দেবে কিংবা বিনিময়ের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করবে।

ইসলাম যেমন দাসপ্রথার একটা সংকীর্ণ দ্বার জায়েযরূপে উন্মুক্ত রেখেছে, তেমনি তাদের মুক্ত ও আযাদকরণের বহু কয়টি প্রশস্ত দ্বারও খুলে দিয়েছে। দাস মুক্তকরণের প্রথা উন্মুক্তকরণ তো কেবলমাত্র ইসলামেরই অবদান। কিন্তু দাস বানানোর কোন নতুন পথ ইসলাম খুলে দেয়নি।

---

১. حقوق الانسان في الاسلام -للدكتور على عبدالواحد وافى ص ١٣٩

ইসলাম দাস মুক্তকরণের আহ্বান জানিয়েছে। সেজন্যে বিপুল উৎসাহ দান করেছে, তাকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থারূপে চিহ্নিত করেছে। উপরন্তু মুসলিমের ব্যক্তিগত বহু সংখ্যক মানবিক ভুলত্রুটি বা গুনাহের কাফ্ফারারূপে দাসমুক্তকরণকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন কিড়া-কসম করে তা ভঙ্গ করলে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 'জিহার' হলে, রমযান মাসে দিনের বেলা স্ত্রী-সহবাস করা হলে এবং ভুলবশত নরহত্যা করা হলে দাসমুক্তি দানই তার কাফ্ফারা। কোন মনিব যদি তার ক্রীতদাসকে অন্যায়ভাবে মারধোর করে, তাহলে তাকে মুক্ত করাই হয় তার এই অপরাধের কাফ্ফারা।

তাছাড়া মনিবদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দাসদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখতে বা জানতে পারলে তাদের সাথে মুক্তির চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। আর তা সম্ভব হয়, যদি তাকে মুক্তভাবে উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয়া হয় এবং যদি ইসলামী সমাজ সমষ্টি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। কুরআনের সুদৃঢ় স্পষ্ট ঘোষণায় যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ اٰتَاكُمْ- (النور -٣٣)

তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব ক্রীতদাসের মালিক হয়েছে, তাদের কেউ যদি তোমাদের সাথে মুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, তা হলে তোমরা সে চুক্তি অবশ্য সম্পাদন করবে—যদি তোমরা তাদের মধ্যে কোন কল্যাণের কথা জানতে বুঝতে পার। আর তাদের আল্লাহ্র সেই মাল থেকে দাও যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। (সূরা নূর ঃ ৩৩)

এসব বলার পর অধিক অতিরিক্ত ব্যবস্থাস্বরূপ দাসমুক্ত ও আযাদকরণকে যাকাতের মালের একটা ব্যয়ক্ষেত্ররূপেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যাকাত এমন একটা 'কর' বিশেষ যা বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতা দিয়ে থাকে। আর ইসলামী বায়তুলমালের জন্যে তা একটা স্থায়ী আয়-ব্যবস্থা। তাতেই রক্ষিত হয়েছে দাস মুক্তকরণের অংশ।[১]

এই বার্ষিক আবর্তনশীল আমদানী থেকে দাসমুক্তির জন্যে একটা অংশ স্থায়ী ও চিরকালের তরে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু তা নিশ্চয়ই কোন সহজসাধ্য কাজ ছিল না। যাকাতলব্ধ জিনিসের মূল্য কখনও বিপুল হয়, কখনও সামান্য। অনেক সময় অবশ্য অন্যান্য খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন না থাকার দরুন সমস্ত যাকাত সম্পদই এ খাতে ব্যয় হতে পারে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সময়ে ঠিক তাই হয়েছিল।

---

১. দাস-দাসীদের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা বৃদ্ধি, উন্নতকরণ এবং তাদের সত্যিকার অর্থে সম্মানার্হ মানুষ বানাবার—বরঞ্চ মনিবের ভাই বানিয়ে দেয়ার জন্যে এ ছাড়াও আরও অনেক কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালিক ও দাসের খাওয়া-পরার মান অভিন্ন রেখেছেন। সাধ্যের অতীত কোন কাজের জন্যে তাদের বাধ্য করা, তাদের মারধোর করা, তাদের কষ্ট-পীড়ন দেয়া—'আমার দাস, আমার দাসী' বলে তাদের মনে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আলোচ্য মুক্তি পথ খুলে দেয়া এসবের বাইরের ব্যবস্থা।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমাকে আফ্রিকায় যাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি সে যাকাত যথারীতি আদায় ও সংগ্রহ করার পর তা বণ্টন করে দেয়ার জন্য ফকীর-মিসকীনদের সন্ধান করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন ফকীরও পেলাম না। এমন একজনকেও পেলাম না, যে যাকাত গ্রহণ করতে রাজী হতে পারে। আসলে উমর ইবনে আবদুল আজীজ জনগণকে বিপুলভাবে সচ্ছল ও অর্থশালী বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আমি তা দিয়ে ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলাম।[১]

বস্তুত মুসলমানগণ যদি খুব উত্তম ও পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়িত করত এবং সৎপন্থী সুবিচারক প্রশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করে রাখত দীর্ঘকাল পর্যন্ত, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দাস প্রথার উৎখাত হয়ে যেত, দুনিয়ার কোথাও তার অস্তিত্ব থাকত না।

মুসলিম বন্দীকে দাসমুক্তির অংশ দিয়ে মুক্ত করা যাবে

কুরআনের ব্যবহৃত শব্দ فى الرقاب কেবলমাত্র ক্রীতদাসকেই বোঝায়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ শব্দটির সাধারণ প্রয়োগে মুসলিম বন্দীদেরকে শামিল করা ও তাদের মুক্তির জন্যে এই অংশের যাকাত ব্যয় করা যাবে কিনা..... যাদের ওপর কাফির শত্রুরা ঠিক সেভাবেই প্রভুত্ব করে যেমন করে মনিব-মালিক তার ক্রীতদাসের ওপর ? আসলে এই মুসলিম বন্দীরা ঠিক ক্রীতদাসদের মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেই নিপতিত হয়ে থাকে।

ইমাম আহমাদের মতের বর্ণনানুযায়ী তা করা সম্পূর্ণ জায়েয। মুসলিম বন্দীকে যাকাতের টাকা দিয়ে মুক্ত করা অবশ্যই শরীয়াতসম্মত কাজ হবে। কেননা তাতেও তো 'ঘাড়'কে বন্দীদশা থেকে মুক্তই করা হয়।[২]

কাযী ইবনুল আরাবী মালিকী বলেছেন, যাকাতের টাকা দিয়ে বন্দী মুক্তকরণ পর্যায়ে আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আতবাগ বলেছেন, তা জায়েয হবে না। ইবনে হুবাইব বলেছেন, অবশ্যই জায়েয হবে। মুসলিম দাসকে যখন একজন মুসলমানের নিকট থেকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করা ইবাদতের পর্যায়ের কাজ এবং জায়েয, তখন মুসলিম বন্দীকে কাফিরের দাসত্ব শৃংখল ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা অধিক উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৩] দাসপ্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে বটে কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ তো চিরকালের জন্যেই লেগে আছে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে না এবং তাতে বহু মুসলমান কাফির শক্তির হাতে বন্দীও হতে পারে। কাজেই মুসলমান বন্দীকে যাকাতের এ অংশ থেকে বিনিময় মূল্য দিয়ে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে উদার হস্তে ও প্রশস্তভাবে।

---

১. سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن عبد الحكم ص ٥٩

২. الروض المربع ج ١ ص ٤٠٢

৩. احكام القران ج ٢ ص ٩٥٦

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন জাতিসমূহকে কি যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে

সাইয়েদ রশীদ রিজা তাঁর তাফসীর 'আল-মানার'-এ লিখেছেন, 'ফির-রিকাব' বলে যাকাতের যে ব্যয়-খাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে পরাধীন গোত্র ও জাতিসমূহকে মুক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে—যখন ব্যক্তিদের মুক্তকরণে তা ব্যয় করা হবে না।[১] প্রধান শিক্ষাবিদ শায়খ মাহ্‌মুদ শালতুত তাগিদ করে বলেছেন, ব্যক্তি দাসের মুক্তিকরণের সুযোগ যখন নিঃশেষ হয়ে গেছে—আমি যা মনে করি—এ ব্যয়ের ক্ষেত্রটি নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে জাতি ও গোত্রসমূহকে সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামে সাহায্যকরণ। কেননা এই অবস্থাটি মানবতার পক্ষে অধিকতর কঠিন, দুঃসহ ও বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে মানুষ দাস হয় চিন্তা-বিশ্বাস, ধন-মাল ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বে। তাদের গোটা দেশের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। আগের কালে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাসত্বের প্রথা চালু ছিল। সে ব্যক্তির মৃত্যুতে দাসত্বেরও মৃত্যু ঘটত। তাদের রাষ্ট্র থাকত স্বাধীন সার্বভৌম, তখন তার কর্তৃত্ব ও যোগ্যতা ততটাই থাকত যতটা দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের থাকত। কিন্তু এখনকার দাসত্ব হচ্ছে গোটা জাতির। জাতির জন্মই হয় দাসত্বের অবস্থায় তাদের বাপ-দাদার মতই। এই দাসত্ব সাধারণ ও স্থায়ী। একটি অন্ধ জুলুমকারী শক্তি তাদের দাসত্ব শৃংখলে বন্দী করে নেয় ও রাখে। এই দাসত্বের মুকাবিলা—প্রতিরোধ এবং তা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদের ওপর থেকে অপসারণ করার জন্যে যাকাতের এ অংশ ব্যয় করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তা কেবল যাকাত সাদকার দ্বারাই নয়, সমস্ত ধন-মাল ও প্রাণ দিয়েই তা করতে হবে।

এ থেকে আমরা এ-ও বুঝতে পারি, এ পর্যায়ের ইসলামী জাতিসমূহকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে দুনিয়ার ধনী মুসলিমদের বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।[২]

সাইয়্যেদ রশীদ রিজা ও মাহ্‌মুদ শালতুত এই যা কিছু বলেছেন, তা বলেছেন الرقاب। শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য স্বরূপ। তাতে ব্যক্তি ক্রীতদাসের পর্যায়ে এসে গেছে জাতি বা গোত্র ক্রীতদাস। মূলের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

তবে আমার কথা হচ্ছে, যে বাক্য বা শব্দের তাৎপর্যে এ ব্যাপকতা নেই, তাতে কৃত্রিমভাবে ব্যাপকতা নিয়ে আসার কোন প্রয়োজনই আমাদের নেই। আমরা তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামী থেকে মুক্তি লাভের সংগ্রামে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা যাকাতের বন্টন ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি—তা হচ্ছে : سبيل الله-এর অংশ। যদিও রাষ্ট্রের অপরাপর আয়ও এ কাজে ব্যয় হতে পারে। বরং এজন্যে সমস্ত মুসলিম জনতা ও রাষ্ট্রের প্রধানগণ এগিয়ে আসা একান্তভাবেই কর্তব্য।

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٩٨

২. الاسلام عقيدة وشريعة ص ٤٤٦

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'আল গারেমূন'—ঋণগ্রস্ত লোকগণ

কুরআনের আয়াত অনুযায়ী যাকাতের ষষ্ঠ ব্যয়-ক্ষেত্র হচ্ছে, আল-গারেমূন—ঋণগ্রস্ত লোকগণ। কিন্তু 'গারেমূন' বলতে কোন্ সব লোক বোঝায়?

'গারেমূন' কারা

'গারেমূন' বহুবচনের শব্দ। একবচনে 'গারেম' غارم ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে 'গারেম' বলা হয়।[১] তবে 'গরীম' বলা হয় ঋণ গ্রহীতাকে, যদিও ঋণদাতাকে বোঝাবার জন্যেও এই শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। আর عرم শব্দের আসল অর্থ অপরিহার্যতা, লেগে যাওয়া। জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা ঃ– انَّ عَذَا بَهَا كَانَ غَرَامًا 'নিশ্চয়ই জাহান্নামের আযাব অবশ্যম্ভাবী'! এ থেকেই 'গারেম' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা ঋণ তার ওপর চেপে বসেছে, অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে (তা ফিরিয়ে দেয়া)। আর 'গরীম' বলা হয় এজন্যে যে, ঋণদাতার সাথে তার ঋণের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ হানীফার মতে غارم হচ্ছে 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।'—যার ওপর ঋণ চেপেছে, ঋণ পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের সে মালিক নয়।[২] (তাই সে যাকাত পেতে পারে।) ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, 'গারেমূন' দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ঋণ গ্রহণ করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে সমাজ সমষ্টির কল্যাণে ঋণ গ্রহণকারী। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে আলাদা-আলাদা আইন-বিধান রয়েছে।

---

১. ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেছেন, 'গারেমূন' হচ্ছে সেই লোক যার ওপর ঋণ চেপেছে অথবা লোকদের নিকট যার পাওনা রয়েছে, কিন্তু তা আদায় করতে পারছে না, তাকেও 'গারেম' বলার প্রচলন আছে। এই লোকের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই বলে তার ওপর যাকাত ফরয হয় না। কিন্তু এই কথাটিতে আপত্তি আছে। কেননা আভিধানিকভাবে 'গারেম' কেবল তাকেই বলা হয়, যার ওপর ঋণ চেপেছে। সম্ভবত 'গারেম' ও 'গরীম'-একই ধরনের দুটি শব্দে তার বিভ্রান্তি ঘটেছে। কেননা 'গরীম' বলতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়কেই বোঝায়। মানুষ তো, ভুলের উর্ধ্বে কেবলমাত্র আল্লাহ। তবে الفتح। গ্রন্থে যে রূপটির উল্লেখ হয়েছে, তা সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যার পাওনা রয়েছে লোকদের নিকট......... তাকেও যাকাত দেয়া জায়েয। কেননা সে কার্যত ফকীর—নিঃস্ব পথিক। সে ঋণগ্রস্ত বলে নয়। দেখুন ঃ حاشيه ردالمحتار ج ٢ ص ٦٣

২. البحر الرائق ج ٢ ص ٢٦٠.

নিজের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণকারী লোক

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সেসব লোক যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অর্থ ঋণ করে থাকে। ঘরের প্রয়োজন, কাপড়-চোপড় খরিদ, বিবাহ অনুষ্ঠান, কিংবা রোগের চিকিৎসা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামাগ্রী বা সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, কিংবা সন্তানের বিবাহ দান প্রভৃতি কাজে অথবা ভুলবশত অপরের কোন জিনিস নষ্ট করে দেয়া ইত্যাদি কারণে ঋণ করেছে। তাফসীর লেখক ইমাম তাবারী আবূ জাফর কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'গারেম'—ঋণকারী অপচয়কারী নয়—রাষ্ট্রপ্রধানের উচিত তার এই ঋণটা বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করে দেয়া।[১]

আকস্মিক বিপদগ্রস্তরা এই পর্যায়ে গণ্য

এ গুণটির বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় সেসব লোকের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে জীবনের কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয়েছে। তারা এমন সব আঘাত পেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে যে, তাদের ধন-মাল সবই নিঃশেষে শোষিত হয়েছে। তখন তারা প্রয়োজনবশতই নিজেদের ও পরিবারবর্গের জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তিনজন লোক 'ঋণগ্রস্ত' 'গারেম'রূপে গণ্যঃ একজন, যার ধন-মাল ফসল-ফল বন্যায় ভেসে গেছে। দ্বিতীয় জন যার সব কিছু জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে আর তৃতীয়, যার বহু সন্তান ও পরিজন, কিন্তু তার ধন-মাল বলতে কিছুই নেই। সে ঋণ নিয়ে পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করতে বাধ্য হয়।[২]

কুবাইচাতা ইবনুল মাখারিকের—আহমাদ ও মুসলিম উদ্ধৃত হাদীস-এ বলা হয়েছে, যে লোক বিপদগ্রস্ত হয়ে সব ধন-মাল খুইয়েছে, রাষ্ট্র-সরকারের নিকট যাকাত ফাণ্ড থেকে তার হক্ পাওয়ার জন্যে দাবি করা সম্পূর্ণ জায়েয ও মুবাহ, যেন সে জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজন পরিমাণ লাভ করতে পারে। ('গারেমীন' সম্পর্কিত দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় আমরা এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করব।)

এভাবে যাতে বিপদ মুকাবিলার লক্ষ্যে সামষ্টিক নিরাপত্তা দানের (Social security) দায়িত্ব পালন করে। আকস্মিকভাবে বিপদে পড়া লোকেরা নিজেদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা লাভ করতে পারে যাকাত ব্যবস্থার দরুন। বিশ্ব-সমাজ এর পূর্বে এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার সাথে কিছুমাত্র পরিচিত ছিল না। জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রচলন নিতান্তই এ কালের ব্যাপার।

তবে ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে তার লোকদের জন্যে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা অধিকতর উন্নত, পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর—জীবন বীমার তুলনায়। পাশ্চাত্য জগত আধুনিককালে পর্যায়ক্রমে এই বীমার ব্যবস্থা খাড়া করেছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য

---

১. تفسير الطبرى، بتحقيق محمود شاكر ج ١٤ ص ٣٢٨

২. مصنف ابن ابى شيبة ج ٣ ص ٢٠٧ ط حيدراباد، وانظر الطبرى السابق

পদ্ধতিতে তা থেকে উপকৃত হতে পারে কেবলমাত্র সেসব লোক, যারা কার্যত তার পলিসি ক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণে বীমা কোম্পানীর কিস্তি আদায় করতে সমর্থ হয়। আর বিনিময় দেয়ার সময় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঠিক ততটা পরিমাণই দেবে, যার সে বীমা করেছে। কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে বা যা তার প্রয়োজন, সে পরিমাণ অর্থ তাকে কখনও দেবে না। ফলে যে লোক বিরাট পরিমাণ টাকার বীমা ক্রয় করেছে, বড় বড় কিস্তি দিয়েছে, সে বড পরিমাণ বিনিময় লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে লোক সামান্য পরিমাণের পলিসি করেছে, সে সেই দৃষ্টিতে সামান্য পরিমাণই পাবে—তার বিপদটা যত বড় এবং প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন। আর কম আয়ের লোকেরা যে খুব সামান্য পরিমাণেরই বীমা পলিসি করতে পারে, তা তো জানা কথাই। এরূপ অবস্থায় তার বিপদ যত বড়ই হোক, প্রাপ্য হবে খুবই কিঞ্চিৎ। তার কারণ হচ্ছে, পাশ্চাত্য বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে ব্যবসায়িক এবং বীমাকারী লোকদের দেয়া টাকার মধ্য দিয়ে মালিক পক্ষের বিপুল পরিমাণে মুনাফা কামাই করে নেয়ার নীতির ওপর সংস্থাপিত।

কিন্তু ইসলামী সামজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্বে প্রদত্ত কিস্তির শর্তের ওপর স্থাপিত নয়। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেখানে দেয়া হবে তার প্রয়োজন পরিমাণ, ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে, যেন তার অসুবিধাটা দূর হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণকারীকে সাহায্য দেয়ার শর্ত

এই প্রকারের ঋণগ্রস্তকে ঋণ-শোধ পরিমাণে দেয়া হবে। তবে সে-জন্যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ অবশ্যই রক্ষা করতে হবে ঃ

প্রথম শর্তঃ তার প্রয়োজনটা হবে ঋণ শোধ করার। সে যদি ধনী হয় নগদ টাকা বা তার নিজের জিনিসপত্র দিয়ে তা শোধ করতে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে না।[১] তার নিকট যদি ঋণের কিছু অংশ শোধ করার মত অর্থ থাকে, তাহলে অবশিষ্ট পরিমাণ ঋণ শোধ করার জন্যে যাকাত থেকে দেয়া যাবে। আর যদি তার কোন জিনিসই না থেকে থাকে, সে শ্রম করে উপার্জন করে ঋণ শোধ করতে সক্ষম হয় তাহলেও তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা সে যদি তা কামাই-রোজগার করে শোধ করতে পারেও, তবু তা সে পারবে দীর্ঘদিন পর। এই সময়ের মধ্যে ঋণ শোধের প্রতিবন্ধকও কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু ফকীরের অবস্থা ভিন্নতর। সে তো বর্তমানেই উপার্জন করে তার প্রয়োজন পূরণে সমর্থ তবুও তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

ঋণগ্রস্তের ঋণ-শোধ পরিমাণ প্রয়োজনের শর্ত করা অর্থ এই নয় যে, তাকে একেবারে শূন্য হাত—কিছুরই মালিক নয়, এমন হতে হবে।

---

১. ইমাম শাফেয়ীর কথা হচ্ছে, তার স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে দেয়া যাবে। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। সে নিজস্ব প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণকারী। দেখুন المجموع ج ٦ ص ٢٠٧ نهاية المحتاج। ٦ص ١٥٥

বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, দারিদ্র্য বিচারে বসবাসস্থল—ঘর-বাড়ি, কাপড়-চোপ, বিছানা, তৈজসপত্র ইত্যাদি গণ্য করা হবে না। এমন কি, অবস্থার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় খাদেম ও যানবাহন থাকলেও তা গণ্য করা যাবে না। এসবের মালিক হলেও ঋণগ্রস্তের ঋণ শোধ করা যাবে যাকাতের টাকা দিয়ে।

ঋণগ্রস্তের যদি এতটা পরিমাণ মাল-সম্পদ থাকে, যা দিয়ে ঋণ শোধ করা হলে সে মাল-সম্পদ তার জীবিকা নির্বাহের জন্যে যথেষ্ট হবে না, তাহলে তার জন্যে যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ মাল রেখে দিতে হবে, অবশিষ্ট পরিমাণ ঋণ শোধ করার জন্যে যাকাত থেকে দেয়া হবে।

'যথেষ্ট পরিমাণ' বলতে—শাফেয়ী আলিমদের মতে—পূর্বে বিশ্লেষণ করা 'যথেষ্ট পরিমাণ' বোঝানো হয়েছে। তা হচ্ছে, বাহ্যত যতদূর বোঝা যায়, বেশির ভাগ জীবনের জন্যে যথেষ্টভাবে প্রয়োজন-পূরণকারী পরিমাণ। অতঃপর কোন জিনিস অতিরিক্ত হলে তা তার ঋণ শোধে ব্যয় করা হবে। যা অপূরণ থাকবে, তা যাকাত ফাণ্ড থেকে দিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ লোকটি ঋণ গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌র বন্দেগী পালন বা কোন মুবাহ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে—এরূপ হতে হবে। যদি কোন নাফরমানীর কাজ করার জন্যে ঋণ করে থাকে—মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়া বা হাস্য-কৌতুক, চিত্ত-বিনোদন প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের কোন হারাম কাজ করার জন্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে নিজের ও পরিবারবর্গের জন্যে অপব্যয়-অপচয়ের জন্যে ঋণ করে থাকলেও দেয়া যাবে না—তা মুবাহ পর্যায়ের কাজ হলেও। কেননা মুবাহ কাজের জন্যে ঋণ হওয়ার পরিমাণ ব্যয় করা মুসলিম ব্যক্তিমাত্রের জন্যেই হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَابَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর এবং তোমরা খাও, পান কর; কিন্তু অপচয় করো না। কেননা আল্লাহ্ অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩১)

ঋণ করে মুবাহ কাজ করা ইসরাফ বা বেহুদা খরচ পর্যায়ে গণ্য। আয়াতে তাই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

পাপ কাজে ব্যয় করার জন্যে ঋণ গ্রহণকারীদের যাকাত দেয়া যাবে না এ কারণে যে, তা দিলে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে তাকে সাহায্য ও সহায়তা করা হবে। তার এই পাপ কাজে তার অনুসরণ করতে অন্যদেরকেও উৎসাহিত করা হবে। তবে সে যদি তওবা করে, তাহলে সে যাকাত থেকে ঋণ শোধ করতে পারে। তওবা করলেই সে তা

পাবে। কেননা তওবা অতীতের পাপ ধুয়ে মুছে ফেলে। পাপের কাজ থেকে তওবাকারী পাপমুক্ত ব্যক্তির মতই।

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ অবশ্য শর্ত করেছেন, পাপ কাজ থেকে তওবা করার ও তা প্রকাশ করার পর এমন একটা সময় অতিবাহিত হওয়া উচিত, যার মধ্যে তার অবস্থার সংশোধন হওয়া ও তওবার ওপর স্থির থাকার কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। অন্যরা বলেছেন, তার তওবার সত্যতা ও যথার্থতার ওপর একটা সাধারণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা গেলেই যাকাত দেয়া যাবে, মেয়াদ তার যত স্বল্পই হোক-না-কেন।

তৃতীয় শর্ত ঃ ঋণটা সাম্প্রতিক হতে হবে। ঋণ যদি বিলম্বিত হয়, দীর্ঘমেয়াদী হয়, তাহলে তা শোধের জন্যে যাকাত দেয়া যাবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, দেয়া যাবে। কেননা সে তো 'গারেম' ঋণগ্রস্ত। কুরআনের সাধারণ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দেয়া যাবে না। কেননা সে এক্ষণে তার জন্যে ঠেকা নয়। আবার অন্যরা বলেছেন, যদি সেই মেয়াদটা সেই বছরই শুরু হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে, অন্যথায় সেই বছরের যাকাত থেকে তাকে দেয়া যাবে না।[১]

এই গ্রন্থকারের মতে গ্রহণীয় কথা হচ্ছে, উপরিউক্ত কোন একটি মত অনুযায়ী কাজ করার পূর্বে যাকাতলব্ধ সম্পদের পরিমাণ ও সর্বশ্রেণীর প্রাপকদের সংখ্যা ও তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ দেখা আবশ্যক। যদি লব্ধ সম্পদের পরিমাণ বিরাট হয় এবং পাওয়ার যোগ্য লোকদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম হয়, তাহলে প্রথমোক্ত মতটি গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে এবং যাকাত থেকে তাকে দেয়া যাবে—তার ঋণ সাময়িক দেয় হোক কি দীর্ঘ মেয়াদী। যদি ব্যাপারটি এর বিপরীত হয়, তাহলে দ্বিতীয় মত অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তখন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহীতার ওপর অন্যান্য শ্রেণীর প্রাপকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যদি ব্যাপার মধ্যম ধরনের হয়, তাহলে তৃতীয় মতটি গ্রহণীয় হবে (প্রকৃত কথা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)।

যাকাতদাতা যদি ব্যক্তিগতভাবেই যাকাত বণ্টন করে, তাহলে সে তার বিবেচনায় অধিক প্রয়োজনশীল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কম প্রয়োজনশীলের ওপর অগ্রাধিকার দেবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ ঋণটা এমন হতে হবে যেজন্যে ঋণ গ্রহীতাকে কয়েদ করা যেতে পারে। সন্তানের ঋণও তার পিতার ওপর বর্তাতে পারে। কম আয়ের লোকের ঋণও হতে পারে। তবে কাফ্‌ফারা ও যাকাত দেয়ার দরুন গৃহীত ঋণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা যে ঋণের দরুন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করা যেতে পারে, তা হচ্ছে মানুষের নিকট থেকে গ্রহণ করা ঋণ। আর কাফ্‌ফারা ও যাকাত পর্যায়ের কাজগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্যে।[২]

---

১. এসব শর্তের উল্লেখ হয়েছে ঃ شـرح الـخـرشـى على خليل ج ٢ ص ٢١٨نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٥٤ المجموع ج ٦ ص ٢٠٧

২. দেখুন ঃ حاشية الصاوى ج ١ ص ٢٣٢

এই যা বলা হল, তা মালিকী মাযহাবের মত। সব ফিকাহ্‌বিদই এই শর্তগুলো আরোপ করেন নি। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ যাকাতকে সেসব ঋণের মধ্যে গণ্য করেন, যার দাবি জনগণের পক্ষ থেকে করা হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান করে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহীতাকে কত দেয়া হবে

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে লোক ঋণ গ্রহণ করেছে, তাকে তার প্রয়োজন পরিমাণ দিতে হবে। আর এখনকার প্রয়োজন হচ্ছে তার ঋণ শোধ করা। তাকে যদি সামান্য পরিমাণ দেয়া হয়, তাহলে সে ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে না তার দ্বারা। বরং তখন ঋণদাতা তাকে হয় ক্ষমা করে দেবে, কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্যরা তা দিয়ে দেবে কিংবা সে যাকাত ছাড়া অন্য মাল দ্বারা শোধ করবে, যথার্থ কাজ হবে তার নিকট থেকে তা ফিরিয়ে নেয়া হলে। কেননা তার তো সে পরিমাণের প্রয়োজন নেই।[১] ঋণের পরিমাণ কম হোক কি বেশি, তা শোধ করাই কাম্য এবং তাকে এই দায়িত্বের ঝুঁকি থেকে নিষ্কৃতি দানই আসল লক্ষ্য।

ঋণগ্রস্তদের প্রতি ইসলামের ভীতি প্রদর্শন

ঋণগ্রস্ত ও ঋণ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপরে সাধারণভাবে দ্বীন ইসলামের ভূমিকা ভীতিপূর্ণ ও অনন্য।

ক. ইসলাম প্রথমত মুসলিম জনগণকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ ইনসাফভিত্তিক নীতি গ্রহণের শিক্ষা দেয়, যেন কোন কারণেই তারা ঋণ গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়ে না পড়ে।

খ. মুসলিম ব্যক্তি যদি জীবন-জীবিকার জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, যত শিগ্‌গির সম্ভব সে ঋণ ফেরত দেয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। তাহলে সে তার ঋণ শোধের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবে, সহযোগিতা পাবে—তার নিয়ত অনুযায়ী। 'যে লোক জনগণের মাল-সম্পদ নেবে তা ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ত সহকারে, আল্লাহ্‌ই তা তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন (আদায়ে সাহায্য করবেন)।' আর যে লোক তা নেবে তা ধ্বংস বা নষ্ট করার নিয়তে, আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন।[২]

গ. ঋণ আদায়ের দৃঢ় সংকল্প ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তার সব বা আংশিক ঋণ আদায়ে অক্ষম থেকে যায়, তাহলে রাষ্ট্র তাকে পিঠ চূর্ণকারী ও মানুষের মস্তক অবনতকারী এই ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্যে এগিয়ে আসবে। এজন্যেই বলা হয়েছে।

اَلدَّيْنُ هُمٌّ بِاللَّيْلِ وَمَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ-

ঋণ রাত্রিকালের দুশ্চিন্তা এবং দিনের আলোয় অপমানকারী।

---

১. المجموع ج ٦ ص ٢٠٩

২. বুখারী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ, আবূ হুরায়রা বর্ণিত (কাঞ্জুল-উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড-১১৪ পৃ.)।

নবী করীম (স) সব সময়ই এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মহান আল্লাহ্র নিকট পানা চাইতেন। বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَا تَةِ الْاَعْدَاءِ-

হে আমাদের আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানা চাই ঋণের প্রচণ্ডতা, শত্রুর দাপট ও শত্রুদের তিরস্কার থেকে।[১]

ঋণ কেবলমাত্র ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব ও মনের প্রশান্তির ওপর কঠিন বিপদ নিয়ে আসে তাই নয়, তার চরিত্র ও নৈতিকতার ওপর তা বড় আঘাতও বটে। তাঁর আচার-আচরণকেও প্রভাবিত করে সাংঘাতিকভাবে। বুখারী বর্ণিত একটি হাদীস এই বিষয়ে আমাদের সাবধান করেছে। নবী করীম (স) আল্লাহ্র নিকট খুব বেশি-বেশি পানা চাইতেন ঋণগ্রস্ততা থেকে। সাহাবিগণ এর গভীরে নিহিত কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোন্ কারণে তা থেকে এত বেশি বেশি পানা চাইছেন? ঋণ থেকে পানা চাওয়ার সাথে সাথে কবর আযাব থেকেও পানা চাইতেন, খুব দীর্ঘজীবন ও মরণের ফেত্না, মসীহ্ দাজ্জালের ঈমান নষ্টকারী বিপদ থেকেও রক্ষা পেতে চাচ্ছেন কেন? তাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন ঃ 'ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে।'—(এটাই সাধারণ নিয়ম) (বুখারী كتاب الاستعراض باب ، من استعاذ من الدين) এটা নবী করীম (স)-এর প্রসঙ্গক্রমে বলা একটি অতীব সত্য কথা। এ থেকে মানুষের নৈতিকতা ও আচার-আচরণের ওপর অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক প্রভাবের কথা অকাট্যভাবে জানতে পারে যায় এবং এ কথাটি সত্যই অনস্বীকার্য। তবে মানব চরিত্রের ওপর কেবল অর্থনীতিই একক প্রভাবশালী শক্তি বলে যারা মনে করে, তাদের এই মতকে আমরা সম্পূর্ণ অসত্য বলে বিশ্বাস করি।

নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরামের মনে ঋণ গ্রহণের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তার সাহাবীদের মধ্যে কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে মরলে ও তা আদায় করার ব্যবস্থা রেখে না গিয়ে থাকলে তার জানাযা নামাযই তিনি পড়তেন না। আর এটা ছিল ঋণগ্রস্ততা থেকে সাহাবীদেরকে বিরত রাখার জন্যে তার প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। কেননা তাঁদের প্রত্যেকেই চূড়ান্তভাবে বাসনা পোষণ করতেন মৃত্যুর পর নবী করীম (স)-ই যেন তাঁর জানাযা নামায পড়ান, যেন তিনি তার জন্যে দো'আ করেন। আর তা না হলে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় তাদেরকে কাতর করে ফেলত। তাঁরা মনে করতেন, এটা একটা অপূরণীয় ভয়াবহ ক্ষতি বিশেষ।

উত্তরকালে আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে বিপুল বিজয় ও ধন-দৌলত দিলেন, বায়তুলমালের আয় যখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন তিনি নিজেই

---

১. হাফেয-মুহাদ্দিস 'বুলুগুল মারাম' গ্রন্থে বলেছেন (৩১৩ প.) হাদীসটি নাসায়ী আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে রাসূলে করীম (স)-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন।

মুসলমানদের ঋণ শোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-এর সম্মুখে যখন কোন লাশ নিয়ে আসা হত জানাযা নামাযের জন্যে, যার ওপর ঋণ চেপে আছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, ঋণ শোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে কিনা? যদি বলা হত যে, ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে গেছে, তাহলে তিনি তার নামায পড়তেন। অন্যথায় তিনি বলতেন, 'তোমরাই তোমাদের সঙ্গীর জানাযা নামায পড়।' অতঃপর যখন তাকে ব্যাপক বিজয় দান করলেন আল্লাহ্ তা'আলা, তখন তিনি বললেন ঃ

اَنَااَوْلٰى بِالْمُؤْ مِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوَ فِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاءُهُ-

(بخاری، مسلم)

মুমিনদের জন্যে আমি তাদের নিজেদের তুলনায়ও অধিক উত্তম। যে লোক ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তা শোধ করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে।

ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে এই হাদীসে বিপুলভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে। এতেই ভ্রাতৃত্বের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নিহিত। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার এটাই বাস্তব পন্থা। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের এ একটা মহৎ উপায়। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি ফলের ব্যবসায়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে তা বিক্রয় করে দেয়; কিন্তু তার ঋণের পরিমাণ বিপুল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে হয়ে যায় নিতান্ত গরীব। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তোমরা সকলে লোকটিকে সাহায্য কর। লোকেরা তার প্রতি দান-সাহায্য করল। কিন্তু তাতে তার ঋণ শোধ হওয়া পরিমাণ সম্পদ পাওয়া গেল না। তখন নবী করীম (স) পাওনাদারদের বললেন ঃ 'যা পাও নিয়ে নাও। তোমরা এ ছাড়া আর কিছু পেতে পার না।'[১]

লোকদের যাকাতের মালে 'গারেমূন'-এর জন্যে যে অংশটি কুরআন মজীদে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা পাওনাদারদের ঋণের এই বোঝা খতম করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্র নির্ধারণ বিশেষ।

ইসলামে আইন প্রণয়নের মৌল ভাবধারা ও পদ্ধতি এটাই। ইসলাম ঋণগ্রস্তদের গলদেশ ঋণের শৃংখল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে—তলিয়ে যাওয়ার গভীর গহ্বরের মুখ থেকে তাকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে এই বাস্তব ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। ঋণের কারণে কাউকে নির্যাতিত ও নিঃস্ব হয়ে যেতে এবং দারিদ্র্যের চরম প্রকাশ ঘটাতে ইসলাম নারাজ। ইসলাম ভিন্ন দুনিয়ার অপর কোন সমাজ-বিধান ঋণগ্রস্ত নাগরিকদের ঋণের বোঝার কঠিন দুঃখের চাপ থেকে মুক্তকরণের লক্ষ্যে এরূপ কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায় না। এটা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্রই নির্ধারণ।

---

১. بلوغ المرام ص ١٧٧؛ باب التفليس والحجو

ইসলাম যাকাতের মাল থেকে সৎকাজের দরুন ঋণী হওয়া লোকদের ঋণ মুক্তির এই ব্যবস্থা করেছে দুটি বিরাট লক্ষ্যে ঃ

প্রথম ঃ তার সম্পর্ক সেই ঋণগ্রস্তের সাথে, যার ওপর ঋণ চেপে বসেছে। তদ্দরুন সেদিনের লজ্জায় ও রাতের দুশ্চিন্তায় ভয়ানকভাবে কাতর হয়ে পড়েছে। ঋণ ফেরত দেয়ার দাবি ও চাপে এক চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পাওনাদারদের মামলায় কারাগমনের কারণ ঘটে গেছে। এ ছাড়া নানারূপ নির্যাতন-নিষ্পেষণের অবস্থাও দেখা দিয়েছে। ইসলাম এই ব্যক্তির ঋণ আদায় করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং যে জিনিস তাকে চিন্তায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, তা দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ তার সম্পর্ক ঋণদাতার সাথে যে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়েছে, তার শরীয়াতসম্মত কাজে তার সহায়তা করেছে। এরূপ অবস্থায় ইসলাম যেমন তার প্রাপ্য ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার সহায়তা করেছে, তেমনি সমাজ-সমষ্টির লোকদেরকে সহানুভূতিপূর্ণ আচার-আচরণ, সহযোগিতা ও বিনা সুদে ঋণ দিতেও যথেষ্টভাবে উৎসাহ দান করেছে। এদিক দিয়ে বলা চলে, যাকাত সুদী কারবারের প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বস্তুত ইসলামী শরীয়াত কঠিন বিপদে পড়া এসব ঋণ গ্রহীতাদের হস্ত মজবুতভাবে ধারণ করেছে। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র বিক্রয় করে ঋণ শোধ করতে তাদের বাধ্য করা হয়নি। কেননা তাহলে তো প্রতিটি মানুষ ও পরিবার জীবনের মৌল উপকরণ–উপাদানাদি থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। সব সুখ-শান্তি-সুবিধার সরঞ্জামাদি থেকেই বঞ্চিত হয়ে যেতে বাধ্য হবে। না, ইসলাম তা চায় না, তা হতে দিতে পারে না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর খিলাফত আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, 'তোমরা ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ পরিশোধ করে দাও।' একজন শাসনকর্তা জবাবে লিখেছিলেন, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, এক ব্যক্তির ঘর-বাড়ি আছে, খাদেম-সেবক, অশ্বযান ও ঘরের আসবাবপত্র সবই আছে, তা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় কি করা যাবে ? হযরত দ্বিতীয় উমর লিখে পাঠালেন, 'জেনে রাখ, মুসলিম নাগরিক মাত্রের জন্যেই বসবাসের ঘর-বাড়ি, কষ্টের কাজে সাহায্যকারী খাদেম এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করার জন্যে অশ্ববাহন একান্তই জরুরী। সেই সাথে তার ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও থাকতে হবে। হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও তার ঋণ শোধ কর। কেননা সে (কুরআনী পরিভাষানুযায়ী) 'গারেম'।[১]

এটাই ইসলামী শরীয়াতের অবদান। তা চৌদ্দশ' বছর থেকেই মানুষের প্রতি সুবিচার, ন্যায়পরতা ও দয়া-অনুগ্রহের এই অবদান নিয়ে বিশ্বের জনসমক্ষে সমুপস্থিত।

এর তুলনায় মানব রচিত মতবাদ ও আইন-বিধান মানবতাকে কি দিয়েছে ? অথচ তাকেই সভ্যতা ও আধুনিক সংস্কৃতির উচ্চতর দৃষ্টান্ত মনে করা হচ্ছে ? কিন্তু তাই ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দারিদ্র্যের ঘোষণা দেয়ার, তাদের ব্যবসায় সমস্যার জটিলতা

---

১. الاموال ص ٥٥٦

বিধানে এবং পরিমাণে তাদের ঘরবাড়ি সর্বস্বান্ত ও উজাড় করে দিতে বাধ্য করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজ বা সরকার তাদের ঋণমুক্তির কোন কার্যকর ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না!

রোমান আইনই বা ন্যায়বাদী দয়াশীল ইসলামী শরীয়াতের মুকাবিলায় কোন্ অবদানটা রেখেছে ? দুস্থ মানবতার বিপদমুক্তির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ? রোমান আইন তো ঋণদাতাকে এই অধিকার দিয়েছে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ শোধ দিতে অক্ষম হলে তাকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে। 'বারো পর্যায়ের আইন' নামক রোমান আইনে বলা হয়েছে, 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ শোধ করতে অক্ষম হলে তাকে ক্রীতদাস বানানোর নির্দেশ দেয়া হবে—যদি সে স্বাধীন নাগরিক হয়ে থাকে। আর সে ক্রীতদাস হলে তাকে কয়েদ করার বা হত্যা করার হুকুম হবে।[১]

জাহিলিয়াতের যুগে আরব সমাজেও এই বিধানই পরিচিত ও ব্যাপকভাবে কার্যকর ছিল। ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিকে ধরে ক্রীতদাস বানিয়ে বিক্রয় করা হত এবং এভাবেই ঋণদাতার প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হত। কারো কারো বর্ণনা মতে ইসলামের প্রথম যুগেও এটা চালু ছিল। পরে অবশ্য তা বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দাস বানানোর কোন উপায়ই থাকেনি ঋণদাতার পক্ষে।[২] আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ط وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- (البقره- ٢٨٠)

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অর্থশূন্য দরিদ্র হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে দেয়া সম্ভব এমন সময়ের অবকাশ অবশ্যই দিতে হবে। আর তোমরা যদি পাওনাটা সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে তো তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম—যদি তোমরা জান।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ অন্য লোকের কল্যাণে ঋণগ্রস্ত হওয়া

ঋণগ্রস্ত লোকদের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে দানশীল উদার হস্ত লোক সমষ্টি। তাদের আত্মা অনেক বড় ও উচ্চ। তা ইসলামী ও আরব সমাজেই কেবল সুপরিচিত, সুলভ। এরা পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের কাজে নেমে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তটা এরূপ হতে পারে যে, একটা বিরাট জনসমষ্টি—দুটি গোত্র বা দুটি জনবসতি—হত্যাকাণ্ড ধনসম্পত্তির জন্য পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে কারণে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তখন কেউ অগ্রসর হয়ে এই বিবদমান জনসমষ্টির মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিতে চেষ্টা চালায়। তখন হয়ত সে পারস্পরিক বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু কোন ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেয়—বিবাদের

১. এই কথা গ্রন্থকার كتاب روح الدين الاسلامى ৩২৮ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

২. تفسير القرطبى ج ٣ ص ٢٧١

জ্বলন্ত আগুনের নিভানোর উদ্দেশ্যে। এটা একটা ব্যাপক প্রচলিত প্রথা। এরূপ অবস্থায় দায়িত্ব বোঝাটা যাকাতের 'গারেমূন'-এর জন্য নির্দিষ্ট অংশ থেকে বহন করা যাবে যেন সমাজের সংশোধন প্রয়াসী কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দ নিজেদের ওপর এই বোঝা চাপিয়ে নিয়ে নিষ্পিষ্ট হতে বাধ্য না হন কিংবা তদ্দরুন তাদের সংশোধন-সংকল্পও ব্যাহত ও পর্যুদস্ত হয়ে না পড়ে অথবা তার প্রতি অনীহা ও অনুৎসাহের সঞ্চার না হয়। এ কারণে ইসলামী শরীয়াত ব্যাপারটিকে এভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা দিয়েছে। এদের জন্যে যাকাতের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।[১]

আমাদের আলিম সমাজ যদি এই সিদ্ধান্ত দেন যে, পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার দরুন কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার এই ঋণ শোধের জন্যে তাকে যাকাতের অংশ দেয়া হবে। এই মীমাংসার ব্যাপারটা যিম্মীদের দুই দলের মধ্যকার বিবাদের ক্ষেত্রে হলেও তা করা যাবে।[২] তা হলে খুবই ভাল হয়।

জনসমষ্টির পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার পর্যায়ে সেই লোকেরাও পড়ে যারা কোন সামষ্টিক শরীয়াতসম্মত ভালো কাজের জন্যে দায়িত্ব সহকারে কাজ করবে। যেমন ইয়াতীমদের কোন প্রতিষ্ঠান, গরীবদের চিকিৎসায় নিয়োজিত কোন হাসপাতাল, নামাযের জন্যে কায়েম করা কোন মসজিদ, মুসলিমদের শিক্ষাদানের জন্যে প্রতিষ্ঠিত কোন মাদ্রাসা—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কল্যাণময় বা সামষ্টিক খেদমতের কাজ প্রভৃতি। এসবের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্যে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কাজেই সাধারণ ধন-সম্পদ থেকেই তার সাথে সহযোগিতা করতে হবে। 'গারেমীন' শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসাকারী লোকদেরই বুঝতে হবে, অন্য কেউ তার মধ্যে শামিল হতে পারবে না, এমন কথা শরীয়াত থেকে জানা যায় না। ওরা যদি গারেমীন-এর শব্দে গণ্য নাও হয়, তবু 'কিয়াস'-এর সাহায্যে এই বিধান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

তার অর্থ, যে লোক উক্তরূপ সামষ্টিক কল্যাণকর কাজ-কর্মের দরুন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তাকে যাকাত ফাণ্ড থেকে তার ঋণশোধ পরিমাণ অর্থ অবশ্যই দিতে হবে—সে নিজে ধনশালী ব্যক্তি হলেও। কোন কোন শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদ একথা বলিষ্ঠভাবেই বলেছেন।[৩]

প্রথম প্রকারের লোকেরা যখন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করার বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে, তাহলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তো

---

১. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٤٣ ২. দেখুন ঃ الروض المربع ج ١ ص ١٢٠٢

৩. কোন কোন শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, কেউ যদি ইমারত নির্মাণ বা বন্দীমুক্তিকরণ কিংবা মেহ্‌মানদারী প্রভৃতির জন্যে ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে—যদি সে ধনীও হয় এবং তার এই ধনশীলতা যদি জমি-জায়গা থেকে হয়, নগদ অর্থের কারণে না হয়। দেখুনঃ الروضه للنووى ج ٢ ص ٣١٧ রমলী বলেছেন, এই কথার ভিত্তিতে যদি বলা যায় যে, নগদ টাকায় ধনী হলেও কোন তারতম্য হবে না। কেননা এটা আল্লাহ্‌র এক সাধারণ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, তা হলে তা অস্বাভাবিক কথা হবে না। দেখুন نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٥٥

সামষ্টিক কল্যাণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, তারা তো অধিক উত্তমভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। প্রথম শ্রেণীর লোকদের যদি দলবদ্ধতা ছাড়া দেয়া না হয়, তাহলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের দেয়া হবে তাদের ধনশীলতা থাকা সত্ত্বেও।[১]

ইতিপূর্বে 'যাকাত সংস্থার কর্মচারী' পর্যায়ের আলোচনায় আমরা একটা হাদীস উদ্ধৃত করে এসেছি। তাতে বলা হয়েছে, 'পাঁচজন ছাড়া অন্যদের জন্যে যাকাত হালাল নয়।' তারা হচ্ছে ঃ মহান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধকারী কিংবা যাকাত সংস্থার কর্মচারী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ....

কুবাইচা ইবনে মাখারিক আল-হিলালী বলেছেন, আমি একটা বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করলাম। পরে আমি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ব্যাপারে কিছু সাহায্য পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি বললেন, দাঁড়াও, আমাদের কাছে যাকাতের মাল আসুক, তখন আমি তোমাকে তা থেকে দেয়ার জন্যে আদেশ করব।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে কুবাইচা, তিনজনের যে-কোন একজন ছাড়া অন্যদের জন্যে ভিক্ষা চাওয়া হালাল নয়। তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে কোন বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। সেজন্যে ভিক্ষা চাওয়া তার পক্ষে জায়েয—যতক্ষণ না সে তা পায় ও শেষ পর্যন্ত তা থেকে বিরত হয়ে যায় অর্থাৎ ভিক্ষা করা পরিহার করা। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যার কোন বিপদ ঘটেছে, যার দরুন তার সমস্ত ধন-মাল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েয, যেন সে জীবনের প্রয়োজনীয় সম্বল অর্জন করতে পারে (কিংবা বলেছেন, জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে)। আর তৃতীয় সে, যে অভুক্ত রয়েছে। এমন কি তার নিকটবর্তী যে কোন তিনজন লোক বলতে শুরু করেছে, অমুক ব্যক্তি অভুক্ত রয়েছে। তখন তার পক্ষে ভিক্ষা করা জায়েয, যেন জীবনে বেঁচে থাকার সম্বল সে পেতে পারে। অথবা বলেছে—জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এদের ছাড়া—হে কুবাইচা—অন্য কেউ ভিক্ষা করলে তা ঘুষ হবে এবং সে ঘুষের ন্যায় হারাম খাবে।[২]

হাদীসের কথা 'বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ' থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে লোক ব্যক্তিগতভাবে ধনী। কেননা ফকীরের জন্যে তো জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না।[৩]

বস্তুত পারস্পরিক সম্পর্কের সুস্থতা বিধান, শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপন বা রক্ষা করার জন্যে ঋণগ্রস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ দিয়ে সাহায্যকরণ ইসলামের একটা বিশেষ অবদান। বিপদগ্রস্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা এবং তাদের হাত এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করা—যেন তার পতিত অবস্থা থেকে সে উপরে উঠতে

---

১. এটা হবে তখন, যদি তারা নিজেরা নিজেদের মাল থেকে তা কার্যত না দিয়ে থাকে। কেননা সে অবস্থায় তারা নিজেরা ঋণগ্রস্ত হয়নি। আলিমগণ তাই বলেছেন।

২. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ নাইলুন আওতার ৪র্থ খণ্ড–১৬৮ পৃ.

৩. العبادة فى الاسلام এই গ্রন্থকার লিখিত ঃ ২২১- ২২২পৃ.

পারে। সন্দেহ নেই, এটা কেবলমাত্র ইসলামেরই এক বিশেষ অবদান। বিশ্বে যখন জিনিসপত্র, পণ্যদ্রব্য, জীবন ইত্যাদির ওপর দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের ক্ষেত্রে বীমা ব্যবস্থা চালু হয়নি—বিশ্ব মানব তার সাথে কিছু মাত্র পরিচিতও ছিল না, ঠিক তখনই এ সবের বহু পূর্বেই ইসলাম বাস্তবভাবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। অতএব যে দরিদ্র ব্যক্তির অনশন অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেশীর অন্তত তিনজন লোক সাক্ষৎ দেবে, তারই জন্যে দয়া ভরা দুটি বাহু বিস্তীর্ণ করে দেয়ার শিক্ষা মানুষকে ইসলামই দিয়েছে। অবশ্য একজন লোক অভুক্ত থাকলেই এবং দারিদ্র্যের দাবি করলেই তা করতে হবে এমন কথা নয়।

ইসলামের এই অবদানের ওপর আরও বড় অবদান হচ্ছে, যাকাত দেয়ার চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে জীবন-জীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দেয়া। সুখী জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকরণ—যার ফলে সে সত্যিই নিশ্চিত ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। কেবল দুই চার মুঠি খাবার দিয়ে তার মেরুদণ্ড খাড়া রাখাই তার উদ্দেশ্য নয়।[১]

মৃতের ঋণ শোধে যাকাত ব্যবহার

এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে, তা হচ্ছে, যাকাত দ্বারা যেমন জীবিত ব্যক্তির ঋণ শোধ করা যায়, তেমনি মৃত ব্যক্তির ঋণও কি শোধ করা যাবে ? ইমাম নববী এ পর্যায়ে শাফেয়ী মাযহাবের দুটি মতের উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, তা জায়েয নয়। বলা হয়েছে, সাইমারী, নখরী, আবূ হানীফা ও আহমাদ এই মতই পোষণ করতেন।

আর দ্বিতীয়, তা করা জায়েয। কেননা আয়াতে সাধারণভাবেই ঋণগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে। অতএব মৃতকে জীবিতের ন্যায় মনে করেই তার ঋণও শোধ করা যাবে। আবূ সওর এ মতই দিয়েছেন।[২]

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মৃতের ঋণ শোধে যাকাতের টাকা দেয়া জায়েয নয়। কেননা এ অবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত। তাকে তো দেয়ার উপায় নেই। আর যদি ঋণদাতাকে দেয়া হয়, তাহলে তা দেয়া হবে ঋণদাতাকে, ঋণগ্রস্তকে নয়।[৩]

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মৃতুর ঋণ শোধে যাকাত দেয়া জায়েয। কেননা আয়াত সাধারণ অর্থবোধক। তা সর্ব প্রকারের ও সর্বাবস্থার ঋণগ্রস্ত পরিব্যাপ্ত; সে জীবিত হোক, কি মৃত। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির ঋণ শোধ দিয়ে তার প্রতি একটা বদান্যতা দেখানোও সম্ভব এবং এটা সঠিক কাজ। মালিক ও আবূ সওরও এই কথা বলেছেন।[৪]

খলীলের মূল রচনার ওপর টীকা লিখতে গিয়ে খরশী বলেছেন ঃ ঋণগ্রস্তের ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না। রাষ্ট্রকর্তা যাকাত ফাণ্ড থেকে নিয়ে মৃতের ঋণ শোধ করে দেবে। বরং অন্যরা বলেছেন, মৃতের ঋণ বাবদ যাকাত প্রদান

---

১. المجموع للنووى ج ٦ ص ٢١١   ২. المجموع للنووى ج ٦ ص ٢١١

৩. المغنى ج ٢ ص ٦٦٧   ৪. দেখুন المجموع ج ٦ ص ٢١١

জীবিতের ঋণের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বসম্পন্ন যেহেতু তার ঋণ শোধ হওয়ার আর কোন আশা নেই। কিন্তু জীবিতের ঋণ সে রকম নয়।[১]

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন,[২] আমাদের আলিম ও অন্যরা বলেছেন, যাকাতের অর্থ দিয়ে মৃতের ঋণ শোধ করা যাবে। কেননা সেও 'গারেমীন' 'ঋণগ্রস্ত' লোকদের মধ্যে গণ্য। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَنَاأَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ-

> প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্যে আমি তার নিজের থেকে অধিক আপন। যে লোক ধন-মাল রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে লোক ঋণ অথবা (বলেছেন) অসহায় সন্তানাদি রেখে যাবে তা আমার ওপর ন্যস্ত হবে।[৩]

শিয়া জাফরী ফিকাহ্রও এই মত।[৪]

এই গ্রন্থকার একটি মতকে অগ্রাধিকার দিতে চান। শরীয়াতের অকাট্য দলিলসমূহ ও তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা যাকাত থেকে মৃতের ঋণ শোধ করতে কোন বাধা দিচ্ছে না, নিষেধও করছে না। কেননা আল্লাহ্ যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ দুই প্রকারের নির্ধারণ করেছেন। এক প্রকারের হল তারা যাদের পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে ل দিয়ে অর্থাৎ মালিক বানানো। তারা হচ্ছে, ফকীর, মিসকীন যাকাত কাজে নিযুক্ত কর্মচারী এবং মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম। এরা যাকাত পেয়ে তার মালিক হয়ে যায়। আর অপর ভাগের লোকদের উল্লেখ করেছেন في এর অধীন। তারা অবশিষ্ট চার শ্রেণীর লোক—দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত লোক, আল্লাহ্র পথে ও নিঃস্ব পথিক অর্থাৎ তিনি যেন বলেছেন, যাকাত 'গারেম' দের মধ্যে ব্যয় হবে, গারেমদের জন্যে বলেন নি। অতএব গারেমকে যাকাতের মালিক বানানোর প্রশ্ন নেই। ফলে তাদের ঋণ শোধ করা সম্পূর্ণ জায়েয। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই মত পসন্দ ও গ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে ফতোয়াও দিয়েছেন।[৫] উপরিউক্ত হাদীসও এই মতের সমর্থক।

যাকাত থেকে 'করযে হাসানা' দেয়া

এই পর্যায়ের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে আরও একটি বিষয়ে কথা বলতে হবে। তা হচ্ছে, যাকাতের টাকা 'করযে-হাসানা' স্বরূপ দেয়ার বিষয়... তা কি জায়েয হবে—যদি ঋণগ্রস্তদের মতই মনে করা যায় 'করযে হাসানা প্রার্থীদেরকে ?...না আমরা

---

১. দেখুন شرح الخرشي وحاشية العدوى عليه ج ٢ ص ٢١٨

২. تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٨٥

৩. হাদীসের শব্দ الضياع। বলতে ছোট ছোট শিশু সন্তান বোঝানো হয়েছে, যারা দারিদ্র্যের চাপে অসহায় বলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হাদীসটি বুখারী মুসলিম উদ্ধৃত।

৪. فقه الامام جعفر ج ٢ ص ٩١

৫. فتاوى ابن تيمية المنار كويت ج ١ ص ٢٩٩

আক্ষরিকভাবেই তাকে ধরে নেব ও তা জায়েয নয় মনে করব ? এই কথা ধরে নিয়ে যে, 'গারেম' হচ্ছে শুধু সেসব লোক, যারা কার্যত ঋণ গ্রহণ করেছে ?

আমি মনে করি, যাকাত পর্যায়ের সহীহ্ কিয়াস ও ইসলামের সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে 'গারেম'দের জন্যে নির্দিষ্ট যাকাত অংশ থেকে ঠেকায় পড়া লোকদেরকে 'করয' দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তবে সেজন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও একটি নির্দিষ্ট ফাণ্ড গড়ে তুলতে হবে। সুদী কারবার প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থাস্বরূপ যাকাতকে এভাবে বন্টন করা বাঞ্ছনীয়। 'করযে হাসানা' দান সুদী কারবার রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আবূ জুহ্‌রা, খাল্লাফ ও হাসান—একালের ইসলামী চিন্তাবিদগণ যাকাত সম্পর্কে উপরিউক্ত রূপ মত প্রকাশ করেছেন। তার কারণ ধরা যায় এই যে, ভালো কাজের জন্যে গৃহীত ঋণ যদি যাকাত থেকে আদায় করা যায়, তা হলে সুদমুক্ত ঋণ—'করযে হাসানা'—তা থেকে দেয়া যাবে আরও অধিক উত্তমভাবে। .... তা তো শেষ পর্যন্ত বায়তুলমালেই প্রত্যাবর্তিত হবে।[১] চিন্তাবিদগণ এই কথা বলেছেন উপরিউক্ত কিয়াসের ভিত্তিতে। উপমহাদেশীয় প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ হামীদুল্লাহ হায়দরাবাদীই (ইস্তাম্বুল, প্যারিস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)-ও এই মতই প্রকাশ করেছেন।[২] তিনি 'সুদবিহীন ঋণ ও ব্যাংক' শীর্ষক আলোচনায় এই কথাটির বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই পর্যায়ে যুক্তি প্রদর্শনস্বরূপ বলেছেন, কুরআন যাকাতের পরিকল্পনায় 'গারেমীন'—ঋণগ্রস্ত লোকদের জন্যে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে। এই ঋণ ভারাক্রান্ত লোকেরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে—তা সকলেই জানেন ঃ

১. প্রতি মুহূর্ত প্রতিঘাতকারী দারিদ্র্য ও উপায়-উপকরণহীন হওয়ার কারণে যারা নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ ফেরত দিতে সমর্থ হচ্ছে না।

২. এমন সব লোক, যাদের রয়েছে সাময়িক প্রয়োজন, অবশ্য তাদের উপায়-উপকরণও রয়েছে, যদ্দারা একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সে সাহায্য সহযোগিতা লাভ করতে পারে, যা তারা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।[৩]

উপরিউক্ত চিন্তাবিদ এই প্রকারের ঋণ প্রার্থীদেরকে কুরআনে বর্ণিত 'গারেমীন' পর্যায়ে গণ্য করেছেন। কিন্তু তা কি করে হয় ? 'করয' গ্রহণের পূর্বে তো সে 'গারেম' ছিল না ? কাজেই আবূ জুহ্‌রা প্রমুখ উপরিউক্ত তিন জন ফিকাহ্‌বিদ যে মত দিয়েছেন তাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তারা উত্তম কিয়াসের ভিত্তিতেই এ কথা বলেছিলেন।

---

১ حلقة للدراسات الاجتماعيه ص ٢٥٤

২. এই গ্রন্থটির আরবী আনুবাদ প্রকাশ করেছেন نحو اقتصاد اسلامى سليم সিরিজ হিসেবে।

৩. দেখুন পূর্বোক্ত সূত্রের ৮–৯ পৃ.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফী-সাবীলিল্লাহ্—আল্লাহ্‌র পথে

কুরআন মজীদ সপ্তম পর্যায়ে যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র বা খাত হিসাবে উল্লেখ করেছে وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ্‌র পথে .....। এই খাতটির প্রকৃত লক্ষ্য কি ? আয়াতে কোন্ সব লোকদের সাহায্যের জন্যে বলা হয়েছে ?

বাক্যটির প্রকৃত আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট। 'সাবীল' অর্থ পথ। আর 'সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আকীদা-বিশ্বাস ও কাজের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যে পথ, তা।

'আল্লামা ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ 'সাবীল' অর্থ পথ। আর সাবীলিল্লাহ্ সাধারণ অর্থবোধক এমন যে কোন কার্যক্রমই বোঝায়, যা খালেস নিয়তে করা হবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, তা করা যাবে ফরয, নফল ও বিভিন্ন ধরনের ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক কাজ-কর্মের মাধ্যমে, আর এই কথাটি যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে, তখন প্রধানত তা ব্যবহৃত হবে 'জিহাদ' অর্থে। ব্যাপক ও বেশি বেশি ব্যবহারের দরুন এক্ষণে যেন 'ফী-সাবীলিল্লাহ' বলতে এই জিহাদকেই বোঝাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বাক্যটির যেন এ ছাড়া অন্য কোন অর্থই নেই।[১]

ইবনুল আসীর কর্তৃক 'ফী-সাবীলিল্লাহ' বাক্যের উপরিউক্ত তাফসীর থেকে আমাদের সম্মুখে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

১. বাক্যটির আসল আভিধানিক অর্থ ঃ এমন সব খালেস আমল যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়। সর্বপ্রকারের নেক আমলই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের হোক, কি সামষ্টিক।

২. বাক্যটির অর্থ সাধারণভাবে ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা মনে করা হয়, তা হচ্ছে জিহাদ। এই অর্থে খুব বেশি ব্যবহারের দরুন কেবল এটার মধ্যেই সীমিত হয়ে গেছে বাক্যটির সমস্ত তাৎপর্য।

উপরিউক্ত দুটি অর্থের দ্বন্দ্বে যাকাত ব্যয়ের এ খাতটির সঠিক তাৎপর্য নির্ধারণে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কারণেই এই দ্বিতীয় অর্থটি 'সাবীলিল্লাহ্'-এর তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া হয়েছে ফিকাহ্‌বিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তা হচ্ছে, 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' -এর অর্থ কি শুধু জিহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—যেমন ব্যবহারিকতায়

---

১. النهاية لابن الاثير ج ٢ ص ١٥٦

সাধারণভাবেই তা বোঝা যায় অথবা তা অগ্রসর হয়ে তার আসল আভিধানিক অর্থটিকেও শামিল করে নেবে ?.... তখন তা কেবল জিহাদের সীমার কাছে এসে থেমে যাবে না, এবং সর্বপ্রকারের কল্যাণময় নেকের কাজই শামিল হবে, কোন একটিও এর বাইরে পড়ে থাকবে না।

আমরা এখানে ফিকাহ্‌বিদদের মতামত ও এই খাতের শরীয়াতসম্মত তাৎপর্য নির্ধারণে তাঁদের মতবৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত করছি। আমাদের বিবেচনায় যেটি সত্যতা-যথার্থতার নিকটবর্তী হবে, আমরা সেই মতটিকে অগ্রাধিকার দেব। তওফীক আল্লাহ্‌ই দেবেন।

হানাফী মাযহাব

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ 'সাবীলিল্লাহ্‌'-এর বিশ্লেষণে বলেছেন ঃ 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' বলে—ইমাম আবূ ইউসুফের মতে—মুজাহিদদের সাথে শামিল হয়ে ইসলামী জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি যেসব লোক তাদের দারিদ্র্যে কারণে—সম্বল বা যানবাহন প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বা না থাকার কারণে, তাদের সাহায্য দেয়াই এর উদ্দেশ্য। তারা নিজেরা উপার্জনকারী হলেও তাদের জন্যে যাকাত গ্রহণ জায়েয হবে। কেননা উপার্জনে মশগুল থাকলে তারা জিহাদে শরীক হতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মাদের মত হচ্ছে, 'সাবীলিল্লাহ্‌' বলে সেসব হাজীদের বোঝানো হয়েছে, যারা কোন কারণে হজ্জ কার্য করতে সমর্থ হচ্ছে না। কেননা বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি তার একটি উট 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' দিয়ে দিল। তখন নবী করীম (স) তাকে নির্দেশ দিলেন উটটিকে হাজী বহন করে নেয়ার কাজে লাগানোর জন্যে। তাহলে বোঝা গেল যে, হজ্জও আল্লাহ্‌র পথ। আরও এজন্যে যে, 'আল্লাহ্‌র পথে' বলতে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ও তাঁর আনুগত্য করা বোঝায়, আল্লাহ্‌র দুশমন নফ্‌স বা কুপ্রবৃত্তি দমন এর অন্তর্ভুক্ত।

বলা হয়েছে, 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' বলে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে। 'ফতোয়ায়ে জহীরীয়া' গ্রন্থে কেবলমাত্র এই অর্থটিই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অনেকে এ অর্থটি অবাস্তব মনে করেন। কেননা আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল, তখন সে সমাজে 'দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার্থী' বলতে কোন লোক-সমষ্টির অস্তিত্ব ছিল না। এর জবাবে বলা হয়েছে, দ্বীনি ইলম শিক্ষা হচ্ছে শরীয়াতের বিধান শিখে উপকৃত হওয়া। নবী করীম (স)-এর সঙ্গে লেগে থেকে যারা ইসলামী বিধান শিক্ষা লাভ করেছিলেন, কোন 'তালেবে ইলম'ই কি তাঁদের মর্যাদায় পৌছতে পারে ?..... আসহাবে সুফ্‌ফার সমান মর্যাদার লোক আছে কি দুনিয়ায় ?

আল্লামা কাসানী তাঁর البدائع الصنائع গ্রন্থে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' বলতে 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও ইবাদতমূলক সমস্ত কাজই' মনে করেছেন। আর কাব্যটির আসল তাৎপর্যও তাই। ফলে আল্লাহ্‌র কাজে চেষ্টাকারী ও সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত লোকগণই এর অন্তর্ভুক্ত হবে—যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়।

ইবনে নজীম 'বাহরুর-রায়েক' গ্রন্থে বলেছেন, দারিদ্র্যের শর্ত লাগানো হলে তার সর্বদিক দিয়েই দারিদ্র্য থাকতে হবে।[১]

'আল-মানার তাফসীর লেখক' বাহরুর-রায়েক' গ্রন্থকারের উপরিউক্ত মতের সমালোচনা করে বলেছেন[২] ঃ দারিদ্র্যের শর্ত করার ফলে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' খাতটি স্বতন্ত্র খাত হওয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। কেননা তাহলে তারা তো প্রথম খাত الفقراء। والمساكين-এর মধ্যেই গণ্য হতে পারে।[৩]

হানাফী ফিকাহ্র আলিমগণ 'সাবীলিল্লাহ্'-এর তাৎপর্য নির্ধারণে বিভিন্ন মত দিয়ে থাকলেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'র মধ্যে গণ্য হওয়া সব লোকের জন্যেই গরীব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া জরুরী শর্ত বিশেষ—সে ইসলামী যোদ্ধা হোক, কি হাজী, তালেবে-ইলম হোক, কি কল্যাণময় কাজসমূহে চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী। এজন্যেই তাঁরা বলেছেন, মতপার্থক্যটা আসলে শব্দগত, যখন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে যে, যাকাত পেতে পারে এমন সব পর্যায়ের লোকদেরকে তা দেয়া যাবে। তবে যাকাত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের ব্যাপারে এই শর্ত নেই।

আমরা জানি, অভাবগ্রস্ত ফকীরের জন্যে যাকাতের একটা নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যদিও এসব গুণের কোন একটিরও তারা অধিকারী বা এই গুণে বিশেষিত নয়।

তাহলে এ ক্ষেত্র বা খাতটি আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়ে কোন্ ভূমিকাটা পালন করেছে ? কুরআন তাকে আলাদা একটি খাতরূপে চিহ্নিতই বা করল কেন ?

যেমন হানাফী আলিমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যাকাতকে একজনের মালিকানাভুক্ত করে দিতে হবে। কাজেই তা মসজিদ, পুল, পানশালা নির্মাণ ও রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে ব্যয় হতে পারে না। খাল কাটা, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদির কাজেও তা

---

১. দেখুন – الاختيار لتعليل المختار ج ٢ ص ٨٣ – الدر المختار ج ١ ص ١١٩؛ وحاشية ردالمحتار والبحر الرائق ج ٢ ص ٢٦٠.

২. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٨٠.

৩. হানাফী আলিমগণ এরূপ আপত্তিই তুলেছেন। তারা যা জবাব দিয়েছেন তা সন্তোষজনক নয়। 'বাহ্র' গ্রন্থে 'অন-নিহায়া' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, বলেছেন, জিহাদকারী ও হাজীদের পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের নিজেদের দেশে কোন ধন-মাল না থাকলে তারা ফকীর শ্রেণীভুক্ত। অন্যথায় তারা 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতে সাহায্য পাবে। আমি বলব, সে ফকীর, তবে আল্লাহ্র ইবাদতে একান্তভাবে মশগুল হয়ে আছে, এটা অতিরিক্ত। ফলে সে সাধারণ ফকীর থেকে ভিন্ন অবস্থার হয়ে গেল। তখন এই শর্ত থেকে মুক্ত হল। (দেখুন ঃ (ردالمحتار ج ٢ ص ٨٤ – البحر الرائق ج ٢ ص ٢٦٠.

আমি বলব, অবস্থা যা-ই হোক, ফকীর শ্রেণীর পর্যায় থেকে বাইরে আসতে পারেনি। আলূসী তাঁর তাফসীরে (৩য় খণ্ড ৩২৮ পৃ.) ফিকাহ্বিদদের মত উদ্ধৃত করেছেনঃ যুক্তিপূর্ণ কথা যা আল-যাসসাস উল্লেখ করেছেন, তা হল যে লোক তার নিজের দেশে ও শহরে ধনী, যার খাদেম ও যানবাহন ঘোড়া আছে এবং অতিরিক্ত অর্থ আছে, এমন যে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ হালাল হয় না, সে যদি জিহাদের সফরে গিয়ে প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে পড়ে—নিজ বাড়িতে যদিও সে সেজন্যে অভাবগ্রস্ত নয়—তাকে যাকাত থেকে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয, সে নিজ দেশে ধনী হলেও।

লাগতে পারে না, কেননা এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না। মৃতের কাফন ও তার ঋণ শোধ দেয়ার ব্যাপারেও এই কথা সত্য।[১]

মালিকী মাযহাবের মত

কাযী ইবনুল আরাবী 'আহ্কামুল কুরআন' গ্রন্থে 'ফি-সাবীলিল্লাহ্'-এর ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে ইমাম মালিকের এই মত উদ্ধৃত করেছেন ঃ আল্লাহ্র পথ বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। কিন্তু এখানে 'সাবীলিল্লাহ্'-এর তাৎপর্য যে ইসলামী যুদ্ধ—আল্লাহ্র বহু পথের একটি, তাতে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হেকাম বলেছেন, পানি পান করানো অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র ক্রয়ের কাজে যাকাত ব্যয় হতে পারবে। শত্রুপক্ষকে অবস্থান গ্রহণ থেকে বিরত রাখার কাজেও তাই। কেননা এসবই যুদ্ধ ও তার পক্ষের কার্যাবলী। নবী করীম (স) সহল ইবনে আবূ হাস্মা কর্তৃক সৃষ্ট বিপজ্জনক অবস্থায় বিদ্রোহের আগুন নিভানোর জন্য একশত উট যাকাত ফাণ্ড থেকে দিয়েছিলেন।[২]

খলীলের মূল আলোচনায় দর্দীর রচিত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুজাহিদ, পাহারাদার এবং এই দুইজনের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি সংগ্রহে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে। এই টাকা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা যাবে, চলাচলের জন্যে ঘোড়াও খরিদ করা যাবে। মুজাহিদ নিজে ধনী হলেও সে যাকাত নিতে পারবে। কেননা তার এই যাকাত গ্রহণ জিহাদের জন্যে—জিহাদের কারণে, দারিদ্র্যের কারণে নয়। গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রু সম্পর্কিত খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যেও যাকাত ব্যয় করা যাবে। সে কাফির হয়েও যদি খবর এনে দেয় তা হলেও। কিন্তু খলীলের মত অনুযায়ী শহর-নগরের চতুর্দিকে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রাচীর নির্মাণের জন্যে যাকাত ব্যয় করা জায়েয হবে না। যে যানবাহনে চড়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তা ক্রয় করার কাজেও তা ব্যয় হবে না।

দসূকী তাঁর টীকায় উল্লেখ করেছেন, প্রাচীর নির্মাণ ও যুদ্ধের যানবাহন নির্মাণে যাকাত ব্যয় না করার এই মতটি ইবনে বশীরের; অন্যদের নিকট এই কথাটি পরিচিত নয়। ইবনে আবদুল হেকাম তার বিপরীত কথা বলেছেন। লখ্মী প্রমুখ তার উল্লেখ করেন নি। 'তাওজীহ' গ্রন্থে তা প্রকাশ করা হয়েছে। ইবনে আবদুস সালাম এই মতটিকে সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন।[৩]

মালিকী মাযহাবের মতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয় ঃ

১. তাঁরা সকলে একমত এ ব্যাপারে যে, 'সাবীলিল্লাহ্' কথাটির সম্পর্ক যুদ্ধ-জিহাদ ও এই অর্থের পাহারাদারী ইত্যাদি কাজের সাথে। কিন্তু হানাফী মতের আলিমগণ জিহাদ, হজ্জ, ইল্ম শিক্ষা ও অন্যান্য আল্লাহ্র নৈকট্যমূলক কার্যাবলীর মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

---

১. ردالمحتار ج٢ ص ٨٥ ২. ردالمحتار ج ٢ ص ٨٥

৩. দেখুন الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج ١ ص ٤٩٧

২. তাঁরা জিহাদকারী ও পাহারাদারীর কাজে নিযুক্ত লোককে ধনী হলেও যাকাত দেয়া জায়েয মনে করেন। হানাফীরা ভিন্ন মত দিয়েছেন। তাঁদের এ বিষয় সংক্রান্ত মতটি কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা কুরআনে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'কে ফকীর মিসকীন উভয় খাত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি খাতরূপে চিহ্নিত করেছে। উক্ত মত হাদীসের সাথে নৈকট্যসম্পন্ন, কেননা হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ পাঁচজন লোক ছাড়া অন্যদের জন্যে যাকাত হালাল নয়। এই পাঁচজনের মধ্যে 'আল্লাহ্র পথে যুদ্ধকারী'ও উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে 'গারেমূন' পর্যায়ের আলোচনায় বিশদভাবে কথা বলা হয়েছে। হানাফীরা যোদ্ধার জন্যে গরীব হওয়ার যে শর্ত করেছেন, ইবনুল আরবীর মতে তা অত্যন্ত দুর্বল কথা। বলেছেন, এটা কুরআনের কথার ওপর অতিরিক্ত। আর তাঁদের মতে মূল দলিলের ওপর অতিরিক্ত কিছু বলা হলে সেই কথাকেই মনসূখ করা হয়, অথচ কুরআনের কোন কিছু মনসূখ হতে পারে কেবল অনুরূপ কুরআনের দ্বারা অথবা 'মুতাওয়াতির' হাদীস দ্বারা মাত্র।[১]

৩. জমহুর ফিকাহ্বিদগণ যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় মাল-মসলা, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব বা যানবাহন, প্রাচীর, যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতি সবকিছু যাকাতের টাকা দিয়ে ক্রয় বা নির্মাণ করা সম্পূর্ণ জায়েয বলে মনে করেন। তাঁরা যাকাতকে কেবলমাত্র জিহাদকারীদের জন্যে ব্যয় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী নন। তা হচ্ছে হানাফীদের মত। কেননা তারা তো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেয়াও ওয়াজিব বলে মনে করেন। কিন্তু জিহাদে বিনিয়োগে তা সম্ভব নয়।

সত্য কথা হচ্ছে, মালিকীদের উপরিউক্ত মত কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ। কেননা কুরআনে এই বাক্যটি في দিয়ে বলা হয়েছে; ل দিয়ে নয়, ل দিলেই মালিক করানো বোঝা যেত। বাহ্যত এরূপ বর্ণনার দরুন যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে যাকাত ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি মুজাহিদদের জন্যে ব্যয় করার পূর্বেই অনুভূত হয়।

শাফেয়ী মত

শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য হল, 'সাবীলিল্লাহ' বলতে তাদের বোঝায়, যারা যুদ্ধ করছে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে, এজন্যে সরকারের নিকট থেকে কোন মাসিক বেতনের দাবি করে না। ইমাম নববীর লিখিত 'আল্-মিনহাজ' গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার আল হাইসী রচিত তার ব্যাখ্যায় এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে। অথবা ইবনে হাজারের কথানুযায়ী রিযিক পাওয়া লোকদের তালিকায় তাদের জন্যে অংশ নির্দিষ্ট নেই। বরং তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করে যখন তারা নিজেরাই উৎসাহী হয়। অন্যথায় তারা নিজেদের পেশা ব্যবসায় ও শিল্পকর্মে লিপ্ত থাকে। বলেছেন, 'সাবীলিল্লাহ' বিষয়গতভাবে সেই পথ যা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। পরে শব্দটি জিহাদ বোঝাবার জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা জিহাদে শরীক হওয়ার পরই মানুষ সেই শাহাদত বরণ করার সুযোগ পেতে পারে যা আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে

---

১. দেখুন احكام القرآن ج ٢ ص ৯৫৭।

দেয়। অতঃপর উক্ত লোকদের বোঝানো হচ্ছে। কেননা তারা কোনরূপ বিনিময় না নিয়েই জিহাদ করছে। ফলে তারা যাকাত পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় উত্তম অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়।[১] তাদের যুদ্ধকাজে সাহায্যকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে দেয়া যাবে—তারা নিজেরা ধনী হলেও।

ইমাম শাফেরী তাঁর الام গ্রন্থে অকাট্যভাবে লিখেছেন 'সাবীলিল্লাহ্'র ভাগ থেকে যোদ্ধাদের যাকাত দেয়া যাবে, সে গরীব হোক কি ধনী। তা থেকে অন্যদের দেয়া যাবে না। তবে দেয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে দেয়া যাবে তাকে যে যাকাতের প্রতিবেশী হয়ে কাফিরদের আক্রমণের মুকাবিলায় প্রতিরক্ষার কাজ করে।[২] (যাকাতের প্রতিবেশী অর্থ ঃ যে অঞ্চল থেকে যাকাত সংগৃহীত হয়েছে, সেখানকার অধিবাসী হওয়া)।

যাকাতের প্রতিবেশী হওয়ার শর্ত করা হয়েছে এজন্যে যে, যেখানে যাকাত পাওয়া গেল সেখান থেকে তা স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়।

ইমাম নববী তাঁর الروضه গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'গাযী—ইসলামী যোদ্ধাকে তার যাতায়াতকালীন যাবতীয় ব্যয় ও পোশাক দেয়া হবে, বিদেশে অবস্থানকালেও, তা যত দীর্ঘই হোক। তবে সমস্ত শ্রমমূল্য দেয়া হবে, না বিদেশ যাত্রার দরুন যা অতিরিক্ত হবে শুধু ততটুকু দেয়া হবে, এ পর্যায়ে দুটি দিক রয়েছে ঃ

'অশ্ব ক্রয়ের টাকা দেয়া হবে যদি সে অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করে। অস্ত্র ও যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যও ক্রয় করার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে এবং তা সবই তার মালিকানাভুক্ত হবে। অবশ্য অস্ত্র ও যানবাহন ভাড়ায়ও নেয়া যেতে পারে। সম্পদের প্রাচুর্য বা স্বল্পতার দৃষ্টিতে তা বিভিন্ন হবে। আর পায়ে হেটে যুদ্ধ করলে তাকে অশ্বক্রয়ের জন্যে যাকাত দেয়া হবে না।'

ইমাম নববী আরও বলেছেন, 'আল-মিফতাহ্' গ্রন্থের কোন কোন শরাহ গ্রন্থে লিখিত রয়েছে, গাযীকে তার নিজের এবং তার পরিবারবর্গের খরচপত্র দেয়া হবে তার যুদ্ধযাত্রা, অবস্থান গ্রহণ ও প্রত্যাবর্তনকালীন সমস্ত সময়ের জন্যে। তবে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ যোদ্ধার পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহন পর্যায়ে কিছু বলেন নি। কিন্তু তা দেয়াও অকল্পনীয় নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান এ ব্যাপারে ইচ্ছাধিকারী। ইচ্ছা করলে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুরই তাকে মালিক বানিয়েও দিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে তার জন্যে একটা বাহনও ভাড়া করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে যাকাতের এই অংশ থেকে একটা ঘোড়া ক্রয় করে তা আল্লাহ্‌র পথে ওয়াক্‌ফও করে দিতে পারে। তখন সে তার ওপর প্রয়োজন মত আরোহণ করবে ও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তা ফেরত দেবে।[৩]

---

১. দেখুন نهاية المحتاج ج٦ ص ٩٦ এবং تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج ٣ ص ١٥٥-١٥٦

২. الام ج ٢ ص ٦٠ بولاق ৩. الروضة للنووى ج ٢ ص ٣٢٦ - ٣٢٧

যদি রাষ্ট্রীয় অর্থ ভাণ্ডার থেকে 'ফাই' সম্পদ নিঃশেষিত হয়ে যায়, রাষ্ট্রের হাতে এমন সম্পদ না থাকে যা দিয়ে যাদের রিযিক দেয়ার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে তাদের তা দেয়া সম্ভব হতে পারে এবং মুসলিম সমাজ যদি কাফির শত্রুদের দুষ্কৃতি থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্যে কোন লোক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করে, তাহলে তাদেরকে যাকাতের 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' অংশ থেকে দেয়া যাবে কি না, এ একটি জরুরী প্রশ্ন। এ পর্যায়ে শাফেয়ী ফকীহ্গণ আলোচনা করেছেন। ইমাম নববী বলেছেন, এ পর্যায়ে দু'টি কথা। তন্মধ্যে অধিক স্পষ্ট কথা হচ্ছে, দেয়া যাবে না। তবে মুসলিম ধনী লোকদের দিয়ে তার সাহায্য করাতে হবে।[১]

ধনী লোকেরা যদি অস্বীকার করে; কিংবা তাদের নিকট অতিরিক্ত ধন-মাল না থাকে এবং রাষ্ট্রপ্রধান 'ফাই' পাওয়ার যোগ্য লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে না পায়, তাহলে তাদের জন্যে যাকাত থেকে প্রয়োজনমত গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

ইবনুল হাজার জোর করে বলেছেন, হ্যাঁ, তা তাদের জন্যে হালাল হবে।[২]

এ পর্যায়ে আমাদের বিবেচনা হচ্ছে ঃ

'ফী-সাবীলিল্লাহ্'র খাতটিকে কেবলমাত্র জিহাদ ও মুজাহিদদের মধ্যে সীমিতকরণে শাফেয়ী ও মালিকী মাযহাব ঐকমত্য পোষণ করে। আর মুজাহিদকে তার জিহাদের সাহায্যকারী জিনিসপত্র দেয়ার ব্যাপারে—সে ধনী ব্যক্তি হলেও জায়েয এবং মুজাহিদের জন্যে জরুরী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে যাকাত ব্যয় করার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারেও কোন মতপার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু শাফেয়ীরা এ পর্যায়ে দুটি ব্যাপারে হাম্বলীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন ঃ

১. তাঁরা শর্ত করেছেন, মুজাহিদকে নফল জিহাদকারী হতে হবে, যার জন্যে যাকাতের কোন অংশ বা সরকারী ভাণ্ডারে কোন বেতন নির্দিষ্ট নেই।

২. এই অংশ ফকীর-মিসকীনের জন্যে নির্দিষ্ট অংশদ্বয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় করা জায়েয মনে করেন না।—কেননা ইমাম শাফেয়ীর কথা হচ্ছে, আটটি খাতের মধ্যে সমান পরিমাণ ব্যয় করা ওয়াজিব। ....

এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

হাম্বলী মত

শাফেয়ী মাযহাবের ন্যায় হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য হল, যাকাতের 'সাবীলিল্লাহ' খাত থেকে অংশ দেয়া হবে সেই মুজাহিদদের যারা নফল হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করেছে, যাদের জন্যে কোন বেতন নির্দিষ্ট নেই বা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম সম্বল রয়েছে। এরূপ অবস্থায় মুজাহিদকে তার যুদ্ধ কাজের জন্যে প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ দেয়া হবে—সে ধনী ব্যক্তি হলেও। সে যদি কার্যত যুদ্ধ না করে তাহলে সে যা নিয়েছে, তা ফেরত দেবে। এদের নিকট এটাও ঠিক যে, ঘাঁটিসমূহে পাহারাদারী করাও কার্যত যুদ্ধের মতই কাজ এবং উভয়ই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' রূপে গণ্য।

---

১. الروضة للنووى ج ٢ ص ٣٢١ ২. تحفة المحتاج ج ٣ ص ٩٦

'গায়াতুল মুন্‌তাহা' গ্রন্থ এবং তার শরাহ্ পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধান যাকাতের মাল দিয়ে অশ্ব খরিদ করে তা এমন ব্যক্তিকে দিতে পারে—দেয়া জায়েয—যে তার ওপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করবে। সেই যোদ্ধা নিজে যাকাতদাতা হলেও কোন দোষ নেই। কেননা সে নিজের যাকাত বায়তুলমালে জমা দেয়ার পর তা থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে যুদ্ধজাহাজও ক্রয় করতে পারে। কেননা তা যোদ্ধা ও তার সুবিধার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। আর মুসলিম জনগণের কল্যাণের জন্যে যে কোন কাজ করা—যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাই রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা তিনি অন্যদের তুলনায় সাধারণ জনকল্যাণ বিষয়ে অধিক অবহিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন অবশ্যই হবেন। কিন্তু ধন-মালের মালিক ব্যক্তির নিজের পক্ষে তা করা জায়েয হবে না। সে নিজের যাকাতের টাকা দিয়ে ঘোড়া ক্রয় করে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' নিয়োজিত করে দিতে পারে না। কোন জমি ক্রয় করে যোদ্ধার জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিতে পারে না। কেননা সে যে কাজ করতে নির্দেশিত হয়েছিল তা সে করেনি।[১]

তবে হজ্জ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ থেকে দুটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ একটি হচ্ছে তা 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' কাজ। তাই যাকাত কোন ফকীরকে দেয়া হলে তা দিয়ে সে যদি ইসলামী নিয়মানুযায়ী হজ্জ করে কিংবা এই কাজে সে সাহায্য দান করে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা উম্মে মাকাল আল-আসাদিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর স্বামী একটা নব্য বয়সের উটকে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর তিনি নিজে উম্‌রা করার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর স্বামীর নিকট সে উটটি চাইলেন, কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। পরে তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এই বিষয়টির উল্লেখ করলেন। নবী করীম (স) তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন তাকে উটটি দেয়ার জন্যে এবং বললেন ঃ হজ্জ ও উম্‌রা 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথের কাজ।[২]

এই বর্ণনাটি হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইসহাকের কথাও তাই।

দ্বিতীয়ত, যাকাত হজ্জের কাজে ব্যয় করা যাবে না। জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের বক্তব্যও তাই। ইবনে কুদামাহ তাঁর 'আল্-মুগ্‌নী' গ্রন্থে বলেছেন ঃ এই কথাটি অধিকতর সহীহ্। কেননা 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'-এর ব্যবহারিক অর্থ জিহাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কুরআন মজীদে যেখানে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'-এর উল্লেখ হয়েছে, সেখানেই তার অর্থ 'জিহাদ' করা হয়েছে—দু-একটি ছাড়া। অতএব আয়াতটিকে তার যথার্থ অর্থেই গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেননা বাহ্যত তাই আল্লাহ্‌র বক্তব্য মনে করতে হবে। উপরন্তু যাকাত দু'জনার

১. দেখুন مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٤٧ - ٤٨

২. হাদীসটি আহমাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি যয়ীফ। কেননা এর সনদে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রয়েছে। একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়েছে, তা ছাড়া এতে এলোমেলো অবস্থা اضطراب রয়েছে। আবূ দাঊদ অপর এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সে সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রয়েছে। সে সনদে তালাশ করে দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨١

যে-কোন একজনের জন্যে ব্যয় করতে হবে ঃ যে তার মুখাপেক্ষী তার জন্যে—যেমন ফকীর, মিসকীন ও দাসমুক্তি। আর গারেমীনদের জন্যে তাদের ঋণ শোধে অথবা মুসলমান যার মুখাপেক্ষী তার জন্যে ব্যয় করা যাবে, যেমন যাকাত কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী, যোদ্ধা, মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম এবং 'গারেম'—ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তা দিয়ে নিজের অবস্থা সংশোধন করে নেবে। কিন্তু কোন ফকীর ব্যক্তির হজ্জ আদায়ে মুসলিম জনগণের কোন কল্যাণ হওয়ার কথা নেই, মুসলমানদের জন্যে তার প্রয়োজনীয়তাও তেমন কিছু নেই, সেই ফকীর ব্যক্তির পক্ষেও তা আদায় করার আদৌ কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিলেও তাতে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। তার ওপর হজ্জ আদায়ের কর্তব্য চাপিয়ে দিলে তাকে এমন একটা কষ্টে নিক্ষেপ করা হবে যা আল্লাহ্ তার ওপর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তার কর্তব্যের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। ফকীরকে হজ্জ করার জন্যে যাকাত না দিয়ে বরং অন্যান্য সব প্রাপকদের মধ্য থেকে অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করা হলে তা অধিক উত্তম কাজ হবে। (تحفة المحتاج ج ٣ ص ٩٦)

এই বিশ্লেষণটা অতীব গভীর ও আলোকমণ্ডিত। তার ওপর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন করে না।

ইমাম আহমাদ থেকে অপর যে বর্ণনায় প্রাপ্ত হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে, তার সনদ যয়ীফ। হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মেনে নিলেও কোন কোন শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদ্ উক্ত কথার জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, 'হজ্জ 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' পর্যায়ের কাজ'—এই কথা বলতে আমরা নিষেধ করছি না। তবে انما الصدقات বলে যে আয়াতটির সূচনা, তার এক স্থানে যে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' বাক্য এসেছে তার তাৎপর্য কি, তাই নিয়েই তো দ্বন্দ্ব। সেই সাথে لا تحل الصدقة الا لخمسة বলে যে হাদীসটির শুরু তাতে যে الغازى فى سبيل الله যোদ্ধা আল্লাহ্র পথের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তো উক্ত আয়াতের সাথে তাৎপর্যগতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। তবে এই হাদীসটি আসল দাবির সমর্থন করে কিনা, সে বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। কেননা যে হাদীসটিতে উটকে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' সাদ্‌কা দেয়ার কথা বলা হয়েছে; কিংবা যেটি সম্পর্কে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' দৃষ্টিতে অসীয়ত করা হয়েছে—যেমন অপর একটি বর্ণনায় হজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তা দেয়ার জন্যে নির্দেশ করা হয়েছে—এক্ষণে আমরা যদি ধরে নিই যে, সেটি যাকাতের উট ছিল, তাহলে সম্ভবত যাকে সেটি দেয়া হয়েছিল সে ফকীর ছিল, তার পক্ষে তা ব্যবহার করে ফায়দা গ্রহণ জায়েয ছিল অথবা তাকে তার মালিক না বানিয়েই তার ওপর সওয়াব করানো হয়েছিল এবং তার ওপর তার মালিকত্ব ছিল না।[১]

আলোচ্য বিষয়ে চারটি মাযহাবের ঐকমত্য

উপরে চারটি মাযহাবের মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আলোচ্য বিষয়ে তিনটি ব্যাপারে এই মাযহাব চতুষ্টয়ের ঐকমত্য রয়েছে ঃ

১. দেখুন ঃ تحفة المحتاج ج ٣ ص ٩٦

১. জিহাদ নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহভাবেই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' ভুক্ত।

২. যাকাতের অর্থ মুজাহিদ ব্যক্তিদের জন্যে ব্যয় করা শরীয়াতসম্মত হলেও জিহাদের প্রস্তুতি ও সুবিধা বিধানের জন্যে যাকাত ব্যয় করা পর্যায়ে মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে ঐকমত্য হয়নি।

৩. বাঁধ, পুল, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তাঘাট মেরামত ও মৃতের দাফন-কাফন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সাধারণ জনকল্যাণ ও সওয়াবমূলক কাজে যাকাত ব্যয় করা জায়েয নয়। এসব কাজে সম্পন্ন করা হবে বায়তুলমালের অপরাপর—ফাই-খারাজ—ইত্যাদি আয় থেকে।

এসব কাজে যাকাত ব্যয় করা জায়েয না হওয়ার কারণ হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে যাকাতের মালিক বানানোর সুযোগ নেই। এটা হানাফীদের কথা অথবা তা করা যাবে না এজন্যে যে, যাকাতের জন্যে নির্দিষ্ট আটটি খাতের কোন একটিতে এগুলো পড়ে না। অন্যান্যরা এটাই বলেছেন।

'বাদায়ে-ওয়াস-সানায়ে' গ্রন্থ থেকে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'র তাফসীর প্রসঙ্গে 'সর্বপ্রকারের ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যমূলক কাজকে এ পর্যায়ে গণ্য করার কথা উদ্ধৃত হয়েছে বটে; কিন্তু তাতে যাকাতকে এক ব্যক্তির মালিকানায় দেয়ার শর্ত করা হয়েছে। অতএব তা সাধারণে ও নির্বিশেষে বণ্টন বা ব্যয় করা যায় না। যেমন ব্যক্তির ফকীর হওয়ারও শর্ত করা হয়েছে। ফলে এই মতটি 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'র সংকীর্ণ তাৎপর্য গ্রহণের আওতার বাইরে আসতে পারেনি।

ইমাম আবূ হানীফা মুজাহিদ ব্যক্তির ফকীর হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। বলেছেন, তবেই তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। এই মত কেবলমাত্র তাঁর একার। অপর দিকে ইমাম আহমাদ হাজী ও উমরাকারীর জন্যে যাকাত ব্যয় করা জায়েয বলে যে মত দিয়েছেন, তাঁর এই মত অপর কেউই গ্রহণ করেন নি।

শাফেয়ী ও হানাফী উভয়ই এই শর্ত আরোপে একমত যে, সেসব মুজাহিদই যাকাত গ্রহণ করতে পারবে, যারা স্বেচ্ছামূলক কাজ হিসেবে জিহাদে শরীক হচ্ছে, যাদের জন্যে কোন মাসিক বেতন সরকারী দফতরে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

হানাফীরা ছাড়া অন্যরা সর্বাধিকভাবে জিহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কাজে যাকাত ব্যয় করা শরীয়াতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

যাঁরা 'সাবীলিল্লাহ্'র তাৎপর্য ব্যাপক মনে করেন

প্রাচীন ও আধুনিককালে বিপুল সংখ্যক আলিম 'সাবীলিল্লাহ্'-এর ব্যাপক তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন। তাঁরা কেবল জিহাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজের মধ্যেই তার তাৎপর্য সীমিত বলে মনে করেন না। বরং তাঁদের তাফসীরে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক, আল্লাহ্র নৈকট্যবিধায়ক ও নেক কাজকে এর মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা বাক্যটির আসল তাৎপর্য সেই রকমই। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা এই মত দিয়েছেন।

কতিপয় ফিকাহ্‌বিদের মত

ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে এ পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন وفى سبيل الله। এই কথাটির বাহ্যিক তাৎপর্য অনুযায়ী তা থেকে কেবল যোদ্ধাদের বোঝানোই কোন ওয়াজিব কাজ নয়। পরে বলেছেন, এর অর্থের দৃষ্টিতে কিফাল তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা যাকাতকে সর্বপ্রকারের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয বলে মত দিয়েছেন। তার মধ্যে মৃতের লাশ কাফন-দাফন, কেল্লা ও মসজিদ নির্মাণও শামিল মনে করেন। কেননা আল্লাহ্‌র কথা وفى سبيل الله। সর্বব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত।[১]

কিন্তু সেই ফিকাহ্‌বিদ কারা তা আমাদেরকে তিনি বলেন নি। তবে বিশেষজ্ঞগণ 'ফকীহ' গুণবাচক নামটি কেবল 'মুজতাহিদ' বোঝাবার জন্যেই ব্যবহার করেন। যেমন ইমাম রাযী কিফালের কথার উদ্ধৃতি দেয়ার পর তার ওপর কোন মন্তব্য করেন নি। ফলে তা থেকে তাঁর মনে ঝোঁকটাও বোঝা যাচ্ছে না।

আনাস ও হাসান সম্পর্কে বলা কথা

ইবনে কুদামাহ তাঁর 'আল্‌-মুগ্‌নী' গন্থে আনাস ইবনে মালিক ও হাসান বসরী—এই দুজনের মত উল্লেখ করেছেন। তাঁরা দুজন বলেছেন—যাকাতের যে অংশ পুল ও রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে, তা চলমান সাদ্‌কা বা সাধারণ দান বিশেষ।[২]

এই কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, পুল বানানো, রাস্তা নির্মাণ ও তা মেরামত করার কাজে যাকাত ব্যয় করা জায়েয। তা একটি প্রবহমান, জায়েয ও গ্রহণীয় সাদ্‌কা বিশেষ।

কিন্তু আবূ উবাইদ উক্ত দুজন থেকে উক্ত কথাটি উদ্ধৃত করেছেন, যা ভিন্ন এক অর্থ বোঝায়। উল্লেখ করেছেন, মুসলিম ব্যক্তি যদি তার যাকাত শুল্ক আদায়কারীর নিকট নিয়ে যায় এবং সে যদি তার যাকাতের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে অথচ এই ওশর গ্রহণকারী সরকার কর্তৃক যাকাত গ্রহণকারীরূপে নিয়োজিত ছিল—তারা যদি পুল বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থেকে আশ্রয় গ্রহণকারী যুধ্যমান ও যিম্মী ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকদের নিকট থেকে এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর ধার্য ব্যবসায়ী কর আদায় করে, তাহলে তারা সম্ভবত সীমানার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এবং শুল্ককর আদায় করছে। আবূ উবাইদ কয়েকজন তাবেয়ী ও তৎপরবর্তীকালের ফিকাহ্‌বিদদের মত উদ্ধৃত করেছেন। তারা হচ্ছেন ইবরাহীম, শাবী, আবূ জা'ফর, বাকের, মুহাম্মদ ইবনে আলী প্রমুখ। তাদের মত উপরিউক্ত অর্থটিকেই তাকীদ করে। আর তা হচ্ছে, শুধু আদায়কারী যা গ্রহণ করেছে, তাকে যাকাত হিসেবে গণ্য করা হবে। এই কথা হাসান নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন বলে উদ্ধৃত হয়েছে। যদিও সে মত এই পর্যায়ে মাইমুন ইবনে মাহ্‌রানের কথার সাথে সমঞ্জস্য নয়। তিনি তাঁর মালের যাকাত দেন; কিন্তু কি বাবদ তা

---

১. تفسير الفخر الرازى ج ١٦ ص ١١٢
২. المغنى ج ٢ ص ١٦٧

নেয়া হল তার বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু আবূ উবাইদ বলেন ঃ আমাদের মতে ব্যাপারটি তাই যা আনাস, হাসান, ইবরাহীম, শা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেছেন এবং সব লোকই এই মত পোষণ করেন।[১]

ইবনে আবূ শাইবাও এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।[২] তাঁদের দুজন থেকে 'যে বলেছে, শুল্ক আদায়কারী যা গ্রহণ করেছে, তা অবশ্যই গণ্য করা হবে' শীর্ষক অধ্যায়ে তা উদ্ধৃত হয়েছে, আবূ উবাইদও তাই করেছেন। এই দৃষ্টিতে বলা যায়, ইবনে কুদামাহ্, আনাস ও হাসান (রা)-এর নামে যে উক্তির উল্লেখ করেছেন। তা বোধ হয় ঠিক নয়, দৃঢ়ভিত্তিক নয়।

জাফরী ইমামিয়া ফিকাহ্র মত

'ইমামিয়া জাফরিয়া' ফিকাহ্র কিতাব المختصر النافع গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, বলেছেন, فى سبيل الله বলতে সর্বপ্রকার এমন কাজ বোঝায়, যা আল্লাহ্ নৈকট্যবিধান করে, যা সার্বিক কল্যাণমূলক—যেমন হজ্জ, জিহাদ ও পুল নির্মাণ ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, তা শুধু জিহাদ অর্থে ব্যবহৃত।[৩] جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام – জাফরী ফিকাহ্র একখানি বিশ্বকোষবত বিরাট গ্রন্থ। তাতে বলা হয়েছে ঃ পুল, মসজিদ নির্মাণ, হজ্জ ও সমস্ত কল্যাণময় ভালো ভালো কাজ 'ফী-সাবীলিল্লাহ্" পর্যায়ে গণ্য। শেষের দিকে সর্বসাধারণ ফিকাহ্‌বিদ এই মতই পোষণ করেন। এটাই শব্দের মৌল ভাবধারা বলে উক্ত মতের সমর্থন দেয়া হয়েছে। কেননা 'সাবীল' অর্থ পথ। বলা হয়েছে, 'সাবীলিল্লাহ্' এমন সব কিছুই বোঝায় যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও সওয়াব পাওয়ার মাধ্যম বা কারণ হতে পারে। এই কারণে জিহাদও তার মধ্যে গণ্য।[৪]

জায়দীয়া ফিকাহ্র মত

ইমাম জায়দ থেকে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য গ্রন্থ الروض النضير। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ যাকাতের টাকা মৃতের কাফন ও মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে না। বলেছেন, যাঁরা তা জায়েয মনে করে, তাঁরা দলিল দিয়েছেন এই মর্মে যে, এ সবই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'-এর মধ্যে শামিল। কেননা তা সাধারণভাবেই কল্যাণের পথ, যদিও তার অধিক ব্যবহার ব্যক্তি পর্যায়ে জিহাদের জন্যে হয়েছে। কেননা ইসলামের প্রথম যুগে এই জিহাদের ঘটনাই তো খুব বেশি সংঘটিত

---

১. الاموال ص ٥٧٣ – ٥٧٥

২. المصنف ج ٣ ط حيدر اباد ص ١٦٦ বর্ণনাটির ভাষা হচ্ছেঃ ما اخذ منك على الجور والقناطر فتلك زكاة قاضية جواهر الكلام ٢ ص ٧٩ –

৩. المختصر النافع ص٥٩ داو الكتاب العربى، القاهره –

৪. দেখুন ঃ شرائع الاسلام للمحلى ج ١ ص ٨٧ دار مكتبة الخياة لفقه الامام جعفر ج ٢ ص ٩٢

হয়েছে। আর তা হয়েও থাকে। কিন্তু প্রচলিত তত্ত্বেও সীমা পর্যন্ত নয়। তাই তা তার প্রথম অর্থেই অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তাতে সর্বপ্রকারের আল্লাহ্র নৈকট্যমূলক কাজ শামিল ও গণ্য হবে। সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিলেও তা-ই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। অবশ্য কোন বিশেষ দলিল যদি তার কোন বিশেষ অর্থ নিতে তাকীদ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর 'বাহ্রুর রায়েক' গ্রন্থের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ তাই যা আমরা বলেছি ঃ বাহ্যত 'সাবীলিল্লাহ' সাধারণ অর্থই দেয়, কোন বিশেষ দলিল বিশেষ অর্থ গ্রহণের তাকীদ হলে ভিন্ন কথা।'[১]

এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, 'বাহ্র' ও 'আর-রওজ' এই গ্রন্থ দুটির লেখকদ্বয় 'সাবীলিল্লাহ্'র খুব ব্যাপক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী। شرح الازهار গ্রন্থে বলা হয়েছে, কুরআন নির্ধারিত এই খাতের অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত যাকাতের অর্থ সাধারণ মুসলিম জনগণের কল্যাণে ব্যয় হতে পারে। আল-ইমামুল হাদী এই কথা বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন। আবূ তালিব বলেছেন ঃ হ্যাঁ, এ সব কল্যাণময় কাজে যাকাত ব্যয় করা যাবে দরিদ্র জনগণকে সচ্ছল বানানোর পর। সেখানে যদি কোন ফকীর এখনও অভাবগ্রস্ত থেকে থাকে, তাহলে সে-ই যাকাত পাওয়ার অধিক অধিকারী। তাঁদের অন্যরা মনে করেন, এই শর্তটি 'মুস্তাহাব' বা উত্তম বলে ধরা যায়। অন্যথায় ফকীর-মিসকীন থাকা সত্ত্বেও এসব কল্যাণকর কাজে যাকাত ব্যয় করা হলে তা নিশ্চয়ই জায়েয হবে।

'আল-আজহা'র গ্রন্থের টীকায় 'আল্-বাহর; গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, 'সাবীলিল্লাহ্' খাতে ব্যয় করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা-ই শুধু কল্যাণময় কাজে ব্যয় করা যাবে, এমন কথা নয়। বরং আটটি খাতে ব্যয় করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা-ই সাধারণ কল্যাণে ব্যয় করা যাবে, যেমন কল্যাণময় কাজের জন্যে নির্দিষ্ট অর্থ ফকীর-মিসকীনদের জন্যে ব্যয় করা সঙ্গত।[২]

الروضة الندية-এর লেখকের অভিমত

সাইয়েদ সিদ্দিক হাসান খান লিখিত روضة الندية গ্রন্থের বক্তব্য এখানে তুলে দেয়া হচ্ছে। স্বতন্ত্র ধরনের আহলি হাদীস লোকদের মত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলেছেন. 'সাবীলিল্লাহ্'-এর তাৎপর্য এখানে হচ্ছে, 'আল্লাহ্র নিকট পৌঁছার পথ।' 'জিহাদ' যদিও আল্লাহ্র নিকট পৌঁছার বহু সংখ্যক পথের মধ্যে অনেক বিরাট ও উচ্চ পথ, তা সত্ত্বেও কেবল এই একটি অর্থেই তা বিশেষভাবে ব্যবহৃত মনে করার কোন প্রমাণ নেই। বরং তা মহান আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার যে-কোন কাজে তা ব্যয় করা যথার্থ ও সহীহ্ হবে। এ হচ্ছে আয়াতটির আভিধানিক অর্থ। আর এই আভিধানিক অর্থের ওপর স্থিতি গ্রহণই কর্তব্য। তার স্থানান্তরকরণ এখানে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঠিক হতে পারে না। পরে বলেছেন, 'সাবীলিল্লাহ্' পর্যায়ের একটি বড় ব্যয় হল দ্বীনদার মুসলিম জনগণের সার্বিক কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগকারী আলিমগণের জন্যে ব্যয় করা।

---

১. البحرج ٢ ص ١٨٢ الروض النضير ج ٢ ص ٤٢٨

২. দেখুন شرح الازهار وحواشية ص ١١٥-١١٦

কেননা আল্লাহ্‌র ধন-মালে তাদের অংশ রয়েছে, তারা ধনী হোক, কি দরিদ্র। বরঞ্চ এই প্রয়োজনে ব্যয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নেই। কেননা আলিমগণ হচ্ছেন নবিগণের উত্তরাধিকারী। দ্বীনের ধারক ও বাহক হচ্ছেন তাঁরা। ইসলামের মৌল আকীদা ও সার সংরক্ষণ তাদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মুহাম্মাদ (স)-এর উপস্থাপিত শরীয়াত তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায়ই জারি আছে।[১]

মুহাদ্দিসমণ্ডলীর মত—আল কাসেমী

শায়খ জামালুদ্দিন আল কাসেমী (র) তাঁর তাফসীরে তাই লিখেছেন, যার উল্লেখ করেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী। তা হল বাহ্যত বাক্যটি থেকে কেবল যোদ্ধাদেরই বুঝাতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেফাল এ পর্যায়ে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। পরে 'তাজ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ 'এমন প্রত্যেক পথই আল্লাহ্‌র পথ যার মূল লক্ষ্য হচ্ছেন আল্লাহ্।'—তা-ই কল্যাণময়, পুণ্যময়।[২] ...... এবং উপরের উদ্ধৃতিসমূহের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যও করেন নি।

রশীদ রিজা ও শালতুতের অভিমত

'আল-মানার' তাফসীর প্রণেতা সাইয়েদ রশীদ রিজা (র) যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

> প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এই পর্যায়ে 'সাবীলিল্লাহ্' বলতে বোঝায় মুসলিম জনগণের কল্যাণময় যাবতীয় কাজ, যার দৌলতে ব্যক্তির পরিবর্তে দ্বীন ও সমষ্টি তথা রাষ্ট্রের স্থিতি সম্ভব। ব্যক্তিগণের হজ্জ এ পর্যায়ে গণ্য নয়। কেননা হজ্জ তো সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ওপর ফরয, অন্যদের ওপর নয়। তা হচ্ছে আইনী ফরয, তার শর্তগুলো নামায-রোযার মতই। তা দ্বীনি সামষ্টিক কল্যাণময় কাজের মধ্যে গণ্য নয়। তবে হজ্জ অনুষ্ঠান ও উম্মতের প্রতিষ্ঠা সেই পর্যায়ে গণ্য। তাই হজ্জের পথের নিরাপত্তা বিধান, পানি ও খাদ্যের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা এবং হাজীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণে যাকাতের এই ভাগের টাকা ব্যয় হতে পারে—যদি তার জন্য অপর কোন ব্যয়ের ক্ষেত্র না থাকে।[৩]

এর একটু পরেই উক্ত তাফসীরকার লিখেছেন ঃ 'সাবীলিল্লাহ্ বলতে সর্বসাধারণের কল্যাণময় শরীয়াতসম্মত কার্যাবলী বোঝায়, যাতে দ্বীন ও জাতি বা রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যোগ্যতা অর্জন, অস্ত্র ক্রয়, সেনাবাহিনীর খাদ্য, যানবাহন ও যোদ্ধাদের সজ্জিতকরণ ইত্যাদি কাজ (এই কথা ইসলামী যুদ্ধ ও ইসলামী সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে বিবেচ্য, যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কালেমা প্রচারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল

---

১. محاسن التاويل ج ٧ ص ٣١٨١ .২ الروضة الندية ج ١ص ٢٠٦ .১

৩. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٨٥ ط ثانية .৩

হেকামও এই মত দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে; তবে যেসব জিনিস দিয়ে যোদ্ধাকে সুসজ্জিত করা হবে, তা যুদ্ধের পর বায়তুলমালে ফেরত নিতে হবে—যদি তা অবশিষ্ট থাকে। যেমন অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহন। কেননা যোদ্ধা এগুলো যুদ্ধকালে ব্যবহার করলেও সে তার স্থায়ী মালিক হয়ে যায়নি। সে তো তা আল্লাহ্র পথে ব্যবহার করবে মাত্র। আল্লাহ্র পথের যোদ্ধা হওয়ার সেই অবস্থা শেষ হয়ে গেলে তা থেকে যাবে। এই সাধারণ প্রয়োগের মধ্যে সামরিক হাসপাতালও অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য সাধারণ কল্যাণময় কাজও শামিল এর মধ্যে। নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরাতনের মেরামত, রেল লাইন বানানো সামরিক প্রয়োজনে—ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে নয়—এরই মধ্যে গণ্য। প্রতিরক্ষামূলক ব্যারেজ, সামরিক এয়ারপোর্ট, দুর্গ ও পরিখা খনন ইত্যাদি। আমাদের এই যুগে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' খাতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী লোক তৈয়ার ও সংগঠন করা, তাদেরকে কাফিরদের দেশে প্রেরণ করা, সুসংগঠিত বড় বড় সংগঠনের পক্ষ থেকে, যা তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। কাফিরদের মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন করছে। আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই বিরাট কল্যাণময় কাজের বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরেছি।[১]

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ-

তোমাদের মধ্যে কল্যাণময় কাজের দিকে আহ্বানকারী একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে।

শায়খ মাহমুদ শালতুত (র) 'সাবীলিল্লাহ্র' ব্যাখ্যায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'যে সাধারণ কল্যোণময় কাজের কোন ব্যক্তি মালিক নয়, যার কল্যাণ কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সংশ্লিষ্টও নয়, তার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা, তার কল্যাণ আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের জন্য। যে সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা জাতি বিদ্রোহ দমন করে, মান-মর্যাদা রক্ষা করে, মানবীয় আবিষ্কার ও নবোদ্ভাবনসমূহের প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ পরিচালনা করে, তা সবই এর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। সামরিক ও সামষ্টিক হাসপাতালসমূহ এর মধ্যে পড়ে। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতকরণ, রেল লাইন বিছানো প্রভৃতিও এর মধ্যে শামিল। কেননা এগুলো যোদ্ধাদের জন্যে প্রয়োজনীয়। শক্তিশালী পরিপক্ক ইসলাম প্রচারক দল প্রস্তুতকরণ—যারা ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে, তার যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা করবে, তার বিধানসমূহ লোকদের জানিয়ে দেবে, শত্রুপক্ষের সব আক্রমণের মুকাবিলা করবে—যেন যার ফলে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যায়—প্রভৃতি খুবই জরুরী কাজ।

অনুরূপভাবে যেসব উপায়-উপকরণ দ্বারা কুরআন হেফ্যকারীদের স্থায়ী সংরক্ষণ সম্ভব—যারা ক্রমাগতভাবে কুরআনকে তার নাযিল হওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত রক্ষা করে নিয়ে এসেছে—কিয়ামত পর্যন্ত নিয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ্—সে সবের ব্যবস্থা করাও এর মধ্যে গণ্য।[২]

---

১. আলে ইমরান, ১০৪ আয়াত ২. الاسلام عقيدة وشريعة ص ٩٧-٩٨ ط الازهر

এই আলোচনা 'আল-মানার' তাফসীর লেখকের মতেরই সমর্থন করছে। মসজিদ নির্মাণে যাকাত ব্যয় করা যায় কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে এরই ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

'যে মসজিদ নির্মাণ বা মেরামত করার ইচ্ছা করা হয়েছে, তা যদি তথায় একমাত্র মসজিদ হয়ে থাকে, অপর একটি মসজিদ থাকলেও তাতে নামাযীদের সংকুলান হয় না—যদি এমন হয় এবং আর একটি মসজিদের প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তা হলে এই মসজিদের নির্মাণ বা মেরামতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা শরীয়াতসম্মত ও সহীহ্ কাজ হবে। আর এরূপ অবস্থায় মসজিদের জন্য ব্যয় সেই খাত থেকে করা হবে, যা সূরা তওবার আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে যাকাত ব্যয়ের খাত প্রসঙ্গে।

এ কথার ভিত্তি হচ্ছে এই অবলম্বন যে, 'সাবীলিল্লাহ্' বলতে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজই বোঝায়, যাতে তাবৎ মুসলিম জনগণ উপকৃত হতে পারে, কোন বিশেষ এক ব্যক্তি বিশেষভাবে উপকৃত হবে না এমন হবে। তাহলে তাতে মসজিদ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইস্পাত কারখানা, গুদাম ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু তার মধ্যে গণ্য। কেননা এগুলোর কল্যাণ লোকসমষ্টি পায়। এখানে এ কথাও বলার প্রয়োজন মনে করি যে, বিষয়টি নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। (এর পর ইমাম রাযী কিফাল থেকে সর্বপ্রকার কল্যাণময় কাজে যাকাত ব্যয় করা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তাই উদ্ধৃত করেছেন) শেষ পর্যন্ত বলেছেন ঃ আমি এই কথা পসন্দ করি, এতে মনের নিশ্চিন্ততা পাই এবং এরই অনুকূলে ফতোয়া দিচ্ছি। কিন্তু মসজিদ প্রসঙ্গে যে শর্তের উল্লেখ করেছি, সে মসজিদটি এমন যে, তা ছাড়া চলে না। নতুবা মসজিদ ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যয় করাই উত্তম ও বেশি অধিকারসম্পন্ন।[১]

মাখ্লুফের ফতোয়া

শায়খ হুসাইন মাখ্লুফ (মিশরের প্রাক্তন মুফতী)-কে ইসলামী জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহকে যাকাত দেয়া জায়েয কিনা—প্রশ্ন করা হলে তিনি ফতোয়া দিলেন যে, হ্যাঁ, তা জায়েয। ইমাম রাযী কিফাল প্রমুখ থেকে 'সাবীলিল্লাহ্‌র' তাৎপর্য পর্যায়ে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তাই ছিল তাঁর বড় দলিল।[২]

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

উপরে চারটি মাযহাবের মতই উল্লেখ করা হয়েছে, যার অধিকাংশেরই মত হচ্ছে, 'সাবীলিল্লাহ্' বলতে জিহাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি বোঝায়। তার পরে আমরা প্রাচীনকালীন ফিকাহ্‌বিদ ও মুহাদ্দিসগণের অভিমতও উদ্ধৃত করেছি। তাতে দেখা গেছে যে, এরা সকলেই 'সাবীলিল্লাহ্'র ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করার পক্ষপাতী। এক্ষণে এ দুটি মতের কোন্‌টি অধিকতর সত্যানুগ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, তা চিহ্নিত করা আমাদের জন্যে একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

---

১. দেখুন ঃ الفتاوى لشلتوت ص ٢١٩ ط الازهر

২. দেখুন ঃ فتاوى شرعية للشيخ مخلوف ج ٢

যারা 'সাবীলিল্লাহ্'-এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভিত্তি স্থাপিত একটা সুস্পষ্ট দলিলের ওপর। আর তা হচ্ছে 'সাবীলিল্লাহ্' কথাটির আসল ও মূলগত অর্থ। তা বাস্তবিকই সর্বপ্রকারের কল্যাণের কাজ শামিল করে। যেসব কাজের ফায়দা সার্বিকভাবে মুসলিম জনগণ পেতে পার, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে ধরা যায় যে, তাঁরা মসজিদ নির্মাণ, মাদ্‌রাসা ও হাসপাতাল চালানো এবং সর্বপ্রকারের কল্যাণমূলক কাজেই যাকাত ব্যয় করা জায়েয বলে মনে করেছেন।

কিন্তু চারটি মাযহাবের জম্‌হুর ফিকাহ্‌বিদগণই এই মত সমর্থন করেননি। উক্ত কার্যাদিতে যাকাত ব্যয় করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন। তাঁরা দুটি দলিলের ভিত্তিতে এই মত গ্রহণ করেছেন ঃ

প্রথম হচ্ছে, হানাফী মাযহাবের সেই গোঁড়ামী (عول) যে, প্রাপককে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাতের একটা রুকন্ বিশেষ—যা না হলে যাকাত আদায় করা হয় না। আথচ মালিকবিহীন কল্যাণমূলক কার্যাদিতে এটা অনুপস্থিত, সেখানে তা অকল্পনীয়। মালিক বানিয়ে দেয়াকে রুক্‌ন হিসেবে গণ্য করার দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্ একে সাদ্‌কা নামে অভিহিত করেছেন। আর 'সাদ্‌কা'র তত্ত্বকথা হচ্ছে কোন ফকীরকে মালের (تمليك) মালিক বানিয়ে দেয়া।[১]

দ্বিতীয় ঃ মসজিদ, মাদ্‌রাসা, পানি পানের ব্যবস্থা প্রভৃতি যেসব কাজের উল্লেখ এই পর্যায়ে করা হয়, তার কোনটিই যাকাত ব্যয়ের ঘোষিত আটটি খাতের মধ্যে কোন একটি খাতেও পড়ে না। কুরআন মজীদই এই খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। বলেছেঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ......الخ

সাদকা-যাকাত—কেবলমাত্র ফকীর.......ইত্যাদির জন্যে।

انما শব্দটি দ্বারা এই খাতসমূহকে সীমাবদ্ধ ও সুচিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। তা উল্লিখিত বিষয়গুলোকে প্রমাণিত করে এবং তাছাড়া অন্যগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেয়। সেই সাথে হাদীসও রয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَكَمَ فِيْهَا فَجَزَّاَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ.....الخ (الحديث)

তার প্রারম্ভিক কথা হল, আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন, তিনি নিজেই তাকে আটটি অংশে বিভক্ত করে দিয়েছেন........... ইত্যাদি....

ইবনে কুদামাহ তাঁর 'আল-মুগনী' গ্রন্থেও এই হাদীসটিকেই ভিত্তি করেছেন।[২]

---

১. فتح القدير ج ٢ص ٢

২. المغنى ج ٢ ص ١٦٧

প্রথমোক্ত দলিলটি সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। পূর্বে অবশ্য বলা হয়েছে, কুরআন যেসব খাতের উল্লেখ করেছে فى দিয়ে তাতে, تمليك 'মালিক বানিয়ে দেয়া'র শর্ত নেই। যেসব ফিকাহ্‌বিদ যাকাতের টাকা দিয়ে দাসমুক্তকরণ ও মৃতের ঋণ শোধ করা জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন—যদিও তাতে মালিক বানানোর সুযোগ নেই—তাঁরাই উক্তরূপ ফতোয়া প্রচার করেছেন। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে যাকাত জমা করা হলেই তো রাষ্ট্রপ্রধানকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হল সব ফকীর মিসকীনের প্রতিনিধিরূপে। ফকীরের হাতে যাকাত দিয়ে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া তো জরুরী নয়, তাছাড়া অন্য কোনভাবে মালিক বানানো যায় না এমনও তো নয়। তাই রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি যখন যাকাত গ্রহণ করলেন, তখন তো তিনি উপরিউক্ত কার্যাবলীতে যাকাত ব্যয় করতে পারেন। কেননা তিনি তো যাকাত পাওয়ার লোকদের পক্ষ থেকে তার মালিক হয়েছেন তা গ্রহণ করে।

আর দ্বিতীয় দলিল—যাকাত ব্যয়ের খাত আটটির মধ্যে সীমিত—এই মতের ওপর ভিত্তিশীল। এমতাবস্থায় যারা সাবীলিল্লাহ্'র ব্যাপক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী তাদের জবাব দেয়ার জন্য একথা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা বলবেন যে, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ 'সাবীলিল্লাহ্'র মধ্যকার কাজ। কেননা তা বলা হলে আল্লাহ্‌র কথায় সীমিত ও নির্ধারিত আটটি খাতের বাইরে তো যাওয়া হল না। কিন্তু এই মতের লোকদের জন্যে সঠিক জবাব হতে পারে 'সাবীলিল্লাহ্'র তাৎপর্য স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হলে তা কি শুধু যুদ্ধ ও মারামারির অর্থে বিশেষভাবে ব্যবহৃত—যেমন জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন, না তা সর্বপ্রকারের কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কার্যাবলীও সাধারণভাবে শামিল করে ? এই মতের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শব্দের সাধারণ তাৎপর্যের দিক দিয়েও তা বোঝা যায়।

এই শব্দের তাৎপর্য সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণের জন্যে কুরআনের যেসব স্থানে এই শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তার সব কয়টির একত্রে উল্লেখ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের পক্ষে। তাহলেই কোথায় তার কি অর্থ করা হয়েছে তা বোঝা যাবে। আর কুরআনের উত্তম তাফসীর তো কুরআন দিয়েই হতে পারে।

কুরআনে 'সাবীলিল্লাহ্'

কুরআন মজীদের 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' শব্দটি অনেক কয়টি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। দুভাবে এই শব্দের উল্লেখ রয়েছে ঃ

১. কখনও কখনও 'সাবীলিল্লাহ্' পূর্বে 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন আলোচ্য যাকাতের খাত সংক্রান্ত আয়াতে রয়েছে এবং এটাই অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত। কখনও তার পূর্বে عنْ রয়েছে। এরূপ ব্যবহার কুরআনে প্রায় তেইশটি আয়াতে রয়েছে।

এসব আয়াতে তার পূর্বে صَدّ (বিরত রাখা) ব্যবহৃত হয়েছে —যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلَلًا بَعِيْدًا -

যেসব লোক কুফরী করে ও (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখে, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূর চলে গেছে। —সূরা নিসা ঃ ১৮৭

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

যারা কুফরী গ্রহণ করেছে তারা (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-মাল ব্যয় করে। —সূরা আনফাল ঃ ৩৬

কোন কোন আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ্'র পূর্বে اضلال 'গুমরাহ করা' শব্দটি এসেছে। যেমন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এমন লোকও আছে, যারা খেল-তামাশার কথা ক্রয় করে (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে গুম্‌রাহ্ করে নেয়ার উদ্দেশ্যে। —(সূরা লোকমান ঃ ৬)

২. যে যে আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ্' শব্দটির পূর্বে فى এসেছে—আর এই ধরনের আয়াতের সংখ্যাই অধিক—সেখানে হয় انفاق। 'ব্যয় করা' শব্দটি তার পূর্বে এসেছে। যেমন ঃ

اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় কর।

অথবা 'হিজরাত' শব্দটি এসেছে। যেমন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

আর যারা হিজরাত করেছে আল্লাহ্‌র পথে ......

কিংবা قتال (যুদ্ধ) বা قتل (হত্যা) শব্দটি এসেছে। যেমন ঃ

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

তারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, তাতে তারা হত্যাও করে আর নিজেরাও নিহত হয়।

যেমন ঃ وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ-

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না।

অথবা তার পূর্বে 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন ঃ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এবং তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে।

কিংবা দুর্ভিক্ষ বা মার বা অনুরূপ কোন শব্দ এসেছে। এসব ক্ষেত্রে 'ফি-সাবীলিল্লাহ্' শব্দের কি অর্থ বা তাৎপর্য গ্রহণ করা হবে ?

আভিধানিক অর্থে 'সাবীল' অর্থ পথ। আর 'সাবীলিল্লাহ্' অর্থ 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রতিফল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার পথ।' আর আল্লাহ্ তা'আলা নবিগণকে পাঠিয়েছেন গোটা সৃষ্টিলোককে সেই দিকের পথ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর শেষ নবীকে সেই দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে ঃ

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

আহ্বান কর তোমার আল্লাহ্র পথে সুদৃঢ় যৌক্তিকতা ও উত্তম উপদেশ সহকারে।
—সূরা নহল ঃ ১২৫

লোকদের মধ্যে এই কথা ঘোষণা করারও নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اُدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ (يوسف)

এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাই বুঝে শুনে ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে—আমি এবং আমার অনুসারী লোকেরা। —সূরা ইউসূফ

এখানে আরও একটা পথ রয়েছে। কিন্তু তা উক্ত পথের বিপরীত। তা হচ্ছে তাগুতের পথ। ইবলিশ শয়তান এবং তার চেলা-চামণ্ডারা সেই পথে লোকদের আহ্বান জানায়। সে পথটি তার পথিককে জাহান্নাম ও আল্লাহ্র ক্রোধ-অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। এ দুটো পথের ও এই পথ-দ্বয়ের পথিকদের মধ্যে তুলনাস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

ঈমানদার লোকেরা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে এবং কাফিররা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে।
—সূরা নিসা ঃ ৭৬

'সাবীলিল্লাহ্'—'আল্লাহ্র পথের আহ্বানকারী স্বল্পসংখ্যক এবং তার শত্রুপক্ষ—এই পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট লোকের সংখ্যা বিপুল। আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ 'তারা তাদের ধন-মাল ব্যয় করে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের বিরত রাখবে।' 'লোকদের মধ্যে এমনও আছে যারা খেলা-তামাশার বস্তু ক্রয় করে লোকদের আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে।' বলেছেন, 'তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে গুমরাহ করে দেবে।' .....এ সব এই কারণে যে, এ পথে অনিবার্য কষ্ট ও দায়দায়িত্ব মানব-মন ও কামনা-বাসনাকে এই পথের বিরোধী ও রোধকারী বানিয়ে দেয়। এই কারণে মনের কামনা-বাসনা অনুসরণের পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে কুরআন মজীদেঃ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তুমি মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তা করলে তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে গুমরাহ্ করে দেবে।

আল্লাহ্র দুশমনরা যখন তাদের চেষ্টা-সাধনা ও অর্থশক্তি দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহ্র পথে চলায় বাধা দান করার কাজে নিয়োজিত করেছে, তখন আল্লাহ্র সাহায্যকারী মুমিন লোকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থবল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, আর ইসলাম তা ফরযও করে দিয়েছে। তাই এই কাজটিকে ফরয যাকাতের একটা অংশরূপে নির্দিষ্ট করেছে 'আল্লাহ্র পথে'র এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়খাতে ব্যয় করার জন্যে—যেমন করে মুমিনদেরকে সাধারণভাবে তাদের ধন-মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্যে উৎসাহ দান করেছে।

ব্যয় করার কথাটির পার্শ্বে 'সাবীলিল্লাহ'র অর্থ কি ?

কুরআনে যেখানে ব্যয় করার কথাটির পাশে 'সাবীলিল্লাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তথায় এই শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে ঃ

১. সাধারণ অর্থ—যেমন শব্দটির আসল তাৎপর্য হয়—সর্ব প্রকারের নেক কাজ, আল্লাহ্র আনুগত্য ও জনকল্যাণমূলক কাজ। তার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَ لَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْـبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ-

যারা তাদের ধন-মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত—একটি দানার মত, যা সাতটি ছড়া উৎপাদন করে, প্রতিটি ছড়ায় একশ'টি করে দানা থাকে।......আল্লাহ যাকে চান এর চাইতেও কয়েক গুণ বেশি করে দেন।

বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْ مَنًّاوَّ لَااَذًى لَهُمْ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

যেসব লোক তাদের ধন-মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, পরে তার কারণে নিজেদের অনুগ্রহের বোঝা চাপায় না বা কোনরূপ পীড়ন করে না, তাদের জন্য তাদের আল্লাহ্র কাছে বড় শুভ ফল রয়েছে; তাদের কোন ভয় নেই, তাদের দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নেই।

এ সব আয়াত থেকে কোন লোকই এ কথা বুঝেন নি যে, এসব কথা কেবলমাত্র যুদ্ধ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির মধ্যেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে। 'অনুগ্রহের বোঝা চাপানো' ও 'পীড়ন করা' সম্পর্কিত কথার দরুন তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা এ দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে যদি ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্যে অর্থ ব্যয় করা হয়। বিশেষ করে কষ্ট দানের ব্যাপারটি। আল্লাহ্র এ কথাটিও এ পর্যায়েই পড়ে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

যেসব লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

এ সব আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ'র সাধারণ অর্থই গ্রহণীয়। হাফেয ইবনে হাজার এ কথাই লিখেছেন।[১] এসব কথা কেবলমাত্র যুদ্ধ সম্পর্কেই নয় নতুবা যেসব লোক ফকীর-মিসকীন, দরিদ্র-ইয়াতীম ও নিঃস্ব পথিক প্রভৃতি অ-যুদ্ধ পর্যায়ের কাজে অর্থ ব্যয় করবে, তারা এই আয়াত অনুযায়ীই সঞ্চয়কারী ও আযাবের সুসংবাদ প্রাপ্তির উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

এ কালের কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেছেন ঃ 'ফী-সাবীলিল্লাহ' বাক্যাটি যদি ইনফাক বা ব্যয় করার কথাটির পার্শ্বে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার অর্থ নিশ্চিতরূপে জিহাদ হবে। তা ছাড়া অন্য অর্থই বোঝা যাবে না।[২] কিন্তু এ কথা কুরআন মজীদে বাক্যটির ব্যবহারকৃত সব কয়টি আয়াত একত্রিত করে তাৎপর্য অনুধাবনের সর্বাত্মক চেষ্টা না করেই বলা হয়েছে। সূরা আল-বাকারা ও সূরা তওবার পূর্বোদ্ধৃত আয়াতদ্বয় তো উক্ত কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে।

২. 'সাবীলিল্লাহ'র বাক্যটির দ্বিতীয় অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য, তাঁর শত্রুদের সাথে মুকাবিলাকরণ এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র বাণীর প্রচারকার্যের জন্যে যেন কোন ফিতনা—আল্লাহ্র বিধানের শাসনহীন অবস্থা অবস্থিত না থাকে এবং প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহ্তে স্থাপিত হয়। বাক্যাটির পূর্ব কথাই পূর্বোক্ত সাধারণ অর্থ থেকে এই বিশেষ অর্থকে আলাদা করে বিশিষ্ট মর্যাদা দানে ভূষিত করেছে। আর এই বিশেষ অর্থই গ্রহণ করতে হবে, যেখানে যুদ্ধ ও জিহাদের উল্লেখের পর তার উল্লেখ হয়েছে। যেমন ঃ

قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে।

وَجَاهِدُوْافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে।

সূরা আল-বাকারায় 'কিতাল' বা যুদ্ধসংক্রান্ত কথার পর যা বলা হয়েছে তাও এই অর্থেই গ্রহণীয়। যথা ঃ

---

১. فتح البارى ج ٣ ص ١٧٢ - النظام الا قتصادى فى الاسلام

২. تقى الدين النبهانى من منشورات حزب التحرير ص ٢٠٨ ط ثالثه

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (ধন-মাল) ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না এবং খুব দয়ার্দ্র আচরণ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা দয়ার্দ্র আচরণকারীদের ভালোবাসেন। —সূরা বাকারা : ১৯৫

এই আয়াতে যে 'ইনফাক' ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ইসলামের সাহায্য এবং যুধ্যমান ও তাঁর পথে বাধাদানকারী আল্লাহ্‌র শত্রুদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রচার কার্যে ব্যয় করার অর্থে।

সূরা আল-হাদীদে আল্লাহ্‌র বলা এ কথাটিও এ পর্যায়ের :

وَمَالَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى -

আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো না ?....... অথচ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই জন্যে। তোমাদের যারা (মক্কা) জয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে—তারা অন্যদের সমান নয়, তাদের মর্যাদা অনেক বড়—তাদের তুলনায়, যারা (বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। এ সবই আল্লাহ্‌র উত্তম ওয়াদা বিশেষ। —সূরা হাদীদ : ১০

প্রসঙ্গটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এখানে যে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহে বলা ব্যয়ের সমপর্যায়ভুক্ত।

সূরা আল-আনফাল-এ আল্লাহ্‌র এই ইরশাদটি উদ্ধৃত হয়েছে :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ- (انفال - ٦٠)

তোমরা শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তি সঞ্চয় কর যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায়—ঘোড়ার পাহারাদারিও, তার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, তোমাদের শত্রুকেও, তাদের ছাড়া অন্যান্য আরও যেসব রয়েছে তাদেরও যাদের কথা তোমরা জান না, আল্লাহই তাদের জানেন আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা

কিছুই ব্যয় কর, তা তোমাদের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়ে দেয়া হবে—তোমরা নিশ্চয়ই অত্যাচারিত হবে না। —সূরা আনফাল ঃ ৬০

এ আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ' যেখানে উদ্ধৃত হয়েছে, তাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, এখানে 'সাবীলিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র দুশমনদের সাথে সংগ্রাম করার এবং আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সহীহ্ হাদীসে ঠিক এই কথাটিই স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

যে লোক আল্লাহ্র কালেমাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী বানাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, তার এই যুদ্ধই 'আল্লাহ্র পথে' হল।[১]

এই বিশেষ অর্থ বোঝাবার জন্যে কখনও কখনও 'জিহাদ' 'গজওয়া'—যুদ্ধ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি 'ইসলামের সাহায্য' বলে এবং তা খুবই উত্তম। অন্যথায় আল্লাহ্র কথা جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর অর্থ 'জিহাদের মধ্যে জিহাদ কর' করতে হয়। কিন্তু তা খুবই হাস্যকর।

যাকাত ব্যয়ক্ষেত্রে 'সাবীলিল্লাহ্'র অর্থ

'ইনফাক' (ব্যয়) শব্দের পর 'সাবীলিল্লাহ'র উল্লেখ হলে তার এই সাধারণ ও বিশেষ—এ দুটো অর্থই গ্রহণ করতে হয়—যেমন ইতিপূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে—তখন যাকাত-ব্যয় সংক্রান্ত আয়াতে উল্লিখিত 'সাবীলিল্লাহ'র কি অর্থ হবে ? .....এখানেও ব্যয় করার তাৎপর্যটি বিদ্যমান, যদিও শাব্দিকভাবে তার উল্লেখ হয়নি।

এই গ্রন্থাকারের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এই কথা যে, 'সাবীলিল্লাহ' বাক্যের সাধারণ অর্থটি এখানে শোভন হয় না। কেননা এই সাধারণ অর্থে অনেকগুলো দিক এসে যায়, যার প্রকারগুলো সীমিত করা সম্ভব নয়, তার ব্যক্তিগুলোকে চিহ্নিত করা তো দূরের কথা। আর তা যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র হিসেবে আটটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখারও পরিপন্থী হবে। আয়াতটির বাহ্যিক বিবেচনা থেকে তাই প্রকাশিত হয়। নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের ক্ষেত্রে নবী বা অন্য কারোর হুকুমে কিছু ফরয করেন নি। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান দিয়েছেন এবং তাকে আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যেমন 'সাবীলিল্লাহ' তার সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে ফকীর-মিসকীন ও সাত প্রকারের লোকদের দান করাকেও শামিল করে। কেননা এ সব কাজই ভালো, পুণ্যময় ও আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক। তাহলে এই ব্যয়ক্ষেত্রটিও তার পূর্বের ও পরের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

---

১. বুখারী, মুসলিম, আবূ মূসা আল-আশআরী বর্ণিত

মনে রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্র কালাম অতিশয় উচ্চমানের, মানব সাধ্যের উর্ধ্বের, তা নিশ্চয়ই অর্থহীন পুনরাবৃত্তির দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। অতএব এখানে তার এমন একটা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে হবে যা সেটিকে অপরাপর ব্যয়ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় চিহ্নিত ও ভূষিত করবে। প্রাচীনকাল থেকে তাফসীরকার ও ফিকাহ্বিদগণ এই কথাই বুঝেছেন। ফলে তাঁরা 'সাবীলিল্লাহ'র অর্থ করেছেন 'জিহাদ' এবং তাঁরা বলেছেন 'ফি-সাবীলিল্লাহ' নিঃশর্তভাবে ব্যবহৃত হলে তাই তার অর্থ হবে। এ কারণে ইবনুল আসীর লিখেছেন ঃ এই বাক্যটি এই অর্থে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে ধারণা জন্মেছে যে, এর এটাই একমাত্র অর্থ। এ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা এ পর্যায়ে সব কথাই উদ্ধৃত করেছি।

ইবনুল-আসীরের কথার সমর্থন পাওয়া যায় তাবারানী বর্ণিত একটি কথায়। তা হল সাহাবায়ে কিরাম একদা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা সকলে একজন শক্ত-সমর্থ যুবককে দেখতে পেলেন। তাঁরা বললেন, 'যুবকটির যৌবন ও শক্তি-সামর্থ্য যদি আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত হত! অর্থাৎ যদি তা জিহাদ ও ইসলামের সাহায্য কাজে নিয়োজিত হত! (তাহলে কতই না ভালো হত!)

রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে বহু সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, 'সাবীলিল্লাহ' বাক্যটি থেকে সহজেই যে কথাটি বোঝা যায়—মনে জেগে ওঠে—তা হচ্ছে জিহাদ। যেমন হযরত উমরের একটি কথা সহীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

حُمِلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

আমি ঘোড়ার পিঠে আল্লাহ্র পথে নীত হয়েছি অর্থাৎ জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীস হচ্ছে ঃ

لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

আল্লাহ্র পথে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবকিছু অপেক্ষা অধিক উত্তম।

বুখারীতে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَاِنَّ شَبِعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِىْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ....

যে লোক একটি ঘোড়া আল্লাহ্র পথে বেঁধে রাখবে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান সহকারে ও তাঁর ওয়াদাকে সত্য ধরে নিয়ে, তার পেট পুরে খাওয়া, তার তৃষ্ণা নিবৃত্তি, তার পেশাব-পায়খানা সবই কিয়ামতের দিন ওজন বা মূল্য পাবে।

অর্থাৎ এসবই নেক কাজের মধ্যে গণ্য হবে। বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীস ঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا-

যে বান্দাই আল্লাহ্‌র পথে একটি দিন রোযা রাখে, আল্লাহ এই দিনটির বিনিময়ে তার সত্তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তরটি অধ্যায়ের বছর দূরে রাখবেন।

নাসায়ী ও তিরমিযী বর্ণিত ও উত্তম বলে ঘোষিত হাদীস ঃ

مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ بِسَبْعَمِا ئَةِ ضِعْفٍ -

যে লোক আল্লাহ্‌র পথে কিছু পরিমাণ ব্যয় করবে, তার সাত শত গুণ বেশি তার জন্যে লিখিত হবে।

বুখারী উদ্ধৃত হাদীস ঃ

مَااَغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ-

যে বান্দার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলি-মলিন হবে তা জাহান্নাম কখনই স্পর্শ করবে না।

প্রভৃতি বিপুল সংখ্যক হাদীস রয়েছে; কিন্তু এই সবে উদ্ধৃত 'সাবীলিল্লাহ' বাক্য দ্বারা 'জিহাদ' ছাড়া অন্য কোন অর্থ কেউই বুঝেন নি বা গ্রহণ করেন নি।

এ সব দলিল-প্রমাণ ও লক্ষণাদি এ কথা বলার জন্যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য যে, যাকাত বণ্টন সংক্রান্ত আয়াতে 'সাবীলিল্লাহ'র অর্থ হিসেবে 'জিহাদ'ই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। জমহূর আলিমগণ তাই বলেছেন। তার আসল আভিধানিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। আর এই হাদীসটি থেকেও এ কথাই প্রমাণিত হবে যাতে বলা হয়েছে ঃ 'যাকাত কোন ধনীর জন্যে হালাল নয় এই পাঁচজন ছাড়া'... তাদের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও আল্লাহ্‌র পথে যোদ্ধাকে গণ্য করা হয়েছে।

অতএব 'সাবীলিল্লাহ' বাক্যের অর্থে এখানে কোন ব্যাপকতাকে প্রধান্য দেয়া যায় না। তাই সর্বপ্রকারের কল্যাণময় ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কাজগুলোকে এর মধ্যে শামিল করা যাবে না। অনুরূপ তার অর্থে এতটা সংকীর্ণতাকেও প্রশ্রয় দিতে চাই না, যার ফলে 'জিহাদ' বলতে কেবল সামরিক পদক্ষেপই মনে করতে হবে।

জিহাদের এ সকল প্রকার ও রূপই সাহায্য ও অর্থব্যয়ের মুখাপেক্ষী।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ ক্ষেত্রে মৌলিক শর্ত হিসেবে একথা স্পষ্ট ও প্রকাশমান হতে হবে যে, তা 'আল্লাহ্‌র পথে ...... অর্থাৎ ইসলামের সাহায্য ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র কালেমা প্রচারে নিয়োজিত। প্রতিটি জিহাদেরই লক্ষ্য হতে হবে ঃ আল্লাহ্‌র কালেমা উচ্চতর করা। অতএব তা সবই আল্লাহ্‌র পথে, তা যে-কোন ধরনের ও রূপের এবং অস্ত্রের হোক না কেন।

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে 'ফী-সাবীলিল্লাহ'র ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ 'অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যে ব্যয়ে।' আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্‌দের জন্যে যে শরীয়াতের বিধান দিয়েছেন, সেই পথে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে এবং তা-ই কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই।

প্রধান তাফসীরকারের উক্ত কথার প্রথম অংশটি স্পষ্ট এবং গ্রহণীয়। তাতে ইসলামের সাহায্যে ও তার শরীয়াতের সমর্থনে সর্বপ্রকার ব্যয়ই শামিল হবে। তবে আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই দ্বীনের সাহায্য প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা বৈ তো নয়।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের, তাঁর পন্থা ও শরীয়াতের সাহায্য কর্ম কোন কোন অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধ ও লড়াই দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। বরঞ্চ কোন সময় ও স্থানে আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যরূপে এটাই একমাত্র পন্থারূপে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও এমন একটা সময় আসে—যেমন আজকের সময় চিন্তা, মতবাদ ও মানসিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, বিপদ দূরকারী ও গভীর প্রভাবশালী হয়ে পড়ে বস্তুগত সামরিক যুদ্ধের তুলনায়।

প্রাচীন চারটি মায্‌হাবের জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ যখন যাকাতের এ অংশটিকে যোদ্ধা ও অগ্রবর্তী বাহিনীকে সজ্জিতকরণ এবং তাদের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন ক্রয়ে সাহায্য করার কাজে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা এ কালের প্রয়োজনে এক নতুন ও ভিন্ন ধরনের যোদ্ধা ও অগ্রবর্তী বাহিনীকে তার সাথে শামিল করছি। তারা হচ্ছে সেসব লোক, যারা ইসলামের শিক্ষাদানে, জনগণের বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্যে কাজ করছে। এরা ইসলামের দাওয়াতদাতা লোক, এরা তাদের চেষ্টা-সাধনা, মুখের কথা, ভাষা-সাহিত্য দিয়ে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী বিধানে সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার কাজে সদা নিয়োজিত।

জিহাদের তাৎপর্যে আমরা এই যে ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা নিয়ে আসছি, তার দলিলও আমাদের নিকট রয়েছে। তা এই ঃ

প্রথমঃ ইসলামের জিহাদ কেবলমাত্র সামরিক তৎপরতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নবী করীম (স) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ জিহাদ উত্তম ? তিনি বললেন ঃ

كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা বলা।[১]

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন —নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আমার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যে নবীই কোন

---

১. আহমাদ, নাসায়ী ও বায়হাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন জিয়া মাকদাসী তারেক ইবনে শিহাব থেকে। মুনযেরী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্। ١٨٢ التيسير للمناوى ج ١ ص

উম্মতের প্রতি পাঠিয়েছেন তার উম্মতের মধ্যে তাঁর বহু সংখ্যক 'হাওয়ারী' ও সাহাবী (সঙ্গী-সাথী) বানিয়ে দিয়েছেন, যারা তাঁর সুন্নাতকে ধারণ করে এবং তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালন করে। পরে তাদের উত্তরাধিকারীরা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা বলে এমন এসব কথা যা তারা বাস্তবে করে না এবং করে সেসব কাজ, যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এরূপ অবস্থায় যে লোক তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে নিজের হস্ত (শক্তি) দ্বারা, সে মুমিন, যে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে নিজের মুখের কথা-ভাষা দ্বারা সে-ও মুমিন। আর যে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে তার অন্তর দ্বারা সে-ও মুমিন। এর পরে আর কারোর একদানা পরিমাণ ঈমানও নেই বলে মনে করতে হবে।'

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তোমাদের ধন-মাল দিয়ে, তোমাদের মন দ্বারা ও তোমাদের মুখের (ভাষা) দ্বারা।[১]

দ্বিতীয়, উপরে জিহাদের যে বিভিন্ন বস্তু ও ইসলামী তৎপরতার উল্লেখ করেছি, তা যদি জিহাদের অর্থের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে অকাট্য দলিলের অভাবে, তাহলে তা কিয়াসের সাহায্যে অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এ উভয় পর্যায়ের কাজই ইসলামের সাহায্যে নিবেদিত, তার প্রতিরক্ষাই লক্ষ্য এবং তার সাহায্যে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করা হয়, আল্লাহ্র জমিনে তাঁরই কালেমা প্রচার করা হয়।

মুসলমানদের মধ্যে এমন ফিকাহ্বিদও আমরা পাচ্ছি, যাঁরা যাকাত সংস্থার কর্মচারীরূপে গণ্য করেন এমন সমস্ত লোককে, যারা সাধারণ মুসলিম জনগণের পক্ষে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত। ইবনে রুশ্দ বলেছেন ঃ যাঁরা কর্মচারীদের জন্য—তারা ধনী হলেও—যাকাত জায়েয বলেছেন, বিচারকমণ্ডলী এবং এই ধরনের কাজে নিয়োজিত লোকদের জন্যে তা জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা তাদের সকলের দ্বারা সাধারণ মুসলিম উপকৃত হয়ে থাকে।[২] যেমন হানাফী মাযহাবের এমন ফিকাহ্বিদ আমরা দেখতে পাই, যারা 'ইবনুস্-সাবীল—নিঃস্ব পথিক পর্যায়ে' গণ্য করেছেন এমন সমস্ত লোককে, যারা নিজেদের ধন-মাল থেকে অনুপস্থিত, তা ব্যয়-ব্যবহার করতে অক্ষম, যদিও তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও গ্রাম-শহরে অবস্থান করছে। কেননা এক্ষেত্রে আসল কারণ হচ্ছে প্রয়োজন বা অভাব—আর তা এখানে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। এই প্রেক্ষিতে আমরা যদি জিহাদ অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধের সাথে এমন সব কাজকেও শামিল মনে করি যা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে এবং কথা বা কাজ দ্বারা এই কাজের সহায়তা করে, তা হলে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা 'কারণ' বা 'ইল্লাত'টা এখানে অভিন্ন। আর তা হচ্ছে ইসলামের সাহায্য।

---

১. হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম আনাস থেকে এবং বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্। তাঁরা এটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। تيسير ج ١ ص ٤٨٥

২. بداية المجتهد ج١ ص ٢٧٦

এর পূর্বে আমরা দেখেছি, যাকাত অধ্যায়ে 'কিয়াস'-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এমন কোন মাযহাব নেই, যা কোন-না-কোনভাবে ও কোন-না-কোন অবস্থায় তার প্রয়োজন মনে করেন নি।

এই 'সাবীলিল্লাহ্' পর্যায়ে আমরা যে মতটি গ্রহণ করেছি, তার যৌক্তিকতা এই প্রেক্ষিতেই অনুধাবনীয়। আর তা হচ্ছে, তার অর্থে সামান্য প্রশস্ততার ভাবধারা সহকারে জনমতের গুরুত্ব।

এই পর্যায়ে আমি এ ব্যাপারটিও জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন কোন কাজ ও প্রকল্প কোন-না-কোন সময়ে কোন-না-কোন স্থানে ও অবস্থায় 'আল্লাহ্র পথে জিহাদরূপে গণ্য হয়ে যায়, হয়ত তা অপর সময়ে ও অপর স্থানে ও অবস্থায় 'জিহাদ'রূপে গণ্য হয় না।

সাধারণভাবে একটা দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা নেক কাজ ও প্রশংসনীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টারূপে গণ্য হয়, যা দ্বীন-ইসলামের বিরাট কল্যাণ করে; কিন্তু তা 'জিহাদ'রূপ গণ্য হয় না। কিন্তু যেখানে গোটা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণভাবে খৃস্টান মিশনারী বা কমিউনিস্ট অথবা ধর্মহীন-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের একচেটিয়া কর্তৃত্বে চলে গেছে, সেখানে একটা খালেস দ্বীনী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কায়েম ও চালু করা এবং রাখাও বিরাট জিহাদরূপে অবশ্যই গণ্য হবে, যা মুসলমান সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষাদানের কাজ করবে এবং চিন্তা-বিশ্বাসের বিপর্যয় থেকে তাদের রক্ষা করবে, জীবন-ধারা, লেখাপড়া, শিক্ষকদের বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ জন-মানুষের মৌল ভাবধারায় যে বিষ ছড়ানো হচ্ছে, তা থেকে তাদের বাঁচাবে।

বিপর্যয়কারী বই-পুস্তকের মুকাবিলায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও পাঠাগার গড়ে তোলাও এ পর্যায়েরই কাজ বলে গণ্য হবে।

মুসলমানদের চিকিৎসার জন্যে একটা চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা এবং খৃস্টান মিশনারীদের নৈতিক ও আকীদা-বিশ্বাসে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী চিকিৎসা থেকে তাদের রক্ষা করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যদিও চিন্তা-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর বিপদ সৃষ্টিকারী ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবশালী হয়ে থাকে।

একালে 'সাবীলিল্লাহ্'র অংশ কোথায় ব্যয় করা হবে ?

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, চারটি মাযহাবের প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে ঃ 'সাবীলিল্লাহ'-এর অর্থ হচ্ছে সামরিক ও সশস্ত্রতার অর্থে জিহাদ ও যুদ্ধ। অন্য কথায়, 'সাবীলিল্লাহ' হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধ। যেমন সাহাবায়ে কিরাম ও মহান তাবেয়িগণ যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা তার সূচনা করেছেন আল্লাহ্র নামে, কুরআনের ঝাণ্ডার তলে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল মানুষকে সৃষ্টিকুলের বন্দেগী ও দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র বান্দাহ বানিয়ে দেয়া, জীবনের সংকীর্ণতা-কাঠিন্য থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জীবনের প্রশস্ততা-উদারতার মধ্যে নিয়ে আসা, ধর্মের নামে অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বের করে ইসলামের সুবিচার ও ন্যায়-নিষ্ঠা নিয়ে আসার জন্যে।

কেউ কেউ মনে করেন, আজকের দিনে এ ধরনের যুদ্ধের আর কোন অস্তিত্ব বা অবকাশ নেই, দীর্ঘকাল পর্যন্তই তার অস্তিত্ব ছিলও না। যেসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এ কালের মুসলিম দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এবং কিছুকাল ধরে চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই ইসলামী যুদ্ধ নয়। মুসলমানগণ তাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়ছে না। সেগুলো হচ্ছে জাতীয় বা স্বাদেশিক পর্যায়ের যুদ্ধ, তা একটি জাতি করে তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের দেশ বা জাতির বিদ্রোহী হয়েছে অথবা অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়েছে। এগুলো আসলে নেহায়েত বৈষয়িক যুদ্ধ, দ্বীনের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। অতএব এসব যুদ্ধ কখনই 'ফী-সাবীলিল্লাহ' বলে গণ্য হতে পারে না। আর এজন্যেই এসব যুদ্ধে যাকাত ব্যয় করা কোন মুসলমানের পক্ষেই জায়েয নয়।

কোন কোন মুসলমান এরূপ ধারণা করেন, বলেনও। কিন্তু এ কথাটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক, যেন তার ভুল ও শুদ্ধ দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইসলামী যুদ্ধ বা ইসলামী জিহাদ কেবলমাত্র সেসব রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যা সাহাবায়ে কিরামের যুগে পরিচিত ছিল। বিদ্রোহী স্বৈরাচারী শক্তিসমূহ দমন বা উৎখাতের উদ্দেশ্যে যেসব যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে—যার ফলে মুসলমানকে ইসলাম থেকে বলপূর্বক দূরে সরিয়ে নেয়া হয় এবং ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনকে শক্তিবলে নেস্তনাবুদ করা হয়, ইসলামের আন্দোলনকারীদের অত্যাচার-নিপীড়ন সহকারে হত্যা করা হয়, এ ধরনের যুদ্ধ—তার লক্ষ্য ও নিয়ম-নীতিসহ ইতিহাসে কখনই পরিচিত বা পরিচালিত ছিল না। এসব যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাবের কোন দৃষ্টান্ত অতীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে এগুলো ছিল বিদ্রোহীদের কর্তৃত্ব থেকে জাতিসমূহকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে, তারা আল্লাহ্র বান্দাহ্দেরকে নিজেদের দাসানুদাস বানাবার উদ্দেশ্যেই এসব যুদ্ধ চালিয়েছে।

সন্দেহ নেই, এ অবস্থা ইসলামী যুদ্ধ এবং ইসলামী জিহাদের পক্ষে খুব ভয়াবহ, কিন্তু তা-ই একমাত্র অবস্থা নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন এমন যুদ্ধও সংঘটিত হতে দেখা গেছে, যাতে ইসলাম ও ইসলামপন্থীরা নিজেদের সত্তা, মান-মর্যাদা, ইজ্জত-আবরু, দেশ বা জন্মভূমি ও পবিত্রতম প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলামের জন্যেই তারা ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করেছে যার পবিত্রতা সাহাবা-তাবেয়ীনের যুদ্ধের তুলনায় কিছুমাত্র সামান্য নয়। এসব যুদ্ধের ইতিহাসের ইমাদুদ্দীন জংগী, নূরুদ্দীন মাহমুদ, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, কুতজ ও জাহির বেবিরস প্রমুখের নাম আজও জ্বলজ্বল করছে। এগুলো হিত্তীন, বাইতুল মাকদিস ও জালুত-কূপের যুদ্ধ। ইসলামী দেশকে তাতার ও ক্রুস যোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুদ্ধ যখন ইসলামী দাওয়াত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল, তখন নূরুদ্দীন, সালাহুদ্দীন ও কুতুজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইসলামের দেশ ও ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে। আর জিহাদ যেমন ফরয হয়েছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার্থে—তার সমর্থনে, তেমনি ফরয হয়েছে ইসলামী দেশ রক্ষার জন্যেও। কেননা

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ইসলামী দেশের মতই। এ দুটোরই পূর্ণ সংরক্ষণ এবং আক্রমণকারীদের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া একান্তই আবশ্যক।

দেশ বা জমিনের এরূপ গুরুত্ব এবং তার সংরক্ষণ প্রতিরক্ষা একটা ইবাদত ও পবিত্র কর্তব্যরূপে গণ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে তা দারুল-ইসলাম—ইসলামের আবাসস্থল, ইসলামের অবস্থানক্ষেত্র, ইসলামের পরিবেশ। পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি অথবা বাপ-দাদার দেশ বলে নয়। কেননা মুসলমান অনেক সময় এই বাপ-দাদার দেশ থেকেও হিজরত করে ইসলামেরই ভালোবাসায়—ইসলামের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রক্ষার্থে অন্য দেশে—সম্পূর্ণ বিদেশ বিভূঁইয়ে চলে যেতেও প্রস্তুত হয়—যদি পূর্বের স্থানে ও দেশে ইসলাম পালন করা সম্পূর্ণ অবসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, ইসলামের কথা শুনতে একটি কর্ণও প্রস্তুত না থাকে। রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর সাহাবিগণ ঠিক এ কারণে ও এরূপ অবস্থায়ই মক্কা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা হয়েছিলেন 'মুহাজির ফী-সাবীলিল্লাহ'। এরূপ অবস্থা আজও হতে পারে শুধু তাই নয়, রাত-দিন হতে দেখা যাচ্ছে।

কাফিরী শাসন থেকে ইসলামের দেশ মুক্তকরণ

কোন সন্দেহ নেই, এ কালেও 'জিহাদ' শব্দের বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে জোরপূর্বক দখলকারী কাফিরদের প্রশাসন থেকে ইসলামী দেশ মুক্তকরণের সংগ্রামের ওপর। কেননা তারা তথায় আল্লাহ্র বিধান উচ্ছেদ করে কাফিরী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কাফির ইয়াহুদী হোক, খৃস্টান হোক বা মূর্তিপূজারী অথবা নাস্তিক কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্যানুসারী—এরা কেউই আল্লাহ্র দ্বীন মেনে চলে না। আর কুফর—তার রূপ যাই হোক—এক অভিন্ন শক্তি, ইসলামের দুশমন।

পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্টপন্থী, পাশ্চাত্যপন্থী বা প্রাচ্যবাদী, আহ্লি কিতাব কিংবা ধর্মহীন—ইসলামের দৃষ্টিতে সকলই সমান। এই সবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয—যদি তারা বল প্রয়োগ করে কোন ইসলামী দেশ বা তার কোন অংশ দখল করে নেয়। কোন অংশ দখল করে নিলেও তা গোটা দেশের সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্তব্য কাজে শরীক হওয়ার বাধ্যবাধকতা নৈকট্যের দৃষ্টিতে বিচার্য। যারা অতি নিকটে, তাদের কর্তব্য সর্বাগ্রে। শেষ পর্যন্ত এই কর্তব্য গোটা মুসলিম জাতির ওপর বর্তে। কেউই এ কর্তব্য পালন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। অবশ্য সকলের যোগদানের পরিবর্তে কিছু লোকের অংশ গ্রহণে যদি উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

তবে একালে অনেক কয়টি মুসলিম দেশ কাফির শক্তি কর্তৃক দখলকৃত বা অধিকৃত, আক্রান্ত হওয়ার দরুন এখানকার গোটা মুসলিম জাতির ওপরই এক কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে—যা ইতিপূর্বে কখনই দেখা যায়নি। এ দেশগুলোর মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য হচ্ছে ফিলিস্তিন। দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী ইয়াহুদীরা এ দেশটি দখল করে নিয়েছে। কাশ্মীরের প্রধান অংশ দখল করে নিয়েছে হিন্দু মুশরিকরা। এরিটেরিয়া,

আবিসিনিয়া, চাদ, পশ্চিম সোমালিয়া ও কবরুচ বা ক্রীট—ষড়যন্ত্রকারী হিংসুক খৃস্টান বা কমিউনিস্ট শক্তি এসব দেশ দখল করে নিয়েছে। আর সমরখন্দ, বোখারা, তাসখন্দ, উজবেকিস্তান ও আলবেনিয়া প্রভৃতি ইসলামী দেশ নাস্তিক খোদা বিদ্রোহী কমিউনিস্টরা শক্তি প্রয়োগ করে দখল করে নিয়েছে। এখনকার মত শেষ শিকার হচ্ছে আফগানিস্তান। রাশিয়া নিতান্ত গায়ের জোরেই তা দখল করে রেখেছে।

এসব দেশ পুনরুদ্ধার করা ও কুফরী শাসন থেকে তা মুক্ত করা—কুফরী আইন-বিধান সম্পূর্ণ উৎখাত করা সামষ্টিকভাবে গোটা মুসলিম জাতিরই একান্ত কর্তব্য। এসব শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা একটা বড় ইসলামী ফরয বিশেষ।

এ উদ্দেশ্যে এসব দেশের যে কোন অংশে কোন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তা নিঃসন্দেহে 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ' হবে। অবশ্য লক্ষ্য হতে হবে কুফরী শাসন ও কাফিরী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তকরণ। এ যুদ্ধে ধন-মাল ব্যয় করা ও কার্যত সাহায্য-সহায়তা করা অবশ্যই ফরয হবে। আর এজন্যে যাকাতের একটা অংশ দেয়াও একান্তই উচিত হবে। সে অংশের পরিমাণ কমও হতেও পারে, বেশিও হতে পারে—যাকাত বাবদ সঞ্চিত সম্পদের হার অনুপাতেই তা হবে একদিক দিয়ে। আর জিহাদের প্রয়োজনের দৃষ্টিতেও তা কম বা বেশি হতে পারে অপর দিকের বিচারে। আর অন্যান্য সর্ববিধ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তীব্রতা ও দুর্বলতার দৃষ্টিতেও তার বিবেচনা হতে পারে। এ সবই নির্ভর করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিবেচনাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর। মুসলিম পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টাগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, সেরূপই হবে।

সব যুদ্ধই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' নয়

এ পর্যায়ে একটি বিষয়ে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন। কোন কোন মুসলমান মনে করেন, মুসলিম নামধারী লোকদের যে কোন উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণই 'আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ' বলে বিবেচিত হবে, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে যা-ই হোক, তার আচার-বিধি ও ভঙ্গি—দৃষ্টিকোণ যেরূপই হোক না কেন। সে যুদ্ধ আল্লাহ্র নামে শুরু করা হোক কিংবা অপর কারোর নামে। যে ঝাণ্ডার তলে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করা হবে, তা ইসলামী ঝাণ্ডা হোক, কি কাফিরী ঝাণ্ডা অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী যুদ্ধ বা জাতীয়তা কিংবা দেশমাতৃক বা শ্রেণীভিত্তিক—সব যুদ্ধই মুসলমানদের জন্যে কর্তব্য।

আমরা তাকীদ সহকারে বলতে চাই, যুদ্ধ কেবল তখনই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'—'আল্লাহ্র পথে' গণ্য হতে পারে, যদি তা ইসলামী লক্ষ্যে ও ইসলামী রীতি নীতি অনুযায়ী হয়। অন্য কথায় যুদ্ধ হতে হবে দ্বীন ইসলামের সাহায্যার্থে, আল্লাহ্র কালেমার প্রচার উদ্দেশ্যে, ইসলামের আবাসক্ষেত্রের সংরক্ষণ ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে। আর এ জিনিসই ইসলামী যুদ্ধকে অন্যান্য সর্বপ্রকার যুদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে পারে। কোন যুদ্ধ এসব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাশূন্য হলে তা নিতান্তই বৈষয়িক যুদ্ধ হবে। আর এ ধরনের যুদ্ধ সাধারণত নাস্তিক ধর্মহীন লোকেরাই করে থাকে।

এ ধরনের যুদ্ধ কোথাও শুরু হলে—যাতে মহান আল্লাহ্‌র বা তাঁর দ্বীনের, তাঁর কিতাবের , তাঁর রাসূলের কোন স্থান বা স্বীকৃতি নেই—তাতে যাকাতের একটি পয়সা ব্যয় করাও সম্পূর্ণ না-জায়েয হবে—তাকে যতই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' মনে করা হোক না কেন।

মনে করা যেতে পারে, আলবেনীয় বা উজবেকিস্তানী কোন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী যদি তাদের দেশ—যা মূলত ইসলামী দেশ ছিল—রুশীয় কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব-আধিপত্য থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তৎপরতা শুরু করে ও সেজন্যে যুদ্ধের সূচনা করে, তাহলে এই যুদ্ধটিকে কি 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' গণ্য করা যাবে ?....তাতে কি জায়েয হবে যাকাতের টাকা ব্যয় করা ? কেননা বলা যেতে পারে, একটি ইসলামী দেশকে বিদেশীয়—রুশীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ করা হচ্ছে।

এর উত্তর অকাট্যভাবে নেতিবাচক, কেননা উজবেকী কমিউনিস্ট ও রুশীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে কোনই পার্থক্য নেই। এ যুদ্ধের ফলে হয়ত এক কমিউনিস্ট আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে; কিন্তু তার পরিণতিতে অপর এক কমিউনিস্ট আধিপত্যের অধীনতা ছাড়া আর তো কিছুই হবার নয়। ইসলামে কেবল জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার পার্থক্যের কোনই মূল্য নেই।—কেননা এরা সকলেই খোদা-দ্রোহী—তাগুত; কিংবা তাগুতের চেলাচামুণ্ডা মাত্র। তবে মুসলমানরাই এ যুদ্ধের সূচনা করে কাফিরী শাসন খতম করে ইসলামী শাসন-প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং তারা যদি জাহিলীয়াতের পতাকা পরিহার করে ইসলামী তওহীদী পতাকা উড্ডীন করে, তবেই তা 'ইসলামী জিহাদ' নামে অভিহিত হতে পারে।

ইসলাম নিছক 'জিহাদ' নামের মারামারি ও হত্যাকাণ্ড মাত্রকেই পবিত্র বলে গ্রহণ করতে রাজী নয়। হ্যাঁ, যদি এ জিহাদ ও নরহত্যা আল্লাহ্‌র পথে হয়, তবেই তা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্ব পেতে পারে। সে অবস্থায় সমস্ত মানুষই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, শত্রুদের হত্যা করবে, এ কাজে তারা ধন-মাল ও মনপ্রাণ বিনিয়োগ করবে। নিজেদেরও রক্ষা করবে, নিজেদের ইজ্জত-আবরু ও স্বদেশও রক্ষা করবে। এ কাজে ফাসিক-ফাজের, দ্বীন-ধর্মহীন লোকেরাও অনেক বীরত্ব দেখাবে, অনেক কুরবানী দেবে, রক্ষা করবে নিজেদের দেশ ও ঘর-বাড়ি, জাতি ও জনতাকে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা-সাধনা আল্লাহ্‌র নিকট কোন মূল্যই পাবে না।

এ সব যুদ্ধে মুমিনরা যোদ্ধা ও জিহাদকারী হয়েও অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্য পেতে পারে শুধু এ দিক দিয়ে যে, তারা জিহাদ করছে আল্লাহ্‌র পথে, অস্ত্র চালনা করছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং তাই তাদের চরম লক্ষ্য।

এ মহান লক্ষ্যই তাদের জিহাদ ও যুদ্ধকে পবিত্র ও মহান বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও বিরাট ইবাদতের পর্যায়ে গণ্য হওয়ার যোগ্য বানিয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি যখন কোন ভূ-খণ্ড মুক্তকরণের লক্ষ্যে অস্ত্র চালনা করে, তখন তারা

একটি জাতিকে উৎখাত করে অনুরূপ অপর একটি জাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে না। একটি শ্রেণীর স্থানে অপর একটি শ্রেণীকে প্রধান বানিয়ে দেয়াও তাদের লক্ষ্য হয় না। তারা যুদ্ধ করে গায়রুল্লাহ্‌র শাসন খতম করে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বভিত্তিক শাসন-বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। তথায় আল্লাহ্‌র শরীয়াতের প্রাধান্য হবে, আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ হবে, এই উদ্দেশ্যে।

এ তাৎপর্য বহন না করলে কোন যুদ্ধই ইসলামের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না। তা হয়ে যাবে নিছক বৈষয়িক উদ্দেশ্যে করা যুদ্ধ, মাটির জন্যে যুদ্ধ—দ্বীনের জন্যে নয়। এ দুই ধরনের যুদ্ধের মাঝে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা সকলেরই অনুধাবনীয়।

এই ধরনের যুদ্ধকে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' নামে অভিহিত করার কোন জ্ঞানী দ্বীনপন্থী মুসলিমের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তাতে ফরয যাকাতের কোন অংশ ব্যয় করার জন্যে মুসলমানদের বলতেও পারে না কেউ। অনেক সময় দেখা যায়, এ সব যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এমন সব লোক যারা প্রকৃত কাফিরদের অপেক্ষাও ইসলামের কট্টর দুশমন।

হাফেয আবূ মুহাম্মাদ আবদুল গনী তাঁর সনদে আবদুর রহমান ইবনে আবূ নায়াম থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট বসা ছিলাম। তখন একজন স্ত্রীলোক এসে তাঁকে বললোঃ হে আবূ আবদুর রহমান, আমার স্বামী তাঁর সমস্ত ধন-মাল 'ফী-সাবীলিল্লাহ্‌' দেয়ার অসীয়ত করে গেছেন। ইবনে উমর বললেন ঃ তাহলে তা তাতেই উৎসর্গিত হবে—আল্লাহ্‌র পথে। ইবনে আবূ নায়াম বললেন ঃ এই কথা বলে তো আপনি স্ত্রীলোকটির চিন্তা-ভাবনা বৃদ্ধি করেই দিলেন (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করে যে সমস্যার সমাধান চেয়েছিল, এই জবাবে তা সে পায়নি)। ইবনে উমর বললেন ঃ তাহলে তুমি আমাকে কি বলতে বল, হে ইবনে আবূ নায়াম ?.... আমি কি তা সেসব সৈন্য-সামন্তকে দিতে বলব, যারা দুনিয়ায় সীমা লংঘনের জন্যে বে'র হয় এবং পথে পথে ডাকাতি করে বেড়ায় ? আমি বললাম ঃ তাহলে আপনি মেয়েলোকটিকে কি করতে বললেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'আমি তাকে নির্দেশ দিচ্ছি, এই ওয়াক্‌ফকৃত ধন-মাল নেক লোকদের মধ্যে ও আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ যাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করতে। এরাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, এরাই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, এরাই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।'[১]

হযরত ইবনে উমর (রা) তাঁর সময়কার সৈন্য-সামন্তদের কর্মতৎপরতা আল্লাহ্‌র পথে হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়েছিলেন অথচ সেকালের সৈন্যদের অনৈসলামী ঝাণ্ডা বা ইসলাম-বিরোধী তেমন কোন কার্যকলাপ ছিল না। এমন কি খারেজী সৈন্যদের সম্পর্কেও এ কথা চলে। তাহলে এ যুগের সৈন্য-সামন্তদের সম্পর্কে কি বলা যায় ?

---

১. তাফসীরে কুরতুবী ৮ম খণ্ড, ১৮৫ পৃ.। মনে হচ্ছে, আসল ঘটনাটিই হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত যে, হজ্জ আল্লাহ্‌র পথের ব্যাপার। কুরতুবীর বর্ণনা প্রসংগ থেকে তাই বোঝা যায়। ইবনে উমরের কথা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, 'সাবীলিল্লাহ্‌' কথাটি নিঃশর্তভাবে বলা হলে তা থেকে জিহাদ বুঝা যাবে। কিন্তু এই প্রাথমিক ও সহজ ধারণা থেকে ভিন্ন অর্থে নেয়া হয়েছে যখন দেখা গেছে জিহাদকারীদের আদর্শচ্যুতি ও বিভ্রান্তি বিপর্যয়।

আজকের সৈন্যদের যদি তিনি দেখতে পেতেন, এরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না, ইসলামের নামও জানে না, বলে না। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নামায কায়েমের বা আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীর কোন ব্যবস্থাই নেই...যদি তিনি দেখতে পেতেন, সেনাধ্যক্ষদের অবস্থা, তারা তাসখেলা ও মদ্য পান ছাড়া আর কিছু জানে না, যদি দেখতে পেতেন, একালের সব সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রীতি ও পন্থায় পরিচালিত হচ্ছে, তথায় আল্লাহ্-রাসূল বা আল্লাহ্র দ্বীন ও কিতাবের কোন স্থান নেই, তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ইসলাম-বিরোধী জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়, কাফির ও কুফরের প্রাধান্য বিস্তার করছে মাত্র, দ্বীন ইসলাম ও তার ধারক-বাহকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে দিন-রাত, দ্বীনের গুরুত্ব কিছু মাত্র স্বীকার করে না—তার নাম যদি কখনও নেয় তো শুধু প্রাণ–শক্তির বৃদ্ধি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগানোর উদ্দেশ্যে....তাহলে তিনি কি বলতেন ?

আমরা আবার বলছি, আজকের দিনের সব যুদ্ধই সংঘটিত হচ্ছে গায়র-ইসলামী ঝাণ্ডার নীচে, ইসলামের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নয়, ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থেও নয়। তাই এসব যুদ্ধই গায়র-ইসলামী। এই যুদ্ধকে 'ফী-সাবীলিল্লাহ্' বলা দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যায়ে আমাদের দলিল হচ্ছে অনেক কয়জন হাদীস: গ্র প্রণেতার উদ্ধৃত হাদীস, হযরত আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে খুব বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিল, আর এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে যুদ্ধ করছিল অন্ধ আত্মম্ভরিতা ভরে, অপর এক ব্যক্তি লড়ছিল লোক দেখানো ছলে, এদের মধ্যে কার যুদ্ধ আল্লাহ্র পথে হচ্ছে ? রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ যে লোক যুদ্ধ করছে আল্লাহ্র কালেমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে, সেটাই আল্লাহ্র পথে হচ্ছে মনে করতে হবে।[১]

বস্তুত ইসলামী জিহাদ ও জাহিলী যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে এটাই হচ্ছে মৌলিক ও নৈতিক পার্থক্য—আল্লাহ্র পথ ও তাগুতের পথের মধ্যকার লক্ষণীয় তারতম্য। যে লোক আল্লাহ্র কালেমার প্রাধান্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লড়াই করছে, কেবল তাই 'ফী-সাবীলিল্লাহ্'—অন্য কিছু নয়।[২]

তবে লোকদের অন্তর দীর্ণ করে ভিতরকার অবস্থা দেখার জন্যে মুসলিমদের বাধ্য করা হয়নি। স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের অবস্থা ও সমষ্টির বাহ্যিক অবস্থাই লক্ষণীয় স্বাভাবিক অবস্থা বুঝবার জন্যে, তাদের সাধারণ মতি-গতি দৃষ্টি ভঙ্গী অনুধাবনের জন্য, তাদের লক্ষ্য ও চরিত্র মূল্যায়নের লক্ষ্যে। যা তারা প্রকাশ্যভাবে বলছে, তা-ই ধরা যেতে পারে। মনের গোপন গহনে কার কি মানসিকতা ও প্রেরণার উৎস, কোন্ ব্যক্তির কি, সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সমর্পিত।

---

১. المنتقى গ্রন্থে উদ্ধৃত। দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٧ ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ط مصطفى الحلبى، ثانيه

২. পূর্বোদ্ধৃত সূত্র।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, এ কালের সব যুদ্ধই ইসলামী নয়, নয় আল্লাহ্‌র পথে—কেননা তা সাহাবায়ে কিরামের যুদ্ধের মত নয়—এরূপ বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং বিশেষ ধরনের স্পর্ধাও বটে! ঠিক যেমন একথা বলাও অযৌক্তিক যে, এ কালের মুসলমানের যে কোন যুদ্ধ বা সামরিক পদক্ষেপ—উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তার যা-ই হোক, ভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ যা-ই হোক, চিন্তা-বিশ্বাস যা-ই হোক—আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধ। এরূপ বলাও একটা বড় ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই একালের আলিমগণের কর্তব্য, ফতোয়া দানের সময় যেন তারা মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং প্রকৃত সত্য যা তা জানতে ও অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন যেন যেসব লোক গোপনে বা প্রকাশ্যে ইসলামের সাথে শত্রুতা করছে তাদের জন্যে মুসলমানদের ধন-মাল ব্যয় করা না হয়, যেন মুসলমানদের সমর্থন পেয়ে এই শ্রেণীর লোকেরা বর্বরতা ও পাশবিকতা দেখাবার সুযোগ না পায়, ইসলামকে 'সেকেলে' বলে অভিহিত করতে না পারে, যেমন এ কালে ইসলামের ধারক-বাহকদের বলা হয় পশ্চাদপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল। এ শ্রেণীর লোকদের নাম অনেক সময় মুসলিম ধরনের বটে; কিন্তু কার্যত তারা ইয়াহুদ-খৃস্টান-কমিউনিস্টদের চাইতেও অধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক হয়ে যাবে দ্বীন-ইসলাম ও মুসলিম জনতার পক্ষে।

ইসলামী শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ

এ কালে যাকাতের 'ফী-সাবীলিল্লাহ' অংশের ধন-সম্পদ সেই কাজে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়, যার উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত সংস্কারক মনীষী আল্লামা সাইয়েদ রশীদ রিজা (রা)। তিনি মুসলিমদের মধ্যে যারা দ্বীন ও দ্বীনী মর্যাদাসম্পন্ন লোক রয়েছেন, তাঁদের নিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন। এ সংস্থাটি যাকাত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার সুসংগঠিত করবে, সংগ্রহ ও বণ্টন করবে এবং সর্বাগ্রে তা ব্যয় করবে এই সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কল্যাণময় কাজে, অন্যত্র নয়। বলেছেন ঃ এ সংস্থাটির সংগঠনে এটা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যাকাতের 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতটির একটা ব্যয়ক্ষেত্র রয়েছে ইসলামী শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা-প্রচেষ্টায়। বর্তমান অবস্থায় কাফিরদের আগ্রাসন থেকে ইসলামকে সংরক্ষণের জন্যে জিহাদ করার তুলনায় এটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে দাওয়াতী কাজও তার একটা ব্যয়ক্ষেত্র, মুখের বক্তৃতা ও ভাষা-সাহিত্য রচনার সাহায্যে তার প্রতিরক্ষা জরুরী। কেননা এখানে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরক্ষা করা অধিক কঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার।[১]

এ মূল্যবান প্রস্তাব গভীর অনুধাবন শক্তির পরিচায়ক। মনে হচ্ছে, তিনি সূক্ষ্মভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করেছেন ইসলামের জন্যে—জীবনের সব কিছুর জন্যে। ইসলামের আহ্বান-আন্দোলনকারীদের উচিত এই প্রস্তাবটি শক্ত করে ধারণ করা, বোঝা ও বাস্তবায়ন করা। কেননা দ্বীনদার লোকদের ধন-মাল নিয়ে নাস্তিক, চরিত্রহীন, আদর্শহীন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্যে তা ব্যয় করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না।

---

১. تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٩٨ ط ثانيه

হ্যাঁ, প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতে ইসলামী জীবন বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো, যেখানে ইসলামী আইন বিধান বাস্তবায়িত হবে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, শরীয়াত, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু পুরামাত্রায় কার্যকর হবে।

সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা বলতে আমরা বুঝি সামষ্টিক সুসংগঠিত ও লক্ষ্যভিত্তিক কাজ এবং তা হবে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের জন্যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর তা হল ইসলামী খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুসলিম উম্মতের পুনর্জাগরণ, ইসলামী সভ্যতার পুনরাভ্যুদয়।

এ ক্ষেত্রটিই প্রকৃতপক্ষে এমন যে, মুসলিম দানশীল লোকদের পক্ষে তাদের যাকাতের মাল ও অপরাপর সাধারণ সাদকা এই কাজে বিনিয়োগ করাই অধিক উত্তম ও কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু মুসলমানই এ ক্ষেত্রটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, মাল ও মনন শক্তির দ্বারা এই কাজের সমর্থন দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সর্বশক্তি দিয়ে এ ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে মনে-প্রাণে প্রস্তুত হন নি। অথচ অবস্থা এই যে, যাকাত ও যাকাত-বহির্ভূত আর্থিক সাহায্য দিলে যাকাত ব্যয়ের অন্য খাতসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায় না।

একালে ইসলামী জিহাদের বিচিত্র রূপ

আমরা এক্ষণে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে, ইসলামী জিহাদের কাজটি কেবলমাত্র বৈষয়িক বস্তুগত সামরিক পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এ পথে জিহাদের আরও বহু প্রশস্ত পদ্ধতি ও ক্ষেত্র রয়েছে। সম্ভবত এ কালের মুসলিমগণ সেই অন্যান্য প্রকারের জিহাদের মুখাপেক্ষী তুলনামূলকভাবে বেশি। বস্তুত এ কালে আমরা ঘোষিত ইসলামী জিহাদের আরও কতিপয় পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারি।

সে পদ্ধতি ও দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করার পূর্বে এ বিষয়টির নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

সে নিগূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে এই ঃ সুসংগঠিত সেনাবাহিনী সজ্জিতকরণ, তাকে সশস্ত্র বানানো এবং তার জন্যে অর্থ ব্যয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব—ইসলামের সূচনাকাল থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থ ভাণ্ডারের ওপর অর্পিত ছিল। কেবল যাকাতের টাকা দিয়েই এ কাজটি হত না। সেজন্যে 'ফাই' 'খারাজ' প্রভৃতি বাবদ সংগৃহীত অর্থ সেনাবাহিনী, অস্ত্র ক্রয় ও যুদ্ধকাজে ব্যয় করা হত। যাকাতের অর্থব্যয় করা হত কতিপয় পরিপূরক কাজে। যেমন নফল হিসেবে যুদ্ধে যোগানকারীদের খরচ বহন ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে আমরা দেখছি, সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষার যাবতীয় খরচের সামষ্টিক বোঝা সাধারণ বাজেটের কাঁধের ওপর চাপানো হয়ে থাকে। কেননা সে বাবদ একটা বিরাট ও ভয়াবহ ব্যয়ভারের দাবি করা হয়, যা কেবলমাত্র যাকাত সম্পদই বহন করতে সক্ষম হয় না। এরূপ ব্যয়ভার যদি যাকাত ফাণ্ডকেই বহন করতে হয়, তাহলে যাকাত বাবদ অর্জিত সমস্ত সম্পদ নিঃশেষে ব্যয় হয়েও তার প্রয়োজন পূরণ সম্ভব হবে না।

এ কারণে আমরা মনে করি, যাকাত খাতের সমস্ত আয় সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণমূলক ও প্রচারধর্মী কার্যাবলীতে ব্যয় করাই একালে উত্তম। তবে শর্ত এই যে, সে জিহাদটি ইসলামী হতে হবে সর্বতোভাবে, খালেস এবং যথার্থ ইসলামী। তা কখনো জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতাবাদী ভাবধারায় কলুষিত হবে না। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য উপাদান সম্পন্ন ইসলামী ঝাণ্ডাধারীও হবে না তা। কেননা তাতে বিশেষ ধর্মমত বা বিশেষ ব্যবস্থা কিংবা শহর বা দেশ, শ্রেণী অথবা ব্যক্তির খেদমতই লক্ষ্য হয়ে থাকে। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করছি, ইসলাম অনেক সময় এমন সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়, যার অভ্যন্তরীণ ভাবধারা পুরাপুরি ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন হয়ে থাকে। অতএব এক্ষণে ইসলামকেই ভিত্তি ও মৌল উৎসরূপে গৃহীত হতে হবে, তা-ই হতে হবে চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনুপ্রেরক ও পথ প্রদর্শক হতে হবে তাকে। তাহলেই এ সব প্রতিষ্ঠান আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হতে পারবে। আর সে কাজটাই 'আল্লাহ্র পথের জিহাদ' নামে অভিহিত হতে পারবে।

আমরা এ পর্যায়ে এমন বহু কাজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি, যার ওপরে এ কালে ইসলামী দায়িত্ব পালন অনেক মাত্রায় নির্ভর করে। তাও 'আল্লাহ্র পথের জিহাদ' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হতে পারে।

সঠিক ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন এবং অমুসলিম লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন একালে সব কয়টি মহাদেশেই একান্ত কর্তব্য। কেননা একালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছে। এ কাজও 'জিহাদ-ফী-সাবীলিল্লাহ' রূপে গণ্য হতে পারে।

খোদ ইসলামী দেশসমূহের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং মুসলিম যুব সমাজকে এ কাজে নিয়োজিত ও প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। এ সব কেন্দ্র যথার্থ ইসলামী আদর্শ প্রচার করে সর্বস্তরের জনগণকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। রক্ষা করতে পারে তাদেরকে সকল প্রকার নাস্তিক্যবাদী মতবাদের কু-প্রভাব থেকে, চিন্তা-বিশ্বাসের কঠিন বিপর্যয় থেকে, আচার-আচরণের বিচ্যুতি থেকে। এ কাজও ইসলামের সাহায্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে, তাই ইসলামের দুশমনদের প্রতিহত করার এ-ও একটা কাজ এবং তাও ইসলামী জিহাদ।

খালেস ইসলামী মতবাদ ও চিন্তাধারামূলক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রচার করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা প্রতিহত করবে বিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার যাবতীয় কারসাজি। তার ফলেই আল্লাহ্র কালেমা প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং সত্য সঠিক চিন্তা সর্বত্র প্রচারিত হতে পারে। সম্ভব হতে পারে ইসলামের প্রতিরক্ষা। কেননা এ কালে ইসলামের ওপর বহু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আরোপ করা হচ্ছে। জনমনে বহু সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এ বই ও পত্রিকা ইসলামকে সর্বপ্রকার বাহুল্য ও বাড়াবাড়ি মুক্ত করে তার আসল রূপে উপস্থাপিত করবে। এ কাজও আল্লাহ্র পথে জিহাদ। মৌলিক ইসলামী গ্রন্থাদি প্রকাশ করা—ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা, তার অন্তর্নিহিত পবিত্র

ভাবধারাসমূহ বিকশিত করা ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্যার সমাধানে তার সর্বাধিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা একটা বিরাট কাজ। তা ইসলামের দুশমনদের সৃষ্ট সব বিভ্রান্তি ও সন্দেহের ধূম্রজাল ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এ ধরনের বই-পুস্তক ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রচার করা একটি ইসলামী জিহাদ সন্দেহ নেই।

শক্তিমান বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান লোকদের পূর্বোক্ত কার্য ক্ষেত্রসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ করা, তাদের দৃঢ় সংকল্প ও মর্যাদাবোধ সহকারে সুস্পষ্ট রূপরেখা সম্মুখে নিয়ে এই দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ করে দেয়া—বিশ্বের চারদিকে ইসলামের নির্মল জ্যোতির কিরণ ছড়ানো, ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করা আর ঘুমন্ত মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করা এবং খৃস্টান মিশনারী ও নাস্তিকতার প্রচারকদের মুকাবিলা করা নিশ্চয়ই ইসলামী 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ'।

প্রকৃত ইসলাম প্রচারকদের সাহায্য করাও কর্তব্য। কেননা তাদের ওপর বাইরের জগতের ইসলামের দুশমনদের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহদ্রোহী ও মুর্তাদ লোকদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে সর্বাত্মক অসহযোগিতা ও বিরোধিতা। তাদের ওপর আসে আঘাতের পর আঘাত প্রচণ্ডভাবে। নানা ধরনের আযাবে তারা হয় নিত্য জর্জরিত, তাদের হত্যা করা হয়, নিপীড়ন করা হয় মর্মান্তিকভাবে, তাদের পানাহার বন্ধ করে দিয়ে কষ্ট দেয়া হয়, মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতার এ প্রচণ্ড চাপের মুখে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার কাজে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পথে অতি বড় জিহাদ।

এ ধরনের বহুবিধ বিচিত্র ক্ষেত্র এমন রয়েছে, যেখানে একালে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা মুসলমানদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতে পারে। যাকাতের ওপরও—আল্লাহ্র পরে ইসলামের ধারক-বাহকগণের প্রয়োজন পূরণের গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ করে ইসলামের বর্তমান দুর্দিনে তো তার গুরুত্ব কোন অংশেই কম হওয়া উচিত নয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইবনুস-সাবীল—নিঃস্ব পথিক

'ইবনুস-সাবীল' কে ?

জমহুর আলিমগণের মতে 'ইবনুস-সাবীল' বলে বোঝানো হয়েছে সেই পথিক—মুসাফিরকে, যে এক শহ্র থেকে অন্য শহরে—এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। 'সাবীল' অর্থ পথ। পথিককে 'ইবনুস-সাবীল' বলা হয় এজন্যে যে, পথিকের জন্যে পথই হয় অবিচ্ছিন্ন সাথী। যেমন কবি বলেছেন ঃ

أَنَا ابْنُ الْحَرْبِ رَبَّتْنِىْ وَلِيْدًا

اِلٰى اَنْ شَبَتَ وَاكْتَهَلْتُ لَدَاتِىْ

আমি সমর সন্তান, তা-ই আমায় জন্মকাল থেকে লালিত করেছে—শেষ পর্যন্ত আমি যৌবন লাভ করেছি এবং বৃদ্ধ হয়েছি জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে ....

আরবরা তা-ই করে। সে যে জিনিসের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, নিজেকে সে জিনিসেরই সন্তান বলে ঘোষণা করে। বলে .... তাঁর পুত্র।[১]

তাবারী মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনুস-সাবীল—পথিক ব্যক্তির একটা হক্ রয়েছে যাকাত সম্পদে, সে যদি ধনী হয় তবুও—যদি সে তার নিজের ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইবনে জায়দ বলেছেন ঃ 'ইবনুস-সাবীল' মানে মুসাফির, পথিক—সে ধনী হোক, কি গরীব উভয় অবস্থায়ই, যদি সে স্বীয় প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সম্পদ হারিয়ে ফেলে অথবা অন্য কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে অথবা তার হাতে যদি কোন সম্পদই না থাকে, তাহলে তার এই হক অবশ্যই প্রাপ্য।[২]

(এ কারণে বাংলায় আমরা ইবনুস-সাবীল-এর অনুবাদ করেছি এক শব্দে 'নিঃস্ব পথিক' বলে—অনুবাদক)

'ইবনুস-সাবীল'-এর প্রতি কুরআনের বদান্যতা

কুরআন মজীদ 'ইবনুস-সাবীল' শব্দটি দয়ার পাত্র হিসেবে—সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারীরূপে—আটবার উল্লেখ করেছে। কুরআনের মক্কী অংশের সূরা আল-ইসরায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

---

১. تفسير الطبرى - بتحقيق محمود شاكر ج ١٤ ص ٣٢٠.

২. ঐ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا-

এবং নিকটাত্মীয়কে দাও তার হক্ এবং মিসকীন, নিঃস্ব পথিককেও এবং তুমি অপব্যয় করবে না।[১]

সূরা 'আর-রুম'-এ বলা হয়েছে ঃ

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ -

'অতএব দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক্ এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককেও। এ কাজ অতীব কল্যাণময় সেসব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায়।[২]

কুরআনের মাদানী সূরাসমূহে 'ইবনুস-সাবীল'কে ফরয কিংবা নফল অর্থব্যয়ের ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি এবং কোথায় ব্যয় করবে? বল, তোমরা যে-ধন-মালই ব্যয় কর না কেন, তা করবে আল্লাহ্‌র জন্যে, পিতামাতার জন্যে, নিকটাত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্যে।[৩]

দশটি অধিকার সংক্রান্ত আয়াতে 'ইবনুস-সাবীল'-এর প্রতি দয়া অনুগ্রহ করার আদেশ করা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল কর, তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করো না, পিতামাতার সাথে উত্তম দয়ার্দ্র ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, নিঃস্ব পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।[৪]

বায়তুলমালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ জমা হলে তাতেও নিঃস্ব পথিকের জন্যে একটা অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

---

১. সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৬ আয়াত ২. সূরা রূম ঃ ৩৮ আয়াত

৩. সূরা বাকারা ঃ ২১৫ ৪. সূরা নিসা ঃ ৬৩

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

তোমরা জেনে রাখ, যে জিনিসই তোমরা গনীমত হিসেবে পাও, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্যে, রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়ে জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্য নির্দিষ্ট। —আনফাল ঃ ৪১

'ফাই সম্পদেও তার জন্যে অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ -

আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে নগরবাসীদের নিকট থেকে যে 'ফাই' সম্পদ পাইয়ে দেন, তা আল্লাহ্‌র জন্যে, রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়ের জন্যে এবং ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে যেন ধন-সম্পদ কেবলমাত্র তোমাদের ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। —সূরা হাশর ঃ ৭

অনুরূপভাবে কুরআন যাকাতেরও একটা অংশ নিঃস্ব পথিকের জন্যে নির্দিষ্ট করেছে। তা এখনকার আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। যার সূচনা হয়েছে এভাবে ঃ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ যাকাত আদায় করার পরও ব্যক্তিদের নিকট যে মাল-সম্পদ সঞ্চিত থাকে, তাতেও তার জন্যে অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে। এরূপ অবস্থায় এই দান আল্লাহভীতি ও পরম পুণ্যময় কাজের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ -

এবং দেয় মাল-সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার দরুন নিকটাত্মীয়কে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, প্রার্থী, দাসত্ব-শৃংখলে বন্দী লোকদেরকে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। —সূরা বাকারা ঃ ১৭৭

ইবনুস-সাবীল-এর প্রতি গুরুত্ব দানের যৌক্তিকতা

নিঃস্ব-পথিকের ব্যাপারে কুরআনের এতটা গুরুত্ব দানের মূলে নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা হচ্ছে, দ্বীন-ইসলাম মানুষকে দেশ-ভ্রমণ ও বিদেশ গমনের উপদেশ দিয়েছে নানাভাবে ও বিবিধ কারণে। দুনিয়ায় ঘুরে—পরিভ্রমণ করে দেখার ও উৎসাহ দানের মূলে কতগুলো কারণ নিহিত রয়েছে ঃ

ক. এক ধরনের পরিভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে রিযিক সন্ধানের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَامْشُوا فِيْ مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه -

তাই চল তোমরা পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে এবং তার কাছে থেকে পাওয়া রিযিক আহার কর। —সূরা মুলক ঃ ১৫

বলেছেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِيْ الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ لا وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -

অন্যরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধান করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (রিযিক) এবং আরও অন্যরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। —সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ سَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا তোমরা পরিভ্রমণ কর, পরিণামে ধনী হয়ে যাও।[১]

খ. আর এক প্রকারের পরিভ্রমণের জন্যে ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে। তা হচ্ছে জ্ঞান-শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ। বিশ্বের অবস্থা অবলোকন এবং সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখে উপদেশ গ্রহণের লক্ষ্যে । সাধারণভাবে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহ্‌র অনুসৃত নীতিসমূহ দেখার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে মানব সমাজের মধ্যে নিহিত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে। তিনি বলেছেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ -

বল, তোমরা পরিভ্রমণ কর পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এবং দেখ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম সূচিত করেছিলাম। —সূরা আনকাবুত ঃ ২০

এ আয়াতের ভূ-তত্ত্ব (Geology) ও জীবনের ইতিহাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর তত্ত্ব আলোচনা-পর্যালোচনা ও অধ্যয়নের নির্দেশ নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ বলেছে ঃ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ لا فَسِيْرُوْا فِيْ الارْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ -

তোমাদের পূর্বে বহু যুগ-কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে অতএব তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং পর্যবেক্ষণ কর আল্লাহতে অবিশ্বাসীদের পরিণতি কি হয়েছে। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৭

---

১. মুনযেরী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন الترغيب والترهيب গ্রন্থে। ২য় খণ্ড কিতাবুস সাওম—বলেছেন, তাবারানী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছে الاوسط গ্রন্থে, এর বর্ণকারিগণ নির্ভরযোগ্য

বলেছেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ج فَإِنَّهَا لاتَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ -

এ লোকেরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি ? করলে তারা এমন হৃদয় লাভ করতে পারত যদ্দারা তারা প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হত; কিংবা এমন শ্রবণেন্দ্রিয় পেতে পারত যদ্দারা তারা অনেক তত্ত্ব জানতে পারত। কেননা প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি কখনও অন্ধ হয় না; অন্ধ হয় হৃদয়—যা বুকের মধ্যে অবস্থিত।

—সূরা হজ্জ ঃ ৪৬

সেই বক্ষে নিহিত অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করার লক্ষ্যে এই ভূ-পর্যটনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে লোক ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথে চলা সহজ করে দেবেন।[১] আর যে লোক ইলম সন্ধান করার উদ্দেশ্যে বের হল, সে আল্লাহ্র পথেই রয়েছে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।' (তিরমিযী)

প্রাথমিককালের আলিমগণ একটা দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। দৃষ্টান্তটি খুব উচ্চমানের। তা ইল্‌ম সন্ধানের পথে দৃষ্টান্তহীন পরিভ্রমণের কাহিনী। এ কালের আলিম ও পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের ঐতিহাসিকগণ খুব বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সহকারে তার উল্লেখ করেছেন।

গ. ইসলাম অপর এক প্রকারের ভ্রমণের আহ্বান জানায়। তা হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্যে সফর। সর্বপ্রকার বিদেশী বিজাতীয় দখলদারী থেকে দেশের স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা, ইসলামী দাওয়াতের কাজের নিরাপত্তা বিধান, দুর্বল লোকদের নিষ্কৃতি সাধন ও ওয়াদা ভঙ্গকারীদের যথাযথ শাস্তি প্রদান প্রভৃতিই হচ্ছে আল্লাহ্র পথ।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

انْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

তোমরা বের হয়ে পড় হালকাভাবে ও ভারী হয়ে এবং জিহাদ কর তোমাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণময়, যদি তোমরা জান।

—সূরা তওবা ঃ ৪১

এরপর মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

১. মুনযেরী. মুসলিম কিতাবুল ইল্‌ম।

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ج يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ-

হে নবী! যদি সহজলভ্য স্বার্থ হত এবং সফরও হত কষ্টবিহীন, তা হলে ওরা নিশ্চয়ই তোমার পেছনে চলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেত। কিন্তু তাদের জন্য এই পথ তো খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষণে তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে করে বলবে, আমরা যদি চলতে পারতাম তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যেতাম। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন যে ওরা মিথ্যাবাদী। —সূরা তওবা ঃ ৪২

মুজাহিদদের সওয়াব দানের কথা বলার পর আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَايُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً وَّلَايَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

'অনুরূপভাবে এটাও কখনই হবে না যে, (আল্লাহ্র পথে) অল্প বা বেশি কিছু খরচ তারা বহন করবে এবং (জিহাদী চেষ্টা-প্রচেষ্টায়) কোন উপত্যকা তারা অতিক্রম করবে এবং তাদের পক্ষে তা লিখে না নেয়া হবে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এই ভালো কীর্তির পারিশ্রমিক তাদের দান করবেন।[১]

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে একটা সকাল কিংবা একটা বিকাল অতিবাহিত করা সারা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে সেসব কিছু থেকে উত্তম।[২]

চ. আর এক প্রকারের সফরের প্রতি ইসলাম আহ্বান জানিয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্র একটা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইবাদত—হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে। তা ইসলামের একটা অন্যতম 'রুকন'।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

'আল্লাহ্র জন্যে কা'বায় হজ্জ করা লোকদের জন্যে ফরয—যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থবান হবে। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ - لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ-

১. التوبة - ١٢١ ২. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ

এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্যে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দাও, তারা তোমার নিকট সব দূরান্তরের স্থান থেকে পায়ে হেঁটে এবং উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। যেন তারা সেই সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ দেখতে পারে যা এখানে তাদের জন্যে রক্ষিত হয়েছে এবং কতিপয় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম নেবে ....।

—সূরা হজ্জ ঃ ২৭-২৮

দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও ঘোরাফেরার এ হচ্ছে বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরন। ইসলাম এ সব সফরের জন্য আহ্বান জানিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এ সব পরিভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে মুসলমানদের। ইসলামের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন এভাবেই সম্ভবপর হতে পারে। এ ছাড়া আরও কয়েক ধরনের বিশ্বপরিভ্রমণ রয়েছে। আর দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্যই এখানে যে, এ সব সফরে গমনকারী লোকদের প্রতি তা খুব বেশি ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আরও বিশেষ করে তাদের প্রতি, যারা এই সফরে বের হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তার আপন লোকজন ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলাম সাধারণভাবেই এ সবের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং বিশেষ করে যাকাতের অংশ—জনগণের দেয়া সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন পরিমাণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর তা করে বিদেশ ভ্রমণের পক্ষে ইসলামের উৎসাহ দানকে শক্তিশালী করেছে, শরীয়াত সম্মত উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের কাজটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভ্রমণকারীদের অপরিচিত পরিমণ্ডলে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বানিয়েছে । মুসলিম সমাজের সকল অংশই যে পরস্পর সম্পৃক্ত—দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ তার বাস্তব প্রমান উপস্থাপিত করেছে। এ সমাজের লোকেরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে, একের বিপদ বা অসুবিধায় অপর লোক বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেয় । সেক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের কোন পার্থক্যের প্রতি আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। আর দেশী-বিদেশীদের মধ্যে ইসলামে কোন পার্থক্যই করা যেতে পারে না।

সামাজিক নিরাপত্তার এক দৃষ্টান্তহীন ব্যবস্থা

ইসলাম বিদেশী অপরিচিতির মধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়া মুসাফিরদের ব্যাপারে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তা সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন। এ দুনিয়ার অপর কোন মতবাদ, সমাজ-ব্যবস্থা বা কোন বিধানই এরূপ কোন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পারেনি। আর আসলে এটা এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা—এ পর্যায়ের একক ও অনন্য ব্যবস্থা। কোন দেশে বসবাসকারী লোকদের স্থায়ী প্রয়োজন ও অভাব-অনটন দুর করার ব্যবস্থা করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং ভ্রমণ ও বিদেশ গমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও কার্যকারণে মানুষ যেসব অভাব ও নিঃস্বতার সম্মুখীন হয়, তার জন্যেও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ইসলামের এই অবদান সেই কালে—যখন পথে-ঘাটে শহরে-বন্দরে, হোটেল-মুসাফিরখানা, বিশ্রামাগার বা হোটেল-রেস্তোঁরা একালের মত কোথাও ছিল না।

কার্যতও আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর খিলাফত আমলে একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং তার ওপর লিখে দিয়েছিলেন 'দারুদ্দাকীক'—ময়দার ঘর। তার কারণ সেই ঘরে ময়দা, আটা, খেজুর, পানি ও অন্যান্য দরকারী দ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। যেসব নিঃস্ব পথিক ও অতিথি তাঁর নিকট আসত সেসব দিয়ে তাদের সাহায্য করা হত। অনুরূপভাবে মক্কা ও মদীনার দীর্ঘ পথের মাঝেও হযরত উমর অনুরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নিঃস্ব লোকেরা এখান থেকে যথেষ্ট উপকৃত হত এবং একটা স্থান থেকে পানি নিয়ে পরবর্তী স্থানে পৌঁছতে পারত।[১]

পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সময়কার ব্যবস্থা সম্পর্কে আবূ উবাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম ইবনে শিহাব জুহ্রীকে যাকাত-সাদকা সংক্রান্ত রাসূলে করীমের বা খুলাফায়ে রাশেদুনের যেসব সুন্নাত বা হাদীস মুখস্থ আছে তা তাঁর জন্যে লিখে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি একখানি দীর্ঘ লিপি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাতে প্রত্যেকটি অংশ আলাদা আলাদা বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। এই লিপিখানিতে 'ইবনুস-সাবীল' পর্যায়ে এই কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ ইবনুস সাবীল-এর অংশ প্রত্যেক রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের সংখ্যানুপাতে বিভক্ত করে হবে, যে কোন নিঃস্ব পথিক—যার কোন আশ্রয় নেই, আশ্রয় দেয়ার মত কোন পরিবারও নেই—তাকে খাওয়াতে হবে যতক্ষণ না সে তেমন একটা আশ্রয়স্থল পেয়ে যায় বা তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। প্রত্যেকটি পরিচিত বাড়ি-ঘর নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যেন যে কোন নিঃস্ব পথিক সেখানে উপস্থিত হতে পারবে এবং তাকে আশ্রয়ও দেবে এবং খাবার দেবে। তার সঙ্গে বাহন জন্তু থাকলে তার খাবারের ব্যবস্থাও করবে—যতক্ষণ তাদের নিকট রক্ষিত দ্রব্যাদি নিঃশেষ হয়ে না যায়। ইনশাআল্লাহ।[২]

অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন পথিকের জন্যে এরূপ ব্যবস্থা বিশ্বমানব কোথাও দেখেছে কি ? ....ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থায় এরূপ নিরাপত্তা কোথাও পাওয়া যায় কি ? মুসলিম উম্মত ছাড়া দুনিয়ার অপর কোন উম্মত এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে কি ?

সফর শুরুকারী ও সফর সমাপ্তকারী

এখানে একটি বিষয় ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ ঘটিয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, যে মুসাফির পথ অতিক্রম করে গেছে লক্ষ্যহীনভাবে, তাকে 'ইবনুস সাবীল' বলা হবে, না সে সহ সেই মুসাফিরও তার মধ্যে শামিল হবে যে দেশে বা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করতে চাইছে ?

---

১. طبقات ابن شعلد ج ٣ ص ٢٨٣ ط بيروت

২. الاموال .٥٨٠

জমহুর ফিকাহবিদদের বক্তব্য

সফর সূচনাকারী ব্যক্তি 'ইবনুস সাবীল' পর্যায়ে গণ্য হওয়ার অধিকারী হবে না। তা এজন্যে ঃ

(ক) কেননা 'সাবীল' মানে পথ। আর 'ইবনুস-সাবীল' হচ্ছে সেই পথিক যে পথে চলমান রয়েছে। যেমন 'ইবনুল লাইল' বলা হয় সে লোককে যে রাত্রিবেলা বাইরে খুব বেশি যাতায়াত করে। নিজ শহরে বা ঘরে অবস্থানকারী তো আর পথে পড়ে নেই। তাই 'পথিক' বলতে যা বোঝায় তা তাকে বলা যাবে না। কাজেই যে-লোক শুধু সংকল্প করেছে, কার্যত পথে এখনও নামেনি, তাকে 'পথিক' সংক্রান্ত গুণে গুণান্বিত বা সেই পরিচয়ের অধিকারী বলা যায় না।

(খ) 'ইবনুস সাবীল' বলতে 'বিদেশী' লোকই বোঝায়। যে লোক নিজের দেশে নিজের ঘরে রয়েছে, তাকে তা বলা চলে না। তার যত প্রয়োজন বা অভাবই দেখা দিক না কেন।[১]

তাই জমহুর ফিকাহবিদদের মতে আয়াতে উল্লিখিত 'ইবনুস-সাবীল' বলে কেবলমাত্র 'বিদেশী লোক'ই বোঝা যেতে পারে, অন্যকে নয়। সে লোকের নিজের দেশে সম্পদ সংগতি থাকা সত্ত্বেও তাকে যাকাতের অংশ দেয়া হবে এজন্যে যে, সে তার নিজের সম্পদ ব্যবহার করতে পারছে না, তা থেকে উপকৃত হতে পারছে না বিদেশে পড়ে আছে বলে। এক্ষণে সে নিঃস্ব ফকীরবত। আর 'পথিক' নিজ দেশে গরীব হলেও তাকে তা দেয়া হবে দুটি কারণে। একে তো সে দরিদ্র, দ্বিতীয় সে বিদেশে নিঃস্ব অবস্থায় রয়েছে। 'নিঃস্ব পথিক' হিসেবে তাকে দেয়া হবে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার প্রয়োজনীয় সম্বল। আর তার এই প্রয়োজনের দৃষ্টিতে তাকে খরচ বাবদ দেয়া হবে তার প্রয়োজন পরিমাণ।

'ইবনুস-সাবীল' পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য

সে অপরিচিত ব্যক্তি—পথ অতিক্রমকারী কিংবা সফর সূচনাকারী উভয়ই অর্থাৎ যে লোক সফর করার ইচ্ছা করেছে: কিন্তু সম্বল পাচ্ছে না। এই দুই ধরনের লোককেই তাদের প্রয়োজন মত দেয়া হবে—তাদের যাওয়ার জন্যে ও প্রত্যাবর্তনের জন্যে। কেননা পথে চলার সংকল্পকারী সফরের ইচ্ছা করেছে, কোন পাপ কাজের নয়। ফলে সে পথ অতিক্রমকারীর পর্যায়ভুক্ত। কেননা এই দুই লোকই সফর সম্বলের মুখাপেক্ষী, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইবনুস সাবীল বলা হবে পরোক্ষ অর্থে।[২]

এই গ্রন্থকারের বিবেচনা

প্রথমোক্ত মতটি আয়াত উদ্ধৃত 'ইবনুস-সাবীল'-এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। শরীয়াতের লক্ষ্যের দিক দিয়েও অধিক নিকটবর্তী। তার ওপর কিয়াস করা হয়েছে

১. الشرح الكبير-مع المغنى- ج ٢ ص ٧٠٢

২. দেখুন ঃ نهاية المحتاج ج ٦ ص ١٥٦ المجوع ج ٦ ص ٢١٤

সফরে আগ্রহী বা সংকল্পকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে। তাকেও যাকাতের মাল থেকে দেয়া যাবে, যদিও সে তার সফর দ্বারা বিশেষ কোন ফায়দা লাভ করার ইচ্ছা করেছে। হতে পারে সে জীবিকা অর্জনের কোন উপায় তালাশ করেছে কিংবা মনের আনন্দস্ফূর্তি লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়ার সংকল্প করেছে।

তবে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত—আমি মনে করি—গ্রহণ করা যেতে পারে তাদের ক্ষেত্রে, যারা এমন কোন সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সফর করে, যার কল্যাণটা দ্বীন-ইসলাম কিংবা মুসলিম সমাজ পেয়ে যায়। যেমন কেউ সফর করে কোন শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিনিধিত্বে বা মুসলিম দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় কোন কাজের জন্যে। এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্যেও এ সফর হতে পারে যা দ্বীন-ইসলাম ও মুসলিম সমাজের জন্য উপকারী সাধারণভাবে। তবে তাতে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত লোকদের মতামতকে গ্রাহ্য করতে হবে।

এই ধরনের সফরকারী কার্যত 'ইবনুস-সাবীল' না হলেও সে 'ইবনুস সাবীল' হবে তার সংকল্পের দৃষ্টিতে। আর যা কাছাকাছি ও নিকটবর্তী তা সেই আসল জিনিসের মর্যাদা পেয়ে থাকে। এই লোককে কোন সাহায্যদান জাতি ও উম্মতের জন্যে সাধারণ কল্যাণে দানের সমান। ফলে তা 'ফী-সাবীলিল্লাহ' দেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন বা উন্নতকরণের উদ্দেশ্যে যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে যাকাত দেয়ার মতই এই দান। তাই এরূপ দান শরীয়াতের অকাট্য স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে সমর্থনীয় না হলেও কিয়াসের ভিত্তিতে সমর্থনীয়।

এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়, উক্ত আয়াতে 'ইবনুস সাবীল' বাক্যটি এসেছে ফী-সাবীলিল্লাহ-এর পর। যেন বলা হয়েছে : 'আল্লাহ্র পথে ও পথ সন্ধানে'।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই আয়াতটিতে কতিপয় ব্যয়ক্ষেত্রকে فى অক্ষরের পর উল্লেখ করায় এ সুবিধাটুকু পাওয়া গেছে যে, এটা এমন কল্যাণকর কাজ যাতে যাকাত দেয়া যাবে, এক ব্যক্তিকে দেয়ার পূর্বে। এমন কি এদের কোন একজন যদি যাকাতের অংশ নিয়ে নেয় তবে সে তা নেবে তার পরিচিতি সহকারে শরীয়াত যে সাধারণ কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছে সেই সাধারণ কল্যাণের জন্যেই।

এই কারণে এ চারটি ক্ষেত্রে কাউকে যাকাতের সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়ার শর্ত করা হয়নি—দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র পথে ও 'পথ-পুত্র' এর ক্ষেত্রে। এটাই নির্ভুল মত। উপরিউক্ত কথার ভিত্তিতে 'ইবনুস সাবীল, (পথ-পুত্র) সাধারণ কল্যাণের প্রতিভূ। সে নিজের প্রতিনিধিত্ব করছে না। তাই সঠিক পন্থা হচ্ছে, সে নিজ হাতে যাকাতের সেই অংশ গ্রহণ না করে তা জাহাজ বা পরিবহন কোম্পানী, মাঝি-মাল্লা বা লক্ষ্যস্থলে যাওয়ার কাফেলা বা তার জন্যে ব্যয়কারী কোন প্রতিষ্ঠান তা নিয়ে নেবে।

হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা প্রথমোক্ত মতের সমর্থনকারী। তাঁরা বলেছেন, 'ইবনুস সাবীল' যদি তার নিজের গ্রাম বা শহরে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যত্র যেতে চায়, তাহলে তাকে সেখানে যাওয়ার ও সেখান থেকে নিজের ঘরে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ

সম্বল দিতে হবে, কেননা এটা বৈধ সফরের জন্যে সাহায্য, সঠিক উদ্দেশ্য লাভই এই সফরের লক্ষ্য। তবে সফরটা শরীয়াতসম্মত হতে হবে। হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভমূলক হবে, যেমন হজ্জ, জিহাদ ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাৎ; অথবা হবে মুবাহ্ সফর, যেমন জীবিকার সন্ধান, ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধান। আর সফরটা যদি প্রমোদ বিহার (Excursion—Pleasure trip) হয়, তাহলে তাতে দুটো পন্থা হতে পারে ঃ একটি, তাকে দেয়া হবে। কেননা তার এই সফর কোন পাপ কাজের জন্যে নয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তাকে দেয়া যাবে না। কেননা তার জন্যে এই সফর কোন প্রয়োজনীয় বা আবশ্যকীয় ব্যাপার নয়।[১]

পথ অতিক্রমকারী মুসাফিরকে যাকাত দান—তার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে তার জন্যে, এটা তার উদ্দেশ্য লাভের জন্যে সাহায্য বিশেষ। তার জীবিকার সন্ধানে হলে—বরঞ্চ প্রমোদ বিহার হলেও তাকে যাকাতের অংশ দেয়াই উত্তম। কেননা ইসলাম বা মুসলিমের জন্যে কোন যথার্থ উদ্দেশ্যে সফর করার মূলে যে কারণ নিহিত থাকতে পারে, এক্ষেত্রেও তা রয়েছে।

'ইবনুস সাবীল'কে যাকাত দেয়ার শর্ত

'ইবনুস-সাবীল'—'পথ-পুত্র'কে যাকাতের অংশ দেয়ার ব্যাপারে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কয়েকটি শর্ত সর্বসম্মত এবং কয়েকটি শর্তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

প্রথম শর্ত, 'পথ-পুত্র' যে স্থানে রয়েছে, সেখানেই তাকে অভাবগ্রস্ত হতে হবে তার স্বদেশে পৌঁছার সম্বলের জন্যে। তার নিকট সেই সম্বল থেকে থাকলে তাকে যাকাতের অংশ থেকে দেয়া যাবে না। কেননা তার তো কাজ হল তার নিজের ঘরে পৌঁছা। মুজাহিদের অবস্থা ভিন্নতর। সে যাকাতের অংশ নিতে পারবে—অ-হানাফীদের মতও এই—যদিও সে তার নিজের অবস্থান স্থানে ধনশালী ব্যক্তি। কেননা তাকে তা দেয়া হবে শত্রুদের ভীত ও বিতাড়িত করার লক্ষ্যে। আর জিহাদকারীকে যাকাত দেয়া হবে আল্লাহ্‌র দুশমনদের মুকাবিলায় তাকে সাহসী শক্তিমান করে তোলার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়, তার সফর পাপমুক্ত হতে হবে। তার সফর যদি কোন পাপ কাজের লক্ষ্যে হয়—যেমন কাউকে হত্যা করা বা হারাম ব্যবসায়ের জন্যে প্রভৃতি—তা হলে তাকে যাকাতের অংশ থেকে দেয়া যাবে না একবিন্দুও। কেননা তাকে দেয়ার অর্থ তার সেই পাপ কাজে তাকে সহায়তা করা। কিন্তু মুসলমানদের ধন-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে সহায়তা করা যেতে পারে না। তবে সে যদি খালেসভাবে তওবা করে, তবে তার অবশিষ্ট সফরের খরচ বাবদ দেয়া যাবে। তার যদি অভাবে মরে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে তওবা না করলেও তাকে দেয়া যাবে। কেননা পাপ করলে সে করবে, তাকে মারার জন্যে ছেড়ে দিয়ে সমাজ তো পাপ করতে পারে না।[২]

---

১. দেখুন ঃ الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٠٢ – ٢٠٣।

২. দেখুন ঃ حاشية الدسوقى ج ١ ص ٤٩٨ মালিকী মতের কেউ কেউ বলেছেন, তার মৃত্যুর

আর যে সফরে কোন গুনাহ্ নেই সে সফর কোন ইবাদতের জন্যে হতে পারে, হতে পারে কোন প্রয়োজনের জন্যে বা প্রমোদবিহারও হতে পারে। ইবাদতের সফর যেমন হজ্জ, জিহাদ ও কল্যাণকর ইল্‌ম সন্ধান এবং জায়েয যিয়ারতের সফর ইত্যাদি, সে সব পথিককে যাকাত দানে কোন মতভেদ নেই। কেননা ইবাদতের কাজে সাহায্য তো শরীয়াতে কাম্য। বৈষয়িক প্রয়োজনের সফরও হতে পারে—যেমন ব্যবসা, জীবিকা সন্ধান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন। যারা বলেন যে, 'ইবনুস-সাবীল' হচ্ছে সেই লোক, যে তার নিজের ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের মতে সে পথিককে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা এ হচ্ছে বৈধ বৈষয়িক প্রয়োজনের কাজে সাহায্য দান। সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সাহায্য।

যে শাফেয়ী ফিকাহবিদ নিজ ঘর থেকে রওয়ানাকারীকেও 'ইবনুস-সাবীল' মনে করেন, উক্ত ব্যাপারে তাদের দুটি কথা ঃ

একটি, দেয়া যাবে না। কেননা এ সফরে তার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়, দেয়া যাবে। কেননা শরীয়াত যে সফরের রুখসাত বা অনুমতি দিয়েছে তাতে ইবাদতের সফর ও মুবাহ সফরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যেমন নামায 'কসর' পড়া যাবে, রোযা ভাংগা যাবে উভয়বিধ সফরেই। এ অত্যন্ত সহীহ্ কথা।

আনন্দ ও বিনোদনের সফর পর্যায়ে খুব বেশি মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকদের মধ্যে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, দেয়া যাবে। কেননা এ সফর পাপমুক্ত। অপররা বলেছেন, দেয়া যাবে না। কেননা এ সফরের প্রকৃত কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ এক প্রকারের বেহুদা অর্থব্যয়।[১]

তৃতীয়, সে যদি ঋণ বা অগ্রিম হিসেবে পাওয়ারও কোন উপায় না পায়—তাকে দেয়ার মত কোন লোকই না পাওয়া যায় সেই স্থানে, যেখানে সে রয়েছে তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে। এই কথা সে লোক সম্পর্কে যার নিজের ঘরে ধন-মাল রয়েছে, ঋণ শোধ করার সামর্থ্যও আছে।[২]

এই শর্তটি মালিকী ও শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ আরোপ করেছেন যদিও এ মাযহাবেরই অপর লোকেরা এর বিরোধিতা করেছেন।

আশংকা হলেও তাকে দেয়া যাবে না। কেননা তার মুক্তি তার নিজের হাতেই রয়েছে, সে সহজেই তওবা করতে পারে। দেখুন حاشية الصاوى ج ١ ص ٢٣٢ অন্যরা বলেছেন, পাপটা কি ধরনের তা দেখতে হবে। নর হত্যার বা কারুর ইজ্জত নষ্ট করার ইচ্ছা থাকলে দেয়া যাবে না, তওবা করলে দেয়া যাবে।

১. দেখুন ঃ المجموع للنووي ج ٦ ص ٢١٤ – ٢١٥ والشرح الكبير المطبوع مع شرح الخرشى على خليل ج ٢ ص ٨٠٢-٧٠١ ২. এই জন্য দেখুন ঃ المغنى ج ٢ ص ٢١٩ نهاية المحتاج للرملى ج ٦ ص ١٥٦

ইবনুল আরাবী তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এবং কুরতুবী তাঁর তাফসীরে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এ মতকে যে, 'ইবনুস-সাবীল'কে যাকাত থেকে দেয়া যাবে, অগ্রিম দেয়ার মত কোন লোক পাওয়া গেলেও। তাঁরা দুজনই বলেছেন, কারোর ব্যক্তিগত অনুগ্রহের বশবর্তী হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ামতও তো পাওয়া গিয়েছে।[১] তা-ই যথেষ্ট।

ইমাম নববী বলেছেন, 'ইবনুস-সাবীল' যদি এমন লোক পেয়ে যায়, যে তাকে লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ ঋণ বাবদ দেবে, তবু তার পক্ষে ঋণ করা জরুরী নয়। বরং তার জন্যে যাকাত ব্যয় করা সম্পূর্ণ জায়েয।[২]

হানাফী আলিমগণের বক্তব্য হচ্ছে, পারলে ঋণ নেয়াই তার পক্ষে উত্তম। তবে তা করা কর্তব্য নয়। কেননা হতে পারে সে ঋণ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।[৩]

ইবনুল আরাবী ও কুরতুবী যে কারণের উল্লেখ করেছেন তার সাথে সংযোজিত এ হচ্ছে অপর একটি কারণ। এই দুই 'ইল্লাত' বা কারণ ইবনুস সাবীলের জন্যে ঋণ গ্রহণ করার বাধ্যতা আরোপ করতে নিষেধ করে ঃ

প্রথম, ঋণ গ্রহণ করায় লোকদের অনুগ্রহ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা করার জন্যে চাপ দেন নি।

দ্বিতীয়, ঋণ ফেরত দিতে অক্ষম হওয়া সম্ভব। আর তা হলে সেটা তার পক্ষেও যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর ঋণদাতার জন্যেও।

'ইবনুস-সাবীল'কে কত দেয়া হবে

ক. 'ইবনুস-সাবীল'কে খোরাক-পোশাকের ব্যয় এবং লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছার জন্যে যা প্রয়োজন অথবা তার ধন-মাল পথিমধ্যে কোথাও থাকলে তা যেখানে রয়েছে, সে পর্যন্ত পৌছার খরচ দিতে হবে। এ ব্যবস্থা তখনকার জন্যে, যখন পথিকের সঙ্গে আদৌ কোন ধন-মাল থাকবে না। আর যদি এমন পরিমাণ মাল তার সঙ্গে থাকে যা যথেষ্ট নয়, তা হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিতে হবে।

খ. সফর দীর্ঘ পথের হলে তার জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দীর্ঘ সফরের পরিমাণ হচ্ছে যে পথে চললে নামায 'কসর' করা চলে তা। প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ। অথবা পথিক দুর্বল—পথ চলতে অক্ষম হলে সে দৃষ্টিতেও পথের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা যায়। আর পথিক যদি সক্ষম ব্যক্তি হয় এবং তার সফর নামায 'কসর' করার পরিমাণ দীর্ঘ পথের না হয় তাহলে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হবে না। তবে তার সঙ্গের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু সে জিনিসপত্র যদি সে নিজেই বহন করে নিতে সক্ষম হয় তাহলে তা বহনের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন হবে না।

---

১. الحكام القوان – القسم الثانى ص ٩٥٨ تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٨٧

২. المجموع ج ٦ ص ٢١٦ ৩. দেখুন ঃ رد المحتار ج ٢ ص ٦٤ فتح القدير ج ٢ ص ١٨

ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যানবাহনের ব্যবস্থা করা বলতে বোঝায়, সম্পদ বিপুল থাকলে তা দিয়ে একটা যান ক্রয় করা। আর কম হলে ভাড়ায় নেয়া হবে। তাঁরা একথা বলেছেন এজন্যে যে, সেকালে যানবাহনরূপে সাধারণত জন্তু-জানোয়ারই ব্যবহৃত হত। এজন্যেই তা ক্রয় করতে বা ভাড়ায় নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে যানবাহনের অনেক বিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। মোটর গাড়ি, রেল গাড়ি, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি কত রকমেরই না যানবাহন একালে পাওয়া যায়! এগুলো ক্রয় করার কোন উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। মোটকথা অবস্থা অনুপাতে সহজলভ্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিলেই হবে। যার পক্ষে রেল গাড়ি বা জাহাজ-লঞ্চ সহজ হবে, তার জন্যে উড়োজাহাজের ব্যবস্থা করা অনাবশ্যক। যেন যাকাতের মাল নির্দয়ভাবে ব্যয় করা না হয়। যা না হলে চালে না, শুধু তার ব্যবস্থাই তা দিয়ে করা যাবে।

গ. সফরের সব খরচই বহন করা যাবে। কেবল তা-ই শুধু নয়, যা সফরের দরুন অতিরিক্ত পড়ছে। এটাই সহীহ কথা।

ঘ. সফরকারী উপার্জনে সক্ষম হোক কি অক্ষম—উভয় অবস্থাতেই দেয়া যাবে।

ঙ. তার যাওয়ার ও ফিরে আসার জন্যে যে পরিমাণটা যথেষ্ট তা-ই দেয়া যাবে—যদি সে ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে এবং সেখানে ধন-মাল কিছু পাওয়ার সুযোগ তার যদি না থেকে থাকে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, তার সফরকালে ফিরে আসার জন্য কিছু দেয়া যাবে না, তা দেয়া যাবে যখন সে ফিরে আসবে তখন। আর কেউ কেউ বলেছেন, সে যদি যাওয়ার পরই ফিরে আসবার ইচ্ছা রাখে তাহলে ফিরে আসার জন্যেও দেয়া যাবে। আর সে যদি একটা সময় পর্যন্ত তথায় অবস্থান করার ইচ্ছা রাখে তাহলে ফিরে আসার জন্যে দেয়া যাবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই ঠিক।

চ. অবস্থান করার ইচ্ছা থাকলে তখন কি করা হবে এই পর্যায়ে শাফেয়ী আলিমগণ একটু বিস্তারিত করে বলেছেন। আর তা হচ্ছে, যদি চারদিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে—যাওয়া ও আসার দিন ছাড়া তাহলে অবস্থানের ব্যায়ও বহন করা হবে। কেননা আসলে সে তখন সফরেই রয়েছে। এজন্যে সে রোযা ভাংগতে পারে, নামায কসর করতে পারে, সফরের সব সুবিধাই সে ভোগ করতে পারে। কিন্তু যোদ্ধার ব্যাপার তা নয়। তার দূরদেশে অবস্থানকালীন খরচাদিও বহন করতে হবে, তা যত দীর্ঘই হোক। পার্থক্য হচ্ছে, যোদ্ধাকে তো বিজয়ের আশায় বসে থাকতে হয়। যোদ্ধা 'গাযী' এই নাম বা পরিচিতিটা তার অপরিবর্তিতই থাকে কোন স্থানে অবস্থান করলেও বরং তা আরও শক্ত হয়। কিন্তু সফরকারীর তা হয় না।

অন্যদের কেউ কেউ বলেছেন, 'ইবনুস-সাবীল'কেও দিতে হবে তার অবস্থানকালের জন্যেও তা যত দীর্ঘই হোক। অবশ্য সাফল্যের আশায় অবস্থান করার প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই।[১]

---

১. দেখুন : المجموع ج ٦ ص ٢١٥- ٢١٦ الشرح الكبير ص ٧.١-٧.٢

ছ. 'ইবনুস-সাবীল' যখন সফর থেকে ফিরে আসবে, তখন কিছু পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত ও অবশিষ্ট থাকলে তা তার নিকট থকে ফেরত নেয়া হবে কি হবে না এ একটা প্রশ্ন। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এর জবাবে শাফেয়ীরা বলেছেন ঃ হ্যাঁ, নেয়া হবে, সে নিজের ওপর কৃচ্ছতা গ্রহণ করে থাকুক কি না-ই থাকুক। অন্য মত হচ্ছে, যদি সে নিজের ওপর কৃচ্ছতা করে থাকে তবে এবং এই কারণেই যদি সম্বল উদ্বৃত্ত থেকে থাকে, তাহলে তা ফেরত নেয়া হবে না। কিন্তু যোদ্ধার জন্যে তা নয়। সে নিজের ওপর কৃচ্ছতা করে থাকলে তার নিকট থেকে তা ফেরত নেয়া হবে না। কেননা যোদ্ধা যা নেয়, তা বিনিময় হিসেবেই নেয়। আমরা তার মুখাপেক্ষী, সে যুদ্ধ করলেই আমরা রক্ষা পাই। আর তা সে করছে। পক্ষান্তরে 'ইবনুস-সাবীল' নিজেই তার নিজের প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করে আর এই সাহায্য গ্রহণ করায় তার সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।[১] অতএব উদ্বৃত্তের ওপর তার কোন অধিকার থাকার কথা নয়।

এ যুগে 'ইব্‌নুস্-সাবীল' পাওয়া যায় কি

সমকালীন কোন কোন আলিম মনে করেছেন, আমাদের এ যুগে 'ইবনুস্-সাবীল' ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা এ কালের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত, দ্রুত গতিবান এবং বিচিত্র ধরনের। মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবী যেন একটি শহরে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া লোকদের উপায়-উপকরণও বিপুল, সহজলভ্য। দুনিয়ার যে কোন স্থানে বসে মানুষ স্বীয় ধন-মাল নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ব্যাংকের মাধ্যমে, অন্যান্য উপায়ে।[২]

উপরিউক্ত কথা মরহুম শায়খ আহমাদ আল-মুস্তফা আল-মারাগী তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমরা এই মতের বিপরীত কথা বলতে চাই। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এ যুগেও 'ইবনুস-সাবীল' পাওয়া যায়—যে কোন শহ্‌র থেকে—যে-কোন উপায়েই হোক ধন-মাল লাভ করা যেতে পারে বলে যতই দাবি করা হোক না কেন।

'ইব্‌নুস্-সাবীল'-এর বাস্তব রূপ

১. কোন কোন লোক ধনী গণ্য হয় বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাংকের সাহায্য নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে যখন বিদেশে অর্থহীন সম্বলহীন হয়ে পড়বে তখন সে কোথায় পাবে তার প্রয়োজনীয় সম্পদ ? অনুরূপভাবে বিভিন্ন কার্যকারণ ও পরিস্থিতির দরুন কোন দূরবর্তী গ্রামে কিংবা ধূলি-ধূসর মরুভূমিতে যে লোক আটকে যাবে, কোন নগর কেন্দ্রে পৌছবার সামর্থ্য লাভ করছে না, ফলে সে তার ব্যাংক থেকে ইচ্ছামত সম্পদ গ্রহণও করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় এই লোকের পরিণতি কি হবে ?

---

১. ردالمحتار ج ٢ ص ٦٤ - فتح القدير ج ٢ ص ١٨

২. দেখুন ঃ تفسير المراغى ج ٢٨ সূরা হাশর-এর ষষ্ঠ আয়াতের তাফসীরে এই মত লেখা হয়েছে।

এ ধরনের লোক অবশ্যই 'ইবনুস-সাবীল' রূপে গণ্য হবে। কেননা সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার ধন-মাল থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব সে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। উপরিউক্ত অবস্থা বিরল হলেও তা কখনও কখনও সংঘটিত হয়ে থাকে, হতে পারে।

পালিয়ে যাওয়া ও আশ্রয় গ্রহণকারী লোক

২. এমন বহু লোকই আছে যারা স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় অবস্থার কারণে এবং তারা তাদের ধন-মাল ও মালিকানা সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তা হয় বিদেশী দখলদার যোদ্ধা বাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়নের দরুন অথবা বিদেশী স্বৈরাচারী আল্লাহ্ বিরোধী লোকদের চাপে। তারা কাফির প্রশাসক হতে পারে বা প্রায় কাফিরদের ন্যায় আচরণ গ্রহণকারীও হতে পারে। এ ধরনের লোকেরাই দেশের ভালো ও কল্যাণকামী লোকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে থাকে। তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে তাদের নিজেদের ধন-মাল ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে। তাদের অপরাধ এ ছাড়া আর কিছুই হয় না যে, তারা বলে ঃ 'আমাদের রব্ব্ একমাত্র আল্লাহ্। তাকে ছাড়া আর কাউকেই আমরা মানি না।' এরূপ অবস্থায় বহু লোক নিজেদের দ্বীন-ঈমান লয়ে দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের ঘর-বাড়িতে রক্ষিত ধন-মাল থেকেও তারা হয়ে পড়ে বঞ্চিত। তার নিজ দেশের ব্যাংকে তার নামে বা তার নিয়ন্ত্রণে বহু ধন-মাল থাকলেও বা অনুরূপ কোন অবস্থা হলেও—তার নিজের কোন কাজের আসে না তা। বহু নিপীড়িত-বিতাড়িত-বহিষ্কৃত ও বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রাজনীতিক বা সাধারণ নাগরিক এ কালে অনেক দেশেই দেখা যায়।

ফিকাহ্‌র পরিভাষায় তাদের কি বলা হবে ?

তাদের নিজেদের দেশে তাদের ধন-মাল রয়েছে একথা সত্য। কিন্তু তার ওপর এক্ষণে তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তা পাওয়ারও কোন উপায় নেই। এরূপ অবস্থায় তারা আসলে ধনী হলেও কার্যত নিতান্তই দরিদ্র, সর্বহারা। আর এরূপ অবস্থা যাদেরই হবে, তারাই 'ইবনুস্ সাবীল'-এর মর্যাদা ও অধিকার পাবে।

নিজ ঘরে থেকেও নিজের মালের ওপর কর্তৃত্ব নেই যার

৩. হানাফী ফিকাহবিদের কেউ কেউ এমন প্রত্যেককে 'ইবনুস-সাবীল' গণ্য করেছেন, যে তার নিজের ধন-মাল থেকে অনুপস্থিত, তা ব্যবহারে অক্ষম যদিও সে নিজের ঘরে উপস্থিত। সে ব্যক্তির প্রয়োজন বা অভাবগ্রস্ততাই তার যাকাত প্রাপ্তির যোগ্য হওয়ার কারণ। এ কারণটি এখানে পুরাপুরি উপস্থিত। কেননা এখন সে কার্যত ফকীর, দরিদ্র, বাহ্যত সে যত ধনীই হোক।[১]

---

১. দেখুন ঃ ردالمحتار ج ٢ ص ٦٤. البحر الرائق ج ٢ ص ٢٦

তাঁরা বলেছেন ঃ কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তির যদি লোকদের নিকট টাকা পাওনা থাকে কিন্তু তা সে আদায় করতে পারছে না, কিছুই ফেরত পাচ্ছে না—তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। কেননা সে কার্যত ফকীর—ইবনুস সাবীল-এর মতই।[১]

কল্যাণমূলক কাজে বিদেশ গমনকারী

৪. যে লোক বিদেশ গমনের ইচ্ছা করেছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সফর সম্বল যোগাড় করতে পারছে না, শাফেয়ী মাযহাব তাকেও ইবনুস সাবীল গণ্য করেছে। এই মত যদি আমরাও গ্রহণ করি এবং এই সফর ইসলামে গণ্য কোন কল্যাণকর কাজের জন্যে অথবা মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে হতে হবে বলে আমরা যে শর্ত আরোপ করেছি, তা এখানে আছে বলে যদি আমরা মনে করি, তা হলে আমাদের এই যুগেও এ পর্যায়ের বহু অবস্থা ও রূপ এবং বহু ব্যক্তিকে দেখতে পাব। তারা প্রতিভাবান ছাত্র হতে পারে, দক্ষ শিল্পপতি হতে পারে, সূক্ষ্ম শিল্পী বা কারিগর হতে পারে এবং এ পর্যায়ের এমন সব লোকও হতে পারে, যারা বিদেশে প্রতিনিধিত্বের জন্যে প্রেরিত হয়ে থাকে। প্রেরিত হয়ে থাকে কল্যাণকর জ্ঞানে বিশেষত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে, ফলপ্রসূ কর্মে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের লক্ষ্যে। এসবের সুফলটা দ্বীন ও জাতি—উভয়ই পেয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত।

আশ্রয় বঞ্চিত লোকেরা

৫.হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন আলিম ইবনুস-সাবীল-এর অপর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাতে বহু লোকই এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে পারে আমাদের এ কালেও। উল্লেখ করেছেন, সেই সব লোকও 'ইবনুস-সাবীল' যারা লোকদের পথে ঘাটে জড়িয়ে ধরে ও পাকড়াও করে ভিক্ষা চায়।[২]

লজ্জা ও দুঃখে কপাল ঘুচিয়ে যায় যখন আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, বহু দেশ ও শহর-নগরের অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বহু সহস্র লোক সাধারণ আশ্রয় ও বসবাসস্থল থেকেও বঞ্চিত হয়ে আছে। তারা নিরুপায় হয়ে পথের পার্শ্বে কিংবা গাছতলায় কোন-না-কোন রকমের একটু আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। সর্বত্র মাটি ছড়িয়ে আছে, তার ওপরই শয্যা রচনা করেছে। বাতাসকেই তারা গাত্রাবরণ বানিয়েছে। এরা নিঃসন্দেহে 'পথের সন্তান'—'ইবনুস-সাবীল'। কেননা পথই তাদের মা-বাপ।

এটা বস্তুতই সমাজ-সমষ্টির কলংক। কাজেই কুরআন তাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কুরআন তাঁদেরকে একটা বিশেষ গুণেও ভূষিত করে থাকতে পারে এবং তা 'ফকীর' মিসকীন' ইত্যাদি থেকে ভিন্নতর। ইসলামের প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 'কর' যাকাতে তাদের জন্যে একটা অংশও নির্দিষ্ট করে দিয়ে থাকতে পারে, তা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

এ সব লোককে 'ইবনুস-সাবীল' ধরে নিয়ে যাকাতের অংশ দেয়া হলে তা কিছুমাত্র অশোভন কাজ হবে না। তাদের 'ফকীর'ও মনে করা যায়। প্রথমোক্ত পরিচিতির

---

١. البحر الرائق ج ٢ ص ٢٦٠.
٢. الانصاف ج ٢ ص ٢٢٧.

ভিত্তিতে তাদেরকে 'পথ-সন্তান' হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে তাদের উপযোগী 'বাসস্থান' বানিয়ে দেয়া একান্তই আবশ্যকীয় মনে হয়। আর দ্বিতীয় পরিচিতির ভিত্তিতে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা—তাদের জীবিকার নির্ভরযোগ্য সংস্থান করে দেয়াও আবশ্যক মনে হয়। তাতে করে তারা কোনরূপ অপচয়, বাহুল্য ব্যয় এবং কৃচ্ছ্রতা ব্যতিরেকেই মানবীয় প্রয়োজন তৃপ্তিদায়ক মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম হবে।

পড়ে পাওয়া মানুষ

৬. সাইয়্যেদ রশীদ রিজা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'কুড়িয়ে পাওয়া (Foundling) শিশু'ও সম্ভবত 'ইবনুস-সাবীল'-এর মধ্যে গণ্য হতে পারে। তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, সমকালীন বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের লিখিত গ্রন্থে এটাও একটি যথার্থ তাৎপর্য বলে ঘোষণা করেছেন।

শায়খ রশীদ যদিও খুব দৃঢ়তার সাথে না হলেও তার উক্ত কথাটিকে সমর্থন যুগিয়েছেন এই বলে যে, 'কুড়িয়ে পাওয়া' বালক বা শিশুও এর মধ্যে গণ্য হতে পারে, যা অপর কোন শব্দে শামিল হয় না। আর কুরআন যেহেতু ইয়াতীম-এর ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং তার প্রতি ভালো দয়ার্দ্র ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছে উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতা সহকারে। এ কারনে যে, ইয়াতীম কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শক্তিশালী সাহায্যকারী পিতা পায় না বলেই নিরুপায় হয়ে পড়ে অথবা তার চরিত্র গঠন হয় খুবই ত্রুটিপূর্ণভাবে। বিবেক-বুদ্ধির ওপর আবরণ সৃষ্টিকারী মূর্খতা তাকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে বসে। মন-মানসিকতার বিকৃতির দরুন নৈতিক চরিত্রেরও চরম বিপর্যয় ঘটে। আর এই মূর্খতা ও নৈতিক বিকৃতির দরুন সমাজের ও জাতির কুলাংগার সন্তান হয়ে দাঁড়ায় তারা। তারা এক সঙ্গে বাস করেও তাদের জন্যে তারা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। ইয়াতীমেরই যখন এরূপ পরিণতি, তখন কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান তো সমাজের স্নেহ-যত্ন-আশ্রয় ও লালন-পালন বেশি মাত্রায় অধিকারী। উপরে এই যৌক্তিকতা ও ফিকহী দৃষ্টিকোণের কথাই বলা হয়েছে।

বলেছেন, প্রায় সব তাফসীরকারই এই কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। হয়ত এজন্যে যে, তাঁদের সময়ে কুড়িয়ে-পাওয়া সন্তানদের সংখ্যা খুবই বিরল ছিল। আর শেষের দিকের তাফসীর লেখকগণ তো কেবল পূর্ববর্তী লেখকদের রচনাবলীর অনুলিপিই তৈরী করেছেন মাত্র।[১]

তাছাড়া 'কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান' 'ইবনুস-সাবীল' পর্যায়ে গণ্য না হলেও তারা সাধারণ ফকীর-মিসকীনের মধ্যে তো অনিবার্যভাবেই গণ্য হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কেননা 'ফকীর' হচ্ছে 'অভাবগ্রস্ত'—ঠেকে যাওয়া লোক। তা অল্প বয়সের হোক কি বেশি বয়সের। তার পক্ষে যাকাতের অংশ পাওয়া তো সবদিক দিয়েই নিশ্চিত।

---

১. تفسير المنارج ٥ ص ٩٤ ط ثانيه

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের সম্পর্কে পর্যালোচনা

যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের সামগ্রিক পর্যালোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের ব্যয়খাতসমূহের উল্লেখ করেছেন তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে। এই খাতসমূহকে আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ভাগসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা করেছি, প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি। তা সত্ত্বেও একটি বিষয় এখানে অবশিষ্ট থেকে গেছে, যার বিশ্লেষণ আমরা এ পর্যায়ে করতে চাচ্ছি। তা হচ্ছে—যাকাত বণ্টনকারী ব্যক্তি নিজে হোক কি সরকার বা বায়তুলমাল সংরক্ষক, সে কি এই আট প্রকারের লোকদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করবে এবং তাদের মধ্যে পরিমাণ সমান করে দেবে?

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ তা-ই মনে করেছেন। তন্মধ্য ইমাম শাফেয়ীও রয়েছেন। তিনি তাঁর কিতাব 'আল-উম্ম'-এর বহু কয়টি অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইমাম নববী তাঁর المجموع। গ্রন্থে লিখেছেন—ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সঙ্গীদের কথা হচ্ছে, 'মূল মালিকই যদি যাকাত বণ্টনকারী হয় কিংবা তার প্রতিনিধি, তাহলে যাকাত সংস্থার কর্মচারীদের জন্যে العاملين। নির্দিষ্ট অংশ বণ্টন থেকে বাদ যাবে, সে অংশটি অপর সাতটি অংশের সাথে মিলিত হয়ে বণ্টিত হবে—যদি সেগুলো পাওয়া যায়। অন্যথায় যে কয়টি খাতে লোক পাওয়া যাবে, সে সব খাতেই তা বণ্টন করা হবে। কোন একটি খাতে লোক পাওয়া সত্ত্বেও তাতে যাকাত অংশ না দেয়া জায়েয নয়। বাদ দেয়া হলে সে অংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অর্থাৎ আমাদের মত হচ্ছে, সব কয়টি খাতেই যাকাত ব্যয় করা। ইকরাম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, জুহ্‌রী ও দাউদ জাহিরী এই মত পোষণ করেন।[১]

ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণনা পাওয়া গেছে শাফেরী মাযহাবের সমর্থনে। তিনি তো সব কয়টি খাতেই ব্যয় করা, এগুলোর মধ্যে সমতা বিধান এবং প্রতিটি খাতে তিন বা ততোধিককে দেয়া ওয়াজিব বলে মনে করেন। কেননা এই 'তিন' হচ্ছে জামায়াত হওয়ার কম-সে কম সংখ্যা। তবে عامل-এর কথা স্বতন্ত্র। সে যা গ্রহণ করে তা তার পারিশ্রমিকস্বরূপ। তাই একজন হলেও চলবে ও দিতে হবে আর ব্যক্তি মালিক নিজেই

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٨٥

যাকাত বণ্টন করলে 'কর্মচারীর' খাত বাদ দিতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের আবূবকরও এ মত দিয়েছেন।[১]

মালিকী মাযহাবের আলিম 'আচবাগ্' সকল খাতে সাধারণ বণ্টনের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর মতকে খুবই পসন্দ করেছেন। যেন তাদের সকলেরই অধিকারের কথা ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা না হয়। তাছাড়া তাতে করে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ সাধিত হওয়াও সম্ভবপর। তাতে দারিদ্য বিদূরণ, যুদ্ধ পরিচালন ও ঋণ শোধ প্রভৃতি সব কাজ একই সাথে সম্পন্ন হতে পারে। এই সকলের দো'আও সেই জিনিসকেই বাধ্যতামূলক করে দেয়।[২]

ইবনুল আরাবী বলেছেন, ফিকাহবিদ্গণ একমত হয়ে বলেছেন—যাকাত সংস্থার কর্মচারীদেরকে সবকিছু দেয়া যাবে না।[৩] কেননা তাতে শরীয়াতের যাকাত বণ্টন নীতির লক্ষ্য বিনষ্ট হওয়ার আংশকা রয়েছে। সে লক্ষ্য হচ্ছে—মুসলমানদের দারিদ্য নিরসন, ইসলামে বিশ্বাসীদের রিক্ততা বিদূরণ—যেমন ইমাম তাবারী বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গিগণ দলিল হিসেবে নির্ভর করেছেন এই কথার ওপর যে আল্লাহ তা'আলা সাদকা যাকাতকে—'মালিক করে দেয়া' বোঝায় যে ل 'লাম' তা সহ উল্লেখ করে انما الصدقات। যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোকদের উল্লেখ করেছেন। তাতে শরীক হিসেবে মালিকানা লাভ সম্ভব হতে পারছে। ফলে তা হচ্ছে প্রাপক লোকদের বিবরণ। এটা হল, ঠিক যেমন সুনির্দিষ্ট লোকদের জন্যে অথবা কোন এক প্রকারের লোকদের জন্যে অসিয়ত করা। কাজেই তাদের সকলকেই তাতে শরীক করা ওয়াজিব হয়ে পড়ল।

হাদীসের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আবূ দাউদ-এ জিয়াদ ইবনুল হারিস আস সাদায়ী' থেকে বর্ণিত হাদীসটি। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী করীমের নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট 'বায়'আত' করলাম। এই সময় তার নিকট আর এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। বলল ঃ আমাকে যাকাতের অংশ দিন। নবী করীম (স) তাকে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর বা অপর কারোর হুকুমে যাকাতের বিধানও বিভক্তি করেন নি। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং তাকে আটটি অংশে বিভক্ত করেছেন। এখন তুমি যদি সেই বিভক্তির কোন একটিতে গণ্য হও, তাহলে আমি তোমার হক দিয়ে দেব।'

ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফার এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরোধিতা করেছেন। এরা যাকাত বণ্টনে সব কয়টি খাতকে শরীক করা ওয়াজিব মনে করেন নি।

---

১. الكافى الابن قدامه ج ١ص٤٢

২. 'চাভীতা'র টীকায় এই কথা উদ্ধৃত করেছেন, ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃ., খরশী থেকে উদ্ধৃত।

৩. احكام القران ج ٢ ص ٩٤٧

তাঁরা বলেছেন—আয়াতের যে ل 'লাম' এর কথা বলা হয়েছে তা 'মালিক বানিয়ে দেয়া' অর্থ বোঝায় না। তা 'জন্যে' বোঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, 'এই লাগামটি জন্তুটির জন্যে', 'দুয়ার ঘরের জন্য।"

তাঁরা দলিলস্বরূপ এ আয়াতটির উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَ اَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ

তোমরা যদি দান-সাদকা প্রকাশ্যভাবে দাও, তা-ও উত্তম, আর যদি তা গোপন কর এবং তা 'ফকীর'দের দাও, তবে তাও তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

আয়াতটিতে কেবল 'ফকীরদের'ই উল্লেখ করা হয়েছে সাদকার ব্যয়খাত হিসেবে। আর কুরআনে সাদকা যখনই নিঃশর্ত উল্লিখিত হবে, বোঝা যাবে যে, তা ফরয সাদকা অর্থাৎ যাকাত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَا ئِكُمْ وَاَرُدُّهَا عَلٰى فُقَرَئِكُمْ -

আমি সাদকা-যাকাত তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করব ও তোমাদের গরীবদের মধ্যে তা ফিরিয়ে দেব, এজন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি।

যাকাত ব্যয়খাতের আটটির মধ্যে শুধু একটি খাতের উল্লেখ করার দলিল কুরআন ও হাদীস উভয় থেকেই এখানে উদ্ধৃত হল।[১]

আবূ উবাইদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَاوَضَعْتَهَا فِيْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَصْنَافِ فَحَسْبُكَ -اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَا كِيْنَ وَكَذَا وَكَذَا- لِئَلَّا يَجْعَلُهَافِيْ غَيْرِ هٰذِهِ الْاَصْنَافِ -

তুমি যখন খাতসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি খাতে যাকাত ব্যয় করলে তখন তা-ই তোমার জন্যে যথেষ্ট হল। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'সাদ্‌কা' ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে'....... অমুক অমুকও পাবে। যেন এই খাতসমূহ ছাড়া অন্য কোথাও তা নিয়োগকৃত না হয়.....।

হুযায়ফা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَسْعَدُهُمْ بِهَا اَكْثَرُهُمْ عَدَدًا وَاَشَدُّ هُمْ فَاقَةً -

তোমাদের মধ্যে যাকাতের ব্যাপারে অধিক সৌভাগ্যবান সে, যে হবে তাদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক বেশি এবং অনশনের দিক দিয়ে অনেক বেশি কষ্টকারী তাদের মধ্যে।

---

১. احكام القران لابن الحربى ج ٢ ص ٩٤٧

অর্থাৎ যাদের সংখ্যা বেশি এবং যারা ক্ষুধায় অধিক মাত্রায় কাতর, তারা যাকাত পাওয়ারও বেশি অধিকারী।

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ مَاكَانُوا يَسْأَلُوْنَ اِلَّا عَنِ الْفَاقَةِ

লোকেরা কেবল দারিদ্র্য ও অনশন সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করত (যে, তা নিরসনের উপায় কি ?)।

সুফিয়ান ও ইরাকবাসী আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গিগণ বলেছেন ঃ

اِذَا وَضَعَهَا فِيْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ اَجْزَاهُ -

যাকাত আটটি খাতের কোন একটিতে ব্যয় হলেই তা যথেষ্ট হবে।

ইবরাহীম নখয়ী বলেছেনঃ যাকাত সম্পদ বিপুল হলে তা সব কয়টি খাতে বন্টন কর। আর কম বা স্বল্প হলে তা একটি খাতেই ব্যয় কর। আতা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১]

আবূ সওর বলেছেন, যাকাতদাতা নিজেই তা বন্টন করলে তা একটি মাত্র খাতে ব্যয় করা তার পক্ষে জায়েয। আর সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান বন্টন করলে সব কয়টি খাতেই তা করবে।

ইমাম মালিক বলেছেন, সাদকা—যাকাত—বন্টনের ব্যাপারে আমাদের মতে কাজটি রাষ্ট্রপ্রধানের ইজতিহাদ ছাড়া আর কোনভাবে সম্পন্ন করা যাবে না। যে খাতের প্রয়োজন তীব্র ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের সংখ্যা বেশি হবে, সে খাতটিতে রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন পরিমাণ অধিক ব্যয় করবে। এক বা দুই বৎসর কিংবা কয়েক বৎসর পর তা অন্য খাতে স্থানান্তরিত করা যাবে। কাজেই অভাবগ্রস্ত ও অধিক সংখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে তা যতটা এবং যেভাবেই হোক।

আমার পসন্দনীয় আলিমগণকে আমি এই মতেরই ধারক পেয়েছি।[২]

উপরিউক্ত মতসমূহের মধ্যে নখয়ী, আবূ সওর ও মালিক প্রমুখের কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়—আমি যা মনে করি—তা পরস্পর সম্পূরক।

الروضة الندیه গ্রন্থকারের গবেষণা

الروضة الندیه। গ্রন্থকার এ ব্যাপারটির পর্যায়ে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন। বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সাদকা-যাকাতকে আটটি খাতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর বাইরে অপর কোন খাতে তা ব্যয় করার কোন সুযোগ রাখেন নি। কিন্তু এই বিশেষভাবে নির্দিষ্টকরণ থেকে একথা জরুরী হয়ে পড়ে যে, সেই খাতসমূহে একেবারে সমান পরিমাণে বন্টন করতে হবে। আর কম বেশি যা-ই

১. আবূ উবাইদ তাঁর الاموال। গ্রন্থে এ সব কথা উদ্ধৃত করেছেন, ৫৭৬-৫৭৮ পৃ.

২. احكام القران ج ٢ ص ٩٤٨

সংগৃহীত হবে, তা-ই তাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে এমন কথাও নয়। তার অর্থ হচ্ছে, সাদকা-যাকাত জাতীয় সম্পদ এই আট জাতীয় প্রাপকদের মধ্যে বণ্টনীয়। যার ওপর যাকাত-সাদকা জাতীয় কিছু দেয়া ফরয হবে, সে যদি তা এই আট জাতীয় খাতে ব্যয় করে দিল, তাহলে সে এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করল এবং আল্লাহ্র আরোপ করা ফরয আদায় হয়ে গলে। যদি বলা হয়, মালিক যদি যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ সম্পদ লাভ করল তার পক্ষে আট প্রকারের ব্যয় খাতগুলির বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সেই সব কয়টিতেই তা ভাগ করা—কষ্ট ও অসুবিধা ছাড়াও—প্রাচীন ও শেষদিকের মুসলমানদের কাজের পরিপন্থী পদক্ষেপ হবে। অনেক সময় যাকাত বাবদ স্পল্প পরিমাণ সম্পদ জমা হয়, তা যদি সবকয়টি খাতেই বণ্টন করা হয়, তা হলে প্রতিটি খাতই লব্ধ অংশ থেকে উপকৃত হতে পারল—তা একটি প্রকার হলেও, বেশি সংখ্যক হওয়া তো দূরের কথা।

জিয়াদ ইবনুল হারিস বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ নবী বা অন্য কারুর হুকুমে যাকাত বণ্টনের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি নিজেই ফায়সালা করে দিয়েছেন ও আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—এ হাদীসটি দলিল হিসেবে গণ্য ধরে নিয়েও (হাদীসটির সনদ সম্পর্কে আপত্তি উঠেছে) বলা যায় তার অর্থ হচ্ছে, যাকাত সম্পদ বিভক্তি তার খাত বিভক্তি অনুযায়ী হবে। আয়াতটিতে যেমন করে খাত কয়টির উল্লেখ হয়েছে—নবী করীম (স) যা বলতে চেয়েছেন, মূল যাকাত বণ্টনই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে তার অর্থ, প্রতিটির অংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় জায়েয হবে না। যে খাতটির অস্তিত্ব নেই, সেই খাতের জন্যে নির্দিষ্ট অংশটি অপর খাতে ব্যয় করা কখনই জায়েয হবে না। তা মুসলিম উম্মতের ইজমার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

উপরন্তু তা মেনে নিলে তা হবে সমষ্টিগত যাকাত সম্পদ হিসেবে যা রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ বায়তুলমালে—সংগৃহীত হবে। ব্যক্তি বিশেষ বা প্রত্যেকটি ব্যক্তি হিসেবে নয়। তাহলে সমান বণ্টন ওয়াজিব হওয়ার মত কোন কথাই অবশিষ্ট থাকল না। বরং কোন কোন পাওয়ার যোগ্য লোককে কোন কোন যাকাত এবং অপর লোকদের অপর কোন যাকাত দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

হ্যাঁ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি কোন বিশেষ ভূ-খণ্ডের সমস্ত প্রকারের যাকাত সংগ্রহ করে এবং আটটি খাতের সব কয়টি উপস্থিত হয়ে যায়, তাহলে প্রতিটি খাতেরই তার অংশের দাবি করার অধিকার রয়েছে আল্লাহ্র বিভক্তি অনুযায়ী পাওয়ার। কিন্তু তা তাদের মধ্যে সমান পরিমাণে বণ্টন করা এবং দান করার ক্ষেত্রে সবাইকে শামিল করা জরুরী কর্তব্য নয়। কতিপয় খাতকে অপর খাতের তুলনায় অধিক পরিমাণে দেয়ার তার অধিকার রয়েছে। এমনকি কাউকে দেবে কাউকে নয়, যদি তা-ই ইসলাম ও মুসলিমের জন্যে কল্যাণ বিবেচিত হয়—তাহলে তা করারও অধিকার আছে। যেমন তার নিকট যাকাত সংগৃহীত হল এই সময়ই জিহাদ সংঘটিত হল এবং কাফির ও বিদ্রোহীদের হামলা থেকে ইসলামের ঘর প্রতিরক্ষার দাবি উপস্থিত হল, তাহলে তখন মুজাহিদদের জন্যে নির্দিষ্ট খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া ও তাতেই সব ব্যয় করা সম্পূর্ণ জায়েয

হবে। তাতে যাকাতলব্ধ সব সম্পদ ব্যয় হয়ে গেলেও আপত্তি করা চলবে না। অনুরূপভাবে মুজাহিদ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যয় করার অধিক তাকীদ দেখা দিলে তা করা খুবই সংগত হবে।[১]

আবূ উবাইদের অগ্রাধিকার দান

ইমাম আবূ উবাইদ উপরিউক্ত মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম আবূ জুহ্রা যাকাতের পর্যায় ও স্থান সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজকে যা লিখেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন, যেমন হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। বলেছেন, এখানে আটটি অংশ রয়েছে। একটি ফকীরদের জন্যে আর একটি মিসকীনদের জন্যে...... এভাবে আটটি অংশ। পরে ফকীর থেকে ইবনুস সাবীল পর্যন্ত প্রতিটি খাতে যা ব্যয় হবে তা আলাদা আলাদা করে দেখিয়েছেন। আটটি খাতের প্রতিটিতে একটি অংশ কিভাবে বন্টন করা হবে তাও দেখিয়েছেন। অতঃপর আবূ উবাইদ বলেছেন, এগুলো হচ্ছে যাকাত ব্যয় করার ক্ষেত্রে, যখন তাকে অংশে অংশে বিভক্ত করা হবে। আর এ-ই হচ্ছে পদ্ধতি যে তা করতে সক্ষম ও সামর্থ্যবান হবে তার জন্যে। কিন্তু আমি মনে করি, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার ছাড়া এরূপ করা আর কারুর জন্যেই ফরয নয়। তার ফাণ্ডে যদি মুসলমানদের দেয়া যাকাতের পরিমাণ বিপুল হয় তখন সব কয়টি খাতের প্রাপ্য দিয়ে দেয়া আবশ্যক হবে। তখন তা বন্টন করার ব্যাপারে সাহায্যকারী বহু সংখ্যক হস্ত কাজ করবে। কিন্তু যার নিকট তার বিশেষ করে নিজের ধন-মালের জন্যে নিয়োজিত লোক ছাড়া তার কেউ থাকে না, সে যদি কোন কোন খাতে তা দেয় অপর কোন কোন খাত বাদ দিয়ে, তাহলে তা তার জন্যে যথেষ্ট এবং জায়েয হবে। যেসব আলিমের নাম উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাঁদের এটাই মত।

এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হচ্ছে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি যাকাত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

تُؤْ خَذُمِنْ اَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَا ئِهِمْ -

তা নেয়া হবে তাদের ধনীদের থেকে। পরে তা ফিরিয়ে বন্টন করা হবে তাদেরই গরীবদের মধ্যে।

এখানে তো একটি মাত্র খাতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পরে তাঁর নিকট ধন-মাল আসল। তখন তিনি তা ফকীরদের ছাড়া দ্বিতীয় খাতে নিয়োগ করেছেন। তারা হচ্ছে 'আল-মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' ঃ আল আকরা ইবনে হাবেস, উয়াইনা ইবনে হাসান, আলা ও জায়দ ইবনুল খায়ল প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিল এই খাতের প্রাপক। তাদের মধ্যে সেই রৌপ্য বন্টন করে দিলেন যা হযরত আলী নবী করীম (স)-এর নিকট ইয়ামেনবাসীদের ধন-মাল থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তা সেই লোকদের নিকট থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল, যাদের ধন-মাল থেকে তখন যাকাত নেয়া হত।

---

১. الروضة الندیه ج اص ٢٠٧-٢٠٩ تبرف

পরে তার নিকট আরও মাল আসল। তখন তিনি তা তৃতীয় খাতে নিয়োগ করলেন, তা হচ্ছে 'আল-গারেমুন'—ঋণগ্রস্ত লোক।

কুবাইচা ইবনুল মাখারিক যে দুর্বহ বোঝা নিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি অপেক্ষা কর, আমাদের নিকট যাকাতের মাল আসুক'। অতঃপর হয় আমরা সে বোঝা বহনে তোমার সহায়তা করব, না হয় বোঝাটি তোমার ওপর থেকে আমরা তুলে নিয়ে যাব। এ কথাটিও এই পর্যায়েরই। এতে নবী করীম (স) বিশেষ একটি খাতকে অপরাপর খাত অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতেই যাকাত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন।

মোটকথা, রাষ্ট্রপ্রধান—সরকার—সব কয়টি খাতে যাকাত বন্টনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী—কোন কোন খাত বাদ দিয়ে অপর কোন কোন খাতে সে তা ব্যয় করতে পারে। যখন তা ইজতিহাদ পন্থায় সমাধা করা হবে এবং সত্যকে পরিহার করার প্রবণতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার ছাড়া অন্যদের জন্যেও এরূপ অবাধ অধিকার রয়েছে (ইন্‌শা আল্লাহ্)।[১]

রশীদ রিজা'র অগ্রাধিকার দান

আল্লামা রশীদ রিজা 'আল-মানার' তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ পূর্বকালের আলিম ও বিভিন্ন দেশের ইমামগণের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কোন সুস্পষ্ট নীতি পাওয়া যায়নি যার ওপর নবী করীম (স) থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

খুলাফায়ে রাশেদুন-এর সময় থেকেও এ পর্যায়ে কোন ঐকমত্য ভিত্তিক নীতি পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে, তাঁরা ব্যাপারটি কল্যাণময়তার দৃষ্টিতে বিবেচনা করতেন এবং তদনুযায়ী অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতেন—যা রাষ্ট্রনায়কগণ পাওয়ার অধিকারের দৃষ্টিতে ও যাকাত সম্পদের পরিমাণ সল্পতা ও বিপুলতা এবং বায়তুলমালে তা সংগৃহীত হওয়ার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

কল্যাণকরতা বিবেচনায় সব কয়জন ইমামের মধ্যে ইমাম মালিক ও ইবরাহীম নখয়ী'র কথা অধিক গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম আবূ হানীফার মত সাধারণ কল্যাণ ও অকাট্য দলিল উভয় দিকের বিচারেই গ্রহণযোগ্যতা থেকে অনেক দূরে।[২] তবে সংগৃহীত সম্পদ খুব বেশি মাত্রায় কম হলে অন্য কথা। তখন তা একজনকে দেয়া হলে সে তা দিয়ে উপকৃত হবে। আর তা যদি অন্যান্য কয়েকটি খাতেও ব্যয় করা হয় কিংবা একই খাতের বহু ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করা হয়—যেমন 'ফুকারা' খাত—তা হলে তা কারোর জন্যেই যথেষ্ট হবে না।

---

১. الاموال ص ٥٨١ وما قبلها

২. পূর্বে উল্লেখ করেছি, আবূ উবাইদ ইবনে আব্বাস ও হুযায়ফা থেকে এরূপ কথার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। একটি মাত্র খাতে সব যাকাত সম্পদ ব্যয় জায়েয হওয়া সম্পর্কিত মতটি প্রয়োজন ও বন্টন ক্ষেত্রের কল্যাণের বিরোধী নয়—যদি তা-ই মুসলিম মানসিকতার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়।

তবে একই খাতের পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকে বিপুল সম্পদ দেয়া জায়েয হওয়ার বাস্তবিকই কোন কারণ বা যৌক্তিকতা নেই, তা নিঃসন্দেহ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি খাতকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। তাই আবূ হানীফা বা অন্য কেউ ইলম ও চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে একথা বলতে পারেন না যে, একটি খাতের একজন লোককে দিয়ে দিলেই আল্লাহ্র আদেশ পালন এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী কাজ হয়ে যাবে। দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মজলিশে শূরা প্রতিটি যুগে ও দেশে কার পরে কার অগ্রাধিকার তা নির্ধারণ করবে এটাই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত যাকাত সম্পদও যখন যথেষ্ট হবে না তখন রাজা-বাদশাহ্ প্রশাসক সকলকেই ইচ্ছামত বণ্টন বা ব্যয় করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আর প্রয়োজন বা অভাবের যেমন শ্রেণী বা মাত্রা পার্থক্য রয়েছে, তেমনি কোন কোন স্থানে ও সময়ে কোন কোন খাত কার্যত দেখা যায় না, অপর কয়েকটি খাত পাওয়া যায়—এটাও স্বাভাবিক।[১]

খাতসমূহে যাকাত বণ্টনের সারকথা

উপরিউদ্ধৃত বহু মত, গবেষণা-বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় কথার সারনির্যাস আমরা এখানে তুলে ধরছি ঃ

১.যাকাত সম্পদের পরিমাণ বিপুল ও বেশি হলে সব কয়টি খাতে তা বণ্টন করা বাঞ্ছনীয়—যদি সব কয়টি খাতই পাওয়া যায়, সে সবের প্রয়োজন সমান মাত্রার হোক বা পার্থক্যপূর্ণ হোক। তার কোন একটা খাতের প্রয়োজন থাকা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তাতে কিছুই ব্যয় না করা—খাতটিকে বঞ্চিত করা জায়েয নয়। এই কথাটি সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান বা শরীয়াতসম্মত কর্তৃপক্ষের জন্যে, যা যাকাত সংগ্রহ ও প্রাপকদের মধ্যে বণ্টনের কাজ করবে।

২.আটটির সব কয়টি খাতের বর্তমান থাকা অবস্থায় সব খাতেই যখন যাকাত বণ্টন করা হবে, তখন প্রতিটি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ সর্বতোভাবে সমান করা ওয়াজিব বা ফরয নয়। বরং তা হতে হবে প্রয়োজন ও সংখ্যা মাত্রা অনুপাতে। কেননা কোন এলাকায় হয়ত এক হাজার জন ফকীর রয়েছে.; কিন্তু 'গারেমুন' বা 'ইবনুস-সাবীল' খাতে দশ জনের বেশি পাওয়া যায় না—এমনটা হতে পারে। এরূপ অবস্থায় দশজনকে যা দেয়া হবে, তা-ই এক হাজার জনকে কিভাবে দেয়া যেতে পারে ? এ কথাটি ইমাম মালিক এবং তাঁর পূর্বের ইমাম জুহ্রীর মাযহাবের সাথে অধিক সাযূজ্যপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। তারা যে খাতের লোকদের সংখ্যা বেশি প্রয়োজন তীব্র, সেই খাতটিকে বড় অংশ দিতে অগ্রাধিকার দিতেন[২]। কিন্তু তা ইমাম শাফেয়ীর মতের খেলাফ।

---

১. تفسير المنار ج ١ط صانبم ص ٥٩٢

২. দরদী তাঁর شرح الصغير গ্রন্থে বলেছেন ঃ অধিক অভাবগ্রস্তকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে, হয় বিশেষভাবেই তাদের দিতে হবে, নয় অধিক পরিমাণে দিতে হবে—আস্থানুযায়ী যেটা সমীচীন বোধ হবে। কেননা অভাব মোচনই লক্ষ্য। (১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃ.)

৩. বিশেষভাবে কয়েকটি খাতে সমগ্র যাকাত সম্পদ ব্যয় করা জায়েয, যদি শরীয়াতসম্মত কল্যাণ দৃষ্টি এই বিশেষ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন প্রকাশ করে। ঠিক যেমন আটটি খাতের মধ্য থেকে মাত্র একটি খাতে ব্যয় করা কালে তার সমস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দেয় পরিমাণ সর্বতোভাবে সমান করা জরুরী নয়। বরং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে কম বেশি করা জায়েয। কেননা প্রয়োজনের মাত্রা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অনেক সময় তারতম্যপূর্ণ হতে পারে।

জরুরী কথা হচ্ছে, পরিমাণে কম-বেশি করা যাবে যদি তার কারণ থাকে, যদি তা করা কল্যাণকর হয়। ইচ্ছামত ও খাহেশ অনুপাতে তা করা যাবে না এবং তা করা যাবে অপরাপর খাত বা ব্যক্তিদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ ব্যতিরেকে।[১]

৪. যেসব খাতে যাকাত ব্যয় করা হবে তন্মধ্যে ফকীর ও মিসকীনই হতে হবে প্রথম পর্যায়ে গণ্য ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কেননা তাদের সচ্ছল বানানো ও যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োজন পূরণই হচ্ছে যাকাতের প্রথম লক্ষ্য। এমনকি রাসূলে করীম (স) হযরত মুয়ায (রা) বর্ণিত হাদীসে কেবল মাত্র এই একটি খাতেরই উল্লেখ করেছেন ঃ 'তাদের ধনীদের নিকট থেকে যাকাত নেয়া হবে এবং তাদের গরীব লোকদের মধ্যেই তা বন্টন করা হবে' এই বাণীতে। এটা এজন্যে যে, এই খাতটির গুরুত্ব অন্য কয়টির তুলনায় অধিক।

তাই সরকারের পক্ষে সেন্য সংগ্রহে যাকাত সম্পদ ব্যয় করার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না, যদি দরিদ্র মিসকীন প্রভৃতি দুর্বল লোকদের খাতসমূহ বঞ্চিত করে তাদেরকে ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা ও বিলুপ্তির হাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্বেষ তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করতে থাকে।

এ সবই যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ ও সাময়িক ক্ষেত্র হয়ে না দাঁড়াবে, ততক্ষণ তার চিকিৎসাকে দারিদ্র্য ও মিসকীন রোগের চিকিৎসার ওপর অগ্রবর্তিতা দেয়া যাবে।

৫.যাকাত সংস্থার কর্মচারীদের জন্যে 'কর' হিসেবে ও বন্টনস্বরূপ সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণে ইমাম শাফেয়ীর মতটি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন

---

১. এই পর্যায়ে উত্তম কথা পড়েছি شــرح الازهار ج ١ ص٥١٨ গ্রন্থে, তাতে বলা হয়েছে ঃ রাষ্ট্রপ্রধান (সরকার) কম বেশি করার এই কাজ করতে পারবে কেবল মাত্র তখন, যখন অপরাপর খাতের প্রতি কোনরূপ অবিচার করার মনোভাব না থাকে। যদি তা থাকে, তবে তা করা যাবে না। কেননা তা হচ্ছে সত্য বিরোধী ঝোঁক ও প্রবণতা, অবিচার। এই অবিচার এরূপ, যেমন একজন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পূরণেরও অধিক পরিমাণ দেয়া হল। আর অপর ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিমাণ থেকেও অনেক কম দেয়া হল। অথবা একজন ইবনুস সাবীলকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার পরিমাণ দেয়া হল আর অপর জনকে তার কম দেয়া হল। অথবা একজন ফকীরকে দেয়া হবে যা তার ও তার পরিবারবর্গের জন্যে যথেষ্ট। আর অপর জনকে তার তুলনায় অনেক কম। অথচ তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। এই পার্থক্যকারী যেন কারুর মন সন্তুষ্টকরণের কাজ করল। অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কোন কোন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে পরিমাণে বেশি দিতে পারে অন্যদের তুলনায় বহু কয়টি কারণে যেমন, যাকাত পাওয়ার অধিকারের কারণ। যেমন হয়তো কোন দরিদ্র ব্যক্তি মুজাহিদ। যাকাত সংস্থার কর্মচারী ও ঋণগ্রস্ত হবে। এরূপ ব্যক্তিকে বহু কয়টি কারণ একত্রিত হওয়ার দরুন অন্যদের তুলনায় বেশি দেয়া যেতে পারে।

লব্দ যাকাত সম্পদের এক-অষ্টমাংশ পরিমাণ। তাই তার বেশি হওয়া জায়েয নয়।' কেননা আরোপিত অধিকাংশ 'কর' ব্যবস্থা সম্পর্কে দোষারোপ করা হয় এই বলে যে, তার একটা বিরাট পরিমাণই ব্যয় হয়ে যায় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকর্মে। ফলে মূল ভাণ্ডারে অর্জিত সম্পদের খুব সামান্য অংশই সঞ্চিত থাকে। অর্জন ও সংগ্রহ ব্যয় বাবদ বহু অপচয়ের দরুন লব্ধ পরিমাণ সম্পদের অধিকাংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তাতে বড় বড় পদ সৃষ্টি করা হয় ও তার বাহাদুরী ও মর্যাদা রক্ষার্থে, অফিস সংক্রান্ত কায়দা-কানুন ও বাহ্যিক প্রকাশ ও দেখানো যে, জটিলতা সৃষ্টির প্রবণতার কারণে বিপুল ব্যয় অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। তাতে বহু জাঁকজমক দেখানো হয় ও বহু সম্পদ নিয়োজত হয়, আসলে তা পাওনাদারদের প্রাপ্য অংশ থেকেই নেয়া হয় নতুবা পাওয়ার যোগ্য লোকদের অংশের পরিমাণ আরও অনেক বড় হতে পারে।'

৬. যাকাত বাবদ সংগৃহীত সম্পদের পরিমাণ স্বল্প হলে—যেমন খুব বড় সম্পদশালী নয় এমন এক ব্যক্তির দেয়া যাকাত—কেবল একটি খাতেই তা নিয়োগ করা যাবে। নখয়ী ও আবূ সওর তা-ই বলেছেন। বরং তা এক ব্যক্তিকেই দিতে হবে, যেমন ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন। কেননা এই সামান্য পরিমাণ সম্পদ বহু কয়টি খাতে কিংবা একই খাতের বহু লোকের মধ্যে বন্টন করা হলে যাকাত থেকে যে ফায়দাটা পাওয়ার আশা, তা-ই ব্যাহত হয়ে পড়বে। পূর্বে 'ফকীর' ও 'মিসকীন' খাতে যাকাত দিয়ে সচ্ছল করে দেয়া পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর অগ্রাধিকার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেককে একটি-দুটি করে 'দিরহাম' বণ্টনের তুলনায় তা অনেক উত্তম। কেননা এই শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করা হলে কারুরই কোন উপকার হবে না, কারুর জন্য যথেষ্টও হবে না।

এই ব্যবস্থা তখনকার জন্যে যখন উপস্থিতির সংখ্যা কম হলেও খুব বেশি সাহায্যের প্রয়োজনসম্পন্ন লোক খুব বেশি হবে না। তা যদি হয়, তাহলে তা তখন সেই অনুপাতে বণ্টন করাই অধিক উত্তম হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

যেসব খাতে যাকাত ব্যয় করা হবে না

'যাকাত' একটি বিশেষ ধরন ও ভাবধারাসম্পন্ন 'কর' বিশেষ। তা ব্যক্তি ও সমষ্টির এবং মানব-বিশ্বের জীবন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ সম্মুখে রেখে তার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

তাই কোন ব্যক্তিরই তা পাওয়ার যোগ্য অধিকারী না হয়ে তা থেকে একবিন্দু গ্রহণ করার অধিকার থাকতে পারে না। ধন-মালের মালিক বা সরকার কর্তার পক্ষেও নিজ ইচ্ছেমত ও উপযুক্ত খাত তালাশ না করে তা ব্যয় করারও কোন অধিকার স্বীকৃত নয়।

এই কারণে ফিকাহবিদগণ শর্ত করেছেন যে, যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি সে সব পর্যায়ের লোক হতে পারবে না, যাদের জন্যে যাকাত হারাম হওয়ার অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে এবং যাকাত ব্যয়ের জন্যে তাদেরকে সহীহ ও উপযুক্ত খাতরূপে গণ্য করেনি।

যাদের জন্যে যাকাত গ্রহণ হারাম ঘোষিত হয়েছে, তারা মোটামুটি এই ঃ

১. ধনী সচ্ছল লোকেরা

২. শক্তিসম্পন্ন উপার্জনকারী লোক

৩. নাস্তিক, আল্লাহ-দ্রোহী, ইসলামের সাথে শত্রুতাকারী, বিরোধিতাকারী, প্রতিবন্ধকতাকারী লোক। সর্বসম্মতভাবে এই লোকেরা যাকাত পেতে পারে না। আর জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতে যিম্মিরাও যাকাত পাবে না।

৪. যাকাতদাতার সন্তানেরা, তার পিতামাতা এবং তার স্ত্রী (তার নিকট থেকে যাকাত নিতে পারবে না—অনুবাদক)। এ ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয় পাবে যদিও এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে এবং তা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ।

৫. নবী করীম (স)-এর ঘর-পরিবার বংশধর । বনু হাশেম গোত্রের লোকমাত্রই। অথবা বনু হাশেম ও বনুল মুত্তালিব। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলব।

প্রথম আলোচনা

ধনী—সচ্ছল লোকেরা

'ফকীর ও মিসকীন' পর্যায়ের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, 'ফকীর ও মিসকীন' খাতের জন্যে নির্দিষ্ট অংশের যাকাত কোন ধনী ব্যক্তিকে দেয়া যাবে না। এ বিষয়ে ইসলামের সকল ফিকাহ্‌বিদই সম্পূর্ণরূপে একমত। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ ধনীর পক্ষে যাকাত গ্রহণ হালাল নয়।[১] তিনি হযরত মুয়ায (রা)-কে বলেছিলেন ঃ 'যাকাত ধনীদের নিকট থেকে নেয়া হবে ও তাদের সমাজের গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে'।[২]

তাঁরা বলেছেন ঃ যাকাত ধনী লোকদের দেয়া হলে তা ফরয করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কেননা সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, তা দিয়ে গরীব লোকদের ধনী বানানো। কিন্তু ধনীদের তা দিলে এই উদ্দেশ্যটা পূরণ হতে পারে না।

এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণের পূর্ণ ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও 'ধনী' কাকে বলে—কোন ধনীকে যাকাত দেয়া নিষেধ এবং তা গ্রহণ করা কোন 'ধনী'র পক্ষে হারাম তা নির্ধারণে তাঁরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আর এ পর্যায়ের যাবতীয় কথাবার্তাও আমরা 'ফকীর-মিসকীন' খাতের বিশদ আলোচনায় উল্লেখ করেছি। তা আবার দেখে নেয়া যেতে পারে।

অন্যান্য খাতসমূহ সম্পর্কেও ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ 'ধনীকে যাকাত দেয়া যাবে না, যদিও সে 'ফী-সাবীলিল্লাহ' হয় কিংবা হয় ঋণগ্রস্ত পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করার দরুন। হযরত মুয়ায ও অপর হাদীসটি অনুযায়ী আমল করার জন্যে এই মত গ্রহণ করা হয়েছে।

তারা যাকাত সংস্থার কর্মচারী ছাড়া উক্ত নিষেধ থেকে আর কাউকে বাদ দেন নি। কেননা কর্মচারী যা নেবে তা তার কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ। 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুবুহুম'কেও বাদ দেয়া হয়েছে উক্ত নিষেধের আওতা থেকে। কিন্তু তাঁরা যেমন বলেছেন, ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভের দরুন এই খাতটিই বাতিল হয়ে গেছে।[৩]

অন্যান্য ইমাম মত দিয়েছেন ঃ যাকাত কেবল 'ফকীর' দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করাকে একমাত্র খাত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে হযরত মুয়ায সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিতে। কেননা যাকাত ফরয করার লক্ষ্যই হল 'গরীব জনগণকে সচ্ছল বানানো'।

---

১. ও ২. হাদীসদ্বয়ের উৎসের উল্লেখও তথায় করা হয়েছে।

৩. দেখুন ঃ فتح القدير على الهداية ج ٢ ص ٢١

যাকাত যদি 'ফকীর' ও 'মিসকীন' ছাড়া অন্য কাউকে না দেয়া যায় তাহলে সূরা তওবার আয়াতে এ দুটো খাতের উল্লেখের পর আরও ছয়টি খাতের উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না।

যাকাত-কর্মচারী ও 'ইবনুস্-সাবীল' নিজ দেশে ধনী হলেও এই নিষেধাজ্ঞা থেকে তাদেরকে মুক্ত মনে করা হয়েছে, তেমনি যোদ্ধাকে—যার জন্যে সরকারীভাবে কোন বেতন ধার্য করা হয়নি এবং পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার্থে ঋণগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিকেও তোমরা উক্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বাদ দিতে পার।

সত্যি কথা হচ্ছে, যাকাত ব্যয়ের খাত সংক্রান্ত আয়াতে পাওয়ার যোগ্য লোকদের দুটি গোষ্ঠীকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম গোষ্ঠী ঃ যেসব মুসলমান অভাবগ্রস্ত, আর তারা হচ্ছে ঃ

ফকীর, মিসকীন, ক্রীতদাস নিজেদের কাজের দরুন ঋণগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তি ও ইবনুস-সাবীল। এদেরকে যাকাত দেযা হবে তাদের অভাব ও মুখাপেক্ষিতার কারণে। তা পেয়েই তারা তাদের উপস্থিত প্রয়োজন মেটাতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক তারা, যাদের প্রতি মুসলমানরা মুখাপেক্ষী। তারা হচ্ছে, যাকাত সংস্থার কর্মচারী, মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম, অন্য লোকদের কল্যাণার্থে ঋণগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তি এবং ফী-সাবীলিল্লাহ্ অর্থাৎ জিহাদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। এই লোকদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, তারা দরিদ্র হোক, কি ধনী।

এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর হাদীস বিস্তারিত ও আলাদা আলাদা করে কথা বলেছে ঃ 'ধনীর জন্যে যাকাত জায়েয নয় পাঁচ জন লোক ছাড়া—আল্লাহ্র পথে যোদ্ধা, কিংবা যাকাতের কর্মচারী, কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি; অথবা এমন ব্যক্তির জন্যেও যে তা নিজের সম্পদ দ্বারা ক্রয় করেছে অথবা সেই ব্যক্তির জন্যও জায়েয, যার প্রতিবেশী মিসকীন লোক। 'সে মিসকীনকে সাদকাস্বরূপ দিল, মিসকীন তাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন স্বরূপ দিল'। ইমাম নববী বলেছেন ঃ এই হাদীসটি 'হাসান' বা সহীহ্। আবূ দাউদ দুটো সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। একটি সূত্র 'মুরসাল'। আর অপরটি ধারাবাহিক।[১]

ছোট বয়সের ধনী পুত্র পিতাকেও ধনী করে দেয়

'ধনী'র পক্ষে দারিদ্র্য অভাব-অনটনের কারণ যাকাত গ্রহণে হালাল নয়, কেননা মানুষ কখনও নিজেই ধনী থাকে, আবার কখনও অপর ব্যক্তির ধনী হওয়ার কারণে ধনী হয়ে যায়।

---

১. المجموع। গ্রন্থে (৬ খণ্ড, ২০৬ পৃ.) লিখেছেন ঃ উভয় সূত্রেই হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য। বায়হাকী হাদীসটির সবগুলো সূত্রকে একত্রিত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, মালিক ও ইবনে উয়াইনা দুজনই হাদীসটিকে 'মুরসাল' বলেছেন। আর মা'মর ও সওরী ধারাবাহিক সূত্র সমন্বিত বলেছেন। এরা দুজনই নির্ভরযোগ্য হাফেযে হাদীস পর্যায়ে গণ্য আর যে হাদীস 'মুরসাল' ও 'মুত্তাসিল' উভয় ধরনে বর্ণিত, সহীহ্ মতে তাকে 'মুত্তাসিল'—ধারাবাহিক সনদসম্পন্ন মনে করতে হবে।

ছোট বয়সের সন্তানকে ধনীই মনে করতে হবে, যদি তার পিতা ধনী হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে বড় বয়সের লোক যদি দরিদ্র হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা তার পিতার সচ্ছলতা তাকে ধনী বানিয়ে দেবে না—যদি তার যাবতীয় ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হয়। যেমন দরিদ্র মেয়ে, যার স্বামী নেই ও দরিদ্র পুত্র—উপার্জনে অক্ষম।[১]

দরিদ্র মেয়েলোক স্বামীর ধনাঢ্যতার দরুন ধনী গণ্য হতে পারে। কেননা জানা মতে ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে সে তো তার সাথেই সম্পৃক্ত। তার হিসাব-নিকাশ স্বামীর ওপর অর্পিত। স্বামীর দেয়া যথেষ্ট মাত্রার খরচ ব্যবস্থা তার জন্যে রয়েছে। কাজেই তাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না। কেননা কার্যত তো তা ধনী স্বামীকেই দেয়া হবে, যা জায়েয নয়।

ইমাম আবূ হানীফার দেয়া বাহ্যিক মতে ধনী ব্যক্তির স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েয করে, স্বামী তার জন্যে যাবতীয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে থাক আর না-ই থাক। ইমাম আবূ ইউসুফের মত হচ্ছে, তা জায়েয নয়। কেননা তার স্বামী ধনী ব্যক্তি, স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার যথেষ্ট মাত্রায় বহন তার কর্তব্য। তার মোটামুটি অবস্থা সচ্ছলতাপূর্ণ হোক কিংবা দারিদ্র্যের চাপে সংকীর্ণতাপূর্ণ। সেই স্ত্রীকে যাকাত দেয়া কার্যত ধনী অল্প বয়সী সন্তানকে দেয়ার মতই।[২] আর হানাফী আলিমগণ ধনী লোকের স্ত্রী ও তার সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এজন্যে যে, স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামী কর্তৃক বহন তো স্ত্রীর 'পারিশ্রমিক' স্বরূপ। ছোট বয়সের সন্তানের ব্যয়ভার বহন ওয়াজিব হওয়া তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কেননা সন্তান তো ধনী ব্যক্তির অংশ—ঔরসজাত। তার ব্যয়ভার বহন নিজের ব্যয়ভার বহনের মতই। কাজেই তাকে যাকাত দেয়া আসলে ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার মতই ব্যাপার।[৩]

শাফেয়ী মাযহাবের কোন কোন আলিম ধনী ব্যক্তির দরিদ্র স্ত্রীকে এবং তার দরিদ্র সন্তানদের যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন, স্বামী ও পিতার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও। অন্যরা এর বিরোধিতা করেছেন। এ পর্যায়ে বহু কয়টি মত রয়েছে।[৪]

তন্মধ্যে একটি মত হচ্ছে, সন্তান বা স্ত্রী কিংবা অন্য নিকটাত্মীয়—যার যার ব্যয়ভার বহন কোন ধনী ব্যক্তির দায়িত্বভুক্ত হবে, তার তার জন্যে যাকাত গ্রহণ হারাম। কেননা তার প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তো গৃহীত হয়েছে। আর এটাই তার জন্যে যথেষ্ট।[৫]

---

১. দেখুন : الهداية وفتح القدير ج ٢ ص ٢٣

২. ঐ, এবং شرح العناية على هاش الهداية

৩. شرح العناية على هاش الهداية ص ٢٤

৪. شرح العناية على هاش الهداية ص ٢٤

৫. المجموع ج ٦ ص ١٩١

মালিকী আলিমদের কথা হচ্ছে, যে ফকীর ব্যক্তির খরচ বহনের দায়িত্ব কোন ধনী ব্যক্তির ওপর অর্পিত, তার জন্যে যাকাত হারাম—কার্যত সে ব্যয়ভার বহন না করা হলেও। কেননা সে তা গ্রহণ করতে সক্ষম বিচার বিভাগের রায় বা আনুকূল্য নিয়ে। কিন্তু সেই ধনী ব্যক্তির ওপর দাবির মামলা যদি দায়ের না হতে পারে কিংবা তার ওপর রায় কার্যকর করা যদি কঠিন বা অসম্ভব হয়, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা হবে।[১]

আমি পূর্বে যা বলেছি, আমার মতে সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তা হচ্ছে, ছোট বয়সের সন্তান ও স্ত্রী পিতা ও স্বামীর ধনাঢ্যতার দরুন 'ধনী' গণ্য হবে। কেননা সন্তান পিতার সাথে ও স্ত্রী স্বামীর সাথে এতই একাত্ম যে, তা কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই দুজনের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পালন ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ উভয় দলিলেই। এরা দুজনই এমন যে, তাদের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণের দায়িত্ব স্থায়ী বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্যভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব এ দুজনকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় এবং এ দুজনের পক্ষে তা গ্রহণ করাও হালাল নয়। তবে অন্যান্য সব নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারটা এরূপ নয়। সরকারই তাদের জন্যে যাকাত বা অন্যান্য সরকারী আয়ের ফাণ্ড থেকে যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পালন করবে এবং তাদেরকে তাদের নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন থেকে মুক্ত করে দেবে। মুসলিম ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের যাকাত থেকেও এমন পরিমাণ দেয়া জায়েয হবে যদ্দারা প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা অপূরণ থাকা প্রয়োজনগুলো পূরণের ব্যবস্থা করবে। অথবা সে ব্যয়ভার বহন থেকে সম্পূর্ণ মাত্রায় মুখাপেক্ষীহীন বানিয়ে দেবে। এ কথা সত্য তাঁদের মত অনুযায়ীও, যাঁরা বলেন যে, ফকীর ও মিসকীনকে সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে।[২]

নিকটাত্মীয় নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করবে, এ পর্যায়ের এটা হচ্ছে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক পর্যালোচনার ব্যাপার।

---

১. দেখুন ঃ شرح الخرشى على خليل ج ٢ ص ٢١٤

২. পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা ঃ 'ফকীর-মিসকীনকে কত পরিমাণ যাকাত দেয়া হবে' দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় আলোচনা

উপার্জনশীল শক্তিসম্পন্ন লোক

হাদীসসমূহে ধনী লোকদের জন্যে যাকাত হারাম হওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে শক্তিমান ভারসাম্যপূর্ণ দেহাঙ্গের অধিকারী ব্যক্তির ওপর যাকাত হারাম হওয়ার কথা। কেননা তার দেহ সর্বপ্রকার পঙ্গুত্ব ও অক্ষমতামুক্ত। এই শক্তিমান ব্যক্তির ওপর যাকাত হারাম করা হয়েছে এজন্যে যে, এই ব্যক্তি কাজ করবে, নিজের প্রয়োজন নিজেই যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ করবে, বেকার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে না ও দান-সাদকা পাওয়ার ওপরও নির্ভরশীল হবে না, এটাই তো কাম্য। তবে লোকটি যদি স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়, কিন্তু উপার্জনের সুযোগ বা কাজ না পায়, তাহলে সে 'মা'যুর' বটে; যাকাত দিয়ে তার সাহায্য করাই বাঞ্ছনীয়—এটা তার অধিকারও, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উপযুক্ত কোন কাজ না পাবে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَاحَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَالِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ -

ধনী ও শক্তিমান উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্যে যাকাতের কোন অংশ থাকতে পারে না।

'ফকীর' 'মিসকীন' পর্যায়ের আলোচনায় এই কথাটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

হানাফী আলিমগণ এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ নিসাব-পরিমাণের কম সম্পদের মালিককে—সে সুস্বাস্থ্যবান উপার্জনশীল হলেও—যাকাত দেয়া জায়েয হবে। কেননা সে তো 'ফকীর'। আর 'ফকীর' হল যাকাতের একটা নির্দিষ্ট ব্যয়ক্ষেত্র। তা ছাড়া প্রকৃত প্রয়োজনটা তার দ্বারা পূরণ হতে পারছে না। তাই তার দলিলের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নিসাব-পরিমাণ সম্পদের অনুপস্থিতিই যাকাত পাওয়ার অধিকার সৃষ্টি করে। ইবনুল হুমাম বলেছেন ঃ 'অনেকের মতেই উপার্জনশীল লোকদের পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়।' দলিলটা হচ্ছে উপরে উদ্ধৃত সেই হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন, 'ধনী ও সুস্থ দেহধারী ব্যক্তির জন্যে যাকাত হালাল নয়। আর যে দুজন লোক তার নিকট যাকাত চেয়েছিল, তিনি তাদেরকে মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, 'আসলে তো তোমাদের দুজনের কোন অধিকার নেই যাকাত পাওয়ার। তা সত্ত্বেও তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেব।' এর জবাবস্বরূপ বলেছেন, দ্বিতীয় হাদীসটি প্রমাণ করছে ঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে, তাদের দুজনের চাওয়াটাই হারাম। কেননা নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

'তোমরা দুজনে চাইলে আমি তোমাদের দেব।' গ্রহণ করা হারাম হলে এরূপ বলতেন না।[১]

পূর্বেও এ হাদীসটি উদ্ধৃত এবং আলোচিত হয়েছে। তাতে আছে, 'তোমরা দুজনে চাইলে আমি তোমাদের দুজনকে দেব' আর 'এতে ধনী ও শক্তিমান উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্যে কোন অংশ নেই'। তাদেরকে একথা বলেছিলেন এজন্যে যে, তাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁর জানা ছিল না। আর সব স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিই তো আর উপার্জনশীল হয় না, যা তার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। এ কারণে তাদের দিয়েছেন বটে; কিন্তু সেই সাথে তাদের নসীহতও করেছেন, নির্ভুল পথও দেখিয়েছেন এই বলে যে, ধনী ও উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্যে যাকাতে কোন অংশ নেই।

এটা ইমাম আবূ উবাইদের পসন্দ করা মত। কেননা নবী করীম (স) ধনাঢ্যতা ও উপার্জন ক্ষমতার ভিত্তিস্বরূপ ঘোষণা করেছেন, যদিও সব শক্তিমান ব্যক্তিই ধনশালী হয় না। এক্ষণে তারা দুজনেই সমান। তবে এই শক্তিমান ব্যক্তি যদি পেশা গ্রহণ সত্ত্বেও—রিযিক সন্ধান করেও তা পায় না বলে—রিযিক থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, সে তার পরিবারবর্গের জন্যে উপার্জনে প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও চাহিদা তাকে অক্ষম করে রেখেছে। অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে তখন মুসলিম জনগণের ধন-মালে তার হক্ ও হিসসা রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

তাদের ধন-মালে তাদের জন্যে হক অংশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই আয়াত পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ المحروم। হচ্ছে, যারা উপার্জনের পেশা গ্রহণকারী লোক হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করতে পারছে না।[২]

---

১. দেখুন ঃ الهداية وفتح القدير ج ٢ ص ٢٨

২. الاموال – ৫৫৭

তৃতীয় আলোচনা

অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যায় কি

নাস্তিক, দ্বীন-ত্যাগকারী ও ইসলামের সাথে যুদ্ধকারীকে যাকাত দেয়া যাবে না

মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, কাফির, মুসলিমদের সাথে যুধ্যমান লোকদের যাকাতের একবিন্দুও দেয়া যাবে না।[১]

এই ইজমা (ঐকমত্যের) প্রমাণ ও ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوكُمْ فِيْ الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْاهُمْ ج وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ -

তোমাদেরকে সে সব লোকের সাথে যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। যারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই জালিম।

আরও এজন্য যে, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ওরা প্রকৃত সত্যের দুশমন, সত্যের ধারকদের শত্রু। তাদের প্রতি যে সাহায্যই করা হবে, তা-ই খঞ্জর হয়ে দ্বীনকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। তার দ্বারা মুসলমানদের হত্যা করবে। আর নিজেকে হত্যা করা ও তাদের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ করার জন্যে কাউকে নিজেদের ধন-মাল দেয়া, না ধর্মের কথা হতে পারে, না এটা বিবেকসম্মত হতে পারে।

মুলহিদ—নাস্তিকের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। সে তো আল্লাহ্কেই অস্বীকার করে। নবুয়ত ও পরকালকে করে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো তার স্বাভাবিক প্রবণতা হবে। অতএব এই দ্বীনের ধন-মাল তাকে কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না।

অনুরূপভাবে ইসলাম থেকে মুর্তাদ—দ্বীন ত্যাগকারী হয়ে বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকেও যাকাত দেয়া যেতে পারে না। কেননা সে তো ইসলামের মধ্যে ছিল, পরে সে বের হয়ে গেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ব্যক্তি বেঁচে থাকারই অধিকারী নয়। সে দ্বীন

---

১. এই ইজমা'র কথা البحر الزخار গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্যাগ করে মহাঅপরাধ করেছে। মুসলিম সমাজকেও সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এজন্যেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَــنْ بَــدَّلَ دِيْنَهُ فَـاقْـتُـلُوْهُ -

যে লোক দ্বীন ত্যাগ করেছে তাকে তোমরা হত্যা কর।

যিম্মীদের যাকাত দেয়া

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যারা আহ্‌লি কিতাব আর যারা অনুরূপ কোন ধর্মে বিশ্বাসী-অনুসারী—যারা মুসলিম সমাজের মধ্যে বসবাস করছে, যারা মুসলমানদের দায়িত্বাধীন হয়ে গেছে, মুসলমানদের রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছে, ইসলামের দেশীয় আইন বিধান (Law of the land) তাদের ওপর জারি করার অনুমতি দিয়েছে ও এই সূত্রেই দারুল-ইসলামের অধীনতা অর্জন করেছে অথবা অনুরূপ 'নাগরিকত্ব' (Citizenship) লাভ করেছে, তাদের জন্যে যাকাত সাদকা ব্যয় করার ব্যাপারে বহু মতবিরোধ রয়েছে, তা বহু দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। এখানে তা তুলে ধরছি।

'নফল সাদকা' দান

মুসলমানদের নফল দান-খয়রাত অমুসলিমদের দেয়ায় কোনই নিষেধ নেই, দোষ নেই। এটা মানবতা ও মানবিকতার দৃষ্টিতেও যুক্তিসঙ্গত। মুসলমানদের সাথে তাদের যে চুক্তি রয়েছে, তার মর্যাদাটাও এতে করে রক্ষা পেতে পারে। ইসলামের প্রতি তাদের অবিশ্বাস-অস্বীকৃতি كفر তাদের প্রতি মুসলমানদের সদ্ব্যবহার ও দয়া-সহানুভূতি প্রদর্শনে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তবে তা ততদিন পর্যন্ত, যতদিন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুধ্যমান হবে না। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

لاَيَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْآ اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

আল্লাহ্ তোমাদিগকে সেই লোকদের ব্যাপারে নিষেধ করছেন না যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি—এ দিক দিয়ে যে, তোমরা তাদের প্রতি ভাল কল্যাণমূলক আচরণ করবে ও তাদের প্রতি সুবিচার করবে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[১]

মুসলমানরা যখন তাদের মুশরিক নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভাল ও শুভ আচরণ গ্রহণ করার ব্যাপারে কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন, তখন এই কুণ্ঠা রদ করার উদ্দেশ্যেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। এর পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানরা তাদের বংশের ও আত্মীয় মুশরিক লোকদেরকে

---

১. الممتحنه - ٨

দান-সাদকা দেয়াটা অপসন্দ করছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা রাসূলে করীম (স)-কে প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি তাঁদের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল।[১]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَـآءُ ط وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَـآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ -

হে নবী! তাদের হেদায়েত করে দেয়ার দায়িত্ব তোমার নয়, আসলে হেদায়েত আল্লাহ্ই করেন যাকে চান। আর তোমরা যে মাল ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যে আর তোমরা যা কিছু খরচ কর তা কর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এভাবে তোমরা যা ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তা তোমাদের প্রতিই পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবেন। আর তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।[২]

'তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা কর কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে'—এই আয়াতাংশের তাৎপর্যস্বরূপ ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ 'সাদকা দানকারী যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে তা হলে তাতেই তার শুভ ফল আল্লাহ্ দেবেন; কিন্তু তা কে পেল, সে নেককার পরহেজগার ব্যক্তি, না পাপী, সে তা পাওয়ার যোগ্য কি অযোগ্য—এ ব্যাপারে তার ওপর কোন দায়িত্ব নেই। সে তার নিয়ত অনুযায়ীই সওয়াব পেয়ে যাবে। আয়াতের অপর অংশ তার দলিল, যাতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যে মালই খরচ কর, তা তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।'[৩]

তার বান্দাদের মধ্যে যারা নেককার, ভালো আচরণকারী, তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন এই বলে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا-

তারা তার-ই ভালবাসাস্বরূপ মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাবার খাওয়ায়।[৪]

এই সময়কার বন্দী ছিল মুশরিক লোকেরা। হাসান প্রমুখ থেকে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।[৫]

'সাদকায়ে ফিতর' থেকে দেয়া

নফল সাদকার মতই—কাছাকাছির-ই 'সাদকায়ে ফিত্র' কাফফারা দেয়া ও মানত পুরা করা ইত্যাদি। ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মাদ ও আর কয়েকজন ফিকাহবিদ উক্ত দানসমূহ 'যিম্মী'দের দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা দলিল এই সাধারণ অনুমতির ধারক। যেমন আল্লাহ্ সাদকাত পর্যায়ে বলেছেন ঃ

---

১. تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٤٩ ط الحلبى
২. البقره -٢٧٢
৩. ابن كثير ج ١ ص ٣٢٤
৪. الدهر -٨
৫. দেখুন ঃ البدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَات فَنعِمَّاهِىَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ - فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُعَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ -

তোমরা যদি সাদকা প্রকাশ্যভাবে দাও, তা-ও উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং তা দাও 'ফকীর'দের তাহলে তাও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তা তোমাদের থেকে তোমাদের খারাপগুলো দূর করে দেবে।[১]

এ আয়াতে 'ফকীর' দরিদ্রদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নি। আর 'কাফ্ফারা' পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَكَفَّا رَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ -

তাহলে তার কাফ্ফারা হবে দশজন মিসকীন খাওয়ানো—তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে যে মধ্যম মানের খাবার দাও সেই রূপ খাবার।[২]

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا -

তারপরে যারা সমর্থ হবে না, তার জন্যে ষাটজন মিসকীন খাওয়ানোই হল কাফ্ফারা।[৩]

এ সব আয়াতে মিসকীনের মধ্যে কোন পার্থক্য বা তারতম্য করা হয়নি। বিশেষ করে এজন্যে যে, এ কাজটি হল তাদের প্রতি কল্যাণ পৌঁছানো। আর এ কাজ থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়নি।

তা সত্ত্বেও তাঁরা বলেছেন, এ সব জিনিস মুসলিম সমাজের ফকীর মিসকীনদের দেয়া অতীব উত্তম কাজ, কোন সন্দেহ নেই। কেননা মুসলিমকে সাহায্য করা হবে আল্লাহ্র বন্দেগীর কাজে।

ইমাম আবূ হানীফা শর্ত করেছেন, সে অমুসলিম যেন মুসলমানদের দুশমন ও তাদের বিরুদ্ধে যুধ্যমান না হয়। কেননা সেরূপ ব্যক্তিকে সাহায্য দিলে তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। আর তা কখনই জায়েয হতে পারে না।[৪]

আবূ উবাইদ ও ইবনে আবূ শায়বা কোন কোন তাবেয়ী থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ তাঁরা পাদ্রী-পুরোহিতদের সাদকায়ে ফিতরের অংশ দিতেন।[৫]

---

১. البقرة – ٢٧ ২. المائده – ٨٩

৩. المجادله – ٤

৪. দেখুন ঃ بدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩

৫. দেখুন ঃ المجموع للسنوى ج ٦ ص ٢٢٨ যে ইজমা'র কথা বলা হয়েছে, আসলে তা মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম সম্পর্কে।

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে মালের যাকাত অমুসলিমকে দেয়া জায়েয নয়

কিন্তু মালের যাকাত—ওশর ও অর্ধ-ওশর দেয়ার ব্যাপারে আলিম সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই মত দিয়েছেন ঃ কোন অমুসিলমকে তা দেয়া জায়েয নয়। এমন কি, ইবনুল মুনযির বলেছেন, এই মতের ওপর উম্মতের 'ইজ্‌মা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, যিম্মীকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। তবে সাদ্‌কায়ে ফিতর-এর ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১]

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ এ পর্যায়ে যে দলিল পেশ করেছেন, তার মধ্যে অধিক শক্তিশালী দলিল হচ্ছে হযরত মুয়ায বর্ণিত হাদীস ঃ

اِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُمِنْ اَغْنِيَا ئِهِمْ وَتَرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ -

আল্লাহ তা'আলা তাদের ধন-মালে তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন তা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেয়া হবে এবং তাদেরই গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

এ হাদীসে যাদের—অর্থাৎ যে সমাজেরই ধনী লোকদের নিকট থেকে যাকাত নেয়া হবে, তাদেরই—অর্থাৎ সেই সমাজেরই গরীবদের মধ্যে তা বণ্টন করতে হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তারা (যাকাতদাতাগণ) হচ্ছে সব মুসলিম। অতএব তাদের ছাড়া অমুসলিম গরীবদের যাকাত দেয়া জায়েয হতে পারে না।

'ইজ্‌মা' হওয়ার দাবির পর্যালোচনা

কিন্তু ইবনুল মুনযির যে ইজমার দাবি করেছেন, তা এখানে অগ্রহণযোগ্য। অন্যরা ইবনে সিরীন ও জুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজন কাফিরদের যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন।[২]

সারাখ্‌সী 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবূ হানীফার সঙ্গী ইমাম জুফর যিম্মীকে যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন। সারাখ্‌সী বলেছেন, এটা কিয়াস মাত্র। কেননা ফকীর—অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা লাভের পথে ধনী বানিয়ে দেয়াই লক্ষ্য। আর তা এখানে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু মুয়ায বর্ণিত হাদীসের দালিল দ্বারা জুফার-এর কথার প্রতিবাদ করেছেন।[৩]

ইবনে আবূ শায়বা হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে সাদকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তা কাকে দেয়া হবে। তিনি বললেন ঃ

---

১. দেখুন ঃ المجموع للسنوى ج ٦ ص ٢٢٨। যে ইজমা'র কথা বলা হয়েছে, আসলে তা মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম সম্পর্কে।

২. المجموع للسنوى ج ٦ ص ٢٢٨ ৩. দেখুন ঃ المبسوط ج ٢ ص ٢.٢।

তোমাদের মিল্লাতের মধ্যকার মুসলিম ও যিম্মিগণকে দেবে। আরও বলেছেন, নবী করীম (স) যিম্মীদের মধ্যে সাদকা ও লব্ধ এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করে দিতেন।[১]

বাহ্যত প্রশ্নটি থেকে বোঝা যায় যে, তা ছিল ফরয সাদকা অর্থাৎ যাকাত সম্পর্কে। অবশ্য সেই সাথে নফল সাদকার বিষয়েও হতে পারে। এতদসত্ত্বেও নবী করীম (স)-এর নিকট জমা করা হত ও তা থেকে যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টন করা হত যেসব সাদ্কাত তা প্রধানত যাকাত সম্পদই। কিন্তু এ হাদীসটি মুরসাল।

ইবনে আবূ শায়বা তার সনদে হযরত উমর থেকে যাকাতের আয়াত[২] সম্পর্কে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, এরা হচ্ছে সমকালীন আহলি কিতাব।[৩]

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা ইমাম ইউসুফ উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রা) একজন বৃদ্ধ ইয়াহুদীর জন্যে মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাহায্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর দলিল ছিল কুরআনের আয়াত ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ -

এই মিসকীনরা আহলি কিতাব থেকে।[৪]

'রওজুননজীর' গ্রন্থ[৫] প্রণেতা ইবনে আবূ শায়বার হযরত উমর সম্পর্কিত বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন ঃ 'এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, হযরত উমর (রা) আহলি কিতাব লোকদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয মনে করতেন।' 'আল-মানার' তাফসীর লেখক জায়দীয়া থেকে অনুরূপ কথাই উদ্ধৃত করেছেন। এবং البحر الذخار।[৬] গ্রন্থে জুহ্রী ও ইবনে সিরীন থেকে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। বলেছেন ঃ আয়াতে 'আল-ফুকারা' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক ও নির্বিশেষ এটাই তাদের দলিল।

তাবারী[৭] ইকরামা থেকে উক্ত আয়াত পর্যায়ে এই মত উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ফকীরদেরকে এই মিসকীন মনে করো না। এরা হচ্ছে আহলি কিতাবের মিসকীন।[৮]

---

১. مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٤٠. ২. সূরা তওবা - ৬০ আয়াত

৩. مصنف ابن ابى شيبه ج ٣ ص ٤٠.

৪. দেখুন ঃ كتاب الخراج ص ١٢٦ طالسلفيه ثانيه বালাযুরী ইতিহাস গ্রন্থে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন (১৭৭ পৃ.)। উমর ইবনুল খাত্তাব দামেশকের আল-জাবীয়া নামক স্থানে খৃস্টান কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকদের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের জন্য সাদকাত ও খাদ্য যোগাড় করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এই সাদকাত বলতে বাহ্যত ফরয যাকাতই মনে করা যায়। কেননা তা-ই কেবল রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন হয়। তা হলেই তা থেকে খাদ্য ব্যবস্থা করা চলে।

৫. দ্বিতীয় খণ্ড. ৪২৬ পৃ. ৬. البحر الذخارج ٢ ص ١٨٥

৭. تفسير الطبرى بتحقيق محمود شاكرج ١٤ ص ٣٠٨

৮. আবূ জুহ্রা, আবদুর রহমান হাসান ও খাল্লাফ এই তাফসীর পর্যায়ে মত প্রকাশ করেছেন ঃ তিনি বলেন যে, উক্ত আয়াতে মিসকীন বলতে আহলি কিতাবের মিসকীন বোঝানো হয়েছে, তিনি দুটি কায়দা করে দিচ্ছেন। একটি হচ্ছে, ফকীর ও মিসকীন দুটি পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী। আয়াতে একটির উল্লেখ করা হলে অপরটির উল্লেখ আপনা আপনি হয়ে যেত না আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যিম্মীদের মধ্যে যারা মিসকীন তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয হয়ে যায় এই শর্তে যে, তারা নিঃশর্তে উপার্জনে

এই পর্যায়ে কেউ কেউ যিম্মীকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, যাকাতদাতা যদি যাকাত গ্রহণকারী মুসলমান না পায়, তবেই তা জায়েয হবে। আল জাসসাস উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান থেকে তা-ই বর্ণনা করেছেন।[১] আবাদীয়া গোষ্ঠীর কোন কোন লোকেরও এই কথা।[২]

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

আমরা বলব, জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ তাদের মতের সমর্থনে যে অধিক শক্তিশালী দলিলের উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে হযরত মুয়াযের হাদীস। হাদীসটি যে সহীহ্, সে বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যে কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন, তা অকাট্য নয়। হাদীসটি এই সম্ভাবনা তুলে ধরে যে, প্রতিটি অঞ্চলের ধনী লোকদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং তা তাদেরই ফকীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এরা সকলে অঞ্চল স্বাদেশিকতা ও প্রতিবেশীর বিচারে সেই ধনী লোকদেরই দরিদ্র জনগণ গণ্য হবে। এখান থেকেই তাঁরা এ হাদীসকে দলিলরূপে পেশ করেছেন এ কথা প্রমাণের জন্যে যে, এক শহর বা অঞ্চলের যাকাত সেখান থেকে অন্য শহর বা অঞ্চলে তুলে নেয়া জায়েয নয়।

সাদকায়ে ফিতর ও অনুরূপ অন্যান্য সাদকা ব্যয় করা জায়েয হওয়ার পক্ষে হানাফী আলিমগণ যেসব দলিলের উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে সেই সব আয়াতের নিঃশর্ত তাৎপর্যও রয়েছে, যাতে ফকীর লোকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়নি। সে দৃষ্টিতে সব মিসকীনই সম্পূর্ণ সমান ও অভিন্ন। হযরত উমর, জুহ্‌রী, ইবনে সিরীন, ইকরামা, জাবির ইবনে জায়দ ও জুফার থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, উক্ত দলিল তারও সাক্ষী। সূরা আল-মুমতাহিনা'র আয়াত বলছে ঃ

'যেসব লোক তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছেন না।' তাঁরা বলেছেন ঃ 'এই আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ যিম্মীদের প্রতি যাকাত ব্যয় করার জায়েয হওয়ার দাবি করে। কেননা যাকাত দেয়াটা তাদের প্রতি একটা ভালো ব্যবহারই বটে, যদিও মুয়াযের হাদীস থেকে তা প্রমাণিত হয় না।[৩]

অথচ আমাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুয়ায বর্ণিত হাদীসটি অপর দলিলের নিঃশর্ততা ও সাধারণত্বের পরিপন্থী নয়। আর হযরত উমর انما الصدقات

অক্ষম হলেই তা পাবে। কেননা সক্ষম যিম্মীদের নিকট থেকে তো জিযিয়া আদায় করা হবে। আর তাদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হবে আর যাকাতও তাদের দেয়া হবে, এটা বোধগম্য নয়। দেখুন ঃ الدراسات الاجتماعيه ص ٢٥٢

১. احكام القران ج٢ ص ٣١٥ طالاستانه

২. شرح النيل ج ٢ ص ١٣٣

৩. দেখুন ঃ البدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩

আয়াতের তাৎপর্যে মনে করেছেন যে, এর মধ্যে মুসলিম অমুসলিম উভয়ই সমানভাবে শামিল রয়েছে।

দলিলসমূহের পারস্পরিক তুলনা থেকে আমার মনে হচ্ছে, যাকাতের ব্যাপারে আসল কথা হল, তা প্রথমত কেবল মুসলিম ফকীর-মিসকীনকেই দিতে হবে। কেননা তা বিশেষভাবে মুসলিম ধনী লোকদের ওপরই ধার্য করা ফরয বিশেষ। কিন্তু যাকাত সম্পদে প্রশস্ততা ও বিপুলতা থাকলে এবং মুসলিম ফকীরদের কোন ক্ষতি না হলে যিম্মী ফকীরকে দিতে নিষেধ বা বাধা কিছু নেই। এ ব্যাপারে আয়াতটির সাধারণ ও নিঃশর্ত তাৎপর্যই আমাদের জন্যে যথেষ্ট দলিল। হযরত উমরের আমল (বাস্তব কাজ) কম দলিল নয়। এ ছাড়া রয়েছে ফিকাহবিদদের রায় ও অভিমত। বস্তুত এই ধরনের একটা উচ্চতর বদান্যতা ও মহানুভবতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই উপস্থাপিত বা প্রবর্তিত করতে পারেনি।

উপরিউক্ত কথা এখানকার জন্যে, যখন দেয়া হবে দারিদ্র্য ও অভাব বা প্রয়োজনের নামে। কিন্তু যদি মনস্তুষ্টি সাধনকল্পে تاليف قلوب তার নিকট ইসলামকে প্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, দেয়া হয় তার সাহায্য করে মুসলমানদের সাথে ও তাদের রাষ্ট্রের সাথে মনের আকর্ষণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সনতের অকাট্য দলিল দ্বারা আগেই আমরা তা জায়েয হওয়ার মতকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি, আর এই অংশটি যে, চিরদিন থাকবে, সে কথাও বলেছি। যদিও আমরা বলেছি যে 'মনস্তুষ্টিকরণ' ও 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে যাকাত ব্যয় করার কাজটি আসলে ইসলামী সরকারের করণীয় নয়, ব্যক্তিমনের নয়। অবশ্য ইসলামী সংস্থাসমূহ এই রাষ্ট্র সরকারের বিকল্প হতে পারে।

এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া আবশ্যক। তা হচ্ছে, যারা বলেছেন, যিম্মীদের যাকাতের সম্পদ দেয়া যাবে না, তার অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে অনশন ও বস্ত্রহীনতার মধ্যে রেখে তিল তিল করে মরতে দেয়া হবে। কখখনই নয়। তাদেরকে বায়তুলমালের অপরাপর আয়—যেমন 'ফাই', গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ, খনিজ সম্পদ ও খারাজ প্রভৃতি—থেকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। আবূ উবাইদ তাঁর الاموال গ্রন্থে উমর ইবনে আবদুল আজিজের তাঁর বাওরা'র ওপর নিযুক্ত প্রশাসককে লিখিত ফরমানের উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ 'তোমার নিজের দিক থেকে যিম্মীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর; যাদের বয়স বেশি হয়ে গেছে, শক্তিহীন বা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের কামাই-রোজগার সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এরূপ লোকদের জন্যে মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাহায্য চালু কর।'[১] সত্য কথা এই যে, তিনি যিম্মীদেরকে সাহায্য চাওয়া অপেক্ষায় রাখাও পসন্দ করেন নি। বরং খলীফাতুল মুসলমীন নিজেই আঞ্চলিক প্রশাসককে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাদের দাবি-দাওয়া জানবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করা যায়। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের সুবিচার।

---

১. الاموال ص – ٤٦

ফাসিক ব্যক্তিকে কি যাকাত দেয়া যাবে

ফাসিক সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আসল ইসলামের ওপর অবিচল থাকবে, যতক্ষণ তার অবস্থার সংশোধনের জন্যে চেষ্টা চলতে থাকবে, ততক্ষণ তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে। তার মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই এর লক্ষ্য। আর যেহেতু এরূপ ব্যক্তির নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, তাই তাদের দেয়াও যাবে। ফলে 'ধনী লোকদের নিকট থেকে তা নেয়া হবে ও তাদেরই গরীব লোকদের মধ্য তা বণ্টন করা হবে'—হাদীসে এই সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।[১] তবে তা দেয়া যাবে ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের ফিসক-ফুজুরী ও আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে এই যাকাতের অর্থ তারা ব্যয় করবে না বলে মনে করা হবে। সে যেন এই টাকা দিয়ে মদ্য ক্রয় করতে না পারে কিংবা তা দিয়ে খারাপ বা হারাম খায়েশ পূরণ করতে না পারে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র মাল দিয়ে তো আর আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে সহায়তা-সহযোগিতা করা যায় না। সাধারণ ধারণাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করতে হবে। এ কারণে মালিকী মাযহাবের কোন কোন আলিম বলেছেন, পাপী-গুনাহগার লোকদের যাকাত দেয়া যাবে না যদি মনে করা হয় যে, তারা তা এ সব পাপ কাজে ব্যয় করবে। অন্যথায় তাদের তা দেয়া জায়েয হবে।[২]

জায়দীয়াদের মতে ফাসিক ধনী ব্যক্তির ন্যায়, তার জন্যে যাকাত জায়েয নয়, তাকে দিলে যাকাত আদায় হবে না। হ্যাঁ, তবে সে যদি যাকাত সংস্থার কর্মচারী হয় কিংবা 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'-এর কেউ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।[৩]

আমার মতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য মত হচ্ছে, ফাসিক ব্যক্তি যদি তার ফিসক-ফুজুরী দ্বারা মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ না করে তাহলে তাকে যাকাত দেয়ায় কোন দোষ নেই। যদিও নেককার ও দৃঢ় আদর্শবাদী চরিত্রবান লোকই হচ্ছে যাকাত পাওয়ার ইজমাসম্মত উপযুক্ত ও উত্তম লোক। কিন্তু যে ফাজের—গুনাহগার ব্যক্তি ধৃষ্টতা দেখায় তার সর্ববিধ পাপ কাজ নিয়ে অহমিকা বোধ করে—নির্ভীকভাবে ফাসিকী কাজ করতে থাকে, তাহলে তার অহংকারী মনোভাব নির্মূল না হওয়া ও তওবা না করা পর্যন্ত তাকে যাকাতের টাকা বা সম্পদ দেয়া যেতে পারে না। কেননা ঈমানের শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য রজ্জু হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা আল্লাহ্‌রই জন্যে অসন্তোষ।[৪]

---

১. দেখুন : البحر الذخارج ٢ص ١٨٢

২. দেখুন : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٦ ص ٤٩٢ এই মত জাফরী মায্‌হাবের সাথে সংগতিসম্পন্ন। যেমন ইমাম জাফরের ফিকাহতে উদ্ধৃত হয়েছে ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃ. এবং আবাজীয়া ফিকাহায়ও তাই রয়েছে, كمافى النيل وشرحه ج ٢ ص ١٣١

৩. شرح الازهارج ١ص ٥٢٠.

৪. একটি হাদীসের তরজমা, যা ইমাম আহ্‌মাদ, ইবনে আবূ শায়বা ও বায়হাকী তার শুয়ুবুক ঈমানে উদ্ধৃত করেছেন। সয়ূতী হাদীসটি সহীহ বলে ইঙ্গিত করেছেন তার الجامع الصغير গ্রন্থে।

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُؤْ مِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَـاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণ পরস্পরের বন্ধু—পৃষ্ঠপোষক। তারা ভাল ও সৎকাজের আদেশ করে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ করে।[১]

এই আয়াতের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে, মুসলিম সমাজ কোন ফাসিক ব্যক্তির দিকে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে না—এরূপ অবস্থায় যে, সে তার নাফরমানীর কাজে গভীরভাবে মগ্ন রয়েছে এবং তার গুনাহের দ্বারা সে পরস্পরের প্রতি লানত করছে; তার সাধারণ চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করছে। তাই বলে এটা গুনাহগার ও ফাসিক লোকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন, এমন কথা বলার কোন যুক্তি নেই। মুসলিম সমাজের মধ্য থেকেও তাদের ক্ষুধা-কাতর হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া হবে, এমন অপবাদেরও যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। ইসলাম তো আসলেই বিশাল উদারতা, দয়া-সহানুভূতি এবং ক্ষমা-সহিষ্ণুতা নিয়ে এসেছে।

ক্ষমা-সহিষ্ণুতা ব্যক্তিগত দোষ ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যে লোক গোটা সমাজকেই কলুষিত ও পাপপ্রবণ বানিয়ে দিচ্ছে, দ্বীন ও দ্বীনদার লোকের লাঞ্ছিত করছে, তাকে ক্ষমা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাকে ক্ষমা করার ক্ষমতাও নেই কারোর। যে লোক নিজের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, সেই অন্যের নিকট থেকে দয়া পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। তবে তওবা করলে ভিন্ন কথা। আর তা না করে যদি ক্রমাগতভাবে পাপ করতেই থাকে, শয়তানের আনুগত্য করায় সে পৌনপৌনিকতা বজায় রেখে চলে—গুমরাহীর পথে চলতেই থাকে, সমাজ ও তার মূল্যমান, তার আদর্শের প্রতি বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখাতেই থাকে, তাহলে সে না খেয়ে মরলেও কোন দোষ নেই। এমন ব্যক্তির কোন মর্যাদাই স্বীকার করা যেতে পারে না। আর যে লোক নিজেই নিজেকে অপমানিত করে সে অন্য লোকের নিকট সম্মান পাওয়ার অধিকারী নয়। যে নিজেকে দয়া করে না, সে দয়া পেতেও পারে না।

যে লোক নামায-রোযা পালন, মদ্যপান-জুয়া খেলার ওপর না খেয়ে মরাকে অগ্রাধিকার দেয় সে সমাজের নিকট কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতি পাওয়ার অধিকারী নয়। অন্তত এরূপ যার স্বভাব-চরিত্র ও ইচ্ছা-বাসনা, তার পক্ষে সমাজের দয়া-সহানুভূতি পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এই ধৃষ্টতাকারী ফাসিক ব্যক্তির যদি তার ওপর নির্ভরশীল কোন পরিবার থাকে, তাহলে সেই পরিবারের লোকদেরকে যাকাতের মাল দেয়া আবশ্যক। সেই ব্যক্তির দোষে তার পরিবারকে কষ্ট দেয়া যায় না। আল্লাহ্ তাই বলেছেন ঃ

---

১. التوبه – ٧١

وَلَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ج وَلَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَاُخْرٰى -

প্রত্যেকটি ব্যক্তির ওপর তার নিজের উপার্জনই চাপবে। কোন বোঝা বহনকারীই অপরের বোঝা বহন করবে না।[১]

বিদ'আতপন্থী কিংবা বেনামাযী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে কিনা, ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বললেনঃ

'যাকাতদাতা ব্যক্তির উচিত দ্বীনদার শরীয়াত অনুসরণকারী মুসলমানদের মধ্য থেকেই ফকীর, মিসকীন, গারেমীন প্রভৃতি যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক সন্ধান করা। যে লোক প্রকাশ্যভাবে বিদ্'আত করছে; কিংবা পাপ কাজ করে যাচ্ছে, সে তো পরিত্যক্ত হয়ে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য; তাকে তওবা করতেও বলা যেতে পারে।....তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে কি করে সাহায্য করা যায়?[২]

নামায তরককারী সম্পর্কে বলেছেন

'যে লোক নামায পড়ছে না, তাকে নামায পড়তে বলতে হবে। সে যদি বলে যে, হ্যাঁ, আমি নামায পড়ি, তাহলে তাকে দেয়া যাবে। অন্যথায় দেয়া যাবে না[৩]। অর্থাৎ সে যদি তওবা করার কথা প্রকাশ করে এবং নামায পড়বে এই মর্মে ওয়াদা করে তাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করে যাকাত দেয়া যাবে।

'الاختيارات। গ্রন্থে শায়খুল-ইসলাম লিখেছেন ঃ 'যে লোক যাকাত পেয়ে তদ্দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে সাহায্য পেতে চাইবে না, তেমন লোককে যাকাত দেয়া যায় না। কেননা আল্লাহ যাকাত ফরয করেছেন তার ইবাদত-আনুগত্যের কাজে তদ্দ্বারা সহায়তা গ্রহণকল্পে—যে সব মুমিন ব্যক্তি তার মুখাপেক্ষী হবে। যেমন ফকীর, ঋণগ্রস্ত কিংবা যে লোক মুসলমানদের কাজে সহযোগিতা করে—যেমন যাকাত সংস্থার কর্মচারী ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তি। তাই অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে যারা নামায পড়ে না, সে যতক্ষণ তওবা না করবে এবং নামায রীতিমত পড়তে শুরু না করবে, ততক্ষণ তাকে যাকাত আদৌ দেয়া যাবে না।[৪]

সাইয়্যেদ রশীদ রিজা'র বক্তব্য

এ পর্যায়ে ইসলামী সমাজ সংস্কারক সাইয়্যেদ রশীদ রিজার একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে দিয়ে এই প্রসঙ্গটি আমরা শেষ করতে চাই। তিনি তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে, ইংরেজ ফ্রাংগ্রীরা যে সব দেশের ইসলামী ভিত্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকৃত-বিভ্রান্ত করেছে, সে সব দেশে নাস্তিকতা ও আল্লাহদ্রোহিতা মারাত্মক রকম বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। আর দ্বীন-ইসলামের ফায়সালাও জানা গেছে যে, ইসলাম ত্যগকারী ব্যক্তি আসল কাফির অপেক্ষাও অনেক বেশি ক্ষতিকর।

---

১. الانعام - ١٦٤ ২. مجموع فتاوى امام ابن تيميه ج ٢٥ ص ٨٧

৩. مجموع فتاوى امام ابن تيميه ج ٢٥ ص ٨٩ ৪. الاختيارات ص ٦١

তাই এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত বা সাদকায়ে ফিতর-এর কিছুই দেয়া যেতে পারে না। তবে প্রকৃত কাফির যদি অ-যুধ্যমান হয়, তাহলে তাকে নফল সাদ্কার টাকা বা সম্পদ দেয়া জায়েয হতে পারে; কিন্তু ফরয যাকাত দেয়া যাবে না। (জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত-ই তিনি সমর্থন করে গেছেন।)

'এই সব দেশে মুজাহিদ—নাস্তিক অ-ধার্মিক লোক বহু রকমের। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে—হয় বলে, আল্লাহ্ নিষ্কর্মা হয়ে গেছেন; কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করছে। অন্যরা কেউ কেউ 'অহী' অস্বীকার করছে, নবুয়ত-রিসালতের সত্যতা মানছে না বা নবীর প্রতি গালাগাল করছে কিংবা কুরআনকে যা তা বলছে অথবা পুনরুত্থান ও বিচার দিনকে অমান্য করছে। এদের কেউ কেউ আবার ইসলামকে শুধু রাজনৈতিক জাতীয়তা হিসেবে মানছে, কিন্তু তারা মদ্যপান, জ্বেনা-ব্যভিচার, নামায তরক করা প্রভৃতি ইসলামের 'রুকন'সমূহকে অস্বীকার করছে, নামায পড়ছে না, যাকাত দিচ্ছে না, রোযা পালন করছে না, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ করতে রাজী হচ্ছে না। এ সব লোকের ভৌগোলিক বা বংশীয় ইসলাম গণনার যোগ্য নয়। তাই উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকেই যাকাত দেয়া জায়েয হতে পারে না। বরং যাকাতদাতার কর্তব্য হচ্ছে, ইসলামের সহীহ্ আকীদায় অবিচল লোক তালাশ করে বের করে তাদের যাকাত দেবে। দ্বীনের অকাট্য আদেশ-নিষেধের প্রতি যাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, এমন লোক বের করবে। এ সব লোক একবিন্দু গুনাহও করবে না এমন শর্ত কখনই করা যেতে পারে না। কেননা মুসলিম ব্যক্তি কখনও কখনও গুনাহ করে; কিন্তু সেই সাথে সে তওবাও করে। আর আহ্‌লি সুন্নাহ্‌র মৌল নীতি হচ্ছে, কাবাকে কেবলা মানে, এমন কোন লোককে কোন গুনাহের দরুন তারা কাফির বলবে না। কার্যত বিদ'আতে নিমজ্জিত বা শরীয়াতের দলিলে ব্যাখ্যাগত ভিত্তির ওপর বিদ'আতী আকীদা সম্পন্ন লোকও কাফির হয়ে যায় বলে তারা মনে করেন না। বস্তুত আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ বিশ্বাসকারী মুসলমান যদি গুনাহ্ করে এবং ফরয তরক করা ও নির্লজ্জ কাজ-কর্ম করা যারা হালাল মনে করে, এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই ব্যক্তি এসব কাজ আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বের এক বিন্দু চেতনা ছাড়াই পৌনপুনিকতা সহকারে করে। সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে, এই খেয়ালও হয় না তার। তার উচিত আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

যে মুসলিমের ইসলামে সংশয় রয়েছে, তাকেও যাকাত দেয়া সমীচীন নয়। যেসব লোককে রমযান মাসে দিনের বেলা কফিখানা, হোটেল-রেস্তোরা ও খেল-তামাশার লীলাকেন্দ্রে ধূম্র উদগীরণ করতে বা মদ্যপানে মত্ত হয়ে থাকতে অথবা চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-র স্বাদ আস্বাদনে ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়—এমনকি জুম'আর দিনের নামাযের সময়ও—তারা উক্তরূপ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে না তাদের সম্পর্কে কি বলা যাবে, আমি জানি না। অনেক সময় আবার এ সব বিভ্রান্ত লোকেরা কোন-না-কোন জুম'আর মসজিদে উপস্থিতও হয়ে থাকে। এই লোকদেরকে কি 'গুনাহ্‌গার মুসলিম' বলা

যাবে কিংবা বলা যাবে 'সব সীমালংঘনকারী নাস্তিক' ? তাদের সম্পর্কে যে ধারণাই পোষণ করা হোক, যাকাতের কোন মাল যে এদেরকে দেয়া যেতে পারে না, তা নিঃসন্দেহ। তাই যাদের দ্বীন ঈমান ও সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে নির্ভর করা যাবে সেই লোকের সন্ধান করতে হবে যাকাত দেবার জন্যে। তবে ফাসিক ব্যক্তিকে দিলে তার সংশোধন হবে এমন ধারণা হলে তাকে 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'-এর মধ্যে গণ্য করে দেয়া যাবে।

ইসলামের পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীসমূহকে যাকাত দান

ইসলামে পরস্পর বিরোধী যতগুলো ফির্কা বা জনগোষ্ঠী রয়েছে আহলি সুন্নাত তাদের 'বিদআতপন্থী' বা 'স্বেচ্ছাচারবাদী' أهل البدع وأهل الأهواء নামে অভিহিত করেছে।

'বিদআত' দুই ধরনের। একটা হল মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয় এমন বিদ'আত بدعة مكفرة এ বিদ'আত তার অনুসারীকে ঈমান থেকে বের করে কুফরির মধ্যে নিয়ে যায়। এই পর্যায়েও বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। কিছু হয় সীমালংঘনকারী, কিছু মধ্যমপন্থী।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষকে 'ফাসিক বানিয়ে দেয় এমন বিদ'আত' بدعة مسفقة। তা তার অনুসারীকে কাফির বানায় না বটে; কিন্তু 'ফাসিক' অবশ্যই বানিয়ে দেয়। আর এই 'ফিস্‌ক্'টা প্রধানত চিন্তা ও আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাজ করে। একে 'ব্যাখ্যাগত ফিস্‌ক্'-ও বলা চলে তবে বাস্তব কাজ ও আচার-আচরণে ফিসক (সীমালংঘন প্রবণতা) থাকে না।

এ সব পরস্পর বিরোধী ফির্কা বা জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যেসব ফকীর ও যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক আছে তাদেরকে যাকাত দেয়া সম্পর্কে কি হুকুম সেটাই প্রশ্ন।

সত্যি কথা হচ্ছে, 'আহলি সুন্নাহ' গোটা মুসলিম উম্মতের মধ্যে উদারতা ও বদান্যতা প্রদর্শনে অগ্রসর অতি বড় একটি জনগোষ্ঠী। যে বিদ'আত মানুষকে কাফির বানায় ও ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে যায়,[১] তাদের ছাড়া অন্য সব বিদ'আত পন্থীদেরই—আহলি কেবলা মুসলিম মাত্রকেই যাকাত দেয়ার পক্ষপাতী, যদি তারা কল্যাণ ও স্থিতিশীলতাসম্পন্ন হয়। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, আহলি সুন্নাত লোকেরা বিদ'আত মুক্ত ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাকাত দেয়াকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যদিও তারা তাদের সাথে সম্পর্কশীল। তাহলে অন্যদের ব্যাপারে কি করতে হতে পারে ?

আসলে এ পর্যায়ে কথা হচ্ছে, দেয়া জায়েয—দিলে যাকাত আদায় হবে, কিংবা হবে না, এই বিষয়েই যা মতপার্থক্য।

জা'ফরী ইমামীয়া শিয়াদের মত হচ্ছে এই শর্তে যে, যাকাতদাতা ইসনা আসারিয়া শিয়া মতের লোক হবে—ইমামের কথা ঃ 'সাদকা ও যাকাত কেবল তোমার সঙ্গী-সাথীদেরই দাও।' 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' ছাড়া আর কাউকে এই শর্ত থেকে নিষ্কৃতি

---

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন ঃ حاشيه ابن عابدين ج ٢ ص٧٥

দেয়নি। কেননা এ কথা ধরে নেয়া হয়েছে যে, এরা কাফির বা মুনাফিক হবে। যাকে যাকাত দেয়া হবে সাধারণ কল্যাণময় কাজের জন্যে—তার দারিদ্র্য দূর করার বা তার বিশেষ ধরনের প্রয়োজন পূরণের জন্যে নয়, তা-ও উক্ত শর্ত থেকে মুক্ত।

ইমাম জাফর-এর ফিকাহ্‌তে শায়খ মুগনীয়া এই শর্তটিকে বিশেষ করে শুধু যাকাতের ব্যাপারে প্রয়োগ করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর মুস্তাহাব দান-সাদকা যে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিতে দেয়া জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১]

একথা বলেছেন এতদ্‌সত্ত্বেও যে, শায়খ এক্ষেত্রে মাযহাবী ইমাম (র)-এর প্রদত্ত মতের ওপর নির্ভর করেছেন ও আস্থা স্থাপন করেছেন। সে মতটি হচ্ছে, সাদকা ও যাকাত কোন কিছুই না দেয়া। এখানে 'সাদকা' অর্থ ফরয 'দান' বলা ঠিক নয়। অন্যথায় তার পর যাকাত বলা পুনরুক্তির দোষে দূষিত হয়ে পড়ে।

মূল দলিলে—যদি বর্ণনাটি সহীহ্ সাব্যস্ত হয়—মূল বক্তব্যের এমন সাধারণ অর্থ করা যেতে পারে যা সব মুসলিমকেই শামিল করে।

আহলি বায়াতের কোন কোন আলিমের এমন মত জানা গেছে, যা উপরিউক্ত সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যকে সমর্থন করে।

'বুহ্‌রানী' তাঁর الحدائق গ্রন্থে আবূ জাফর আল-বাকের (র) থেকে এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ একজন লোক তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন ঃ 'আল্লাহ্ আপনাকে রহমত করুন' আমার নিকট থেকে এই পাঁচ শত দিরহাম গ্রহণ করুন, পরে তা যথাস্থানে ব্যয় বা বণ্টন করুন। আসলে এটা আমার মালের যাকাত। এ কথা শুনে ইমাম বললেন ঃ না, ওটা বরং তুমিই নাও। এবং ওটা তোমার প্রতিবেশী ইয়াতীম ও মিসকীন এবং তোমার মুসলিম ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।[২]

ইমামুস-সাদেকের পিতা থেকে এ দলিলটি বর্ণিত। সওয়ালকারীকে তিনি কোন শর্ত বলে দেন নি। শুধু দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তা হচ্ছে, প্রয়োজন ও অভাব এবং দ্বিতীয় ইসলাম বা মুসলিম হওয়া। অতএব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সব হিসেবের উর্ধ্বের জিনিস। মুমিনরা সকলেই পরস্পরের ভাই, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত।

আবাজীয়া গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে সেই মাযহাব অনুসারী ছাড়া অন্য মুসলমানকে যাকাত দেয়া জায়েয হওয়া পর্যায়ে মতবিরোধ রয়েছে।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, যদি জানা যায় যে, সে দরিদ্র ব্যক্তি; কিন্তু সে পক্ষের কি বিপক্ষের, সমর্থক কি বিরোধী—তা জানা না যায় তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কেউ কেউ আবার বিরোধীকেও দেয়া জায়েয বলে মত দিয়েছেন। বলা হয়েছে, এমন লোক আমাদের চোখের সম্মুখে থাকলে তাকে দেয়া জায়েয। আবার কেউ বলেছেন, দাতার নিকটে থাকলে তাকে যাকাত দেয়া হবে। شـــــرح النـيـل

---

১. فقه الامام جعفر الصادق ج ٢ ص ٩٢

২. فقه الامام جعفر الصادق ج ٢ ص ٩٧

গ্রন্থে বলেছেন, সহীহ্ এবং সত্য কথা হচ্ছে, দেয়া যাবে না, দেয়া যাবে শুধু সমমাযহাব লোকদের। যদি সে রকম লোক না পাওয়া যায়, তা হলে এই দিক দিয়ে পরিচিতি ব্যক্তিকে দেয়া হবে। আর তাও পাওয়া না গেলে দেয়া হবে তা থেকে সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে নতুবা এমন বিরোধীকে যে তার নিজের মাযহাবী মতের অনুগত। তবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে সেই ব্যক্তিকে যে আমাদের গালাগাল করে না, আর তার পরে সেই ব্যক্তিকে যে কম গালাগাল করে আর তার পরে খুব বেশি গালাগালকারীকে। আর তাও না হলে খৃস্টানকে দেয়া হবে নতুবা 'সাবুনী' বা সাবেয়ীকে। আর তাও না হলে ইয়াহুদীকে। আর তারপর অগ্নিপূজককে নতুবা মূর্তিপূজারীকে। এসব কথা সম্ভব না হওয়ার ওপর ভিত্তিশীল। আকস্মিক মৃত্যুর ভয় দেখানো হয়েছে এবং পাঠাবার কোন পথ না পাওয়ার ওপর নির্ভর করা হয়েছে।[১]

লক্ষণীয়, এই শেষোক্ত শর্তগুলো লোকদের পক্ষে মায্হাবপন্থীদের গোষ্ঠী থেকে বের হয়ে যাওয়াকে কঠিন করে দেয়া হয়েছে।

আর জায়দীয়া গোষ্ঠীর মত المجموع الفقه الكبير। গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

জায়দ ইবনে আলী (রা) এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'তোমার মালের যাকাত কাদরীয়া পন্থীদের দেবে না[২] মুর্জিয়াকেও নয় [৩] হারুরীয়াকেও নয়[৪] রাসূলের আহলি বায়ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তাদেরকেও নয়।[৫]

---

১. شرح النيل ج ٢ ص ١٢٢

২. 'কদরীয়া' বলতে প্রাচীন কালের সে সব লোককে বোঝানো হয়, যারা বলত, প্রতিটি ব্যাপারই সূচনা। অর্থাৎ তার পূর্বে আল্লাহ জানতেন না। এভাবে ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ জানতে পারেন তা সংঘটিত হওয়ার পর। এ মত সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছে 'আল-জুহানী'। সহীহ মুসলিমে তাই বলা হয়েছে। মু'তাজিলাদের বোঝাবার জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হত। তবে এখানে প্রথম ব্যবহারটিই লক্ষ্য। ইমাম জায়দ একজন তাবেয়ী। মনে করা হচ্ছে যে তিনি তাবেয়ীদের দেখতে পেয়েছেন।

৩. 'মুর্জিয়া' বলতে বোঝায় সে লোক, যে ফাসিক লোকদের ওপর অভিশাপ বর্ষণে বাড়াবাড়ি ত্যাগ করেছে। পূর্বকালের একটি জামা'আতের এটাই মত। সেই ব্যক্তিকেও বলা হয়, যে বিশ্বাস করে আমল ছাড়াও ঈমান হতে পারে। ঈমান থাকা অবস্থায় গুনাহ কোন ক্ষতি করে না, যেমন কুফরী অবস্থায় আল্লাহ্র ইবাদত কোন ফায়দা দেয় না। শব্দটি الارجاء। থেকে, অর্থ বিলম্বিতকরণ। উক্ত মতের লোক যেহেতু আমলকে ঈমান থেকে দূরে নিয়ে গেছে, সেই কারণে তাকে 'মুর্জিয়া' বলা হয়। ইমাম জায়েদের মতের দৃষ্টিতে শেষোক্ত ব্যবহারটাই সমীচীন।

৪. 'হারুরা' একটা স্থানে নাম। সেই সম্পর্কের দিক দিয়ে 'হারুরীয়া' বলা হয়েছে। স্থানটি কুফাতে অবস্থিত। প্রাথমিক খাওয়ারিজ লোকেরা এখানে একত্রিত হয়েছিল। পরে প্রত্যেক খারিজী মতের লোককে 'হারুরীয়া' বলতে শুরু করা হয়েছে। এদেরকে المحكمة والشراة। ও বলা হয়। এরা হযরত আলী ও হযরত ওসমানকে কাফির মনে করে।

৫. তাদের সাথে যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে, বিদ্রোহ করেছে, সীমালংঘন করেছে, রক্তপাত করা হালাল মনে করেছে, এ কথা সাধারণভাবে তাদেরকে এবং অন্যদেরকেও বোঝায়। কিন্তু তাদের ব্যাপারে খুব বেশি করে যেসব ইজতিহাদী মাসলায় তাদের ইজমা হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি তাতে এবং দ্বীনের যেসব মৌল বিষয়ে উভয় পক্ষ থেকে প্রবল সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, তাতে বিরোধিতা খুব বেশী ক্ষতিক্ষর বা নিন্দনীয় নয়। দেখুন ঃ الروض النضير ج ٢ ص ٨٩-٩٠।

'রওজুন নজীর' গ্রন্থে বলা হয়েছে, উক্ত ইমাম (আ)-এর কথা ফাসিককে যাকাত দেয়া জায়েয নেই' ব্যাখ্য সাপেক্ষ। হাদী, কাসেম ও নাসের এরূপ বলেছেন।

তাদের দলিল হল اَغْنِيَائِكُمْ। বলে সম্বোধন করা হয়েছে মুমিন লোকদের প্রতি এজন্য যে, যাকাতের টাকা দিয়ে যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কোন কাজের সহায়তা করা না হয়।

বলেছেন ঃ প্রাচীন লোকদের একটি জামায়াত তা জায়েয বলে মত দিয়েছেন।

'মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়েবা' গ্রন্থে ফুজাইলের সনদে বলা হয়েছে ঃ আমি ইবরাহীম নখয়ীকে اصحاب الاهواء সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ ওরা সে লোক যারা নিজেদের অভাব ছাড়া কখনও ভিক্ষা চাইত না।

মুয়াইয়্যিদ বিল্লাহ ইমাম ইয়াহইয়া, হানাফী শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা তাই বলেছেন। কেননা الفقراء। শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। আরও এজন্যে যে, 'ধনীদের নিকট থেকে নিয়ে তাদেরই ফকীর গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হয়।' (হাদীস)

ইমাম শাফেয়ীর দুটো কথার একটি ইমাম ইয়াহইয়া গ্রহণ করেছেন। তা হচ্ছে ঃ ফাসিকের ফিস্‌ক্ যদি মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর হয় তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। যেমন বিদ্রোহী ও যুদ্ধলিপ্তকে দেয়া হয় না, এদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে না। কেননা তাতে রাষ্ট্রপ্রধানের কথার অপমান হয়। আর তারও মুসলিম জনগণের দায়িত্ব পালন এই দুটোর মধ্যেই ব্যাপারটি আবর্তিত হয়।[১] যা কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়।

১. الروض النضير ج ٢ ص ٤٢٣

চতুর্থ আলোচনা

স্বামী, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়কে কি যাকাত দেয়া যাবে

নিকটবর্তী ব্যক্তি যদি ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়ে দূরবর্তী হয়, তাহলে যাকাতদাতা ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে সেই লোকের ব্যয়ভার বহন বাধ্যতামূলক হয় না। কাজেই তার এই নিকটবর্তী ব্যক্তির যাকাত তাকে দিতে কোন দোষ নেই। নিকটবর্তী ব্যক্তি নিজেই দিক কিংবা অন্য যাকাতদাতা দিক, তা সমান কথা কিংবা তা দেবে সরকার বা তার প্রতিনিধি অর্থাৎ যাকাত বিতরণ প্রতিষ্ঠান তা দেবে। আর ফকীর-মিসকীনদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ থেকে দেয়া হোক, কি অন্য কোন খাত থেকে, তাতেও কোন পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু যে নিকটবর্তী ব্যক্তি ঘনিষ্ঠতম নৈকট্য সম্পর্কশীল; যেমন পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোন ও চাচা-চাচী—এদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয হওয়া পর্যায়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

সেই নিকটবর্তী ব্যক্তি যদি যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়—হয় এজন্যে যে, সে যাকাত সংস্থার কর্মচারী, ক্রীতদাস বা ঋণগ্রস্ত অথবা আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ, তাহলে সেই যাকাতদাতা নিকটবর্তী ব্যক্তির পক্ষে তাকে যাকাত দেয়ায় কোন দোষ হতে পারে না। কেননা লোকটি যাকাত পাওয়ার যোগ্য এমন গুণগত কারণে, যাতে এই নৈকট্যের কোন প্রভাব খাটতে পারে না। আর এই নিকটবর্তী ব্যক্তিরও নৈকট্যের নাম করে ঋণগ্রস্তের ঋণ শোধ করা বা আল্লাহ্র পথের মুজাহিদদের খরচ বহন করার অনুরূপ কিছু করারও প্রয়োজন হয় না, তাও ওয়াজিব নয়।

অনুরূপভাবে নিঃস্ব পথিককেও সফর খরচ দান করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয হবে।

তবে 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য বা যাকাতের টাকা দেয়া উচিত নয়। এটা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রতিনিধিরই করণীয়। পূর্বে এ কথা বলে আসা হয়েছে।

আর ঘনিষ্ঠ নৈকট্যসম্পন্ন নিকটবর্তী ব্যক্তি যদি "ফকীর' বা 'মিসকীন' হয়ে থাকে, তাহলে কি এই ফকীর ও মিসকীনের যাকাত-অংশ তাকে দেয়া যাবে ?..... এর জবাব দেয়ার জন্যে সর্বপ্রথম দাতা লোকটিকে তা জানা আবশ্যক।

যাকাত বিতরণকারী ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি হয় কিংবা এ কালের পরিভাষায় সরকারই যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সে প্রয়োজন, অভাব ও পাওয়ার যোগ্যতার দৃষ্টিতে যাকে দেয়ার প্রয়োজন মনে করবে,

তাকে দেবে, সে যদি যাকাতদাতার সন্তান বা তার পিতা বা স্বামীও হয়, তবুও।[১] তার কারণ হচ্ছে, যাকাতদাতা তো মুসলমানদের দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট যাকাত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সে যথাস্থানেই জমা করে দিয়েছে, তাতে তার ফরয পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি সংঘটিত হয়েছে। এক্ষণে তার বণ্টনের ব্যাপারটি সরকারের ওপর ন্যস্ত। কেননা যাকাতের মাল বায়তুলমালে জমা হয়ে যাওয়ার পর তার পূর্ব-মালিক দাতার সাথে তার কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট থাকে না। এক্ষণে তা আল্লাহ্‌র মাল কিংবা মুসলিম জনগণের সম্পদ।

সেই নিকটবর্তী ব্যক্তি যদি 'ফকীর' কিংবা 'মিসকীন' হয় আর যে লোক তাকে যাকাত দেবে, সে নিজেই হয় তার নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাহলে এই নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার মান এবং কোন্ লোক তার নিকটবর্তী, সেটা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই ফকীর যদি যাকাতদাতার পিতা হয়, মা হয়, হয় পুত্র বা কন্যা, এরা সেই ধরনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্যে ধনী ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে, তাহলে এদের কাউকেই সেই ধনী ব্যক্তির যাকাত দেয়া চলবে না।

ইব্‌নুল মুনযির বলেছেন, ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন যে, যাকাতদাতা তার যাকাত তার আপন পিতামাতাকে দিতে পারবে না, দেয়া জায়েয হবে না, কেননা অবস্থা তো এই যাকাতদাতা নিজেই এদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য এবং দায়ী। এমতাবস্থায় এদেরকে তার যাকাত দেয়া হলে তাদের খরচ বহনের দায়িত্ব পালন থেকে তাদের মুখাপেক্ষিতা দূর করা হবে বটে কিন্তু সেই লোক তার স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে যাকাতের প্রত্যক্ষ ফায়দাটা সে নিজেই পেয়ে যাবে। তখন মনে হবে, সে নিজেই যেন নিজেকে যাকাত দিয়েছে অথচ তা জায়েয নয়—যেমন যাকাত দ্বারা সে নিজের ঋণ পূরণ করতে পারে না।[২]

আরও এজন্যে যে, সন্তানের ধন-মাল তো পিতামাতার ধন-মাল। এই কারণে মুসনাদ ও সুনান হাদীস সংকলন গ্রন্থে একাধিক সূত্রে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ -

তুমি ও তোমার ধন-মাল তোমার পিতার জন্যে।[৩]

---

১. দেখুন ঃ احكام القران لابن العربى ص ٩٦٥

২. দেখুন ঃ المغنى لابن قدامه ج ٢ ص ١٤٧

৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃ.। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তিনটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে। শায়খ শাকের হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। দেখুন, ১৬৭৮. এবং ৬৯০২. ৭০০১-১খণ্ড ও ১২ খণ্ড। 'ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত জাবির থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, এই সূত্রের বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণ সিকাহ্। তাবারানী বর্ণনা করেছেন সামুরাতা ও ইবনে মাসউদ থেকে যয়ীফ সূত্রে التفسير المناوى ج ا ص ٣٧٨ দেখুন।

যেমন করে কুরআন পুত্রদের ঘরকে পিতার ঘর বলে ঘোষণা দিয়েছে। যখন বলেছেঃ

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ -

এবং তোমাদের ওপর কোন দোষ বর্তাবে না যদি তোমরা আহার কর তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে.....।[১]

অর্থাৎ তোমাদের পুত্রদের ঘর থেকে।[২]

আয়াতটিতে সংশ্লিষ্ট নিকটাত্মীয়দের প্রকৃত রূপটা তুলে ধরা হয়নি। ব্যক্তির নিজের ঘরে খাবার গ্রহণে এমন কোন দোষের প্রশ্ন নেই, যা দূর করার জন্যে কুরআনী আয়াত নাযিল করতে হবে। তাই আয়াতে বলা 'তোমাদের ঘর' বলে বুঝিয়েছে 'তোমাদের পুত্রদের ঘর'।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ -

ব্যক্তির নিজের উপার্জন থেকে আহার গ্রহণ খুব বেশি উত্তম এবং ব্যক্তির সন্তান তার নিজেরই উপার্জন বিশেষ।[৩]

এ পর্যায়েই হানাফী মাযহাবের আলিমগণ বলেছেন ঃ সম্পদের উপকারিতা পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্মিলিত ও সুসংবদ্ধ। তাই ফকীর পিতামাতাকে মালিক বানিয়ে দেয়ায় সর্বতোভাবে যাকাত আদায় হবে না। বরং তা 'নিজের জন্যে ব্যয়' হয়ে দাঁড়াবে এক হিসেবে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব শক্তিসম্পন্ন থাকায় তাদের পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪] তার মূলেও এই কারণই নিহিত।

অনুরূপভাবে সন্তানদেরকে যাকাত দেয়াও জায়েয নয়। কেননা তারা হল যাকাতদাতার অংশ। তাদের যাকাত দেয়া নিজেকে দেয়ার সমান। বুখারী ও আহমাদ মায়ান ইবনে ইয়াজীদ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তা হল ঃ

'আমার পিতা মসজিদের এক ব্যক্তির নিকট বহু দীনার স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন তা দান করার উদ্দেশ্যে। আমিও তথায় উপস্থিত থেকে তা নিলাম। পরে পিতা বললেন ঃ আল্লাহ্র নামের শপথ আমি তোমাকে তো দিতে চাইনি, তুমি নিলে কেন? পরে আমি রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। তখন নবী করীম

---

১. سورة النور – ٦١ ২. تفسير القرطبى ج ١٢ ص ٣١٤

৩. হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আয়েশা (রা) থেকে এমন সনদে যাকে তিরমিযী 'উত্তম' বলেছেন। আবূ হাতিমও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ঃ تفسير التيسير ج ١ ص ٣١١-এ তা উদ্ধৃত হয়েছে। আহমাদ অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন সহীহ্ সনদে। তা ৬৬৭৮ ও ৭০০১ নম্বর হাদীসের অংশ বিশেষ।

৪. দেখুনঃ البدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩

(স) বললেনঃ হে-ইয়াজীদ! তুমি তোমার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। আর যে মায়ান, তুমি যা নিয়েছ, তা তোমার জন্যই থাকবে।'

বাহ্যতই বোঝা যায়, এই সাদকাটা ছিল নফল সাদ্কা। শাওকানী তাই বলেছেন—ওটা ফরয যাকাতের ব্যাপার নয়।[১] তা যদি হত তাহলে পিতার দেয়া যাকাত তার পুত্র নিতে পারত না, নিলে তা জায়েয হত না।

এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে এসেছে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং শিয়া মতের আবদুল আব্বাস থেকে পাওয়া একটি বর্ণনা। তাতে বলা হয়েছে, বাবা মাকে যাকাত দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। শেষের দিকের জায়দীয়া ফিকাহ্বিদ্দের একটি গোষ্ঠীও উক্ত মতের সমর্থন করেছে, মূল, শাখা প্রশাখা বংশের লোক এবং রক্ত সম্পর্কের অপরাপর সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে যাকাত ব্যয় করাকে তারা জায়েয ঘোষণা করেছেন। তাঁরা দলিল হিসেবে বলেছেন—আসল কথা হল, যাকাত সংক্রান্ত কথাগুলো সম্পূর্ণ সাধারণ অর্থবোধক, সব শ্রেণীর লোকই তার মধ্যে শামিল ও গণ্য হতে পারে। তাতে এমন কোন বিশেষত্ব বিধায়ক কথা নেই যা সহীহ্ হতে পারে ও কাউকে কাউকে তা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে।[২] ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। বলেছেন ঃ পুত্রদের পুত্রদের মধ্যে এবং উর্ধ্বে দাদা ও দাদীর জন্যে যাকাত বণ্টন বৈধ।[৩] সম্ভবত ইবনুল মুন্যির ও 'বহরুয্ যাকাত' গ্রন্থ প্রণেতাদ্বয়ের নিকট উক্ত বর্ণনা সমূহ সহীহ্ বলে গৃহীত হয়নি। এঁরা দুজন বর্ণনা করেছেন ঃ ব্যক্তির বংশমূল পিতা, মা, দাদা ও দাদী এবং নিজের বংশের শাখা প্রশাখা—সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের মধ্যে যাকাত ব্যয় নাজায়েয হওয়ার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে।[৪]

ইবনুল মুনযির প্রমুখ যে দলিলটির উল্লেখ করেছেন, তা-ই হচ্ছে এই ঐকমত্যের সনদ। আর তা হচ্ছে ঃ এদেরকে যাকাত দিলে তা তাদেরকে তার খরচ বহন থেকে নিষ্কৃতি দান করবে, এই দায়িত্ব তার ওপর থেকে সরিয়ে দেবে। তার ফায়দাটা তার নিজের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হবে। মনে হবে, যকাতটা নিজেকেই দেয়া হয়েছে। আর তাতে যাকাত আদায় হয় না।

ইবনুল মুন্যির এ কথার ওপর ঐক্যমত্যের কথা বলেছেন যে, পিতামাতাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কেননা অবস্থা এরূপ যে, যাকাতদাতাকে তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্যে বাধ্য করা হবে। এই অবস্থাটা যদি বাস্তবায়িত না থাকে—সন্তান যদি অর্থনৈতিক সংকীর্ণতার মধ্যে পড়ে দরিদ্র না হয়, বরং সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে পড়ার দরুন যাকাত দেয়া তার জন্যে কর্তব্য হয়ে পড়ে, এরূপ অবস্থায় ইমাম নববী বলেছেন, সন্তান বা পিতামাতা যদি ফকীর বা মিসকীন হয়, কোন কোন অবস্থায় পিতামাতার খরচ বহন সন্তানের জন্যে ওয়াজিব না হয়, তাহলে তার

---

১. দেখুনঃ نيل الاوطار ج ٤ص ١٨٩ ২. الروض النضير ج ٢ ص ٤٢١
৩. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٩ ৪. দেখুনঃ البحر الذخار ج ٢ ص ١٨٦

পিতা-মাতা ও সন্তানের জন্যে ফকীর ও মিসকীনের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ থেকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে। কেননা এরূপ অবস্থায় সে নিঃসম্পর্ক ও দায়িত্বমুক্ত ব্যক্তি।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ পিতামাতা ও তদূর্ধ্ব আত্মীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয—নিচের দিকে সন্তানকে দেয়াও জায়েয—যদি তারা 'ফকীর' হয় এবং সে তাদের খরচ বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই কথার সমর্থনে যাকাত ব্যয়ের মৌল কারণ—দারিদ্র্য ও অভাবের দাবিকে তুলে ধরা হয়েছে। এ দাবি পূরণের পথে কোন শরীয়াতসম্মত প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়নি। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ইমাম আহমাদের দুটো কথার একটি হচ্ছে এই—মা যদি দরিদ্রা হয় এবং তার ছোট ছোট অক্ষম সন্তান থাকে যাদের ধন-মাল রয়েছে, যাকাত তাদের জন্যে ব্যয় করা হলে তাদের ক্ষতি সাধন করা হবে, তাহলে তাদের যাকাত থেকে মাকে অংশ দেয়া যাবে।[২]

স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়

উপরে পিতামাতা ও সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে, স্ত্রী সম্পর্কেও সেই কথাই বলা চলে। এজন্যে ইবনুল মুনযির বলেছেন ঃ বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়ে বলেছেন, কোন ব্যক্তিই তার যাকাত তার স্ত্রীকে দেবে না। কেননা স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার তো যাকাতদাতাকেই বহন করতে হবে। আর তা করা হলে স্ত্রীর পক্ষে যাকাতের মুখাপেক্ষী থাকার কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েয হতে পারে না। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যয় বাবদ তা দেয়া হলেও তা জায়েয হবে না। তাতে যাকাত আদায় হবে না।

তাছাড়া স্ত্রী তার স্বামীর সাথে এমন অভিন্নভাবে সম্পৃক্ত যে, স্ত্রী না যেন সে নিজে কিংবা তার অংশ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا -

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এ-ও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৩]

(স্বামী স্ত্রীর জন্যে জুড়ি, স্ত্রী স্বামীর জন্যে)

তার স্বামীর ঘর তার নিজেরই ঘর। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ -

এবং তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করো না।[৪]

এই ঘর বৈবাহিক সম্পর্কের ঘর স্বভাবতই স্বামীর মালিকানা সম্পদ।

অন্যেরা বলেছেনঃ[৫] স্বামী তার যাকাত স্ত্রীর জন্যে ব্যয় করলে তা গণ্য হবে

---

১. المجموع ج ٦ ص ٢٢٩ ২. اختيارات ابن تيميه ص ٦١ - ٦٢

৩. سورة الروم - ٢١ ৪. سورة الطلاق - ١ 'তাদের ঘর' অর্থ—তাদের স্বীয় ঘর।

৫. الاموال - ٥٨٨

না—তাতে যাকাত আদায় হবে না। কেননা এরূপ অবস্থায় ডান হাতে দিয়ে বাম হাতে নিয়ে দেয়া ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই হয় না।

স্ত্রী কি তার দরিদ্র স্বামীকে যাকাত দিতে পারে

মিসকীন ও দরিদ্র স্বামীকে স্ত্রীর নিজের সম্পদের যাকাত দেয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্য কয়েকজন ফিকাহ্‌বিদ মত দিয়েছেন যে, তা জায়েয নয়, কেননা স্বামী তার স্ত্রী থেকে ভিন্নতর ও বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। যেমন ভিন্নতর ও বিচ্ছিন্ন কেউ নয় স্ত্রী স্বামী থেকে। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যাকাত দান নিষিদ্ধ।

কিন্তু স্বামীর দেয়াটাকে স্ত্রীর দেয়ার ওপর কিয়াস করা সহীহ্ হতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার - বিবেচনা উভয় দিক দিয়েই তা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি হাদীস ও সাহাবীদের বক্তব্যের দিক দিয়েও।

বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনার দিক দিয়ে ইমাম আবূ উবাইদ যেমন বলেছেন—স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য—স্ত্রী যদি সচ্ছল অবস্থার হয়, তবুও। আর স্ত্রীকে বাধ্য করা যায় না স্বামীর ব্যয়ভার বহন করতে সে যদি খুব কষ্টের মধ্যেও থাকে। তা হলে এ দুটোর মধ্যকার পার্থক্যের তুলনার কোন্‌টি অতিশয় বড় কঠিন পার্থক্যের ব্যাপার হবে, তা আমাদের অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।

ইবনে কুদামা জায়েয হওয়ার পন্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ কেননা স্বামীর ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর বর্তায় না। কাজেই স্বামীকে স্ত্রীর যাকাত দেয়া নিষিদ্ধ হতে পারে না, যেমন নিষিদ্ধ নয় ভিন্নতর ও নিঃসম্পর্ক কোন পুরুষকে দেয়া। কিন্তু স্ত্রীকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা তার ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর কর্তব্য। আর মৌলিকতার দিক দিয়ে যাকাত দেয়াটা জায়েয, কেননা যাকাত পাওয়ার চিহ্নিত নামগুলো যেহেতু সাধারণ প্রয়োগযোগ্য, নিষেধ করার কোন অকাট্য দলিল নেই। এর ওপর কোন ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়নি। আর যার ব্যাপারে নিষেধ প্রমাণিত, তার ওপর এই ব্যাপারটি কিয়াস করা সহীহ্ হতে পারে না। কেননা এ দুটোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব দেয়া জায়েয হওয়াটা প্রমাণিত অবস্থায় বর্তমান থেকে গেল।[১]

বর্ণিত দলিলাদির দিক দিয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে ইমাম আহমাদ, বুখারী ও মুসলিমের আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বললেন ঃ

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ 'হে মহিলা সমাজ! তোমরা দান-সাদ্‌কা কর, তোমাদের অলংকারাদি থেকে হলেও।' তিনি বললেন ঃ অতঃপর আমি ফিরে এসে আবদুল্লাহ্‌কে বললাম ঃ 'তুমি তো খুব সংকীর্ণ হাতের (দারিদ্র্যপীড়িত) লোক। আর রাসূলে করীম (স) আমাকে দান-সাদ্‌কা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তুমি তাঁর নিকট

---

১. المغني ج ٢ ص ٦٥٠.

গিয়ে জানতে চেষ্টা কর (তোমাকে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা ? যদি আমার যাকাত দেয়া হয়ে যায় তোমাকে দিলে তাহলে তোমাকেই দেব।) অন্যথায় আমি তা অন্য লোকদের দিয়ে দেব, বললেন। আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ তুমিও চল। বললেন, অতঃপর আমিও গেলাম। তখন তথায় দেখলাম রাসূলের ঘরের দ্বারদেশে একজন আনসার বংশীয় মহিলাও দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রয়োজনও ঠিক আমারই মত। তখন নবী করীম (স)-এর স্বাস্থ্যগত অবস্থা ভালো ছিল না বলে হযরত বিলাল (রা) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ তুমি রাসূলের নিকট গিয়ে খবর দাও, দুইজন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আপনার নিকট জানতে চাচ্ছে, তাদের স্বামীদেরকে এবং তাদের ক্রোড়ে লালিত ইয়াতীম সন্তানদেরকে যাকাত দিলে তা তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে কি না ?...... কিন্তু আমরা কারা, তা তাঁকে বলো না।..... পরে বিলাল ঘরে প্রবেশ করে রসূলের নিকট উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, কে কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে ? তিনি বললেন ঃ আনসার বংশের মহিলা একজন আর অপরজন জয়নব। রসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জয়নব ? বললেন, আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ এই দুজনের জন্যে দুটো করে শুভ কর্মফল। একটি হচ্ছে নৈকট্য রক্ষার শুভ কর্মফল আর অপরটি হচ্ছে দানের।' হাদীসটি আহ্‌মাদ ও বুখারী, মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত। বুখারী উদ্ধৃত ভাষায় প্রশ্নটি ছিল ঃ আমার স্বামীর জন্যে এবং আমার ক্রোড়ে লালিত ইয়াতীমদের জন্যে ব্যয় করলে আমার যাকাত আদায় হয়ে যাবে কি ?[১]

ইমাম শাওকানী বলেছেন, এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে বলা হয়েছে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিলে তার থেকে তা আদায় হয়ে যাবে—তার জন্যে এই দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। সওরী, শাফেয়ী, আবূ হানীফার দুই সঙ্গী এবং মালিক ও আহমাদ থেকে পাওয়া দুটো বর্ণনার একটি উক্ত মতের সমর্থন রয়েছে। হাদী, নাসের, মুয়াইয়্যিদ বিল্লাহও এই মত দিয়েছেন। দলিল হিসেবে তা সম্পূর্ণতা পায় যদি ধরে দেয়া হয় যে, এখানে ফরয সাদ্‌কা বা যাকাতের কথা বলা হয়েছে। মাজেরী এ কথা দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন। মহিলা দুইজনের প্রশ্ন ঃ 'আমার দিক থেকে আদায় হবে কি ?' থেকেও উক্ত কথার সমর্থন মেলে। অন্যরা এ হাদীসটি থেকে বুঝেছেন যে, এটা নফল দান-সাদকার কথা, সেই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন, ফরয যাকাত সম্পর্কে নয়। রাসূলের কথা, 'তোমাদের অলংকারাদি থেকে হলেও' তার প্রমাণ। 'আমাদের দিক থেকে আদায় হবে কি' প্রশ্নের ব্যাখ্যা এঁরা করেছেন এই অর্থে ঃ 'এ দান আমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে কি' অর্থাৎ মহিলাটি ভয় করেছিলেন, তার স্বামীকে দানটা দিয়ে দিলে সওয়াব লাভ করার লক্ষ্য হাসিল হবে কি, আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কি ?.... সেজন্যেই এই প্রশ্ন করেছিলেন।

শাওকানী এ বিষয়ে লিখেছেন, বাহ্যত স্ত্রীর যাকাত স্বামীকে দেয়া জায়েয হতে পারে বলে মনে হয়। প্রথমত এজন্যে যে, তার নিষেধকারী কিছু নেই। যে বলেছে যে,

১. দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ ص ১৮৭ – ১৮৮

জায়েয নেই, তার প্রমাণ তাকেই দিতে হবে। দ্বিতীয়ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নবী করীম (স) কোন বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি বলে ব্যাপারটি সাধারণ ও সার্বজনীন পর্যায়ে পড়ে গেছে। সাদ্‌কাটা নফল না ফরয ওয়াজিব, তা যখন তিনি জিজ্ঞেস করেন নি, তখন মনে হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ, স্বামীকে দিলে তোমার তরফ থেকে আদায় হয়ে যাবে—তা ফরয সাদ্‌কা হোক, কি নফল।[১]

অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের যাকাত দান ঃ নিষেধকারী ও অনুমতিদানকারী

ভাই, বোন, চাচা, ফুফা-ফুফী ও খালা-খালু প্রভৃতি নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে কিনা সে পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, জায়েয হবে। অন্যরা বলেছেন, তা না, হবে না। এভাবে বহু বিরাট মতবিরোধ। এদের মধ্যে কেউ উক্ত আত্মীয়দের সকলকেই দেয়া জায়েয বলেছেন। আর অন্যরা এদের সকলকেই দিতে নিষেধ করেছেন। কিছু ফিকাহ্‌বিদ্ কোন্ কোন্ নিকটাত্মীয়কে দিতে পারা যায় বলেছেন, অন্যদের দিতে নিষেধ করে মত দিয়েছেন।

যাঁরা নিষেধ করেছেন, তাঁরাও নিষেধের ভিত্তি নির্ধারণে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ নিকটাত্মীয়কে পরিবারের সাথে বাস্তবভাবে যুক্ত দেখতে পেয়েছেন। তাই যতক্ষণ তারা পরিবারবর্গের সাথে মিলে-মিশে থাকবে, ততদিন সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের পর্যায়ভুক্ত হবে। এরূপ অবস্থায় তাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না।

এঁদের কেউ কেউ এমন, যাঁরা মনে করেন যে, প্রশাসক স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনের জন্যে তাকে বাধ্য করতে পারে। তাই যতক্ষণ এরূপ কোন আদালতি নির্দেশ জারি না হচ্ছে যা তার নিকটবর্তী ব্যক্তির খরচ বহনে তাকে বাধ্য করবে, ততক্ষণ তার যাকাত তাকে দেয়া জায়েয হবে।

এঁদের কেউ কেউ মনে করেছেন, শরীয়াত অনুযায়ীই তার খরচ বহন বাধ্যতামূলক, তাই তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না। কেননা শরীয়াতই তাদের খরচ বহনের জন্যে যাকাতদাতাকে বাধ্য করছে। আর যার খরচ বহন শরীয়াত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়, তাকে দেয়া যেতে পারে। এই মতের লোকেরা যে নিকটবর্তী ব্যক্তির খরচাদি বহন বাধ্যতামূলক তাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে কিনা, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

আবূ উবাইদ তাঁর সনদে ইবরাহীম ইবনে আবূ হাফ্‌সা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি মায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আমি আমার খালাকে যাকাত দেব কি না ? জবাবে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার জন্যে দ্বার রুদ্ধ করে না দেবে[২] অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার নিজের পরিবার ও সন্তানাদির সাথে মিলিয়ে একাকার করে না নিচ্ছে, ততক্ষণ তা জায়েয।

---

১. দেখুন ঃ ١٨٨ – ١٨٧ نيل الاوطار ج ٤ ص ২. দেখুন ঃ ৫৮৩– ٥٨٢ الاموال ص

হাসান থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যাকাতদাতা ব্যক্তি তার যাকাত তার নিকটাত্মীয় লোকদের দেবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পরিবারবর্গের মধ্যে গণ্য না হচ্ছে।[১] আতা বলেছেন, ব্যক্তির নিকটাত্মীয় যদি তার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত না হয় যার ব্যয়ভার সে বহন করছে, তাহলে সে বা তারা অন্যদের তুলনায় তার যাকাত পাওয়ার অধিক বেশি অধিকার সম্পন্ন—যদি তারা 'ফকীর' হয়।[২]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমার ভরণ-পোষণের আওতাভুক্ত কোন লোককে যাকাত না দিলে তোমার কোন দোষ নেই।[৩]

কোন কোন বিশেষজ্ঞের এটাই মত। তাঁরা দেখেছেন, নিকটাত্মীয়কে পরিবারবর্গের মধ্যে শামিল করা হয়েছে কি হয়নি। যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু শরীয়াত অনুযায়ী তার খরচ বহন বাধ্যতামূলক কিনা সেদিকে বা অন্য দিকে তাঁরা নজর দেন নি।

আবূ উবাইদ আবদুল্লাহ্ ইবনে দাউদ থেকে অপর একটি মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া অপসন্দনীয় হবে যদি সরকার যাকাতদাতাকে তাদের খরচ বহনের জন্যে বাধ্য করে। যতক্ষণ বাধ্য করা হবে না, ততক্ষণ তাদের যাকাত দেয়ায় কোন দোষ নেই।[৪]

আবূ উবাইদ নিজে বলেছেন ঃ উক্ত মতটি আবদুর রহমান ও ইবনে দাউদের ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি। এ দুটো স্বতন্ত্র অভিমত, যারা তা চাইবে—অনুসরণ করবে।[৫]

এই সব মত ও রায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতটি হচ্ছে তার, যিনি যাকাত দেয়া নিষেধের ভিত্তি বানিয়েছেন শরীয়াত অনুযায়ী খরচ বহনের বাধ্যতাকে, তাই শরীয়াত অনুযায়ী যে নিকটাত্মীয়ের খরচ বহন ওয়াজিব, তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। তাঁরা এর দুটো কারণ বলেছেন। একটি এই যে, সে ধনী বলে তার কিছু ব্যয় করা ওয়াজিব হয়েছে। দ্বিতীয়, এই নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেয়া হলে তার ফায়দা দাতার ভাগেই আসে এবং খরচ বহনের দায়িত্ব বাতিল হয়ে যায়।[৬]

এটাই হচ্ছে ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর মত। ইমাম আহমাদ থেকেও একটি বর্ণনা এই মর্মে এসেছে। জায়দ ইবনে আলী, আল-হাদী কাসেম, নাসের ও মুয়াইয়্যিদ বিল্লাহ্‌র অভিমতও এই। কোন্ নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন বাধ্যতামূলক, তা নির্ধারণে তাদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

জায়েদ ইবনে আলী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত, যে লোক যার উত্তরাধিকারী তার খরচ বহন তারই ওপর বর্তায়।

---

১. ২ ও ৩. ৫৮৩– ٥٨٢ الاموال ص ৪. ٥٨٢ ـ الاموال ৫. ٥٨٢ ـ الاموال

৬. দেখুন ঃ ٢٢٩ احكام القران لابن ও المجموع للنوى ج ٦ ص العربى ق ٢ ص ٩٦٠.

ইমাম জায়েদ আরো বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কর্তৃক যাকে খরচ বহনের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। প্রশ্ন হয়েছে ঃ বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কার খরচাদি বহনের কথা বলবেন ? জবাবে বলেছেন ঃ তার সব কয়জন উত্তরাধিকারীর খরচাদি।[১]

ইমাম শাফেয়ী ব্যক্তির মূলের দিকের—তা যত উচ্চেই উঠুক এবং শিকড়ের দিক—তা যত নিচেই হোক—আত্মীয়দের খরচ বহন ওয়াজিব মনে করেন।

খরচাদি ওয়াজিবকরণে অধিক সংকীর্ণ মত হচ্ছে ইমাম মালিকের। তাঁর মতে তার ঔরসজাত পুরুষ সন্তানের জন্যে তার মূলের দিকে পিতার খরচ জরুরী—ওয়াজিব যতক্ষণ তারা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে উঠতে না পারছে।[২] আর এমন মেয়েদেরও, যতক্ষণ তাদের বিয়ে না হচ্ছে। তাদের স্বামীরাও এদের মধ্যে গণ্য। তবে সন্তানের সন্তানের কথা ভিন্নতর। তাদের খরচ বহনদাতার কর্তব্যভুক্ত নয়। যেমন নাতিদের কর্তব্য নয় দাদার খরচ বহন। সন্তানের তার দরিদ্র—ফকীর পিতামাতার খরচ বাধ্যতামূলক, যেমন স্বামীর জন্যে তার স্ত্রীর ও তার একজন সেবকের খরচ বহন করা বাধ্যতামূলক। ভাইবোন ও অপর নিকটাত্মীয় ও মুহ্‌ররম ব্যক্তি সম্পর্কিত আত্মীয়ের।[৩] খরচ বহন কারুর জন্যে বাধ্যতামূলক নয়।[৪] এক্ষণে সেই লোকের পিতা-মাতা ও সন্তান এই নিকটাত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের যাকাত জায়েয—যেমন ইমাম মালিকের মত।

নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন যাঁরা

অন্যান্য আলিম নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন পিতা-মাতা ও সন্তানদের ছাড়া। তাদের কেউ কেউ ভিত্তি করেছেন এই কথার ওপর যে, নিকটাত্মীয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পালন শুধু একটা সদাচরণ ও আত্মীয়তা রক্ষার মহান ব্রত মাত্র। এটা কারুর ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় না, কাউকে তা করার জন্যে বাধ্য করা যায় না, মজবুর করা যায় না অথচ তাদেরই অনেকেই মনে করেছে, এটা একান্তই পালনীয় ওয়াজিব। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন না। ইমাম আবূ হানীফা, তার সঙ্গিগণ এবং ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদ থেকে বাহ্যিক বর্ণনাও এরূপ। ইবনে কুদামাহ্‌ বলেছেন, এই বর্ণনাটি বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও ইসহাক ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এই কথা রয়েছে ঃ

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٤٧ এবং الروض النضير ج ٢ ص ٤٢١

২. শায়খ আলীশ মালিকীকে একজন পূর্ণ বয়স্ক ও উপার্জনক্ষ শিক্ষার্থী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার বাবাকে যাকাত দিলে তা আদায় হয়ে যাবে কি ? জবাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ জায়েয। কেননা তার পূর্ণ বয়স্ক ও উপার্জনক্ষম হওয়ার দরুন সে দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। আর বিদ্যার্জনে মশগুল থাকার কারণে সে যাকাত পেতে পারে। فتح العلى المالك ج ١ ص ١٢٩

৩. المدونة الكبرى ج ا ص ٢٥٦ المطبعة الخيريه اولى سنة ١٣٢٤

৪. ঐ. পৃ. ২৫৪।

তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ভাই, বোন ও খালাকে যাকাত দেয়া যাবে ? জবাবে বললেনঃ 'পিতামাতা ও সন্তানাদি ছাড়া আর সব নিকটাত্মীয়কেই দেয়া যাবে'। এটাই অধিকাংশ আলিমের মত। আবূ উবাইদ বলেছেন, আমারও সেই কথা। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

الصد قة على المسكين صدقة وهى على ذى رحم ثنتان صدقة وصلة-

দান মিসকীনকে দিলে হয় দান আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে দিলে তা যেমন দান, তেমনি তা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাও।[১]

এখানে নফল বা ফরয—কোন কিছুরই শর্ত করা হয়নি। উত্তরাধিকারী ও অপরদের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। কেননা এরা বংশের মূল কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত নয়। ফলে অনাত্মীয় লোকদের মত হয়ে গেছে।[২]

ইবনে আবূ শায়বা ও আবূ উবাইদ একদল সাহাবী ও তাবেয়ীন থেকে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় তিনি বলেছেন ঃ 'নিকটাত্মীয়রা অভাবগ্রস্ত হলে তাকে যাকাত দেবে।'

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, ইবনে মাসউদের স্ত্রী তার অলংকারের যাকাত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তিনি অলংকারের যাকাত দিতে হয় বলে মনে করতেন—'আমার ক্রোড়ে আমার ভাইয়ের ইয়াতীমরা লালিত, আমার যাকাত তাদের দেব ? তিনি বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ।

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন ঃ আমার ইয়াতীম ও আমার নিকটাত্মীয়রাই আমার যাকাত পাওয়ার সবচাইতে বেশি অধিকারী।

হাসানকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ আমার ভাইকে আমার যাকাত দেব ? বললেন ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ভালোবেসে দেবে।

ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ একজন মেয়েলোকের সম্পদ আছে। সে তার যাকাত তার বোনকে দেবে কি ? বললেন ঃ হ্যাঁ।

দহ্হাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমার নিকটাত্মীয়রা গরীব হয়ে থাকলে অন্যদের অপেক্ষা তারাই তোমার যাকাত পাওয়ার বেশি অধিকারী।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, বলেছেন ঃ গ্রহণ করা হবে না এরূপ অবস্থায় যে, তার রক্ত সম্পর্ক তার মুখাপেক্ষী।[৩]

---

১. আবূ দাউদ ছাড়া অপর পাঁচখানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২. المغنى ج ٢ ص ٦٤٨ ।

৩. এসব উক্তি 'মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বা' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় الاموال । গ্রন্থের ৫৮১-৫৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

উপরে যে বিভিন্ন মত ও উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে আমি তার মধ্যে অগ্রাধিকার দিচ্ছি সাহাবী, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তীকালের অধিক সংখ্যক আলিম যে মত দিয়েছেন, সেটিকে। আর তা হচ্ছে, পিতামাতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য সব নিকটাত্মীয়কেই যাকাত দেয়া জায়েয হবে। ইমাম আবূ উবাইদও তাঁর الاموال গ্রন্থে এই মতকেই তারজীহ্ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আমাদের দলিল হচ্ছে ঃ

প্রথমত যে সব শরীয়াতী দলিল যাকাতকে সাধারণভাবে ফকীর মিসকীনদের জন্যে নির্দিষ্ট করেছে, তাতে নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নি। যেমন যাকাতের মূল আয়াত ঃ 'সাদকাত কেবলমাত্র ফকীর ও মিসকীনের জন্যে'। হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ তাঁদের ধনীদের নিকট থেকে তা দেয়া হবে এবং তাদেরই ফকীরদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে।'

এই সাধারণ তাৎপর্যসম্পন্ন ঘোষণাবলী সব নিকটাত্মীয়কেও শামিল করে। তাদেরকে এই সাধারণ অধিকারের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মত কোন তারতম্যধর্মী দলিল একটিও নেই। তবে স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তানদের কথা স্বতন্ত্র। এদেরকে এই সাধারণ অধিকার থেকে বাইরে গণ্য করে ইজমা। ইবনুল মুন্যির, আবূ উবাইদ ও 'বাহরিয়ুখ্নার' গ্রন্থ প্রণেতাগণ এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন নিজ নিজ গ্রন্থে।

এ ছাড়া আরও দলিল-প্রমাণ রয়েছে। যথাস্থানে আমরা সে সবের উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় ঃ যেসব দলিলে বিশেষভাবে নিকটাত্মীয়দের প্রতি সাদ্কা দানের উৎসাহ দেয়া হয়েছে—যেমন রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ মিসকীনকে সাদ্কা দিলে তা একটা সাদ্কাই হয়। আর রক্ত সম্পর্কশীল আত্মীয়কে দিলে তা সাদ্কা ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়ই হয়।[১]

'সাদকা' যাকাত বোঝায়—যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। নবী করীম (স)-এর আর একটি বাণী ঃ

انَّ اَفْضَلَ الصَّدَ قَةِ عَلَى ذِىْ الرِّحْمِ الْكَا شِحَ -

নিকটাত্মীয়কে দান করার উত্তম দিক হচ্ছে তোমার শত্রুতা গোপনকারী।[২]

১. হাদীসটি আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম, দারে কুত্নী উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٩

২. হাদীসটি আহমাদ ও তাবারানী কর্তৃক আবূ আইউব থেকে এবং এ দুজনই হাকীম ইবনে হেজাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। مجمع الزوائد এ-ও তা উদ্ধৃত হয়েছে। বলেছেন ঃ এর সনদ 'হাসান'। অনুরূপভাবে তাবারানী উদ্ধৃত করেছেন الكبير। গ্রন্থে উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা থেকে। এর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। الروض النضير ج ٢ ص ٤٢٢।

অনুরূপভাবে তাবারানী ও বাজ্জার আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন (পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসটির অংশ—যা বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ উদ্ধৃত করেছেন)ঃ তার স্ত্রী বিলালকে বললেন ঃ দুই মুহাজির মহিলার পক্ষ থেকে রাসূলে করীমকে সালাম বল। কিন্তু আমাদের পরিচিতি প্রকাশ করো না। তাকে বল ঃ 'তার স্বামী নিঃস্ব এবং তার ক্রোড়ে পালিত তার ভাইয়ের ঔরসজাত সন্তান ইয়াতীমদের জন্যে তার যাকাত ব্যয় করলে সে কি শুভ ফল পাবে ?' অতঃপর বিলাল নবী করীমের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তার জন্যে দ্বিগুণ শুভ ফল। একটা হল নিকটাত্মীয়তার আর একটা দানের সওয়াব।[১] আমরা বলেছি, কোনরূপ বিস্তারিত কথা জিজ্ঞাসা না করাটা এই সম্ভাব্যতা আনে যে, কথার তাৎপর্য হচ্ছে সাধারণ নির্বিশেষ। ইলমে উসূলের বিশেষজ্ঞগণ এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন।

তাঁদের কথা—'নিকটাত্মীয়দের দিলে তার ফায়দাটা তার নিজেরই হয়, এবং তার নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছুটে যায়, এ কথাটি স্ত্রী, সন্তান ও পিতামাতার ক্ষেত্রে খুবই সত্য ও প্রযোজ্য। কেননা তাদের ফায়দা মিলিত অবিভাজ্য। তারা সকলেই তার মালে সমানভাবে শরীক। এদের ব্যয়ভার বহন তার জন্যে ওয়াজিব এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।

অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে—আমি যা মনে করি, তাদের ব্যয়ভার বহন নিকটাত্মীয়ের জন্যে বাধ্যতামূলক হয় যদি তথায় মুসলমানদের ধন-মালে তাদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকে। আর যাকাত, ফাই, এক-পঞ্চমাংশও বায়তুলমালের অন্যান্য আয় উৎস। এগুলোর দ্বারা ব্যবস্থা করা না হলে তখন সচ্ছল অবস্থার নিকটাত্মীয়ের জন্যে কর্তব্য হয় নিঃস্ব নিকটাত্মীয়দের ব্যয়ভার বহন করা। সে তো তার নিকটাত্মীয়কে ক্ষুধা-বস্ত্রহীনতার মধ্যে পড়ে মরে যেতে দিতে পারে না। অনুরূপভাবে সরকার যদি যাকাত সংগ্রহকারী ও দরিদ্র জনগণের জীবিকার নিরাপত্তা দানকারী না হয়, তখন ধনী নিকটাত্মীয়ের কর্তব্য হয় তার নিকটাত্মীয় দরিদ্র ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা। অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে মরতে দিতে পারে না সে। এই নিরাপত্তা দান সম্পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হোক, কি আংশিক, তার জন্যে যাকাত দ্বারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই।

কেননা নিকটাত্মীয়ের নিরাপত্তা দান, তার প্রয়োজন পূরণ ও তার দুঃখ বিদূরণই ওয়াজিব। এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার্থে এবং তার অধিকার আদায়স্বরূপ। আর এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার জন্যে যাকাতকে একটা আয়রূপে গণ্য করার পথে প্রতিবন্ধক কোন দলিল পাওয়া যায়নি। সরকার যদি এই যাকাত সংগ্রহ করত তাহলে

---

১. হাদীসটি তাবারানী الأوسط গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, বাজ্জারও অনুরূপ বর্ণনা তুলেছেন। একজন বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনে নছর, ইবনে হাব্বান প্রমুখ তাকে 'সিকাহ' বলেছেন; কিন্তু তার সম্পর্কে আপত্তি আছে। বাজ্জারের বর্ণনাকারিগণ সহীহ্। দেখুন ঃ مجمع الزوائد ج ٣ ص ١١٦ সহীহ্ ইবনে হাব্বানেও উদ্ধৃত হয়েছে। দেখুন ঃ الروض النضير ج ٢ ص ٤٢٢।

এই সব দরিদ্র ব্যক্তির ব্যয়ভার যাকাতের আয় থেকেই বহন করা সম্ভব হত। তাই এরূপ অবস্থায় যখন এরূপ সরকার নেই—একজন মুসলিম ব্যক্তি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে তার নিকটাত্মীয়দের জন্যে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—করবে সেই যাকাত দিয়েই, যা দিয়ে রাষ্ট্রেরই কর্তব্য ছিল তা সংগ্রহ ও বণ্টন করে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা।

তবে এমন আলিমও রয়েছেন, যারা নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার পালনের বাধ্যবাধকতা এবং তাকে যাকাত দেয়ার মধ্যে কোন বৈপরীত্য আছে বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেছেন, নিকটাত্মীয়দের ব্যয়ভার বহন করা বিশেষ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে ওয়াজিব। তা সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাত দেয়া তাঁরা জায়েয বলেছেন।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গিগণের অভিমত। তাঁরা চিন্তা করেছেন, ব্যয়ভার বহন বাধ্যতামূলক হলেও তা যাকাত দেবার প্রতিবন্ধক নয়। যাকাত দেবার প্রতিবন্ধক হচ্ছে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ফায়দার মালিকানার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব। এরূপ অবস্থায় 'মালিক বানিয়ে দেয়া' তাদের মতে যাকাতের যে-রুকন, তা বাস্তবায়িত হয় না। যাকাতদাতাই যেন নিজেকে যাকাত দিচ্ছে। তাঁরা বলেছেন, এই অবস্থাটা দাতা ও তার সন্তান পিতামাতার মধ্যে সংঘটিত হয়, তা ছাড়া অন্য কোনখানে তা ঘটে না। এই কারণেই তাদের পরস্পরের পক্ষে পরস্পরে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু অন্য নিকটাত্মীয়দের বেলায় তা নয়। তাদেরকে যাকাত দিলে সেখানে 'তামলীক' হতে পারে। কেননা সেক্ষেত্রে যাকাতের ফায়দাটা পারস্পরিক শরীকানায় থাকে না, সেটা ছিন্ন হয়ে যায়। আর এ কারণে তাদের পারস্পরিক সাক্ষ্যদানও বৈধ বলে স্বীকৃত হয়।[১]

'রওজুন্ নজীর' গ্রন্থ প্রণেতা শেষ দিকের জায়দীয়া ফিকার ফিকাহ্‌বিদ। তিনি বলেছেন ঃ 'আলিমগণ যে কারণ দেখিয়েছেন যে, নিকটাত্মীয়কে যাকাত দিলে তাতে ভবিষ্যতের যে ব্যয়ভার বহন তার দায়িত্ব, তা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। তাই নিকটাত্মীয়দের সাদকা দানের ব্যাপারে হাদীসসমূহে যে উৎসাহ দান করা হয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার দরুন তা গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা বাধা হচ্ছে, বলা যাবে যে, নিকটাত্মীয়ের খরচ বহনও ওয়াজিব—তাকে যাকাত দিলে তা বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়ে যায় না। কেননা নিকটাত্মীয় কর্তৃক নিকটাত্মীয়ের খরচ বহনের ব্যাপারটি কখনও কখনও ওয়াজিব হয়, স্থায়ীভাবে তো নয়।[২]

ইমাম শাওকানী বলেছেন, আসল কথা হচ্ছে, কোনই প্রতিবন্ধকতা নেই। যে লোক মনে করেন, নিকটাত্মীয়তা কিংবা ব্যয়ভার বহন ওয়াজিব হওয়া দুটিই প্রতিবন্ধক, তার স্বপক্ষে দলিল পেশ করা তারই কর্তব্য। কিন্তু আসলে তেমন কোন দলিল-ই নেই।[৩]

---

১. দেখুন ঃ بدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩ - ٥٠.

২. الروض النضير ج ٢ ص ٤٢٣.

৩. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٩.

পঞ্চম আলোচনা

মুহাম্মাদ (স)-এর বংশ-পরিবার

যেসব হাদীস মুহাম্মাদ (স)-এর বংশ-পরিবারের জন্যে যাকাত হারাম বলে

আহমাদ ও মুসলিম মুত্তালিব ইবনে রবীয়াতা ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি এবং ইবনে আব্বাস পুত্র ফযল একসাথে রাসূল করীমের নিকট উপস্থিত হলেন। পরে আমাদের একজন কথা বলতে গিয়ে বললেন ঃ 'হে রাসূল! আমরা আপনার নিকট এসেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমাদেরকে এ সব যাকাত-সাদকাতের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করবেন। তাহলে তা থেকে অন্যরা যেমন ফায়দা পাচ্ছে, আমরাও তেমনি তার ফায়দা পেতে পারব। লোকেরা যেমন আপনার নিকট যাকাতের মাল পৌঁছিয়ে দেয়, আমরাও তেমনি পৌঁছিয়ে দেব। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

انَّالصَّدَقَةَ لَاتَنْبَـغِىْ لِمُحَمَّدٍ وَلَالِاَلِ مُحَمَّدٍ - انَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ -

সাদকা-যাকাত মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশ পরিবারের লোকদের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তা লোকদের ময়লা আর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপর বর্ণনার ভাষা হচ্ছে ঃ

لَاتَـحِـلُّ لِـمُـحَـمَّـدٍ وَلَالِاَلِ مُـحَـمَّدٍ -

মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশ-পরিবারের লোকদের জন্যে যাকাত হালাল নয়।

'মুন্‌তাকা' গ্রন্থে এই হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।[1]

আবূ দাউদ ও তিরমিযী আবূ রাফে থেকে বর্ণনা করেছেন (তিরমিযী হাদীসটিকে বলেছেন সহীহ্) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বনু মাখজুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদ্‌কা-যাকাত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে সেই ব্যক্তি আবূ রাফেকে বললে ঃ তুমি আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে তুমিও তা থেকে পাবে। আমি বললাম ঃ আমি নিজেই রাসূলের নিকট প্রার্থনা করব, তাই করলামও। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ

اِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَنَّا اَهْلُ بَيْتٍ لَاتَحِلُّ لَنَا الصَّدَ قَةُ-

জনগণের মুক্ত দাস তাদের নিজেদের মধ্যেই গণ্য হয়। আর আমরা আহ্‌লি বাইতের লোক। আমাদের জন্যে সাদ্‌কা-যাকাত হালাল হয় না।[2]

---

১. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٧٥

২. দেখুন ঃ المجموع ج ٦ ص ١٦٨ – ٦٨

আবূ রাফে রাসূলে করীমের মুক্ত দাস ছিলেন।

ইমাম বুখারী ما يذكر في الصدقة للنبى صلعم অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হযরত আলীর পুত্র হাসান যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর ধরে মুখে পুরেছিলেন (তিনি বালক বা শিশু ছিলেন) তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ এ্যা, এ্যা, কি করছ ?.......যেন তিনি তা ফেলে দেন। পরে বললেন ঃ

أَمَا شَعَرْتَ اَنَّا لاَنَـأْ كُلُ الصَّدَقَةَ-

তুমি কি বুঝতে পারনি, আমরা তো যাকাত খাই না ?

হাদীসটি মুসলিমও উদ্ধৃত করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, মুসলিমের বর্ণনার ভাষা এই ঃ

اِنَّا لاَتَحِلُّ لَنَاالصَّدَقَةَ-

আমাদের জন্যে যাকাত হালাল নয়।

অপর বর্ণনা মা'মার থেকে। তাঁর ভাষা ঃ

اِنَّ الصَّدَ قَةَ لاَتَحِلُّ لاٰلِ مُحَمَّدٍ-

সাদকা-যাকাত মুহাম্মাদের বংশধরদের জন্যে জায়েয নয়।

ইমাম আহ্‌মাদ, তাহাভী হাসান ইবনে আলীর নিজের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلٰى جَرِيْنَ مِنْ تَمرِ الصَّدَ قَةِ فَاَخَذْتُ مِنْهُ تَمرَةً فَالْقَيْتُهَا فِيْ فِيَّ فَأَ خَذَهَا بِلعَابِهَا - فَقَالَ : اِنَّا اٰلِ مُحَمَّدٍ لاَتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ -

আমি নবী করীম (স) এর সঙ্গে ছিলাম। তখন যাকাতের খেজুরের দুটি বোঝা চলে এলো। আমি তার একটি ধরলাম ও সেটি মুখে নিক্ষেপ করলাম। নবী করীম (স) তখনই সেটিকে মুখের পানিসহ ধরে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ মুহাম্মাদের বংশের লোকদের জন্যে যাকাত হালাল নয়।

এই হাদীসটির সনদ খুব মজবুত।[১]

এ পর্যায়ে উল্লিখিত সমস্ত হাদীসই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) এবং তার বংশের লোকদের জন্যে যাকাত হালাল নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'আলে মুহাম্মাদ'—'মুহাম্মাদের বংশের লোক' কারা ?... কোন্ ধরনের সাদ্‌কা তাঁদের জন্যে হালাল নয় ?

---

১. الفتح البارى ج ٣ ص ٢٢٨

এ ক্ষেত্রে খুব বেশি মতবিরোধ দেখা যায়। আমরা তা এখানে উল্লেখ করছি। শেষে আমাদের অভিমতও প্রকাশ করব, কোন্ মতটিকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি তাও বলব।

'আলে মুহাম্মাদ (স)' কারা

হাফেয ইবনুল হাজার 'ফত্হুল বারী' গ্রন্থে এবং শাওকানী 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে 'আলে' বলতে কি বোঝায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় ফিকাহ্বিদ্দের মতপার্থক্যের উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী ও বিপুল সংখ্যক আলিম বলেছেন, তারা হচ্ছে বনু হাশিম ও বনু-মুত্তালিব। ইমাম শাফেয়ীর এই মতের দলিল হচ্ছে, নবী করীম (স) বনু মুত্তালিবকে বনু হাশিমের সাথে শরীক বানিয়েছেন নিকটাত্মীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট অংশে। তাদের ছাড়া কুরাইশ বংশের অন্য কাউকে কিছু দেন নি। যে সাদ্কা দাতাদের প্রতি হারাম ঘোষণা করেছেন, তার বিকল্প ব্যবস্থা এই দানটা। বুখারী জুবাইর ইবনে মুত্য়িম বর্ণিত হাদীসে এই কথাই দেখিয়েছেন। হাদীসটির বক্তব্য হচ্ছে ঃ

আমি ও উসমান ইবনে আফ্ফান নবী করীম (স)-এর নিকট গেলাম। এবং বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি বনু-মুত্তালিবকে তো খায়বরের এক-পঞ্চমাংশ দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা ও তারা একই মর্যাদার লোক। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اِنَّمَا بَنُوْ الْمُطَّلِبِ وَبَنُوْهَا شِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ -

বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিম তো এক ও অভিন্ন জিনিস।

এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে এই বলে, তিনি তাদের তা দিয়েছেন তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে, যাকাতের বিকল্প হিসেবে নয়। আবূ হানীফা, মালিক ও সাদুইয়া বলেছেন, শুধু বনু হাশিমরাই হচ্ছে আলে মুহাম্মাদ। আহমাদ থেকে বনু মুত্তালিব সম্পর্কে দুটি বর্ণনা এসেছে। আর অন্যদের থেকে এসেছে, তারা হচ্ছে, বনু গালেব ইবনে ফহর। 'ফত্হুল বারী' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে।

'বনু হাশিম' বলতে বোঝায়, আলী, আকীল, জাফর, আব্বাস ও আল-হারম-এর বংশধররা। তার মধ্যে আবূ লাহাবের বংশধররা গণ্য নয়। কেননা এই বংশের লোকই রাসূলের জীবদ্দশায় ইসলাম কবুল করে নি। এই কথার প্রতিবাদ করে جامع الاموال গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ উৎবা ও মা'কাব নামে আবূ লাহাবের দুই পুত্র মক্কা বিজয়ের বৎসর ইসলাম কবুল করেছিল। নবী করীম (স) তাদের ইসলাম কবুলের দরুন খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তাদের জন্যে তিনি দো'আও করেছিলেন। এরাই দুইজন রাসূলে করীম (স) এর সঙ্গে হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধে শরীকও হয়েছিল। বংশাবিজ্ঞ লোকদের মতে এই দুজনের অনুসরণকারীও ছিল বহু লোক।

ইবনে কুদামাহ্ লিখেছেন, বনু হাশিমের জন্যে ফরয যাকাত হালাল নয়, এ বিষয়ে কোন মতিবিরোধের কথা আমরা জানি না। আহলি বাইতের আবূ তালিবও তাই

বলেছেন। 'বাহরি যুখ্খার' গ্রন্থে তার সূত্রে এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে বাসলান এই পর্যায়ে ইজমা হওয়ারও উল্লেখ করেছেন। তাবারী ইমাম আবূ হানীফার এই মত উদ্ধৃত করেছেন যে, বনু হাশিমের জন্যে সাদ্‌কা গ্রহণ জায়েয। তাঁর এই মতটিও উদ্ধৃত হয়েছে যে, তারা রাসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ থেকে বঞ্চিত হলে যাকাত গ্রহণ তাদের পক্ষে জায়েয হবে। তাহাভী এই কথা বলেছেন।

কোন মালিকী আলিম আব্‌হরী সূত্রে এই কথা উদ্ধৃত করেছেন। 'ফত্‌হুল বারী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন কোন শাফেয়ীরও এই মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ থেকেও এই কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ যাকাত তাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে গ্রহণ করা জায়েয, অন্য লোকদের নিকট থেকে জায়েয নয়। 'বাহর' গ্রন্থে জায়দ ইবনে আলী, মুর্তাজা, আবুল আব্বাস ও ইমামীয় সূত্রেও এ কথাই বলা হয়েছে। আর 'শিফা' গ্রন্থে আল-হাদী ও আল-কাসেম আল-ইয়ামীর সূত্রেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনুল হাজার বললেন, এ পর্যায়ে মালিকী মায্‌হাবের পক্ষে চারটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে ঃ জায়েয, নিষিদ্ধ, নফল দান জায়েয, ফরয নয় আর তার বিপরীত।

শাওকানী লিখেছেন, যে সব হাদীস সাধারণভাবে হারাম হওয়ার কথা বলে, তা সকলের জন্যেই প্রবর্তিত। বলা হয়েছে এই হাদীসসমূহ তাৎপর্যতভাবে 'মুতাওয়াতির'। খোদ আল্লাহ্‌র কালামও তাই বলে ঃ

قَلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا اَلْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى - (الشورى-٢٣)

বল এই কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না—শুধু নৈকট্যে ভালোবাসা চাই।

বলেছেন ঃ قَلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ - (ص-٨٦)

বল, এই কাজের জন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকই চাই না।

এই পারিশ্রমিক বা যাকাত যদি তার আলে'র জন্যে হালাল করে দিতেন, তাহলে তারা সেজন্যে সম্ভবত দোষ ধরত। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও পঠনীয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا - (التوبه - ١٠٣)

তুমি তাদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে তার দ্বারা।

নবী করীম (স) এর কথাটিও প্রমাণিত হয়েছে ঃ اَنَّ الصَّدَقَةَ اَوْ صَاخُ النَّاسِ-

'যাকাত জনগণের ময়লা।'[১] মুসলিমের বর্ণনা।

---

১. ইবনুল হাজার বলেছেন ঃ এ দলিল থেকে নফল সাদ্‌কা জায়েয প্রমাণিত হতে পারে, ফরয যাকাত

যাঁরা বলেছেন, হাশিমীরা হাশিমীদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারে—তা হালাল, তারা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন হযরত আব্বাস বর্ণিত হাদীস। এ হাদীসটি মুহাদ্দিস হাকেম 'উলুমুল হাদীস'-এর ৩৭তম অধ্যায়ে এমন সনদের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যার সব কয়জন লোকই বনু হাশিম থেকে। তা হচ্ছে, হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বলেছেন ঃ 'আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো আমাদের ওপর লোকদের সাদকাত (যাকাত) হারাম করে দিয়েছেন' তাহলে আমাদের পরস্পর থেকে তা গ্রহণ করা হালাল হবে কি না? বললেন হ্যাঁ। কিন্তু এই হাদীসের কতিপয় বর্ণনাকারীর ওপর 'তুহ্মাত' (দোষ) আরোপিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে হাজার ও ইমাম শাওকানী যা উদ্ধৃত করেছেন, তা ছাড়াও এখানে আমরা চারটি মাযহাবের গ্রন্থাবলী যা যা বলা হয়েছে, তা উদ্ধৃত করছি। এতে করে আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে।

হানাফী ফিকাহ্র مجمع الا نهر গ্রন্থে বলেছেন ঃ

ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত ঃ তাদেরকে নফল ও ফরয যাকাত দিতে কোন দোষ নেই।

ইমাম মুহাম্মাদের كتاب الاثار -এ বলা হয়েছে ঃ

ইমাম আবূ হানীফা থেকে এপর্যায়ে দুটি বর্ণনা এসেছে। ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আমরা জায়েয হওয়ার বর্ণনাটি গ্রহণ করছি কেননা তা তাদের জন্যে হারাম ছিল বিশেষভাবে স্বয়ং রাসূলে করীমের জামানায়। در المنتقى গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাশিমীকে যাকাত দেয়া অনুরূপভাবে জায়েয বলে বর্ণনা এসেছে।

তাঁর থেকে এসেছে ঃ আমাদের এই যুগে তা নিঃশর্তভাবে জায়েয। তাহাভী বলেছেনঃ আমরা এই মতটিই গ্রহণ করছি। কাহাস্তানী প্রমুখও এই কথাটিকেই বহাল রেখেছেন।[১]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন, বনু হাশিমের জন্যে হাশিমীদের যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।[২] জাফরীয়া'র মতও তাই।[৩]

নয়। অধিকাংশ হানাফী আলিমেরও এই মত। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকদের নিকটও তাই। তার বিপরীতটা—ফরয যাকাত জায়েয, নফল দান জায়েয নয়। বলেছেন, ফরয দান গ্রহণ করায় কোন লাঞ্ছনা নেই, নফল দানের কথা আলাদা। বনু হাশিম ও অন্যদের মধ্যে এই তারতম্য করার কারণ হচ্ছে, নীচের হাত উপরের হাতের ওপর তোলাই হল নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। কিন্তু উপরের হাতও যদি সেরূপ হয়, তাহলে দোষ নেই। (الفتح ج ٣ ص ٦٦٧)

১. দেখুন ঃ مجمع الانهر وبهاشه در المنتقى ص ٢٢٤

২. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٥٧

৩. فقه الامام جعفر ج ٩ ص ٩٥.٩٤ এই গ্রন্থে রয়েছে ঃ মুস্তাহাব যাকাত সব মানুষ থেকেই গ্রহণ তাদের জন্যে জায়েয ব্যবসায়ের যাকাতের ন্যায়। তাছাড়া যব, গম, খেজুর, কিশমিশ ও অন্যান্য কৃষি ফসলেরও।

এক্ষেত্রে সবচাইতে কঠিন ও কঠোর মাযহাব হচ্ছে জায়দীয়া মাযহাব। তাতে হাশেমীদের হাশেমী থেকে যাকাত গ্রহণও জায়েয মনে করা হয়নি। তাদের নিকট এটার ওপরই নির্ভরতা। তারা যাকাত গ্রহণের চাইতে লাশ খাওয়া ভাল বলেছেন। বলেছেন ঃ লাশ ভক্ষণ যদি তাকে ক্ষতি করে, তা হলে ঋণ হিসেবে যাকাত নিতে পারে।

এ গ্রন্থে লিখিত রয়েছে ঃ মুস্তাহাব যাকাত সব মানুষ থেকেই গ্রহণ তাদের জন্যে জায়েয—ব্যবসায়ের যাকাতের ন্যায়। তাছাড়া যব, গম, খেজুর, কিসমিস ও অন্যান্য কৃষি ফসলেরও।

তা যখনই সম্ভব হবে ফিরিয়ে দেবে। এ সব কথা সেই কঠিন ঠেকায় পড়া ব্যক্তি সম্পর্কে, যার ক্ষুধায় বা পিপাসায় কিংবা নগ্নতা প্রভৃতির দরুন ধ্বংস ও মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে পড়েছে।[১]

হাশিমীর গনীমত ও ফাই সম্পদের অংশ না পেলে

এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, বায়তুলমালে যখন গনীমত ও ফাইর সম্পদ থাকবে না কিংবা এমন ব্যক্তি তার কর্তা হয়ে বসল যে, তাদেরকে সে কিছুই দিচ্ছে না, তখন বনু হাশিমের অবস্থা কি হবে ? মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, বায়তুলমাল থেকে তাদের যা প্রাপ্য তা যদি তাদেরকে দেয়া না হয় আর সে কারণে তারা কষ্টের দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তাহলে তখন তাদেরকে যাকাত থেকে দিতে হবে। এরূপ অবস্থায় তাদেরকে দেয়া অন্যদেরকে দেয়ার তুলনায় অনেক উত্তম।

তবে তাঁদের কেউ কেউ এই শর্ত করেছেন যে, এই দানটা জায়েয হবে কেবল কঠিন প্রয়োজন দেখা দিলে, এরূপ অবস্থায় অন্যান্য হারাম জিনিসও যেমন হালাল হয়ে যায়, এও তেমনি। এরূপ অবস্থায় লাশ ভক্ষণ করাও মুবাহ হয়ে যায়। তার অর্থ, তা আসলে হারাম প্রয়োজন বশত হালাল হয়ে গেছে। (হালাল হয়ে গেছে ঠিক নয়, শুধু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে শর্ত সাপেক্ষে)।

অন্যরা বলেছেন ঃ এই শেষের যুগে এসে দৃঢ় প্রত্যয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই তাদেরকে যাকাত দেয়া যিম্মী ও কাফির-ফাজিরদের যাকাত দেয়ার তুলনায় অনেক সহজ।[২]

হানাফীদের কারুর কারুর বক্তব্য আমরা একটু পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। শাফেয়ী মাযহাবের আবূ সায়ীদ আল-ইস্তুখ্রী বলেছেন ঃ তারা যদি 'খুমুস' থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদের যাকাত দেয়া জায়েয। কেননা তাদের জন্যে যাকাত হারাম করা হয়েছে এই কারণে যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশে তাদের প্রাপ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। অতএব এই প্রাপ্য যখন তারা পাবে না, তখন যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

---

১. شرح الازهار وحواشيه ج ١ ص ٥٢٠ - ٥٢٢

২. فتح العلى المالك ج ١ ص ١٤١ وحاشية الصوى ج ١ ص ٢٣٢

নববী রাফেয়ী থেকে উল্লেখ করেছেন ঃ গাযালীর সঙ্গী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া উক্ত মতের সমর্থনে ফতোয়া দিতেন।[১]

ইবনে তাইমিয়া ও হাম্বলী মাযহাবের কাযী ইয়াকুব অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন, তারা যদি গনীমত ও ফাই সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে জনগণের যাকাত থেকে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারে—তা জায়েয। কেননা এক্ষণে তারা বড় অভাব ও প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে।[২]

ইমামীয়া জাফরীয়া'র মাযহাব-ও তাই।[৩]

বনু হাশিমকে যাকাত দেয়ার পক্ষে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ কোন মত দেন নি। (এককভাবে তারা কিংবা মুত্তালিবসহ—এ পর্যায়ের মতভেদ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে) তারা যদি এক-পঞ্চমাংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিতও হয় তবুও। কেননা যাকাত তাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে রাসূলে করীমের সাথে তাদের সম্পর্কের মর্যাদার কারণে, তাই 'খুমুস' পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলে এই মর্যাদাটা তো শেষ হয়ে যায় না।[৪]

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

আমি যা মনে করি, আমাদের এ কালে নবী করীম (স)-এর নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়ার কথাটিই অধিক যুক্তিসংগত ও শক্তিশালী। কেননা এ কালের তারা গনীমত ও ফাই সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ পাচ্ছে না। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় তাদের প্রতি সাদ্‌কা-যাকাত হারামকরণের বিনিময়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এই গনীমত ও 'ফাই' সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আর নিকটাত্মীয় হিসেবে যে অংশটি নির্দিষ্ট হয়েছিল, তার উল্লেখ এই আয়াতটিতে রয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ - وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

তোমরা জেনে রেখো, যে জিনিসই তোমরা গনীমতরূপে পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্যে এবং রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে।[৫]

অপর আয়াত ঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى

---

১. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٥٧ ২. المجموع ج ٦ ص ٢٢٧ - ٢٢٨
৩. فقه الامام جعفر ج ٢ ص ٩٥ ৪. المجموع ج ٦ ص ٢٢٧
৫. سورة انفال - ٤١

وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ لْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ـ

আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নগর-গ্রামবাসীদের কাছ থেকে 'ফাই' হিসেবে যা-ই দিবেন, তা আল্লাহ্র জন্যে, রাসূলের জন্যে, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে যেন ধন-সম্পদ কেবলমাত্র তোমাদের ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তনশীল হয়ে না থাকে।[১]

বনু হাশিমের জন্যে যাকাত হারাম করা হয়েছিল তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে। এ কথাটি খুব শক্তিশালী নয়। বরং উত্তম কথা হল, তা ছিল রাসূলের তরফ থেকে তাদের সংরক্ষণ এবং সাহায্যদান স্বরূপ। ফলে এই প্রাপ্তিতে তাদের মুসলিম ও কাফির উভয় শ্রেণীর লোকই অংশীদার হয়েছিল।

বনু মুত্তালিবকে বনু হাশিমের সাথে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন শাফেয়ী উক্তরূপ কথা বলেছেন। তাঁরা যুক্তিস্বরূপ বলেছেন, এরা সকলেই রাসূলে করীমের সঙ্গে বহু দুঃখ-কষ্ট নির্যাতন ও ক্ষুধা-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এরা তার সঙ্গী হয়ে আবূ তালিব গুহায় প্রবেশ ও অবস্থান করেছেন এবং কুরাইশের ক্রোধ ও বয়কটের যন্ত্রণা তিলে তিলে সহ্য করেছেন। পরে যদি কোন-না-কোন কারণে নিকটাত্মীয়ের জন্যে নির্দিষ্ট এই অংশটি প্রত্যাহার করা হয়, বায়তুলমাল শূন্য হওয়া অথবা শাসকদের স্বৈর নীতি অনুসরণের কারণে তা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যাকাত থেকে বঞ্চিত করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না নতুবা সন্দেহটা তাহাদের জন্যে খুব মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে।

রাসূলে করীম (স)-এর দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নিকটাত্মীয়ের জন্যে নির্দিষ্ট এই অংশটি বাতিল হয়ে গেছে বলে যখন বিপুল সংখ্যক আলিম ও বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং পরবর্তী খলীফার নিকটাত্মীয়ের জন্যে তা পুনঃনির্ধারিত হয়ে গেছে অথবা তা জিহাদের প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে[২], তখন তার বিকল্প যাকাত তাদের জন্যে জায়েয হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

---

১. الحشر –٧

২. আবূ উবাইদও কিতাবুল খারাজে আবূ ইউসুফ এবং ইবনে জরীর সূরা আন্ফাল-এর উপরিউক্ত (গনীমত সংক্রান্ত) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ হানাফীয়া থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে রাসূলের ও নিকটাত্মীয়ের অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, রাসূলের ইন্তেকালের পর লোকেরা এ দুটি অংশ সম্পর্কে নানা মতবিরোধের মধ্যে পড়ে যায়। কারুর মত এই হয় যে, নৈকট্যের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ ছিল রাসূলের নিকটাত্মীয়ের জন্যে। অপর লোকেরা বলেলেন, তা এখন মুসলমানদের খলীফার নিকটাত্মীয়রা পাবে। অপর লোকেরা বললে, নবী করীমের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ তাঁর পরবর্তী খলীফা পাবে। পরে সকলের মতের সমন্বয় করা হয় এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে, এই দুটি অংশ আল্লাহ্র পথে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হবে।

পরে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরের খিলাফত আমলে এই ব্যবস্থাই কার্যকর হয়। দেখুন ঃ الاموال ص ٣٣٢ আরও দেখুনঃ بداية المجتهد ج اص ٣٩٠ – ٣٩١ ط–الجلى —পরে হযরত আলী (রা) যখন খলীফা হলেন, তখনও এই নীতি কার্যকর থাকে (الاموال)

উপরিউক্ত মতটি আরও শক্তিশালী হয় এই কথায় যে, জমহুর আলিম যেসব হাদীসের ভিত্তিতে বনু হাশিমের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে যাকাত হারাম হওয়ার মত দিয়েছেন, কেউ কেউ বনু মুত্তালিবকেও তাদের সাথে যুক্ত করেছেন। তাদের মুক্ত করা দাসদেরও তাদেরই মর্যাদায় ধরে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেছেন, সেই সব হাদীস আসলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দেয় না।

সত্যি কথা হচ্ছে, যে লোকই সর্বপ্রকার বিদ্বেষ-আত্মপক্ষ, অন্ধ অনুসরণ, প্রশাসকদের খ্যাতি ও মতদাতাদের দাপট প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অনাবিল বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সে সব বিষয় বিবেচনা করবেন, তাঁরই সম্মুখে উক্ত মতের বিপরীত কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিবাদ হয়ে উঠবে, তা হচ্ছে ঃ

ক. মুত্তালিব ইবনে রবীয়াতা বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে বনু হাশিমের দুইজন যুবক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট যাকাত-সাদ্‌কাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্তির প্রার্থনা করে, যেন অন্য লোক যে ফায়দা পাচ্ছে, তারাও তা পেতে পারে। নবী করীম (স) তাদের জন্যে এই পথ বন্ধ করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন এবং তার ঘর ও নিকটবর্তী বংশের লোকদের পক্ষ থেকে ত্যাগ ও কুরবানীর অনুসরণযোগ্য আদর্শ কায়েম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গনীমতের মাল ও অনুরূপ ফায়দা পাওয়া থেকেও তাদেরকে দূরে রাখলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তারা রাসূলের নিকট কাবার খেদমত ও পানি পান করানোর সেবার সুযোগ লাভ করতে চাইলেন। তখন তিনি তাদেরকে এই কাজের সুযোগ দিলেন। কেননা এ কাজে ঝুঁকি ও কষ্ট রয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

انما اوليكم ماتر زاؤن لاماتر زاؤن -

তোমাদের পক্ষে উত্তম হচ্ছে তা যা তোমরা দেবে, তা নয় যা তোমরা পাবে।[১]

বুখারী উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা হচ্ছে, 'যাকাত আলে-মুহাম্মাদের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়'। এ থেকে বড়জোর মক্‌রুহ্ তানজীহী বোঝায়। মনে হয় যে কাজে হালাল নয় এমন জিনিস গ্রহণের আশংকা থাকে, তার নিকটে যাওয়া থেকে। তিনি তাদের মনে ঘৃণা বা এড়ানোর ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন। 'ইবনুল লাতবিয়' তাই মনে করেছেন। আর এ কারণেই উবাদাতা ইব্‌নুস্ছামেত প্রমুখ সাহাবী সাদ্‌কাত-যাকাত সংগ্রহের কর্তৃত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কেননা তাতে জায়েয নয় এমন অনেক কাজ হওয়ার আশংকা ছিল।

এই কর্তৃত্বপূর্ণ দায়িত্বটি কঠোরতার ওপর ভিত্তিশীল। কেননা তা জনগণের ধন-সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা গোটা মুসলিম সমষ্টির সম্পদ। মুসলমান অভাবগ্রস্ত লোকদের—কিংবা মুসলমানদের যে জিনিসেরই প্রয়োজন, তা পাওয়ার অধিকারে

---

১. سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٢ بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد

সম্পদ। তাই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পাওয়ার অধিকারসম্পন্ন লোকদের থেকে অতিরিক্ত যা-ই গ্রহণ করবে, তাতেই ফকীর ও অভাবগ্রস্ত লোকদের খালেছ অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে এবং সমষ্টির সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হবে।

এই হাদীস থাকা সত্ত্বেও অনুসৃত মাযহাবগুলোর বিপুল সংখ্যক আলিম বনু হাশিমের লোকদের জন্যে এই বিভাগের কর্মকর্তা হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। 'যাকাত সংস্থার কর্মচারী' পর্যায়ের আলোচনায় আমরা এসব কথা বিশদভাবে বলে এসেছি। আবূ রাফে বর্ণিত হাদীসটিও এই তাৎপর্যকেই শক্তিশালী করে। তা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, রাসূলের ঘরের লোকদেরকে যাকাত-সাদকা সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মূল কারণ তাদের বংশীয় মর্যাদা রক্ষা নয়, বরং তাদের ওপর যে মিথ্যা সন্দেহ ও অভিযোগ হতে পারে, তা থেকে রক্ষা করাই ছিল আসল লক্ষ্য। ফলে মিথ্যা দোষারোপকারীদের মুখ যেমন বন্ধ থাকবে, তেমনি একটা উত্তম অনুসরণীয় আদর্শও সংস্থাপিত হবে। রাসূলের বংশ ও তাঁদের মুক্ত করা লোকদের এই প্রশিক্ষণও হবে যে, তারা কষ্ট ও ঝুঁকি বরদাশ্‌ত করতে মন-মানসিকতার দিক দিয়ে প্রস্তুত হবে। গনীমতের মালের প্রতিও তাঁদের লোভ হবে না। কেবল মর্যাদা রক্ষাই যদি এই নিষেধের কারণ হত, তাহলে তাঁদের মুক্ত করা গোলামদের নিশ্চয়ই তাদের সাথে যুক্ত করা হত না।

খ. হাসান ইবনে আলীর বর্ণনা, রাসূলের কথা ঃ 'তুমি বোঝা না, আমরা যাকাত-সাদ্‌কা খাই না'—এবং মুসলিমের বর্ণনা ঃ 'আমাদের জন্যে সাদ্‌কা যাকাত হালাল নয়,' এসব থেকে আমার মনে হচ্ছে, নবী করীম (স) রাষ্ট্র ও সমাজপ্রধান হিসেবেই এসব কথা বলেছিলেন। কেননা তাঁর কর্তৃত্বে যাকাত-সাদ্‌কাত সংগৃহীত ও একত্রিত হলেই তো হালাল হয়ে যায় না। তা তো মুসলিম সমষ্টির মালিকানা সম্পদ। 'হযরত উমর (রা) যাকাতের দুগ্ধ পান করেছিলেন ভুলবশত, সঙ্গে সঙ্গেই তা থু থু করে ফেলে দিয়েছিলেন'—বর্ণনাটিও ঠিক এ পর্যায়ে গণ্য।[১]

البحر الزخار গ্রন্থে ঠিক এই জন্যেই বলা হয়েছে ঃ 'রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে হালাল নয়, যেমন রাসূলও রাষ্ট্রপ্রধানই। হযরত উমর যাকাতের দুগ্ধ এ জন্যেই পরিহার করেছিলেন।[২]

গ. উক্ত হাদীসসমূহ যেসব কার্যকারণ ও সম্ভাবনা উপস্থাপিত করেছে, তা থেকে আমরা যখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম ও নিছক শব্দসমূহের বিবেচনায় আত্মনিয়োগ করলাম, তখন বিবেচ্য হল ঃ 'আলে মুহাম্মাদ' বাক্যটি কি বোঝায় ? তা কি নিশ্চিতভাবে শুধু বনু হাশিমের লোকদের কিংবা তাদের সাথে বনু মুত্তালিবও বোঝায় কিয়ামত পর্যন্ত ?

এরূপ অর্থ হওয়ার কোন অকাট্য ও নিরংকুশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং 'আলে-মুহাম্মাদ' ঠিক 'আলে ইবরাহীম' 'আলে ইমরান'-এর মতই তাৎপর্যের ধারক। যেমন কুরআনের আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

---

১. رواه مالك فى الموطا فى كتاب الزكاة

২. البحر الذخارج ٢ ص ١٨٤

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম, নূহ, আলে ইব্রাহীম ও আলে ইমরানকে সারা জাহানের ওপর মনোনীত করেছেন।

এ আয়াতের 'আলে-ইমরান' বলতে মরিয়াম ও তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-কে বোঝায়। আর 'আলে-ইব্রাহীম' বলতে ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরদের বোঝায়। কিন্তু তাঁদের কিয়ামত পর্যন্ত বংশধরদের বোঝায় না। ইবরাহীম ও ইসহাক প্রসঙ্গে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ –

এখন এ দুজনের বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ মুহ্সিন, সদাচারী আর কেউ নিজের আত্মার ওপর সুস্পষ্ট জুলুমকারী।[১]

বিশ্ব বিধ্বংসী ইয়াহুদীরা তো হযরত ইবরাহীমেরই বংশোদ্ভূত লোক; আল্লাহ্র এ কথাটিও এ অর্থেই ঃ

فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ –

পরে তাকে ফিরাউনের লোকেরা তুলে নিল।[২]

এবং وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ এবং ডুবিয়ে দিলাম ফিরাউনের লোকজনকে।[৩]

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ –

এবং ফিরাউনের লোকজনের ওপর নিকৃষ্ট ধরনের আযাব ভেঙ্গে পড়ল।[৪]

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, 'আলে-ফিরাউন' বলে কেবল ফিরাউনকেই বুঝতে হবে, না তার ঘরের লোকজনসহ সবাইকে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কশীল লোকদেরও বুঝতে হবে ? ...... নিশ্চয়ই তা-ই হবে তার তাৎপর্য। তাই এখানেও—'আলে-মুহাম্মাদ' বলে—কেবলমাত্র তার ঘরের লোক, তাঁর স্ত্রীগণ, সন্তানাদি, বংশধর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গই বুঝতে হবে। আর এ কথাও বিশেষভাবে যথার্থ ও প্রয়োগযোগ্য কেবলমাত্র তাঁর (স) জীবনে বেঁচে থাকা অবস্থার ক্ষেত্রে। ইমাম আবূ হানীফারও এই কথাই তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সাথী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও এই মতই গ্রহণ করেছেন। البحر الذخار। গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, ইমাম মালিকের অনেক কয়টি মতের মধ্যে এ মতটি অন্যতম। আর তার কারণ দেখিয়েছেন এই বলে যে, মিথ্যা সন্দেহ ও দোষারোপ থেকে তাদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই তা তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল। আর তা রাসূলের জীবনের অবসানের সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।[৫]

---

১. الصفت – ١١٣ ২. القصص – ٨

৩. البقره – ٥٠

৪. المؤمن – ٤٥

৫. البحر الذخار ج ٢ص ١٨٤

ইমাম শাওকানী 'বল, আমি এই কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না' কুরআনী ভাষায় রাসূলের এ কথার ভিত্তিতে বলেছিলেন, তিনি যদি তাদের জন্যে যাকাত হালাল করে দিতেন, তাহলে এ জন্যে তাদেরকে অভিযুক্ত হতে হত। এই কথাটি বাতিল হয়ে যায়। কেননা এ সবই ছিল রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশার ব্যাপার। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তারা সকলে অন্যান্য মুসলমানের সমান মর্যাদার হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের জন্যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না এবং এই ঘোষণা যথাযথভাবে কার্যকর হবে ঃ 'যাকাত গ্রহণ করা হবে সমাজের ধনী লোকদের থেকে এবং বণ্টন করা হবে তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে।'

আমরা এই কথা বলেছি দুটি কারণে ঃ

প্রথম ঃ ইসলামী শরীয়াত যাবতীয় বিধি-বিধানে নবী করীম (স)-এর নিকটাত্মীয়দের সাধারণ জনগণ থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং তিনি তো ঘোষণাই করেছেন যে, জনগণ চিরুনীর দাঁত বা কাঁটাগুলোর মতই সমান ও সর্বতোভাবে অভিন্ন। অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যের ক্ষেত্রেও এই অভিন্নতা পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে, ঝুঁকি ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য পার্থক্যকে স্থান দেয়া হয়নি। নবী করীম (স) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মাদ-তনয়া ফাতেমাও যদি চুরি করে, তাহলেও আমি তার হাত কেটে দেব।'[১] তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَنْ بَطَاءَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ -

যার নিজের আমল ও চরিত্র মন্থর, তার বংশ তাকে দ্রুতগতিশীল বানাতে পারে না।[২]

দ্বিতীয় ঃ আর এ কারণটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে ইসলামের যাকাত একটা বাধ্যতামূলকভাবে ধার্যকৃত ফরয। তা সর্বজনবিদিত হক ও অধিকার—একটা সুনির্দিষ্ট 'কর' বিশেষ। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারই তা আদায় করার ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করার জন্যে দায়িত্বশীল। তাই তাতে কারুর ওপর কারুর ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বর্ষণের কোন অবকাশ থাকে না। যে লোক তা থেকে নেবে, তা নেবে তার পাওয়ার অধিকারের ভিত্তিতে। অতএব তাতে কোন দোষের স্থান নেই।

বিস্ময়ের ব্যাপার, কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ—বরং অধিকাংশই হাশিমী বংশের লোকদের জন্যে ফরয—যাকাত হারাম মনে করেছেন বটে; কিন্তু নফল দান-সাদ্‌কা গ্রহণকে সম্পূর্ণ মুবাহ্ মনে করেছেন। অথচ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ দেখাবার সুযোগ এই ক্ষেত্রেই অধিক।

আলে-মুহাম্মাদের ওপর যাকাত কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়ার কথা যদি সহীহ্-ই হত, তাহলে হারাম হত নফল দান গ্রহণ। ইবনুল হাজার কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের এরূপ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা এই বলে দলিল দিয়েছেন যে, যা

১. বুখারী, মুসলিম ২. বুখারী, মুসলিম

ফরয, তা গ্রহণে কোন লাঞ্ছনার অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু নফল দান-সাদ্‌কার অবস্থা এরূপ নয়।

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ বিষয়ে কখনই কোন ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই যারা তাদের জন্যে যাকাত হালাল বলে মত দিয়েছেন, তাঁরা ঐকমত্যের ইজ্‌মার প্রাচীর দীর্ণ ও চূর্ণ করেছেন বলে তাদের ওপর দোষারোপ করা যায় না।

কেননা আমরা দেখেছি, ইমাম আবূ হানীফা জায়েয হওয়ার কথা বলেছেন, তাঁর সাথী ইমাম মুহাম্মাদ এই মতই অবলম্বন করেছিলেন, কোন কোন শাফেয়ী আলিমের মতও তাই এবং মালিকী মাযহাবের কারো কারো কাছে এটাই গ্রহণীয়।

তবে কোন কোন বর্ণনায় এমন তাৎপর্য রয়েছে যা নিঃশর্ত জায়েয হওয়ার মতের সমর্থক। তার একটির কথা 'বাহ্‌রি যুখ্‌খার' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই ঃ নবী করীম (স) বনু মুত্তালিবের বিধবাদের জন্যে দান করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থ প্রণেতার মতে তা ছিল নফল সাদকা।[১]

যেমন আবূ দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা আমাকে নবী করীম (স)-এর কাছে একটি উটের ব্যাপারে পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁকে যাকাত থেকে দিয়েছিলেন। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ সেটি বদলানোর জন্যে এলেন।[২]

ইমাম নববী দুই দিক দিয়ে এ হাদীসের জবাব দিয়েছেন ঃ

একটি, বনু হাশিমের প্রতি প্রথম দিক দিয়ে যাকাত হারাম ছিল, পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে, যেমন বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়, হযরত আব্বাস (রা) থেকে গরীব লোকদের জন্যে একটি উট ধার নিয়েছিলেন। পরে সেটি তিনি যাকাতের উট থেকে ফেরত দিলেন। অপর একটি বর্ণনায়ও এমন কথা এসেছে যা এই কথা বোঝায়। খাত্তাবীও এ কথার দ্বারাই জবাব দিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।[৩]

সন্দেহ নেই, হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্যই গ্রহণ করতে হবে—কোনরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন না করেই কিংবা মনসূখ কথা না বলেই।

আমার মনে হচ্ছে, ইমাম বুখারীর নিকট এ পর্যায়ে সহীহ্‌ সনদের কোন হাদীস প্রতিভাত হয়নি, যা স্পষ্টভাবে কিছু বোঝায়। এ কারণেই তিনি এরূপ শিরোনাম দিয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

১. البحر الذخار ج ٢ ص ١٨٤

২. আবূ দাউদ الصدقة على بني هاشم অধ্যায়ে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। মুনযেরী এই বিষয় নীরব রয়েছে। নাসায়ীও হাদীসটি তুলেছেন। দেখুন ঃ مختصر السنن ج ٢ ص ٢٤٦

১. المجموع ج ٦ ص ٢٢٧

بَابُ مَايُذْكَرُ فِىْ الصَّدَ قَةِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِهِ -

নবী করীম (স) ও তাঁর বংশের লোকদের যাকাত দেয়া পর্যায়ে যা বলা হয়, তার অধ্যায় ....

'যা বলা হয়' ....কথাটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, যে হাদীস নিয়ে আসা হচ্ছে তা যয়ীফ এবং তাতে সংশয় রয়েছে।'

এ হচ্ছে পূর্ব কথার উদ্ধৃতির দিক দিয়ে কথা। কিন্তু ইসলামী বিধান রচনার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাহ্যত তা নবী করীম (স) ও তাঁর বংশধরদের জন্যে তাঁর জীবনকালে হারাম করারই সিদ্ধান্ত দেয়। কেননা নবী করীম (স) নিজেই নিজেকে ও তাঁর বংশের লোকদেরকে যাকাত-সাদকা গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে পবিত্র রাখতে চেয়েছিলেন, যেন পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতার একটা উচ্চতর দৃষ্টান্ত মুসলিম জনগণের জন্যে সংস্থাপন করা যায়। যেন দেয়ার জন্যে তাঁদের মনে লোভ দেখা না দেয়। তাহলে নবী করীম (স) যে উচ্চতর আদর্শবাদিতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, বাস্তবে তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى -

উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে অনেক ভালো।[১]

এজন্যে যে, কোনরূপ বস্তুগত বিনিময় বা মুনাফা ছাড়া সম্পদ দানের মধ্যে গ্রহীতার প্রতি দাতার একটা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বর্ষণের ভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি ধনীদের কাছ থেকে যাকাত-সাদকাত গ্রহণ করে ও দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে জনগণের প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল হিসেবে তা হলে তাতে ব্যক্তিগত অনুগ্রহের ভাব প্রকাশের কোন অবকাশ থাকে না। রাষ্ট্রপ্রধান নিজে ব্যক্তিগতভাবে মুমিনদের কাছে থেকে যাকাত-সাদকাত গ্রহণ করে নিজের ঘাড়ে এই অনুগ্রহ দেখানোর ঝুঁকি গ্রহণ করবেন এবং তাঁর ঘরের লোকজনের ওপরও এই মর্যাদা চাপিয়ে দেবেন তা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এরূপ ব্যবস্থার মধ্যে একটা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আল্লামা শাহ্ দেহলভী এই বিষয়ে অবহিত করেছেন। বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান নিজে ব্যক্তিগতভাবে যদি যাকাত-সাদকাত গ্রহণ করে এবং তাঁর বিশেষ লোকদের জন্যে তা গ্রহণ করাকে জায়েয করে দেন—সে যেরূপ ফায়দা তা থেকে পায় সেরূপ ফায়দা যদি পায় তারাও, তাহলে তাঁকে কেন্দ্র করে একটা সন্দেহ সংশয়ের ধূম্র কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে এবং লোকেরা তাঁর সম্পর্কে এমন সব কথা বলবে যা তাঁর ক্ষেত্রে সত্য নয়। এ কারণে এসব ছিদ্রপথকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানের ফায়দাটা তাদের দিকেই ফিরে আসছে। কেননা যাকাত সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে ঃ তা দেয়া হবে সমাজের ধনী লোকদের কাছ থেকে এবং সেই সমাজেরই দরিদ্র জনগণের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে। এটা তাদের সকলের প্রতি

---

১. حجة الله البالغه ج ٢ ص ٥١٢

আল্লাহ্র একটা অনুগ্রহ বিশেষ। মূল ফায়দাটা তাদের নিকটই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে কল্যাণের নিকটবর্তী করে দেয়া হয়েছে, পাপ ও অন্যায়ের সংস্পর্শ থেকে তাদের রক্ষা করা হয়েছে,[১] তবে আলে-মুহাম্মাদের জন্যে যাকাতকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে হারাম করে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলে মনে হচ্ছে না।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল, যারা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের জন্যে যাকাত হারাম করেছেন, তা গ্রহণ তাদের জন্য জায়েয নয় বলেছেন, তারা যদি বায়তুলমালের এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন, তাহলে এই পঞ্চমাংশও নির্মূল হয়ে যেত। এ কালে যেমনটা ঘটছে, বিশেষ করে প্রশাসকদের স্বৈরতন্ত্রের কারণে। অতীত কালেও তা-ই দেখা গেছে, প্রশ্ন হচ্ছে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের যদি যাকাত দেয়া না হয়—এরূপ প্রয়োজনের অবস্থায়ও, তাহলে নবীর ঘরের লোকদেরকে অনশনে মরে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিলেই তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানো হবে? যাকাতের মানে তাঁদের অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাঁদের তা না দিয়ে কষ্ট দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে; এ বাস্তবিকই বোধগম্য নয়।

এই কারণে চারটি মাযহাবের আলিমসমষ্টি ও অন্যরা ফতোয়া দিয়েছেন যে, 'আলে-মুহাম্মাদ' লোকদের যদি বায়তুলমাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ না দেয়া হয়, তাহলে যাকাত গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা তাঁদের প্রয়োজন রয়েছে, তারা অভাবগ্রস্ত এবং সে অভাব অবশ্যই পূরণ হতে হবে।[২] বরং মালিকী মাযহাবের কতিপয় আলিম মত দিয়েছেন যে, এরূপ অবস্থায় তাদেরকে যাকাত দান অন্যদেরকে দেয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। আর এটাই হচ্ছে সহীহ্ কথা (والله اعلم)

---

১. حجة الله البالغه ج ٢ ص ٥١٢

২. দেখুন: شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٥٧

ষষ্ঠ আলোচনা
যাকাত ব্যয়ে ভুল-ভ্রান্তি

যাকাতদাতা যাকাত ব্যয়ে ভুল করলে কি করা হবে

যাকাতদাতা যদি ভুল করে এমন ক্ষেত্রে যাকাত ব্যয় করে বসে যা প্রকৃতপক্ষে যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র নয়, তা করেছে নিজের অজ্ঞতার কারণে, পরে তার নিজের কাছেই ভুলটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে, এরূপ অবস্থায় তার যাকাত কি দেয়া হল এবং ফরযের দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত হল ? কিংবা এই যাকাত তার ওপর ঋণ হয়ে থাকবে স্থায়ীভাবে যতক্ষণ না সে তা তার সঠিক ক্ষেত্রে ব্যয় করছে ?

এই বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন।

আবূ হানীফা, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও আবূ উবাইদ বলেছেন, সে যা দিয়েছে, তা-ই তার জন্যে যথেষ্ট। তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে, মনে করতে হবে, পুনরায় যাকাত দেয়ার জন্যে তার নিকট দাবি করা যাবে না।

মায়ান ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন ঃ আমার পিতা সাদ্‌কা দেয়ার জন্যে দীনারসমূহ বের করে এনেছিলেন। পরে তা মসজিদে এক ব্যক্তির কাছে রেখে দিলেন। পরে আমি এসে তাঁর নিকট থেকে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তখন পিতা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে দিতে চাই নি। পরে আমি বিষয়টি নিয়ে রাসূলে করীমের দরবারে মামলা দায়ের করি। তখন তিনি বলেন ঃ হে ইয়াযীদ, তুমি যা নিয়ত করেছ, তা তুমি পেয়ে যাবে। আর হে মায়ান, তুমি যা নিয়েছ, তা তোমার জন্যে। হাদীসটি আহমাদ ও বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

হাদীসে সাদ্‌কার কথা বলা হয়েছে, তা সম্ভবত নফল হবে। তবে (ما শব্দ) তুমি যা নিয়ত করেছ বাক্যের 'মা' শব্দটি সাধারণত্বের তাৎপর্য বহন করে।

এঁদের দলিল হিসেবে হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসটিও উল্লেখ্য। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি[১] বললে ঃ আমি অদ্য রাতের বেলা অবশ্যই সাদ্‌কা দেব। পরে সে সাদ্‌কা নিয়ে এল এবং একজন চোরের হাতে রেখে দিল। (সে যে চোর তা তার জানা ছিল না)। পরে তারা বলতে শুরু করল, রাতের বেলা সাদকা করতে গিয়ে একজন চোরের হাতে দিয়ে দিল। সে লোক বললেঃ হে আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা[২] আমি নিশ্চয়ই সাদ্‌কা দেব। পরে সে সাদ্‌কা নিয়ে বের হয়ে তা এক জ্বেনাকারের হাতে রেখে দিল।

---

১. লোকটি ছিল ইসরাঈলী বংশের।

২. সেই অবস্থার দরুন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল নতুবা কোন খারাপ কাজের দরুন তো আর আল্লাহ্‌র হামদ করা হয় না।

সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি শুরু করে দিল ঃ রাতের বেলা লোকটি একজন জ্বেনাকারের হাতে সাদ্‌কা দিয়েছে! লোকটি বললে ঃ হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা, আমি আবার সাদকা করব। পরে সে সাদকা নিয়ে বের হয়ে ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালবেলা আবার লোকেরা বলতে শুরু করলে ঃ রাতের বেলা একজন ধনীকে সাদকা দিয়েছে। পরে সে বললেঃ হে আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা, জ্বেনাকার, চোর ও ধনীর ব্যাপারে। পরে সে স্বপ্নে দেখল, তাকে বলা হচ্ছে, তোমার সাদ্‌কা চোরের হাতে পড়েছে সম্ভবত সে চৌর্যবৃত্তি থেকে মুক্তি পাবে, জ্বেনাকার সম্ভবত তার দরুন জ্বেনা থেকে বিরত থাকবে। আর ধনী ব্যক্তি সম্ভবত সাদ্‌কা পেয়ে চেতনা লাভ করবে এবং আল্লাহ্ তাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে শুরু করে দেবে।[১]

এক ব্যক্তি রাসূলে করীমের কাছে যাকাত চেয়েছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি যদি সেই বিভক্তি খাতসমূহের কোন একটিতে গণ্য হও, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তোমার পাওনা দিয়ে দেব।' এবং দুই শক্ত সমর্থ ব্যক্তিকে তিনি বলে দিয়েও ছিলেন, 'তোমরা চাইলে আমি তা থেকে তোমাদের দেব; কিন্তু জেনে রাখো, কোন ধনী এবং শক্তিমান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যে কোন অংশ এতে নেই।' যদি ধনাঢ্যতার আসল রূপটা ধরতেই হত, তাহলে এই লোক দুটির মৌখিক কথাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। 'আল-মুগানী' গ্রন্থেও এরূপ বলা হয়েছে।[২]

এই সহজ নীতির ধারক লোকদের প্রতিকূলে এক জনসমষ্টি এ ব্যাপারে খুব বেশি কঠোরতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাদের মত হচ্ছে, যে লোক যাকাত পাওয়ার অধিকারী নয়, তাকে তা দেয়া হলে তার যাকাত আদায় হল না। যখন তার ভুল ধরা পড়বে, তখন তাকে দ্বিতীয়বার যোগ্য অধিকারীকে তা দিতে হবে। কেননা সে ফরয পাওনাটা এমন ব্যক্তিকে দিয়েছে যে তা পেতে পারে না। অতএব মনে করতে হবে, সে ফরয আদায় করেনি। তার দায়িত্ব পালিত হয়নি। লোকদের পাওয়া ঋণের মতই তা অ-দেয়া থেকে গেছে ও তার নিকট পাওনা রয়ে গেছে।

শাফেয়ী মাযহাবও অনুরূপ কঠোরতাপ্রবণ। 'রওজাতুন নাজীর' প্রভৃতি গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে।[৩]

ইমাম আহমাদের মাযহাব হচ্ছে—কাউকে ফকীর মনে করে তাকে যাকাত দেয়ার পর যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সে ধনী লোক, তাহলে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। একটি বর্ণনা মতে, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। আর অপর বর্ণনাটির দৃষ্টিতে তা অ-দেয়া রয়ে গেছে।

আর যদি জানা যায় যে, গ্রহণকারী দাস বা কাফির কিংবা হাশিমী বংশের অথবা দাতার নিকটাত্মীয় কেউ—যাকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই, তাহলে এ দেয়াটা গণ্য

---

১. আহ্মাদ, বুখারী, মুসলিম। ২. المغنى ج ٢ ص ٦٦٧।

৩. الروضة النضير ج ٢ ص ٣٢٨।

হবে না। এ হচ্ছে একটি বর্ণনা। এর কারণ বলা হয়েছে, অন্যদের ছাড়া ধনী ও গরীবকে আলাদা করে চিনতে পারা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ -

তাদের অবস্থা প্রকাশ না করা ও ভিক্ষা না চাওয়ার দরুন জাহেল লোক তাদেরকে ধনশালী মনে করে।[১]

এই দুই প্রান্তিক মতের লোকদের মধ্যবর্তী বহু ফিকাহ্‌বিদ্ রয়েছেন, যারা উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করে দেখেছেন। ফলে তাঁরা কোন কোনটিকে জায়েয বলেছেন—আদায় হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দিয়েছেন, আর কোন কোন অবস্থার দেয়াকে অগ্রাহ্য করেছেন।

হানাফীদের মতে ঃ

যে লোক বহু চিন্তা-ভাবনা ও কষ্ট করে বিচার-বিবেচনার পর যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক মনে করে যাকাত দিয়েছে; কিন্তু তার পরও প্রকাশিত হয়েছে যে, সে লোকটি ধনী কিংবা যিম্মী অথবা জানা গেছে যে, গ্রহীতা তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী বা হাশেমী বংশের কেউ, তা হলে তার যাকাত সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে, তাকে তা পুনরায় দিতে হবে না। কেননা তার সাধ্যমত সে করেছে।

তবে যদি প্রকাশিত হয় যে, যাকাত গ্রহীতা কাফির, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত—যদিও সে এখন আশ্রয়প্রার্থী, তা হলে আবূ হানীফার মতে তার এই দেয়া যথার্থ ও যথেষ্ট হবে, পুনরায় দিতে হবে না। কেননা এখানেও যতটা সতর্কতা অবলম্বন সম্ভব ছিল, তা সে করেছে। অপর একটি বর্ণনায় অবশ্য বলা হয়েছে, তা আদায় হয়নি মনে করতে হবে। আবূ ইউসুফেরও এই কথা। কেননা যুদ্ধলিপ্ত হওয়ার পরিচিতিটা শরীয়াত অনুযায়ী শুভ নয়। এ কারণে নফল সাদ্‌কাও তাকে দেয়া জায়েয হতে পারে না। তাই ফরয আদায় করেও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হল না। অতএব পুনরায় তা দিতে হবে।

কোনরূপ সন্দেহ ও অনুসন্ধিৎসা ছাড়াই কাউকে যাকাত দেয়া হলে তা যাকাত-ব্যয়ের যথার্থ ক্ষেত্র কিনা সে বিষয়ে মনে কোন প্রশ্নই যদি না জেগে থাকে—পরে তার ভুল প্রকাশিত হয়ে পড়ল, জানা গেল যে, যাকাত ব্যয়ের সঠিক ক্ষেত্র নয়—তা হলে তা আদায় হয়নি, পুনরায় তাকে তা দিতে হবে। কেননা সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করেনি। আর যদি তার ভুল প্রকাশিত না হয় ও ধরা না পড়ে, তবে তা জায়েয ধরে নিতে হবে।

আর যদি সঠিক ক্ষেত্র বের করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে থাকে, যাকাত দিল এমন ব্যক্তিকে যে তার যথার্থ ক্ষেত্র নয় বলে ধারণা হওয়া সত্ত্বেও কিংবা সন্দেহ করল, কিন্তু যথার্থ ক্ষেত্র জানতে চেষ্টা করেনি, তা হলে আদায় হবে না—যতক্ষণ না তা সঠিক

১. سورة البقرة ٢٧٣

ক্ষেত্ররূপে প্রকাশিত হয়। পরে যদি তার যথার্থতা প্রকাশিত হয়, তাহলে সহীহ্ কথা—তা জায়েয হল।

ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যাকে দেয়া হল, সে যদি ফকীরদের কাতারে দাঁড়িয়ে তাদের মতই কাজ করে, অথবা তাদের মতই তার বেশ-বাস থাকে, কিংবা সে চাইল, তাই দিয়ে দিল—এ সব কার্যকারণ সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টার পর্যায়ে গণ্য, এরূপ অবস্থায় পরে যদি তার ধনী হওয়ার কথা প্রকাশিতও হয়, তবু পুনরায় দিতে হবে না।

ভুলবশত গ্রহণ করা হলে তা কি তার নিকট থেকে ফেরত দেয়া হবে ? যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ফেরত নিতে হবে না। হাশিমী হলে সে পর্যায়ে দুটি বর্ণনা। নিজের ধনী সন্তান হলে ফেরত নিতে হবে। তা কি তার জন্যে শুভ হবে ?... এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আর যদি শুভ না হয়, তাহলে—বলা হয়েছে—সে দান করে দেবে, অন্যরা বলেছেন, দাতার কাছে প্রত্যর্পিত করতে হবে।[১]

মালিকী মতে

সঠিক ক্ষেত্র জানতে চেষ্টা করেও যদি প্রকৃত অনুপযুক্ত লোককে যাকাত দিয়ে থাকে—যেমন সে ধনী, কাফির ইত্যাদি—যদিও ধারণা ছিল যে, সে পাওয়ার যোগ্য, তখন তা ফেরত নেয়া সম্ভব হলে তা ফিরিয়ে নিতে হবে—যদি তা অবশিষ্ট থেকে থাকে। অন্যথায় তার পরিবর্তনে অন্য কিছু নিতে হবে—যদি তা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে। যেমন যদি খেয়ে ফেলে থাকে। বিক্রয় করে দিয়ে থাকে কিংবা কাউকে দান করে থাকে—এরূপ অবস্থায় গ্রহীতা তাকে ধোঁকায় ফেলে থাকুক, কি না-ই থাকুক।

যদি নৈসর্গিক কারণে তা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা বিবেচনা সাপেক্ষ গ্রহীতা যদি দাতাকে ধোঁকা দিয়ে থাকে—সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য প্রকাশ করে প্রতারিত করে থাকে অথবা কাফির হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করে থাকে, তা হালে তার বিনিময়টা তার কাছ থেকে ফেরত নেয়া ওয়াজিব। আর যদি ধোঁকা দিয়ে না থাকে; তা হলে গ্রহীতাকে কিছু ফেরত দিতে হবে না। দাতাকেই বরং দ্বিতীয়বার নিজ থেকে যাকাত দিতে হবে। কেননা প্রথমবারের দেয়াটা যথার্থ হয়নি। যেহেতু তা পাওয়ার যোগ্য লোক—মুসলিম দরিদ্র—তার সম্মুখে আসেনি, এ ধরনের লোক যাকাত পায়নি।

এসব কথা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেয়া অবস্থার জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি সঠিক ক্ষেত্র বের করতে চেষ্টা করার পর যাকাত দিয়ে থাকেন—কিন্তু পরে জানা গেল যে, গ্রহীতা তা পাওয়ার অনুপযুক্ত তাহলে তা আদায় হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপ্রধানকে তা জরিমানাস্বরূপ পুনরায় ফকীরকে দিতে হবে না। কেননা সে তো মুসলমানদের কল্যাণেব জন্যে চেষ্টা করেছে। আর তাই এই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর এই দেয়াটা যথার্থ হবে যদি তা

---

১. الدر المختار وحاشيه ٧٣ - ٧٤

ফিরিয়ে দেয়া সম্ভবও হয়, তবুও। এর ওপরও এ বলে আপত্তি তোলা হয়েছে যে, মাযহাবপন্থীদের কথা থেকে বোঝা যায় যে, প্রশাসক যাকে দিয়েছে তার হাত থেকে তা কেড়ে নিতে হবে—যদি গ্রহীতা তা পাওয়ার অধিকারী না হয়—যদি তা সম্ভবপর হয়। এ কথাটি পরিষ্কার। কেননা যাকাত তো আর ধনী লোকদের হাতে দেয়া যায় না এবং তাদের হাত থেকে তা কেড়েও নেয়া যায় না ?

এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছেন অছি; বিচারপতির অগ্রবর্তী। এ দুজনের ক্ষেত্রে তা যথার্থ হবে বলে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন—যদি তা ফেরৎ নেয়া দুষ্কর হয় কোনরূপ প্রতারিত না হলেও। আর যদি ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা ওয়াজিব হবে—এটা সর্বসম্মত মত।[১]

যায়দীয়া ফিকাহ্‌বিদদের মতে

যে লোক যাকাত দেবে এমন লোককে, যে তা পাওয়ার যোগ্য নয় সর্বসম্মতভাবে—কিংবা তার মাযহাব অনুযায়ী যাকে দেয়া যায় এমন লোককে ছাড়া দেয়া হলে তা পুনর্বার দিতে হবে। প্রথম বারের দেয়াকে যাকাত মনে করা যাবে না। সর্বসম্মতভাবে যাকাত পাওয়ার অযোগ্য লোক হচ্ছে কাফির—কাফির ব্যক্তির পিতামাতা ও সন্তান এবং ধনী—যার ধনাঢ্যতা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। এরূপ লোককে যাকাত দেয়া হলে তা পুনরায় দিতে হবে, তাদেরকে দেয়া হারাম তা জেনে-শুনে দিক, কি না জেনে শুনে, কিংবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, কাফির মুসলিম এবং সন্তান ও পিতামাতা কেউ অপরিচিত নয়। আর ধনী গরীবও চেনা যায় না কিংবা এরূপ কোন ধারণা ছাড়াই। সর্বাবস্থায়ই তা পুনরায় দিতে হবে।

যেসব লোকের যাকাত পাওয়ার অধিকারে মতবৈষম্য রয়েছে—যেমন এমন নিকটাত্মীয় যার ব্যয়ভার বহন তার জন্যে জরুরী, আর ধনী—যার ধনাঢ্যতায় মতপার্থক্য রয়েছে—এদের কাউকে যাকাত দেয়া হলে অথচ তার মাযহাবী মত হচ্ছে যে, তাকে দেয়া জায়েয নয়, দিল এই কথা জেনে-শুনে যে, তার সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, অথচ তার মাযহাব অনুযায়ী কথা নিষিদ্ধ—তা পুনরায় দেয়া একান্তই আবশ্যক। এই কথা সর্বসম্মত।

তাদেরকে যাকাত দেয়া হারাম, কিংবা তার মাযহাব না জেনেও অথবা ওরা অপরিচিত লোক এই ধারণা নিয়ে কিংবা ধনী ব্যক্তিকে দরিদ্র মনে করেই যদি দিয়ে থাকে, তাহলে তা পুনরায় দিতে হবে না। কেননা মত বিরোধীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ লোক তো ভুলো মনের মতই অক্ষম অথবা ইজতিহাদকারী ভুল করলেও যেমন হয়, এ-ও তেমনি।[২]

---

১. الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١ص ١٠٥ – ١٠٢

২. شرج الازهار وحو اشيه ج ١ص ٥٢٦ – ٥٢٧

এবং দেখুন ঃ البحر النضيرج ٢ ص ١٨٧

এসব বিভিন্ন অবস্থাকে বিচার-বিবেচনা করে আমি মনে করি, যে লোক সত্য জানতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ভুল করেছে ও তার যাকাত যথার্থ স্থানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, সে তো মাযূররূপে গণ্য। কাজেই তার এ ভুলের জন্যে তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু করতে বাধ্য করা যায় না। কেননা সে তো তার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছে। হানাফীদেরও এই মত। তার দলিল হচ্ছে ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ্ তো মানুষকে দায়িত্ব দেন তার সাধ্যে যতটা কুলোয় ততটাই, তার বেশি নয়।

আর আল্লাহ্ কারুরই শুভকর্ম ফল বিনষ্ট করেন না। যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার যাকাত কোন চোরের, ব্যভিচারীর বা ধনী ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় তাহলে যেমন হয়, এ-ও ঠিক তেমনি।

হ্যাঁ, সত্য জানার চেষ্টার ত্রুটি করে থাকলে, বে-পরোয়াভাবে যাকাত বন্টন বা ব্যয় করে থাকলে যদি প্রকাশিত হয় যে, সে ভুল করে বসেছে, যথার্থ ক্ষেত্রে যাকাত পৌঁছাতে পারেনি, তাহলে তাকে তার এই ভুলের দণ্ড—যা তার নিজের ত্রুটির দরুন দেখা দিতে পেরেছে—ভোগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই তাকে পুনরায় যাকাত দিতে হবে যেন যথার্থ স্থানে তা পৌঁছানো সম্ভবপর হয়। কেননা আসলে তা—ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্য পাওনাদার লোকদের হক, তাদেরকেই তা না দেয়া পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হতে পারে না অথবা দিতে হবে তাদের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে—তাদের সাধ্যে যেটা কুলোয়।

আর এই উভয় অবস্থাতেই যে লোক তা গ্রহণ করেছে ও জানতে পেরেছে যে, তা যাকাত—সে তা পাওয়ার যোগ্য নয়, তার কর্তব্য হচ্ছে, তা ফিরিয়ে দেয়া অথবা তা ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলে তার বদল বা বিকল্প ফেরত দেবে। অন্য লোকের অধিকার সে কিছুতেই ভক্ষণ করতে পারে না। তা খেলে তার পেট আগুন খেয়ে ফেলবে। এটা তখনকার জন্যে যখন তাগিদ করা হবে বা তার বেশির ভাগ ধারণা হবে যে, সে তা পাওয়ার অধিকারী নয়। অন্যথায় তা তারই হয়ে যাবে। যেমন সে তা গ্রহণ করল; কিন্তু তা যে যাকাত তা সে জানতে পারল না, তা তার হাতে বিনষ্ট হয়ে গেল—তখনও এই হুকুম। হাদীসে উদ্ধৃত রাসূলের উক্তি 'হে মায়ান, তুমি যা নিচ্ছ তা তোমার' এ কথাটি বলার তাৎপর্য হচ্ছে, সে সম্ভবত তা পাওয়ার যোগ্য ছিল, যদিও তার পিতা তা পসন্দ করেন নি। রাষ্ট্রপ্রধান যদি যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে ভুল করেন, তাহলে তাঁকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে না। কেননা তিনি তো মুসলিম জনকল্যাণের জন্যে বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল, যদি এই ধরনের অনুপযুক্ত লোক তা নেয় এবং তার হাতে তা মওজুদ থাকে, তাহলে তা ফেরত দেয়া কর্তব্য—যেমন মালিকী আলিমরা বলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকাত আদায় করার পন্থা

- *যাকাতের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক*
- *যাকাতের ক্ষেত্রে নিয়তের স্থান*
- *যাকাত বাবদ মূল্য প্রদান*
- *সংগৃহীত যাকাত ভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর*
- *যাকাত দেয়া তরান্বিতকরণ ও বিলম্বিতকরণ*
- *যাকাত আদায় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়*

ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যাকাত ফরয হওয়ার কথা, কার ওপর তা ফরয, কোন্ সব মাল-সম্পদে তা ফরয, তার প্রত্যেকটিতে কত পরিমাণ ফরয—এর সবই জানতে পারা গেছে। অনুরূপভাবে এও জানতে পেরেছি, কার জন্যে যাকাত ব্যয় করতে হবে, পাওয়ার যোগ্য লোক কত প্রকারের এবং কোন্ কোন্ প্রকারের লোকদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়—এ সব বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এক্ষণে যাকাত আদায় করার যথার্থ পন্থা কি, সেই বিষয়ে জানা বাকী রয়েছে। যার ওপর যাকাত ফরয, সে নিজেই কি পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করার দায়িত্বশীল কিংবা সে দায়িত্ব সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের ? আর এটা সর্বপ্রকারের মালের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না কোন কোন ধনমালের ক্ষেত্রে এবং কোন কোন ধন-মালের ক্ষেত্রে নয় ? উপরন্তু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা যদি না থাকে কিংবা রাষ্ট্রচালক যদি জালিম অথবা কাফির হয়, তাহলে তখন কি করা যাবে ?

যাকাত আদায়ে নিয়তের কি শর্ত আছে ? যাকাতদাতার নিয়ত ছাড়াই সরকার যদি জোর করে নিয়ে নেয়, তাহলে তখন কি হবে ? রাষ্ট্র-সরকারের পক্ষে কিংবা দাতার পক্ষে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে—এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাকাত স্থানান্তরিত করা কি জায়েয ? এ ব্যাপারে সীমা কি এবং কোথায় ?

যাকাত জিনিসের বদলে তার মূল্য দেয়া কি জায়েয কিংবা ঠিক যেটা দেয়া ফরয, সেই আসল জিনিসটাই দিয়ে দিতে হবে—দেয়া কি ওয়াজিব—যাকাত ফরয হওয়ার পর তা আদায় করতে বিলম্ব করা কি জায়েয ? যদি বিলম্বিত করা হয়, তাহলে কি হুকুম ? বিলম্ব করলে কি যাকাত ফরয পরিত্যক্ত হবে ? আর খুব তাড়াতাড়ি দেয়ার বা হুকুম কি ? যাকাত গোপন করা কি জায়েয ? যে তা গোপন করল, তার কি শাস্তি হবে ? যাকাত আদায় করার দায়িত্ব এড়ানোর পরিণাম কি ? তা প্রত্যাহার করানোর উদ্দেশ্যে কোন কৌশল অবলম্বন করলে কি হবে ? ...এগুলো এবং আরও অনেক প্রশ্ন যাকাত আদায় ও বণ্টন পর্যায়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

আমরা এ পর্যায়ে এসব ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও বহু প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে সবিস্তারে আলোচনা করব। এই উদ্দেশ্যেই এ অধ্যায়ের অবতারণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাতের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক

যাকাতের ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও জবাবদিহি

পূর্বে যেমন সবিস্তারে বলা হয়েছে, যাকাত একটা প্রমাণিত ও সুনির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ—তা আল্লাহ্ কর্তৃক ফরয করা হয়েছে। কিন্তু মূলত তা এমন অধিকারের জিনিস নয় যা ব্যক্তিদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অতঃপর যে লোক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি চায়, সে তা দেবে; আর যার পরকালের প্রতি প্রত্যয় দুর্বল, আল্লাহ্র ভয়ের মাত্রা ক্ষীণ—অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বতের তুলনায় ধন-মালের মহব্বত প্রবল, সে তা দেবে না। এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

না, যাকাত কোন ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বা দয়ার ব্যাপার নয়। তা একটা সামষ্টিক ঘংগঠনের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্র-সরকারই এই সংগঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি আঞ্জাম দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল। তা একটা সুগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পালনীয়। সরকারই এ অনন্য দায়িত্ব পালনের জন্যে একান্তভাবে দায়ী। যার ওপর যাকাত ফরয তার কাছ থেকে সরকারই তা আদায় ও সংগ্রহ করবে এবং যাদের তা প্রাপ্য, তাদের মধ্যে তা সুষ্ঠু বণ্টনের দায়িত্বও সরকারের ওপরই অর্পিত।

কুরআনের দলিল

এই কথার সবচাইতে বড় দলিল হচ্ছে, যাকাত আদায়-সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যাপারে যারাই দায়িত্বশীল, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাদের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের নাম দিয়েছেন ঃ اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا —'এই কাজের কর্মচারী লোকগণ'। আর মূল যাকাতেই এদের জন্যে একটা অংশও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাদের মজুরী বা পারিশ্রমিক হিসেবে। অন্য কোন ফাণ্ড বা দুয়ার থেকে তাদের বেতন গ্রহণের জন্যে তাদেরকে বাধ্য করেন নি। ফলে তাদের জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, তারা যাতে করে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, তার নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

যাকাত কেবলমাত্র গরীব ও মিসকীন, সে কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট রাখতে হচ্ছে, ক্রীতদাসের ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহ্র পথে এবং নিঃস্ব পথিকের ব্যাপারে ব্যয়িত হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে আরোপিত ফরয। আর আল্লাহ্র সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী[১]।

কুরআন মজীদে এই সুস্পষ্ট-অকাট্য ঘোষণা দেয়ার পর কারুর পক্ষে এ.থেকে রুখ্সত বা নিষ্কৃতি পাওয়ার কিংবা অন্য কোন রকম ব্যাখ্যা করার অথবা ভিন্ন কোন ধারণা পোষণ করার একবিন্দু অবকাশ থাকতে পারে না। বিশেষ করে যখন বলা হয়েছে ঃ 'এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে ধার্যকৃত ফরয' এবং তার বন্টন ক্ষেত্র হিসেবে এ খাতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ কর্তৃক ধার্যকৃত ফরযকে কে অকেজো করে দিতে পারে, কার সে অধিকার আছে ?

যে সূরাতে যাকাত ব্যায়ের উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক সেই সূরাটিতেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

তুমি তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি তাদের পবিত্র কর, এবং তদ্দ্বারা তাদের পরিশুদ্ধ কর এবং তাদের জন্যে পূর্ণ দো'আ কর। তোমার পূর্ণ দো'আ নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে সান্ত্বনার কারণ।[২]

আগের কালের ও একালের জমহুর মুসলমান মত প্রকাশ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে 'সাদ্কা الصدقة। অর্থ যাকাত।' প্রথম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

উপরিউক্ত কথার সমর্থনে একটা বাস্তব ও ঐতিহাসিক দলিল হচ্ছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলের 'যাকাত দিতে অস্বীকারকারী' লোকেরা এই আয়াতটিকেই ভিত্তি করেছিল। বাহ্যত উক্ত আয়াতটি বোঝায় যে, যাকাত গ্রহণের দায়িত্ব শুধুমাত্র নবী করীম (স)-এর। তিনিই তার বিনিময়ে তাদের জন্যে দো'আ করবেন। একজন সাহাবীও এই দাবি করেনি যে, এই আয়াতটি ফরয যাকাত ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কথা বলছে। তাঁদের পরে ইসলামের মহান ইমামগণ সেই লোকদের উত্থাপিত সন্দেহের প্রতিবাদ ও অপনোদন করেছেন। তাঁরা সকলেই যা বলেছেন, তা হচ্ছে, 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত নাও' বলে যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তা যেমন নবী করীম (স)-এর প্রতি ছিল, তেমনি ছিল তাঁর পরবর্তী মুসলিম মিল্লাতের দায়িত্বশীল প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেও। ....এ বিষয়েও আমরা প্রয়োজনীয় কথা বলে এসেছি।

---

১. سورة التوبه - ٦٠.

২. سورة التوبه - ١٠٣.

হাদীস

আল্লাহ্‌র কিতাবে উদ্ধৃত দলিল সম্পর্কিত কথা উপরে বলা হয়েছে। এক্ষণে এ বিষয়ে নবীর সুন্নাত উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

বুখারী, মুসলিম ও অন্য গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ নবী করীম (স) যখন হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন ঃ

> তাদের তুমি জানিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ধন-মালে যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, পরে তা বণ্টন করা হবে তাদের দরিদ্র লোকদের মধ্যে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি তাদের বাছাই করা উত্তম মালসমূহ থেকে দূরে থাকবে। আর নিপীড়িতের ফরিয়াদকে তুমি খুবই ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। (ইবনে আব্বাস থেকে অনেকেই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন)।

এ হাদীসটিতে আমরা লক্ষ্য করছি, নবী করীম (স) সেই ফরয যাকাত সম্পর্কেই বলেছেন ঃ 'তাদের ধনী লোকদের থেকে তা নেয়া হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে।' হাদীসটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, কোন্ গ্রহণকারী আদায়কারী তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ ও আদায় করবে এবং বণ্টনকারী তা বণ্টনও করবে। যার ওপর তা ফরয, তার ইচ্ছার ওপর তা ছেড়ে দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনুল হাজার বলেছেন ঃ উক্ত হাদীস এ কথার দলিল যে, রাষ্ট্রপ্রধান (সরকারই) যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয় বণ্টনের জন্যে দায়িত্বশীল, হয় সে নিজে এ কাজ করবে, নয়তো করবে তার প্রতিনিধি। আর যে লোক তা দিতে অস্বীকার করবে, তার কাছ থেকে তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নেয়া হবে[১]।

শাওকানী তাঁর 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে এ সব হাদীসই উদ্ধৃত করেছেন[২]। যাকাতের কাজে নিযুক্ত এইসব কর্মচারীদের কথা বিশ্লেষণ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তখন তাদেরকে السعاة। অথবা المصدقين। 'চেষ্টাকারী লোকগণ' বা 'সাদ্‌কা আদায়কারী লোকগণ' নামে অভিহিত করা হত। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা 'যাকাত কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী' খাত সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছি। যাকাত দেয়া যাদের ফরয তাদের এই যাকাত সংগ্রহকারীদের প্রতি কি কর্তব্য, বহু সংখ্যক হাদীসে বিশদভাবে বলা হয়েছে। আমরা শিগ্‌গিরই এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলব।

---

১. فتح الباری للحافظ بن حجر ج ٣ ص ٢٣ فی شرح حدیث وصیة معاذ من صحیح البخاری کتاب الزکاة : باب اخذ الصدقة من الاغنیاء وتردالی الفقراء حیث کانوا

২. نیل الاوطار ج ٤ ص ١٢٤ ط مصطفی الحلبی ثانیة

নবী ও খুলাফায়ে রাশেদুনের বাস্তব সুন্নাত

উপরে রাসূলে করীম (স)-এর কথার সুন্নাত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর বাস্তব কর্মের সুন্নাত সেই কথাকে অধিকতর বলিষ্ঠ করে তোলে। রাসূলের এবং তারপর খুলাফায়ে রাশেদুনের সময়ে যে কর্মধারা প্রবহমান ছিল, তার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও সেই কথারই সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করে।

হাফেয ইবনুল হাজার تلخيص গ্রন্থে ইমাম রাফেয়ী উদ্ধৃত এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন ঃ 'নবী করীম (স) এবং তারপর খলীফাগণ যাকাত গ্রহণের উদ্দেশ্যে চেষ্টাকারী লোক السعاة। পাঠাতেন। এ হাদীসটি মশ্হুর। বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'হযরত উমর যাকাতের জন্যে লোক পাঠালেন। ঐ দুটি গ্রন্থ আবূ হুমাইদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'আজদ' বংশের 'ইবনুল লাতবীয়া' নামক এক ব্যক্তিকে এই কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।' গ্রন্থদ্বয়ে হযরত উমর থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি ইবনে সাদীকে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (স) আবূ মাসউদকে একজন যাকাত সংগ্রহকারীরূপে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে রয়েছে; 'তিনি আবূ জহম ইবনে হুযায়ফাকে যাকাত আদাকারী করে পাঠিয়েছিলেন। তাতে আছে ঃ তিনি উক্বা ইবনে আমেরকে যাকাত আদায়কারীরূপে পাঠালেন। তাতে কুররা ইবনে দমূচ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 'দহ্হাক ইবনে কায়সকে যাকাত আদায়কারী করে পাঠালেন।' 'মুস্তাদ্রাক' গ্রন্থে রয়েছে ঃ 'তিনি কায়স ইবনে সায়াদকে যাকাত সংগ্রহকারীরূপে পাঠালেন।' তাতে উবাদাহ্ ইবনে সামেত বর্ণিত হাদীস হচ্ছে, নবী করীম (স) তাকে যাকাতদাতাদের কাছে পাঠালেন। অলীদ ইবনে উক্বাকে বনুল মুস্তালিকের কাছে যাকাত আদায়কারী করে পাঠালেন।

বায়হাকী শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) দুজনই যাকাত আদায়ের জন্যে লোক পাঠাতেন। শাফেয়ী ইবরাহীম ইবনে মায়াদ থেকে জুহ্রী থেকে—সূত্রে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে অতিরিক্ত রয়েছে ঃ 'এবং তা আদায় করাকে কোন বছরই বিলম্বিত করতেন না।' প্রাচীন বর্ণনায় রয়েছে ঃ উমর থেকে বর্ণিত, তিনি এই কাজ 'রিমাদাহ্'র বৎসর বিলম্বিত করেছিলেন। পরে যাকাত সংগ্রহকারী পাঠালেন। সে দুই দুই বছরের যাকাত নিয়ে এল।

তাবকাতে ইবনে সায়াদ-এ উল্লিখিত হয়েছে ঃ নবী করীম (স) নবম সনের মুহররম চাঁদে (মাসে) আরবদের কাছে যাকাত আদায়কারী প্রেরণ করেছিলেন। এ কথাটি আল-ওয়াকিদী রচিত 'কিতাবুল মাগাজী'তে বিস্তারিতভাবে এসেছে[১]।

ইবনে সায়াদ সে সব গোত্রের ও তাদের প্রতি প্রেরিত যাকাত আদায়কারীর নামও উল্লেখ করেছেন। উয়াইনা ইবনে হুসাইনকে পাঠিয়েছিলেন বনূ তামীম গোত্রের প্রতি তাদের যাকাত আদায়ের জন্যে।

---

১ দেখুন ঃ التلخيص ج ٢ ص ١٥٩ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة

বুয়াইদা ইবনুল হাবীবকে আসলাম ও গাইফার প্রতি তাদের যাকাত আদায়ে জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তাকে বলা হত কায়াস ইবনে মালিক।

উবাদাহ ইবনে বাশার আল-আশহালকে মুলাইম ও মুজাইনা গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। রাফে ইবনে মাকীস্কে জুহাইনা গোত্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমর ইবনুল আসকে পাঠিয়েছিলেন ফাজারাহ গোত্রের কাছে। দহ্হাক ইবনে সুফিয়ানুল কাইলানীকে বনু কিলাবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বুসর ইবনে সুফিয়ানুল কায়াবীকে বনু কায়াবের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ইবনুল লাতামিয়া আল আজদীকে বনু যুবইয়ানের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সায়াদ হুযাইমের কাছে তাদের যাকাতের জন্যেও এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন।

ইবনে সায়াদ বলেছেন, রাসূলে করীম (স) তাঁর প্রেরিতব্য যাকাত আদায়কারীদের ক্ষমাশীলতা অবলম্বনের জন্যে এবং লোকদের উত্তম ও বাছাই করা ধন-মাল বেছে বেছে নেয়া পরিহার করার জন্যে নির্দেশ দিতেন[১]।

ইবনে ইসহাক অপরাপর জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে নবী করীম (স) বিভিন্ন গোত্র ও আরব উপদ্বীপের অন্যান্য এলাকার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন।

মুহাজির ইবনে আবূ উমাইয়্যাতাকে ছান্য়ায় পাঠিয়েছিলেন। পরে তার কাছে আসওয়াদ আল-আনাসী বের হয়ে এসেছিল, সে সেখানেই অবস্থান করছিল। জিয়াদ ইবনে লবীদকে হাজরা মওতে পাঠিয়েছিলেন। আদী ইবনে হাতেমকে 'তাই ও বনু আসাদ গোত্রের প্রতি পাঠিয়েছিলেন। মালিক ইবনে নুযাইরাতাকে বনু হিঞ্জালার যাকাতের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। বনু মায়াতের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দুই ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। জবরকান ইবনে বদরকে একদিকে এবং কাইস ইবনে আবেমকে অপরদিকে পাঠিয়েছিলেন।

'আলা' ইবনুল হাজরামীকে বাহ্রাইনে পাঠিয়েছিলেন। হযরত আলীকে পাঠিয়েছিলেন নাজরানের দিকে তাদের যাকাত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য এবং এজন্য যে, তারা তাদের জিযিয়া তাঁর নিকট পেশ করবে[২]।

আল-কাত্তানী রচিত التراتيب الادارية গ্রন্থে ইবনে হাজমের جوامع السير থেকে, ইবনে ইসহাক ও আল-কালায়ী রচিত 'সীরাত' থেকে ইবনে হাজার রচিত 'আল-ইসাবাহ' থেকে সেসব সাহাবীদের নাম উদ্ধৃত করা হয়েছে যাঁদেরকে নবী করীম (স) যাকাত বিভাগের দায়িত্বে বা সে বিষয়ে লেখাপড়া করার জন্যে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। বলেছেন ঃ

ইবনে হাজম তাঁর جوامع السير নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ যাকাতের হিসাব লেখার জন্যে রাসূলে করীম (স)-এর নিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), তাঁর অনুপস্থিতি কিংবা অক্ষমতার ফলে জুহাম ইবনুস সালাত ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামোন

---

১. زادالمعاد ج ٢ ص ٤٧٢
২. طبقات ابن سعد ج ٢ ص ١٦٠ ط بيروت

এই লেখার কাজ সমাধান করতেন।[১] আরও বলেছেনঃ[২] 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে আল-আরকাম ইবনে আবুল আরকমের আজ-জুহ্রীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তাবারানী উল্লেখ করেছেন ঃ নবী করীম (স) তাঁকে (আরকাম) যাকাত সংগ্রহের কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাতে কাফীয়া ইবনে সাবা আল-আসাদীর বৃত্তান্তও উদ্ধৃত হয়েছে। ওয়াকিদী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ নবী মুস্তফা (স) তাঁকে তাঁর গোত্রের লোকজনের যাকাতের ব্যাপারে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। হুযায়ফাতা ইবনুল ইয়ামান প্রসঙ্গেও লেখা হেয়েছে, ইবনে সায়াদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁকে 'আজদ' গোত্রের যাকাত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে কাহাল ইবনে মালেক 'আল-হাযালী'র বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী মুস্তাফা (স) তাঁকে হুযাইলের যাকাত সংগ্রহের কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাতে খালিদ ইবনুল বারচায়ার কথাও উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আবূ দাউদ ও নাসায়ী মা'মার জুহ্রী থেকে—আয়েশা (রা) থেকে সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন ঃ নবী করীম (স) আবূ জহম ইবনে হুযাইফা (রা)-কে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেছিলেন। খালেদ ইবনে সায়ীদ ইবনুল আঁচ আল-উমাভীর বৃত্তান্তে বলা হয়েছে যে, নবী মুস্তাফা (স) তাঁকে মুয্হিজ-এর যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত করেছিলেন। হুযাইমাতা ইবনে আসেম আল-আকলীর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে কানে' সাইফ ইবনে উমর—থেকে মায়সের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আদাস থেকে—এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আদাস ও খুজাইমা নবী করীম (স)-এর কাছে প্রতিনিধি হয়ে এলেন। পরে তিনি খুজাইমাকে আহলাফ গোত্রের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে লিখলেন ঃ 'আল্লাহ্র নামে যিনি দয়াবান ও করুণানিধান' আল্লাহ্ রাসূল মুহাম্মাদ থেকে খুজামা ইবনে আসেমের নামে ঃ আমি তোমাকে তোমার লোকজনের ওপর যাকাত সংগ্রহকরূপে নিযুক্ত করলাম। সেই লোকেরা যেন আহত না হয়, তাদের ওপর যেন জুলুম করা না হয়। এ কথাটি রাশাতী উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবূ উমর তা উপেক্ষা করল। সাহম ইবনে মিনজাব তাইমীর জীবন বৃত্তান্তে তাবারী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নবী করীম (স)-এর নিয়োজিত বনু তমীমের যাকাত সংগ্রহ কাজে কর্মচারী ছিলেন। নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর পর্যন্ত তিনি এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইকরামা ইবনে আবু জেহলের জীবন বৃত্তান্তে তাবারী থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ নবী করীম (স) তাঁকে হাওয়াজিনের যাকাত সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর ওফাতের বছর। মালিক ইবনে নুযাইরাতার জীবনীতে উল্লেখ করেছেনঃ তিনি বেশ কয়জন রাজা-বাদশাহ্র সহযাত্রী ছিলেন। নবী করীম (স) তাঁকে তাঁর জনগণের যাকাত সংগ্রহ কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন মুন্য়িম ইবনে নুযাইরাতা তামীমীর জীবন কাহিনীতে বলেছেন ঃ নবী করীম (স) তাঁকে বনু তমীমের যাকাত সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। মুরদাম ইবনে মালেক আল—গনভীর জীবন বৃত্তান্তে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁকে তাঁর লোকজনের যাকাত সংগ্রহ কাজে ক্ষমতাশালী করে নিযুক্ত করেছিলেন।

---

১. التراتيب الادارية ص ٣٩٨ ২. التراتيب الادارية ص ٣٩٦-٣٩٨

এভাবেই নবী করীম (স) প্রায় গোটা উপদ্বীপ পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছিলেন[১]। সর্বত্র তিনি যাকাত আদায়কারী ও সে জন্যে চেষ্টাকারী কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন, যেন যাকাত ফরয হওয়া লোকেরা তা যথাযথভাবে আদায় করার সুবিধা পায়।

নবী করীম (স) এ কাজে নিযুক্ত লোকদেরকে ধন-মালের মালিকদের সাথে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কিরূপ আচরণ করতে হবে সেই সংক্রান্ত মূল্যবান উপদেশে সুসমৃদ্ধ ও শক্তিমান করে দিতেন। তাদের সাথে দয়ার্দ্র ও সহজাতমূলক আচরণ গ্রহণ করার—সেই সাথে আল্লাহ্‌র হক আদায়ের ব্যাপারে কোনরূপ উপেক্ষা-অপমানের আবেশ না আসতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়ার উপদেশ দিতেন।

অনুরূপভাবে কোনরূপ অধিকার ছাড়া জনগণের একবিন্দু মাল গ্রহণ সম্পর্কে তীব্র ভাষায় ও কঠিনভাবে হুঁশিয়ার করে দিতেন। তাঁদের কারোর কারোর কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের হিসেবও গ্রহণ করা হত, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনুল লাতবীয়া যখন কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন তাঁর নিকট থেকে সংগৃহীত যাকাতের হিসাব নেয়া হয়েছিল।

ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, দায়িত্বশীল কর্মচারীদের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণ এবং তাদের কার্যকলাপের যে বিচার-বিশ্লেষণ করা হত তার প্রমাণ এতেই রয়েছে। তাতে কারুর কোন বিশ্বাসভঙ্গের ত্রুটি ধরা পড়লে তাকে বরখাস্ত করা হত এবং অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করা হত,[২] এতেও কোনই সন্দেহ নেই।

এসব কিছুই আমাদের সম্মুখে অকাট্যভাবে প্রতিভাত করে তুলে যে, নবী করীম (স)-এর যুগ হতেই যাকাত সংক্রান্ত গোটা ব্যাপারটি সরকারীভাবে পালনীয় কাজরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। এটা একান্তভাবে সরকারী কাজরূপে গণ্য। এই কারণে নবী করীম (স) ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী ও গোত্রের জন্যে একজন করে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করার ইচ্ছা করেছিলেন। সে সেখানকার ধনী লোকদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবে তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বন্টন করবে। তাঁর পরবর্তী খলীফাগণও এই ব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন।

এই কারণে আলিমগণ বলেছেন, যাকাত আদায়ের জন্যে কর্মচারী নিয়োগ ও প্রেরণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। কেননা নবী করীম (স) ও তৎপরবর্তী খলীফাগণ তাই করেছেন। তাঁরা যাকাত আদায়কারী লোক সর্বত্র পাঠাতেন। আরও এজন্যে যে, লোকদের ধন-মাল থাকলেও তা থেকে তাদের কি দিতে হবে, তা সাধারণত তারা জানে না। অনেকে কার্পণ্যও করে। অতএব আদায়কারী পাঠানো একান্তই কর্তব্য[৩]।

---

১. দেখুন ঃ الخريطة المرافقه আমরা حضارة الاسلام নামক দেমাশক থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি থেকে—যা নবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী الخرائط الجيده নামের সমষ্টির মধ্যে স্পষ্ট করে তুলেছে. তা থেকেই এই কথা উদ্ধৃত করেছি, তা যদিও পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে ইবনে ইসহাক উদ্ধৃত কাহিনী তার সাথে মেশালে তা সম্পূর্ণ হয়। তবে ম্যাপটিতে গোত্রসমূহের অবস্থান দেখানোর কারণে উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।

২. زادالمعاد ج ٢ ص ٤٧٢ ৩. الروضه ج ٢ ص ٢١٠ - المجموع ج ٦ ص ١٦٧

বিভিন্ন গোত্রের ধনশালী ব্যক্তিদেরও কর্তব্য হচ্ছে যাকাত আদায়ে নিযুক্ত লোকদের সাথে এই কাজ সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করা, তাদের ওপর যা যা ধার্য হবে তা নিজ থেকেই আদায় করে দেয়া এবং বিন্দুমাত্রও গোপন না করা, তাদের ধন-মালের কোন অংশ বাদ দিয়ে হিসাব না করাও কর্তব্য। রাসূলে করীম (স) নিজেই এবং তাঁর সাহাবিগণ এরূপই আদেশ করেছেন।

জবীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আরব বেদুইনদের কিছু লোক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললে ঃ যাকাত আদায়কারী কিছু লোক আমাদের কাছে আসে, তারা আমাদের ওপর জুলুম করে। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা তাদেরকে রাজী-সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে।[১]

জাবির ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলের করীম (স) বলেছেন ঃ খুব শীঘ্র তোমাদের কাছে এমন অশ্বারোহী লোক আসবে, যারা তোমাদেরকে ক্রুদ্ধ করতে চাইবে। কাজেই তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদেরকে স্বাগতম জানাবে, তাদের পথ ছেড়ে দেবে, তারা যা চাইবে তা তাদের নিতে দেবে। এতে তারা যদি সুবিচার করে, তা হলে তাতে তাদেরই কল্যাণ হবে। আর জুলুম করলে তার অকল্যাণ তাদেরই ভোগ করতে হবে। মনে রাখবে, তোমাদের সম্পূর্ণ যাকাত দিয়ে দেয়াই তাদেরকে সন্তুষ্টকরণের উপায় এবং তাদের উচিত তোমাদের জন্যে দোআ করা।[২]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে বললে ঃ আমি যদি আপনার প্রেরিত ব্যক্তির কাছে যাকাত শোধ করে দিই, তাতে কি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর

---

১. হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

২. হাদীসটি আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত। 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে (৪র্থ খণ্ড ১৫৫ পৃঃ-উসমানীয়া ছাপা) মুনাভী 'ফায়খ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ সন্দেহ নেই, নবী করীম (স) কখনই কোন জালিম লোককে কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন নি। বরং তাঁর নিযুক্ত যাকাত আদায়কারীরা চূড়ান্ত মাত্রার ইনসাফপন্থী ছিলেন। তার হবেই বা না কেন ? হযরত আলী, হযরত উমর ও মুয়ায (রা) প্রমুখই ছিলেন তাঁর নিযুক্ত লোক। রাসূল (স) কোন জালিম লোক নিয়োগ করেছিলেন, তা বলা থেকেও পানা চাই। উক্ত কথার তাৎপর্য হচ্ছে শীঘ্র তোমাদের কাছে আমার কর্মচারীরা যাকাত চাইতে আসবে। কিন্তু সাধারণত মানব-মন ধন-মালের প্রেমে মশগুল থাকে। তাই তখন তোমরা ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হতে পার এবং তোমরা তাদেরকে জালেম ভাবতে পার। আসলে তারা তা নয়। রাসূলের কথা ঃ 'তারা জুলুম করলে' উক্ত ধারণার প্রেক্ষিতেই বলা। 'যদি' শব্দই এই কথা প্রমাণ করে অর্থাৎ ধরে নেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। মাযহারী বলেছেন ঃ কথাটি সকল কালব্যাপী। তাই এর অর্থ তারা যেভাবেই যাকাত নিক না কেন, তোমরা বাধা দিও না। তারা তোমাদের প্রতি জুলুম করলেও না। যেহেতু তাদের বিরোধিতা করার অর্থ রাষ্ট্র-সরকারের বিরোধিতা। কেননা তারা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত। আর সরকারের বিরোধিতা চরম অশান্তির সৃষ্টি করে। আদায়কারীদের জুলুমের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাল গোপন করা জায়েয বলার প্রতিবাদ করে বলেছেন, তা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। একটি হাদীসে লোকদের প্রশ্ন উদ্ধৃত হয়েছে ঃ আদায়কারীরা বাড়াবাড়ি করলে আমরা কি মাল গোপন করব ? জবাবে রাসূল বলেছিলেন ঃ না। তবে রাসূলের নিযুক্ত কর্মচারী ছাড়া অন্যদের নিযুক্ত কর আদায়কারীদের মধ্যে যারা জালিম, তাদের অসন্তুষ্ট করা ওয়াজিব। তারা যে জুলুম করে তার সহায়তা করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা সম্পূর্ণ হারাম। (فيض القدير ج ١ص ٧٥ ٤)

রাসূলের কাছে থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবো ? বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার প্রেরিত ব্যক্তির কাছে তুমি যদি যাকাত দিয়ে দাও, তাহলে তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর তুমি তার সওয়াব পাবে। যদি কেউ তা বিকৃত করে, তাহলে তার গুনাহ্ তারই ওপর পড়বে।[১]

সাহাবিগণের ফতোয়া

সহল তাঁর পিতা আবূ সালেহ্ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমার কাছে ব্যয়যোগ্য সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল, তাঁর মধ্যে যাকাতও ছিল (অর্থাৎ যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ আমি সায়াদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস, ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা ও আবূ সায়ীদুল খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমি নিজেই তা বণ্টন করে দেব, না সরকারের কাছে জমা করে দেব ? তাঁরা সকলেই আমাকে তা সরকারের কাছে জমা করে দেবার নির্দেশ দিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা কেউই আমার নিকট ভিন্ন মত প্রকাশ করেন নি। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আমি তাদেরকে বললাম ঃ আপনারা কি মনে করেন, এই সরকার যাকাত সেভাবেই ব্যয় করবেন যেমন আপনারা উচিত বলে মনে করেন ? (বলা বাহুল্য, এটা উমাইয়া শাসন আমলের ঘটনা)...আর তা সত্ত্বেও আমি আমার যাকাত তার কাছেই জমা করে দেব ? তাঁরা সকলেই বললেন ঃ হ্যাঁ, তাই দাও। ইমাম সায়ীদ ইবনে মনসূর তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে উপরিউক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।[২]

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে তোমাদের সামষ্টিক ব্যাপারের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, তোমরা তোমাদের যাকাত তাকেই—তার কাছেই জমা করে দাও। সে ভালো কাজ করলে তার শুভ ফল সে পাবে। আর গুনাহ্ করলে তার শাস্তিও সেই ভোগ করবে।

জিয়াদের মুক্ত গোলাম কাজায়া থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর বলেছেন, 'তোমরা তাদের (সরকারী কর্মকর্তাদের) কাছেই যাকাত জমা করে দাও, তা দিয়ে তারা মদ্য পান করলেও।' ইমাম নববী বলেছেন ঃ বায়হাকী উক্ত হাদীস দুটি সহীহ্ কিংবা হাসান সনদে উদ্ধৃত করেছেন।[৩]

মুগীরা ইবনে শ'বা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক মুক্ত গোলামকে—সে তায়েফে তার ধন-মালের ব্যবস্থাপক ছিল—জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ধন-মালের যাকাত দেয়ার ব্যাপারে তুমি কি কর ? বললেন ঃ তার কিছু অংশ আমি নিজেই বন্টন করে দিই। আর কিছু অংশ সরকারের নিকট জমা করে দিই।

বললেন ঃ তোমার নিজের কি করার আছে এ ব্যাপারে ? (তাঁর নিজের বন্টন করা অপসন্দ করলেন) বললে ঃ ওরা তো যাকাত নিয়ে তা দিয়ে জমি ক্রয় করে ও ধুমধাম

১. المنتقى। গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'নাইলুল আওতার' পূর্বোদ্ধৃতি।

২. নববী তাঁর المجموع। গ্রন্থে এরূপই লিখেছেন।

৩. এসব হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি ইমাম নববী তাঁর المجموع। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৬২-১৬৪ পৃ.

করে বিয়েশাদী করে। বললেন ঃ তাদেরকেই তুমি দেবে। কেননা রাসূলে করীম (স) তাদের কাছেই জমা করে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। বায়হাকী 'সুনামুল কুব্‌রা' গ্রন্থে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

এসব হাদীস রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত, সুস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক। উক্ত ফতোয়াসমূহও সাহাবিগণের আর অকাট্য। তা আমাদের মনে এই অনুভূতি বরং দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, মূলত ইসলামী শরীয়াতের বিধান হচ্ছে, মুসলিম সরকারই যাকাত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের দায়িত্বশীল। তাই তা সংগ্রহ করবে ধনশালী লোকদের কাছ থেকে এবং পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টনও করবে। আর জাতির জনগণের কর্তব্য হচ্ছে এই কাজের দায়িত্বশীল লোকদের সাথে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করা। এই সংস্থাকে স্বীকৃতিদান, ইসলামের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া এবং মুসলমানদের বায়তুলমালকে শক্তিশালী করা।

এই ব্যবস্থার তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য

কেউ বলতে পারেন, ধর্মের কাজ হচ্ছে লোকদের মনকে জাগ্রত করা, অন্তরে চেতনা সৃষ্টি করা এবং জনগণের সম্মুখে উন্নত মহান আদর্শসমূহ প্রকট করে তুলে ধরা। এই লক্ষ্যে কাজ করা যে, জনগণ নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সন্তুষ্টি ও শুভ ফললাভের জন্যে আগ্রহান্বিত হবে। তাঁর শাস্তির চাবুকের ভয়ে তারা পরিচালিত হবে। সরকারী লোকদেরই এ কাজ করতে দেয়া উচিত যে, তারাই তা নির্দিষ্ট করবে, সুসংগঠিত করবে, দাবি করবে, অন্যথায় শাস্তি দেবে। এসবই রাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব। ধর্মের এই পথ প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন করে না।

এর জবাবে বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, উক্ত কথা দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে যথার্থ, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে এ কথা কোনক্রমেই যথার্থ নয়। কেননা ইসলাম যেমন একটা বিশ্বাসের ব্যাপার তেমনি তা একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিধানও। তাতে যেমন উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা রয়েছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র-সরকার গঠন ও পরিচালনের আইন-বিধানও রয়েছে। কুরআন গ্রন্থও সার্বভৌম।

ইসলাম মানুষের জীবনকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করেনি যে, তার একটি অংশে ধর্ম কর্ম হবে আর অপর অংশ দুনিয়ার জন্যে পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতরভাবে। মানব জীবনকে এরূপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। তার একটি অংশ কাইজার-বাদশাহ-কে আর একটি অংশ আল্লাহ্‌কে দেয়া যায় না। বস্তুত গোটা জীবন একটি অবিভাজ্য সমগ্র। মানুষ সামগ্রিকভাবেই মানুষ। গোটা বিশ্বলোক এক অবিভাজ্য সমষ্টি—কেবলমাত্র মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌র বিধানে নিয়ন্ত্রিত।

ইসলাম এমনি এক সর্বাত্মক জীবন বিধান হয়েই এসেছে। মানুষের সামগ্রিক জীবনে পথ-প্রদর্শন ও বিধান প্রদানই তার কাজ। এজন্যে তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্যাদা—সমষ্টির কল্যাণ ও উন্নয়ন। গোটা জাতি ও সরকারসমূহকে সত্য ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করাই ইসলামের লক্ষ্য। সমগ্র মানবতাকে আল্লাহ্‌র

দিকে পরিচালিত করাই ইসলামের অবদান। মানুষ কেবল এক আল্লাহ্র বন্দেগী করবে, তাতে একবিন্দু শিরক করবে না এবং পরস্পর পরস্পরকেও—আল্লাহ্কে বা দিয়ে—রব্ব প্রভু-মানব বানাবে না—এই হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত।

এই প্রেক্ষিতেই 'ইসলামের যাকাত বিধান' বিচার্য। তা কখনই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ইসলামী সরকারকেই এ পর্যায়ের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই ইসলাম তা সংগ্রহ ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বণ্টনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের ওপরই ন্যস্ত করেছে। ব্যক্তিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার করে রাখা হয়নি তা। আর এসব কারণে যাকাতকে কোনরূপ উপেক্ষা করা ইসলামী শরীয়াতের পক্ষে শোভন হতে পারে না। আরও কতিপয় কারণে উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে ঃ

প্রথম, অনেক ব্যক্তিরই মন-মানসিকতা মৃতপ্রায় হয়ে থাকে, তাতে রোগের সৃষ্টি হতে পারে, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে তা। এ সব লোক যদি গরীব লোকদের অধিকার আদায়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তা হলে তাদের কোন নিরাপত্তাই থাকে না।

দ্বিতীয়, গরীব মানুষ তার অধিকার সরকারের কাছ থেকেই পেতে পারে, ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। তাতে তার নিজের মর্যাদা রক্ষা পায়, তার মুখ লাঞ্ছনার হাত থেকে বেঁচে যায়, প্রার্থনার কালিমা লেপন থেকে মুক্ত থাকতে পারে। ব্যক্তির অনুগ্রহ ও তৎজনিত পীড়ন তার ব্যক্তি সত্তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়—এই অবস্থা থেকেও নিষ্কৃতি সম্ভব।

তৃতীয় এই ব্যাপারটি ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিলে তার বণ্টন অর্থহীন হয়ে পড়বে। ধনী ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত মাত্র একজন গরীবকেই হয়তো সব যাকাত সম্পদ দিয়ে দেবে, এটা অসম্ভব কিছু নয়। তা হলে অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, কেউ তা বুঝতেও পারবে না—অথচ তারা অধিকতর তীব্র দারিদ্র্য-পীড়িত লোক হতে পারে।

চতুর্থ, যাকাত কেবলমাত্র ফকীর-মিসকীন-নিঃস্ব পথিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টনীয় ব্যাপার নয়। মুসলমানদের সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজেও যাকাত বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু তা ব্যক্তিদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালক—পরামর্শ পরিষদ সদস্যদের করণীয়। যেমন 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম'দের জন্যে ব্যয় করা, আল্লাহ্র পথে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সারা জাহানে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্যে লোক গঠন ও প্রেরণ করা প্রভৃতি কাজও যাকাত সম্পদ দ্বারাই আঞ্জাম দিতে হবে।

পঞ্চম, ইসলাম যেমন দ্বীন, তেমন রাষ্ট—রাষ্ট্রব্যবস্থাও। কুরআন পঠনীয়, সার্বভৌমত্ব প্রশাসনীয়। আর এই সার্বভৌমত্ব ও এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে ধন-মালের প্রয়োজন, যা দিয়ে রাষ্ট্র চলবে। তবে তার পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হবে। আর সেজন্যে আয়ের সূত্র ও উপায় প্রয়োজন। আর ইসলামে যাকাত হচ্ছে বায়তুলমালের গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী আয়ের একটা উৎস।[১]

---

১. مشكة الفقر وكيفر عالجها الاسلام ص ٩٤-٩٥ থেকে উদ্ধৃত।

যাকাত সম্পদের ঘর

এই আলোচনা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, ইসলামী জীবিন-বিধানের দৃষ্টিতে যাকাতের একটা বিশেষ বাজেট পরিকল্পনা থাকতে হবে। তা স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত সঞ্চয়। তা থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট খাতসমূহে খরচ করা হবে। এই খাতসমূহ যেমন পুরামাত্রায় মানবিক, তেমন খালেসভাবে ইসলামী। রাষ্ট্রের বিরাট সাধারণ বাজেটের সাথে তা মিলে একাকার হতে পারবে না। কেননা সরকারী সাধারণ বাজেট তো বহু বিচিত্র ধরনের পরিকল্পনা সমন্বিত হয়ে থাকে এবং খরচও করা হয় বহু ধরনের খাতে।

যাকাতের খাত বর্ণনাকারী সূরা তওবার আয়াতটি এই লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে। তাতেই বলা হয়েছে যে, যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা তাদের মাসিক বেতন-ভাতা এই যাকাত ফাণ্ড থেকেই গ্রহণ করবে। তার অর্থ, এর জন্যে একটা স্বতন্ত্র বাজেট প্রয়োজন। তাতে যাকাত প্রতিষ্ঠানের জন্যে ব্যয় করার ব্যবস্থা থাকবে। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা একথা বিশেষভাবে বলে এসেছি। শুরু থেকেই মুসলিমগণ এ কথাই চিন্তা করে এসেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা যাকাতের জন্যে একটা স্বয়ংক্রিয় বায়তুলমাল রচনা করেছিলেন। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালসমূহকে তাঁহা চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে তার আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথম, বিশেষভাবে যাকাতের জন্যে বায়তুলমাল। তাতে গৃহপালিত গবাদি পশুর যাকাতের জন্যে ব্যবস্থা থাকবে। জমির ওশর এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গৃহীত শুল্ক হিসেবে যা গ্রহণ করা হবে, অ-ও তাতে থাকবে।

দ্বিতীয়, বিশেষভাবে জিযিয়া ও খারাজ বাবদ লব্ধ সম্পদের জন্যে একটা বায়তুলমাল।

তৃতীয়, ছাগল ও রিকাজের জন্যে একটা বিশেষ বায়তুলমাল। রিকাজ সম্পর্কে কেউ কেউ মত দিয়েছেন যে, তা যাকাতের মধ্যে গণ্য হবে না। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহেও তা ব্যয় হবে না, উক্ত কথা তাদের দৃষ্টিতেই বলা হয়েছে।

চতুর্থ, মালিকবিহীন ধনসম্পদের জন্য একটা বিশেষ বায়তুলমাল। যেসব ধন-সম্পদের মালিক পাওয়া যায় না—যেমন যে-সব ধন-মালের উত্তরাধিকারী কেউ নেই, কিংবা উত্তরাধিকারী থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করতে কেউ আসে না—যেমন স্বামী বা স্ত্রী এই দুজনের একজন, নিহত ব্যক্তি রক্তমূল্য হিসেবে পাওয়া সম্পদ বা দিয়েত—যার অলী কেউ নেই, আর পড়ে পাওয়া সম্পদ, যার মালিকের খোঁজ পাওয়া যায় না।[১]

প্রকাশমান ধন-মাল ও প্রচ্ছন্ন ধন-মাল এবং তার যাকাত যে পাবে

যে-সব ধন-মালে যাকাত ধার্য হয়, ফিকাহ্‌বিদগণ তাকে দুই ভাগে বিভক্ত

১. দেখুন ঃ الدر المختار وحشيه ردالمختار ج ٢ ص ٥٩ - ٦٠.
البدائع ج ٢ ص ٦٨ -٦٩ المبسوط ج ٢ ص ١٨

করেছেন ঃ একটা প্রকাশমান আর দ্বিতীয়টি অপ্রকাশিত, প্রচ্ছন্ন। প্রকাশমান ধন-মাল হচ্ছে তা, যা মালিক নয় এমন ব্যক্তির পক্ষেও চিহ্নিত ও আয়ত্ত করা সম্ভব। কৃষিলব্ধ ফসল দানা ও ফল এবং উট, গরু ও ছাগল প্রভৃতি পশু সম্পদ এর মধ্যে গণ্য।

আর অপ্রকাশিত ধন-সম্পদ হচ্ছে, নগদ টাকা বা এই পর্যায়ে আর যা পড়ে আছে এবং ব্যবসায় পণ্য। ফিত্‌রার যাকাত সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে প্রকাশমান মালের মধ্যে গণ্য করেছেন আর অন্যরা তাকে গোপন বা প্রচ্ছন্ন মাল ধরেছেন।

প্রথম প্রকার—প্রকাশমান ধন-মাল সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন যে, তার যাকাত সংগ্রহ পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বন্টন করার দায়িত্ব মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধানের তথা সরকারের। ব্যক্তির করণীয় ব্যাপার নয়, ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও তাদের পরিমাণ নির্ধারণের ওপর এই কাজ ছেড়ে দেয়া হয়নি। হাদীসের বর্ণনাসমূহ 'মুতাওয়াতির' সূত্রে পাওয়া গেছে, নবী করীম (স) এ পর্যায়ের মালের ফরয যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মচারী প্রেরণ করতেন। তা রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করার জন্যে মুসলমানদের বাধ্য করতেন। আর কেউ তা দিতে অস্বীকৃত হলে এই লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করত।[১] যেসব আরব গোত্র নবী করীম (স)-এর সময়ে যাকাত দিত হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের সূচনাকালে তা দিতে তারা অস্বীকার করলে এই কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَوْمَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ -

আল্লাহ্‌র কসম! ওরা রাসূলের জামানায় দিত এমন একটি রশিও যদি আজ দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব কেবল এই কারণে।

এই ঘোষণাটি প্রকাশমান ধন-মালের যাকাত সম্পর্কেই ছিল। আরও বিশেষ করে তা ছিল গবাদি পশুর যাকাত সম্পর্কে।

আর দ্বিতীয় প্রকারের—অপ্রকাশমান, প্রচ্ছন্ন ধন-মাল, নগদ টাকা ও ব্যবসায় পণ্যের যাকাত সম্পর্কেও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত হয়েছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান সরকারই তা আদায় করার জন্যে দায়িত্বশীল। তার হাতেও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টিত হতে হবে। কিন্তু তা করা কি তার পক্ষে ফরয বা ওয়াজিব? তা তার বা তার নিযুক্ত লোকদের কাছে অর্পণ করার জন্যে জনগণকে বাধ্য করা যাবে? সেজন্যে কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে—যেমন হযরত আবূবকর (রা) করেছেন?

এই বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। যাকাত সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে বিভিন্ন মায্‌হাবের বক্তব্য আমরা এখানে তুলে ধরছি।

১. الاموال ص ٥٣١

হানাফীদের রায়

হানাফীদের মতে প্রকাশমান ধন-মালের যাকাত সংক্রান্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ সরকারের ওপর অর্পিত। ধন-মালের মালিকদের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً –

তুমি গ্রহণ কর তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত।

আরও এজন্যে যে, হযরত আবূ বকর (রা) মুসলমানদের খলীফা হিসেবেই জনগণের নিকট যাকাত দেয়ার দাবি করেছিলেন এবং দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উপরন্তু যে জিনিস হস্তগত করা কর্তৃত্বের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের দায়িত্ব, তা তার মালিককে বা পাওয়ার যোগ্য লোককে দেয়া জায়েয হতে পারে না। যেমন ইয়াতীমের ওলীর ব্যাপার।[১]

তবে প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত দিয়ে দেয়া ধনের মালিকদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে। আসলে সে দায়িত্বও রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারেরই ছিল। পরে তা হযরত উসমানের খিলাফত আমল থেকে জনগণের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা তাই তখন সুবিধাজনক ছিল এবং তাতেই জনগণের কল্যাণ মনে করা হয়েছে বলে সাহাবিগণ তা সমর্থন করেছেন। (পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে) ফলে ধন-মালের মালিকরাই তখন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এই কাজ করেছে। কিন্তু তাই বলে তাও সরকারের কাছে দেয়া ও সরকারের পক্ষ থেকে তার দাবি করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়নি। এই কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ 'সরকার যদি জানতে পারে যে, কোন স্থানে লোকেরা তাদের প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত দিচ্ছে না, তাহলে তারই দায়িত্ব তার দাবি করা ও আদায় করা। অন্যথায় তা নয়। কেননা তা করা হলে ইজ্‌মার বিরোধিতা করা হবে।[২]

ব্যবসায়পণ্য স্বস্থানে প্রচ্ছন্ন ধন-মালের মধ্যে গণ্য। কিন্তু তা যদি এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং ব্যবসায়ী তার শুল্ক আদায় করে, তাহলে তখন তা প্রকাশমান ধন-মালের মধ্যে গণ্য হবে। তারও যাকাত সরকারের কাছেই দিতে হবে। শুল্ক আদায়কারী তো পথে ঘাটে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত। ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে যখন এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যায়, তখন শুল্ক অফিসার তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে। এজন্যে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ শুল্ক আদায়কারীদের সম্পর্কে অনেক মন্দ কথা বলা হয়েছে, তার কারণ, তারা লোকদের ওপর জুলুম করে শুল্ক আদায় করে থাকে।[৩]

---

১. দেখুন ঃ المغنى ج ٢ ص ٦٤ – ط المنار

২. حاشية ابن عابدين ج ٢ص٥

৩. ঐ ঃ ৪১-৪২ পৃ.

মালিকী মাযহাবের বক্তব্য

মালিকী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, সুবিচারক ও ন্যায়নীতিবান রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকারের কাছেই যাকাত জমা করে দেয়া ওয়াজিব যার আদায়করণ ও বণ্টনে ন্যায় নীতিবাদী হওয়া সুপরিচিত। কিন্তু সে যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে জুলুমকারী-পীড়নকারী হয়, তার জুলুম ও পীড়ন গবাদিপশু, কৃষি ফসল কিংবা নগদ সম্পদ—যে ক্ষেত্রেই হোক, সে যদি সুবিচার করতে চায়ও এবং তা তার কাছে দিয়ে দেয়ার দাবি করে, তবুও তাকে দেয়া যাবে না।

উক্তরূপ রাষ্ট্রপ্রধান সরকারের নিকট যাকাত দেয়া কি ওয়াজিব, না শুধু জায়েয?

দরদীর তাঁর الكبير। গ্রন্থের শরাহ্ গ্রন্থে বলেছেন, তা ওয়াজিব। কিন্তু দাসূকী তাঁর টীকায় বলেছেন, তা মাক্‌রূহ্। 'তাওজীহ্' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই বলা হয়েছে।

বস্তুত যাকাত গ্রহণ ও ব্যয়-বণ্টন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবলম্বনকারী রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কাছে যাকাত জমা দেয়া ওয়াজিব।[১]

কুরতুবী বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি যাকাত গ্রহণ ও বণ্টনে ন্যায়নীতির অনুসারী হয়, তাহলে নগদ বা অন্যান্য সম্পদের মালিকের পক্ষে নিজস্বভাবে তা বণ্টন বা ব্যয় করার কোন অধিকার নেই। বলা হয়েছে ঃ নগদ সম্পদের যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তার মালিকদের ওপরই অর্পিত। ইবনুল মাজেশূন বলেছেন, তা হতে পারে যদি যাকাত শুধু ফকীর-মিসকীনের জন্যেই ব্যয় করা হয়। কিন্তু যদি এ দুটি ছাড়া অপরাপর খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা বণ্টন করার কাজ কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান—সরকারেরই করণীয় হবে।[২]

শাফেয়ী মাযহাবের মত

শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে কেবল প্রচ্ছন্ন ধন-মালের মালিকই নিজস্বভাবে ব্যয়-বণ্টন করতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসায় পণ্য ও ফিতরের যাকাত প্রভৃতিই এ পর্যায়ে গণ্য। (ফিত্‌রা সম্পর্কে অপর একটা মত হচ্ছে, তা প্রকাশমান সম্পদ।)

প্রকাশমান ধন-সম্পদ, কৃষি ফসল, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির যাকাত মালিকের নিজের বণ্টন করার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিক পরিচিত—যা নতুনও—মত হচ্ছে, তা জায়েয। আর প্রাচীন মত হচ্ছে, তা জায়েয নয়। বরং রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার ন্যায়নীতির অনুসারী হলে তা তার কাছে জমা করে দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি অন্যায়কারী হয়, তাহলে তাতে দুটি মত। একটি মতে তা জায়েয; কিন্তু ওয়াজিব নয়। আর বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে তার কাছেই জমা করে দেয়া ওয়াজিব তার হুকুমের কার্যকরতা ও তার সাথে অসহযোগিতা না করার লক্ষ্যে।

---

১. الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج ١ص ٣.٥ - ٤.٥

২. القرطبى ج ٨ ص ١٧٧

ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান—সরকার যদি প্রকাশমান ধন-মালের যাকাত দাবি করে, তাহলে কোনরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব ছাড়াই তা তার কাছে জমা করে দেয়া ওয়াজিব। তাহলেই তার আনুগত্য সম্পন্ন হতে পারে। আর লোকেরা যদি তা না দেয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান সরকারই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে, যদি তারা নিজেরাই তা বের করে বণ্টন করতে প্রস্তুত হয়, তবুও। আর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি তা না চায়, কোন আদায়কারীও যদি না আসে, মালের মালিক যাকাত দেয়া বিলম্বিত করবে যতদিন পর্যন্ত আদায়কারীর আগমনের আশা থাকবে। শেষ পর্যন্ত যদি আদায়কারীর আগমন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে তখন সে তা নিজেই বণ্টন করে দেবে।

কিন্তু প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত—সম্পর্কে মা-অর্দীর বক্তব্য মতে—রাষ্ট্রপ্রধান বা আদায়কারীদের সঠিক কিছু জানা থাকে না, ধন-মালের মালিকরাই সে বিষয়ে অবহিত। তাই তারা নিজেরাই যদি স্বতস্ফূর্তভাবে তা বণ্টন করে দেয়, তাহলে তা মেনে নেয়া যাবে। রাষ্ট্রপ্রধান—সরকার—যদি কারো সম্পর্কে জানতে পারে যে, সে নিজে থেকে যাকাত দিচ্ছে না, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান—সরকার—কি তাকে বলবে ঃ হয় তুমি নিজেই দিয়ে দাও অথবা আমার কাছে অর্পণ কর, আমি তা বণ্টন করি ? এই বিষয়ে দুটি কথা রয়েছে, মানত ও কাফফারার ক্ষেত্রে তা কার্যকর।

ইমাম নববী বলেছেন ঃ সর্বাধিক সহীহ্ কথা, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের উক্ত রূপ কথা বলা ওয়াজিব, অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার আশংকা দূর করার উদ্দেশ্যে।[১]

হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য

হাম্বলী মাযহাবের অভিমত হল, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কাছে যাকাত জমা দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে তার অধিকার আছে তা নেয়ার বা গ্রহণ করার। 'আল-মুগ্‌নী' গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে—তা রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকারের কাছে সমর্পণ করা জায়েয, এই ব্যাপারে মাযহাবটি কোন মত পোষণ করে না। সে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার ন্যায়বাদী হোক, কি অন্যায়বাদী এবং তা প্রকাশমান ধন-মাল হোক, কি প্রচ্ছন্ন, তাতে কোন পার্থক্য নেই। তা অর্পণ করেই যাকাতদাতা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, তা তার হাতে জমা হওয়ার পর বিনষ্ট হয়ে যাক, কি না হোক, তার জন্যে নির্দিষ্ট খাতসমূহে তা ব্যয় করা হোক, কি নাই হোক, তাতেও কোন পার্থক্য হবে না। কেননা সাহাবীদের কাছ থেকে এরূপ কথাই পাওয়া গেছে। আর যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান—সরকার—জনগণের প্রতিনিধি শরীয়াত অনুযায়ী, কাজেই তাকে দেয়া হলেই ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যেমন ইয়াতীমের অভিভাবক (অলী) যদি তার পক্ষ থেকে কিছু গ্রহণ করে তাহলে তাতে সেই ইয়াতীমেরই গ্রহণ করা হয়ে যায়, আর মালের মালিক নিজেই যদি তা ভাগ-বণ্টন করে দেয়, তা হলেও মাযহাব সে ব্যাপারে কোন ভিন্নমত পোষণ করে না।

মাযহাবে ভিন্নমত এদিক দিয়ে অর্থাৎ উত্তম ও অধিক পসন্দনীয় নীতি হচ্ছে, মালিক নিজেই তা বিলি-বণ্টন করবে যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার তা তার নিকট জমা দিতে না বলে; কিংবা উত্তম ও পসন্দনীয় নীতি এই যে, ন্যায়বাদী রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তা দিয়ে দেবে, যেন সে তা যথাস্থানে ব্যয় করার দায়িত্ব পালন করে।

---

১. الروضة النضير ج ٢ ص ٢٠٥ - ٢٠٦

ইবনে কুদামাহ 'আল-মুগ্নী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে তার যাকাত ব্যক্তিগতভাবে নিজের হাতে বিলি-বণ্টন করাই মুস্তাহাব—পসন্দনীয়। তবেই তা পাওয়ার যোগ্য লোকেরা পেল বলে তার প্রত্যয় অর্জিত হতে পারে। তা প্রকাশমান মালেরই যাকাত হোক, কি অপ্রকাশমান মালের। ইমাম আহ্মাদ বলেছেন ঃ 'আমি খুশি হই যদি সম্পদের মালিক নিজেই তা বণ্টন করে। আর সরকারী ব্যবস্থাপনার কাছে দিলেও তা জায়েয হবে।'

হাসান, মকহুল, সায়ীদুবনি জুবাইর এবং মাইমুন ইবনে মাহরান বলেছেন ঃ ধন-মালের মালিক নিজেই নিজের যাকাত যথাস্থানে ব্যয় করবে। সওরী বলেছেন ঃ সরকারী যাকাত সংগ্রহকারীরা যদি তা যথাস্থানে ব্যয়-বিনিয়োগ না করে, তাহলে তুমি কিরা-কসম কর, মিথ্যা বল, তবু তাদেরকে কিছুই দিও না। বলেছেন ঃ না, তাদেরকে কিছু দেবে না।

আতা বলেছেন ঃ 'হ্যাঁ, তারা যদি তা যথাস্থানে ব্যয় বিনিয়োগ করে, তবে তাদেরকেই যাকাত দিয়ে দাও।' এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, তারা সেরূপ না হলে তাদের হাতে যাকাত দেয়া যাবে না।

শবী ও আবূ জাফর বলেছেন ঃ তুমি যদি দেখ যে, সরকারী দায়িত্বশীল লোকেরা যাকাতের ব্যাপারে ন্যায়নীতি অনুসরণ করছে না, তা হলে স্থানীয় অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে তুমি নিজেই বণ্টন করে দাও।

(লক্ষণীয়, এ সমস্ত কথাই অন্যায় নীতির অনুসারী যাকাত কর্মচারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তা 'আল্-মুগনী' যা বলেছেন তার সমর্থন করছে না।) বলেছেন ঃ আহ্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি মত দিয়েছেন, 'জমি ফসলের যাকাত সরকারের নিকট প্রদান আমি পসন্দ করি। কিন্তু অন্যান্য ধন-মালের যাকাত যেমন গবাদিপশু—তা নিজেই গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করলে কোন দোষ হবে না।

এর বাহ্যিক অর্থ হল, তিনি বিশেষভাবে 'ওশর' রাষ্ট্রকর্তার হাতে পৌছে দেয়া পছন্দ করেন। কেননা 'ওশর' সম্পর্কে লোকদের মত হচ্ছে তা জমির খাজনা। অতএব তা খারাজ সমতুল্য। রাষ্ট্রকর্তারাই তার বিলি-ব্যবস্থার অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য যাকাতের অবস্থা এরূপ নয়।

বলেছেন ঃ 'আল্-জামে' গ্রন্থে আমি দেখেছি, তাতে বলা হয়েছে, সাদ্কায়ে ফিতর সরকারী তহবিলে দেয়াই আমি পছন্দ করি।

পরে আবূ আবদুল্লাহ্—অর্থাৎ ইমাম আহমাদ বলেছেন, হযরত ইবনে উমর (রা)-কে লোকেরা বলল, ওরা এই যাকাত নিয়ে তা দিয়ে কুকুরের গলায় ফিতা বাঁধে এবং তা দিয়ে ওরা মদ্য পান করে! .....তবুও কি ওদের দেব ? বললেন ঃ হ্যাঁ, ওদের কাছেই দেবে।

ইবনে আবূ মূসা ও আবুল খাত্তাব বলেছেন, 'ন্যায়বাদী রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের তহবিলে যাকাত দিয়ে দেয়া উত্তম।' ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গীদেরও এই মত।

অতঃপর ইবনে কুদামাহ্ সর্বপ্রকারের মালের যাকাতই রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের তহবিলে দেয়া ওয়াজিব বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যাঁরা শুধু প্রকাশমান মালের যাকাতের কথা বলেছেন—ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও আবূ উবাইদ প্রমুখের কথারও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের দলিল হচ্ছে পূর্বে উল্লিখিত আয়াত 'নাও তাদের ধন-মাল থেকে .....এবং এরই জন্যে হযরত আবূ বকর ও সাহাবিগণ (রা) রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন.....।

এদের কথা রদ্দ্ করেছেন এই বলে ঃ 'যাকাত নিজের হাতে দেয়া জায়েয হওয়া পর্যায়ে আমাদের দলিল হচ্ছে, তা হল হক্—যার যা পাওনা, তাকেই তা দিয়ে দেয়া হয়। এটা তার বৈধ কাজ। এ করা হলে যাকাত আদায় হয়ে গেল। যেমন ঋণটা মূল ঋণদাতাকেই দেয়া হল। প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাতের ব্যাপারটিও তাই। যেহেতু দুই ধরনের যাকাতের এও একটা। ফলে অন্য প্রকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হল। উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রপ্রধান—সরকারের অধিকার রয়েছে তা গ্রহণ করার। এতে কোন মতদ্বৈততা নেই। হযরত আবূ বকর (রা) এজন্যেই তার দাবি করেছিলেন যে, লোকেরা তা পাওয়ার অধিকারী লোকদেরকে দিচ্ছিল না, তারা নিজেরাও যদি তা পাওয়ার অধিকারী লোকদেরকে দিয়ে দিত, তাহলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন না। কেননা ব্যক্তিগতভাবে দিলে তাতে যাকাত আদায় হয় কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সে কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না। রাষ্ট্রপ্রধান-সরকার ধন-মালের মালিকদের কাছে যাকাত দাবি করে পাওয়ার অধিকারী লোকদের প্রতিনিধি হিসেবে—অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে। তাই তারা নিজেরাই যদি উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তবে তা অবশ্যই জায়েয হবে। কেননা তারা বয়স্ক সমঝদার লোক। অল্প বয়স্ক পিতৃহীন ছেলেমেয়ে—ইয়াতীমের—কথা আলাদা।

নিজ হাতে যাকাত বিতরণের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। তাতে 'হক্'টা তার পাওয়ার যোগ্য লোকদের কাছে সরাসরিভাবে পৌঁছে যায়। তাতে কর্মচারীদের মজুরী বেঁচে যায় যেমন, তেমনি লোকদের দারিদ্র্য-পীড়ন থেকে সরাসরিভাবে মুক্ত করা সম্ভব হয়। তা দিয়ে তাদেরকে সচ্ছল বানিয়ে দেয়া যায়। নিকটবর্তী ও রক্ত সম্পর্কসম্পন্ন অভাবগ্রস্তদের যাকাত দেয়া উত্তম, তাও এভাবেই রক্ষা পায়। আত্মীয়তা রক্ষা করার এ একটা উপায়। অতএব তা উত্তম। যেমন তা গ্রহণকারী সরকারী লোক যদি ন্যায়বাদী না হলে ব্যক্তিগতভাবে দিয়ে দেয়া উত্তম, এও ঠিক তেমনি।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, তাহলে আসলে কথা হচ্ছে ন্যায়বাদী রাষ্ট্রনায়ক—তথা সরকারকে কেন্দ্র করেই। এরূপ অবস্থায় খিয়ানত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আমরা বলব, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার নিজ থেকেই তো আর যাকাত নেয়ার অধিকারী হয় না, নিজেই তা গ্রহণ বা বণ্টন করে না। সব কাজই এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত করতে হয়। কিন্তু তারা সকলেই তো আর খিয়ানতের ঊর্ধ্বে হয়

না, তা থাকে নিরাপত্তাও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া অনেক সময় আসলে পাওয়ার যোগ্য লোকেরা তা পায় না। সম্পদ-মালিক নিজেই তার পরিবারের প্রতিবেশী লোকজনের কাছ থেকে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে অবহিত হতে পারে। আর তারাই এ নৈকট্যের সম্পর্কের কারণে তা পাওয়ার অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশি অধিকারী।[১]

জায়দীয়া ফিকাহ্‌বিদদের মত

জায়দীয়া ফিকাহ্‌বিদদের মত হচ্ছে, যাকাতের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের, তা প্রকাশমান ধন-মাল হোক, কি প্রচ্ছন্ন ধন-মাল। ন্যায়বাদী রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় ধন-মালের মালিকের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। প্রকাশমান ধন-মাল বলতে তারা বুঝেন গবাদি পশু, ফল এবং অনুরূপ ফিত্‌রা, খারাজ ও খুমুস প্রভৃতি সম্পদ। আর প্রচ্ছন্ন ধনমাল বলতে তাঁরা বুঝেন নগদ সম্পদ—স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা বা এ ধরনের আর যা কিছু—যেমন কারখানা ও ব্যবসায় পণ্য। এটা হবে, যদি তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

তাদের দলিল উপরিউক্ত আয়াত ঃ 'গ্রহণ কর তাদের ধন-মাল থেকে....' এবং হাদীস ঃ 'তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং....' প্রভৃতি। নবী করীম (স)-এর নিজের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহকারী প্রেরণ, খলীফাগণের তাই করা....এসবই। এটা কাফ্‌ফারা, মানত, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির মত নয়। কেননা এসবের ওপর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। এগুলো ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত পর্যায়ের করণীয় কাজ। তবে লোকেরা নিজেরা যদি তা দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করবে।

পার্থক্য এ কারণে যে, যাকাত প্রভৃতি ফরয হয়েছে আল্লাহ্ নিজেই তা ফরয করেছেন বলে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ইত্যাদি তো ব্যক্তির নিজস্ব কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে।

যখন প্রমাণিত হল যে, যাকাত ব্যাপারটি সার্বিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন যে লোক তার যাকাত সরকারী তহবিল ভিন্ন অন্যভাবে দেবে—সরকারের কাছে জমা দেয়ার তাগিদ থাকা সত্ত্বেও এ দেয়াটা তার যথেষ্ট হবে না, তা পুনর্বার দেয়া একান্তই আবশ্যকীয় হবে। যদি মূর্খতাবশত অন্যভাবে যাকাত আদায় করে থাকে সে মূর্খতা হতে পারে সরকারের কাছে জমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অথবা তার পক্ষ থেকে দাবির কথা না জানার কারণে। কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে মূর্খতা তা পালন করার অক্ষমতার ওযর হতে পারে না।

কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন, সর্বসম্মত কর্তব্যের বিষয়ে অজ্ঞতা কোন ওযর হতে পারে না, তা মেনে নিলাম; কিন্তু যে বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে তাতে অজ্ঞতা ইজতিহাদ সমতুল্য, তার একটা কারণ রয়েছে। তাই সর্বপ্রকারের ধন-মালের যাকাত পর্যায়ে কর্তৃত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের হওয়াটা সর্বসম্মত কথা নয়,—তাতে

---

১. দেখুন ঃ المغنى ج ٢ ص ٦٤١ ط المنار الثالثة

বিভিন্ন মত রয়েছে, তাই মূল হুকুম অজানা থাকার কারণে তার ব্যক্তিগতভাবে আদায় করাটাই যথেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এর জবাবে বলা যায়, উক্ত মতবৈষম্য তো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের পক্ষ থেকে দাবি না করার দরুন অন্যত্র আদায় করার ক্ষেত্রে মাত্র। কিন্তু সেই দাবি যদি করা হয়, তাহলে তা যে তারই নিকট অর্পণ করতে হবে ও যাকাতের ওপর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কর্তৃত্বই মেনে নিতে হবে, তাতে কোন মতবৈষম্য নেই, তা সর্বসম্মত।[১]

আর যদি কোন সময় রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম মুসলিম না থাকে কিংবা তা থাকা সত্ত্বেও ধন-মালের মালিক তার কর্তৃত্ব না রাখে, তাহলে তখন পূর্ণবয়স্ক সম্পদ মালিক নিজেই পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করবে। আর সম্পদ মালিক যদি পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী না হয়,—যেমন বালক, পাগল ও এধরনের অন্য কিছু—যেমন বেহুঁশ, নিখোঁজ, তাহলে তার অভিভাবক—অলী-তারই নিয়তে বণ্টন করে দেবে।[২]

আবাজীয়াদের মত

আবাজীয়া ফিকাহ্ মতে, প্রকাশমান রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম (সরকার) থাকলে যাকাতের সমস্ত ব্যাপার তারই কাছে সমর্পিত হবে। কোন ধনী ব্যক্তিই নিজস্বভাবে যাকাত বণ্টন করবে না। যদি তা করে, তাহলে আদায় হবে না, পুনরায় আদায় করতে হবে যথানিয়মে। হ্যাঁ, তবে রাষ্ট্রপ্রধান ইমাম বা সরকার তা করার নির্দেশ বা অনুমতি দিলে তবে আদায় হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি ও কর্মচারী পর্যায়েও এই কথা।

রাষ্ট্রপ্রধানের—সরকারের অনুমতি ছাড়াই তা দিলে তাদের একটি মতে তা পালন হয়ে গেল এবং তার কাজ জায়েয বলে ঘোষিত হবে। আর অপর একটি মতে তা মোটামুটি নিঃশর্তভাবে আদায় হয়ে যাবে বটে; তবে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি তা চায়, তাহলে তখন তা তাকে আবার দিতে হবে। আদায় করেছে তা জানার পরও যদি দাবি করে তাহলেও।

এই শেষোক্ত কথার দলিলস্বরূপ বলা হয়েছে যে, ইবনে মাসঊদ (রা) তাঁর স্ত্রীর নিকট যাকাত দাবি করলেন। এক্ষণে কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের অনুমতি ব্যতীত দিয়ে থাকলে তা আবার দেয়া জায়েয না হলে তিনি তা চাইতেন না।

কিন্তু ইবনে মাসঊদ (রা)-এর বেগম বললেন ঃ না, তা দেব না, যতক্ষণ না এ বিষয়ে রাসূলে করীমের কাছে জিজ্ঞেস করছি, এই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এই ভয়ে যে, স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামী ও সন্তানদের তার নিজের যাকাত দিয়ে দেয়া হয়ত জায়েয হবে না।

---

১. شرح الازهار وحواشيه ج ١ص ٥٢٨ – ٥٢٩

২. شرح الازهارج ١ص ٥٢٤ – ٥٢٥

যারা যাকাত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারী তহবিলে দেয়া ওয়াজিব বলেছেন, তাঁদের দলিল হচ্ছে, হযরত আবূ বকরের এই কথা ঃ 'ওরা যদি আমাকে যাকাতের এমন একটা রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলে করীম (স)-কে দিত, তাহলে আমি সেজন্যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।' তার অর্থ এই যে, লোকেরা রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকারী তহবিলে যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুধু মুবাহ্ নয়, একটা অবশ্যকর্তব্য ফরয বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাহলে এর মধ্যে সেই অবস্থাও শামিল হয়ে গেল যে, যদি তারা তা দিতে অস্বীকার করে এই কারণে যে, তারা তা ইতিপূর্বে তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের দিয়ে ফেলেছে, অথবা তারা তা তাদের মধ্যে নিজেরাই বণ্টন করে দেবে বলে ইচ্ছা করেছে অথবা তাদের তা আদপেই না দিতে চাওয়া—দিতে অস্বীকার করার কারণেও তা হতে পারে। ঠিক এ ব্যাপারেই ইতিপূর্বে ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে, যখন তারা বলেছিল, 'আমাদের ধন-মালে আমরা কোন অংশীদার বানাতে রাজী নই' এবং অতঃপর তারা মুর্তাদ হয়ে গেল। অতএব শব্দের সাধারণ তাৎপর্যকেই ধরতে হবে, তার কারণের বিশেষত্বকে নয়। আর এখানে সাধারণভাবেই যাকাত দিতে অস্বীকৃত হওয়ার দরুন যুদ্ধ করাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে প্রকাশ্য শব্দ যোজনার মাধ্যমেই।[১]

শবী, বাকের, আবূ রুজাইন ও আওযায়ীর মত

শবী, মুহাম্মাদ ইবনে আলী বাকের, আবূ রুজাইন ও আওযায়ী প্রমুখ ফিকাহ্‌বিশারদ মত দিয়েছেন যে, যাকাত অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধান সরকারকে (তার তহবিলে) জমা দিতে হবে। কেননা যাকাতের ব্যয় খাতসমূহ সম্পর্কে সে-ই অধিক মাত্রায় অবহিত। আর তা একবার তার কাছে দিয়ে দিলে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় মালেই তা আদায় হয়ে যাবে, দাতা দায়িত্বমুক্ত হবে। আর ফকীরকে দিয়ে দিলে তা বাতেনীভাবে দায়িত্বমুক্ত করবে না। কেননা আশংকা রয়েছে, সে হয়ত পাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারে। আরও এই জন্যে যে, সে দিয়েছে বটে; কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, অবশ্য তুহ্মতটা অপসৃত হবে। ইবনে উমর (রা) তাঁর যাকাত দিয়ে দিতেন ইবনে জুবাইরের পক্ষ থেকে যে কোন আদায়কারী তাঁর নিকট আসত, তাকেই অথবা নজদাতুল হারুরীকে। 'সুহাইল থেকে—আবূ সালেহ থেকে, সূত্রে বর্ণিত বলেছেন ঃ আমি সায়াদ ইবেন আবূ ওয়াক্কাবের কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ আমার মাল রয়েছে, আমি তার যাকাত দিতে চাই আর এরা সব হচ্ছে পাওয়ার যোগ্য লোক যা মনে হচ্ছে, এখন আপনার কি আদেশ আমার প্রতি ? বললেন, 'তুমি তাদেরকেই দিয়ে দাও।' পরে আমি ইবনে উমরের কাছে এলাম, তিনিও তাই বললেন। তারপর এলাম আবূ হুরায়রার কাছে, তিনিও তাই বললেন। পরে আবূ সায়ীদের নিকট এলে তিনিও তাই বললেন। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।[২]

---

১. شرح النيل ج ٢ ص ١٣٧ - ١٣٨

১. দেখুন ঃ المغنى ج ٢ ص ٦٤٢ - ٦٤٣ ط المنار الثالثه

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

ফিকাহ্‌বিদদের মাযহাব ও মতামত—উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করার পর আমি যা মনে করি—উত্তম বলে ধারণা করি, তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার পূর্বে আমি এদিকে ইঙ্গিত করতে ইচ্ছা করেছি যে, সমস্ত মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে শত মতবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও দুটি মৌলিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

প্রথমত, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের জনগণের কাছে যাকাতের দাবি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। মাল-সম্পদ যে ধরনের ও যে প্রকৃতি বা রূপেরই হোক-না-কেন। প্রকাশমান মাল হোক, কি অপ্রকাশমান এবং বিশেষ করে যখন নগরবাসীদের এই অবস্থা জানা যাবে যে, তারা যাকাত দেয়ার ব্যাপারে খুবই উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। আল্লাহ এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হানাফী আলিমগণ খুব তাগিদ করেছেন।

এই কারণে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি যাকাতের জন্যে দাবি না করে, তাহলে সেই অবস্থায়ও যাকাতের ব্যাপারটি তারই ওপর সমর্পিত কিনা, এ নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি তা সরকারী তহবিলে দেয়ার জন্যে দাবি করে, তাহলে তখন এ ব্যাপারটির কর্তৃত্ব সর্বসম্মতভাবেই সরকারের হবে, তাতে কোন মতভেদ নেই।[১]

এমনকি আমরা যদি বলি যে, মতবৈষম্য রয়েছে; কিন্তু তার দাবি ও বাধ্যতামূলককরণে সে মতভেদ নিঃশেষ হয়ে যায়। কেননা কোন ইজতিহাদী বিষয়ে ইমাম বা সরকারের কোন হুকুম হয়ে গেলে ও তার কর্তৃক পরিস্থিতি বিশ্লেষিত হলে সব মতভেদই দূর হয়ে যায় যেমন কাযীর বিচার হয়ে গেলে তাই হয় চূড়ান্ত।[২]

দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারটি নিরংকুশ ব্যাপার, এতে কোন সন্দেহ নেই, কোন মতভেদও নেই, যে ইমাম—রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার যদি যাকাতের ব্যাপারটি উপেক্ষা করে চলে এবং তা জমা দেয়ার জন্যে নির্দেশ বা দাবি পেশ না করে, তাহলে ধন-মালের মালিকদের যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রত্যাহার হয় না বরং তা তাদের মাথার ওপর থেকেই যায়। আর তা কোন অবস্থায়ই তাদের জন্যে শুভ হয় না। তখন তা তাদের নিজেদেরই পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া একান্তভাবেই ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কেননা যাকাত ইবাদত, দ্বীনী-দায়িত্ব ও ফরয। তা অবশ্যম্ভাবীরূপে পালনীয়। এমন কি কোন প্রশাসক যদি এ কথা বলার দুঃসাহস করে ঃ আমি তোমাদেরকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব মাফ করে দিলাম কিংবা তা তোমাদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করলাম—সর্বপ্রকারের ধন-মালেরই—তা হলেও তার এ কথা বাতিল গণ্য হবে, তার এ কথা অর্থহীন গণ্য হবে। তখন প্রত্যেকটি মুসলিম—যার ওপর যাকাত ফরয—তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে নিজস্বভাবে বিতরণের জন্যে দায়িত্বশীল হবে।

এ দুটি সত্য যখন সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হল, তখন এখানে একটি ব্যাপার অবশিষ্ট থেকে যায়। তা হচ্ছে সেই বিষয়, যাতে তাঁরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যে

---

১. দেখুন ঃ شرح الازهار ج اص٥٢٩ ২. দেখুন ঃ البحر الذخار ج ٢ ص ١٩٠.

বিষয়টি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন ও অপ্রকাশমান ধন-সম্পদ। এ পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধন-মালের যাকাতের ব্যাপারটি কি রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের ওপর অর্পিত, না ব্যক্তিগণের ওপর ?

আমি মনে করি, শরীয়াতের দলিল প্রমাণসমূহ—যা যাকাতকে রাষ্ট্রপ্রধান বা ইসলামী হুকুমতের কর্তৃত্বাধীন বানিয়ে দেয়—প্রকাশমান ধন-মাল ও অপ্রকাশমান ধন-মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। আর মুসলিম হুকুমত যখনই থাকবে তার কর্তব্য হবে যাকাত সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়া, তা সংগ্রহ করা এবং বিতরণ ও বণ্টন করা। এ দায়িত্বের ব্যাপারে সেটাই হচ্ছে আসল কর্তব্য। নিম্নোদ্ধৃত আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

ক. ইমাম রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে انما الصدقات আয়তটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ 'এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, এই যাকাতসমূহ গ্রহণ করা ও বণ্টন করা রাষ্ট্রপ্রধান ও তার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বের ব্যাপার। তার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই যাকাত সংক্রান্ত কর্মচারীদের জন্যে যাকাতের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক। আর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কর্তৃক যে কর্মচারী যাকাত গ্রহণের জন্যে নিযুক্ত হবে, সেই হবে এ বিভাগের কর্মচারী। অতএব এ দলিলই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রপ্রধানই যাকাত গ্রহণ করবে। আল্লাহ্র নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিও একথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -

তাদের ধন-মাল থেকে তুমি যাকাত গ্রহণ কর।' [রাসূলে করীম (স)-কে এই নির্দেশ এবং তিনি রাষ্ট্রপ্রধান]

অতএব প্রচ্ছন্ন ধন-মালের মালিক নিজেই তার যাকাত বণ্টন করবে, এ কথা জানা যায় অপর একটি দলিল দ্বারা। আল্লাহ্র এ কথাটিও ধরা যেতে পারে তা প্রমাণ করার জন্যে ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিত লোকের হক্—অধিকার রয়েছে।

এই অধিকারটি যখন প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিত লোকের অধিকার, তখন প্রথমত এবং সরাসরি তাদেরকেই তা দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে।[১]

তবে কথা হচ্ছে, ইমাম রাযী এই যে আয়াতটির উল্লেখ করেছেন, তা দলিল হিসেবে ধরা ঠিক হয় না। কেননা প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক্ পাওনা রয়েছে প্রকাশমান ধনমালেও, তা নিঃসন্দেহ। তা সত্ত্বেও আরও অনেক দলিল রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, যাকাত সংক্রান্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের ব্যক্তিদের নয়। এ কথাটি স্বতঃই সুস্পষ্ট।

---

১. التفسير الكبير للرازى ج ١٦ ص ١١٤

খ. প্রখ্যাত হানাফী বিশেষজ্ঞ কামালুদ্দীন হুম্মাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর'-এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, যাকাত গ্রহণের সম্যক ও নিরংকুশ দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। তা প্রকাশমান ধন-মাল হোক, কি প্রচ্ছন্ন ধন-মাল। রাসূল করীম (স) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফা দুজনও এ নীতিরই বাস্তব অনুসারী ছিলেন। হযরত উসমান (রা) যখন খলীফা হলেন, লোকদের অবস্থার পরিবর্তন প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন যাকাত আদায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ লোকদের প্রচ্ছন্ন ও গোপন ধন-মালের আতি-পাতি সন্ধান করা অপসন্দ করল। ফলে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়ার যোগ্য লোকদের সরাসরিভাবে যাকাত দিয়ে দেয়ার দায়িত্ব মালিকদের ওপরই ন্যস্ত করা হল। এ ব্যাপারে সাহাবিগণ কোনরূপ মতপার্থক্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তার দরুন রাষ্ট্রপ্রধানের যাকাত চাওয়া ও সংগ্রহ করার মৌলিক দায়িত্ব কখনই বাতিল হয়ে যায় না বা যায়নি। এ কারণে রাষ্ট্রপ্রধান যদি কখনও জানতে পারে যে, কোন অঞ্চলের লোকেরা তাদের যাকাত দিচ্ছে না, তা হলে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার তাদের নিকট যাকাত চাইবে ও নেবে।[১]

গ. নবী করীম (স) সর্বপ্রকারের—প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান—ধন-মালেরই যাকাত গ্রহণ করতেন। তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আবূ উবাইদ, তিরমিযি ও দারে কুত্‌নী বর্ণিত হাদীস ঃ নবী করীম (স) হযরত উমরকে যাকাত সংগ্রকারীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি হযরত আব্বাসের নিকট তার মালের যাকাত চাইতে আসলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো রাসূলের নিকট দুই বছরের যাকাত এক সঙ্গে পূর্বেই পৌছিয়ে দিয়েছি। তখন হযরত উমর বিষয়টি রাসূল (স)-এর কাছে পেশ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমার চাচা ঠিক এবং সত্য কথাই বলেছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে দুই বছরের যাকাত একসঙ্গে আগেই নিয়ে নিয়েছি।[২]

একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত আব্বাস একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর কোন কৃষি সম্পদ ছিল না, পালিত পশুও ছিল না।

ঘ. অনুরূপ আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে । নবী করীম (স) যাকাত সংগ্রহকারী লোকদের পাঠিয়েছিলেন। তখন কতিপয় বিরুদ্ধবাদী প্রচারণা চালাতে লাগল ঃ ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে অলীদ ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। তখন নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। দেখা গেল দুজন সম্পর্কে মিথ্যা বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন—আব্বাস ও খালিদ (রা)। ইবনে জামীল সম্পর্কে সত্য বলা হয়েছিল, বলেছিল, ওরা খালিদের ওপর জুলুম করেছে। খালিদ তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছেন এবং তা আল্লাহ্‌র পথে নিয়োগ করেছেন। আর রাসূলে করীম (স)-এর চাচা

---

১. فتح القدير لابن الهمام ج ١ص ٤٨٧ طبولاق

২. الأموال ص ٥٨٩। হাদীসটি বহু কয়টি সূত্র থেকেই বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ হলেও পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করে দেয়। দেখুন ঃ فتح البارى ٣-٢١٤ ফিকাহ্‌বিদগণ এই হাদীসের বলে বলেছেন যে, যাকাত অগ্রিমও নেয়া যেতে পারে।

হযরত আব্বাসের ওপর যাকাত ধার্য হয়েছে, তাঁর কাছে আরও অবশিষ্ট রয়েছে। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে তা তাঁর ওপর এবং অনুরূপ আরও তাঁর সাথে।[১]

ঙ. আবূ দাউদ প্রমুখ কর্তৃক হযরত আলী বর্ণিত হাদীসও তার সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা দশভাগের একভাগের এক-চতুর্থাংশ দাও অর্থাৎ প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম...শেষ পর্যন্ত[২] রাসূলের কথা ঃ 'দাও' প্রমাণ করেছে যে, নবী করীম (স) নগদ অর্থের যাকাত দিতে বলেছেন এবং এ-ও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারী তহবিলেই দিতে হবে।

চ. বহু কয়টি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে এই মর্মে যে, হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, ইবনে মাসউদ, মুয়াবীয়া, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ রাষ্ট্রপ্রধান নিজ নিজ শাসন আমলে সরকারী দান থেকে যাকাত নিয়ে নিতেন। এ দান হচ্ছে সৈন্যদের ও অনুরূপ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের যাদের নির্দিষ্ট বেতন সরকারী ভাণ্ডার থেকে দেয়া হত, তা এবং দেবার সময়ই তার যাকাত নিয়ে নেয়া হত। হযরত আবূবকর (রা) লোকদেরে যখন কোন দান দিতেন, তখন তাকে প্রশ্ন করতেন ঃ তোমার ধন-মাল কিছু আছে ? যদি বলত 'হ্যাঁ', তাহলে এ দান থেকে তার যাকাত হিসেব মত নিয়ে নিতেন, আর 'না' বললে সবটাই তাকে দিয়ে দিতেন।

ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর দানসমূহ থেকে যাকাত নিয়ে নিতেন। তার হিসেব ছিল, প্রতি হাজারে পঁচিশ। কেননা তাঁর মত ছিল যে, অর্জিত সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, পূর্বে এ পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত উমর (রা) যখন 'দান' দেবার জন্যে বের করতেন তখন ব্যবসায়ীদের মাল একত্রিত করতেন। তার মধ্যে কোনটা নগদ আর কোনটা বাকী, তার হিসেব করতেন। তার পরে উপস্থিত প্রত্যেকটি থেকে যাকাত নিয়ে নিতেন।[৩]

কুদামা থেকে বর্ণিত, বলেছেন ঃ আমি যখন হযরত উসমান (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমাকে দেয়া দান গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ তোমার কাছে কি এমন ধন-মাল আছে যার যাকাত দেয়া ফরয ? আমি বলতাম ঃ হ্যাঁ। তাহলে আমাকে দেয়া 'দান' থেকে আমার সেই মালের যাকাত নিয়ে নিতেন। আর যদি বলতাম 'না', তাহলে তিনি আমার জন্যে দেয় 'দান' সম্পূর্ণ আমাকে দিয়ে দিতেন।[৪]

ছ. হযরত ইবনে উমর ও অন্যান্য সাহাবী (রা) থেকে শাসকগণ জুলুম করলেও যাকাত তাদের কাছে দেয়াই ওয়াজিব—এ পর্যায়ে যেসব ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে, তাতে প্রকাশমান ধন-মাল ও অপ্রকাশমান ধন-মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

---

১. الاموال ص ٥٩٢ - ٥٩٣ আহ্মাদ, বুখারী, মুসলিম, নাইলুল আওতার ৪/১৪৯

২. দেখুন ঃ معالم السنن ج ٢ ص ١٨٨ - ١٨٩ 'তাহযীবু সূনানে আবূ দাউদ' গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যেম যে টীকা লিখেছেন, তা-ও মূলসহ।

৩. مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٤٤

৪. الام للشافعى ج ٢ ص ٤اط بولاق الاولى

আবূ উবাইদের মত এবং তার পর্যালোচনা

কোন কোন আলিম দুই প্রকারের মালের মধ্যে পার্থক্যকারী দলিলের উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে বাস্তব সুন্নাত। কেননা আমাদের পর্যন্ত 'মুতাওয়াত্তির' বা 'মশ্হুর' কোন বর্ণনা এমন পৌঁছায়নি, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, রাসূলে করীম (স) তাঁর কর্মচারীদের এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, তারা এসব ধন-মাল থেকে বায়তুলমালের অংশ নিয়ে নেবে—তা নগদ হোক, কি ব্যবসায় পণ্য এবং তা রাসূলের কাছে পাঠিয়ে দিত, অথবা রাসূলের সমর্পিত দায়িত্ব হিসেবে তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেবে—যেমন করেছে অন্যান্য প্রকাশমান ধন-মালের ক্ষেত্রে।

এ কারণে কতিপয় ইমাম এই মাযহাব গ্রহণ করেছেন যে, এই প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত সরকারী তহবিলে দেয়া বা তা নিজস্বভাবে বন্টন করা জায়েয—এই শর্তে যে, আল্লাহকে ভয় করবে ও তা যথাস্থানে রাখবে। তদ্দ্বারা কারুর পক্ষপাতিত্ব করবে না। এ দুটির মধ্যে যে কোন একটি কাজ ধনের মালিক যদি করে, তাহলেই সে তার ওপর ধার্যকৃত ফরয আদায় করল বলে স্বীকৃতি পেল।

আবূ উবাইদ বলেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য ও ব্যবসায় পণ্য ইত্যাদি নির্বাক সম্পদে ইরাক ও হিজাজবাসী সুন্নাত ও ইলমের অধিকারী লোকদের মত হচ্ছে এই এবং তা-ই আমাদের মতে গ্রহণীয়। কেননা মুসলমানগণকে এর জন্যে আমানতদার বানানো হয়েছে, যেমন তাদেরকে আমানতদার বানানো হয়েছে নামাযের।

গবাদিপশু, দানা, ফল ইত্যাদির যাকাত আদায় ও বন্টন করেন প্রশাসকগণ। এসবের মালিকের কোন অধিকার নেই, ক্ষমতাও নেই তাদের থেকে গোপন করার বা লুকিয়ে রাখার। সে নিজেই যদি তা বন্টন করে ও যথাস্থানে রাখে, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে না। তাকে সে যাকাত পুনরায় তাদের কাছে আদায় করতে হবে। হাদীস ও সাহাবিগণের কথা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

তোমরা কি লক্ষ্য কর না, হযরত আবূ বকর (রা) মুহাজির ও আনসার লোকদের মধ্যে যারা গবাদি পশুর যাকাত দিতে অস্বীকার করে মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন ?...কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের জন্যে তা করেন নি ?[১]

এরপর আবূ উবাইদ সমগ্র 'আ-সা-র' (সাহাবিগণের উক্তির) উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তিগণই তাদের প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত দেয়া পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী।

আবূ উবাইদের উল্লেখ করা—ব্যক্তির গোপন ধন-মালের যাকাত নিজস্বভাবে বন্টন ও তা সরকারী তহবিলে না দেয়া জায়েয প্রমাণকারী ও সব 'আ-সা-র' সম্পর্কে যাঁরাই একটু চিন্তা-ভাবনা করবেন, তাঁরাই দেখতে পাবেন, বস্তুতই তাকে আসল থেকে বাদ

১. الاموال ص ٥٧٣

দেয়া (Exempted) হয়েছে। যে বিষয়ে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তার প্রতি তা অর্পণ করায় তারা রাসূলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাতের বিপরীত কিছু দেখতে পাবেন না। এই কারণে এ কথাটি প্রকাশ লাভ করেছে মুসলিম সমাজের ওপর রাজনৈতিক ফেত্‌নার অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার পর, ইবনে সাবা ও অনুরূপ লোকদের ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র যখন থেকে কাজ করতে শুরু করেছে—হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ঘটনার সময় পর্যন্ত।

আবূ উবাইদ তাঁর সনদে ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন[১] ঃ যাকাত তো দেয়া হত (কিংবা বলেছেন ঃ তোলা হত) নবী করীম (স) কিংবা তাঁর নির্দেশিত ব্যক্তির কাছে, হযরত আবূ বকর (রা) কিংবা তাঁর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে, তাঁর পরে হযরত উমর কিংবা তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে এবং তাঁর পরে হযরত উসমান (রা) কিংবা তাঁর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন শহীদ হলেন, তখন লোকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন কেউ কেউ তা সরকারী তহবিলে দিয়ে দিত, আবার অনেকে নিজেরাই বণ্টন করে দিত। যাঁরা সরকারী তহবিলে দিতেন, হযরত ইবনে উমর (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এ কথাই প্রসিদ্ধ। তিনিই বলেছেন, 'ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায়কারী থাকবে, ততক্ষণ তোমরা ওদের কাছেই যাকাত দিতে থাক।' তাঁর থেকে পাওয়া কোন কোন বর্ণনায় আবার এ শর্তটির উল্লেখ নেই। বরং তাঁর কাছে যে লোকই ফতোয়া চেয়েছে, তাকেই তিনি বলেছেন ঃ 'যাকাত শাসক-প্রশাসকদের কাছেই দাও, তারা তা দিয়ে কুকুরের মাংস তাদের ধ্বংস স্থলে বণ্টন করলেও।' অপর একজনকে বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ, তা ওদেরই দিয়ে দাও, তা দিয়ে তারা কাপড় ও সুগন্ধি কিনলেও।'

কিন্তু কোন কোন বর্ণনা এই ধারণা দেয় যে, তিনি তাঁর একথা পরে প্রত্যাহার করেছেন। বলেছেন ঃ

ضَعُوْهَا فِى مَوَاضِعِهَا

তা তার যথাস্থানেই রাখ (আর্থাৎ নিজেই বণ্টন কর।)[২]

তাঁর এক বন্ধু তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ 'তুমি যাকাত সম্পর্কে কি মনে কর, কেননা এই লোকেরা তো তা নিয়ে যথাস্থানে নিয়োগ করে না ? তখন হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ 'তা ওদেরই দিয়ে দাও।' এক ব্যক্তি বলে, 'ওরা যদি নামাযও ঠিক সময়ে না পড়ে তবুও কি তুমি ওদের সঙ্গেই নামায পড়বে ?' বললেন, 'না।' বললেন, 'তাহলে নামায কি যাকাতের মতই নয় ?' বল্লেন ঃ 'ওরা আমাদের ওপর গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করেছে, আল্লাহ্ই ওদের ওপর গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করবেন।'[৩]

এ কাহিনী এক ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ মেনে নেয়ার কথা প্রমাণ করে। ইবরাহীম

---

১. الاموال ص ٥٦٧ وما بعادها ২. ও ৩. الاموال ص ٥٦٧ وما بعدها

নখয়ী ও হাসান বসরী থেকেও অনুরূপ কথা পাওয়া গেছে। তাঁরা দুজনই বলেছেন ঃ 'যাকাত তার যথাস্থানে দিয়ে দাও এবং শাসক প্রশাসকদের থেকে তা গোপন করে যাও।'[১]

মাইমুন ইবনে মাহরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তা ছিদ্রের মধ্যে রেখে দাও। পরে তা তোমাদের চেনা-জানা লোকদের মধ্যে বন্টন করে দাও এবং প্রত্যেকটি মাস আসার আগেই তা তোমরা বন্টন করে দিতে থাকবে।[২]

আবূ ইয়াহ্ইয়া আল্-কিনদী থেকে বর্ণিত, বলেছেন ঃ আমি সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন ঃ 'তা দায়িত্বশীল সরকারী লোকদের নিকট দিয়ে দাও। পরে সায়ীদ যখন চলতে লাগলেন, আমি তার পিছনে পিছনে গেলাম। এক সময় বললাম ঃ আপনি আমাকে দায়িত্বশীল সরকারী লোকদের হাতে যাকাত দিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তো তা দিয়ে এই.....এই কাজ করে....এই ধরনের কাজে তারা তা ব্যয় করে ? তখন বললেন ঃ তা বন্টন করে দাও তাদের মধ্যে যাদের দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি তো লোকদের সম্মুখে আমাকে প্রশ্ন করেছ, তাই তখন তোমাকে আসল কথা বলতে পারিনি।[৩]

এসব 'আ-সা-র—সাহাবিগণের মত এবং এ সব ফতোয়ার ওপর নির্ভর করেই আবূ উবাইদ উপরিউক্ত কথা বলেছেন। উমাইয়া শাসনের কোন কোন প্রশাসকের আচার-আচরণে ইসলামী মন-মানসিকতার ওপর যে আঘাত লেগেছে ও তাতে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে, তাতে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। খুলাফায়ে রাশেদূনের সময়ে জনগণ যে পরিবেশ ও আচার-আচরণ দেখেছিল, এ সময় তা থেকে অনেকটা বিচ্যুতি তাদের চোখে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তা ছাড়া দুই ধরনের ধন-মালের মধ্যে পার্থক্যকরণ যখন নবীর সুন্নাত অনুযায়ীই সহীহ্ প্রমাণিত হল—নবী করীম (স) নিজেই গোপন বা প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর নিয়োগকৃত যাকাত আদায়কারী পাঠাতেন না—তা দুটি কারণে ছিল ঃ

১. লোকেরা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ মালের যাকাত রাসূলে করীম (স)-এর কাছে দিয়ে দিত ঈমানের তাকীদ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে ফরয আদায় করার ঐকান্তিক উৎসাহের কারণে।

২. যেহেতু এ পর্যায়ের মালের হিসেব-নিকাশ আয়ত্ত করা তার মালিকদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে অসম্ভব, এ কারণে তার যাকাত দেয়া ও তা বন্টন করার কাজটি তাদের মন ও ঈমানের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাকে ইসলাম সঞ্জীবিত করে তুলেছে ঈমানী শক্তির সাহায্যে।

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময় সেরূপ কাজই হয়েছে। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলের ইসলামী খিলাফতের সীমান্ত অনেক

---

১. الاموال ص ٥٦٧ وما بعدها ২. ৩. ঐ الاموال

দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়ে। আর সেই কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে জন্য 'দেয়ান' স্থাপন করা হয়। আর সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। এমন কি ইসলামী সমাজের প্রতিটি সন্তানের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে যিম্মীদের সামাজিক নিরাপত্তারও ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর এ ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে বিরাট ধনাগার ও বিপুল আয়ের উৎসের প্রয়োজন দেখা দেবে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

তাই আমরা যখন দেখি, হযরত উমর (রা) প্রকাশমান ও প্রচ্ছন্ন উভয় ধরনের ধন-মালের যাকাত সংগ্রহের জন্যে যদি তাঁর কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না। প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত তার মালিকদের নিজেদের হাতে বণ্টন করার স্বাধীনতা তখন দেয়া হয়নি। আর এ সবই করা হয়েছে 'সামাজিক নিরাপত্তা' ব্যবস্থার বাজেট পূরণের উদ্দেশ্যে, মুসলমানদের বায়তুলমালকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে।

এই উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রা) 'কর আদায়কারী العاشرون। নামের একদল পরিচিত লোকদের 'সিস্টেম' গড়ে তুলেছিলেন। এদেরকে عاشرون বলা হত এজন্যে যে, তাহা যুধ্যমান দেশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করত, সে শুল্ক হত ১০%, যেমন তারা মুসলমানদের কাছ থেকে তা আদায় করে নিত। আর যিম্মী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গ্রহণ করত, 'অর্ধ ওশর'। এটা হত হযরত উমর তাদের সাথে যে শর্তসন্ধি করতেন সেই শর্তানুযায়ী। মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিত এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ (আর এটা হচ্ছে ব্যবসায়ের যাকাতের ধার্য পরিমাণ)। হযরত উমর (রা) এ পর্যায়ে যে মহান শিক্ষা ও আদর্শ সংস্থাপন করেছেন তারই অনুরূপ।[১] তাদের এ গ্রহণটা 'ওশর', 'অর্ধ ওশর' ও 'ওশরের এক চতুর্থাংশ'—এ হারে আবর্তিত হত।

আলিমগণ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর এই আমল বা কাজকে প্রচ্ছন্ন ধন-মালের মালিকদের প্রতি সহানুভূতিমূলক আচরণ বলে মনে করেছেন।

কেননা তাঁরা ইসলামী খিলাফত কেন্দ্র থেকে বহু দূরবর্তী স্থানসমূহে বিস্তীর্ণ হয়েছিল। তাদের ধন-মালের যাকাত খিলাফতকেন্দ্রে বহন করে নিয়ে আসা ছিল খুবই দুষ্কর কাজ। এজন্যে তা একত্রিত করার উদ্দেশ্যে عاشرون নিয়োগ করা হয়েছিল।

তার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর প্রতিনিধি—অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশমান ও প্রচ্ছন্ন উভয় ধরনের ধন-মালের যাকাত আদায় করার রীতি স্থায়ীভাবে চলেছে। যদিও হযরত উমর (রা) কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা নবী করীম (স) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর কর্মপন্থা থেকে খানিকটা ভিন্নতর ছিল প্রচ্ছন্ন ধন-মালের ক্ষেত্রে, তাও ইসলামী রাজ্যের অধিকতর সম্প্রসারিত হয়ে পড়ার কারণে।

পরে হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-এর খিলাফত আমলে 'ফাই', গনীমত,

---

১. দেখুন ঃ الاموال ص ٥٣١ وما بعدها

খারাজ, জিযিয়া, শুল্ক কর ও যাকাত সাদ্‌কা প্রভৃতি খাতে বায়তুলমালের আয় বিরাট হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌ তখন মুসলমানদের জন্যে যেমন বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তেমনি ধন-সম্পদ অফুরন্ত প্রস্রবণের মত প্রবাহিত হয়ে পড়েছিল। তখন হযরত উসমান (রা) শুধু প্রকাশমান ধন-মালের যাকাত সরকারীভাবে আদায় ও সংগ্রহ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। আর প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত তার মালিকদের কাছেই সোপর্দ করা হয়েছিল যে, তারা নিজেরাই তা আদায় করে দেবে তাদের দায়িত্ব ও লোকদের কাছে জবাবদিহির দৃষ্টিতে। এ ব্যাপারে তাদের দ্বীন ও ঈমানের প্রেক্ষিতে তাদের ওপর পূর্ণ নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়েছিল। সন্ধান-খোঁজ-খবর ও সংগ্রহ করার কষ্ট তাদের থেকে দূর করা, সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যয়ভার বিরাট হয়ে পড়ার দরুন তা হ্রাস করার উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যেই তিনি এ পন্থা ধরেছিলেন। এটা ছিল তাঁর নিজের ইজতিহাদ যদিও উত্তরকালে এ পন্থার পরিণতিতে প্রচ্ছন্ন ধন-মালের যাকাত আদায়ের দিক দিয়ে জনগণের মধ্যে চরম উপেক্ষার ভাব জেগে উঠেছিল। আর তারও কারণ ছিল তাদের দ্বীনী জ্ঞান-গভীরতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং ঈমানের জোরও অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল।

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা) প্রচ্ছন্ন ধন-মালের মালিকদেরকেই তাঁর পক্ষ থেকে তাদের সে ধরনের ধন-মালের যাকাত দিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। আল-কাসানী তাঁর البدائع গ্রন্থে এ পর্যায়ে বলেছেন ঃ

রাসূলে করীম (স) এবং হযরত আবূবকর (রা) ও উমর ফারুক (রা) যাকাত গ্রহণ করতেন, হযরত ওসমান (রা)-এর সময় পর্যন্ত তাই চলছিল। কিন্তু তাঁর সময়ে ধন-মালের পরিমাণ যখন বিপুল হয়ে দাঁড়ায়, তখন যাকাত আদায় ও বন্টনের ভার মালিকদের ওপর ন্যস্ত করাতেই কল্যাণ নিহিত বলে মনে করলেন সাহাবিগণের ইজমার ভিত্তিতে। তখন ধন মালের মালিকরা রাষ্ট্রপ্রধানের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াল। 'তোমরা কি দেখছ না', তিনি বলেছেন, 'যার ওপর ঋণ রয়েছে, তা যেন সে আদায় দিয়ে দেয়।' আর তার মালের যে যাকাত অবশিষ্ট রয়েছে, তার যেন সে নিজেই দিয়ে দেয়'। যাকাত দিয়ে দেয়ার জন্যে এটা ছিল তার দায়িত্ব অর্পণের ঘোষণা। কাজেই তাতে রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার বাতিল হয়ে যায়নি। এজন্যে আমাদের লোকদের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান যখন কোন অঞ্চলের লোকদের যাকাত না দেয়ার খবর জানবে তখন তিনি তার দাবি করবেন[১] ও তার কাছে দিতে বলবেন।

এ সব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ পর্যায়ে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে, প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান উভয় ধরনের ধন-মালের যাকাত রাষ্ট্রপ্রধান সরকারই সংগ্রহ করবেন। কিন্তু হযরত ওসমানের খিলাফতকালে প্রচ্ছন্ন মালের যাকাত সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে কঠিন ও দূরূহ হয়ে পড়ে। তখন বায়তুলমালের সম্পদরাজিও স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে। তাই তখন তিনি তার যাকাত আদায়ের ব্যাপারটি প্রতিনিধিত্ব হিসেবে তার মালিকদের

১. البدائع الصنائع ج ٢ ص ٧

ওপরই ন্যস্ত করেছেন। তবে তারা যদি প্রতিনিধিত্বের এ দায়িত্ব পালনের কোনরূপ ত্রুটি প্রদর্শন করে এবং তাদের ধনমালে আল্লাহ্র যে হক রয়েছে তা আদায় করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানই তা সংগ্রহ করার দায়িত্ব ফিরিয়ে নেবেন—যেমন আসলেই দায়িত্বটা তাঁর ছিল।

এই যুগে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব কার ওপর

আমাদের একালের মুরব্বী চিন্তাবিদ আবদুল ওহ্হাফ খাল্লাফ, আবদুর রহমান হাসান (রা) ও মুহাম্মদ আবূ জুহ্‌রা (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি অসীম রহমত বর্ষণ করুন) এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। দামেশকে ১৯৫২ সনে 'যাকাত' পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণে তাঁরা এ বিষয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপিত করেছেন। 'জামেয়ায়ে আরাবীয়া' এ সেমিনারের আয়োজন করেছিল। তাঁরা বলেছেন ঃ

'এক্ষণে একথা নিশ্চিত হচ্ছে যে, প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান ধন-মালের যাকাত সংগ্রহ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকর্তাই পালন করবেন'। তার দুটি কারণ রয়েছে ঃ

প্রথমটি, এ কালের সাধারণভাবে জনগণ তাদের প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান উভয় ধরনের ধন-মালেরই যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তাই তারা হযরত ওসমান (রা) এবং তাঁর পরবর্তী শাসক-প্রশাসকদের অর্পিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রয়েছে, আর ফিকাহ্বিদগণও একথা চূড়ান্তভাবে বলে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রকর্তা যদি জনগণ যাকাত দিচ্ছে না বলে জানতে পারে, তাহলে সে তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে অবশ্যই আদায় করবে।....এক্ষেত্রে প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান ধন-মালের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না এই কারণে যে, তাদের প্রতিনিধিত্ব খতম হয়ে গেছে। তাই সেই মূলের দিকে ফিরে যাওয়া—রাষ্ট্রকর্তারই যাকাত আদায় করা একান্ত কর্তব্য। ফিকাহ্বিদগণ যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেই অনুযায়ীই এখন কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ কালের ধন-মাল সবই প্রকাশমান হয়ে পড়েছে প্রায়। ব্যবসায়ী অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি সবই প্রতি বছরের আয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। ব্যবসায়ী তা ছোট কি বড় প্রত্যেকের জন্যেই একটা 'রেকর্ড' স্টক রেজিস্টার থাকে যার মধ্যে সব মালের গণনা রক্ষা করা হয়, তার ভিত্তিতে সহজেই লাভ-লোকসানের হিসেব করা হয়। তাই যে সব উপায়ে মুনাফা নির্ধারণ করা হয়, সরকারী কর ধার্য করা হয়, মূলধনের ওপর ফরয যাকাত ধার্য করা তার ওপর খুব সহজেই হতে পারে। এই ফরয যাকাত হচ্ছে, মহান আল্লাহ্র হক, প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিত লোকদেরও হক। আর নগদ টাকা-পয়সা তো বিভিন্ন খাতে ও অনুরূপ কাজে নিয়োজিত থাকে। উপরিউক্ত পন্থায় তার হিসেবটাও সহজেই জানা যেতে পারে। তবে যারা তাদের নগদ সম্পদ মাটির তলায় পুতে রাখে, তারা আসলে খুব বেশি সচ্ছলতার অধিকারী নয়। এ কালে এ ধরনের লোকদের সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। অতএব তাদের যাকাতের ব্যাপারে তাদের দ্বীনদারীর ওপর নির্ভর করা যেতে পারে অনায়াসেই।

খলীফা হযরত উসমান (রা) প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ পর্যায়ে ফিকাহ্বিদগণ সিদ্ধান্ত

দিয়েছেন যে, তা করতে হবে প্রচ্ছন্ন ধন-মালের প্রকাশিত হয়ে পড়া অবস্থায়। তখন তার যাকাতও রাষ্ট্রকর্তার কর্মচারীরা নিয়ে নেবে। এ কারণে হযরত উসমান (রা)-এর অনুসৃত নীতি কার্যকর থাকা অবস্থায়ও عاشرون দের কাজ যথাযথভাবে চলছিল। কেননা তারা নগদ সম্পদ ও ব্যবসায় পণ্য এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়াকালে তার যাকাত গ্রহণ করত। এরূপ অবস্থায় তা আর প্রচ্ছন্ন মাল বলে গণ্য হত না, প্রকাশমান মালরূপে গণ্য হত। তারা এই স্থানান্তর কালেই যাকাত নিয়ে নিত। তবে মালের মালিক যদি প্রমাণ দিতে পারত যে, সে এ সব মালের যাকাত গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে অথবা এ বছরই তা অপর কোন কর আদায়কারীকে দিয়ে দিয়েছে, তাহলে তারা তা থেকে রক্ষা পেতে পারত।[১]

এ সব কথা পূর্ণাঙ্গভাবে সুস্পষ্ট। দলিলের বলিষ্ঠতা স্বীকার্য। এ জন্যে তার ওপর কোন টীকা-টীপ্পনীর প্রয়োজন করে না।

এ দৃষ্টিতেই বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তব্য এমন একটা 'প্রতিষ্ঠান' বা সংস্থা বিশেষভাবে গড়ে তোলা, যা যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। তা গ্রহণ করবে যেমনভাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং তা ব্যয় ও বন্টনও করবে যেমনভাবে আল্লাহ্ তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে العاملين। খাতটির ব্যাখ্যা 'যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দিয়ে এসেছি।

কিন্তু আমি মনে করি, ফরয যাকাতের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ—ধন-মালের মালিকদের নিজেদের হাতে বিতরণের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া উচিত। তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দারিদ্র্য ও ঠেকায় পড়া লোকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব পরিস্থিতির ভিত্তিতে ব্যয় ও বন্টন করবে। এটা রাসূলের করীম (স)-এর অনুসৃত নীতির ওপর কিয়াস করে বলা হচ্ছে। তিনি যাকাত পরিমাণ অনুমানকারীদের এ অধিকার দিতেন যে, তারা ধনের মালিকদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ রেখে দিত, তারা নিজেরা দুই রকম ব্যাখ্যার যে কোন একটা অনুসারে সে যাকাত ব্যয় ও বন্টন করত। ফলে উভয় প্রস্তার মধ্যে যা কিছু কল্যাণবহ, এতে করে আমরা তা গ্রহণ করতে সক্ষম হব। তাতে দুই মংগলের একত্রিতকরণ ও সমন্বয় সাধন করা হবে এবং হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদরা যে মালিকের নিজের যাকাত নিজের হাতেই বন্টন করা মুস্তাহাব বলেছেন, সে হিসেবটাও রক্ষা পাবে।

এ সব কথাই বলা হচ্ছে ইসলামী হুকুমত বর্তমান থাকার কথা মনে করে। কেননা এ ধরনের হুকুমতই ইসলামকে বাধ্যতামূলক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে কাজ করতে পারে। ইসলামই হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার সংবিধান। তার যাবতীয় সাংস্কৃতির, সামষ্টিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্যে ইসলামই একমাত্র পদ্ধতি।

---

১. حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية الدورة الثالثة بحث الزكاة

যদিও কোন কোন খুঁটিনাটি ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম পরস্পর বিপরীত হয়ে পড়তে পারে। সে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত বলতে চাই।

কিন্তু যে রাষ্ট্র সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, প্রশাসন ও বিচারের সংবিধান হিসেবে তাকে মেনে নেয়নি—আল্লাহ্র নাযিল করা বিধানকে বাদ দিয়েই প্রশাসন চলিয়ে যায়—যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের রাষ্ট্রসমূহ মানব রচিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে—, এ ধরনের রাষ্ট্রের যাকাত সংগ্রহ করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। যদি তা করতে সচেষ্ট হয় তা হলে সে রাষ্ট্র আল্লাহ্র গজবের উপযুক্ত হবে। আল্লাহ্র জিজ্ঞাসা ঃ আল্লাহ্র কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস কর আর কতকাংশ অবিশ্বাস কর ?'—এই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। কেননা 'তোমাদের মধ্যে থেকে যারাই এই নীতি অনুযায়ী কাজ করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, বৈষয়িক জীবনে তাদের হবে চরম লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিনতর আযাবে। আল্লাহ্ তোমাদের আমল—কার্যকলাপ—সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন'।[১]

যাকাত গোপনকারী, দিতে অস্বীকারকারী বা দেয়ার মিথ্যা দাবিকারী সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের অভিমত

যাকাত পর্যায়ে রাষ্ট্রের একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের কঠোর শাস্তি দান, তাদের কাছ থেকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তা আদায় করে নেয়া—যদি ইচ্ছা করে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে না দেয়। ইসলামী মাযহাবসমূহের ফিকাহ্বিদগণ এ কথা চূড়ান্ত করে বলেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এ কথাটি আলাদা করে বলেছেন যে, যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হওয়া মিছামিছি দাবি করে কিংবা তার ওপর যাকাত ধার্য না হওয়ার মিথ্যা কথা বলেও এই ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে সুকঠিন শাস্তি দিতে হবে।

হানাফী ফিকাহ্বিদদের মত

হানাফী ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন , যাকাত আদায়কারী লোক যার কাছে গিয়ে তার যাকাত দাবি করবে, তখন যদি সে বলে যে, তার মালিকানায় একটি বছর এখনও পূর্ণ হয়নি; কিংবা যদি বলে, আমার ধন পরিমাণ ঋণ রয়েছে, কিংবা নিসাব পরিমাণের কম সম্পদ আছে, তা হলে তাকে আল্লাহ্র নামে কসম করে বলতে হবে। সে 'কসম' করলে তাকে সত্যবাদী মনে করে নিতে হবে। অপর বর্ণনায় শর্ত করা হয়েছে এই বলে যে, অপর একজন 'কর' গ্রহণকারীকে দেয়ার মুক্তিপত্র বার করতে হবে। ফিকাহ্বিদগণ এ বর্ণনাটি রদ্দ করেছেন এই বলে যে, একটি রেখা অপর রেখার সাথে সাদৃশ্যসম্পন্ন হয়ে থাকে।[২] অনেক সময় তা জাল হয়ে থাকে। অসতর্কতার দরুন

১. আল-বাকারা ঃ ৮৫ আয়াত।

২. আমাদের এ কালে প্রমাণিত হয়েছে যে, লেখা বা রেখাসমূহ বাহ্যত পরস্পর সদৃশ হলেও বাস্তবিকভাবে তা পরস্পর বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির লেখায় একটা নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য থাকে, যা

নিষ্কৃতি পায় না। গ্রহণের পর তা নষ্ট করে ফেলা হয়। তখন তার ওপর ভিত্তি করে কোন বিচার হতে পারে না। এ কারণে তা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কিরা-কসমও করাতে হবে।

আর কিরা-কসমের পর যদি তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ হয়ে পড়ে—কয়েক বছর পর হলেও তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা নেয়ার অধিকার প্রমাণিত, তা মিথ্যা কিরা-কসম দ্বারা বাতিল হতে পারে না।

'কর' আদায়কারী কারুর কাছে যাকাত দাবি করলে সে যদি বলে ঃ আমি নিজে স্থানীয় গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি এবং কিরা করে, সেজন্যে তাহলে তাকে সত্যবাদী মানতে হবে। কিন্তু গবাদি পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা তার যাকাত গ্রহণের অধিকার সরকারের। অন্য কেউ নিয়ে তা বাতিল করতে পারে না। তেমনি প্রচ্ছন্ন ধন-মাল যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হইলেই তা প্রকাশমান মাল হয়ে গেল। তখন তা সরকার বা সরকারের প্রতিনিধি তা গ্রহণ করবে।[১]

অনুরূপ অবস্থা হচ্ছে জমির উৎপাদন, কৃষিফসল, ফল। এগুলো প্রকাশমান মালের মধ্যে গণ্য।[২]

রাষ্ট্রপ্রধান এ কারণে বল প্রয়োগ করে লোকদের কাছে থেকে যাকাত গ্রহণের অধিকারী। জমির মালিকের ওপর থেকে ফরয প্রত্যাহৃত হবে যদি সে নিজেই তা আদায় করে দিয়ে থাকে। তবে ফিকাহ্‌বিদের বক্তব্য হচ্ছে, সে যে নিজ হস্তে তা বণ্টন করেছে তাতে সে ইবাদতের সওয়াব পাবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান যদি তা গ্রহণ করে থাকেন, তবে তার মাল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে নিয়োজিত হওয়ার সওয়াব পাবে।[৩]

অন্য লেখা থেকে ভিন্নতর হয়। এ কারণে প্রতীক ও প্রমাণসমূহ লেখা চেনার বিশেষ গুণসম্পন্ন লোকেরা চিনতে পারে। শরীয়াতের বিধান ধারণার প্রাধান্যের ওপর ভিত্তিশীল। আমাদের এ কালের লেখা ও রেখার ওপর এক অপরিহার্য নির্ভরতা এসে গেছে। যেমন রাষ্ট্রসমূহ তাদের বেতনভুক লোকদের বেতন দেয় নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষর নিয়ে আর জালকারীদের কঠোর শাস্তি হয়ে থাকে।

১. الدر المختار وحاشية ابن عابد بن عليه ج ٢ ص ٤٢ - ٤٣ ط الميمنيه

২. লক্ষ্য করা যাচ্ছে অধিকাংশ হানাফী মতের লোক ওশর-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। মনে হচ্ছে তা যেন যাকাত ছাড়া অন্য কিছু। কেননা তা নিছক ইবাদত নয়। তাতে জমির খাজনার দিকটিও রয়েছে। তাতে এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। এটা সর্বসম্মত মত। আবূ হানীফার মতে তার কোন নিসাব নেই। পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও তা নিয়ে নেয়া হবে, মালিক মৃত্যুর পূর্বে অসিয়াত না করে গেলেও। ঋণ থাকা অবস্থায়ও তা আদায় করা হবে। 'অল্প বয়সের, পাগলের এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকেও নেয়া হবে। এজন্যে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, ওশরকে যাকাত বলাটা পরোক্ষভাবে। অন্যরা বলেছেন, তা যাকাত কেবলমাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের কথা মত। মুহাক্কিক ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, তা যাকাত, সন্দেহ নেই। কৃষি ফসলের যাকাত পর্যায়ে আমরা এসব উল্লেখ করেছি। সঠিক কথা যা, তা আমরা কয়েকবার তাগিদ করে বলেছি। তা হচ্ছে, যাকাত নিছক ইবাদত মাত্র নয়। এ কারণে, তাতে প্রতিনিধিত্ব চলে এবং জোর পূর্বকও নেয়া হয়। বালক ও পাগলের মালেও তা ধার্য হয়। এটাই উত্তম কথা।

৩. الدر المختار ج ٢ ص ٤٢ - ٤٣

মালিকী মাযহাবের মত

যে লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, তার কাছ থেকে তা জোরপূর্বক নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার প্রকাশমান ধন-মাল থেকে থাকে, যদি তার প্রকাশমান মাল না থাকে—আর আছে বলে সে জনগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বন্দী করে তার সে মাল বের করতে হবে। পরে যদি তার কিছু অংশও প্রকাশিত হয় এবং অপরাপর মাল লুকিয়ে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে ইমাম মালিকের বক্তব্য হল—তাকে সত্যবাদী ধরা হবে, তাকে কিরা কসম করতে বাধ্য করা হবে না এই কারণে যে, সে গোপন করেনি, যদিও সে অভিযুক্ত হয়েছে। যে লোকদেরকে কিরা-কসম করতে বাধ্য করে সে ভুল করে।

আর যদি তার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ যুদ্ধ না করা পর্যন্ত সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কিন্তু তাকে হত্যা করা লক্ষ্য হবে না। যদি সে কাউকে হত্যা করে বসে, তাহলে অবশ্য তাকে এজন্যে হত্যা করা হবে। আর এ সময় কেউ তাকে হত্যা করলে সে রক্তপাত বেহুদা হবে।[১]

শাফেয়ী মাযহাবের মত

المهذب। গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, শাফেয়ী মাযহাবের মত হচ্ছে, যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, সে যদি তা দিতে অস্বীকরে করে, তাহলে দেখতে হবে ঃ

সে যদি যাকাত ফরয হওয়াটাকেই অস্বীকার করে তাহলে মনে করতে হবে, সে কাফির হয়ে গেছে এবং এই কুফরির অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে, যেমন মুর্তাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। কেননা এটা সকলেরই জানা কথা যে, যাকাত ফরয হওয়াটা আল্লাহ্র দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই যে লোক তা অস্বীকার করবে, সে আল্লাহ্কে অস্বীকার করল, অস্বীকার করল তাঁর রাসূলকে। অতএব সে কাফির হয়ে গেল।

আর যদি নিছক কার্পণ্যের কারণে যাকাত না দেয়, তাহলে তার কাছ থেকে তা নেয়া হবে এবং এই না দেয়ার জন্যে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী পূর্বে বলেছিলেন ঃ সে লোকের কাছে থেকে যাকাত তো নেয়া হবেই, সেই সাথে তার ধন-মালের অর্ধেকও নেয়া হবে। কেননা বহজ ইবনে হুকাইম তাঁর পিতা—তাঁর দাদা—রাসূলের করীম থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

وَمَنْ مَّنَعَهَا فَاَنَّااٰخِذُوْهَا وَشَطْرُ مَالِهِ عُزْمَةٌ مِّنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ فِيْهَا شَىْءٌ -

আর যে লোক তা (যাকাত) দিতে অস্বীকার করবে, আমরা অবশ্যই তার কাছ থেকে

---

১. الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج ١ص ٥٠٣

তা নিয়ে নেব, সেই সাথে নেব তার মালের অর্ধেক। আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এ একটি। আর আলে মুহাম্মাদের জন্যে তাতে কোন অংশ নেই।[১]

প্রথম কথাটাই ঠিক। যাকাত দিতে কার্পণ্যকারী ব্যক্তি যদি বাধা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তার সাথে যুদ্ধ করবে। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।[২]

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীকে শিক্ষাদান ও জোরপূর্বক গ্রহণে ঐকমত্য

প্রথম সিদ্ধান্তটি—যে লোক যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তা দিতে প্রস্তুত হবে না তার কাফির হয়ে যাওয়ার কথা এবং তাকে মুর্তাদ হিসেবে হত্যা করার ঘোষণা সর্বসম্মত। তবে শর্ত এই যে, সে লোক এমন হবে না, যার কোন 'ওজর' থাকতে পারে। যেমন নও-মুসলিম হওয়া কিংবা মুসলমানদের বসতি থেকে বহু দূরে জন্মগ্রহণ করা ও লালিত পালিত হওয়া। প্রথম অধ্যায়ে এসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি—যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে কিন্তু সে তা কার্পণ্যের কারণে দিতে অস্বীকার করছে, তার কাছ থেকে তা জোরপূর্বক নেয়া হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। সেই সাথে তাকে বন্দী করে উপযুক্ত শিক্ষাও দিতে হবে।[৩]

---

১. হাদীসটি আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী কর্তৃক উদ্ধৃত। প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। হাকেমও হাদীসটি তার আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (১ম খণ্ড, ৩৯৮ পৃ.)। তার সনদ সহীহ্ বলা হয়েছে এবং যাহবীও তা সমর্থন করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুরীন বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ্ যদি তা বহজ ছাড়া হয়। বহজ সিকাহ্ বর্ণনাকারী ইমাম আহ্মাদকে এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি তাঁর অবস্থা জানি না। তাঁর সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ صالح الاسناد খুবই উত্তম সনদ। আবূ হাতিম বলেছেন, বিশ্বস্ততায় মশ্হুর নয় এবং বলেছেন, বর্ণনাকারী ইবনুত তালা মজহুল। অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তি। যদিও ইমামগণের এক জামায়াত তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। ইবনে আদী বলেছেন, তাঁর বর্ণিত কোন হাদীস আমি 'মুনকার' 'অগ্রহণযোগ্য' পাইনি। যাহ্বী বলেছেন, কোন আলিম তাঁকে কখনই পরিত্যাগ করেন নি। তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে কেউ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাঁর সমালোচনা করে বলা হয়েছে, তিনি শত্‌রঞ্জ খেলতেন। ইবনুল কাতান বলেছেন, এটা তার জন্য ক্ষতিকর কিছু নয়। কেননা সকলের জানা ফিকাহর মস্‌লা হল, তা মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী বলেছেন, তাঁর ব্যাপারে লোকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে কাসীর বলেছেন, অধিকাংশ ফিকাহবিদ তাকে দলিল হিসেবে নেন না। হাকেম বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ্। তাঁর অনেক কয়টি হাদীসকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান' অভিহিত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক তাঁকে সিকাহ বলেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবেও নিয়েছেন। ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারী গ্রন্থের বাইরে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ওপর টীকা লিখেছেন। আবূ দাউদ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মতে দলিল। দেখুন ঃ ميزان الاعتدال ج ١ص ٣.٢ - ٣.٤ - ترجمة ٩٢٤ - ج ١ص ٤٩٨ - ٤٩٩ تهذيب التهذيب - العثمانيه - نيل الاوطار ج ٤ ص ١٢٢ وترجمة ١٣٢٤

২. দেখুন ঃ المجموع ج ٥ ص ٣٣١ - ٣٣٢ - المهذب وشرحه

৩. দেখুন ঃ البحر الذخار ج ٢ ص ١٦.

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীকে তার অর্ধেক মাল নিয়ে শাস্তিদান ও বিভিন্ন মত

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর অর্ধেক মাল নিয়ে তাকে শাস্তিদান অন্য কথায় তার অর্ধেক মাল বাজেয়াপ্ত করা—তাকে ইসলামী নীতি শিক্ষাদান ও তার মত অন্যান্য লোককে সচেতন করার উদ্দেশ্যে যেমন বহজ ইবনে হুকাইম বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে বলা হয়েছে—এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী প্রথম দিকে এ কথাই বলেছিলেন। ইমাম ইসহাকও তাই। আহ্‌মাদ ও আওযায়ী এই স্পষ্টভাষী হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের কেউ কেউ উক্ত মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেমন পরে বলা হচ্ছে।

শাফেয়ীর পরবর্তী নতুন মত হচ্ছে, তার কাছ থেকে যাকাত পরিমাণ মালই গ্রহণ করা হবে। জমহুর ফিকাহ্‌বিদদেরও তাই মত।

ক. এজন্যে যে, হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ব্যক্তির ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কারুর কোন অধিকার নেই।[১]

খ. এবং যেহেতু তা একটি ইবাদত, তা পালন করতে কেউ অস্বীকার করলে তার অর্ধেক মাল নিয়ে নেয়া ওয়াজিব হতে পারে না। যেমন অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে করা হয়।

গ. এবং যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা) ও সাহাবীদের সময়ে যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোক ছিল বিপুল সংখ্যক, কিন্তু তাদের কাছ থেকে অধিক মাল নেয়ার কথা কেউ বর্ণনা করেনি, নেয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়নি।[২]

বহজ বর্ণিত হাদীসটি বায়হাকী শাফেয়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদীস পারদর্শিগণ এমন কোন হাদীস প্রমাণ করেন নি, যার বলে যাকাতও গ্রহণ করা হবে আর সেই সাথে তার উটেরও অর্ধেক (তার এই যাকাত না দেয়ার জরিমানাস্বরূপ) নেয়া হবে। যদি তেমন কিছু প্রমাণিত হত, তাহলে আমরা নিশ্চিয়ই তা মেনে নিতাম।[৩]

বায়হাকী শাফেয়ীর উক্ত কথাকে সমর্থন করেছেন এই বলে যে, বুখারী ও মুসলিম এ ধরনের কোন হাদীস নিয়ে আসেন নি।[৪] তাঁর বর্ণিত হাসীসকে যয়ীফ প্রমাণ করার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট নয়। কেননা এমন বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীসই রয়েছে যা বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেন নি অথচ তার অধিকাংশকে বায়হাকী ও অন্যান্য ইমাম দলিল হিসেবে নিয়েছেন।

তার পরেও 'বায়হাকী' বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে চোরকে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হত। পরে তা বাতিল হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী উক্ত নিয়ম মনসূখ হওয়ার ব্যাপারে বরা ইবনে আজেব বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে নিয়েছেন। হাদীসটিতে তার উটটি যে বিপর্যয় করেছিল তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে কিস্‌সায় নবী করীম (স)

---

১. পরে হাদীসটির সূত্র উল্লেখ করা হবে। ২. السنن الكبرى ج ٤ ص ١٠٥
৩. السنن الكبرى ج ٤ ص ١٠٥ ৪. السنن الكبرى ج ٤ ص ١٠٥

থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি তার জরিমানা দ্বিগুণ করে দিয়েছিলেন, বরং তাতে শুধু ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে তিনি যে হুকুম দিয়েছিলেন তারই উল্লেখ হয়েছে। তাই এ ব্যাপারটিও অনুরূপ হওয়ার সম্ভাবনা।[১]

মা-অর্দী বলেছেন, 'ধন-মালের যাকাত ভিন্ন অন্য কোন হক নেই' রাসূলে করীম (স)-এর এ কথাটিতে এমন কিছু ভাব রয়েছে, যা হাদীসটিকে যাকাত ফরয হওয়ার বাহ্যিক অর্থ থেকে তম্বীহ্ ও ভয় প্রদর্শনের দিকে ফিরিয়ে নেয়। যেমন বলেছেন, 'যে লোক তার ক্রীতদাস হত্যা করবে, আমরাও তাকে হত্যা করব'।[২] যদিও সে তার দাস হত্যার কারণে নিহত হবে না।[৩]

ইমাম নববী الروضه। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ সুনানে আবূ দাঊদ প্রভৃতি গ্রন্থে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে 'তার অর্ধেক মাল নেয়া' সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী সে হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বলেছেন এবং হাদীস পারদর্শীদের থেকেই এই কথা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরাও হাদীসটিকে 'সপ্রমাণিত' মনে করেন না।

এ জবাবটাই পসন্দনীয়, গ্রহণীয়। কিন্তু আমাদের সাথীদের মধ্যে যাঁরা এই জওয়াব দিয়েছেন যে, ও হাদীসটি মনসূখ হয়ে গেছে, তা কিন্তু যয়ীফ কথা। কেননা কোন দলিল ছাড়া মনসূখ প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তা করার এখন আর কোন উপায় নেই।[৪]

তিনি المجموع। গ্রন্থেও এরূপ বলেছেন। যেসব সাহেবান বহজ বর্ণিত হাদীসটিকে মনসূখ বলে জবাব দিয়েছেন, বলেছেন তা ছিল তখন, যখন মাল দ্বারা শাস্তি দেয়া হত। বলেছেন, এ জবাবটা দুটি কারণে দুর্বল। একটি হচ্ছে, ইসলামের প্রথম যুগে মালের জরিমানা করে শাস্তি দেয়া হত এই বলে যে, তারা দাবি করেছে, তা প্রমাণিত কথা নয়, লোকদের কাছে পরিচিতও নয়।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মনসূখ হওয়ার কথা গ্রহণ করা যেতে পারে যদি তার তারিখ জানা যায়। কিন্তু তা এখানে জানা যায়নি।

তাই সহীহ্ জবাব হচ্ছে, মূল হাদীসটিই 'যয়ীফ'। তাই অগ্রহণীয়।[৫]

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

আমরা যা মনে করি, বহজ ইবনে হুকাইম বর্ণিত হাদীসটিতে এমন কোন ক্রটি নেই যা গণ্য করা যেতে পারে। তা—যেমন পূর্বে বলেছি[৬] —রাষ্ট্রপ্রধানের মত নির্ধাণের ফলে

---

১. السنن الكبرى ج ٤ ص ١٠٥

২. পাঁচখানি গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। তিরমিযী বলেছেন, حسن غريب তার সনদে দুর্বলতা আছে। কেননা তা হাসানের বর্ণনা সামুরা থেকে এর বাহ্যিক অর্থকে কতিপয় আলিম গ্রহণ করেছেন।
الحلبى - نيل الاوطار ج ٧ ص ١٥

৩. الاحكام السلطانيه ص ١٣١

৪. الروضه ج٢ ص ٢٠٩ ৫. المجموع ج ٥ ص ٣٣٤ ৬. ঐ প্রথম খণ্ড, ৭৭ পৃ.

যে তা'জীরী শাস্তি দেয়া সাব্যস্ত হবে, তাই দিতে হবে। তা সেই পর্যায়ে গণ্য যা আমরা বারবার উল্লেখ করেছি অর্থাৎ সে সব হাদীসের মধ্যে একটি যা রাসূলে করীম (স) সমাজ নেতা ও রাষ্ট্রকর্তা হিসেবে বলেছেন। কিরাফী ও শাহ্ দিহলভী প্রমুখও এরূপই বলেছেন।[১]

এ হাদীসটি সেই পর্যায়ের যা আধুনিক কালের আইন রচনায় রয়েছে ধার্যকৃত কর দিতে অস্বীকারকারী লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্য।

যাঁরা বহ্জ বর্ণিত হাদীসটি রদ্দ করেন, তাঁরা নিম্নোক্ত তিনটির যে কোন একটির ওপর নির্ভর করেছেন ঃ

১. তাঁদের কেউ কেউ নির্ভর করেছেন হাদীসমূহের পারস্পরিক বৈপরীত্যের ওপর। কেননা যাকাত ছাড়া ধন-মালের অন্য কোন হক নেই, এ হাদীসটি সহীহ্ ও প্রমাণিত। এ পর্যায়ে মরফু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।[২]

২. তাঁদের কেউ কেউ নির্ভর করেছেন এ কথার ওপর যে, তা মাল জরিমানার মাধ্যমে এক প্রকারের শাস্তি দান। তা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, পরে মনসূখ হয়ে গেছে।

৩. অপর কিছু লোক নির্ভর করেছেন একথার ওপর যে, হাদীসটি 'যয়ীফ'—তার বর্ণনাকারী বহ্জ-এর দুর্বলতার কারণে।

এই ভিত্তিতে নববী অবিচার করেছেন।

প্রথম কথা, একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা বলব, ধন-মালের যাকাত ছাড়াও হক্ ধার্য হয়। এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াতও রয়েছে। অনেক কয়টি সহীহ্ হাদীসও উদ্ধৃত ও বর্ণিত হয়েছে। অতএব বহ্জ বর্ণিত হাদীস ও অন্য হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

আর দ্বিতীয় কথা, মালের জরিমানা করে শাস্তিদানের নীতি—সহীহ্ কথা এই—মনসূখ হয়নি। গবেষক ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর الطرق الحكميه গ্রন্থে রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদুনের পনেরটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তার প্রত্যেকটি থেকে মালের জরিমানা দ্বারা শাস্তি দেয়ার কথা প্রমাণিত হয়।[৩]

হাদীসটিকে 'যয়ীফ' মনে করার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে—বাহ্যত মনে হচ্ছে, তা সনদের দিক দিয়ে 'যয়ীফ' নয়। বরং তা হাদীস মওজু হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ। তা পূর্ববর্তী দুটি ব্যাপারের ওপর ভিত্তিশীল। এ কারণে তাঁরা বা তাঁদের

---

১. দেখুন ঃ ঐ ২৩০ পৃ. ২৩৩ পৃ.

২. দেখুন ঃ البحر الذخارج ٢ ص ١٩٠ - المغنى ج ٢ ص ٥٧٣ الاحكام السلطانيه للماوردى ص ٢١

৩. দেখুন ঃ الطرق الحكميه ص ٢٨٧ ط المدنى

কেউ কেউ বহজকে এই হাদীসের দরুন 'যয়ীফ' বলেছেন। কিন্তু বহজ-এর কারণে হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বলা হয়নি। তা-ই সম্ভব। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ এ হাদীসটি না হলে বহজকে আমি 'সিকাহ' বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করতাম।

ইবনুল কাইয়্যেম تهذيب سنن ابى داؤد গ্রন্থে বহজ সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য উল্লেখ করার এবং আহমাদ, ইসহাক ও ইবনুল মাদীনী যে তাকে সহীহ্ বলেছেন, তার উল্লেখের পর লিখেছেন ঃ 'এ হাদীসটি যে লোক রদ্দ করেছেন, তার কাছে কোন দলিল নেই।' হাদীসটির মনসূখ হওয়ার দাবিও বাতিল। কেননা সে দাবির স্বপক্ষেও নেই কোন প্রমাণ । অথচ মাল নিয়ে শাস্তি দেয়ার শরীয়াতসম্মত প্রমাণের অনেক হাদীস রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কোন দলিলের ভিত্তিতে সেগুলোর মনসূখ হওয়া প্রমাণিত নয় বরং রাসূলে করীম (স)-এর পরবর্তীকালে তাঁর খলীফাগণ তদানুযায়ী আমল করেছেন। বরা ইবনে আজেবের উটের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসের সাথে তার বৈপরীত্যটাও চরম মাত্রার দুর্বল কথা। কেননা শাস্তি দেয়া ন্যায়সংগত হতে পারে যদি শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কর্তব্য কাজ করতে অস্বীকৃত হয় কিংবা কোন নিষিদ্ধ কাজ করে বসে। কিন্তু যা তার নিজের ইচ্ছা ও কাজ ছাড়াই ঘটে গেছে, তার ওপর কোনরূপ শাস্তি চাপানোর যৌক্তিকতা কেউ মেনে নেবে না। যাঁরা মনে করেন যে, ও কথাটি শুধু ভীত করার জন্যে বলা, আসলে তা নয়, তাদের এ ধারণা চরম মাত্রার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। নবী করীম (স)-এর কালাম এরূপ অবাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইবনে হাব্বানের কথা 'এ হাদীসটি না থাকলে বহজকে আমি সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করে নিতাম' যারপর নাই অগ্রহণযোগ্য কথা। কেননা তাঁর 'যয়ীফ' হওয়ার কারণ কেবলমাত্র এই একটি হাদীস ছাড়া যদি আর কিছুই না থেকে থাকে, অথচ তাঁকে যয়ীফ বলা হয়েছে কেবলমাত্র এই হাদীসটির কারণে, তাহলে এ তো 'আবর্তনশীল' এবং তা বাতিল। অথচ তাঁর বর্ণনায় এমন কিছু নেই যা তাঁর যয়ীফ হওয়ার কারণ ঘটাতে পারে। কেননা ফিকাহ্ বর্ণনাকারীগণ এ পর্যায়ে তার বিপরীত কিছুই পেশ করেন নি।[১]

আশ্চর্যের কথা, ফিকাহ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির লেখকগণ—যেমন শীরাজী 'আল-মুহায্যার-এর লেখক, মাওর্দী 'আল-আহ্কামুস্ সুলতানিয়ার গ্রন্থকার এবং 'আল-মুগনীর' লেখক ইবনে কুদামাহ প্রমুখ বহজ বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন—তা সহীহ্ কিংবা কমপক্ষে তার সহীহ্ হওয়াটায় বিভিন্ন মত থাকার দরুন—এমন এক হাদীসের বলে, যার কোন মূল্যই নেই ইল্মী দিক দিয়ে। সে হাদীসটি হচ্ছে—ধন-মালের যাকাত ভিন্ন আর কোন দাবি নেই।

এ কারণে হাদীসসমূহের গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্যমান—সেসবের মূল উৎস এবং সূত্রের দিক দিয়ে সঠিকভাবে জেনে নেয়া একান্তই আবশ্যক। 'অবহিত ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে আর কেউ অবহিত করতে পারবে না।'[২]

১. تهذيب السنن مع مختصر المنذرى والمعالم ج ٢ ص ١٩٤

২. সূরা ফাতির ১৪ আয়াত

হাম্বলী মায্হাবের মত

হাম্বলী মায্হাবের মত ঠিক শাফেয়ী মাযহাবের মতই। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের অমান্যতা, বিদ্রোহ ও মিথ্যা বলার কারণে মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা দেয়ার পর ইবনে কুদামাহ্ লিখেছেন ঃ 'যাকাত ফরয হওয়া বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তখন রাষ্ট্রপ্রধান যদি তার নিকট থেকে যাকাত নিয়ে নিতে পারেন, তাবে তাই নেবেন এবং তাকে শাস্তি দেবেন। অধিক সংখ্যক আলিমের কথা হচ্ছে, তার অতিরিক্ত কিছু নেবেন না।....অনুরূপভাবে যদি গোপন করে ও মিথ্যা বলে, যার ফলে রাষ্ট্রপ্রধান.তার যাকাত গ্রহণ করতে না পারেন—পরে তা যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাহলে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই ও আবূবকর আবদুল আজীয বলেছেন, তার যাকাতও নেবে, সেই সাথে তার মোট মালের অর্ধেকও নেবে। যেমন বহুজ ইবনে হুকাইম বর্ণনা করেছেন।

সেই অস্বীকারকারী ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপ্রধানের যাকাত গ্রহণে বাধাদান করে, তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কেননা সাহাবায়ে কিরাম (রা) যাকাতের প্রতিবন্ধকতাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। সে যুদ্ধে যদি রাষ্ট্রপ্রধান জয়লাভ করেন, তার সব ধন-মালও দখলে আসে, তাহলে তা থেকে যাকাত নেবেন; তখনও তার অতিরিক্ত কিছু নেবেন না। তার সন্তানদেরকে গোলাম বানানো যাবে না। কেননা এই সন্তানরা কোন অপরাধ করেনি। আর যাকাত দিতে অস্বীকারকারীকেই যখন গোলাম বানানো হয় না, তখন তার সন্তানদের তো কোন কথাই উঠতে পারে না। আর যুদ্ধে যদি জয় হয় কিন্তু ধন-মাল না পাওয়া যায়, তাহলে তা দেবার জন্যে তাকে বলতে হবে এবং তওবা করতে বলতে হবে তিনবার। যদি সে তওবা করে এবং যাকাতও দিয়ে দেয়, তো ভাল কথা, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

অবশ্য ইমাম আহমাদের একটি মত বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে—যাকাত না দেয়ার দরুন সে যখন যুদ্ধই করতে নেমেছে, তখন সে কাফির না হয়ে যায় না। মাইমুনী ইমাম আহমাদের এক কথা বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা যখন যাকাত দিতে অস্বীকৃত হবে—যেমন লোকেরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে দিতে অস্বীকার করেছিল এবং তারা সেজন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তাহলের তাদের উত্তরাধিকারী কেউ হবে না, তাদের জানাযার নামাযও পড়া হবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ যাকাত তরককারী মুসলিম নয়।

তার কারণ, যেমন বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ তাদের কামড়ে ধরল, তখন তারা বলেছিল ঃ হ্যাঁ আমরা যাকাত দেব। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেছিলেন ঃ আমি তা গ্রহণ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ সাক্ষ্য না দেবে যে, আমাদের পক্ষের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতবাসী হবে এবং তোমাদের পক্ষে নিহতরা হবে জাহান্নামবাসী। কোন সাহাবী এ কথার প্রতিবাদ করেছেন, এমন কথা কেউ বর্ণনা করেনি। তাহলে প্রমাণিত হল যে, তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বিবেচ্য, হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবী শুরুতে যখন যুদ্ধ যোগ্রাদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, যদি তাঁরা মনে করতেন যে, ওসব লোক কাফির হয়ে গেছে, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করতে ইতস্তত করতেন না। পরে তাঁরা যুদ্ধে একমত হলেন বটে; কিন্তু তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারটি মৌলিকভাবে 'না'র ওপর থেকে গেল। আরও এজন্যে যে, যাকাত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের একটি শাখা। তা শুধু তরক করলেই একজন লোক কাফির হয়ে যায় না, যেমন হজ্জ। আর যাকাত তরক করলে যদি কাফির না হয়, তাহলে তার জন্যে যুদ্ধ করলেই কাফির হয়ে যাবে না। যেমন বিদ্রোহীরা। হযরত আবূ বকর (রা) যাদেরকে উক্ত কথা বলেছিলেন, হতে পারে তারা যাকাতকে ফরয মানতেই অস্বীকার করেছিল। এ ব্যাপারটি তো একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল। তাই হযরত আবূ বকর (রা) ঠিক কোন্ সব লোককে সম্বোধন করে উক্ত কথাটি বলেছিলেন, তা আজ প্রকট ও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। হতে পারে তারা মুর্তাদ হয়ে যাওয়া লোক ছিল। হতে পারে তারা যাকাত ফরয হওয়াকেই অস্বীকার করেছিল। আরও অনেক কিছু হতে পারে। তাই বিভিন্ন মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে কোন একটা চূড়ান্ত কথা বলা চলে না। হয়ত হযরত আবূ বকর (রা) একথা বলেছিলেন এজন্যে যে, তারা কবীরা গুনাহ্ করেছে এবং তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। এজন্যে তাদের জাহান্নামী হওয়ার কথা বলেছেন প্রকাশ্যভাবে, যেমন প্রকাশ্যভাবে মুজাহিদ শহীদদের জান্নাতবাসী হওয়ার কথা বলেছিলেন। আর সব ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা তো আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত। তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এমন কথাও বলেন নি। কেউ জাহান্নামী হবে একথা বললে তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলা হয় না। পরন্তু নবী করীম (স) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে বহু লোক চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।[১]

'জায়দীয়া' মতের লোকদের বক্তব্য

'জায়দীয়া' মতের কিতাব الازهار এবং তাঁর শরাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ধন-মালের মালিক যদি দাবি করে যে, তার ওপর যাকাত ফরয নয়, সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়, তাহলে তার কথা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধির কর্তব্য হল, তার কথার সত্যতায় কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে সে ব্যক্তিকে কিরা-কসম করতে বাধ্য করবে। আর তা করা হবে যদি তার বিশ্বস্ততা প্রকাশমান ও সর্বজনবিদিত না হয়। কিন্তু সে লোক যদি প্রকাশমানভাবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হয়, তাহলে তাকে কিরা-কসম করতে বাধ্য করা হবে না।[২]

কিন্তু ধন-মালের মালিক যদি অঙ্গীকার করে যে, তার ওপর যাকাত ফরয আর সেই সাথে এও দাবি করে যে, সে তা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে দাবি করার পূর্বেই পাওয়ার

---

১. দেখুন ঃ ৫৭৫ – ৫৭২ المغنى ج ٢ ص

২. ৫২. شرح الازهاروحواشيه ج اص

যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে—এ কথার সত্যতা প্রমাণকারী যদি কেউ না থাকে, তাহলে বন্টন করার দাবিকারীকে তার প্রমাণ পেশ করতে হবে। কেননা আসল কথা হল যাকাত আদায় করে না দেয়া এবং বন্টনটা ঘটেছে রাষ্ট্র প্রধানের দাবি করার পূর্বে। সে যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়া ও বন্টন করা ইত্যাদি সব কিছু প্রমাণ পেশ করে তো ভালো কথা নতুবা তার নিকট থেকে যাকাত আদায়কারী তা আদায় করে নেবে। তখন তার বন্টন করার দাবি মেনে নেয়া যাবে না, সে যদি প্রকাশমান-বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবুও।[১]

অত্যাচারী শাসকের কাছে যাকাত দেয়া

অত্যাচারী শাসকের কাছে যাকাত দেয়া পর্যায়ে আলিমগণ যা কিছু বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তার সম্পূরক ও চূড়ান্ত কথা হচ্ছে তিনটি ঃ

১. নিঃশর্তভাবে তা জায়েয। ২. নিঃশর্তভাবে তা নিষিদ্ধ এবং ৩. পার্থক্যকরণ।

যাঁরা জায়েয বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য

অত্যাচারী শাসকের কাছে যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন যাঁরা, তাঁদের দলিল হচ্ছে সে সব হাদীস, যাতে এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা উদ্ধৃত হয়েছে। المنتقى। গ্রন্থে তন্মধ্য থেকে অনেকগুলো হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।[২]

ক. হযরত আনাস থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি বলল ঃ হে রাসূল (স) আমি যদি আপনার প্রেরিত ব্যক্তির কাছে যাকাত আদায় করে দিই, তাহলে কি আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কাছে দায়িত্বমুক্ত হতে পারলাম ? বলেন ঃ হ্যাঁ, তুমি যদি তা আমার প্রেরিত ব্যক্তির কাছে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত হলে। তখন তুমি তোমার শুভ কর্মফল পাবে। যে তার ব্যয়ক্ষেত্র বদলে দেবে, গুনাহ্ তারই হবে।[৩]

খ. ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ আমার পরে নিশ্চয়ই এমন সব নিদর্শনাদি ও ব্যাপারসমূহ সংঘটিত হবে, যা তোমরা খারাপ মনে করবে। সাহাবিগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, সেই অবস্থার জন্যে আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন ? বললেন ঃ তোমাদের ওপর ধার্য কর্তব্য ও হক তোমরা আদায় করতে থাকবে আর তোমাদের যা পাওনা ও অধিকার, তা আল্লাহ্র নিকট চাইবে।[৪]

গ. ওয়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রশ্ন করছিল—আপনি কি মনে করেন, আমাদের ওপর যদি এমন সব কর্তৃত্বসম্পন্ন লোক প্রতিষ্ঠিত হয় যারা আমাদের হক আমাদেরকে দিতে অস্বীকার

---

১. شرح الازهار وحواشيه ج اص ٥٣٠.

২. দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ ص ١٦٤ - ١٦٥ এবং দেখুন ঃ البحر ج ٢ ص ١٩٠-١٩١.

৩. আহমাদ বর্ণনা করেছেন, যেমন 'নাইলুল আওতার' ৪র্থ খণ্ড ১৫৫ পৃ. রয়েছে।

৪. বুখারী, মুসলিম । ঐ

করে আর তাদের হক্ তারা আমাদের কাছে চায়, তাহলে তখন আমরা কি করব ? বললেন ঃ তোমরা তা শোন এবং মান্য কর। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের ওপর তা ধার্য হবেই যা তারা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে এবং তোমাদের ওপর তাই ধার্য যা তোমরা চাপিয়ে নিয়েছ নিজেদের ওপর।[১]

এ সব হাদীসের খুব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র সব সময়ই এমন ধন-মালের মুখাপেক্ষী, যার দ্বারা তা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেবে, যার ফলে ইসলামের কালেমা বুলন্দ হবে। কিন্তু জনগণ যদি তাদের হস্তে প্রয়োজনীয় ধন-মাল দেয়া থেকে বিরত রাখে—কোন কোন প্রশাসকের জুলুম নিপীড়নের কারণে, তাহলে রাষ্ট্রের আর্থিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। উম্মতের রজ্জু ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। অপেক্ষমাণ শত্রুরা তাদের ব্যাপারে অনেক লোভ-লালসা করবে। অতএব সে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা—যাকাত ইত্যাদি যা কিছু দেয় তা যথারীতি আদায় করা একান্তই কর্তব্য। ইসলামী শরীয়াত জুলুম প্রতিরোধ করার যত পথ দেখিয়েছে তা অবলম্বনের পথে এ নির্দেশ কোন বাধা নয়।

তাই মুসলিম ব্যক্তিবর্গের কাছে যে সব আর্থিক অধিকার পাওনা রয়েছে তা দিয়ে দেয়া তাদের কর্তব্য। সেই সাথে দায়িত্বশীল জাতীয় কর্মকর্তাদের কল্যাণ কামনামূলক উপদেশ—নসিহত করাও বাঞ্ছনীয়। কেননা দ্বীন ইসলামের দিক দিয়ে তা ওয়াজিব এবং তা পালন করা উচিত। কুরআনী ঘোষণানুযায়ী পারস্পরিক সত্য, ন্যায় ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান এবং ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ নাগরিক হিসেবে একটা অতি বড় কর্তব্য।

মুসলিম সমাজের অধিকার এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব অবিসংবাদিত, অবিস্মরণীয়। আর তা হচ্ছে শাসক-প্রশাসকদের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পেলে এবং কুরআনী দলিলের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হলে তাদের আনুগত্য অস্বীকার করা একটা অতি বড় দায়িত্ব।

অনুরূপভাবে মুসলিম ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য হচ্ছে, যে কোন স্পষ্ট গুনাহের কাজ দেখতে পারে, তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحِبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ - فَاِذَاأَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَاطَاعَةَ -

শোনা এবং আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য—পসন্দ ও অপসন্দ সর্বপ্রকারের কাজে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গুনাহের কাজে আদিষ্ট না হবে। যদি কোন পাপ বা নাফরমানীর কাজের আদেশ হবে, তখন তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।[২]

১. মুসলিম, তিরমিযী তিনি এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন, ঐ

১. বেশ কয়জন মুহাদ্দিস হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে উমর থেকে, যেমন الجامع। الصغير। গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

যাঁরা নিষেধ করেছেন তাঁদের অভিমত এবং দলিল

অত্যাচারী শাসকের কাছে যাকাত দিতে যাঁরা নিঃশর্তভাবে নিষেধ করেছেন, তাঁদের এই মতটি ইমাম শাফেয়ীর দুটি কথা একটি। আল-মাহদী তা البحر। গ্রন্থে আহ্‌লি বয়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাহলে জালিম প্রশাসকদের কাছে যাকাত দেয়া জায়েয নয়, তাতে ফরয আদায় হবে না। তাদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী ঃ

لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ -(البقره - ١٢٥)

আমার কোন দায়িত্ব-কর্তৃত্ব অত্যাচারী লোকেরা পেতে পারে না।

ইমাম শাওকানী এ আয়াতকে দলিল বানানোর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এই বিতর্কিত বিষয়ে এরূপ একটি সাধারণ অর্থবোধক আয়াতকে দলিলরূপে পেশ করা যথার্থ বলে নিলেও দেখা যায়, আয়াতটির সাধারণ অর্থবোধকতা এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ দ্বারা সীমিত ও নির্ধারিত হয়ে গেছে।[১]

যাঁরা পার্থক্যকরণের মত দিয়েছেন

শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, মালের মালিকের পক্ষে সরকার নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী ও প্রতিনিধির কাছে যাকাত অর্পণ করা জায়েয—তারা ফাসিক হলেও যদি তারা তা যথাস্থানে স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র বিধান মত ব্যয় করে। আর তারা যদি তা যথাস্থানে স্থাপন না করে ও তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টন না করে, তাহলে তাদের কাছে যাকাত অর্পণ করা সম্পূর্ণ হারাম। তখন তা গোপন করা ও লুকিয়ে ফেলা ওয়াজিব।[২] এবং 'আল-মাঅর্দী শাফেয়ী মতের আলিম হয়েও এ ধরনের শাসক-প্রশাসক সম্পর্কে বলেছেন ঃ তারা যখন মালের মালিকদের কাছ থেকে জোর ও জবরদস্তি করে যাকাত গ্রহণ করবে, তাদের মালে আল্লাহ্‌র যে হক ধার্য রয়েছে তা আদায় হবে না। তখন তা নিজস্বভাবে পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করা তাদের কর্তব্য হবে।[৩]

মালিকী মাযহাবের লোকদের মতে ঃ দরদীর الشرح الكبير على مختصر خليل।[৪] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ যাকাত ব্যয়ে অত্যাচারী বলে পরিচিত ও খ্যাত ব্যক্তিকে যে লোক যাকাত দেবে সে যদি কার্যতও জুলুম ও অবিচারমূলক কাজ করে, তাহলে সে যাকাত আদায় হবে না। তাকে দিতে অস্বীকার করা এবং সম্ভব হলে তা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া কর্তব্য। আর যদি কার্যত, অবিচার না করে, পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যেই তা বন্টন করে, তাহলে তা আদায় হবে।

আর সে যদি যাকাত গ্রহণ ও ব্যয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরতা করে, যদি সে অত্যাচারী

---

১. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٢٥ ২. نيل الاوطارج ٢ ص ١٦٥

৩. الاحكام السلطانيه للماوردى ص ١١٧ المطبعة المحمودية التجارية بمصر

৪ ঐ ج ١ص ٥٠٢

হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে, তাহলে দরদীর বলেছেন—তার কাছে দেয়াই কর্তব্য। দসূকী তাঁর টীকায় লিখেছেন, তা ঠিক নয়, বরং তখনও তা মাকরূহ্ হবে।[১]

শায়খ জরুখ তাঁর شرح الرسالة গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

‘সুবিচারক ও ন্যায়বাদী রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যাকাত ইচ্ছামূলকভাবে দেয়া যাবে, তাতে কোনরূপ মতভেদ নেই। আর অবিচারক ও অন্যায়বাদী রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে সে যদি দাবি করে এবং তার কাছ থেকে তা গোপন করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে দিতে হবে। যার পক্ষে তাকে না দিয়েই নিজস্বভাবে বন্টন করা সম্ভব হবে, তার পক্ষে তাকে দেয়ায় যাকাত আদায় হবে না। ইবনুল কাসেম ও ইবনে নাফে বর্ণনা করেছেন, যে যদি তাকে সেজন্য কিরা-কসম করতে বলে, তাহলে তাকে দিয়ে দেয়া যথেষ্ট হবে। আশ্‌হুব মনে করেন, যাকাতের জন্যে যদি জোর-জুলুম করা হয়, তাহলে তাকে দেয়াই যথেষ্ট হবে। তবে তখন আবার দেয়া মুস্তাহাব। ইবনে আবদুল হাকাম মদীনার শাসনকর্তাকে যাকাত দিয়েছিলেন। ইবনে রুশদ বলেছেন ঃ যে লোক যাকাতের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ নয় এবং তা তার উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করে না, তাকে যাকাত দেয়া যথেষ্ট হওয়া পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে المدونة। আচবাগ, ইবনে অহব এবং ইয়াহ্ইয়ার শ্রবণ মতে কাসেমের দুটি কথার একটি হচ্ছে—তা যথেষ্ট হবে। আর শ্রবণে ইবনুল কাসেমের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তা যথেষ্ট হবে না। মশহুর কথা হচ্ছে, তা যথেষ্ট হবে যদি সেজন্য জোরজবরদস্তি করে। আল্লাহ্ই জালিমের বড় হিসেব গ্রহণকারী। কিন্তু তা জায়েয হবে না যতক্ষণ তাকে যাকাত বলে নামকরণ ও চিহ্নিত করণ না করা হবে এবং তা যথানিয়মে গ্রহণ করা না হবে।[২]

অর্থাৎ ট্যাক্স বা ‘কর’ বা অনুরূপ কোন নামে যাকাত গ্রহণ করা হলে সব মাযহাবের মতেই তা আদায় হবে না।

হানাফীদের মত

আল্লাহাদ্রোহী ও অত্যাচারী শাসকগণ যদি প্রকাশমান ধন-মালে যাকাত বা খারাজ নিয়ে নেয় এবং তা যথাস্থানে ব্যয় করে, তাহলে ধন-মালিকদের পক্ষে পুনরায় যাকাত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে তারা যদি তা যথাস্থানে ব্যয় না করে আর তা স্থাপন করে তার জন্যে শরীয়াতসম্মত স্থানে, তাহলে বান্দাহ্ এবং আল্লাহ্র পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার্থে পুনরায় যাকাত দেয়া তাদের জন্যে কর্তব্য হবে। তবে খারাজ আবার দিতে হবে না। কেননা তার ব্যয়ক্ষেত্র তারাই। তা যুদ্ধের পাওনা, তারাই তো যুধ্যমান শত্রুর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করে থাকে।

অবশ্য অপ্রকাশমান ধন-মালের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন, তা আদায় হয়নি। কেননা যাকাত গ্রহণ করার জালিম শাসকের কোন অধিকার নেই। এই কারণে তার কাছে যাকাত অর্পণ করা জায়েয নয়। কেননা তা গ্রহণ করার যার বৈধ অধিকারই নেই তার কাছে তা দেয়া হলে আদায় হতে পারে না।

---

১. حاشية الدسوقي ج ١ ص ٥٠٤

২. شرح الرسالة ج اص ٣٤٠ - ٣٤١

'আল্-মবসূত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, জালিম লোকের হাতে যাকাত অর্পণ করে যদি তাদের প্রতি সাদ্কা করার নিয়ত করে, তাহ্লে তা সহীহ্ হওয়াই অধিক যথার্থ কথা। কেননা তাদের ওপর যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে, সে হিসেবে তারাই ফকীর পর্যায়ে গণ্য।[১]

হাম্বলীদের মত

হাম্বলী ফিকাহ্বিদদের মত—ইবনে কুদামাহ্ তাঁর المغنى। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'খাওয়ারিজ ও বিদ্রোহীরা যদি যাকাত নিয়ে নেয়, তাহ্লে দাতার যাকাত আদায় হবে। অনুরূপভাবে শাসকমণ্ডলীর কেউ যদি ধন-মালের মালিকের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নেয়, তবে তাতেও ফরয আদায় হয়ে যাবে, গ্রহণকারী তা নিয়ে ন্যায়পরতা রক্ষা করল কি অবিচার করল এবং তা জোরপূর্বক নিল কিংবা ইচ্ছা করেই তা তাকে দিল, তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

আবূ সালেহ্ বলেছেন ঃ আমি সায়াদ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জাবির, আবূ সায়াদী খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; বললাম ঃ এই শাসকমণ্ডলীর কার্যকলাপ তো আপনারা দেখছেনই। আমরা কি আমাদের যাকাত তাঁদের কাছে দেব ? জবাবে তাঁরা সবাই বললেন ঃ হ্যাঁ।

ইব্রাহীম নখ্য়ী বলেছেন ঃ ওশর বা কর আদায়কারীরা তোমাদের কাছ থেকে যা আদায় করে নেয়, তাতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত হবে। সাল্মমাতা ইবনে আক্ওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর যাকাত নজ্দা খারেজীকে দিয়েছিলেন।'

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে ইবনুয যুবাইর ও নজ্দার নিয়োজিত যাকাত আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ এদের যার কাছেই তোমাদের যাকাত দিয়ে দাও না কেন, তোমার দায়িত্ব পালন হয়ে গেল।

কিয়াসের পক্ষপাতী ফিকাহ্বিদ্দের মতও অনুরূপ, যে সব স্থানে তাদের শাসন চলে সব স্থানে তা-ই কার্যকর। তাঁরা বলেছেন, যখন খাওয়ারিজদের কাছে যাবে, তখন তাদেরকে শুল্ক দিলে তাতে যাকাত আদায় হবে না।

যেসব খাওয়ারিজ যাকাত আদায় করে, তাদের সম্পর্কে আবূ উবাইদ বলেছেন, তারা যাদের নিকট থেকে যাকাত নিল তাদেরকে তা পুনরায় দিতে হবে। কেননা ওরা তো মুসলমানদের জননেতা ও দায়িত্বশীল শাসক নয়। ফলে তারা ডাকাত সমতুল্য।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, আমাদের জন্যে সাহাবীদের কথাই দলিল, তাঁদের সময়ে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল বলে আমরা জানি না। অতএব ইজমা হয়েছিল, ধরে

---

১. الدر المختار وحاشية ج ٢ ص ٢٦ – ٢٧। সত্য কথা হচ্ছে, ঐ লোকদের ওপর জনগণের যে সব অধিকার রয়েছে ও ধন-মাল ধার্য হয়েছে, সে হিসেবে তারাই ঋণগস্ত ও ঋণী বলে গণ্য হবে। আর 'আল-গারেমুন' খাত পর্যায়ে আমরা বলে এসেছি যে, তার এ ঋণটা বেহুদা ব্যয় বা পাপ কাজে ব্যয়ের দরুন হবে না, তবেই সে ঋণগ্রস্ত বলে যাকাত পাওয়ার অধিকারী হবে। কিন্তু এখানে সে শর্ত পাওয়া যায়নি।

নিতে পারি। কেননা তা কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকের কাছেই দেয়া বিদ্রোহীদের নিকট দেয়ার মতই।[১]

مطالب اولى النهى গ্রন্থেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনায়কের কাছে যাকাত দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মাযহাবের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। সে সুবিচারক হোক, কি অত্যাচারী। আর ধন-মাল প্রকাশমান হোক, কি প্রচ্ছন্ন। এ পর্যায়ে সাহাবিগণ থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা-ই তাদের দলিল। আহমাদ বলেছেন, তাঁরা শাসকদের কাছে যাকাত দিয়ে দিত। রাসূলের সাহাবীগণই তাদেরকে তা দিয়ে দিতে বলতেন এবং তারা তা কোথায় ব্যয় করে তাও তাঁরা জানতেন। এরূপ অবস্থায় আমার কি বলবার থাকতে পারে?[২]

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

এ সব বিষয়ে আমি যা মনে করি, তা হচ্ছে, জালিম শাসকরা যা নেয়, তা যদি যাকাতের নামে নেয়, তাহলে তাদের হস্তে যাকাত অর্পণ করা অন্যায় হবে না এবং কোন অবস্থাতেই মুসলমানকে পুনর্বার যাকাত দিতে বাধ্য করা যাবে না। হ্যাঁ, তারা যদি যাকাতের নামে না নেন, তাহলে তা দিয়ে যাকাত আদায় করা হল, মনে করা যাবে না। মালিকী মাযহাবের আলিমগণ এবং অন্যরা তাই বলেছেন। 'যাকাত ও কর' এ পর্যায়ে আমরা আরও আলোচনা পেশ করবো।

জালিমের হাতে যাকাত দেয়া হবে কিনা, এই প্রশ্নে আমি তা দেয়াই ভালো মনে করি—যদি তারা তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করে এবং শরীয়াতে তার জন্যে নির্দিষ্ট খাতসমূহে তা ব্যয় করে, অন্যান্য কোন কোন ক্ষেত্রে তারা জুলুম করলেও।

যদি তা যথাস্থানে স্থাপন না করে, তাহলে তাদের হাতে যাকাত দেয়া যাবে না। কিন্তু যদি দাবি করে, তাহলে তো না দিয়ে উপায় থাকবে না। তখন আমল করতে হবে সে সব হাদীস অনুযায়ী যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। শাসক ও রাজন্যবর্গ জুলুম করলেও তাদের হাতে যাকাত সঁপে দেয়া সংক্রান্ত সাহাবাগণের বারবার দেয়া ফতোয়া অনুযায়ীও আমল হবে।

শাসকের মুসলিম হওয়া শর্ত

যে কথায় কোনই সন্দেহ নেই তা হচ্ছে সাহাবিগণ যেসব শাসক-প্রশাসকের হাতে যাকাত সঁপে দেয়ার ফতোয়া দিয়েছেন, তাঁরা মুসলমান—ইসলামের প্রতি ঈমানদার ও ইসলাম অনুসারী লোক ছিলেন। তাঁরা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করেছেন এবং তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইসলামেরই নামে তাঁরা বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, ইসলামেরই ঝাণ্ডা তাঁরা বুলন্দ করেছেন, যদিও পরবর্তীকালে কোন কোন

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٤٤ – ٦٤٥ ط المنار الثالثه

২. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٢٠

হুকুম আহকামের বরখেলাফ কাজ করেছেন দুনিয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ ও লালসার দাসত্ব করতে গিয়ে।

এই শ্রেণীর লোকদের নিকট যাকাত দেয়া যেতে পারে, আদায় করা যেতে পারে সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক অধিকার। সহীহ্ হাদীসসমূহ তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে এবং জমহুর ফিকাহ্বিদগণ এ সব হাদীসকেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের এ কালের শাসক-প্রশাসকদের মধ্যে এই ধরনের লোক খুব বেশি নেই। অধিকাংশই তো ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তাকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে, কুরআন মজীদকে তারা ত্যাগ করেছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অনেকে ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামের দাওয়াত বিস্তারকারীদের ওপর খড়গহস্ত হয়ে পড়েছে। এ লোকদের তো সাহায্য সহযোগিতা করা যেতে পারে না, যাকাতের মাল এদের হাতে সঁপে দিয়ে। কেননা তা দিয়ে তারা তাদের কুফরী ও নাস্তিকতা প্রচার করবে এবং দুনিয়ার চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তাই শাসক-প্রশাসকের মুসলিম ও ইসলাম পালনকারী হওয়া একটি অনিবার্য শর্ত তাদের হাতে যাকাত দেয়া জায়েয হওয়ার জন্যে।

জমহুর ফিকাহ্বিদগণ সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলেছেন, কোন কাজে সফরকারী ইবনুস সাবীল হলেও তাকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পরে না, যতক্ষণ সে তওবা না করবে। পাপ কাজের দরুন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কেও এই কথা। কেননা আল্লাহ্র মাল দিয়ে আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যেতে পারে না।

যে শাসক আল্লাহ্র মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথেই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়—সে পথ রুদ্ধ করে দেয়, আল্লাহ্র শরীয়াতকে অচল করে রাখে এবং আল্লাহ্র বিধানের দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে মর্মান্তিকভাবে উৎপীড়ন দিয়ে জর্জরিত করে, তাদের হাতে যাকাত সঁপে দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠতে পারে না।

সমাজ সংস্কারক আল্লামা সাইয়্যেদ রশীদ রিজা (র) তাঁর তফসীর 'আল-মানা'র এ এ পর্যায়ে যা লিখেছেন, তা আমাকে চরমভাবে সন্তুষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি লিখেছেনঃ 'দারুল ইসলামে মুসলমানদের নেতা—যার হাতে যাকাত দিয়ে দেয়া যায়, সেই আসলে যাকাত সংগ্রহ ও তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করার অধিকারী। তার কাছে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তার একান্ত কর্তব্য—ওয়াজিব।

কিন্তু এ যুগে বহু মুসলিম দেশেই ইসলামী হুকুম কায়েম নেই, যা ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন, ইসলামের ওপর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া পর্যায়ের জিহাদ করবে, আল্লাহ্র হদ্দসমূহ কায়েম করবে, ফরয যাকাত গ্রহণ করবে—যেমন তা ফরয করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র নির্দিষ্ট ব্যয় খাতসমূহে তা

ব্যয় করবে। বরং অধিকাংশ মুসলিম দেশই ফ্রাঙ্গী শাসনের অধীন হয়ে পড়েছে। বহু দেশের শাসকগণ মুর্তাদ হয়ে গেছে, নাস্তিকতায় বিশ্বাস হয়ে গেছে।[১]

ফ্রাঙ্গী রাষ্ট্রসমূহের অধীন ভৌগোলিক নামের মুসলমানদের বহু নেতাকেই ফ্রাঙ্গীরা ইসলামের নামে গোলাম বানাবার কাজে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের দ্বারাই ইসলামকে খতম করানো হচ্ছে।

মুসলমানদের জন্যে কল্যাণময় কাজ ও যাকাত সাদকাত ওয়াকফ প্রভৃতি ধর্মীয় গুণ পরিচিতিসম্পন্ন ধন-মালের ওপরও তারা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে এই মুসলিম নামধারী নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে। তাই এ ধরনের সরকারের হাতে যাকাতের একবিন্দুও সোপর্দ করা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তাদের উপাধি ও সরকারী পদ যা-ই হোক না কেন।

অন্যান্য যে সব ইসলামী হুকুমতের নেতা, কর্তা ও প্রধানরা দ্বীন ইসলাম পালন করে চলে এবং সেখানকার 'বায়তুলমালের ওপর বিদেশীদের কোন কর্তৃত্ব আধিপত্য নেই, সেসবের কাছে প্রকাশমান ধন-মালের যাকাত সঁপে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রচ্ছন্ন ধন-মাল—স্বর্ণ-রৌপ্য, নগদ সম্পদ ইত্যাদির যাকাতও তাদেরই দিতে হবে—যদি তারা তা দেবার জন্যে দাবি করে, যদিও তারা কোন কোন ক্ষেত্রে ও আইন বিধান জুলুমকারী হয়ে থাকে তবুও। যেমন ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাদের হাতে যে লোক নিজের যাকাত সঁপে দেবে, তারা তা যথাস্থানে কুরআনী আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট খাতসমূহের ইনসাফ সহকারে ব্যয় না করলেও তা দিতে বাধ্য হবে।

বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলেছেন, যেমন شرح المهذب প্রভৃতি কিতাবে বলা হয়েছে—রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসক যদি জুলুমকারী হন, যাকাত তার শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় না করে তাহলে উত্তম নীতি হচ্ছে, নিজ হস্তে পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে ফরয যাকাত বন্টন করে দেয়া—যদি রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর কর্মচারীরা তা দেবার দাবি পেশ না করেন, তবে।[২]

---

১. আজকের মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশই এ ধরনের অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। ফ্রাঙ্গী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর ধর্ম ও আদর্শহীন শাসকদের অধীন হয়ে পড়েছে।

২ تفسير المنار ج ١٠ ص ٥٩٥ - ٥٩٦ ط ثانيه

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাতে নিয়তের স্থান

যাকাত এক হিসেবে ইবাদত, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বড় মাধ্যম। কেননা তা ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রতীক এবং ঈমানের তৃতীয় ভিত্তি। কুরআন মজীদ এবং রাসূলের সুন্নতের অসংখ্য স্থানে তা নামাযের সাথে মিলিত ও যুক্তভাবে উল্লিখিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা একটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ইবাদত।

অপরদিক দিয়ে তা একটা নির্দিষ্ট কর, ধনীদের ধন-মালে ফকীর ও আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লিখিত সমস্ত পাওয়ার যোগ্য লোকদের জন্যে সুনির্দিষ্ট হক। তা এমন একটা কর, যা সংগ্রহ করা ও ব্যয় করার মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রাষ্ট্রের। যাদের ওপর তা ধার্য হয়, তারা স্বতস্ফূর্তভাবে তা না দিলে শক্তি প্রয়োগ করে তা আদায় করবে রাষ্ট্রশক্তি। এই অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা একটা বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর।

অর্থাৎ যাকাত এদিক দিয়ে ইবাদতের তাৎপর্যবহ কর এবং এমন একটি কর যা ইবাদতের রূপ ও প্রকৃতির ধারক।

যাকাত এই দুই ভাবধারা সম্বলিত বলে তার প্রতি ফিকাহবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁদের কেউ কেউ যাকাতের প্রথম উল্লিখিত বিশেষত্বের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন এবং অপর কেউ কেউ এই দ্বিতীয় উক্ত বিশেষত্বকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন কোন আহকামের ক্ষেত্রে কতক ফিকাহবিদ দু'টি তাৎপর্যের একটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং অপর আহকামে হয়ত দ্বিতীয় তাৎপর্যটির ওপর লক্ষ্য আরোপ করেছেন তুলনামূলকভাবে বেশি।

এরূপ মতভেদের চেহারা দেখা যায় বালক, পাগল ও এ পর্যায়ের অন্যদের ধন-মালের যাকাত ফরয হওয়ার পর্যায়ে। যেমন 'নিয়ত'-ও যাকাতে তার স্থান বিষয়ে তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

যাকাতে নিয়তের শর্তকরণ

যাকাত দেবার জন্যে নিয়তের কোন শর্ত আছে কি নেই ?

সাধারণ ফিকাহবিদদের মত হচ্ছে, যাকাত আদায়ে নিয়তের শর্ত রয়েছে। কেননা তা একটি ইবাদত বিশেষ এবং কোন ইবাদতই নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ -

লোকদের শুধু এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একান্তভাবে তাঁরই জন্যে একনিষ্ঠ করে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'কাজসমূহ নিয়ত ভিত্তিক'। যদি নিয়ত না করে—ভুল ভ্রান্তির কারণে হলেও—কোন ইবাদত হবে না। কেননা ভুল-ভ্রান্তির কারণে নিয়ত না করা প্রমাণ করে যে, লোকটি মাল দিয়েছে বটে; কিন্তু ইবাদত পালনের ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কোন নিয়ত করেনি। তখন তা মৃতের কাজ হয়ে দাঁড়ায় কিংবা তা যেন একটা প্রাণহীন প্রতিকৃতিমাত্র। নিয়ত ওয়াজিব। হয় তাকে নিজেকেই তা করতে হবে, নতুবা করতে হবে ধন-মালের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিকে। যেমন বালক, পাগল বা নির্বোধ ব্যক্তি—যার মাল ব্যয়ের ক্ষমতা নেই তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি নিয়ত করবে, তার বা সে যার প্রতিনিধিত্ব করছে তার ধন-মালে যা ফরয ধার্য হয়েছে, তা-ই সে আদায় করছে।[১]

বালকের বা পাগলের প্রতিনিধি (অভিভাবক) যদি সে দুজনের মালের যাকাত দেয় কোনরূপ নিয়ত ছাড়াই তাহলে তা যথাস্থানে পৌঁছবে না। তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[২]

ইমাম আওজায়ীর মত এবং তার পর্যালোচনা

যাকাতের জন্যে নিয়তের শর্ত করার পর্যায়ে জমহুর ফিকাহবিদদের মতের বিরোধিতা করেছেন ইমাম আওজায়ী। বলেছেন ঃ তার জন্যে কোন নিয়তের প্রয়োজন নেই। কেননা তা ঋণ সমতুল্য। অন্যান্য ঋণ আদায়করণে যেমন নিয়তের প্রয়োজন হয় না, এই ঋণটি আদায়করণেও অনুরূপভাবে কোন নিয়তের আবশ্যকতা নেই। নিয়ত ছাড়াই ইয়াতীম বালকের মালের যাকাত তার অভিভাবক দিবে এবং দিতে অস্বীকারকারীর কাছ থেকে শাসক তা জোরপূর্বক নিয়ে নেবে।[৩]

এ কথার প্রতিবাদ করেছেন ফিকাহবিদগণ এবং রাসূল (স)-এর উপরিউক্ত প্রখ্যাত হাদীসটি তার দলিলরূপে পেশ করেছেন ঃ 'আমলসমূহ নিয়ত অনুযায়ী মূল্য পায়।' যাকাত আদায় করা একটা 'আমল'। তা একটা ইবাদতও যা বারবার ফরযরূপে ধার্য হয়। তা যেমন ফরয হয়, তেমনি নফলও হয়। অতএব তা নামাযের মতই নিয়তের মুখাপেক্ষী। ঋণ প্রত্যর্পণ থেকে তা ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা ঋণ প্রত্যর্পণ কোন ইবাদত নয়। তা পাওনাদার প্রত্যাহার করলেই প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। কিন্তু যাকাত সেরূপ নয়।

---

১. حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٣٣٥

২. المغنى ج ٢ ص ٦٣٨ ৩. الروضة للنووى ج ٢ ص ٢٠٨

তা যার ওপর ফরযরূপে ধার্য হয়, তার ওপর থেকে তা কেউ প্রত্যাহার করতে পারে না। কেননা ফকীর-দরিদ্রের জন্যে যে মাল ব্যয় করা হয়, তা কয়েক ধরনের হতে পারে। তা যাকাত হতে পারে, মানত হতে পারে, কাফফারা ও নফল দানও হতে পারে। তাই ঠিক কোন ধরনের মাল তাদের দেয়া হচ্ছে তার নিয়ত করে তাতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে।

বালকের অভিভাবক ও প্রশাসক এই দুইজনও নিয়ত করবে প্রয়োজন দেখা দিলে।

কোন কোন মালিকী মতের আলিমও আওজায়ীর অনুরূপ মত পোষণ করেন। তা হচ্ছে, যাকাত নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। এ মতটি মালিকী মাযহাবের একটি বিরল মত। তাই গ্রহণ করে বলা হয়েছে, ফকীহগণ যাকাতের মালের অংশীদার। এক অংশীদার অপর অংশীদারের হাত থেকে তার অংশটা নিয়ে নেবে, এতে নিয়তের কোন প্রয়োজন পড়ে না। গ্রহণকারীরও কোন নিয়তের প্রয়োজন হবে না, দাতারও নয়। উক্ত মাযহাবের লোকদের একটা কথা হচ্ছে ঃ 'যাকাত আদায় করতে অসম্মত ব্যক্তির কাছ থেকে তা জোরপূর্বক নিয়ে নেয়া হবে এবং তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে, যদিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দেয়া এবং তার ওপর জোর প্রয়োগ করে নিয়ে নেয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

তবে মালিকী মতের নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে ঃ 'যাকাত আদায় হওয়ায় নিয়তের শর্ত রয়েছে।'

দিতে অসম্মত ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত গ্রহণ পর্যায়ে ইবনুল আরাবীর মত—যা পরে বলা হবে যাকাত আদায় হবে বটে, কিন্তু তার থেকে সওয়াব লাভ হবে না।[১]

যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি যদি ধনীর ধন-মাল থেকে যাকাত পরিমাণ মাল চুরি করে নিয়ে যায়, তাতে কিন্তু যাকাত আদায় হবে না। কেননা এখানে যাকাত দেয়ার নিয়তের কোন অস্তিত্ব নেই।[২]

যাকাতের নিয়তের অর্থ কি

'নিয়ত' বলতে বোঝায়—দাতা তার মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, এটা তার নিজের ধন-মালের যাকাত, অথবা যার পক্ষ থেকে সে দিচ্ছে তার ধন-মালের যাকাত, এই অভিভাবকত্ব হয় বালক বা পাগলের ক্ষেত্রে। নিয়তের স্ফুরণক্ষেত্র হচ্ছে হৃদয়—সর্বপ্রকারের বিশ্বাস, ধারণা ও অনুভূতির উৎসই হচ্ছে এই হৃদয়।[৩] হুকুম সংক্রান্ত নিয়তই যথেষ্ট, যেমন কোন কোন মালিকী ফিকাহবিদ স্পষ্ট করে বলেছেন।

---

১. দেখুন ঃ شرح الرساله لابن ناجى ج ١ ص ٣١٨ - ٣١٨

২. الشرح الكبير ج ١ ص ٥٠٢

৩. দেখুন المغنى ج ٢ ٢٣٨ مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٢١ শাফেয়ী মতের বক্তব্য হল, মুখের উচ্চারণ অন্তরে স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন الروضه ج ٢ ص ٢٠٦ তে বলা হয়েছে। البحر গ্রন্থে তা দাউদের মত বলা হয়েছে, তার কোন যৌক্তিকতা নেই, (ج ٢ ص ١٤٢)

যখন একজন তার টাকা-পয়সা গণনা করল এবং তার ওপর যা ফরযরূপে ধার্য, সে তা বের করে দিল এবং এটা লক্ষ্য করল না যে, সে যা বের করল তার যাকাত। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করা হলে সে নিশ্চয় বলবে। তা হলেই তার যাকাত হয়ে যাবে।[১]

একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। যদি কারোর এ অভ্যাস থাকে যে, সে জায়দ নমের এক ব্যক্তিকে প্রতি বছর কিছু টাকা দিয়ে থাকে। যখন সে তাকে দিল, দেয়ার পর সে নিয়ত করল যে, সে যাকাত দিয়েছে এবং জায়দ যাকাত পাওয়ার যোগ্য, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে না কেননা এখানে প্রকৃত বা হুকুম পর্যায়ের কোন নিয়ত পাওয়া যায়নি।[২]

বস্তুত এ নিয়তই হচ্ছে ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য প্রভৃতি পর্যায়ের কাজসমূহের মধ্যে পার্থক্যকারী। আর জমহুর ফিকাহবিদগণ যাকাতে এই নিয়তের শর্ত আরোপ করেছেন। আল্লাহর কাছে তা নিয়ত ছাড়া গৃহীত হবে না। এ থেকেই যাকাতের ইবাদতের দিকটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশাসকের যাকাত গ্রহণ অবস্থায় নিয়ত

প্রশাসক যখন যাকাত গ্রহণ করবে—সম্পদের মালিক তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেবে কিংবা দিতে অসম্মত হওয়ার কারণে তার কাছ থেকে জোরপূর্বক নেবে—এ উভয় অবস্থায় নিয়তের ব্যাপারটি কিরূপ হবে ? প্রশাসকের নিয়তই সম্পদের মালিকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে, কি হবে না ? সর্বাবস্থায়ই কি যাকাত আদায় হয়ে যাবে, না কোন কোন অবস্থায় আদায় হবে ? আর যখন আদায় হবে, তখন তা কি শুধু বাহ্যিকভাবেই আদায় হল, না বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয়রূপেই তা আদায় হয়ে যাবে ?

অধিকাংশ ফিকাহবিদের মত হচ্ছে, ইচ্ছামূলক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয়া কালে প্রশাসকের নিয়ত সম্পদের মালিকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে না—তার নিয়তই যথেষ্ট হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে সে নিয়ত যথেষ্ট হওয়ার পক্ষে। এমন কি প্রশাসক যদি কোন নিয়ত নাও করে, তবুও। المختصر। গ্রন্থে লিখিত ভাষ্যের এটাই বাহ্যিক কথা। আর অপর মতটি হচ্ছে—না, সে নিয়ত যথেষ্ট হবে না। কেননা প্রশাসক হচ্ছে গরীব-মিসকীনের প্রতিনিধি। সম্পদের মালিক যদি মিসকীনকে যাকাত দেয় কোনরূপ নিয়ত ছাড়াই, তা হলে তা গৃহীত হবে না। তাদের প্রতিনিধির অবস্থাও অনুরূপ।[৩]

---

১. حاشية الصاوى ج ١ ص ٢٣٥

২. حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٠

৩. নববী الروضة। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ এ দ্বিতীয় মতটি কাযী আবূ তাইয়্যেবের নিকট গ্রহণীয়, সহীহতম এবং তাহজীব ও 'আল-মুহাজ্জাব' গ্রন্থ প্রণেতাদ্বয়ও শেষকালের জমহুর ফিকাহবিদদের কাছে। তাঁরা শাফেয়ীর কথা ঃ দিতে অসম্মত ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য মনে করেছেন। যা গ্রহণ করা হয়েছে, তা কবুল হবে নিয়ত না হলেও। কিন্তু الأم। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ তা কবুল হবে ইচ্ছা করে দিক বা অনিচ্ছাসহ। (الروضه ج ٢ ص ٢٠٨)

নববী বলেছেনঃ

'যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর কাছ থেকে জোরপূর্বক গ্রহণকালে যদি সে তার নিয়ত করে, তাহলে বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয়দিক দিয়েই তার দায়িত্ব পালিত হল। রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ত করার কোন প্রয়োজন পড়বে না। নতুবা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ত করলেও বাহ্যত যথেষ্ট হবে। দ্বিতীয়বার তার কাছে দাবি করা যাবে না। আসলেও—প্রকৃতপক্ষেও কি তা আদায় হয়ে গেল ? এর দুটি জবাব আছে। সহীহতম জবাব হল হ্যাঁ, যথেষ্ট হবে। যেমন বালকের অভিভাবক নিয়ত করলে হয়ে যাবে—তার নিয়ত তার নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ত না করলে প্রকৃতপক্ষে ফরয আদায় হবে না কস্মিনকালেও। সহীহতম কথাই বাহ্যত তা হবে না। মাযহাব হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর নিয়ত করা ফরয, তার এই নিয়ত সম্পদের মালিকের নিয়তের স্থলাভিক্তি হবে। অপর একটি মতে বলা হয়েছে, ফরয নয়, যেন সম্পদের মালিক একটি ইবাদতের কাজকে এত সহজ মনে করে না বসে।[১]

ইবনে কুদামাহ্ তাঁর আল-মুগ্নী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'রাষ্ট্রপ্রধান যদি জোরপূর্বক যাকাত নিয়ে নেন, তাহলে নিয়ত না হলেও চলবে। কেননা মালিকের পক্ষে নিয়ত করা দুষ্কর হওয়ায় তা আর তার ওপর ওয়াজিব থাকল না—এটা ইমাম শাফেয়ীর মত। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের গ্রহণটা দুই অংশীদারের মধ্যে সম্পদ বন্টন করার পর্যায়ে গণ্য। তাই নিয়তের অপেক্ষায় থাকা হবে না। আরও এজন্যে যে, রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার রয়েছে তা গ্রহণ করার। এজন্যে তিনি দিতে অসম্মত ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন। যদি তাতে যাকাত আদায় না হয়ে যেত, তাহলে তিনি নিতেন না..... হাম্বলী মতের আবূ খাত্তাব ইবনে আকীল এ মত গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যাপারটি বান্দাহ ও আল্লাহ তা'আলার পারস্পরিক—তাতে মালের মালিকের নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় হতে পারে না। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান হয় সেই মালিকের প্রতিনিধি নতুবা প্রতিনিধি গরীব লোকদের অথবা এক সাথে এই দুই জনেরই। যারই প্রতিনিধি হোক, তার নিয়ত কখনই মালের মালিকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আরও এ কারণে যে, যাকাত হচ্ছে একটা ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রেই নিয়ত অপরিহার্য। তাই যার ওপর সে ইবাদত ফরয, তার নিজের নিয়ত ভিন্ন তা আদায় হতে পারবে না—যদি সে নিয়ত করার যোগ্য ব্যক্তি হয়ে থাকে। যেমন নামায। যাকাত আদায় হবে না, তা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে তা নেয়া হবে শরীয়াতের বাহ্যিক দিকটা রক্ষার উদ্দেশ্যে। যেমন নামায পড়তে জোরপূর্বক হলেও বাধ্য করা হবে—অন্তত বাহ্যিক রূপটা বজায় থাক এ উদ্দেশ্যে। এখন নামাযী যদি নিয়ত ছাড়াই নামায পড়ে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তা গ্রাহ্য হবে না।

ইবনে আকীল বলেছেন, ফিকাহ্‌বিদদের কথা 'যথেষ্ট হবে বা আদায় হয়ে যাবে' অর্থাৎ বাহ্যত, তার অর্থ ঃ তা দ্বিতীয়বার দিতে বলা হবে না—বলা যাবে না। যেমন

---

১. الروضه ج ٢ ص. ٢٠٨-٢٠٩

আমরা ইসলামের এই নিয়মের কথা বলেছি যে, মুর্তাদ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ঈমানের শাহাদত দিতে বলা হবে। যদি সে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে বাহ্যত তার মুসলিম হওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়া হবে। কিন্তু সে যা উচ্চারণ করছে, তার সত্যতার প্রতি যদি সে বিশ্বাসী না হয়, তাহলে আসলে ও প্রকৃতপক্ষে তার ইসলাম গ্রহণীয় হবে না অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে তাও গ্রাহ্য হবে না।[১]

মালিকী মতের কার্য ইবনুল আরাবীও এ কথা বলেছেন ঃ 'যাকাত জোরপূর্বক নেয়া হলে আদায় হবে বটে; কিন্তু তাতে কোন সওয়াব হবে না।[২]

দলিলসমূহের ভিত্তিতে এ মতটি বের করা যাকাতের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথার্থতা ও সঠিকতার অতি নিকটবর্তী। তাই রাষ্ট্রকর্তার যাকাত গ্রহণ মালের মালিকের নিয়ত ছাড়াই নিছক আইনের দিক দিয়ে ফরয আদায়ের জন্যে যথেষ্ট হবে—এ অর্থে যে, তাকে পুনরায় তা দিতে বলা হবে না।

কিন্তু তাতে আল্লাহ্র নিকট সওয়াব পাওয়ার দিক দিয়ে একান্তই জরুরী হচ্ছে মালের মালিক নিয়ত করতে সমর্থ হলে তাকে অবশ্যই স্পষ্টরূপে নিয়ত করতে হবে। কেননা নিয়ত ছাড়া যে 'আমল' তা প্রাণহীন দেহাবয়ব মাত্র। ('নিয়তই হচ্ছে আমলের রূপকার' কথাটির যথার্থতা স্বীকার্য।)

হানাফী মতে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এ কথার ওপর যে, যার ওপর যাকাত ফরয, সরকারী আদায়কারী যদি তার কাছ তা জোরপূর্বক নিয়ে নেয়, তাহলে তার ফরয আদায় হল—প্রকাশমান মালে ধার্য ফরয তার ওপর অনাদায় থেকে যাবে না। কেননা তার তো তা নেয়ার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বা অধিকার রয়েছে। কিন্তু অপ্রকাশমান মালের ক্ষেত্রে এই ফরয অবশিষ্ট থাকে যাবে।[৩]

যাকাতে নিয়তের সময়

যাকাতের জন্যে যখন নিয়ত শর্ত, তখন প্রশ্ন হচ্ছে এ নিয়ত কখন করতে হবে ?

হানাফীদের বলিষ্ঠ কথা হচ্ছে, নিয়তটা দেয়ার সাথে সময়ের দিক দিয়ে নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ঠতম হতে হবে। আর 'আদায়' বা 'দেয়ার' অর্থ হচ্ছে, ফকীরকে যা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দিয়ে দেয়া—হস্তান্তর করা। রাষ্ট্রপ্রধান 'ফকীরদের প্রতিনিধি। সময়ের ঘনিষ্ঠতার শর্ত করা হয়েছে এজন্যে যে, নিয়তটাই তো আসল। অপরাপর ইবাদতের অনুষ্ঠানেও এই কথা।

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٤٠-٦٤١

২. شرح الرساله لابن ناجى ج ١ ص ٣١٨ الشرح الكبير ج ١ ص ٥٠٢ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ দিতে অসম্মত ব্যক্তির কাছ থেকে যাকাত নিতে হলে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়তই যথেষ্ট হবে —এটা সহীহ মত।

৩. ردالمحتار ج ٢ ص ١٤

যাকাত আদায়ের জন্যে মোটামুটি নিকটবর্তীতা বা ঘনিষ্ঠতা হওয়াই যথেষ্ট। যেমন, নিয়ত ছাড়াই দিয়ে দিল, পরে নিয়ত করল যখন যাকাতের মালটা ফকীরের হাতে রয়েছে অথবা প্রতিনিধিকে দেয়ার সময় নিয়ত করল, পরে প্রতিনিধি দিল নিয়ত ছাড়াই অথবা কোন যিম্মীর হাতে দিল ফকীরদের দেবার জন্যে, তাহলে তা জায়েয হবে। কেননা মূলত আদেশদাতার নিয়তটাই গণ্য।

যেমন সমস্ত মাল থেকে যাকাতের ফরয পরিমাণ আলাদা করার সাথে নিয়তের ঘনিষ্ঠতা বা নিকটবর্তীতা হলেও যথেষ্ট হবে, যদিও তা আসলের বিপরীত। কেননা পাওয়ার যোগ্য লোকদের দিয়ে দেয়া বিচ্ছিন্নভাবে হয়। এজন্যে প্রত্যেকবার দেয়ার সময় নিয়তকে উপস্থিত রাখা দুরূহ ব্যাপার। তাই মূল আলাদা করা কালীন নিয়তই যথেষ্ট হবে—অসুবিধাটা দূর করার জন্যেই এ ব্যবস্থা। কিন্তু কেবল আলাদা করার দ্বারাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে না। দায়িত্বমুক্ত হবে ফকীরদের হাতে পৌঁছানোর পর।

কেউ যদি তার সমস্ত ধন-মাল দান করে দেয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয থাকবে না। যদিও সে কার্যত নিয়ত যাকাতেরই করল অথবা আসলে কোন নিয়তই করল না। কেননা ফরযটা ধার্য এক অংশের ওপর। অথচ সে সমস্তটাই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করে দিয়েছে। নিয়তটা শর্ত ছিল প্রতিবন্ধক দূর করার উদ্দেশ্যে। সে যখন সবটাই দিয়ে ফেলল, তখন প্রতিবন্ধক বলতে কিছুই থাকল না।[১]

মালিকী ফিকাহ মতে যাকাতের মাল আলাদা করা কালে এবং পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে দিয়ে দেয়ার সময়ই নিয়ত করা কর্তব্য। তা কোন সময় হলেও তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু আলাদাকরণ বা দিয়ে দেয়া কোন সময়ই যদি নিয়ত করা না হয়—নিয়ত করল পরে কিংবা এ উভয় সময়েরই পূর্বে, তাহলে তা গ্রহণীয় হবে না।[২]

শাফেয়ী ফিকাহর দুটি বক্তব্য যাকাত বিতরণের পূর্বে নিয়ত করা পর্যায়ে। সহীহতম কথা হচ্ছে, যেমন নববী বলেছেন—আদায় হবে, যথেষ্ট হবে। কেননা দুটি কাজকে এক সঙ্গে করা ওয়াজিব করা হলে খুবই কষ্টকর হত। আরও এজন্যে যে, আসলে উদ্দেশ্য তো ফকীরের দারিদ্র্য দূর করা। এ কারণে মালের মালিক তার প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা কালে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। আর দ্বিতীয় বক্তব্য, মিসকীনদের মধ্যে যাকাত বন্টনকালে প্রতিনিধির নিয়ত করা জরুরী শর্ত। তাঁরা বলেছেন ঃ কেউ যদি প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং নিয়ত করার দায়িত্বও তারই ওপর অর্পণ করে, তাহলে তাও জায়েয হবে।[৩]

হাম্বলী মাযহাবের লোকদের মত—যেমন 'আল-মুগনী' গ্রন্থে লিখিত হয়েছেঃ যাকাত আদায় করার সামান্য পূর্বে নিয়ত করা হলে তাও চলবে, যেমন সমস্ত প্রকারের ইবাদতে হয়ে থাকে। আর যেহেতু এ ইবাদতটিকে প্রতিনিধিত্ব বলে, তাই যাকাত বের করার সাথে নিয়তের ঘনিষ্ঠতা ও নিকটবর্তিতা তার মাল নিয়ে প্রলুব্ধকরণ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

---

১. الدر المختار وردالمحتار ج ٢ ص ١٤ – ١٥ ط استانبول

২. الروضة ج ٢ ص ٢٠٩ ৩. حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٠

সময়ের নিকটবর্তীতা ঘটানোর ক্ষেত্রে এ সহজতা মেনে নেয়া সত্ত্বেও অপর দিকটিতে খুব বেশি কঠোরতা আরোপ করেছেন। তাই 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ যাকাত কেউ তার প্রতিনিধির কাছে দিয়ে দিলে এবং প্রতিনিধি ছাড়াই সে নিজে নিয়ত করলে জায়েয হবে, যদি তার নিয়ত দেয়ার বহু পূর্বে না হয়ে থাকে। খুব দীর্ঘ সময় পূর্বে হলে জায়েয হবে না। তবে প্রতিনিধির কাছে দেয়ার সময় নিয়ত করলে ভিন্ন কথা। তখন প্রতিনিধি পাওয়ার যোগ্য লোকদের কাছে দেয়ার সময় নিয়ত করবে।

কেউ যদি তার সমস্ত মাল ইচ্ছা করে দান করে দেয় এবং এর দ্বারা যাকাত আদায় করার নিয়ত না করে তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা সে তো ফরয আদায় করার নিয়ত করেনি। যেমন কেউ যদি একশ' রাকায়াত নামায পড়ে, কিন্তু তাতে ফরয আদায়ের নিয়ত না করে, তাহলে ফরয নামায আদায় হবে না। শাফেয়ীও এ কথা বলেছেন।[১]

এ সমস্ত অবস্থায় আমি পসন্দ করি, সহজতা বিধান এবং আদায় হয়ে যাওয়ার কথা, কবুল হওয়ার কথা। আর মুসলমানের যাকাত বের করার সাধারণ নিয়ত থাকাটাই যথেষ্ট।

---

১. المغنى ج ٢ ص ٥٣٢ ط الامام - الروضة للنووى ج ٢ ص ٢١٠.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাতের মূল্য প্রদান

মূল্য প্রদানে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত

কারোর ছাগপালের মধ্যে একটি ছাগী যদি যাকাত বাবদ দেয় সাব্যস্ত হয় কিংবা কারোর উটের পাল থেকে একটি উষ্ট্রী অথবা এক 'আরদব' গম, ফলের এক কান্তার যাকাত বাবদ দেয়া হয়, তাহলে একথা কি চূড়ান্ত যে, তাকে মূল এ জিনিসগুলোই দিয়ে দিতে হবে। কিংবা মূল এ জিনিসগুলোর দেয়া ও তার নগদ মূল্যটা দেয়ার মধ্যে তাকে কোন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ?... এবং মূল্য দিয়ে দিলেও তা যথেষ্ট হবে ও তার যাকাত যথার্থভাবে আদায় হয়ে যাবে ?

ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলেছেন। কেউ কেউ তা নিষেধ করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, কোনরূপ দ্বিধা-কুণ্ঠা ছাড়াই তা জায়েয হবে। আবার কারোর কারোর মতে তা জায়েয হলেও মাকরূহ। অন্যান্য কিছু লোকের মত হচ্ছে, তা কোন কোন অবস্থায় জায়েয আবার কোন কোন অবস্থাতে জায়েয হবে না।

মূল্য দেয়া নিষিদ্ধকরণে সবচাইতে বেশি কঠোরতা অবলম্বনকারী হচ্ছেন শাফেয়ী ও জাহিরী মতের ফিকাহবিদগণ। হানাফীরা বিপরীত মতের ধারক। তাঁরা বলেছেন যে, সর্বাবস্থাতেই যাকাত জিনিসের মূল্য দেয়া জায়েয। মালিকী ও হাম্বলী মতের বহু কয়টি বর্ণনা ও কথা রয়েছে।

مختصر خليل গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাকাত জিনিসের মূল্য প্রদান যথেষ্ট হবে না। ইবনুল জায়েব ও ইবনে বশীরও এ কথাই গ্রহণ করেছেন। التوضيح। গ্রন্থে এর ওপর আপত্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, المدونه। গ্রন্থে এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। তার প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, মূল্য দেয়া যেতে পারে বটে—দেয়া হারাম নয়, তবে মাকরূহ।[১]

---

১. المدونه। গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে জিনিস যাকাত বাবদ দেয়, সে বাবদ কোন অস্থায়ী বা খাদ্য ধরনের জিনিস দেয়া যাবে না। কারোর নিজের দেয় যাকাত জিনিস খরিদ করা মাকরূহ। তাকে যাকাত ক্রয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং তা মাকরূহ। ইবনে আবদুস সালামও একথা বলেছেন। 'বাজী' বলেছেন : المدونه। ও অন্যান্য গ্রন্থের বাহ্যিকভাবে বক্তব্য হচ্ছে, এ কাজটি যাকাত ক্রয় পর্যায়ের। আর এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, তা মাকরূহ—হারাম নয়। মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, ফিকাহবিদদের প্রকাশ্য কথা হচ্ছে, 'তওজীহ' ও ইবনে আবদুস সালাম যা বলেছেন, তাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইবনে রুশদও এ কথাই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সকল মতের মধ্যে 'জায়েয' হওয়ার মতটাই অধিক ভাল। ইবনে ইউনুসও এ কথাকে যথার্থ বলেছেন। যাকাতের মূল্য দেয়া পর্যায়ে অনেক বিস্তারিত ও পার্থক্যমূলক কথা রয়েছে। কোন কোন মালিকী মতের ফিকাহবিদ তা এককভাবে বলেছেন। দরদীরও তার উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, কৃষি ফসল বা পশুর

ইবনে নাজী রচিত[১] شرح الرسالة গ্রন্থে আশহুব ও ইবনুল কাশেমের এ মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, মূল্য প্রদান মোটামুটি জায়েয। কেউ কেউ এর বিপরীত কথাও বলেছেন।

المدونة গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাকাত আদায়কারী যাকাতের মূল্য গ্রহণে কাউকে বাধ্য করলে তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে বলে আশা করা যায়, বড় বড় ফিকাহবিদ বলেছেনঃ তা এজন্যে যে, সে প্রশাসক এবং প্রশাসকের হুকুম সকল বিরোধ দূর করে।[২]

হাম্বলীদের মত বলে 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ইমাম আহমাদের বাহ্যিক মত হচ্ছে, কোন যাকাতের জিনিসেরই মূল্য দেয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। ফিতরার যাকাতও নয়। মালের যাকাতও নয়। কেননা তা সুন্নাতের পরিপন্থী।

ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত একটি কথা হচ্ছে, ফিতরার যাকাত ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে মূল্য প্রদান জায়েয। আবূ দাঊদ বলেছেন, ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি তার বাগানের ফল বিক্রয় করে দিয়েছে, সে কি করে যাকাত দেবে? বললেন, যার কাছে বিক্রয় করা হয়েছে, তার ওপর ধার্য করা হবে। বলা হল তাহলে কি খেজুর দেবে, না তার মূল্য ? বললেন, সে ইচ্ছা করলে ফলও দিতে পারে, ইচ্ছা করলে তার মূল্যও দিতে পারে। মূল্য দেয়া জায়েয হওয়ার এটা একটি দলিল।[৩]

ফিতরার যাকাত পর্যায়ে খুব কঠোরতা দেখিয়েছেন। বলেছেন, তার মূল্য দেয়া জায়েয হবে না। যারা উমর ইবনে আবদুল আজীজের কাজকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন।[৪] এ বিষয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করব।

মতবৈষম্যের কারণ

এ মতবৈষম্যের প্রথম কারণ যাকাতের মৌলিক তাৎপর্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের অবস্থিতি। তা একটা ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম; কিংবা ধনীদের ধন-মালে ফকীরদের জন্যে আরোপিত ও নির্ধারিত অধিকার—এই প্রশ্নে দৃষ্টিকোণের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের মতে তা একটা অর্থ সংক্রান্ত কর—নিসাব পরিমাণ ধন-মালের মালিকের ওপর ফরয করা হয়েছে।

সত্যি কথা হচ্ছে—একাধিকবার আমরা যেমন বলেছি—দুটি তাৎপর্য ধারণ। কিন্তু শাফেয়ী ও আহমাদ এবং মালিকী মাযহাবের ও জাহিরী ফিকাহবিদদের কারো কারো মতে যাকাতের ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের তাৎপর্যটি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তাঁরা যাকাতের মূল জিনিসটিই—যার ওপর দলিল আরোপিত হয়েছে —দেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা তার মূল্য প্রদান করাকে আদৌ জায়েয মনে করেননি।

যাকাত জিনিসের মূল্য দেয়া জায়েয মাকরুহসহ, কিন্তু এ দুটোর পরিবর্তে কোন অস্থায়ী জিনিস দেয়া কিংবা আসলের স্থলে অন্য কৃষি ফসল বা পশু দিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। দেখুন ঃ
حاشية الدسوقي عليه ج ١ ص ٥٠٢ ও الشرح الكبير للدردير

১. شرح الرسالة للزروق ج ١ ص ٣٤٠ ২. দেখুন ঃ ج ٢ ص ٢٤٠

৩ ও ৪. المغني ج ٣ ص ٦٥ ط المنار الثالثة

আর আবূ হানীফা, তাঁর মতের অন্যান্য এবং অপর দিকের ইমামগণের মতে যাকাত হচ্ছে একটি সম্পদগত অধিকার, যদ্দারা গরীব লোকদের দারিদ্র্যমুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের মতে জিনিসের মূল্য দেয়া যেতে পারে।

মূল্যদানে নিষেধকারীদের দলিল

যাকাত জিনিসের মূল্য দেয়া জায়েয নয় বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন দলিল রয়েছে। তা যেমন চিন্তা বিবেচনামূলক তেমনি পূর্ববর্তীদের উক্তি। নিম্নে আমরা তার বিভিন্নতা ও বিন্যাসকে তুলে ধরছি ঃ

১. শাফেয়ী মতের হারামাইনের ইমাম আল-জুরাইনী বলেছেন ঃ আমাদের মতের লোকদের নির্ভরযোগ্য দলিল হচ্ছে, যাকাত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আর যে কাজ এ পর্যায়ের হবে, তাতে সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করাই বিধেয়। কেউ যদি তার প্রতিনিধিকে বলে ঃ 'একটি কাপড় ক্রয় কর' এবং সে প্রতিনিধি যদি জানে যে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা এবং সে তার মালিকের পক্ষে অধিক মুনাফাদায়ক কোন পণ্য পায় এবং সে মনে করে যে, মালিক সেটাকে অধিক মুনাফাদায়ক দেখলে তার বিরোধিতা করবে না, এটা যদি হতে পারে তাহলে আল্লাহ্ যা দেবার আদেশ করলেন সেটা দিয়ে তা পালন করাই তো অধিক উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুরূপভাবে নামাযে যেমন গাল ও চিবুকের ওপর সিজদা করা জায়েয হয় না, কেননা সিজদার স্থান হচ্ছে কপাল ও নাক। আর তার কারণ বিনয় আনুগত্য আত্মসমর্পণের ভাবধারা এভাবেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। তাই গাল ও চিবুকের ওপর সিজদা করা হলে তা মূল দলিলের বিপরীত হবে এবং আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকারমূলক ভাবধারাও বিনষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যাকাতে ছাগীর বা উটের মূল্য প্রদান জায়েয হবে না। দানা বা ফলের মূল্য দিলে যাকাত আদায় হবে না, তাতে যে পরিমাণ দেয়, সেই পরিমাণ ফসল ও ফলই দিতে হবে। তা না করা হলে মূল দলিলের পরিপন্থী কাজ হবে। আল্লাহ্ দাসত্বমূলক ভাবধারারও বিপরীত হবে। যাকাত তো নামাযেরই বোন।[১]

এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে যাকাত দেয়ার আদেশ করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে, শুধু এই কথা বলে ঃ وَآتُوا الزَّكَاةَ 'এবং তোমরা যাকাত দাও' অতঃপর রাসূলের সুন্নত কুরআনের এ সংক্ষিপ্ত কথাটুকুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। ধন-মালের কত পরিমাণ থাকলে কি পরিমাণ যাকাত বাবদ দিতে হবে, তাও বলে দিয়েছে। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগীতে একটি করে ছাগী' দিতে হবে, 'প্রতি পাঁচটি উটে একটি করে ছাগী দিতে হবে' প্রভৃতি। তার অর্থ যেন আল্লাহই বলেছেনঃ 'তোমার যাকাত দাও প্রতি চল্লিশটি ছাগীতে একটি ছাগী।' ফলে এ দলিলের বলে যাকাত গরীবের অধিকারের জিনিস হয়ে দাঁড়াল। অতএব এ মূল ছাগী থেকে দরিদ্রদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এর কারণ বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করা উচিত বা জায়েয হতে পারে না।

---

১. المجموع للنووی ج ٥ ص ٤٣٠.

২. অপর একটি ব্যাপারে এ জিনিসকে অধিকতম তাগিদপূর্ণ করে দিয়েছে। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী মালিকী সেই ব্যাপারটির উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে, যাকাত বাধ্যকরণ—এ বাধ্যবাধকতায় লোকদের বন্দীকরণ শুধু মাল হ্রাসকরণের লক্ষ্যেই নয়—যেমন ইমাম আবূ হানীফা মনে করেছেন। কেননা কম মানের জিনিস নির্ধারণে শরীয়াত পালনের অধিকার পূরণের পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তা কম পরিমাণের ওপর শরীয়াতের বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাওয়ার উপায়। কেননা সম্পদের মালিক চায়, তার মালিকানা যথাযথ বর্তমান ও অক্ষুণ্ন থাক আর অপর জিনিস থেকে বোঝা চলে যাক। তার মন যখন ধন-মালের দিকে ঝুঁকে পড়বে ও তার সাথে জড়িয়ে পড়বে, তখন মন ও মালের সেই অংশের মধ্যবর্তী যে সম্পর্ক তা ছিন্ন করে দেয়াই শরীয়াত পালনের লক্ষ্য। এ কারণে মালের সেই নির্দিষ্ট অংশটিই যাকাত বাবদ দিয়ে দেয়া অবশ্য কর্তব্য।[১]

৩. তৃতীয় তাৎপর্য—আর তা হচ্ছে, ফকীর ও মিসকীনের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে। সে সাথে মালের নিয়ামত দেয়ার জন্যে অল্লাহ্‌র শোকর আদায়স্বরূপ। আর প্রয়োজন তো বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। অতএব ধার্য ফরযও বিচিত্র ধরনের হবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। তবেই না ফকীর মিসকীনরা সর্বপ্রকারের মাল পেয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামতে জাতীয় জিনিস দিয়ে ফকীর-মিসকীনের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারলেই নিয়ামতের শোকর আদায় হতে পারে।[২]

৪. অতঃপর কথা হচ্ছে, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা[৩] বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যখন হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলেন ঃ দানা থেকে দানা গ্রহণ কর, ছাগল غنم থেকে ছাগী شاة গ্রহণ কর, উট থেকে উট গ্রহণ কর এবং গরু থেকে গরু গ্রহণ কর। এটা অকাট্য স্পষ্ট দলিল। অতএব যা বলা হয়েছে তাই করার ওপর স্থিতি গ্রহণ করা কর্তব্য। কাজেই তার মূল্য গ্রহণ করে এ নির্দেশ পালন থেকে সরে যাওয়া জায়েয হবে না। কেননা মূল্য গ্রহণ করা হলে দানার স্থানে এমন জিনিস গ্রহণ করা হবে যা দানা নয়। অনুরূপভাবে ছাগলের পরিবর্তে ছাগী না দিয়ে অন্য কোন জিনিস নেয়া হবে—যাকাত বাবদ। আর তাহলে হাদীসের নির্দেশের বিপরীত কাজ করা হবে।

মূল্য প্রদান জায়েয মতের দলিল

যাঁরা মূল জিনিসের পরিবর্তে তার মূল্যটা যাকাত বাবদ দেয়া জায়েয বলেছেন, তারা

---

১. احكام القران القسم الثانى ص ٩٤٥ ২. দেখুন المغنى ج ٣ ص ٦٦

৩. এই হাদীস المنتقى গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। শাওকানী লিখেছেন ঃ হাকেম বুখারী ও মুসলিম আরোপিত শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তার সনদে 'আতা মুয়ায থেকে' উদ্ধৃত হয়েছে, অথচ আতা মুয়াযের কাছ থেকে শুনতে পাননি। কেননা আতার জন্ম হয়েছে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর। (نيل الاوطار ج ٤ ص ١٥٢ - ط العثمانيه)

হলেন, হানাফী মতের ও তার সমর্থক ফিকাহবিদ। তাঁরা তাঁদের মতের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ পর্যায়ে যুক্তি ও বর্ণিত দলিলের ওপর তাঁরা নির্ভরতা গ্রহণ করেছেন, সেসব উপস্থাপিত করেছেন। আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর।' এ দলিল অকাট্যভাবে বলছে যে, গ্রহণীয় জিনিসটি অবশ্যই 'মাল' হবে। আর মূল্যটাও 'মাল'। অতএব মূল্য দিলে দলিল অনুরূপ কাজ হবে।

তা ছাড়া নবী করীম (স) কুরআনের 'মুজমাল' অবিস্তারিত কথার বিশ্লেষণ দিয়েছেন এই বলে—যেমন, 'প্রতি চল্লিশটি ছাগলে একটি করে ছাগী নিতে হবে।' এটা বলে গবাদি পশুর মালিকদের প্রতি সহজতা বিধান করা হয়েছে। কেবল সেই 'ছাগী' দেয়ার বাধ্যতা আরোপ করার উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়নি। কেননা গবাদি পশুর মালিকদের হাতেও নগদ টাকা থাকে। কাজেই তাদের কাছে রক্ষিত সেই নগদ টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করা তাদের পক্ষে সহজতর পন্থা।[১]

২. বায়হাকী তাঁর সনদসূত্রে এবং বুখারী তায়ূস থেকে টীকাস্বরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ মুয়ায ইয়েমেনে গিয়ে লোকদের বলেছিলেন ঃ 'তোমরা আমাকে পাঁচগজি কাপড় বা অন্য কোন পোশাক দাও। আমি তা তোমাদের কাছ থেকে যাকাতের স্থানে বা যাকাত বাবদ গ্রহণ করব। কেননা তাই তোমাদের পক্ষে সহজ এবং মদীনায় বসবাসকারী মুহাজিরদের জন্যেও তা খুবই কল্যাণবহ।'

অপর বর্ণনায় ভাষাটি এই ঃ 'আমাকে তোমরা কাপড়ের একটি বাণ্ডিল দাও। আমি তা তোমাদের কাছ থেকে চাল ও যবের স্থলে নিয়ে নেব।[২]

এটা এজন্যে যে, ইয়েমেনবাসীর কাপড় বুনন ও বস্ত্র শিল্পে খুবই খ্যাতিমান ছিল। কাজেই এ কাপড় দেয়া ছিল তাদের পক্ষে অতি সহজ। অপরদিকে মদীনাবাসীদেরও খুব বেশি প্রয়োজন ছিল এ কাপড়ের। আর ইয়েমেনবাসীদের দেয়া যাকাত সেখানকার লোকদের প্রয়োজনের চাইতে বেশি হত। ফলে মুয়ায তা মদীনায় পাঠিয়ে দিতেন—যা ছিল খিলাফতের কেন্দ্র, রাজধানী। মুয়াযের উক্ত কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ইয়েমেনের ফিকাহবিদ ও তাবেয়ী যুগের ইয়েমেনী ইমাম তায়ূস তা বর্ণনাও করেছেন। তা প্রমাণ করে যে, অপর যে হাদীসে রাসূলে করীম (স) 'দানা থেকে ও উটের যাকাত বাবদ ছাগী নাও' বলে যে আদেশ করেছেন, তা থেকে ঠিক সেই জিনিসটিই বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে, এমন কথা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু যেহেতু ধন-মালের মালিকদের কাছে সেই জিনিসটিই চাওয়া হয়েছে আর মূল্য গ্রহণটা তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যে জিনিসের যাকাত বাবদ সেই জিনিসটা গ্রহণ করায় ধন-মালের মালিকদের প্রতি সহজতা বিধান করা হয়। কেননা প্রত্যেক মালের মালিকের পক্ষে সেই জাতীয় মাল দেয়া, যা তার নিকট রয়েছে, সহজ হয়। যেমন কোন বর্ণনায়

---

১. المبسرط ج ۲ ص ۱٥۷ ২. السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ۱۱۳

সাহাবিগণের উক্তি হিসেবে এসেছে যে, নবী করীম (স) দিয়েতের ক্ষেত্রে কাপড়ওয়ালাদের জন্যে কাপড় দেয়ার পথ করে দিয়েছিলেন।[১]

৩. আহমাদ ও বায়হাকী বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, 'নবী করীম (স) যাকাত বাবদ পাওয়া উটের পালের মধ্যে একটা খুব বয়স্ক উষ্ট্রী দেখতে পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেনঃ এই উষ্ট্রটি যে নিয়ে এসেছে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। লোকটি বললে ঃ হে রাসূল! আমি যাকাতের মধ্যে থেকে দুটি উটের পরিবর্তে এই একটি উট নিয়েছি।' তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তাহলে ঠিক আছে।

এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়েও দলিলরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।[২] আর এ হাদীসটি উপরিউক্ত কথাই প্রমাণ করে। কেননা দুটি উটের পরিবর্তে একটি উট গ্রহণ করা মূল্যই গ্রহণেরই শামিল।

৪. যাকাতের লক্ষ্য হচ্ছে, ফকীরকে স্বচ্ছল বানানো, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন এবং আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দকারী উম্মত ও মিল্লাতের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন। আর তা মূল্য গ্রহণ দ্বারাও সাধিত হতে পারে, যেমন তা হতে পারে ছাগী নিলে। তবে অনেক সময় মূল জিনিসটির পরিবর্তে মূল্য দিলে এ লক্ষ্য অধিক ভালো ও সহজভাবে পূর্ণ হতে পারে। কেননা প্রয়োজন তো বিচিত্র ধরনের। আর মূল্য গেলে তদ্দ্বারা যে কোন প্রয়োজন পূরণ সম্ভব।

৫. তাছাড়া মূল জিনিসের পরিবর্তে সেই জাতীয় অন্য জিনিস অবলম্বন ইজমার ভিত্তিতে জায়েয। যেমন কেউ তার ছাগলের যাকাত যদি তার নিজের ছাগল ছাড়া অন্য ছাগল থেকে দেয়, কেউ তার জমির ওশর তার নিজের কৃষির ফসল ছাড়া অন্য ফসল ও দানা দিয়ে দেয়, তাহলে তা আদায় হবে। তাহলে দেখা গেল এক জাতীয় জিনিস থেকে অন্য জাতীয় জিনিস চলে যাওয়া—একটির পরিবর্তে অন্যটি দেয়া জায়েয, এই কথায় কাযী ইবনুল আরাবীর অভিমতের প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তিনি মনে করেন যে, যে মাল থেকে যাকাত ফরয করা হয়েছে, সেই জিনিসের অংশ নির্ধারণে শরীয়াতের বিধানদাতার লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদের মালিকের অন্তর ও সেই জিনিসের নির্দিষ্ট অংশের সাথে যে একাত্মতার সম্পর্ক রয়েছে তা ছিন্ন করা। তার কারণ এই যে, শরীয়াতদাতার যদি তাই লক্ষ্য হত, তাহলে মালের এ নির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তে অন্য মাল থেকে সেই পরিমাণ দিলে যাকাত আদায় হয়ে যেত না।

৬. সায়ীদ ইবনে মনসুর তাঁর 'সুনানে আতা' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব যাকাত বাবদ দিরহামের পরিবর্তে জিনিস গ্রহণ করতেন।[৩]

তুলনা ও অগ্রাধিকার দান

আমি মনে করি, উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণসমূহ পর্যালোচনা ও তুলনা করার পর

---

১. الجوهر النقي لابن التر كماني المطبوع مع السنن الكبرى ج ٤ ص ١١٣

২. الجوهر النقي لابن التركماني المطبوع مع السنن الكبرى ج ٤ ص ١١٣

৩. المغني ج ٣ ص ٦٥

আমাদের সম্মুখে এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিকোণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ মাযহাব পূর্বোদ্ধৃত খবর ও সাহাবী-তাবেয়ীনের উক্তির ওপর ভিত্তি করেছে। বাস্তব চিন্তা ও বিবেচনাও এই মাযহাবের যৌক্তিকতা অকাট্য করে তোলে।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যাকাতের ব্যাপারে ইবাদতের দিকটির প্রাধান্য স্বীকার করা ও মূল দলিলের আক্ষরিক অনুসরণের শর্তে নামাযের ওপর 'কিয়াস' করা যাকাতের সেই প্রকৃতির সাথে সংগতিসম্পন্ন নয় যাতে হানাফীদের বিরোধীরা নিজেরা অপর দিকটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

আসলে তা একটা অর্থনৈতিক অধিকার বা দায়িত্ব এবং বিশিষ্ট ধরনের ইবাদত—এ দুটোই তাতে সন্নিবেশিত। বালক ও পাগলের মালে তাঁরা এ কারণেই যাকাত ফরয ধরেছেন। অথচ তাদের ওপর নামায ফরয ধার্য হয়নি। এ পর্যায়ে তাঁরা যা বলেছেন, এখানে তাঁদের উচিত ছিল সে কথার উল্লেখ করা। তদ্দারা তাঁরা হানাফীদের প্রতিবাদ করেছেন অথচ হানাফীরা শরীয়াত পালনে অযোগ্য লোকদের ওপর—নামাযের ওপর কিয়াস করে—যাকাতকে ফরয ধার্য করেননি।

বস্তুত হানাফী মাযহাবের মতটি আমাদের যুগে অধিক উপযোগী। জনগণের পক্ষেও অধিক সহজসাধ্য। হিসেব রক্ষা করাও কষ্টমুক্ত। বিশেষ করে যদি সেখানে এমন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থাকে যা যাকাত সংগ্রহ, একত্রিতকরণ ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে। মূল জিনিস গ্রহণ করা হলে তা তার স্থান থেকে নিয়ে বহু দূরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌছানো, তার পাহারাদারী করা ও তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি কাজে অনেক বেশি ব্যয় হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যাকাত বাবদ গবাদি পশু এলে তার খাবার পানি, বাসগৃহ ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং সর্বক্ষণ তার কাছে লোকের উপস্থিতির ব্যবস্থা করায় খুব বেশি অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তা 'কর' পর্যায় ব্যয় হ্রাসকরণ নীতিরও পরিপন্থী।

উমর ইবনে আবদুল আজীজ ও হাসান বসরী থেকেও এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে, সুফিয়ান ও সওরীও এ মতই প্রকাশ করেছেন। ফিতরার যাকাত ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদেরও একথা বলে বর্ণিত হয়েছে।[১]

ইমাম নববী বলেছেন, ইমাম বুখারী ও তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করেছেন, তার বাহ্যিক তাৎপর্যও উক্ত মতের অনুকূলে।[২]

ইবনে রুশদ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী হানাফী মতের সাথে আনুকূল্য করেছেন। হানাফীদের মতই এর নিজের মত অথচ তিনি বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত দলিল প্রমাণই তাঁকে হানাফীদের অনুরূপ মত গ্রহণে বাধ্য করেছে।[৩]

---

১. المغنى ج ٣ ص ٦٥ ২. المجموع ج ٥ ص ٤٢٦

৩. فتح البارى ج ٣ ص ٢٠٠

তা এভাবে হয়েছে যে, ইমাম বুখারী তাঁর হাদীস গ্রন্থে 'যাকাতের দ্রব্যাদি গ্রহণ' (আর তা মূল্য হিসেবে) শীর্ষক একটি অধ্যায় দাঁড় করেছেন। তাতে তিনি দলিল হিসেবে উপস্থিত করেছেন হযরত মুয়াযের সেই কথা বা তায়ূস তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তিনি যাকাত বাবদ দানা শস্য ও যবের বদলে লোকদের কাছ থেকে কাপড় নেয়ার কথা বলেছিলেন। কেননা তা দেয়া তাদের পক্ষে সহজতর ছিল এবং মদীনায় বসবাসকারী লোকদের জন্যেও অধিক কল্যাণবহ ছিল।[১]

ইমাম বুখারী অবশ্য অন্যান্য হাদীসকেও দলিল হিসেবে তুলে ধরেছেন। গবাদি পশুর যাকাত পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা) লিখিত চিঠিখানিও তন্মধ্যে একটি। তাতে লিখিত ছিল ঃ

'যার যাকাত হবে এক বছর বয়সের উষ্ট্রী ছানা, তা তার কাছে না থাকলে তার কাছ থেকে দুই বছর বয়সের উষ্ট্রী ছানা গ্রহণ করা হবে। তবে যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম কিংবা দুটি ছাগী ফেরত দেবে।' তাহলে এক বয়সের পশুর স্থলে অন্য বয়সের পশু গ্রহণ করা যায়—পার্থক্যের মূল্যটা দিরহাম বা ছাগী বাবদ ফেরত দিলেই হল। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক যে জিনিসটি যাকাত বাবাদ চিহ্নিত হবে ঠিক সেই আসল জিনিসটিই ফকীরকে দিয়ে দিতে হবে—এমন কথা নয়। তবে সম্পদের মালিকের পক্ষে যা সহজে দেয়, তা-ই গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু ইবনে হাজম তায়ূস বর্ণিত উক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপিত করার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর ধারণা, ওটাকে দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। তার কয়েকটি কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, উক্ত হাদীসটি 'মুরসাল' (সাহাবীর নাম না বলে তাবেয়ীর বর্ণনা করা)। কেননা তায়ূস মুয়াযকে দেখতে পাননি; তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর জন্ম হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তা যদি সহীহ হত, তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা দলিল থাকত। আর ওটা দলিল নয় এজন্যে যে, তা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত নয়। আর যা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত নয়, তা দলিলই হতে পারে না।

তৃতীয়ত, উক্ত বর্ণনায় একথা নেই যে, কথাটি তিনি যাকাত প্রসঙ্গে বলেছেন। যদি তা সহীহ হয় তবুও তিনি তা জিযিয়াদাতাদের বলে থাকতেন, তারও সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা সেক্ষেত্রে 'জিযিয়া' বাবদ দানা, চাল ও যব গ্রহণ করতেন। আর জিজিয়ার টাকা পরিবর্তে জিনিস বা দ্রব্যাদি গ্রহণ করা যায়।

---

১. বুখারী তায়ুস বর্ণিত উক্ত সংবাদটি 'মুয়াল্লাক'স্বরূপ দৃঢ়তা সহকারে উদ্ধৃত করেছেন। তা যে তাঁর কাছে সহীহ, এটাই তার প্রমাণ। তায়ুস ইয়েমেনের ইমাম ও তাবেয়ী যুগের ফিকাহবিদ ছিলেন। মুয়াযের ইয়েমেন অবস্থানকালীন যাবতীয় খবর সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন। ইমাম বুখারী এ সংবাদটি দলিল হিসেবে তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করায় বোঝা যায় যে. তিনি ওটাকে শক্তিশালী মত মনে করেন। (الفتح ج ٢ ص ١٠٠)

চতুর্থত, এ সংবাদটি যে বাতিল, তার দলিল তাতেই নিহিত রয়েছে। কেননা তাতে মুয়াযের উক্তির একটি অংশ হচ্ছে 'মদীনাবাসীদের জন্য কল্যাণবহ।' আমি মনে করি না, মুয়ায এরূপ কথা বলতে পারেন। কেননা এ কথাটি সত্য হলে আল্লাহ তাদের কল্যাণের জন্যে যা ফরয করেছেন, তার পরিবর্তে অন্য জিনিসে তাদের কল্যাণ আছে বলে দাবি করা হয়, (আল্লাহ না করুন, এরূপ দাবি একজন সাহাবী করবেন!)।[১]

এ গ্রন্থকারের মনে ইবনে হাজম কর্তৃক উপস্থাপিত এসব কারণ খুবই দুর্বল। কেননা তায়ূস যদিও হযরত মুয়াযকে দেখতে পাননি, তা সত্ত্বেও তাঁর ইয়ামন অবস্থানকালীন যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে তায়ূস বিশেষ অবহিত ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী তো তাই বলেছেন। আর তায়ূস তো ইয়েমেনের তাবেয়ী যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি মুয়াযের যাবতীয় অবস্থা ও সংবাদ সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষাশালী ছিলেন। আর তাঁর সময়টাও খুব নিকটবর্তী।

হযরত মুয়াযের ইয়েমেনে কার্যক্রম এবং যাকাত বাবদ জিনিসের মূল্য গ্রহণ প্রমাণ করছে যে, তাতে নবী করীম (স)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা কিছুই নেই। তিনিই তো কুরআন ও সুন্নাতের পর ইজতিহাদকে শরীয়াতের তৃতীয় দলিল হওয়ার মর্যাদা প্রদান করেছেন। সেই সাথে একথাও যে, তখনকার কোন সাহাবীই তাঁর এই কাজকে শরীয়াত বিরোধী বলেননি। তাও প্রমাণ করে যে, সমস্ত সাহাবীই এ পর্যায়ে তাঁর সাথে পূর্ণ আনুকূল্য রক্ষা করেছেন।

এই কথাটি জিযিয়া সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনাটিও খুবই দুর্বল। বরং বাতিল মনে করতে হবে। আল্লামা আহমদ শারে المحلى।- গ্রন্থের টীকায় এ কথা বলেছেন। কেননা ইয়াহইয়া ইবনে আদামের বর্ণনায় مكان الصدقة। 'যাকাতের স্থলে' কথাটি উদ্ধৃত রয়েছে।

আর চতুর্থ কারণ পর্যায়ে ইবনে হাজম যা বলেছেন, তা তাঁর জুলুম ছাড়া কিছু নয়। তিনি এটা জোর করে বলেছেন বলতে হবে। কেননা উক্তির মধ্যে 'তোমাদের জন্যে কল্যাণবহ' যে কথাটি আছে তার অর্থ 'তোমাদের জন্য উপকারী।' কেননা মদীনাবাসীদের কাপড়ের খুব বেশি অভাব ছিল খাদ্য-শস্য—দানা ও যবের তুলনায়। এটা একটা বাস্তব ঘটনা এতে কোন মতদ্বৈততা নেই। কথার এই অংশ—'আল্লাহ তা ফরয করেন নি—এ কথাটি মতদ্বৈততার বিষয়। কাজেই শুধু মৌখিক দাবিকে দলিল মনে করা জায়েয হবে না। আর মূল্য গ্রহণ তো সেই পর্যায়ে গণ্য, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শরীয়াতে ফরয করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এক্ষেত্রে দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যবর্তী একটা মত বা মাযহাব গ্রহণ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'এ ব্যাপারে অধিক স্পষ্ট কথা হচ্ছে, কোন প্রয়োজন বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কোন কল্যাণ বিবেচনা ব্যতীত যাকাত বাবদ দেয় দ্রব্যের মূল্য প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ

---

১. المحلى ج ٦ ص ٣١٢ ط الامام।

কারণে নবী করীম (স) দুটি ক্ষতিপূরণের বিধান দিয়েছেন একটি ছাগী অথবা বিশটি দিরহাম দেয়ার কথা বলে। কিন্তু মূল্যকে মূল জিনিসের বিকল্প ধরা হয়নি। আরও এজন্যে যে মূল জিনিসের মূল্য প্রদান যখনই জায়েয ঘোষিত হবে, তখনই সম্পদ-মালিক নিম্নতম মালের বিচিত্র ধরনের মাল বিকল্পস্বরূপ নিয়ে আসবে। তাছাড়া মূল্য নির্ধারণেও অনেক সময় ক্ষতির কারণ থাকতে পারে। যেহেতু যাকাতের ভিত্তি হচ্ছে সহানুভূতি জ্ঞাপন। তা কার্যকর হতে পারে মালের একটি পরিমাণ থেকে সেই জাতীয় মাল দিলে। আর প্রয়োজন বা বিশেষ কল্যাণ বিচারে অথবা ন্যায়পরতা রক্ষার্থে মূল্য প্রদান করা হলে তাতে কোন দোষ থাকতে পারে না। যেমন বাগানের সব ফল বা ক্ষেতের সব ফসল নগদ টাকা বিক্রি করে দেয়া হলে মোট প্রাপ্ত মূল্যের এক-দশমাংশ দেয়া হলে তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তা দিয়ে ফল বা ফসল ক্রয় করে দেবার জন্যে বাধ্য করা যাবে না। কেননা সে জিনিস দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে। ইমাম আহমাদও তা জায়েয বলে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন।

আর যেমন পাঁচটি উটের যাকাত বাবদ একটি ছাগী দেয়া ফরয ধার্য হল; কিন্তু তার কাছে ছাগী ক্রয় করার কোন লোক নেই। তখন তার মূল্য প্রদানই যথেষ্ট হবে। সেজন্যে অপর শহরে গমন করে ছাগী ক্রয় করতে বাধ্য করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

অথবা এও হতে পারে যে, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকেরাই তার কাছে মূল্য প্রদানের দাবি করল তা তাদের জন্যে অধিক উপকারী মনে করে। তাহলে তাদেরকে তা-ই দেয়া যাবে অথবা যাকাত সংগ্রহকারী কর্মকর্তাই যদি মূল্য প্রদান ফকীর মিসকীনদের জন্যে অধিক উপকারী মনে করে তবুও। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) তো তাই করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি নিজেই ইয়েমেনবাসীদের বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে পাঁচগজি কাপড় বা তৈরী পোশাক দিয়ে দাও। তা তোমাদের জন্যেও যেমন সহজতর, তেমনি মদীনায় বসবাসকারী আনসর ও মুহাজিরদের পক্ষেও অনেক কল্যাণকর। (এ কথাটি কাদের জন্যে বলা হয়েছে ?... কেউ বলেছেন, যাকাতদাতাদের লক্ষ্য করে, কারোর মতে 'জিযিয়ার' ক্ষেত্রে বলেছেন)।১

এ কথাটি আমাদের গৃহীত মতের নিকটবর্তী। আমাদের এ যুগে প্রয়োজন ও কল্যাণ উভয় দিক দিয়েই মূল্য গ্রহণ জায়েয হওয়া বিধেয় হওয়া উচিত—অবশ্য যদি তাতে ফকীর-মিসকীন ও সম্পদের মালিকদের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতির কারণ না হয়।

---

১. مجموع فتاوى ابن تيمية ص ٨٢ - ٨٣ ج ٢٥ ط السعودية

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাকাত স্থানান্তরকরণ

যাকাতলব্ধ সম্পদ ব্যয় ও বিনিয়োগ বা বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের একটা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়বাদী নীতি রয়েছে। আমাদের এ যুগে প্রতিষ্ঠানগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যতই পরিবর্তিত হোক না-কেন, তার সাথে সে নীতির পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান। অধিকন্তু লোকদের ধারণা-কল্পনায় ভবিষ্যতে যত রকমের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাই গড়ে উঠুক এবং যতই নতুন নতুন আইন-বিধান তৈরী হোক, ইসলামের এই নীতির সাথেও উপযুক্ততা ও সংগতি রক্ষা করে অতি আধুনিক ও নতুন হয়ে কাজ করতে সক্ষম হবে।

আরব জাহিলিয়াত ও ইউরোপ ইত্যাদির অন্ধকার জাহিলিয়াতের যুগেও লোকেরা ভালভাবে জানতো, কৃষক-চাষী, শিল্প মালিক, পেশাকধারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতির নিকট থেকে কিভাবে কর-এর নামে অর্থ লুট করে নেয়া হত। অথচ তখন এ লোকেরা কত না কঠোর শ্রম করে মাথার ঘাম ফেলে ও রাত জেগে জীবিকা উপার্জন করত! লোকদের ঘাম রক্ত ও অশ্রুনিষিক্ত এই অর্থ চলে যেত সম্রাট, রাজা-বাদশাহ, স্থানীয় শাসক -প্রশাসক ইত্যাদির হাতে এবং তা তাদের বিলাস-ব্যসনে, রাজধানী ও রাজপ্রাসাদের চাকচিক্য বিধানে অকাতরে ব্যয় করা হত। তাদের সিংহাসন খচিত করা হত তাদের বাহাদুরী ও শান-শওকত বৃদ্ধির জন্যে। তাতে চারপাশের পাহারাদার, সাহায্যকারী ও অনুগমনকারীদের অপেক্ষা নিজেদের অধিকতর প্রাচুর্যে উন্নত করে তুলবার ব্যবস্থা ছিল। তারপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা রাজধানী সম্প্রসারণ, সৌন্দর্য বিধান ও তার অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিকল্পে ব্যয়িত হত। তারপরও কিছু বেঁচে গেলে সর্বোচ্চ কর্তার নিকটবর্তী ব্যক্তি ও শহরের বিশিষ্টদের মধ্যে বন্টন করা হত। আর তারা সকলেই সেই দূরবর্তী অনগ্রসর ও দুর্দশাগ্রস্ত কষ্টে নিমজ্জিত গণ্ডগ্রামের লোকদের প্রতি চরম উপেক্ষা ও অনীহা পোষণ করত অথচ সে সব 'কর' এই স্থানসমূহ থেকেই নেয়া হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে এ সব বিলাস দ্রব্য।[১]

কিন্তু দুনিয়ায় যখন ইসলামের আগমন হল এবং মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের জন্যে নিয়মিতভাবে যাকাত দেবার বিধান জারি করল, সেই সাথে তা আদায় করার জন্যে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হল, তখন এ নীতিও চালু ও কার্যকর করা হল যে, এ যাকাত যেখান থেকে পাওয়া যাবে—আদায় ও সংগ্রহ করা হবে, সেখানেই তা বন্টনও করা হবে। এ নীতিটি গবাদি পশু, কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড়ার যাকাতের ক্ষেত্রে

---

১. গ্রন্থকারের ١١٤ مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ص থেকে উদ্ধৃতি।

সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও পালিত। কেননা যাকাত বন্টন করতে হবে যেখানেই তা পাওয়া যাবে। সেই সাথে এ ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই যে, রোযার ফিতরা—ফিতরার যাকাত সেখানেই বন্টন করা হবে, যেখানে বসবাস করে সেই ব্যক্তি যার উপর তা ওয়াজিব হয়েছে।

তবে নগদ সম্পদের যাকাত পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এ যাকাত কি সেখানেই বন্টন করা হবে যেখানে তা পাওয়া গেছে অথবা যেখানে সম্পদের মালিক বসবাস করে?[১]

প্রখ্যাত কথা—যা অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মত—হচ্ছে, এ পর্যায়ে মালের অবস্থান ধরতে হবে, মালিকের নয়।

এই নীতির দলিল হচ্ছে রাসূলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত। নবী করীম (স) যখনই এবং যেখানেই যাকাত আদায়কারী লোক প্রেরণ করেছেন—প্রশাসক নিয়োগ করেছেন কোন অঞ্চলে, শহরে বা রাজ্যে তাদের স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন সেখানকার ধনী লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে এবং সেখানকারই ফকীর-মিসকীনের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়।

হযরত মুয়ায সংক্রান্ত হাদীস অনেকবার উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে হাদীসটি যে সহীহ, সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই—সর্বসম্মত। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁকে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানকার ধনী লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে সেখানকারই গরীব লোকদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে।

হযরত মুয়ায রাসূলে করীম (স)-এর এ আদেশকে পুরোপুরি ও যথাযথভাবে কার্যকর করেছেন। ইয়েমেনবাসীদের যাকাত সেখানকারই তা পওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যেই বন্টন করে দিয়েছিলেন। বরং প্রতিটি রাজ্যের বা অঞ্চলের যাকাত বিশেষভাবে সেখানকার অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যেই বন্টন করেছিলেন। আর তাদের জন্যে একটি সনদও লিখে দিয়েছিলেন। তাতে ছিলঃ যে 'জেলায়'[২] যার লোকজন জমি ও সম্পদ সেখান থেকে সে অন্যত্র চলে গেলেও তার যাকাত ও ওশর তার লোকজনের সেই জেলাতেই (বন্টিত) হবে'।[৩]

আবূ হুযায়ফা বলেছেন : আমাদের কাছে রাসূল(স)-এর প্রেরিত যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হল। সে আমাদের মধ্যকার ধনী লোকদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে আমাদেরই গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিল। তখন আমি ছিলাম এক ইয়াতীম ক্রীতদাস। আমাকে সে যাকাত সম্পদ থেকে একটা উট দিয়েছিল।[৪]

---

১. দেখুন : حاشية الدسوقى ج ١ص ٥٠٠

২. মূলে المخلاف শব্দ রয়েছে। ইবনুল আসীর النهاية গ্রন্থে বলেছেন : ইয়ামনে 'মেখ'লাফ' তেমন যেমন ইরাকে রুস্তাক رستاق অর্থাৎ তা একটি শাসন এলাকা যেমন প্রদেশ বা জিলা।

৩. আবূ হুযায়ফা থেকে তায়ূস এই বর্ণনাটি করেছেন সহীহ্ সনদে। সায়ীদ ইবনে মনসূর এবং তাঁর ন্যায় আমরাও তা উদ্ধৃত করেছি. যেমন نيل الاوطار ج ٢ ص ١٦١ তে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪. ঘটনাটি তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি 'হাসান' উক্ত সূত্র।

সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, একজন আরব বেদুঈন রাসূলে করীম (স)-কে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই ঃ আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্ কি আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আপনি আমাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন এবং তা বণ্টন করবেন আমাদেরই দরিদ্র লোকদের মধ্যে ? বললেন ঃ হ্যাঁ।

আবূ উবাইদ উমর (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি তাঁর উপদেশনামায় বলেছেন ঃ আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে অসিয়ত করছি এ বিষয়ে। আরও অসিয়ত করছি এই.... বিষয়ে এবং অসিয়ত করছি আরব বেদুঈনদের কল্যাণ করার জন্যে। কেননা তারাই আসল আরব ও ইসলামের সারবস্তু এবং এভাবে করতে হবে যে, তাদের মালদার লোকদের কাছ থেকে তাদের ধন-মালের যাকাত গ্রহণ করতে হবে এবং তা তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[১]

হযরত উমর (রা)-এর জীবনকালীন কাজের ধারাও তা-ই ছিল। তিনি যেখান থেকে যাকাত সংগ্রহ করতেন, সেখানেই বণ্টন করাতেন। আর সরকার নিয়োজিত যাকাত কর্মচারীরা মদীনায় ফিরে আসতো রিক্ত হস্তে, সঙ্গে নিয়ে আসত শুধু সে সব কাপড়-চোপড়, যা পরিধান করে তারা গিয়েছিল নিজ নিজ ঘর থেকে অথবা সেই লাঠি, যার ওপর তারা ভর করে চলাফেরা করত আগে থেকেই।

এ পর্যায়ে সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর মুয়াযকে বনু কিলাব গোত্রের বা বনু সায়াদ ইবনে যুবিয়ান গোত্রের যাকাত সংগ্রহকারীরূপে পাঠিয়েছিলেন। সেখানকার যাকাত বণ্টন করে দেয়ার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পরে তিনি সেই পোশাকেই রাজধানীতে ফিরে আসেন, যা তাঁর পরিধানে ছিল যাওয়ার সময়।[২]

ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যাতার সঙ্গী ও হযরত উমর যাদেরকে যাকাত আদায়ে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে সায়াদ বলেছেন ঃ

> আমরা যাকাত আদায়ের জন্য বের হয়ে যেতাম। পরে আমরা ফিরে আসতাম শুধু আমাদের চাবুকগুলো হাতে নিয়ে।[৩]

হযরত উমর (রা)-কে সওয়াল করা হয়েছিল ঃ আরব বেদুঈনদের যাকাত কি জিনিস থেকে নেয়া হবে ? তা নিয়ে আমরা কি বা কেমন করব ? জবাবে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাদের ওপর সহজভাবে যাকাত ফিরিয়ে দেব, যতক্ষণ তাদের এক-এক জনের ভাগে একশ' উষ্ট্রী বা একশ' উট পড়ে।[৪]

বস্তুত একটি শহর বা স্থানের সংগৃহীত যাকাত সেখানকার গরীব লোকদের প্রয়োজন ও অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র সরিয়ে নেয়া সেই মহান উদ্দেশ্যের

---

১. الاموال ص ৫৯৫ ২-৩. الاموال ص ৫৯٦

৪. المصنف ج ٣ ص ٢.٥ طحيدر اباد

পরিপন্থী—ক্ষতিকর, যে জন্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে। এ কারণে আল-মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ যেহেতু যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তদ্দ্বারা গরীব-মিসকীন লোকদের ধনী বা সচ্ছল বানানো। অতএব তাকে স্থানান্তরিত করাকে যদি আমরা মুবাহ করে দিই, তাহলে সেই স্থানের ফকীর-মিসকীনদের অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে দেওয়ার পরিস্থিতি দেখা দেবে।[১]

রাসূলে করীম (স) ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদূন উপস্থাপিত নীতি ও পদ্ধতির ওপরই স্থিতিশীল রয়েছেন সুবিচারক ও ন্যায়বাদী প্রশাসকবৃন্দ। সাহাবী ও তাবেয়ীনের মধ্যে যাঁরা ফতোয়ার ইমাম ছিলেন, তাঁরাও তা থেকে এক বিন্দু বিচ্যুত হন নি।

ইমরান ইবনে হুচাইন (র) জিয়াদ ইবনে আবীহ্ কিংবা বনু উমাইয়্যা বংশের কোন প্রশাসকের পক্ষ থেকে যাকাতের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, তাঁকে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ মাল-পত্র কোথায়?

তিনি বললেনঃ আমাকে কি মাল আনতে পাঠিয়েছিলেন? মাল তো সেখান থেকেই আমরা পেয়েছি, যেখান থেকে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর যুগে পেতাম এবং তেমনিভাবেই তা রেখে এসেছি যেমন করে পূর্বে রেখে আসতাম।[২]

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সাকাফী তায়ূসকে—যিনি ইয়েমেনের ফিকাহবিদ বলে খ্যাত ছিলেন—মিখ্‌লাফ এলাকার যাকাতের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তথায় ধনীদের কাছে থেকে যাকাত গ্রহণ করতেন এবং তা ফকীরদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। যখন বন্টনের কাজ শেষ করতেন, তখন তাকে বলা হল ঃ তোমার হিসেব পেশ কর। বললেন ঃ আমার কোন হিসেব নেই। আমি তো ধনীর কাছ থেকে নিতাম ও মিসকীনকে দিয়ে দিতাম।[৩]

ফাসকাদ সাবাখী থেকে বর্ণিত আছেঃ আমি আমার মালের যাকাত বহন করে নিয়ে মক্কায় বিতরণ করতে চেয়েছিলাম। পথে সায়ীদ ইবনে জুবাইরের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন ঃ ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তোমার নিজের শহরেই তা বিতরণ করে দাও।[৪]

সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণিত, 'রায়' শহর থেকে যাকাত কুফা নগরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে উমর ইবনে আবদুল আজীজ তা 'রায়' নামক শহরেই ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[৫]

আবূ উবাইদ বলেছেন ঃ এ কালের আলিমগণ এসব উক্তি ও দলিলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। প্রত্যেকটি শহর বা এলাকার জনগণ—মরুবাসীদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পানি কেন্দ্রের লোকেরা সেখানকার যাকাত পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের তুলনায় বেশী

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٧٢

২. আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ ص ١٦١

৩. ৪ ও ৫. الاموال ص ٥٩٥

অধিকারসম্পন্ন—যতক্ষণ পর্যন্ত তথায় অভাবগ্রস্ত লোক থাকবে—একজন বা বহু তাতে যদি সমস্ত যাকাতই নিঃশেষিত হয়ে যায়—এমন কি যাকাতের কর্মচারীকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়, তবুও।

একটু পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে—হযরত মুয়ায সংক্রান্ত কথা যে, তিনি যে পোশাক পরে গিয়েছিলেন, তা পরা অবস্থায়ই ফিরে এসেছিলেন; সায়ীদ সংক্রান্ত কথা —তিনি বলেছিলেন ঃ আমরা যাকাত সংগ্রহে বের হয়ে যেতাম, পরে আমাদের চাবুক হাতেই ফিরে আসতাম। আর একটু পরেই আমরা উল্লেখ করব, হযরত মুয়ায ইয়েমেনবাসীদের উদ্বৃত যাকাত হযরত উমরের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তা ফেরত পাঠিয়েছিলেন—আবূ উবাইদ এ সবকেই দলিলরূপে উপস্থাপন করেছেন। পরে আবূ উবাইদ বলেছেন ঃ এ সব হাদীস প্রমাণ করছে যে, প্রত্যেক স্থানের জনগণ সে স্থানের যাকাত পাওয়ার সর্তবিধ অধিকারী—যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে যাকাতের ওপর নির্ভরতা-মুখাপেক্ষিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হচ্ছে। আমরা যে অন্যদের তুলনায় কেবল সে স্থানের লোকদের অধিকারের কথা বলছি, তার কারণ হচ্ছে, হাদীসে সুন্নাতের প্রতিবেশীর মর্যাদা ও অধিকারের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধনীর পাশে দরিদ্রদের ঘর হওয়াটা তাদেরকে এই অধিকার এনে দিয়েছে।[১]

হ্যাঁ, যাকাতদাতা যদি ভুলে যায় বা না জানে এবং সে যাকাত এক স্থান থেকে অন্য এক স্থানে বহন করে নিয়ে যায়, অথচ সেখানকার সেই প্রথম স্থানের লোক তার মুখাপেক্ষী, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তা তাদের কাছে ফেরত পাঠাবে—যেমন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ করেছিলেন এবং যেমন সায়ীদ ইবনে জুবাইর এ মতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন।[২]

অবশ্য ইবরাহীম নখয়ী ও হাসানুল বখরী যাকাতদাতার এ অধিকার আছে বলে মনে করেন যে, সে তার যাকাত পাওয়ার নিকটবর্তী অধিকার কার তা অগ্রাধিকার দিয়ে ঠিক করবে।

আবূ উবাইদ বলেছেন, ব্যক্তির বিশেষত্ব ও তার মালের বিবেচনায় তা জায়েয হবে। কিন্তু জনসাধরণের যাকাত সম্পদ—যা দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা সংগ্রহ করে ও বন্টনের দায়িত্ব পালন করে, সে ক্ষেত্রে এ কাজ জায়েয নয়।

উপরিউক্ত ফকীহ্ দুজনের মত বহন করে আবদুল আলীয়া বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর যাকাত মদীনায় বহন করে নিয়ে যেতেন।

আবূ উবাইদ বলেছেন, 'আমরা মনে করি, তিনি তা তাঁর নিকটাত্মীয় ও মুক্ত করা গোলামদের মধ্যেই বিশেষভাবে বন্টন করেছেন, আর কাউকে দেন নি।'[৩]

কোন স্থানের জনগণ দারিদ্র্যমুক্ত হলে সেখানকার যাকাত অন্যত্র নিয়ে যাওয়া জায়েয

মূলত ও সর্ববাদীসম্মত মত যেমন এই যে, যাকাত যে স্থানের ধন-মালের ওপর ফরয

১, ২. الاموال ص ٥٩٥ ৩. الاموال ص ٥٩٨

হয়েছে ও তদনুযায়ী আদায় হয়েছে, সেই স্থানের দরিদ্রদের মধ্যেই তা বণ্টন করতে হবে; অনুরূপভাবে এ কথাও সর্বসম্মত যে, সে স্থানের জনগণ যখন সে যাকাতের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মুক্ত হবে, তখন তা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সর্বতোভাবে জায়েয। সে নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি হয় এ কারণে হতে পারে যে, তা পাওয়ার যোগ্য বিভিন্ন প্রকারের লোক তথায় নেই অথবা এজন্যে যে, তাদের সংখ্যা কম আর যাকাতের মালের পরিমাণ বিপুল। তখন হয় রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে অবশিষ্ট পরিমাণ যাকাত ফিরিয়ে দিতে হবে, যেন সে প্রয়োজন মত ব্যয় করতে পারে অথবা সে স্থানের নিকটতর স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে।

আবূ উবাইদ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) রাসূল (স) কর্তৃক ইয়েমেনে প্রেরিত হওয়ার পর তাঁর ও তাঁর পরে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তেকালের পরবর্তী সময় পর্যন্ত 'জামাদ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। পরে হযরত উমর (রা)-এর সময় তিনি ফিরে আসেন। তখন তিনিও তাঁকে পূর্বের সেই দায়িত্বে পুনর্বহাল করেন। তখন হযরত মুয়ায তাঁর কাছে লোকদের কাছ থেকে পাওয়া এক-তৃতীয়াংশ যাকাত পাঠিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বলে পাঠালেন, 'আমি তো তোমাকে কর আদায়কারী করে পাঠাইনি। জিযিয়া গ্রহণকারীরূপেও নয়। পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি ধনী লোকদের কাছ থেকে (যাকাত) নেবে ও তা তাদের মধ্যকার দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করবে। হযরত মুয়ায (রা) জানালেন ঃ আমি আপনার কাছে এমন অবস্থায় কিছুই পাঠাইনি যে, তা গ্রহণ করার এখানে কজন লোকও পাওয়া গিয়েছিল (অর্থাৎ যা পাঠিয়েছি তা গ্রহণ করার এখানে কেউ নেই)। পরবর্তী বছর তিনি খলীফার কাছে অর্ধ-পরিমাণ যাকাত পাঠিয়ে দিলেন। সেবারও তিনি তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় বছরে তিনি যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ খলীফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখনও হযরত উমর পূর্বের ন্যায় ফেরত পাঠালেন। তখন হযরত মুয়ায বললেন ঃ আমার কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার একজন লোকও এখানে পাই নি।[১]

প্রথমবার হযরত উমর (রা) হযরত মুয়ায কর্তৃক প্রেরিত যাকাত সম্পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন—তারপরও বারবার তাই করেছিলেন—এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের ব্যাপারে মৌল নীতি হচ্ছে তা প্রাপ্তির স্থানেই বণ্টন করতে হবে। পরে শেষবার হযরত উমর (রা) হযরত মুয়াযের কাজকে বহাল রেখেছিলেন তা প্রমাণ করে যে, যাকাত সম্পদ স্থানান্তর করা জায়য হবে তখন যখন সেই স্থানে তা পাওয়ার যোগ্য লোক পাওয়া যাবে না।

পূর্ণ অভাবমুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও স্থানান্তরিতকরণে বিভিন্ন মত

যাকাত সংগৃহীত হওয়ার স্থানের লোকদের অভাবমুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

---

১. الاموال ص ٥٩٦ এবং আমার গ্রন্থ مشكلة الفقروكيف عالجها الاسلام গ্রন্থের শেষের টীকা দেখুন।

এ ব্যাপারে কোন কোন মাযহাব খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এ মতের লোকেরা কোনক্রমেই অন্যত্র নিয়ে যাওয়াকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নন। এমনকি ততটা দূরত্বেও নিয়ে যাওয়া জায়েয মনে করেন না যতটা দূরত্বে গেলে নামায 'কছর' করা যায়, যত বড় প্রয়োজনই হোক না কেন।

শাফেয়ী মতের লোকদের বক্তব্য হল, যাকাত এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়, যেখান থেকে তা পাওয়া গেছে সেখানেই তা ব্যয় ও বণ্টন করা ওয়াজিব। তবে সে স্থানে তা পাওয়ার যোগ্য লোক যদি আদৌ না থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। হাম্বলী মতের লোকদেরও এ মত। পাওয়ার যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও যাকাত স্থানান্তরিত করা হলে গুনাহ্ হবে, যদিও যাকাত আদায় হবে। কেননা যাকাতদাতা তো তা পাওয়ার যোগ্য লোককে দিয়েছে, তাই সে দায়িত্বমুক্ত হবে, যেমন ঋণের ক্ষেত্রে হয়। অন্যরা বলেছেন, যাকাত আদায়ই হবে না। কেননা অকাট্য দলিলের বিরোধিতা করা হয়েছে।[১]

আর হানাফী মাযহাবের লোকদের মত হচ্ছে যাকাত স্থানান্তর করা মাক্রূহ্ বটে; তবে তা যদি নিকটাত্মীয় অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়, তাহলে মাকরূহ্ হবে না। কেননা তাতে 'ছেলায়ে রেহমী' রক্ষার দিকটি প্রবল অথবা যদি এমন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর কাছে তা নিয়ে যাওয়া হয় যারা স্থানীয় লোকদের তুলনায় অধিক অভাবগ্রস্ত; কিন্তু তা স্থানান্তরিতকরণ মুসলিম জনগণের পক্ষে অধিক কল্যাণকর বিবেচিত হয় অথবা তা 'দারুল হরব' থেকে দারুল-ইসলামে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলেও কোন দোষ হবে না। কেননা দারুল-ইসলামের মুসলিম ফকীর মিসকীন দারুল হরবের ফকীর-মিসকীনের তুলনায় সাহায্য পাওয়ার উত্তম ও বেশী অধিকারসম্পন্ন। কোন আলিম বা তালেবে ইলমকে দেয়ার জন্যে নেয়া হয়, তাতেও আপত্তি নেই। কেননা তাতে তাকে সাহায্য করা হবে ও তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা হবে অথবা যদি অধিক আল্লাহ্ভীরু বা মুসলিম জনগণের পক্ষে অধিক উপকারী ও কল্যাণকামী ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়,—এও হতে পারে যে, যাকাত বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করা হয়েছে—এসব অবস্থায় যাকাত স্থানান্তরিত করা মাকরূহ্ নয়।[২]

মালিকী মতের লোকদের অভিমত হচ্ছে, যাকাত ফরয হওয়া স্থানে বা তার

---

১. الاحكام السلطانيه للماوردى ص ١١٩-١٢٠ط المطبعة المحمودية التجارية بمصر وشرح الغاية ٢ ص ٢٢٨ মুল্লা আলী আল-কারী মিশকাত-এর শরাহ্ গ্রন্থে তাবেয়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ফিকাহ্বিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যাকাত সম্পদ স্থানান্তরিত করা হলেও আদায় করা হলে ফরয পালন হবে। তবে উমর ইবনে আবদুল আজীজ ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা তাঁর সময়ে খোরাসান থেকে যাকাত সম্পদ 'শাম' চলে যাওয়ার পর তিনি তা তার স্থানে ফেরত দিয়েছিলেন। আল-কারী লিখেছেন, এতে এই প্রমাণ হয় যে, তাঁর এ কাজটা ইজমা'র বিরোধিতা করা বোঝায় না। বরং তিনি তা করেছেন পূর্ণ মাত্রার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং লোভ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। দেখুন : المرقاة ج٤ ص ١١٨-١١٩

২. الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٩٣-٩٤

নিকটবর্তী স্থানে তা বণ্টন করা ওয়াজিব। এই নিকটবর্তী স্থান বলতে নামায 'কসর' করা যায় এমন দূরুত্বের কম বোঝায়, কেননা তাও যাকাত ফরয হওয়ার স্থানের মধ্যে গণ্য।

আর যাকাত ফরয হওয়া বা তার নিকটস্থ স্থানে তা পাওয়ার যোগ্য লোক যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তা এমন স্থানে নিয়ে যাওয়া ওয়াজিব, যেখানে তা পাওয়ার যোগ্য লোক রয়েছে। তা 'নামায কসর'-এর দূরত্বে হলেও কোন দোষ নেই। যাকাত ফরয হওয়া স্থানে বা তার নিকটবর্তী স্থানে কোন যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক থাকে, তাহলে তা সেই স্থানে বণ্টন করা অবশ্যম্ভাবী হবে। তখন তা 'নামায-কসর'-এর দূরত্বে নিয়ে যাওয়াও জায়েয হবে না। তবে তা যাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তারা যদি তুলনামূলকভাবে অধিক অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র হয়, তাহলে বেশী পরিমাণ তাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব হবে। আর যদি সবটাই সেখানে নিয়ে যায়, কিংবা তার সবটা ওয়াজিব হওয়া স্থানেই বণ্টন করে, তাহলেও চলবে।

কিন্তু তা যদি অধিক দুঃস্থ ও অধিক অভাবগ্রস্ত নয় এমন লোকদের জন্যে স্তানান্তরিত করা হয়, তাহলে তার দুটি অবস্থা ঃ

প্রথম, তুলনামূলকভাবে ওয়াজিব হওয়া স্থানের লোকদের সমান অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তা জায়েয হবে না। যাকাত অবশ্য আদায় হয়ে যাবে, তা পুনরায় দিতে হবে না।

আর দ্বিতীয়, অপেক্ষাকৃত কম অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হলে তাতে দুটি কথা ঃ প্রথম কথা, খলীল তাঁর المختصر -এ বলেছেন, তাতে যাকাত আদায় হবে না। আর দ্বিতীয় কথা, ইবনে রুশদ ও আলকাফী বলেছেন, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা তা তার জন্যে নির্দিষ্ট ব্যয় ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হয়েছে।[১]

জায়দীয়া ফিকাহ্‌র মতে যাকাত আদায়ের স্থানে তার গরীব লোক থাকা সত্ত্বেও তাদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে তা বণ্টন করা মাক্রুহ্। বরং সেখানে দরিদ্র লোক থাকলে তাদের মধ্যে বণ্টন করাই উত্তম। মালের মালিক ও রাষ্ট্রপ্রধান সেখানেই থাকুক, কি অন্যত্র তাতে কোন পার্থক্য হবে না তাঁরা বলেছেন ঃ আমাদের মতে মাক্রুহ বলতে বোঝায় মুস্তাহাবের বিপরীতটা। সে স্থানের গরীবদের ছাড়া অন্যত্র যাকাত ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে বটে; তবে মাকরুহ হবে। যদি না তা উত্তম ও অধিক ভালো কোন উদ্দেশ্যের জন্যে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে। সে ভালো উদ্দেশ্যে হতে পারে নিকটাত্মীয় কোন ব্যক্তি বা দ্বীনী শিক্ষার্থী যদি যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয় তবে তাকে দেয়া। খুব বেশী ঠেকায় পড়া কোন লোককে দেয়া। এরূপ অবস্থায় যাকাত স্থানান্তরিত করা হলে তা মাক্রুহ তো হবেই না বরং তাই উত্তম কাজ হবে।[২]

আবাজীয়া মতের লোকদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান প্রতিটি স্থানের

---

১. حاشية الدسوقى على الشرح اكبر ج ١ص ٥٠١

২. شرح الازهار ج ١ص ٥٤٧ - ٥٤٨

দরিদ্রদের মধ্যে যেখান থেকে যাকাত পাওয়া গেছে, সেখানে এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক পরিমাণ বিতরণ করবেন এবং অবশিষ্ট পরিমাণ ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করবেন ?..... এ প্রশ্নের জবাবে দুটি কথা ঃ

তাঁরা বলেছেন, যদি সম্পূর্ণ পরিমাণই ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, তবে তাই নিয়ে নেবে এবং তাদের দেবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। যদি প্রয়োজন না হয়, তাহলে সবটাই বণ্টন করে দেবে। আর একটি স্থানের লোকেরা যখন যথেষ্ট পরিমাণ পেয়ে যাবে, তখন তার নিকটবর্তী আর একটি স্থানকে গ্রহণ করতে হবে।[১]

রাষ্ট্রপ্রধানের ইজতিহাদে স্থানান্তর জায়েয

আমার যা মনে হয়—উপরে যেসব হাদীস, সাহাবীদের উক্তি এবং তাবেয়ীদের মন্তব্য—বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে এ বিশ্বাস জন্মে যে, যাকাতের মূল কথা হচ্ছে, যেখান থেকে তা সংগৃহীত হবে সেখানেই তা বণ্টন করে দিতে হবে প্রতিবেশীর অধিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য বিরোধী যুদ্ধ ও প্রতিঘাত সংঘঠিত করার লক্ষ্যে। সেই সাথে প্রত্যেক অঞ্চলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে ও সেখানকার স্থানীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের মুকাবিলা করার জন্যে। আরও বিশেষ করে এজন্যে যে, স্থানীয় ফকীর-মিসকীনরা তো তাদের দৃষ্টি ও মন এসব ধন-মালের ওপর নিবদ্ধ করে রেখেছে এবং তার যাকাত পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। ফলে অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও এ মৌলনীতির বিপরীত কোন কাজ করার পথে প্রতিবন্ধক কিছু আছে বলে মনে করার কারণ দেখছি না। যদি ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে তা করা মুসলিম জনগণের পক্ষে কল্যাণকর এবং ইসলামের পক্ষে মংগলজনক মনে করে, তাহলে তা সে অনায়াসেই করতে পারে।

এ পর্যায়ে ইমাম মালিক যা বলেছেন, তা আমার খুব মনঃপূত হয়েছে। তা হচ্ছেঃ যাকাত স্থানান্তরকরণ জায়েয নয়। তবে কোন স্থানের লোকদের জন্যে তা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় বোধ হলে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় ইজতিহাদ ও সুবিবেচনার ভিত্তিতে তা করতে পারেন।[২]

তাঁর সহকর্মীদের মধ্য থেকে ইবনুল কাসেম বলেছেন ঃ যাকাতের কিছু অংশ প্রয়োজনের কারণে স্থানান্তরিত করা আমি সঠিক বলে মনে করি।[৩]

মসনূন থেকে বর্ণিত—তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রপ্রধান যদি জানতে পারেন যে, কোন কোন স্থানে অভাব ও প্রয়োজন খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান যাকাতের একটা অংশ অন্যদের জন্যে স্থানান্তরিত করতে পারেন—তা তাঁর জন্যে জায়েয। কেননা অভাব যখন দেখা দেয়, তখন তাকে অভাবমুক্ত এলাকার ওপর

---

১. شرح النيل ج ٢ ص ١٣٨

২৩৩. تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٧٥

অগ্রাধিকার দেয়া একান্তই কর্তব্য। হাদীস বলছেঃ المسلم اخوا المسلم لايسلمه ولايظلمه 'একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে পারে না, তার ওপর সে জুলুমও করতে পারে না।[১]

المدونة গ্রন্থে ইমাম মালিক থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মিশরে অবস্থানরত হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে মহাদুর্ভিক্ষের বছর লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ[২] হায় হায়, আরবদের জন্যে মহাসংকট। উষ্ট্রের একটি কাফেলা বোঝাই খাদ্য আমার কাছে পাঠাও। তা যেন এত দীর্ঘ হয় যে, তার প্রথমটি আমার কাছে পৌছবে যখন, তখন কাতারের শেষ উটটি থাকবে তোমার কাছে। কাপড়ের বস্তায় ছাতু বহন করবে। তা পৌছার পর হযরত উমর আরবদের মধ্যে স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী বন্টন করতে শুরু করলেন। এ কাজের জন্যে কয়েক ব্যক্তিকে তিনি দায়িত্বশীল বানিয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি উটের গলার কাছে উপস্থিত থাকতে আদেশ করতেন এবং বলতেন 'আরবরা উট ভালোবাসবে। আমি ভয় করছি তারা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। অতএব তা যবেহ্ করা বাঞ্ছনীয় এবং তার গোশ্‌ত ও চর্বি মাখা দরকার এবং যে বস্তায় ছাতু এসেছে তা দিয়ে জোব্বা বানিয়ে পরা আবশ্যক।'

বস্তুত কঠিন দুর্ভিক্ষ ও ব্যাপক অভাব অনটনকালে মুসলিম সমাজ পরস্পরের পরিপোষণ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে কাজ করে। একজনের এক অঞ্চলের অভাব অপরজন ও অপর অঞ্চল পূরণ করে দিতে এগিয়ে আসে।

পরবর্তী কথাও এরই সমর্থক ও পরিপূরক।

প্রথম যে শহর বা অঞ্চল বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয় এবং সমগ্র প্রশাসন হতে যে প্রশাসনিক অঞ্চল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের সূত্রেও সমগ্র মুসলিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত—যেমন অংশ 'সমগ্র'-এর সাথে সংযুক্ত থাকে, ব্যক্তি পরিবার সংস্থার সাথে জড়িত থাকে, অংগগুলো গোটা দেহের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই একত্ব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ততা ও একে অপরের দায়িত্বশীলতার শিক্ষাই দেয় ইসলাম এবং তা ফরয করে। কোন অঞ্চল বা শহরকে অন্যান্য ইসলামী দেশসমূহ থেকে—ইসলামের কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন মনে করা যায় না। অতএব দুর্ভিক্ষ,আগুনে জ্বলা বা মহামারী প্রভৃতি ধরনের কোন বিপদ যদি কোথাও এসে পড়ে, তাহলে সেখানকার জনগণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার বেশী অধিকারী। যাকাত সংগ্রহের স্থানের লোকদের অপেক্ষা ওদের সাহায্য দান অধিক প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়, যাকাতের অনেক ব্যয়-ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন ইসলামের দিকে লোকদের মন আকৃষ্ট করার ও ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থক বানানোর জন্যে অর্থ ব্যয় করা,

---

১. تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٧٥

২. المدونة الكبرى ج ١ ص ٢٤٦ হাকেম তাঁর المستدرك গ্রন্থে এ উক্তিটি المدونة -এর তুলনায় আরও দীর্ঘ আকারে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, এটি ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্তানুযায়ী সহীহ্। যাহবীও তাই বলেছেন ঃ (১ম খণ্ড, ৪০৫-৪০৬ পৃ.)

সাবীলিল্লাহ্—আল্লাহ্র পথে ব্যয় পর্যায়ে জিহাদ এবং যেসব কাজ ইসলামের পক্ষে আসে, ইসলামের কালেমা বুলন্দ হয়, তার সাহায্য করাও বিশেষভাবে গণ্য হয় আর এ ধরনের সব কাজই রাষ্ট্রপ্রধানের করণীয়, আধুনিক পরিভাষায় বলতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয়। এমন কি যদি কখনও 'সাবীলিল্লাহ্' খাতের কাজটি সম্পূর্ণরূপে 'জিহাদ' পর্যায়ে পরিচালিত করা হয়, তাও তো ব্যক্তির করণীয় হতে পারে না, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানেরও করণীয় ব্যাপার নয়। বরং তাও সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ সরকারের দায়িত্ব।

এ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নিজস্ব আয়ের উৎস থাকা আবশ্যক, যেখান থেকে সেসব কাজে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে, যা সামগ্রিক দৃষ্টিতে ইসলামের কল্যাণ ও মুসলিম জনগণের পক্ষে পরম উপকারী বিবেচিত হবে। অবশ্য তার কাছে যদি এমন সব আয়ের উপায় থাকে, যার দরুন যাকাতের মুখাপেক্ষিতা থাকবে না, তাহলে সে তো ভালই; খুবই উত্তম কথা। অন্যথায় রাষ্ট্রপ্রধানের এ অধিকার থাকতে হবে যে, সে বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশ থেকে যাকাতের টাকা নিয়ে নেবে যদ্দারা এ গুরুতর কাজগুলো করা হবে। এ কারণে ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে কোন আলিমের মত উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে—ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে যাকাতের যে অংশ তা স্থানীয়ভাবে বন্টন করতে হবে এবং অবশিষ্ট অংশ রাষ্ট্রপ্রধানের ইজতিহাদ অনুযায়ী ব্যয় করার জন্যে কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হবে।[১]

এসব হচ্ছে ইজতিহাদী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আর তাতে উপদেষ্টা পরিষদের লোকদের পরামর্শ শামিল হওয়া আবশ্যক। খুলাফায়ে রাশেদুন ঠিক এভাবেই কাজ করতেন। এই কারণে কোন স্থির ও অনড় নীতি নির্ধারণের কাছে নীতি স্বীকার করা যাবে না এবং প্রতি বছরের জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে কোন অভিন্ন নীতি ধরে রাখা যেতে পারে না।

উমর ইবনে আবদুল আজীজ থেকে যা আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত হয়ে এসেছে,তা-ও এ কথারই ব্যাখ্যা দেয়। তিনি তাঁর কর্মচারীদের লিখে পাঠিয়েছিলেন, "তোমরা অর্ধেক পরিমাণ যাকাত—আবূ উবাইদ বলেছেন—যথাস্থানে স্থাপন কর এবং অপর অর্ধেক আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" পরবর্তী বছর আবার লিখে পাঠালেন ঃ 'সব' যাকাতই যথাস্থানে ব্যয় কর।[২]

'রায়' থেকে কুফা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া যাকাত তিনি পুনর্বার 'রায়'তে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা বা বৈপরীত্য নেই। সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতেই তিনি এ কাজ করেছিলেন।

এজন্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, নামায কসর পরিমাণ দূরত্বের যাকাত স্থানান্তরিতকরণ সম্পূর্ণ ও নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার কোন শরীয়াতী দলিল নেই। তাই শরীয়াতী কল্যাণ দৃষ্টিতে যাকাতও তদনুরূপ অন্যান্য জিনিস স্থানান্তরিত করা সম্পূর্ণ জায়েয।[৩]

الاختيارات ص ٥٩ .٣ الاموال ص ٥٩٤ .٢ من تفسير القرطبى ج ٨ ص ١٧٢ .١

তৃতীয়, প্রসিদ্ধ ও প্রত্যয়ে পরিণত কথা হচ্ছে, নবী করীম (স) আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে মদীনায় যাকাত আনিয়ে নিতেন এবং মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন।

নাসায়ী আবদুল্লাহ্ ইবনে হিলাল সাকাফী বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললে ঃ আমি যাকাতের ছাগী বা ছাগলের বিনিময়ে নিহত হওয়ার অবস্থায় পড়েছিলাম। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ যদি তা মুহাজির দরিদ্রদের দেয়া না হত তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম না।"

অনুরূপ পারিবারিক বোঝা বহন প্রসঙ্গে কুবাইচা ইবনুল মুযারিক (রা)-কে বলা নবী করীমের কথা ঃ অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমাদের কাছে যাকাতের মাল এসে যায়, তখন হয় আমরা এ ব্যাপারে তোমায় সাহয্য করব নতুবা এ বোঝা তোমার ওপর থেকে আমরা তুলে নেব। লোকটি ছিল নজদের অধিবাসী। তাকে হিজাজ থেকে সংগৃহীত যাকাত থেকে দেয়ার কথা রাসূলে করীম (স) চিন্তা করছিলেন এবং তা নজ্‌দ্‌বাসীদের কাছ থেকে হিজাজবাসীদের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন।[১]

আদী ইবনে হাতেম (রা) তাঁর গোত্রের যাকাত নবী করীম (স)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। চারদিকে মুর্তাদ হওয়ার হিড়িকের বছর সম্পর্কেও সেই কথাই সত্য।

হযরত উমর (রা) ইবনে আবূ যুবাবকে শুষ্কতার পর দুর্ভিক্ষের বছর পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন ঃ লোকদের ওপর দুটি বার্ষিক যাকাত বাধ্যতামূলক করে দেবে এবং একবারেরটা সেখানকার লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেবে এবং দ্বিতীয়বারেরটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।[২]

মুয়াযের সেই কথাটিও এরূপ, যা তিনি ইয়েমেনবাসীদের বলেছিলেন ঃ তোমরা আমার কাছে নিয়ে আস পাঁচ গজি কাপড় বা পোশাক। আমি তা যাকাতের স্থলে গ্রহণ করব। কেননা তা মদীনায় বসবাসকারী মুহাজিরদের জন্যে খুবই উপকারী ও সুবিধানজনক হবে।[৩]

আবূ উবাইদ বলেছেন, এসব জিনিস তখনই স্থানান্তরিত হতে পারে যদি তা স্থানীয় লোকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় এবং তাদের সচ্ছলতা লাভের পর উদ্বৃত্ত থাকে। উমর ও মুয়ায সংক্রান্ত বর্ণনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[৪]

আমি বলব, স্থানীয় লোকদের নিরংকুশ ও চরম মাত্রায় সচ্ছল হতে হবে, তা আদৌ জরুরী ও বাধ্যতামূলক নয়। সচ্ছলতারও স্তরভেদ রয়েছে। তার কোনটি অপরটি থেকে নিম্নে এবং কোনটি অপরটির তুলনায় উচ্চে।

---

১ ও ২. الاموال ص ٦٠٠.

৩ ও ৪. ঐ

প্রয়োজনও অভিন্ন নয়। তাই কার প্রয়োজন অধিক তীব্র, তা দেখা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এবং অবিলম্বে তাকে সাহায্য পৌঁছিয়ে দেয়া কর্তব্য। যার অবস্থা একটা সময় পর্যন্ত বিলম্ব সইতে পারবে ও ধৈর্য ধারণ সম্ভব হবে, তাকে সাহায্য দেয়ায় বিলম্ব হলে কোন দোষ হবে না। কেননা দ্রুত কল্যাণ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে কোথাও। কোথাও এমন মারাত্মক বিপদ দেখা দিতে পারে যে, তা বিলম্ব সহ্য করতে পারে না, সেখানে খুব দ্রুত সাহায্য পৌঁছাতে হবে।

তবে যাকাতের সবটাই স্থানান্তরিত না করে তার একটা অংশ পাঠিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়। সমস্তটা স্থানান্তরিত করা যাবে কেবলমাত্র তখন, যখন সে স্থানের লোকেরা পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় সচ্ছলতা পেয়ে যাবে। উমর ও মুয়ায (রা) সংক্রান্ত খবরে একথা বল হয়েছে।

অবশ্য একটি সতর্কতামূলক কথা বলা দরকার। শাফেয়ী মাযহাব যাকাত স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে সব কয়টি মাযহাবের মধ্যে সর্বাধিক কড়াকড়ি ও কঠোরতা করার পক্ষপাতী হলেও তাঁরা এ কাড়াকড়ি হ্রাস করেন যদি যাকাতের মালিক নিজেই তা বণ্টন করে। আসলে রাষ্ট্রপ্রধান ও যাকাত সংগ্রহের কর্মচারী—উভয়ের পক্ষেই যাকাত স্থানান্তরিত করা জায়েয, এটাই সহীহ্ কথা।

শাফেয়ী মতের 'আলী মুহায্যাব' গ্রন্থের লেখক বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান যাকাত কর্মচারীকে যাকাত বন্টনের অনুমতি দিলে সে তা বণ্টন করবে। আর বণ্টন করার অনুমতি না দিয়ে থাকলে সে তা বহন করে তার কাছে নিয়ে যাবে।[১]

ইমাম নববী তাঁর 'শরাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

জেনে রাখ, উপরিউক্ত বক্তব্য দাবি করে যে, যাকাত স্থানান্তরিত করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান ও যাকাত কর্মচারীর নিশ্চিতভাবে রয়েছে। আর যাকাত স্থানান্তরিতকরণে যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে, তা হচ্ছে বিশেষভাবে মালের মালিকের নিজের স্থানান্তরিত করা পর্যায়ে। রাফেয়ী এ কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন ঃ

এই যে কথাটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন, হাদীসসমূহের দৃষ্টিতেও তাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[২]

বিশেষ প্রয়োজন ও কল্যাণদৃষ্টিতে ব্যক্তিদের যাকাত স্থানান্তরিতকরণ

রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে গণনাযোগ্য ইসলামী কল্যাণ দৃষ্টিতে ইজতিহাদ করে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাকাত নিয়ে যাওয়া যখন জায়েয, যে মুসলিম ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয ধার্য হয়েছে, কোন প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্য কল্যাণ বিচারে যাকাত স্থানান্তরিত করা তার পক্ষেও জায়েয হবে। অবশ্য যদি সে নিজেই স্বীয় ধনমালের যাকাত বন্টনের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়ে আসে। উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনার তাই ফলশ্রুতি।

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٧٢

২. ঐ-১৭৫ পৃ.

হানাফীরা স্থানান্তরকরণ পর্যায়ে যেসব দিক বিবেচনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, সেগুলোও লক্ষণীয়। যেমন নিকটাত্মীয় অভাবগ্রস্তদের কাছে নিয়ে যাওয়া, অধিক অনশন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে বহন করে নেয়া, মুসলমানদের জন্যে অধিক কল্যাণকামী ও সাহায্য পাওয়ার বেশী অধিকারী ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া অথবা অপর স্থানে কোন ইসলামী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া—যার ফলে মুসলিম জনগণের পক্ষে বিপুল ও বিরাট কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—যাকাত যে স্থান থেকে সংগৃহীত সেখানে অনুরূপ কোন পরিকল্পনা না পাওয়া গেলে—ইত্যাদি ধরনের কার্যক্রম ও কল্যাণকর পদক্ষেপ-তৎপরতা, যা দ্বীনপন্থী মুসলমানদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারবে, সেই সাথে আল্লাহ্রও সন্তুষ্টি অর্জিত হবে—তা সম্পূর্ণ জায়েয, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যাকাত প্রদানে দ্রুততা ও বিলম্বিতকরণ

দ্রুত ও অনতিবিলম্বে যাকাত দিয়ে দেয়া ফরয

হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, যাকাত খুব ব্যপকতা সহকারে ফরয হয়। ধন-মালের যে মালিকের ওপর তা ফরয হয়, তা তার কাছে যতক্ষণ দাবি করা না হবে, ততক্ষণ তা দেয়া বিলম্বিত করার পূর্ণ ইখতিয়ার তার রয়েছে। কেননা যাকাত আদায়ের হুকুমটা শর্তহীন তাই দেয়ার জন্যে সময়ের প্রথম ভাগকে অপর অংশ থেকে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা যায় না। যেমন এক স্থানের পরিবর্তে অপর স্থানে আদায় করার নির্দেশও দেয়া যায় না। ইমাম আবূবকর আর-রাযীও এ মত গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু হানাফী ইমামগণের মধ্য থেকে ইমাম আল-কারখী বলেছেন, যাকাত তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া ফরয। কেননা 'আদেশ' তো তাৎক্ষণিকতার দাবি করে। এমন কি যদি তাৎক্ষণিকতার দাবি না করে, বিলম্বিত করারও দাবি নেই। তাহলে ফিকাহ্ বিশারদ ইবনুল হুমাম যেমন বলেছেন—ফকীরকে তা দিয়ে দেয়ার নির্দেশটা তাৎক্ষণিকতার নিদর্শনসম্পন্ন। তা হচ্ছে, নির্দেশ তো তার প্রয়োজন দূর করার উদ্দেশ্যে। আর খুব শীঘ্রতা সম্পন্ন। তা তাৎক্ষণিকভাবে ফরয না হলে দেয়া ফরয করার উদ্দেশ্যটা পূর্ণমাত্রায় হাসিল হতে পারে না।[১]

এই কথাটি যথার্থ। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহ্‌মাদ এবং জমহুর ফিকাহ্‌বিদ আলিমগণ এই মত দিয়েছেন।

ইবনে কুদামাহ্ যেমন বলেছেন, এটা এজন্যে যে, 'আদেশ' তো আসলে তাৎক্ষণিকতার দাবি করে। যেমন ফিকাহ্‌র মৌল নীতি বলে। এ কারণে বিলম্বকারী আযাব পাওয়ার উপযোগী হয়। এ কারণে তো আল্লাহ্ তা'আলা ইবলিসকে তাঁর দরবার থেকে বহিষ্কার করেছেন, তার ওপর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সিজদা করার আদেশ হওয়া মাত্র তা পালন করা থেকে বিরত থাকার দরুনই তাকে তিরস্কার করেছিলেন। কেউ যদি তার গোলামকে তাকে পানি খাওয়াবার নির্দেশ দেয় আর তা পালন করতে বিলম্ব করে, সে নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। আরও এজন্যে যে, বিলম্ব করা জায়েয হলে তা ফরযের পরিপন্থী হয়ে পড়ে। কেননা ফরয তো তা, যা পালন না করলে আযাব দেয়া হবে। তাই আদেশ পালনে বিলম্ব করা জায়েয হলে উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কাজ করা জায়েয হতে হয়। আর তাহলে তা অমান্য করলে সেজন্যে আযাব দেয়া ন্যায় হয়ে পড়ে।

---

১. فتح القدير ج ١ ص ٤٨٢– ٤٨٣ ورد المختار ج ٢ ص ١٣–١٤

আমরা যদি মেনেও নিই যে, নিঃশর্ত আদেশ তাৎক্ষণিকতার দাবি করে না, তাহলে আমাদের বিষয়টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা এখানে যদি বিলম্বিতকরণ বৈধ করা হয়, তা হলে তার প্রকৃতির দাবি অনুযায়ীই তা বিলম্বিত করা হবে সে ব্যাপারে এই নির্ভরতা সহকারে যে, বিলম্ব করা হলে গুনাহ্ হবে না। তাহলে এর মধ্যে তার মৃত্যু সংঘটিত হলে ফরযটাই অবহেলিত হয়ে থাকবে অথবা এ সময় তার ধন-মাল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে বা সে তা পালনে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে। আর তাহলে যাকাত পাওয়ার অধিকারী ফকীর-মিসকীন ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

আসলে এখানে তাৎক্ষণিকতার দাবি প্রবল, সেই লক্ষণটা প্রকট। তা হচ্ছে, যাকাত ফরয হয়েছে ফকীর-মিসকীনের অভাব ও প্রয়োজন দূর করার লক্ষ্যে। আর এ অভাব ও প্রয়োজন তো চলমান, গতিশীল। অতএব ফরয পালনটাও চলমান ও গতিশীল হতে হবে। তা ছাড়া তা একটা বারবার পালনীয় হওয়া ইবাদতও । কাজেই তা পালন করা ততটা বিলম্বিত হওয়া উচিত নয়, যাতে করে আবার ফরয হওয়ার সময় উপস্থিত হয়ে পড়তে পারে—যেমন নামায ও রোযা।

এসব কথাই প্রযোজ্য তখন, যখন কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকবে না। মূলত যাকাত দেয়ার ব্যাপারে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হওয়ার আশংকা থাকলে অথবা তার এছাড়া অন্য মাল থেকে থাকলে তা দিতে বিলম্ব করা জায়েয হবে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لاضَرَرَ وَلاضِرَارَ 'ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি স্বীকার করাও যাবে না।[১]

আরও যেহেতু কারোর ঋণ শোধ করায় বিলম্ব করা যখন জায়েয উপরিউক্ত কারণে, তখন যাকাত বিলম্বিত করা তো আরও উত্তমভাবে জায়েয হবে।[২]

১.হাদীসটি আহমাদ ও ইবনে মাজা উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে। ইবনে মাজাহ্ উবাদাতা ইবনুস সামেত থেকেও উদ্ধৃত করেছেন। আর হাকেম ও দারে কুত্নী উদ্ধৃত করেছেন আবূ সায়ীদ থেকে। নবী তাঁর الاربعين ও الازكار গ্রন্থে হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। বলেছেন ঃ মালিক তার 'মুরসাল'রূপে এমন সব সূত্র উদ্ধৃত করেছেন, যা পরস্পরকে শক্তিশালী করে। 'হায়সামী' হাদীসটির বর্ণনাকারীরা সকলেই সিকাহ্। আর আল-আলায়ী বলেছেন, হাদীসটির সমর্থক ও সাক্ষীস্বরূপ বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যার সমষ্টি 'সহীহ্' হওয়ার মর্যাদা পায়, অথবা 'হাসান' হওয়ায় যাকে দলিলরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। শয়খ আহমাদ শাকের মুসনাদের ২৮৬৭ নম্বরের হাদীসটির সনদ বের করতে গিয়ে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ 'যয়ীফ'। তার অর্থ, উবাদাতা ইবনে সাবেত বর্ণিত হাদীসটি যা ইবনে মাজাহ্ উদ্ধৃত করেছেন, সে সনদটি সহীহ্ ও প্রমাণিত।

'ক্ষতি করা' ও ক্ষতি স্বীকার করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ক্ষতি করা হচ্ছে একটি কাজের সূচনা। আর ক্ষতি স্বীকার করা হচ্ছে সেই কাজের পরিণতি। প্রথমটি নিঃশর্তভাবে অন্যের সাথে বিপর্যয়কারী মিশিয়ে দেয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিপর্যয়কারীকে তার সাথে মেশানো তার মুকাবিলা বা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে রজব প্রণীত جامع العلوم ولحكم গ্রন্থে বহু কালাম করা হয়েছে। তা দেখুন। মুল্লা কারী প্রণীত المبين المعين لفهم الاربعين গ্রন্থের ১৮০-১৮৫ পৃষ্ঠায় এবং আল-মুসাভী রচিত فيض القدير গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৪৩১-৪৩২ পৃষ্ঠায়ও বিশদ আলোচনা হয়েছে।

২. المغنى الابن قدامه ج ٢ ص ٦٨٤ – ٦٨٥

যাকাত প্রদানে তাড়াহুড়া করা

ইবাদত পালনে দ্রুততা এবং তা আদায়ের জন্যে সাধারণ অর্থেই খুব তীব্রতা করার জন্যে ইসলাম আহ্বান জানিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ 'তোমরা খুব দ্রুততা সহকারে অগ্রসর হয়ে যাবতীয় কল্যাণময় কাজে যোগদান কর।[১] তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ -

এবং দ্রুত দৌড়ে চল তোমাদের কাছ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্যে।[২]

সর্বপ্রকারের নেক কাজেই এ দ্রুততা ও তরান্বিতকরণ যখন খুবই পসন্দনীয় প্রশংসনীয়, তখন যাকাত প্রভৃতি জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারসম্পন্ন কাজগুলোতে তা গ্রহণ অধিকতর প্রশংসনীয় হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া লোভ ও মায়া বিজয়ী হয়ে ওঠার আশংকাও রয়েছে, নফ্সের খায়েশ তার পথে বাধার সৃষ্টি করতেও পারে অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা মাঝখানে দাঁড়িয়েও যেতে পারে....এ ভয়টা পুরোপুরি রয়েছে। তাহলে তো ফকীর-মিসকীনের অধিকার বিনষ্ট হতে পারে! এ কারণে আলিমগণ বলেছেন,'সকল প্রকার কল্যাণমূলক কাজই খুব তাড়াহুড়া ও দ্রুততা সহকারে করে ফেলা বাঞ্ছনীয়। কেননা বিপদ-আপদ আসতে পারে, কাজের সুযোগ না-ও থাকতে পারে। আর মৃত্যুর ব্যাপারে তো কোন নিরাপত্তাই নেই। কাজেই বিলম্ব করা অপসন্দনীয়, অপ্রশংসনীয়। দ্রুততা ও দায়িত্ব মুক্তির অধিক সহায়কও। প্রয়োজন ও অভাব দূরকারী, ঘৃণ্য অলসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় এবং আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা ও গুনাহ্ নির্মূলকরণে অধিক কার্যকর।[৩]

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে—নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে ধন-মালে যাকাত মিলে মিশে যায় (তা থেকে আলাদা করা হয় না), তা ধ্বংস করে দেয়।' শাফেয়ী ও বুখারী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে এবং হুমাইদীও উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে অতিরিক্ত কথা এটুকু রয়েছে ঃ হতে পারে তোমার মালে যাকাত ফরয হয়েছে। এখন তুমি যদি তা হিসাব করে বের করে না দাও, তাহলে এই হারাম মাল হালাল মালকে ধ্বংস করে ফেলবে।[৪]

আর যাকাত খুব দ্রুততা সহকারে ও অবিলম্বে বের করা যখন খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার, তাহলে তার জন্যে সুনির্দিষ্ট ওয়াদার সময় থেকে তাকে আগে নিয়ে আসা ও পিছনে ঠেলে দেয়া এই উভয় কাজই জায়েয হতে পারে ?.... যেমন বছর পূর্ণ হওয়া কিংবা ফসল কর্তিত হওয়ার পূর্বেই কি তা আদায় করা জায়েয হবে ?

এই বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। একটু পরেই আমরা সে আলোচনায় আসছি।

---

১. البقره – ١٤٨ ، المائده ٤٨ ২. ال عمران ١٣٣

৩. نيل الارطار ج ٤ ص ١٤٨ ط الاعثمانية

৪. نيل الارطار ج ٤ ص ١٤٨ ط الاعثمانية

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যাকাত আদায় করা

যাকাত ফরয যেসব মালে, তা দু'প্রকারের—এক প্রকারের মালে একটি বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। যেমন গৃহপালিত গবাদি পশু নগদ টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ের পণ্য। আর অন্য প্রকারের মালে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই—যেমন কৃষি ফসল ও ফল-ফলাদি।

প্রথম প্রকারের মাল সম্পর্কে অধিক সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ এ মত পোষণ করেন যে, যাকাত ফরয হওয়ার কারণ যখনই ঘটবে—আর তাহলে পূর্ণ মাত্রার নিসাব বা নিসাবের পরিমাণ পূর্ণ হওয়া—একটি বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই যাকাত দিয়ে দেয়া জায়েয। শুধু তা-ই নয়, দুই কিংবা ততোধিক বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়া হলেও তা জায়েয হবে। তবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে তা জায়েয হবে না।

হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, জুহ্‌রী, আওযায়ী, আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবূ ইউসুফ প্রমুখ ফিকাহ্ বিশারদ উপরিউক্ত মত পোষণ করেন।[১]

রবীয়া, মালিক ও দাউদ বলেছেন, মালিকানায় একটি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিয়ে দেয়া জায়েয নয়—তা নিসাব পরিমাণের মালিকানা লাভের পূর্বে দেয়া হোক, কি তার পর।[২] কোন কোন মালিকী মাযহাবপন্থী আলিম বলেছেন, নির্দিষ্ট সময়ের অল্প পূর্বে যাকাত দিয়ে দিলে তা জায়েয হবে। তবে তা নগদ সম্পদের, আবর্তনশীল ব্যবসায়ী পণ্যের বিক্রয় থেকে লব্ধ ফেরত পাওয়ার আশা পূর্ণ ঋণ (লোকদের কাছে পাওনা)—নিজের করা ঋণ নয়, ইত্যাদির হতে হবে। যে সব গবাদি পশুর জন্যে চেষ্টা যত্ন নিতে হয় না, তাও এর মধ্যে গণ্য। এসবের যাকাত অগ্রিমভাবে দেয়া যাবে, যদিও অগ্রিম দেয়া মাকরূহ। কৃষি ফসল ও ফলের মওজুদ করা ব্যবসায় পণ্য আবর্তনশীল ঋণ ইত্যাদির যাকাত অগ্রিমভাবে আদায় করা যায় না। অনুরূপভাবে যে সবের জন্যে আদায়কারী নিযুক্ত হয়েছে—যদি যাকাতের কর্মকর্তা ছাড়াই এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিয়ে দেয়, তাও আদায় হবে না। কিন্তু যদি যাকাতের জন্যে নিযুক্ত কর্মীকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার কিছু সময় পূর্বে দেয়া হয়, তাহলে সে যাকাত আদায় হবে।

এ 'কিছু সময়' বলতে কি বোঝায়—যে সময়ের পূর্বে দিলে যাকাত হবে তা নির্ধারণে ফিকাহ্‌বিদগণ একদিন দুদিন হতে শুরু করে এক মাস দুমাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের

---

১. المغني ج ص ٦٣٠

২. المغني। ইবনে রুশদ তাঁর بداية المجتهد গ্রন্থে লিখেছেন (১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃ.) এ মতভেদের কারণ তা ইবাদত না মিসকীনদের জন্যে ধার্য হক্ –এ নিয়ে মতভেদ। যাঁরা তাকে শুধু ইবাদত মনে করেন এবং তাকে নামাযের সাথে তুলনা করেন, তাঁরা যাকাত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দেয়া জায়েয মনে করেন না। আর যাঁরা তাকে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক ধার্য হক্ মনে করেন, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ইচ্ছা করে দিলে জায়েয হবে বলে মনে করেছেন। ইমাম শাফেয়ী হযরত আলী বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তা হচ্ছে, 'নবী করীম (স) বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই হযরত আব্বাসের যাকাত নিয়ে নিয়েছিলেন।'

কথা বলেছেন। আর নির্ভরযোগ্য হচ্ছে এক মাস কাল। তাই তার অধিক সময় পূর্বে দিলে আদায় হবে না।

আগে ভাগে যাকাত দেয়া কোনরূপ 'কেরাহিয়াত' ছাড়াই জায়েয হবে যদি যাকাত সংগ্রহের স্থান থেকে অধিকতর তীব্র প্রয়োজনক্লিষ্ট কোন ফকীরকে দেয়ার জন্যে স্থানান্তরিত করা হয়, যেন বছর শেষ হওয়া কালেই তা পাওয়ার যোগ্য লোককে দেয়া সম্ভব হয়। বরঞ্চ এরূপ আগে দেয়া তো ফরযও হয়ে পড়ে, যেমন মালিকী মযহাবের কেউ কেউ বলেছেন। এমন কি যাকাত যদি বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা আগে দেয়ার ফলে তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলেও তা আদায় হবে এবং তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা এ যাকাত তো যথাস্থানে নিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সময়টাও ঠিক তা ফরয হওয়ার সময়রূপেও নির্ধারিত হল। তখন অবশিষ্ট সময়ের যাকাত বের করা তার পক্ষে জরুরী নয়। কিন্তু পূর্বোক্ত ধরনে যদি সময়ের আগে যাকাত দেয়া হয়, তাহলে অবশিষ্ট সময়ের জন্যে যাকাত দিতে হবে যদি মালিকানা নিসাব পরিমাণ হয়।[১]

যাঁরা জায়েয বলেন না তাঁদের দলিল

যাঁরা অগ্রিম যাকাত দেয়া জায়েয বলেন না, তাঁদের দলিল হচ্ছে, যাকাত ফরয হওয়ার দুটি শর্ত ঃ একটি নিসাব পূর্ণ হওয়া আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মালিকানার একটি বছর পূর্ণ হওয়া। কাজেই একটি পূর্তির পূর্বে তা দেয়া জায়েয হবে না, যেমন সর্বসম্মতভাবে জায়েয হবে না নিসাব পরিমাণের মালিকানা হওয়ার পূর্বে দিলে। কেননা শরীয়াত যাকাতের জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আর তা হচ্ছে একটি বৎসর পূর্তি হওয়া। তাই তার পূর্বে অগ্রিম দেয়া জায়েয হবে না, যেমন নামায সময় হওয়ার আগে পড়লে নামায হবে না।[২]

যাঁরা জায়েয বলেন তাঁদের দলিল

যাঁরা অগ্রিম যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন, তাঁদের দলিল হচ্ছে—আবূ দাউদ প্রমুখ উদ্ধৃত ও হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তা হচ্ছে হযরত আব্বাস (রা) রাসূলে করীম (স)-এর কাছে এক বছর পূর্তির পূর্বে অগ্রিম যাকাত দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে সেজন্যে 'রুখসত' (অনুমতি) দিয়েছিলেন।[৩]

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে কথা উঠেছে বটে; তবে বায়হাকী হযরত আলী (রা) থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তা হচ্ছে, নবী করীম (স) হযরত উমর (রা)-কে যাকাতের জন্যে পাঠালেন। পরে বলা হল, ইবনে জামীল, খালেদ ইবনুল অলীদ ও নবী করীম (স)–এর চাচা আব্বাস (রা) তা দিতে অস্বীকার করেছেন।

---

১. দেখুন ঃ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٥٠٢

২. المغنى السابق

৩. হাদীসটি নাসায়ী ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচখানি সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হাকেম, দারে কুত্নী ও বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন। দারে কুত্নী ও আবূ দাউদ বলেছেন, হাদীসটি 'মুরসাল'। অপরাপর বহু হাদীস এটিকে শক্তিশালী বানিয়েছে। দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ص ١٥ - ١٦٠ والمجموع ج ٦ ص ١٤٥ - ١٤٦

তখন নবী করীম (স) খালেদ ও আব্বাসের মর্যাদা রক্ষা করলেন। তখন তিনি যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এই কথাটিও ছিল ঃ 'আমরা খুব ঠেকায় পড়েছিলাম। পরে আব্বাস থেকে আমরা দুই বছরের যাকাত অগ্রিম নিয়ে নিয়েছি।[১] সহীহ্ বুখারী গ্রন্থেও এই কিস্‌সাটি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তাতে এ কথা আছে, 'আব্বাসের ব্যাপার হচ্ছে তাঁর যাকাত আমার কাছে এবং অনুরূপ আরও যাকাত সেই সাথে।' পরে বললেন ঃ হে উমর! তুমি কি জানো না এক ব্যক্তির চাচা তার পিতার মূল-শাখা বিশেষ হয়ে থাকে।'[২]

আবূ উবাইদ বলেছেন, فهي على ومثلها معها এ বর্ণনার সারকথা হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে দুই বছরের যাকাত অগ্রিম নেয়া হয়েছিল—সে বছরের এবং তার পূর্বের বছরের।[৩]

চিন্তাবিবেচনা ও কিয়াসের ভিত্তিতে তাঁরা এ দলিল পেশ করেছেন যে, এই অগ্রিম গ্রহণ এমন মালের যাকাত যা ফরয হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে তা ফরয হওয়ার পূর্বেই। আর তা জায়েয। যেমন ঋণ আদায় করার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তা আগেভাগে দিয়ে দেয়া, যেমন কসম খাওয়ার পর কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা তা ভংগ করার পূর্বেই। কাউকে জখম করার পর তার প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই হত্যার কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়া ইমাম মালিকের মতে জায়েয।[৪]

তাঁদের এই কথা, বছর পূর্তি হওয়া যাকাতের দুটি শর্তের অন্যতম। অতএব তা জায়েয নয়—যেমন নিসাব এই কথা সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়ার পূর্বে অগ্রিম যাকাত দেয়া কারণ ঘটার পূর্বেই কার্যকে আগাম করার সমতুল্য। ফলে তা কসমের পূর্বে কাফ্‌ফারা দেয়া ও আহত করার পর হত্যার কাফ্‌ফারা দেয়ার মতই হয়ে যায়। তখন অবস্থা হয়, যেন দুটি শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে তা অগ্রিম দেয়া হয়েছে। আর প্রথমোক্ত অবস্থায় একটি শর্তের পূর্ণ হওয়ার অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দিয়ে দেয়া—এ দুটি কখনও এক ও অভিন্ন নয়।[৫]

'যাকাতের জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট আছে'—এ কথার জবাবে আমরা তা-ই বলব, যা ইমাম খাত্তাবী বলেছেন। আর তা হচ্ছে, কোন জিনিসে যদি সময় প্রবেশ করে মানুষের প্রতি সদয়তাস্বরূপ হয়ে, তাহলে সে তার অধিকারে অনুমতি নিতেও পারে

---

১. السنن الكبرى ج ٤ ص ١١١ -আবূ দাঊদ তায়ালিসী আবূ রাফে'র এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, নবী করীম (স) উমর (রা)-কে বললেনঃ 'আমরা আব্বাসের মালের যাকাত প্রথম বছর অগ্রিম নিয়েছিলাম। (نيل الاوطار السابق)

২. ঐ—এ কিস্‌সা সহীহ্ মুসলিমেও রয়েছে।

৩. শাওকানী বলেছেন, তার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাৎপর্য হচ্ছে, নবী করীম (স) যদি হযরত আব্বাসের ওপর ধার্য যাকাত নিজের ওপর নিয়ে নেন এজন্যে যে, তিনি দিতে অস্বীকার করেছেন, তাহলে অনুরূপ আরও এক বছরে দায়িত্ব নিতে পারেন কোনরূপ বাড়তি ছাড়া। দ্বিতীয়ত দিতে অস্বীকার করার কথা মনে করলে হযরত আব্বাসের প্রতি খারাপ ধারণা করা হবে। (نيل الاوطار السابق)

৪. المغنى ج ٢ ص ٦٣٠ ৫. معالم السنن ج ٢ ص ٢٢٤

এবং তার প্রতি হৃদ্যতা পরিহারও করতে পারে। যেমন, কারোর বিলম্বিত অধিকার তাড়াতাড়ি দিয়ে দিল, যেমন কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির যাকাত কেউ আদায় করে দিল, যদিও তার প্রতি তা ফরয হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় অর্জিত হয়নি। কেননা হতে পারে, সেই মাল সেই সময়ে সংগৃহীত হয়েছে।[১]

তবে নামায ও রোযা নিছক ইবাদত ছাড়া আর কিছু নয়। তার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার তাৎপর্য বোঝার অপেক্ষা রাখে না। তা শরীয়াত আরোপিত দায়িত্ব, একটা কাজের পরীক্ষা। অতএব তা ঠিক সেভাবেই আদায় করা যেতে পারে মাত্র।

যদি কেউ তার মালিকানাভুক্ত নিসাবের যাকাত অগ্রিম দিয়ে দেয়—যা তার কাছে উৎপন্ন হবে তা থেকে কিংবা তাতে তার যে মুনাফা হবে তা থেকে, তাহলে কোনরূপ বৃদ্ধি ছাড়াই নিসাব থেকে তা আদায় হয়ে যাবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদের মতে। কেননা সে অগ্রিম যাকাত দিয়েছে এমন মালের যা তার মালিকানায় নেই। এ কারণে তা জায়েয হবে না।

ইমাম আবূ হানীফার মতে তা আদায় হবে। কেননা সে যে জিনিসের মালিক, তা তার অধীন। অতএব তা তারই মর্যাদা পাবে।[২]

মালের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সে সব যাতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত থাকে না। যেমন কৃষি ফসল, ফল, খনিজ সম্পদ, রিকাজ ইত্যাদি। এসবে যাকাত অগ্রিম দেয়া জায়েয নয়। তবে শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ ওশর অগ্রিম দেয়া জায়েয বলেছেন। কিন্তু অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, তা-ও জায়েয নয়। কেননা 'ওশর' ফরয হয় একটি মাত্র কারণে। তা হচ্ছে ফসল পাওয়া—হস্তগত হওয়া, দানা হাতে আসা। তা যদি অগ্রিম দেয়া হয়, তাহলে ফরয হওয়ার করণ দেখা দেয়ার পূর্বেই তা দেয়া হবে। এজন্যে তা জায়েয বা আদায় হবে না। যেমন নিসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যাকাত দেয়, তাহলে তা হয় না।[৩]

হাম্বলী মাযহাবের কেউ কেউ অগ্রিম 'ওশর' দেয়ার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা হতে হবে গাছ বড় হওয়ার ও খেজুরের ছড়া বের হয়ে আসা—প্রভৃতির পর।

অগ্রিম দেয়ার কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে কি

যাকাত অগ্রিম দেয়া যখন জায়েয, তখন তার জন্যে কয় বছরের সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে কিংবা কোন সীমা ছাড়াই তা জায়েয?

হানাফী ও অন্যান্য ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, মালিক যে-কয় বছরের ইচ্ছা অগ্রিম যাকাত দিতে পারে, সেজন্যে কোন সীমা নেই। এমন কি তাঁরা এতদূর বলেছেন, কারোর যদি তিনশ' দিরহাম সম্পদের মালিকানা থাকে আর তা থেকে সে ভবিষ্যতের

---

১. معالم السنن ج ٢ ص ٢٢٤

২. المغنى ج ٢ ص ٦٣١ ৩. দেখুন : المجموع ج ٦ ص ١٦٠.

বিশ বছরের যাকাত বাবদ একশত দিরহাম দিয়ে দেয়, তাহলেও তা জায়েয হবে। কেননা 'কারণ' এখানে পাওয়া গেছে। তা হল নিসাব পরিমাণ ক্রমবর্ধনশীল সম্পদের মালিকানা। ওশর এরকম নয়। তা গাছ বেড়ে ওঠা ও ফল বের হওয়ার পূর্বে অগ্রিম দেয়া জায়েয হবে না। এমন কি—চারা করা ও গাছ বপনেরও পূর্বে! কেননা ওশর ফরয হওয়ার কারণটাই এখানে অনুপস্থিত। যেমন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকানার পূর্বেই অগ্রিম যাকাত দেয়া জায়েয নয়।[১]

এ কারণে অগ্রিম না দেয়া ও যথাসময়ে যাকাত বের করাই উত্তম ও অধিক ভাল। তাহলে সর্বপ্রকারের মতদ্বৈততা থেকে বাঁচা যাবে এবং সেই সাথে রাষ্ট্রের বার্ষিক আর্থিক আয়ও সুসংহত ও সুসংবদ্ধ থাকবে। অবশ্য অগ্রিম দেয়ার বা নেয়ার কোন প্রয়োজনই যদি দেখা দেয়, তা হলে তা স্বতন্ত্র কথা। যেমন বায়তুলমালের আয় ফরয জিহাদ পালনের জন্যে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দিলে অথবা দরিদ্রদের অভাব পূরণের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হলে সমস্ত ধন-মালের বা কতিপয়ের যাকাত অগ্রিম নেয়া যাবে, যেমন স্বয়ং নবী করীম (স) তাঁর চাচা হযরত আব্বাসের কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

তবে অগ্রিম বা পূর্বের যাকাত দুই বছরের অধিক সময়ের নেয়া উচিত নয়। তাহলে অন্তত ঃ মূল দলিলের ওপর শক্তভাবে আমল করা হবে।

যাকাত বিলম্বিত করা কি জায়েয

প্রয়োজন বা কোন কল্যাণ-দৃষ্টিতে অগ্রিম যাকাত নেয়ার বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি এবং জায়েয বলেছি। তাই তা ফরয হওয়ার সময় থেকে বিলম্বিত করা বা দেরী করে যাকাত দেয়াটা কোন বিশেষ কারণ ছাড়া জায়েয হতে পারে না। কোন গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ-দৃষ্টির দাবি অনুযায়ী যাকাত প্রদান বিলম্বিত করা হলে তা স্বতন্ত্র কথা। যেমন কোন অনুপস্থিত ফকীরকে দেয়ার উদ্দেশ্যে—যার প্রয়োজন উপস্থিত অন্যান্য ফকীরের তুলনায় অনেক বেশী মনে হবে—বিলম্বিত করা হলে জায়েয হবে। অনুরূপভাবে তা কোন অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়কে দেয়ার জন্যে বিলম্বিত করাও জায়েয। কেননা তার অধিকারটা অত্যন্ত তাগিদপূর্ণ এবং তাতে কয়েক গুণ বেশী সওয়াবও রয়েছে।

উপস্থিত আর্থিক ওযরের কারণে যাকাত দিতে দেরী করা যেতে পারে। যেমন যদি মালিকের নিজেরই যাকাত সম্পদের প্রতি অধিক প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা যদি ব্যয় করে এবং তা তার ওপর ঋণ হয়ে চাপে, তবে তাতে খুব বেশী দোষ হবে না। অবশ্য তার সুযোগ-সুবিধা হওয়ার প্রথম ভাগেই তা আদায় করে দেয়া তার কর্তব্য হবে।

শমসুদ্দীন রমলী বলেছেন, অধিকতর অভাবগ্রস্ত, অধিক কল্যাণকর বা নিকটবর্তী কিংবা প্রতিবেশীর অপেক্ষায় যাকাত প্রদানে বিলম্ব করায় যাকাতদাতার অধিকার

---

১. حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٢٩ – ٣٠ البحر الزخار ج ٢ ص ١٨٨

রয়েছে। কেননা এই বিলম্বকরণটা স্পষ্ট উদ্দেশের জন্যে, আর তা মর্যাদা। অনুরূপভাবে উপস্থিত লোকদের অধিকার লাভের বিবেচনায় বিলম্ব করা যাবে। তবে এই বিলম্বকরণে যদি যাকাতের মাল ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এজন্যে যে তার খুব বেশী সম্ভাবনা রয়েছে। সে তো নিজের গরজে বিলম্বিত করেছে। এ কারণে তার বৈধতা জিনিসটির নিরাপত্তার শর্তাধীন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে। অপর পক্ষে বিলম্বিত করায় উপস্থিত ফকীর যদি না খেয়ে থাকার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এ বিলম্বকরণ সম্পূর্ণ হারাম হবে। কেননা তার ক্ষতি প্রতিরোধ করা একান্তই কর্তব্য ছিল। তা শুধু মর্যাদা রক্ষার্থে পরিহার করা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না।[১]

কোন প্রয়োজনে যাকাত প্রদান বিলম্বিত করা জায়েয হওয়ায় ইবনে কুদামাহ্ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা খুব সামান্য জিনিস হতে হবে। যদি পরিমাণ বিপুল হয়, তাহলে তা জায়েয হবে না। তিনি ইমাম আহমাদের এ কথা উদ্ধৃত করেছেন, 'কারোর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যাকাত প্রতি মাসে দেয়া হয় না অর্থাৎ তা দিতে এতটা বিলম্ব করা যাবে না যে, তা মাসিক হিসেবে প্রতি মাসে কিছু কিছু করে বিচ্ছিন্নভাবে দেয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। যদি অগ্রিম দেয়া হয়, তাহলে তাদের বা অন্যদের দেবে—বিচ্ছিন্নভাবেও দেয়া যাবে, এক সঙ্গে সবও দিয়ে দেয়া যাবে। কেননা সে তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করেনি। অনুরূপভাবে যদি কারো নিকট দুই প্রকারের মাল থাকে অথবা বহু মাল থাকে, কিন্তু তার যাকাত একই হয়। আর তার বছর হয় বিভিন্ন তারিখে—যেমন কারো কাছে নিসাব রয়েছে অথচ বছরের মধ্যেই সে অনুরূপ মাল অর্জন করল যা নিসাব পরিমাণের কম, তাহলে এসবের যাকাত একত্রিত করা ও একসাথে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা জায়েয হবে না। কেননা এ একত্রিতকরণ এভাবেও হতে পারে যে, বছরের মাঝখানে পাওয়া সম্পদের যাকাত অপর মালের ওপর যাকাত ধার্য হওয়ার শুরুতে দিয়ে দেবে।[২]

মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ এ কথাটির ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, যাকাত তাৎক্ষণিকভাবে বণ্টন করাই ওয়াজিব। মালের মালিকের কাছে তা অবশিষ্ট থাকা এবং পাওয়ার যোগ্য লোক তার কাছে যখনই আসবে তখন তা প্রদান করা বছরের দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে—এ নীতি জায়েয নয়।[৩]

রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর দায়িত্বশীল বেতনভূক প্রতিনিধির পক্ষে যাকাত সম্পদ একত্রিত ও সংগৃহীতকরণে বিশেষ কোন কল্যাণ বিবেচনায় বিলম্বিত করা জায়েয। সে কল্যাণ বিবেচনা এ হতে পারে যে, মালের মালিক কোন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে গেছে, মাল ও ফল-ফসল বিনষ্ট হয়েছে এই সব। ইমাম আহমাদ এটাকে জায়েয বলেছেন হযরত উমর (রা)-এর হাদীসকে দলিলরূপে গ্রহণ করে। তারা এক বছর খুব বেশী ঠেকায় পড়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রা) সেই বছর তাদের কাছ থেকে যাকাত নেন নি। নিয়েছেন পরবর্তী বছর।[৪]

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٨٥ ২. نهاية المحتاج ج٢ ص ١٣٤

৩. حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٠ ৪. দেখুনঃ مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١١٦

আবূ উবাইদ ইবনে আবূ যুবাবের সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ হযরত উমর (রা) শুষ্কতা ও দুর্ভিক্ষের বছর যাকাত সংগ্রহের কাজ বিলম্বিত করেছিলেন। পরে যখন লোকেরা বৃষ্টিপাতের দরুন নতুন জীবন ফিরে পেল, তখন আমাকে পাঠালেন। বলে দিলেন, লোকদের কাছ থেকে দুইবারের যাকাত আদায় করবে। তার একবারেরটা সেখানকার লোকদের মধ্যেই বণ্টন করে দেবে আর অপরটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।[১]

এটা ছিল হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত পরিচালনার নীতি এবং এ যে অতীব উত্তম ও মানব কল্যাণকর, তা নিঃসন্দেহ। জনসাধারণের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ ও মমত্ববোধ। এ কারণে দুর্ভিক্ষের বছর বিপন্ন লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণকে বিলম্বিত করেছিলেন। ঠিক যেমন তিনি চোরের হাত কাটার দণ্ডও এ বছর মওকুফ রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, لاقطع فى عام السنة —'দুর্ভিক্ষের বছর চোরের হাত কাটা চলবে না।'

যাকাত অগ্রিম দেয়া পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আব্বাস (রা)-এর যাকাত বিলম্বিতকরণের ওযর বলতে গিয়ে নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ এ যাকাত তো তাঁর ওপর আছে এবং তার সাথে অনুরূপ আরও একটি। আবূ উবাইদ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ই প্রকৃত ব্যাপার জানেন, তবে আমি মনে করি, নবী করীম (স) হযরত আব্বাসের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দেয়ায় তাঁর যাকাত বিলম্বিত করে দিয়েছিলেন। আর রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ বিবেচনায় এরূপ করার ইখতিয়ার রয়েছে। অবশ্য পরে তা নিয়ে নেবে।[২]

বিনা প্রয়োজনে যাকাত প্রদান বিলম্বিত করা

কোনরূপ 'ওযর' বা কোন প্রয়োজন ছাড়াই যাকাত প্রদান বিলম্বিত করা জায়েয নেই। তা করলে সে গুনাহ্গার হবে। তার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। কেননা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যাকাত তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা ফরয।

শাফেয়ী মতের المهذب। গ্রন্থ প্রণেতা এ পর্যায়ে লিখেছেন, 'যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তার পক্ষে তা প্রদানে বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা তা এমন একটা হক—অধিকার, যা কোন ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানো ফরয। তাকে দিয়ে দেয়ার দাবি তো প্রবল হয়ে আছে। অতএব বিলম্ব করা জায়েয হতে পারে না। যেমন কারো কোন আমানতের জিনিস তার মালিক যখনই চাইবে, অবিলম্বে দিয়ে দিতে হবে। যদি দিতে বিলম্ব করে—দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে একটা ফরয কাজকে বিলম্বিত করেছে যথাসময়ে দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। অতএব ক্ষতিপূরণ দান অনিবার্য—আমানতের মতই।[৩]

হানাফীদের গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে, কোনরূপ প্রয়োজন ব্যতীতই যাকাত প্রদান বিলম্বিত করার অপরাধ এত বড় যে, তা যে করবে তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না, তার

---

১. الاموال ص ٣٧٤

২. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٥٩

৩. المجموع ج ٥ ص ٣٣١

গুনাহ্ হবে—যেমন আল-করখী প্রমুখ এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। আর তা ঠিক সেই কথাই যার উল্লেখ ইমাম আবূ জাফর তাহাভী করেছেন আবূ হানীফা (র) থেকে। কথাটি হচ্ছে, তিনি তা মাকরূহ্ মনে করেন। মাকরূহ তাহরীমীই মনে করতে হবে যখন শুধু 'কিরাহিয়াত' বলা হবে। আমাদের তিনজন ইমাম থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে যাকাত প্রদান ফরয। সে তিনজন হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান।

তাঁরা বলেছেন, বাহ্যত তো এ কথাই সত্য যে, যাকাত প্রদানে বিলম্ব করলে—সে বিলম্ব একদিন বা দুইদিন বা যত কম সময়ের জন্যেই হোক—গুনাহগার হবে। কেননা তারা 'তাৎক্ষণিক' বলতে বুঝেছেন সম্ভাব্য সময়ের প্রথম মুহূর্ত। বলা যায়, লক্ষ্য হচ্ছে, পরবর্তী বছর পর্যন্ত যেন ঠেলে নিয়ে যাওয়া না হয়। কেননা المنتقى। গ্রন্থ থেকে البدائع। গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যাকাত সময়মত না দেয়া অবস্থায় যদি দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে খুবই খারাপ হবে ও গুনাহ্ হবে।[১]

আমার মতে মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণের যে মত জানা গেছে, তার বাহ্যিক অর্থ যা, তা থেকে অন্যথা করা উচিত নয়। তা একদিন বা দুই বা কয়েক দিনের উপেক্ষা বা অবহেলা হলেও একটা সম্ভব ব্যাপার, সহজতা বিধান ও অসুবিধা দূর করণের নিয়মে তা হতে পারে। কিন্তু এক মাস বা দুই মাস—কি ততোধিক সময়ের উপেক্ষা—এক বছরের কম সময় পর্যন্ত—যেমন البدائع। গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, তা গণ্য করা ঠিক হবে না, মানুষ যেন তাৎক্ষণিকভাবে দেয় ফরযের কথা ভুলে না যায়, তা দেখতে হবে।

যাকাত দেয়ার পর তা বিনষ্ট হয়ে গেলে

অনেক সময় এমনও ঘটে যে, মালের মালিক যাকাত বের করে দিয়েছে, তারপর কোন কারণে তা বিনষ্ট হয়ে গেল। হয় চুরি হল, জ্বলে গেল, কিংবা এ ধরনের অন্য কিছু ঘটল। তখন কি হবে, এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মত বিভিন্ন। ইবনে রুশ্‌দ তা খুব সুন্দরভাবে ও সংক্ষিপ্তরূপে পেশ করেছেন। বলেছেন ঃ

'যাকাত দিয়ে দেয়ার পর যদি তা নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কি হবে ?—কিছু লোক বলেছেন, তাতেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অপর কিছু লোক বলেছেন, প্রদান স্থানে ধ্বংস বা বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ তাকেই করতে হবে, যতক্ষণ না তার যথাস্থানে তা স্থাপিত হয়। অপর লোকেরা দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হয় তা দিয়েছে তা দেয়া সম্ভব হওয়ার পর নতুবা তা দিয়েছে ফরয ও সম্ভব হওয়ার প্রথম সুযোগেই। কেউ কেউ বলেছেন, ফরয ও সম্ভব হওয়ার কিছু দিন পর যদি তা বের করে থাকে, তাহলে উক্ত অবস্থায় তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি তা দিয়ে থাকে প্রথম ফরয হওয়ার কালেই এবং তাতে দাতার কোন ত্রুটি না হয়, তাহলে উক্ত অবস্থায় তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত এটাই।

---

১. الدر المختار وحاشية ج ٢ ص ١٤।

অন্য লোকেরা বলেছেন, দাতার ক্রটি ধরা পড়লে ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। আর তার কোন ক্রটি না হলে সে অবশিষ্টের যাকাত দেবে। আবূ সওর ও শাফেয়ী এ মত দিয়েছেন।

অন্যরা বলেছেন, বরং সব কিছু থেকে যা যাবার তা যাওয়ার পর মিসকীনরা ও মালের মালিক অবশিষ্ট সম্পদে দুজনই শরীক গণ্য হবে মালের মালিকের অংশ থেকে তাদের দুজনের অংশ অনুপাতে। যেমন দুই শরীক—সম্মিলিত মালের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে অনুপাতে তারা দু'জনই ক্ষতিপূরণে শরীক হয়—এ-ও তেমনি।

আলোচ্য বিষয়ে মোটামুটি পাঁচটি মত পাওয়া গেল ঃ

১. একটি মত ঃ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না নিঃশর্তভাবে,

২. একটি মত ঃ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নিঃশর্তভাবে,

৩. একটি মত ঃ দাতার কোন ক্রটি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ক্রটি না হলে নয়।

৪. একটি মত ঃ ক্রটি হলে ক্ষতিপূরণ দেবে, নতুবা অবশিষ্টের যাকাত দেবে,

৫. একটি মত ঃ (পঞ্চম) অবশিষ্টের মধ্যে উভয়ই অংশীদার হবে।[১]

যাকাত ফরয হওয়ার পর ও প্রদানের পূর্বে মাল ধ্বংস হলে

ইবনে রুশ্‌দে অপর একটি বিষয়েরও উত্থাপন করেছেন। তা হচ্ছে, যাকাত ফরয হওয়ার পর এবং তা প্রদানের পূর্বে তা ধ্বংস হয়ে গেলে কি হবে ? বলেছেন, ফরয হওয়ার পর ও প্রদানে সক্ষম হওয়ার পূর্বে কিছু অংশ মাল যদি চলে যায়, তাহলে কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে যাকাত দেবে। অপর লোকেরা বলেছেন, তখন মিসকীনরা ও মালের মালিক দুই শরীকের অবস্থায় এসে যাবে, উভয়ের অংশ থেকে কিছু কিছু বাদ যাবে।

বিষয় দুটিতে মতপার্থক্যের কারণ

ইবনে রুশ্‌দ বলেছেন, এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদদের মতপার্থক্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, যাকাতকে ঋণের মত মনে করা অর্থাৎ অধিকারটা সম্পর্কিত হবে দায়িত্বের সাথে, মূল মালের সাথে নয় অথবা এ অবস্থায় যাকাতকে অধিকার সমতুল্য মনে করা, যা মূল মালের সাথে সম্পর্কিত হয়, মাল যার হাতে তার দায়িত্বের সাথে নয়। যেমন আমানতরক্ষক লোক প্রভৃতি।

যাকাতদাতাদেরকে যারা আমানতদাতাদের ন্যায় মনে করেছে, তাঁরা বলেছেন, যখন যাকাত বের করে দিল, তারপর তা ধ্বংস হয়ে গেলে সেজন্যে তার ওপর কিছুই বর্তাবে না।

আর যাঁরা তাদেরকে ঋণগ্রস্তদের মত মনে করেছেন, তাঁরা বলেছেন তারা ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য হবে।

---

১. بداية المجتهد ج ا ض. ٢٤٠ ط الا ستقامة

আর যাঁরা ক্রটি হওয়া ও ক্রটি না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, তাঁরা তাদেরকে সবদিক দিয়েই আমানতদারদের মত মনে করেছেন। কেননা আমানতদারের ক্রটি হলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। আর যিনি বলেছেন, ক্রটি না হয়ে থাকলে অবশিষ্টের যাকাত দেবে, তিনি তাকে মনে করেছেন সেই লোক যার যাকাত বের করার পর কিছু মাল নষ্ট হয়ে গেছে, সে সেই লোকের মত যার কিছু মাল নষ্ট হয়ে গেছে যাকাত ফরয হওয়ার পর। যেমন কারো ওপর যাকাত ফরয হল, সে তো শুধু যে মাল মজুদ আছে তার যাকাত দেবে। এখানেও তাই। তার যে মাল এখানে বর্তমানে আছে, কেবল সে মালেরই যাকাত দেবে।

এরূপ মতপার্থক্যের কারণ হচ্ছে সম্পদের মালিককে ঋণগ্রস্ত ও আমানতদার এবং শরীক ও ফরয হওয়ার পূর্বেই যার মাল ধ্বংস হয়ে গেছে—এ দুয়ের সাথে তুলনা আবর্তিত হওয়া।

আর যখন যাকাত ফরয হবে এবং তা প্রদানে সক্ষম হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা প্রদান করল না—এর মধ্যে কিছু মাল চলে গেল—এ অবস্থায় আমার বিশ্বাস, সব ফিকাহ্‌বিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মালের মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। তবে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে মনে করেছে যে, তাতে যাকাত ফরয হওয়াটা সম্পূর্ণতা পায় এক বছর অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি যাকাত আদায়কারী যাকাত নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়। এ হচ্ছে ইমাম মালিকের মায্‌হাব।[১]

আগে-পরে হলে কি যাকাত রহিত হবে

কোন বিশেষ ওযরের দরুন কিংবা ওযর ছাড়াই যদি যাকাত প্রদান বিলম্বিত করে, অতঃপর এ অবস্থায় একটি কিংবা কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তা আদায় করা হয় না, তা পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে তা প্রদান করা হয় না, এভাবে কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কি যাকাত রহিত হয়ে যাবে?

জবাব ঃ আসলে যাকাত একটা অধিকার, আল্লাহ্ তা'আলা তা ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্য পাওয়ার যোগ্য লোকের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট ও ফরয করে দিয়েছেন। এ হিসেবে যাকাত কোন অবস্থায়ই রহিত না হওয়া স্বাভাবিক। কেননা তা ফরয ধার্য হয়েছে, তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক হয়েছে, তা প্রদানে এক বছর বিলম্ব হোক, কি তার অধিক কাল। কিছু কালের অতিক্রমণে প্রমাণিত হক্ বা অধিকার কখনই রহিত হতে পারে না।

ইমাম নববী এ পর্যায়ে বলেছেন, যাকাতদাতার যদি অনেক কয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং এর মধ্যে যাকাত প্রদান না করে, তাহলেও এ সব কয়টি বছরের যাকাত প্রদান করা তার জন্যে বাধ্যতামূলক—সে যাকাত ফরয হওয়ার কথা জানুক আর নাই

---

১. بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤٠ - ٢٤١.
المحلى ج ٦ ص ٣٦٣ ط الاستقامه দেখুন ঃ
الدر المختار بحاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٧٩ - ٨٠.

জানুক। অনুরূপভাবে সে দারুল ইসলামে বসবাসকারী হোক, কি দারুল হরবে। এটা আমাদের মাযহাব।

ইবনুল মুন্‌যির বলেছেন, বিদ্রোহীরা যদি কোন দেশ-শহর-স্থান দখল করে নেয় এবং সেখানকার ধনী লোকেরা যদি ক্রমাগত কয়েক বছরের যাকাত প্রদানে অক্ষম হয়ে থাকে আর তারপর মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তথায় বিজয়ী হয়ে পুনর্দখলে সক্ষম হয়, তা হলে এ অতীত বছরগুলোর যাকাত তখন নিয়ে নিতে হবে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আবূ সওর এ মত প্রকাশ করেছেন। কিয়াসের পক্ষপাতী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, অতীত বছরগুলোর যাকাত তাদের দিতে হবে না। তাঁরা এ-ও বলেছেন, দারুল হরবে কিছু লোক যদি ইসলাম কবুল করে এবং তথায় কয়েক বছর অবস্থান করে, পরে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে এই অতীত বছরগুলোর কোন যাকাত তাদের দিতে হবে না।[১]

আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাজম বলেন[২], যে লোকের ধন-মালে দুই বা ততোধিক বছরের যাকাত অদেয় অবস্থায় জমা হয়ে থাকল অথচ সে জীবিত আছে, তা সবই প্রত্যেকটি বছরের জন্যে সেই সংখ্যানুপাতে প্রদান করতে হবে যা প্রত্যেক বছর তার ওপর ফরয হয়েছে। তা তার ধন-মালসহ পালিয়ে যাওয়ার দরুন হয়ে থাক অথবা সরকার নিয়োজিত যাকাত আদায়কারীর বিলম্বে পৌঁছার কারণ হোক কিংবা তার অজ্ঞতা বা অন্য যে কোন কারণেই হোক এবং তা সে মূল নগদ সম্পদে, কৃষি ফসলে, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে হোক অথবা যাকাত তার সমস্ত মালের ওপর ধার্য হোক কিংবা না-ই হোক তার মাল থেকে যাকাত নিয়ে নেয়ার পর সে মালের দিকে ফিরে আসুক যার ওপর যাকাত ধার্য হয়নি, কি ফিরে না আসুক—এই অবস্থাসমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। ঋণদাতারা কিছুই নিতে পারবে না যতক্ষণ না যাকাত পুরোমাত্রায় আদায় হয়ে যায়।[৩]

সরকার ধার্যকৃত কর যদিও আগে-পিছে হওয়ার ও বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার দরুন আইনের নির্ধারণ অনুযায়ী কমবেশী রহিত হয়ে যায়, কিন্তু যাকাত একটা ঋণরূপেই মুসলিম ব্যক্তির গলায় ঝুলে থাকবে, তার দায়িত্বমুক্তি হবে না, তার ইসলাম

---

১. المجموع ج ٥ ص ٣٣٧ ২. المحلى ج ٦ ص ٨٧।

৩. এ মতটি সহীহ্ কথার ওপর ভিত্তিশীল। যাকাত তো সম্পদের মালিকের দায়িত্বভুক্ত হয়ে যায়, মূল মালের মধ্যে শামিল থাকে না। যখন কারো দায়িত্বে তা ফরয হয়ে গেল, তারপর তার মালের ওপর দিয়ে যদি দুটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়—তার যাকাত দেয়া না হয়, তাহলে এ অতীত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করা তার কর্তব্য হবে। দ্বিতীয় বছর গিয়ে তার যাকাতের পরিমাণ একবিন্দু কমে যাবে না। অনুরূপ যদি নিসাবের পরিমাণের অপেক্ষা বেশী হয়ে যায়, তাতেও যাকাত হ্রাস পাবে না, যদিও তার ওপর কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অতএব তার কাছে চল্লিশটি ছাগল থাকলে—তার ওপর কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়: কিন্তু যাকাত আদায় না করে, তা হলে তার ওপর তিনটি ছাগী ফরয হবে। যদি একশ'টি দীনার থাকে, তাকে সাড়ে সাত দীনার দিতে হবে। কেননা যাকাত তার দায়িত্বে ফরয হয়ে গেছে, তাই নিসাব হ্রাস পেলে তার কোন প্রভাব হবে না। কিন্তু তার যদি অন্য মাল না থাকে, তা হলে তা থেকেই যাকাত দেবে, সে পরিমাণ যাকাত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা ঋণ তো যাকাত ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক। দেখুন: المغني ج ٢ ص ٦٧ – ٦٨।

যথার্থ হবে না, তার ঈমানকে সত্য ও সঠিক মনে করা যাবে না—তা আদায় না করা পর্যন্ত, মাঝখানে যতটি বছরই অনাদায় অবস্থায় অতিবাহিত হোক না কেন।

মৃত্যুতে কি যাকাত রহিত হয়

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ এ মত দিয়েছেন যে, ধনের মালিকের মৃত্যুতে যাকাত রহিত হয়ে যায় না, বরং তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সে যাকাত আদায় করে দিতে হবে—যদি তার অসীয়ত সে নাও করে যায়। এটা আতা, হাসান, জুহরী,কাতাদাহ ও ইমাম মালিকের মত।[১] শাফেয়ী,[২] ইসহাক, আবূ আহ্‌মাদ, সওর ও ইবনুল মুনযিরও[৩] এ মত দিয়েছেন। জায়দীয়া মাযহাবও তাই বলে।[৪] আওযায়ী ও লাইস বলেছেন, অন্যান্য অসীয়ত পূরণের আগেই এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ-সম্পত্তি থেকে তা নেয়া হবে। কিন্তু সে যাকাত আদায় করতে গিয়ে এক–তৃতীয়াংশ পরিমাণ ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

ইবনে সীরীন, শবী, নখ্‌য়ী, হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান, সওরী প্রমুখ বলেছেন, মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করে না গেলে তা আদায় করা যাবে না, অসীয়ত করে গিয়ে থাকলে দেয়া যাবে। আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গিগণ এ মত দিয়েছেন, যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে তার মৃত্যুতে যাকাত রহিত হয়ে যাবে, তাবে অসীয়ত করে গিয়ে থাকলে তা দিতে হবে এবং তা দেয়া হবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক–তৃতীয়াংশ থেকে। যাদের জন্যে অসীয়ত করে গেছে, তারা তো তার ওপর ভিড় জমাবে। আর যদি অসীয়ত করে না যায়, তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে। উত্তরাধিকারীরা তা দিতে বাধ্য হবে না। যদি দেয় তবে তা হবে নফল দান। কেননা যাকাত ইবাদত হলেও তা আদায় করায় নিয়তের শর্ত রয়েছে। তাই যে মরে গেছে তার ওপর ধার্য যাকাত রহিত হয়ে যাবে—নামায ও রোযার মত।[৫]

তার অর্থ ঃ হানাফীরা বলেন, যাকাত না দিয়ে মরলে সে গুনাহগার হয়ে মরল। তার মৃত্যুর পর তার ওপর থেকে তা রহিতকরণের আর কোন উপায়ই নেই—যেমন

---

১. মালিকী মাযহাবের গ্রন্থাবলীতে লিখিত হয়েছে ঃ যাকাত কখনও বের করা হয় মূলধন থেকে, কখনও এক–তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অর্থাৎ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে। সে যদি অসীয়ত করে যায়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ থেকে দেয়া হবে। আর যদি যাকাতের বছর পূর্তির অঙ্গীকার করে এবং তা দেয়ার অসীয়ত করে যায়, তাহলে মূলধন থেকে দিতে হবে। حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٢ জররুক লিখিত شرح الرسالة - ج ٢ ص ١٧٢ গ্রন্থে মালিকের মৃত্যুর বছর—সে যদি তা দিয়ে যেতে না পারে, তাহলে তার মূলধন থেকে দেয়া হবে, কেননা তা সুনির্দিষ্ট। দেখুন ط الاستقامة - بداية المجتهد ج اص ٢٤١

২. নববী বলেছেন, যাকাত ফরয হয়ে যাওয়ার পর তা আদায় করতে সক্ষম হয়েও যদি তা না দিয়েই মরে যায়, তাহলে তার মৃত্যুর দরুন —আমাদের মতে—যাকাত রহিত হয়ে যাবে না। বরং তার মাল থেকে তা আদায় করে দেয়া কর্তব্য হবে। এটা আমাদের মত। দেখুন ঃ المجموع ج ٥ ص ٣٣٥।

৩. المغنى ج ٢ ص ٦٨٣ - ٦٨٤ 8. الازهار شرحه ج ا ص ٤٦٣، البحر ج ٢ ص ١٤٤।

৫. ইমাম আবূ হানীফার এ কথা স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পর্কে। কিন্তু কৃষি ফসল ও গবাদি পশুর পর্যায়ে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেছে—মৃত্যুর পর তা রহিত হয়ে যায় কিংবা তা নিয়ে নেয়া হবে এ বিষয়ে। দেখুন ঃ المجموع ج ٥ ص ٣٣٥ - ٣٣٦ - المحلى ج ٦ص ٨٨ - ٨٩।

নামায-রোযা তরককারী। এজন্যে কোন কোন হানাফী আলিম বলেছেন, 'যাকাত বিলম্বিত করলে এ সময় সে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে উত্তরাধিকারীদের থেকে লুকিয়ে তা আদায় করে দিতে হবে।[১]

প্রথমোক্ত কথা বা মতই সবদিক দিয়ে সহীহ্। কেননা—ইবনে কুদামাহ, যেমন বলেছেন—যাকাত হচ্ছে হক,—অধিকার, অবশ্য পালনীয়। সে বিষয়ে অসীয়ত সহীহ্ হয়। কাজেই মৃত্যুর দরুন তা রহিত হতে পারে না—যার ওপর তা ফরয, তার ওপর থেকে। যেমন অন্য কারো ঋণ পাওনা। তা একটা আর্থিক অবশ্য দেয় অধিকার বিশেষ। অতএব যার ওপর তা ফরয, তার মৃত্যুতে তা রহিত হবে না। এটা ঋণের মতই নামায রোযা থেকে তা ভিন্ন রকমের। কেননা এ দুটি দৈহিক ইবাদত। এ দুটির ব্যাপারে কোন অসীয়ত চলে না। প্রতিনিধিত্বও করা যায় না।[২]

তবে একটি সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে মরে গেল তার ওপর রোযা পালনের দায়িত্ব রয়েছে এরূপ অবস্থায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযা পালন করবে।' অথচ রোযা একটা ব্যক্তিগত দৈহিক ইবাদত বিশেষ। এক্ষেত্রে হাদীস অনুযায়ী মৃত্যুর পর প্রতিনিধিত্ব চলে বলে দেখা যায়। বুঝতে হবে, এটা মহান আল্লাহ্র একটা অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। রোযায় যদি এটা সম্ভব, তাহলে যাকাতের ক্ষেত্রে তো অধিক উত্তমভাবে সম্ভব হওয়া উচিত। কেননা তা একটা আর্থিক অধিকারের ব্যাপার যেমন পূর্বে বলেছি।

যাকাতের ঋণ অপরাপর ঋণের তুলনায়

শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থ المهذب-এর লেখক[৩] বলেছেন ঃ 'যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে এবং সে তা আদায় করতে সক্ষম হয়েও তা প্রদান না করেই মরে গেল, তার এ যাকাত তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা তা একটা আর্থিক অধিকার, যা তার জীবদ্দশায়ই তার ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চেপে বসেছে। তার মৃত্যুর দরুন তা রহিত হয়ে যেতে পারে না—অন্য লোকের প্রাপ্য ঋণের মতই। যদি অদেয় যাকাত ও অন্য লোকের প্রাপ্য ঋণ একত্রিত হয়: কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি যা আছে তা থেকে উভয়টি দিয়ে দেয়া সংকুলান না হয়, তাহলে তা কি করা যাবে এ পর্যায়ে তিনটি মত পাওয়া গেছে ঃ

একটি প্রথমে লোকের ঋণ শোধ করতে হবে। কেননা তার ভিত্তি অত্যন্ত কঠোর ও তাগিদের ওপর সংস্থাপিত। আল্লাহ্র হক্ তার তুলনায় অনেক হালকা ও অগুরুত্ব সম্পন্ন।

দ্বিতীয়, যাকাত সবার আগে দিয়ে দিতে হবে। কেননা নবী করীম (স) হজ্জ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র ঋণ সর্বাধিক অধিকারী যে, তা আদায় করা হবে।[৪]

---

১. এ কথা رد المختار ج ٢ ص ١٤ গ্রন্থে فتح القدير থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
২. المجموع ج ٥ ص ٣٣٢، المغنى لابن قدامة ج ٢ ص ٦٨٣-٦٨٤
৩. المجموع ج ٦ ص ٢٣١
৪. বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের এবং রোযা সম্পর্কে।

এবং তৃতীয়, উভয়ের মধ্যে ত্যক্ত সম্পত্তি-সম্পদ ভাগ করা হবে। কেননা দিয়ে দেয়ার বাধ্যবাধকতার দিক দিয়ে উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ, অতএব উভয়ই আদায় হতে হবে সমান গুরুত্ব সহকারে।

যাকাতকে অপরাপর মানুষের প্রাপ্য ঋণের ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার মতটি জাহিরী মতের লোকদের। আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাজম এ মতটিকে অধিক সহায়তা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে সহীহ্ দলিলসমূহ পেশ করে মতটিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছেন। বলেছেন, 'যদি সে লোক মরে যায় যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে এক বা দুই বছর ধরে তাহলে তা তার মূলধনে গণ্য হয়ে গেছে। তার সাথে মিলে-মিশে স্থিতি পেয়ে গেছে। সে তা নিজে স্বীকার করবে অথবা তার ওপর অকাট্য প্রমাণ আনা হবে। তার সন্তানরা তা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যাবে অথবা 'কালালা' হবে।[১] পাওনাদার, অসীয়ত যাদের জন্যে করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকারী লোকেরা কেউ কোন অধিকারই পাবে না যতক্ষণ সম্পূর্ণ যাকাত পুরামাত্রায় আদায় করে নেয়া না হবে—তা সেই আসল জিনিস, গবাদি পশু ও কৃষি ফসল যে থেকেই নেয়া হোক না কেন, তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

ইবনে হাজম হানাফী প্রমুখদের সমালোচনা করেছেন। যাঁরাই বলেছেন যে, মালের মালিকের মৃত্যুতে তার ওপর ফরয হওয়া যাকাত রহিত হয়ে যাবে। ইবনে হাজমের মতে তাঁরা খুব মারাত্মক ধরনের ভুল করেছেন। কেননা তাঁরা এক ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার ওপর ফরযরূপে ধার্য হওয়া আল্লাহ্র ঋণ সে ব্যক্তির মৃত্যুর দরুন তার ওপর থেকে রহিত বলে ঘোষণা করেছেন কোনরূপ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই। বড় জোর তাঁরা শুধু এতটুকুই বলেছেন যে, যদি তাই হত, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একবিন্দু পরিমাণেরও কেউ উত্তরাধিকারী না হোক, তাই হত প্রত্যেকটি মানুষের কাম্য।

বলেছেন, প্রশ্ন করেছেন, যে লোক অন্য লোকদের ধন-মাল খুব বেশী ধ্বংস করে এ উদ্দেশ্যে যে, তা তার ওপর ঋণ হয়ে চাপবে এবং তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা কেউ কিছু পাবে না, সে সম্পর্কে তোমরা কি বলবে? সে ঋণগুলো যদি ইয়াহুদী বা খৃস্টানদের প্রাপ্য হয় তাদের জন্যে খরচ করা মদের কারণে, তাহলেও তাই হবে? তাহলে কে বলবে যে, এ সবই তার মূলধন থেকে দিতে হবে, তার উত্তরাধিকারীরা কিছু পেল আর না-ই পেল? তাহলে তারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করল চরম লজ্জাকরভাবে এবং আল্লাহ্র সেই পাওনাটা রহিত করে দিল যা তিনি ফকীর-মিসকীন মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন—ঋণগ্রস্ত, দাসত্বশৃংখলে বন্দী, আল্লাহ্র পথে ও নিঃস্ব পথিকের জন্যেও। তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ্র কাছ থেকে ধার্য করা ফরযস্বরূপ অথচ তারা লোকদের পাওনাটা ফেরত দেয়া ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারীদেরকে হারাম খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন?

এ সবই খুব আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক নামায তরককারীর জন্যে নামায ফরয

১. 'কালালা' বলা হয় সে ব্যক্তিকে যার ওয়ারিশ হয় তার পিতামাতা ও সন্তানাদি ছাড়া অন্য কেউ।

মনে করেছেন তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় চলে যাওয়ার পর! কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা লোকদের ওপর থেকে তা প্রত্যাহার করলেন তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে সে তা আদায় করেনি বলে!

আবূ মুহাম্মাদ বলেছেন, 'আমাদের কথা যে সহীহ্ এবং বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য যে বাতিল, তা মহান আল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী আইন সংক্রান্ত আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ

অসীয়ত যা করা হয় তা কিংবা ঋণ আদায় করার পরই।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকারের ঋণকে এ পর্যায়ে সাধারণভাবে গণ্য করেছেন। যাকাতও আল্লাহ্‌র জন্যে নিদিষ্ট একটা ঋণ। সেই সাথে তা মিসকীন, ফকীর, ঋণগ্রস্ত ও অন্যান্য সবার জন্যে—যাদের কথা যাকাতের আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

পরে ইবনে হাজম তাঁর সনদে সেই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যা মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ ও আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ 'আমার মা মরে গেছে, তার ওপর এক মাসের রোযা অপালিত হয়ে আছে। আমি কি তা তার পক্ষ থেকে 'কাজা'স্বরূপ আদায় করব ?' নবী করীম (স) বললেন, তোমার 'মা'র ওপর যদি ঋণ থাকত, তাহলে তুমি কি তা আদায় করতে ?' বলল, 'হ্যাঁ'। বললেন, 'তাহলে আল্লাহ্‌র ঋণ তো বেশী অধিকারী এ দিক দিয়ে যে, তা আদায় করা হবে।'

ইবনে আব্বাস থেকে অপর বর্ণনায়—ইবনে জুবাইর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'তাহলে তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র পাওনা পূরণ কর, কেননা তা পূরণ হওয়ার বেশী অধিকারী।'

বলেছেন, আতা, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ—এঁরা উক্ত হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সকলকে পিছনে ফেলে রেখে ওঁরা নিজেদের মতের ভিত্তিতে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র পাওনাটা রহিত হয়ে যাবে। আর মানুষের পাওনাটা প্রত্যর্পিত হওয়ার বেশী অধিকারী হবে—মানুষের পাওনা পূরণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[২]

ঝগড়া-বিতর্কে ইবনে হাজম ব্যবহৃত রূঢ় তীব্র কটাক্ষ ভাষা ও ভঙ্গী থেকে[৩] দৃষ্টি ফিরিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যেসব দলিল তিনি পেশ করেছেন, কেবল তাই যদি

---

১. سورة النساء – ١١ ২. المحلى ج ٦ ص ٨٩ – ٩١

৩. কোন কোন লোক মনে করেন, ইবনে হাজম অপরাপর মাযহাব ও তার অনুসারীদের বিরোধিতায় এত চরম মাত্রার কঠোরতা ও তীব্রতার পন্থা গ্রহণ করেন যে, তাঁর মহামূল্য ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে আমরা কোন উপকার পাই না। এ পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ইবনে হাজম সম্পর্কিত এ কথাটি

বিবেচনা করি, তাহলে তাকীদ সহকারে এ কথা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, যাকাত একটা মৌলিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য, আগে পরে হলেই বা কারোর মৃত্যুতে তা রহিত হয়ে যায় না, পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি থেকেও তা অবশ্যই নেয়া হবে এবং অন্য সর্বপ্রকারের পাওনার ওপর তা অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব পাবে। অন্যান্য ঋণের স্থান তার পরে হবে। এভাবেই ইসলাম আধুনিক অর্থনৈতিক বিধান রচনার ক্ষেত্রেও অগ্রবর্তী অবদান রাখতে পেরেছে। আধুনিক অর্থনীতি ও সরকারের আর্থিক অধিকার অপরাপর ঋণও অধিকারের ওপর স্থান দিয়েছে। সেগুলো সব পরে বিবেচিত হতে পারে।[১]

আমরা স্বীকার করি না। বরং তিনি যে সব উচ্চমানের চিন্তা-বিবেচনাপূর্ণ কথা উপস্থাপন করেন, তা আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে চেষ্টা করতে হবে। তীব্রতা-রূঢ়তা যা আছে তা তাঁর ওপর থাক। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিয়ত অনুযায়ীই ফল পাবেন। তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ তো আল্লাহ্র কাজ। আর এ তো জানা কথা যে, সব মানুষই তার কথাবার্তার দরুনও পাকড়াও হবে। নিষ্কৃতি পাবেন কেবল নবী করীম (স)।

১. مبادى النظرية العامة للصريبة للدكتور عبد الحكيم الرفاعى، وحسين خلاف ص ١٤٣

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাকাত প্রদান পর্যায়ে বিভিন্ন-বিক্ষিপ্ত আলোচনা

যাকাত রহিত করার উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন

যাকাত এড়িয়ে যাওয়ার বা তা প্রদান থেকে পালিয়ে বেড়ানো কি জায়েয ? অন্য কথায়, যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তার ওপর থেকে তা রহিতকরণের উদ্দেশ্যে কোন কৌশল অবলম্বন করা কি জায়েয ?

ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত

ইবনে তাইমিয়া القواعد النورانيه। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আবূ হানীফা যাকাত রহিত করানোর উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করা জায়েয মনে করেন। বলেছেন ঃ তবে তাঁর সঙ্গীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন—এরূপ করা মাক্‌রূহ, কি মাক্‌রূহ্ নয় ? ইমাম মুহাম্মাদ মাকরূহ্ মনে করেন, ইমাম আবূ ইউসুফ মাক্‌রূহ্ মনে করেন না।

বলেছেন, যাকাত প্রত্যাহার করানোর লক্ষ্যে কৌশল অবলম্বন করাকে ইমাম মালিক হারাম বলেছেন। এরূপ কৌশল সত্ত্বেও তা ফরযই থাকবে। ইমাম শাফেয়ী যাকাত রহিত করানোর উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করা মাক্‌রূহ বলেছেন।

কিন্তু ইমাম আহ্‌মাদ এ কৌশল অবলম্বন পর্যায়ে ইমাম মালিকের মতই কথা বলেছেন। অর্থাৎ যাকাত রহিত করানোর জন্যে কৌশল করাকে তিনিও 'হারাম' বলেছেন। কৌশল সত্ত্বেও তা ফরযই থাকবে। সূরা নূন[১] ও অন্যান্য দলিল প্রমাণ[২] থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া যা লিখেছেন, তা আবূ ইউসুফের নিজ রচিত 'কিতাবুল খারাজ'-এ স্পষ্ট ভাষায় বলা কথার বিপরীত। তিনি তাতে অকাট্য ভাষায় বলেছেন ঃ 'যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা অপ্রস্তুত হওয়া এবং তা নিজের মালিক না থেকে সমষ্টির মালিকানায় বণ্টন করার জন্যে না দেয়া—যেন তার থেকে যাকাত রহিত হয়ে যায় এমন উপায়ে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি উট, গরু ও ছাগলের এমন পরিমাণের মালিক হবে যার ফলে কারোর ওপরই যাকাত ফরয হবে না—হালাল হতে পারে না। কোন কারণ বা অবস্থার দরুন যাকাত রহিত করার কৌশলও কেউ করতে পারে না।[৩]

---

১. জান্নাতবাসীদের কিস্‌সার কথা মনে করা হয়েছে। ইবনে কুদামাহ্‌র বর্ণনায় তা একটু পরই আসছে।

২. القواعد النورانيه – ص ৮৭ ৩. كتاب الخراج لابى يوسف ص ৮০

উপরিউক্ত কালাম স্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ যাকাত রহিতকরণ এবং কোন কারণ বা অবস্থার দরুন তা প্রত্যাহার করানোকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া যা বলেছেন এবং আবূ ইউসুফ সম্পর্কে যে কথা খুব ছড়িয়ে পড়েছে, তা হচ্ছে ঃ কৌশল বিচারে কার্যকর হবে, যদিও ঈমানদারীর দিক দিয়ে তা জায়েয নয়।

হানাফী ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহে স্পষ্টভবে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ কোন কোন কৌশল মাকরূহ্ এবং কোন কোনটা মাক্‌রূহ্ নয়।

তাঁরা আরও বলেছেন, যাকাতকে সম্পদ মালিকের অভাবগ্রস্ত পিতামাতার দিকে ফেরাবার জন্যে কৌশল করা—এভাবে যে, তা এক ফকীরকে দিয়ে দেয়া হবে, সে ফকীর তা মূল মালিকের পিতামাতাকে দেবে—মাকরূহ্। তাঁদের বেশীর ভাগ কিতাবেই এ কথাটি আলোচিত হয়েছে।

আর তাঁরাই যখন বলেছেন, যাকাত মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে না, মৃতের কাফন খরিদ করায় ব্যয় করা যবে না, তা দিয়ে ঋণ শোধ করা যাবে না—ইত্যাদি। বলেছেন, ওসব জিনিসের জন্যে তা দেয়ার কৌশল করা এভাবে যে, সহীহ্‌ভাবেই এক ফকীরকে যাকাত দেয়া হবে, পরে তাকেই এসব কাজ করতে আদেশ করা হবে, তাতে যাকাতের সওয়াব তো সে পাবেই, ফকীরও ওসব কাজের সওয়াব পাবে। যেমন এ ক্ষেত্রে তাঁরা বলেছেন, ফকীরের অধিকার আছে; সে চাইলে উক্ত আদেশ সে অমান্য করবে। কেননা তাকে মালিক বানানো সহীহ্ হওয়ার অনিবার্য দাবিই হচ্ছে এই। বাহ্যত এতে কেন সংশয় নেই। কেননা সে তো তার মালের যাকাতের মালিক তাকে বানিয়ে দিয়েছে, তার পরে তার ওপর যে শর্ত চাপিয়েছে, তা অবশ্য 'ফাসেদ'—অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু হেবা—দানও যাকাত 'ফাসেদ' শর্তের দরুন 'ফাসেদ' হয়ে যাবে না।[১]

কিন্তু লক্ষণীয় যে, যাকাতকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার এসব কৌশলের মধ্যে কিছু মাকরূহ আর কিছু মাকরূহ নয়। তবে সম্পদের মালিকের ওপর থেকে যাকাত রহিতকরণ পর্যায়ে হানাফীদের গ্রন্থাবলীতে—যা আমি দেখতে পেয়েছি—স্পষ্টভাবে জায়েয বলার কেন কথা লিখিতভাবে পাইনি।

মালিকী মতের লোকেরা কৌশল হারাম বলেন ও তার প্রভাব বিলুপ্ত করেন

মালিকী মতের লোকদের দৃষ্টিতে ঈমানদারীর দিকে দিয়ে কৌশল করা জায়েয নয় এবং বিচারে তা কার্যকর হবার নয়।

এজন্যে তাঁরা বলেছেন, যার কাছে নিসাব পরিমাণ মাল-সম্পদ রয়েছে, তার ওপর যাকাত ফরয হয়,—যেমন গবাদি পশু—সে যদি তার সবটা বা কিছু অংশ বছরান্তে কিংবা তার অল্প পূর্বে—যেমন একমাস পূর্বে—সেই প্রজাতীয় অন্য গবাদি পশু দ্বারা

---

১. الدر المختار وحاشيه ج ٢ ص ٦٩

বদল করে ফেলে, যেমন পাঁচটি উটকে চারটি দ্বারা বদল করল অথবা অন্য প্রজাতীয় পশু দ্বারা—যেমন উট বদল করে ছাগল বা এর উল্টা বদল করে নিল। এ ধরনের পশু নিসাব পরিমাণ হোক কি তার কম, কিংবা তা বদলানো নগদ টাকায় বা দ্রব্যাদিতে বা তার পশু যবেহ্ করে ফেলল বা এ ধরনের অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করল এবং জানা গেল যে, সে তা করেছে যাকাত এড়াবার উদ্দেশ্যে বা যাকাত ফরযরূপে ধার্য হতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে তা তার নিজের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যাক বা অবস্থার লক্ষণ দেখে, এরূপ পরিবর্তন বা এ ধরনের অন্য কোনরূপ হস্তক্ষেপে বদলে দেয়া মালের ওপর যাকাত ফরয হওয়া রহিত হতে পারে না। বরং তার যাকাত অবশ্যই নেয়া হবে—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে আচরণ করতে হবে। বদলের পর যে জিনিস এসেছে তার যাকাত বেশী হলেও তা নেয়া হবে না। কেননা বদলানো জিনিসের মালিকানার মেয়াদ এক বছর না হওয়ার কারণে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না।

এটা এজন্যে যে, মায্হাবে এটা সিদ্ধান্ত যে, ইবাদতে কৌশল যেমন কোন ফায়দা দেয় না, তেমনি লেনদেন—মুয়ামিলাতেও নয়।

তাঁরা বলেছেন, বাতিল কৌশল হচ্ছে ঃ মালিক তার মাল সম্পদ সম্পূর্ণ বা তার অংশ বছর পূর্তির কাছাকাছি সময়ে তার সন্তান বা তার ক্রীতদাসের নামে হেবা করে দিল, যেন পরবর্তী সময়ে বছর পূর্তি হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর যাকাত ফরয দাঁড়াতে না পারে। পরে তা তার কাছ থেকে নিঙড়িয়ে বা কেড়ে নিয়ে নেবে। তখন তার ধারণা মতে মালিকানার কেবল সূচনা কাল হবে। এরূপ কৌশল স্বামী করে থাকে স্ত্রীকে দিয়ে। পরে তাকে বলে, 'আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম, তা আমাকে ফিরিয়ে দাও, এবং তা করা হবে যাকাত এড়াবার উদ্দেশ্যে। তা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে যাকাত নেয়া হবে এবং তারও কর্তব্য হবে তা প্রদান করা।[১]

হাম্বলী মতের লোকেরা মালিকী মতের লোকদের মতই

ইবনে কুদামাহ্ তাঁর المغنى। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'আমরা বলে এসেছি, নিসাব পরিমাণ সম্পদ অন্য জাতীয় জিনিসের সাথে অদল-বদল করা বছর শেষ হওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ করে, তবে তাতে যাকাত রহিত হবে না। তা গবাদি পশু বদলানো হোক, কি নিসাবের অন্য কোন জিনিস। অনুরূপভাবে কেউ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে কিছু অংশ নষ্ট করে নিসাব হয় না প্রমাণের উদ্দেশ্যে—যেন তার ওপর যাকাত ফরয না হয়, তাতেও যাকাত রহিত হবে না। বছর শেষ হলেই তার কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নেয়া হবে, যদি তা বদলানো ও বিনষ্ট করা ফরয হওয়ার কছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। আর তা যদি বছরের শুরুতে করে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা যাকাত এড়িয়ে যাওয়ার জিনিসই নয়।

এই যা বলা হল, মালিক, আওজায়ী, ইবনুল মাজেলূন, ইসহাক ও আবূ উবাইদ প্রমুখও তাই বলেছেন।

---

১. দেখুন ঃ بلغة السالك وحاشية ج ١ص ٢١٠.

আবূ হানীফা ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ তার যাকাত রহিত হবে। কেননা তার সম্পদ বছর পূর্তির পূর্বেই নিসাব পরিমাণের চাইতেও কম হয়ে গেছে। তাই তার ওপর যাকাত ফরয থাকবে না। যদি তার নিজের প্রয়োজনে নষ্ট করা হয়, তা হলেও তা-ই।

ইবনে কুদামাহ্ বলেছেন-আমাদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কথা ঃ

انَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَابَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ج اِذْاَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ - وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ - فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ -

আমরা এ (মক্কার অধিবাসী) লোকদেরকে সেরূপ পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন একটি বাগানের মলিকগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছিলাম, তারা যখন কিরা-কসম করে বলল আমরা খুব সকাল বেলা অবশ্য-অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল পাড়ব। তারা এ কথার কোনরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভবনা রাখছিল না। রাতের বেলা তারা নিদ্রামগ্ন হয়। এ সময় তোমার আল্লাহ্র কাছ থেকে একটি বিপদ সেই বাগানের ওপর আপতিত হল এবং তার অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মত হয়ে গেল।[১]

আল্লাহ্ এ লোকদের শাস্তি দিলেন এজন্যে যে, তারা যাকাত এড়াতে চেয়েছিল এবং এজন্যে যে, যে ফকীর-মিসকীনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, তা যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে ও তাদের অংশ রহিত হয়, তার জন্যে চিন্তা ও চেষ্টা করেছিল কিন্তু এতে যাকাতের দায়িত্ব রহিত হয় না। যেমন কেউ যদি মুমুর্ষাবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তার মীরাসের অংশ রহিত হবে না। আর এজন্যে যে, সে একটা খারাপ উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছে, তার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে তার শাস্তি প্রদান সুবিচারের ঐকান্তিক দাবি। যেমন কেউ যদি সে যার উত্তরাধিকার পাবে তা পাওয়াকে তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে, তাহলে শরীয়াত তাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে এই অপরাধের শাস্তি দেয়।[২]

কিন্তু মালিক যদি তার নিজের প্রয়োজনে কিছু পরিমাণ মাল বিনষ্ট করে, তাহলে তার অবস্থা ভিন্নতর হবে। কেননা সে কোন খারাপ উদ্দেশ্যে তা করেনি। অতএব সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্যও হয়নি।

জায়দীয়া মতের লোকেরা কৌশল অবলম্বন হারাম মনে করেন

এ ব্যাপারে জায়দীয়া ফিকাহ্ অনেকটা বিস্তারিত কথা বলেছে। এ ফিকাহ্র অনুসারীরা বলেছেন, যাকাত রহিত করার উদ্দেশ্যে কৌশল করা জায়েয নেই। এ ব্যাপারে দুটি অবস্থা—একটি হচ্ছে, ফরয হওয়ার পূর্বে (আর সূক্ষ্মভাবে বললে, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার পর।

---

১. سورة ن القلم ١٧ - ٢٠

২. المغنى المطبوع مع الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٢٤ - ٥٢٥

ফরয হওয়ার আগের কৌশল—যেমন কেউ নগদ সম্পদের নিসাব পরিমাণের মালিক হল। তার ওপর একটি পূর্ণ বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই সে তদ্দ্বারা এমন কোন জিনিস ক্রয় করল যার ওপর যাকাত ফরয হয় না—যেমন খাদ্য, উদ্দেশ্য হচ্ছে যাকাত রহিত করার জন্যে কৌশল করা। এটা জায়েয নেই। তা করলে গুনাহ্গার হবে—যদিও যাকাত ফরয হবে না।

এদের ফিকাহ্বিদদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এরূপ করা মুবাহ্। যাকাত ফরয ধার্য হওয়ার পর কৌশল করা—যেমন তা ফকীরকে দিয়ে দিল ও শর্ত করল তা থেকে ফিরিয়ে দেয়ার, এ শর্তের সাথে একটা চুক্তিও করল। যেমন—বলল—আমি আমার যাকাত থেকে এ জিনিসটি তোমাকে দিচ্ছি এই শর্তে যে, তুমি ওটি আমাকে ফিরিয়ে দেবে। এরূপ করা জায়েয নয়। এরূপ করলে যাকাত রহিত হবে না। মাযহাবে এ নিয়ে কেন মতভেদ নেই।

যদি শর্ত আগে আসে—যেমন এক সাথে সংঘটিত হল—দেয়ার পূর্বে ফিরিয়ে দেয়ার, পরে তা ফকীরকে দিল কেনরূপ শর্ত ছাড়াই—যা এক সাথে ঘটে গেছে, মাযহাবের বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ করা জায়েয নয়। এতে যাকাত আদায় হবে না। অপর কিছু লোক বলেছেন, যাকাত হবে, তবে মাক্রূহ তাহ্রীমী সহকারে।

মাযহাবের এ মতের কারণ হচ্ছে, এর ফলে ফকীরদের অধিকার রহিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তা তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। এরূপ করা হলে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, যা বিধান দিয়েছেন তা বাতিল করা হয়। আর যে কৌশলের পরিণতি হবে শরীয়াতের বিধানদাতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তা-ই হারাম। এ আচরণ তার সুফলও নিঃশেষ করে দেয়।[১]

তাঁরা যেমন যাকাত রহিত করার লক্ষ্যে কৌশল করতে নিষেধ করেছেন, তেমনি তা গ্রহণ বা পাওয়ার লক্ষ্যে কৌশল করাকেও নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ

যার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়, তার পক্ষে তা পাওয়ার জন্যে কৌশল করাও জায়েয নেই। তা পাওয়ার জন্যে কৌশলের দুটি রূপ হতে পারে ঃ

একটি এই যে, ফকীর কৌশলস্বরূপ যাকাত নিল, যেন সে নিতে পারে তার জন্যে, যার জন্যে তা জায়েয নেই—যেমন হাশেমী বংশের লোক বা ধনী, নিজের সন্তান, পিতা বা অন্য যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক নয়। এরূপ করা জায়েয নয়, এতে যাকাত আদায়ও হবে না। তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব হবে।

এ কথার একটা ব্যতিক্রম তাঁরা স্বীকার করেছেন। তা হচ্ছে কোন হাশেমী ফকীর ব্যক্তিকে দেবার জন্যে যদি গ্রহণ করে বা এ ধরনের কিছু। এরূপ করা জায়েয—যদি পারস্পরিক আনুকূল্যের কথা পূর্বাহ্নে হয়েও থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, বিশেষভাবে ধনাঢ্যতার কারণে যার জন্যে যাকাত মোটেই

---

১. شرح الازهار وحواشيه ج ١ص ٥٣٩ - ٥٤٠.

হালাল নয়, সে যদি তার মালিকানা সম্পদ পরের মালিকানায় দিয়ে দেয় নিজে দরিদ্র সাজার উদ্দেশ্যে, যেন তার জন্যে যাকাত গ্রহণ হালাল হয়। মায্হাবের বক্তব্য হল, এরূপ করাও জায়েয নয়। কেউ কেউ এ শর্ত দিয়েছেন যে, এরূপ যদি সে করে বেশী সম্পদ করার উদ্দেশ্যে, এ উদ্দেশ্যে নয় যে, সে আয় বৃদ্ধির সময় পর্যন্ত তার জন্যে যা যথেষ্ট হয় তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, তা জায়েয হবে।[১]

সারকথা, কৌশলের লক্ষ্য যদি হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান, শরীয়াতের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে আনুকূল্য করা, হারাম থেকে ফিরে থাকা, তা হলে তা জায়েয। আর তার লক্ষ্য যদি হয় শরীয়াতের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করা, তা হলে তা জায়েয হবে না। আমরা যদি তা মোটামুটি জায়েয বলিও তাহলে সব হারামই হালাল হয়ে যাবে।[২]

الازهار। গ্রন্থের টীকায় শাওকানী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ ' যে পরিণাম থেকে রক্ষা নেই, তা হচ্ছে প্রতিটি কৌশলই আল্লাহ্র ঘোষিত হারামকে হালাল করে দেবে কিংবা হালালকে করে দেবে হারাম। কৌশলকে সহীহ্করণ শরীয়াতের কাজ নয়—না আমদানীতে, না দিয়ে দেয়ায়।[৩]

যাকাতদাতা ও গ্রহীতা কি বলবে

রাষ্ট্র সরকারসমূহের ধার্যকৃত সাধারণ কর প্রথা থেকে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা যে বহু দিক দিয়েই ভিন্নতর, যাকাতের যে একটি আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে, যা সাধারণ কর প্রথায় নেই এবং এ হিসেবে যাকাত যে অধিক উন্নত এক মানবিক ব্যবস্থা, এক্ষণে আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাচ্ছি। আমাদের এ দৃষ্টি এ কারণেও যে, ইসলামী জবীন-ব্যবস্থায় যাকাত ইবাদতের গুণেও মহীয়ান হয়ে রয়েছে।

একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, যাকাত সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি তার হস্তে যখন যাকাত দ্রব্য অর্পণ করা হবে তখন সে দাতার জন্যে দো'আ করতে আদিষ্ট হয়েছে। এ দো'আ একে তো যাকাতদানে কোনরূপ বিলম্ব না করা ও সেজন্যে দ্রুততাবলম্বন করার জন্যে তাকে উৎসাহ দান করবে। সেই সাথে তাকে এ কথাও জানিয়ে দেবে যে, যাকাতদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে পরিপূর্ণ সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের উভয়কে সহ মুসলিম সমাজকে দুনিয়ার অন্যান্য সব ধর্ম ও মিল্লাতের লোক এবং জবরদস্তিমূলক করদাতা লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তুলবে। এই দো'আ করার কাজটি মহান আল্লাহ্র আদেশ পালন স্বরূপ হয়ে থাকে। কেননা তিনি বলেছেন ঃ

> (ধনী) লোকদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি তাদের পবিত্র কর ও পরিশুদ্ধ কর তার দ্বারা এবং তাদের প্রতি উচ্ছমানের রহমতের দো'আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দো'আ তাদের জন্যে বড় সান্ত্বনা বিশেষ।

---

১. شرح الازهارج ١ ص ٥٤٠ - ٥٤١

২. البحرج ١ ص ١٨٧ এবং দেখুন ঃ حواشى الازهارج ١ ص ٥٣٩

৩. ঐ, ২৪০ পৃঃ।

আয়াতের কথা وَصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থ তুমি তাদের জন্যে উচ্চমানের রহমতের দো'আ কর। যাকাতদাতাদের মনের ওপর এ দো'আর ক্রিয়া ও প্রভাব কি হতে পারে তাও আল্লাহ্ তা'আলা এই সঙ্গেই বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে পরম সান্ত্বনা, সুগভীর নিশ্চিন্ততা ও অস্বস্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতি-দৃঢ়তা বোধ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা বর্ণনা করে বলেছেন, লোকেরা যখন তাদের যাকাতের মাল নিয়ে আসত, নবী করীম (স) তাদের জন্যে দো'আ করতেন। বলতেন 'হে আল্লাহ্, তুমি এদের প্রতি পূর্ণাঙ্গ রহমত নাযিল কর।' আবূ আওফাও তাঁর যাকাত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন, তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ হে আমাদের মহান আল্লাহ্! তুমি আবূ আওফার লোকদের প্রতি পূর্ণ মাত্রার রহমত বর্ষণ কর।[১]

এই দো'আর জন্যে কোন স্থায়ী বা সুনির্দিষ্ট ভাষা নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ (যাকাতদাতা যখন যাকাত দেয় তখন গ্রহীতা এই কথা বলুক,) এটাই আমি পসন্দ করি ঃ

> আল্লাহ্ তোমাকে পূর্ণ শুভ ফল দান করুন যা তুমি দিলে সেজন্যে এবং তাকে তোমার জন্যে পবিত্রকারী বানিয়ে দিন, এবং তোমার কাছে যা অবশিষ্ট রয়েছে তাতে আল্লাহ্ তোমাকে বরকত ও প্রবৃদ্ধি দান করুন।[২]

নাসায়ী বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ নবী করীম (স) একটি লোকের জন্যে দো'আ করেছিলেন, যে লোক একটি সুন্দর উষ্ট্রী পাঠিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্, তুমি তার মধ্যেও এবং তার এই উষ্ট্রীতে বরকত দাও।[৩]

একটি প্রশ্ন, এরূপ দো'আ করা কি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ? উপরিউক্ত আয়াতে যা আদেশ রয়েছে, তাতে বাহ্যত মনে হয়, দো'আ করা ওয়াজিব। জাহিরী ফিকাহ্ ও শাফেয়ী মাযহাবের কিছু লোকের এটাই মত। জমহুর ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ বলেছেন দো'আ করা ওয়াজিব হলে নবী করীম (স) তাঁর নিয়োজিত যাকাত কর্মচারীবৃন্দকে তা শিক্ষা দিতেন ও আদেশ করতেন—হযরত মুযায (রা)-কেও বলতেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি।[৪]

উপরিউক্ত কথাটি অ-গ্রহণযোগ্য। কেননা এজন্যে নবী করীম (স) উপরিউক্ত আয়াতটিকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। আর হযরত মুযায (রা)-এর মত লোকদের কাছে তা আদৌ গোপন থাকতে পারেনি।

তাঁরা আরও বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান ঋণ ও কাফ্‌ফারা ইত্যাদি বাবদ আর যত কিছুই গ্রহণ করে থাকেন, সেজন্যে তার দো'আ করার দায়িত্ব নেই। যাকাতও সে-ই গ্রহণ করে।[৫] এর জন্যে আলাদা কোন দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা কুরআনের উক্ত

---

১. المنتقى গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত, 'নাইলুল আওতার', ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩ পৃ.।

২. سنن النسائى - كتاب الزكاة ج ٥ ص ٣٠ ৩. الروضة للنووى ج ٢ ص ٢١١

৪. দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ص ١٥٣ ৫. نيل الاوطار، ج ٤ ص ١٥٢-١٥٣

আয়াতে দো'আ করার আদেশটি কেবল মাত্র যাকাত প্রসঙ্গেই, অন্য কেন কিছু প্রসঙ্গে নয়। তাও এজন্যে যে, দ্বীন-ইসলামে যাকাতের স্থান ও মর্যাদা অনেক বড় ও উচ্চ। আর তা বাধ্যতামূলক ও আবর্তনশীল অধিকারের ব্যাপারও। অতএব তাতে উৎসাহ দান খুবই উত্তম, এই কাজে দাতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা খুবই প্রয়োজনীয়।

এই দো'আ করাটা বিশেষভাবে নবী করীম (স)-এর জন্যে বাধ্যতামূলক। কেননা তাঁর দো'আয় লোকদের জন্যে নিশ্চিত সান্ত্বনার বিষয় নিহিত। অন্যদের ব্যাপার সেরূপ নয়। এটা স্থিতিদান সেই সংশয়ের জন্যেও; যার অধীন হযরত আবূ বকর (র)-এর খিলাফতকালে যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকেরা মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল। কোন একজন সাহাবীও তার সমর্থন দেননি। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, আয়াতটির প্রথম অংশ সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও শেষাংশ কেবল রাসূল (স)-এর জন্যে নির্দিষ্ট মনে করা যেতে পারে কিভাবে ? অতএব অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কথা হচ্ছে, আদেশটি তার আসলরূপে অবশিষ্ট থাকবে, তা কার্যটিকে ওয়াজিব প্রমাণ করছে। আর বিশেষভাবে যাকাতের প্রকৃতির সাথে এর সাযুজ্য সুস্পষ্ট। তার ওপর ইসলামের যে দৃষ্টি ও গুরুত্ব আরোপ, তাও এরই সমর্থক। এ ছাড়া মানুষ সাধারণত যে সব 'কর' ধার্য করে থাকে, তা থেকে যাকাতের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর দ্বারা।

দ্বিতীয় বিশিষ্টতা হচ্ছে, যাকাতদাতার হৃদয় যাকাতের প্রতি খুবই সন্তুষ্টিসিক্ত থাক—এটাই কাম্য। আল্লাহ্ তার দেয়া যাকাত কবুল করুন এই ভাবধারা ও মিনতিতে তার হৃদয় ভরপুর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ যেন তা তার জন্যে 'গনীমত' বানান, জরিমানা নয়, এই দো'আও সে সব সময় কাতর কণ্ঠে করতে থাকে। রাসূলে করীম (স) সে শিক্ষাই তো দিয়েছেন আমাদেরকে। তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন যাকাত দেবে, তখন তার সওয়াবের কথাটা ভুলে থেকো না। তখন তোমরা বলবে ঃ হে আল্লাহ্ এই যাকাতকে গনীমতের মাল বানাও, তাকে জরিমানার মাল বানিও না।[১]

হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, যার ওপর যাকাত ফরয সে যখন ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেই পাওয়ার-যোগ্য-ফকীর কিংবা সরকার নিয়োজিত কর্মচারীকে দেবে তখন যেন এই দো'আর কথা সে ভুলে না যায়—উপেক্ষা না করে। তাহলে তার জন্যে এর সওয়াব পূর্ণত্ব পাবে। এ দো'আর তাৎপর্য হচ্ছে, হে আল্লাহ্! এই যাকাতের দরুন আমার মন ও মানসকে পবিত্র, একনিষ্ঠ ও নিষ্কলুষ বানাও, যেন আমি তা প্রদান করাকে গনীমত এবং আমর দ্বীনী ও বৈষয়িক জীবনে এবং পরকালে আমার জন্যে খুবই লাভজনক মনে করতে পারি। এটাকে যেন আমি জরিমানা মনে না করি, যা জোরপূর্বক নেয়া হয় ও অসন্তুষ্ট চিত্তে দেয়া হয়।

---

১. হাদীসটি ইবনে মাজা কর্তৃক উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, ১৭৯৭ সংখ্যা। আবদুর রাজ্জাক তাঁর জামে গ্রন্থেও এই হাদীসটি এনেছেন। সয়ূতী তাঁর الجامع الكبير গ্রন্থে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।—হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি হাদীসটির 'যয়ীফ' হওয়ার দিকেও ইশারা করেছেন। মুনাভী الفيض গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ২৯০ পৃঃ) বলেছেনঃ হাদীসটি খুব বেশী 'যয়ীফ' নয়। যেমন ধারণা করা হয়েছে। لا اصل -এ বলা হয়েছে, যয়ীফ। তা এজন্যে যে, সুয়াইদ ইবনে সায়ীদ তার একজন বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে পরিত্যক্ত। দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ ص ١٠٢ - ١٠٣

তিরমিযী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রাসূলের কথা রয়েছে ঃ 'আমার উম্মত যদি পনেরটি নৈতিক কাজ করে, তাহলে তার ওপর মুসিবত নেমে আসবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ 'আমানতকে যখন গনীমতরূপে গ্রহণ করা হবে' আর যাকাতকে যখন জরিমানা মনে করা হবে।[১] আর কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি তার আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে এই বলে যে, তার যাকাতকে যেন জরিমানা বানানো না হয়, তাহলে তিনি তাঁর মন ও তাঁর উম্মতকে বিপদের কারণসমূহ থেকে দূরে রাখবেন ও রক্ষা করবেন।

এ কথা এ ভিত্তিতে বলা হচ্ছে যে, হাদীসের শব্দ عطيتم। কর্তাবাচক হবে। শব্দটি কর্তৃবাচকও হতে পারে। মুনাভী তাই বলেছেন। তখন সম্বোধনটা যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের প্রতি নিবদ্ধ ধরা হবে। অর্থ হবে, যাকাত পাওয়ার যোগ্য হে লোকেরা, তোমাদেরকে যখন যাকাত প্রদান করা হবে, তখন তোমরা যাকাতদাতার এই দয়া ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একথা বলতে ত্রুটি করো না ঃ 'হে আল্লাহ্ তুমি এই লোকের জন্যে এই যাকাতকে গনীমত বানিয়ে দাও, তার উপর তাকে জরিমানাস্বরূপ চাপিয়ে দিও না।[২]

পাওয়ার যোগ্য লোকদের পক্ষ থেকে যে 'উকীল' বা প্রতিনিধি হবে—সে রাষ্ট্রপ্রধান হোন বা তাঁর প্রতিনিধি, এরূপ দো'আ করা তাঁর জন্যেও কর্তব্য হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ وصل عليهم এর এটাই তাৎপর্য।

যাকাত প্রদানে উকীল নিয়োগ

কোন মুসলিম নিজের যাকাত নিজেকেই প্রদান করতে হবে, এমন কথা নেই। বরং সে অপর একজন মুসলিম বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে এ কাজের জন্যে দায়িত্বশীল বানাতে পারে। সে তার পক্ষ থেকে তার যাকাত প্রদান করবে। ثقة —'বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য' বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিকে যার আমানতদারীর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে যে, সে যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যেই তা যথাযথভাবে বিতরণ ও বণ্টন করে দেবে। অবিশ্বাস্য ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ওপর এ দায়িত্ব দিয়ে বণ্টন পর্যায়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কোন কোন ফিকাহ্বিদ সেজন্যে শর্ত আরোপ করেছেন যে, সে 'উকীল'কে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কেননা যাকাত একটা বিশেষ ইবাদত। অমুসলিম ব্যক্তির পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, শোভন নয়। অন্যরা বলেছেন, যাকাত প্রদানের জন্যে কোন 'যিম্মী' (ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিক)-কে 'উকীল' বানানো জায়েয হতে পারে যদি যাকাতদাতা নিজে নিয়তের কাজটা করে। তার নিয়তই যথেষ্ট হবে।[৩]

---

১. হাদীসটির সনদ যয়ীফ 'নাইনুল আওতার' গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে।

২. الفيض। গ্রন্থের ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, বোঝা যায়, এরূপ বলা মুস্তাহাব। যদিও তারা তার উল্লেখ না করে। কেননা এ হল ফযীলতের কাজ। একটা মৌল নীতির অধীন। তা হচ্ছে, যাকাতদাতার জন্যে দো'আ চাওয়া।

৩. দেখুন ঃ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٤٩٨

আমি মনে করি, কোন বিশেষ কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের জন্যে 'উকীল' বানানো কেবলমাত্র তখনই জায়েয হতে পারে, যদি এ নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা থাকে যে, সে দাতার আগ্রহ—অনুরূপ বিশ্বস্ততা রক্ষা করে যাকাত প্রদান করতে সক্ষম হবে।

মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, দাতার যাকাত প্রদানের জন্যে কাউকে প্রতিনিধি বানানো একটা মুস্তাহাব ব্যাপার। রিয়াকারী ও দেখানোপনা থেকে বাঁচার জন্যে এটা করা যেতে পারে। তার এ ভয়ের উদ্রেক হতে পারে যে, সে নিজেই যদি যাকাত বণ্টন করার দায়িত্ব পালন করতে যায়, তাহলে লোকদের প্রশংসা ও স্তুতি পাওয়ার ইচ্ছা তার মনে জাগতে পারে। তাহলে রিয়াকারী হবে।

যদি নিজ সম্পর্কে কেউ এতটা সচেতন হয়, তাহলে তার যাকাত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে বন্টন করানো ওয়াজিব। কেবল ভয়েরই ব্যাপার নয়, কে যাকাত পাওয়ার যোগ্য তা যদি দাতার জানা না থাকে, তাহলে তার উচিত হবে এমন ব্যক্তিকে বন্টনকারী বানানো, যে তা যথাস্থানে স্থাপন করতে ও তা পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে দিতে পারবে।[১]

যাকাত প্রকাশ্যভাবে প্রদান

ইমাম নববী বলেছেন, যাকাত প্রদানে প্রকাশনীতি অবলম্বন উত্তম যেন অন্য লোকেরা তা দেখেতে ও জানতে পারে। তাহলে তারাও অনুরূপ কাজ করবে, তার প্রেরণা ও উৎসাহ পাবে। অন্যথায় লোকেরা খারাপ ধারণা করে বসবে। এটা ঠিক ফরয নামায আদায়ের মত। তা প্রকাশ্যভাবে পড়াই পসন্দনীয়। গোপন করা মুস্তাহাব শুধু নফল নামায-রোযা-দান ইত্যাদি।[২]

তা এজন্যে যে, যাকাত হচ্ছে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। তা প্রকাশ করা, তার বিরাটত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং সে বিষয়ে চারদিকে জানাজানি করা খুবই সঙ্গত ও কাম্য তাতে দ্বীনকে যেমন শক্তিশলী করা হয়, তেমনি মুসলিমদের ব্যক্তিত্বও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। যাকাত দাতার মনে এ মহান লক্ষ্য প্রবল থাকা ও উক্ত উদ্দেশ্য লাভ করা আগ্রহ জাগা আবশ্যক। লোকদের দেখানোর কোন মনোবৃত্তি থাকা উচিত নয়, তাতে নিয়তটাই খারাপ হয়ে যায়। কাজটা কলুষযুক্ত হয় এবং আল্লাহ্র কাছে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়।

ইসলামের মৌল গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর প্রচার-প্রকাশ, তার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং লোকদের কাছে তাকে অতিশয় প্রিয় করে তোলার লোভ ও ইচ্ছা ঈমানের লক্ষণ, তাকওয়ার চিহ্ন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

---

১. দেখুন ঃ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٤٩٨

২. فقه الامام جعفر ج ٢ ص ٩٦ এবং দেখুন ঃ المجموع ج ٦ ص ٢٣٣ তাতে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে الاعلان افضل من الاسرار 'যাকাত গোপনে দেয়ার পরিবর্তে জানিয়ে শুনিয়ে দেয়া অনেক ভাল।'

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ -

তা এজন্যে যে, যে লোক আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিরাট করে তুলবে—সম্মানিত করবে, তার এ কাজটা হৃদয়ের আল্লাহ্-ভীরুতার লক্ষণরূপে গণ্য।[১]

সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত প্রদানে যে মনোভাব ও আত্মচেতনাবোধ সৃষ্টি করা পসন্দ করেন, যে বিষয়ে নবী করীমের হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তা উক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে আত্মচেতনাবোধ মহান আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন, তা হচ্ছে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে চেতনাবোধ যুদ্ধকালে ও যাকাত প্রদানের সময়ে।

আর এ পর্যায়ে আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এ কথাটি ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ -

তোমরা যদি যাকত প্রকাশ্যভাবে দাও, তাহলে তা খুবই উত্তম।[২]

ফকীরকে জানাতে হবে না যে, এ যাকাত

ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্র সরকারই যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের সঠিক দায়িত্বশীল। কিন্তু তা যদি না থাকে আর ব্যক্তিরাই যদি যাকাত বণ্টনের দায়িত্ব পালন করতে থাকে তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে,—একালের প্রায় সব মুসলিম দেশেই এ অবস্থা বিরাজমান—তখন উত্তম নীতি হচ্ছে, যাকাতদাতা ফকীরকে বলবে না যে, এটা যাকাতের মাল। কেননা এরূপ কথা গ্রহীতার পক্ষে খুবই মনসিক কষ্টদায়ক হতে পারে। বিশেষ করে গ্রহণকারী লোক যদি আত্মগোপনকারী হয়, যারা যাকাত গ্রহণ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে সদা সচেতনভাবে সচেষ্ট। আর তা বলার প্রয়োজনও নেই। المغنى। গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

> একজনকে ফকীর মনে করে তাকে যাকাতের মাল দেয়া কালে তা যাকাতের মাল, তা বলে দেয়ার কোন প্রয়োজন করে না। হাসান বলেছেন ঃ তুমি কি তাকে আঘাত দিতে চাও ?...... না, তাকে জানিও না।

আহমাদ ইবনুল হাসান বলেছেন ঃ আমি আহমাদকে বললাম, এক ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে যাকাত দেয়, তখন কি সে বলবে যে, এটা যাকাতের মাল ?....... না চুপ থাকবে ?

বললেনঃ এ কথা বলে তাকে নিন্দিত করা কেন ? তাকে দেবে ও চুপ থাকবে। তাকে আঘাত দিতেই হবে, এমন কি প্রয়োজন পড়েছে।[৩]

বরং মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন ঃ বলাটা মাকরূহ। কেননা তা বললে ফকীরের অন্তর চূর্ণ করা হয়।[৪]

---

১. سورة الحج - ٣٢ ২. سورة البقره - ٢٧١ ৩. المغنى ج ٢ ص ٦٤٧
৪. بلغة السالك وحاشية الصاوى ج ١ ص ٣٣٥

জা'ফরী মতের লোকদের 'মাসলাক্' তা-ই, যা এ ব্যাপারে আহ্লুস্ সুন্নাতের নীতি। তাঁরাও ফকীরকে যাকাত দেয়ার সময় বা তারপরে জানিয়ে দেয়া ওয়াজিব মনে করেন না। আবূ বসীর বলেছেন ঃ আমি ইমাম বাকের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে কেউ কেউ যাকাত গ্রহণে লজ্জাবোধ করে। আমি তাকে যাকাত দিই। কিন্তু বলি না যে, এটা যাকাত। এতে আপনার মত কি ? বললেন ঃ হ্যাঁ , তাকে দাও। কিন্তু বলো না। মুমিনকে লাঞ্ছিত করো না।[১]

গরীব ব্যক্তির ঋণ রহিত করাকে যাকাত গণ্য করা যাবে

ইমাম নববী বলেছেন, কোন অসচ্ছল ব্যক্তির যদি দেয় ঋণ থাকে, তখন যদি এ ইচ্ছা করা হয় যে, যাকাত বাবদ সে ঋণটা রহিত করা হবে এবং তাকে বলে ঃ ঋণটাকে আমার দেয় যাকাত বাবদ কেটে দিলাম। এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাযহাবে দুটি দিক রয়েছে। তার মধ্যে অধিক সহীহ্ দিক হচ্ছে, এতে যাকাত আদায় হবে না। আবূ হানীফা ও আহমাদের মাযহাবও তাই। কেননা যাকাত হচ্ছে ধনী ব্যক্তির দায়িত্বভুক্ত। তা অন্যকে ধরিয়ে দিয়ে দেয়া ছাড়া এ দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। দ্বিতীয়, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এটা হাসান বসরী ও আতা'র মাযহাব। কেননা সে যদি যাকাতের টাকা তাকে দেয় এবং ঋণ শোধ বাবদ তার কাছ থেকে তা নিয়ে নেয়, তাহলে তা জায়েয হবে। তাহলে তার হাতে না দিয়ে তাকেই যদি যাকাত ও পরে ঋণ বাবদ ফেরত ধরে নেয়া হয় তাহলে জায়েয হবে না কেন ? যেমন কারো কাছে যদি কিছু টাকা আমানতরূপে গচ্ছিত থাকে এবং তা যাকাতরূপে কেটে দেয়, তাহলে তাতে যাকাত দেয়া হয়ে যাবে, তা সে নিজের হাতে নিল, কি না-ই নিল। কিন্তু যাকাত তাকে যদি এরূপ শর্ত করে দেয় যে, সে তা তার ঋণ আদায়স্বরূপ ফেরত দেবে তাহলে তাকে দেয়া সহীহ্ হবে না। আর তাতে যাকাতও আদায় হয়ে যাবে না। এটা এ মাযহাবে সর্বসম্মত। আর এভাবে ঋণ শোধ করাও সহীহ্ নয় সর্বসম্মত মতে। অবশ্য উভয়েই যদি অনুরূপ নিয়ত করে—কিন্তু শর্ত না করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে জায়েয হবে এবং যাকাতও আদায় হবে। আর যদি সে তার ঋণ শোধরূপে তা তাকে ফেরত দেয়, তা হলে সে ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর ঋণী ব্যক্তি যদি বলেঃ তোমার যাকাত আমাকে দাও, আমি তোমার ঋণ শোধ করে দেব এবং তাই যদি করেও, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যার মুঠে তা আছে সেই তার মালিক হবে না। তা আর তাকে ঋণ শোধস্বরূপ দেয়ার প্রয়োজন হবে না। যদি দেয়, তাহলে তা কবুল হবে।[২]

নববী হাসান থেকে এ পর্যায়ে যা উল্লেখ করেছেন, আবূ উবাইদ তা উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে ঃ তিনি তাতে কোন দোষ মনে করেন না। যদি তা ফরয হয়। বলেছেন ঃ কিন্তু 'তোমাদের এ বিক্রয় বা ক্রয়, তা জায়েয হবে না অর্থাৎ ঋণ যদি কোন পণ্যের মূল্য হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে জায়েয হবে না। যেমন ব্যবসায়ীর ঋণসমূহের অবস্থা হয়ে থাকে। হাসান তাতে যাকাত আদায় হয় বলে মনে করেন না। এটা উত্তম শর্ত।

১. দেখুনঃ ৮৮ فقه الامام جعفر الصادق ج ٢ ص

২. ٢١١ - ٢١٠ المجموع ج ٦ ص

তবে আবূ উবাইদ এ ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করেছেন। তিনি কোন অবস্থায়ই তা জায়েয মনে করেন না। সুফিয়ান সওরী থেকেই এটা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাতে সুন্নাতের বিরোধিতা দেখতে পেয়েছেন। যেমন এ ভয় হয় যে, ঋনদাতা এভাবে ঋণ দিয়ে নিজের ধন-মাল বাঁচাতে চেষ্টা করতে পারে যা পাওয়া থেকে সে নিরাশ হয়েছে। এভাবে সে যাকাতকে তার ধন-মালের সংরক্ষণের সাহায্য হিসেবে মনে করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তো কেবল তাই গ্রহণ করেন, যা কেবলমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে খালেসভাবে দেয়া হবে।[১]

ইবনে হাজম বলেছেন, যাকাতদাতা লোকদের কারো কারো কাছ থেকে যারা ঋণ নেয়, পরে সে তাকে সেই ঋণটাকেই যাকাতস্বরূপ রহিত করে দিলে, সে তা কবুল করে নেবে এবং নিয়ত করবে যে, এটা যাকাত বাবদ নিল। তা হলে তা আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সেই ঋণটাকে যদি দান করে দিল এমন ব্যক্তিকে, যে যাকাত নেয়ার যোগ্য এবং তা হাওয়ালা করে দিল সেই ব্যক্তির যার যার কাছে তার ঋণ দেয়া আছে এবং তা করে যাকাত দিল বলে নিয়ত করল, তাতেও তার যাকাত আদায় হবে।

তার দলিল হচ্ছে, সে তো ফরয যাকাত দিতে আদিষ্ট। তা সে দিল এভাবে যে, যাকাত পাওয়ার লোকদের মধ্য থেকে যার ওপর তার ঋণ আছে সে সেটিকেই যাকাত ধরে দিল। সে ব্যক্তি যখন ঋণমুক্ত হয়ে গেল, তখন সেটিকেই যাকাত মনে করে নেবে। এতে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ইবনে হাজম এ কথার দলিলস্বরূপ সহীহ্ মুসলিমে উদ্ধৃত আবূ সায়ীদ বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে খুব বিপদে পড়ে গেল। তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা সকলে এ লোকটিকে যাকাত দান কর। বলেছেন, আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ প্রমূখও এ মত গ্রহণ করেছেন।[২]

জাফরীয়া মাযহাবেরও এটাই মত। এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেককে প্রশ্ন করল এই বলে ঃ আমার ঋণ পাওনা রয়েছে লোকদের কাছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা তাদের কাছে আটক রয়েছে। তারা সে ঋণ শোধ করতে সমর্থ হচ্ছে না। অবশ্য তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকও। তাহলে আমি কি তাদের কাছে পাওনাটা ছেড়ে দেব এবং মনে করে নেব যে, আমি তাদেরকে যাকাত দিলাম ? বললেনঃ হ্যাঁ।[৩]

আমার মতে এ মতটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। যতক্ষণ ফকীর-মিসকীনরা যাকাত দ্বারা নিজেদের আসল মৌল প্রয়োজন পূরণ দ্বারা চূড়ান্তভাবে উপকৃত হতে থাকবে—তাদের মৌল প্রয়োজন এখানে তাদের ঋণ শোধ করা—তাহলে তা জায়েয হবে, কুরআন মজীদে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পাওনা ঋণ ছেড়ে দেয়াকে 'সাদকা' বা যাকাত বলা হয়েছে। আল্লাহ্র কথা ঃ

---

১. الاموال ٥٩٥ -٥٩٦ ط دار الشرق
২. المحلى ج ٦ ص ١٠٥ - ١٠٦
৩. فقه الامام جعفر ج ٢ ص ٩١

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবে আক্রান্ত হয়, তাহলে তার সুবিধাজনক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক। আর যদি 'সাদকা' দিয়ে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম—যদি তোমরা জান।[১]

অসচ্ছল ঋণী ব্যক্তিকে এভাবেই যাকাত বা সাদ্‌কা দেয়া হয়। যদিও তাতে হাতেও ধরা হয় না, মালিকও বানিয়ে দেয়া হয় না। কিন্তু কাজ তো সম্পন্ন হয় নিয়তের গুণে, তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নয়। এটা তখন জায়েয হবে, যদি ঋণগ্রস্ত ঋণ শোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন তাকে ঋণের শৃংখল থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তাকে তা জানিয়েও দেয়া চলবে। এরূপ অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঠিক ফকীর-মিসকীনের মধ্যে গণ্য নাও হয়, তাহলেও তারা নিঃসন্দেহে ঋণগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও যাকাত পাওয়ার যোগ্য। ঋণভার থেকে মুক্তি দানটা যাকাতের মাল ধরিয়ে দেয়ার শামিল। এতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আর তা হলো তাঁর কাঁধের ওপর থেকে ঋণের বোঝা অপসারিত করা। তাহলে সে রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনা থেকেও বেঁচে যায়। তাগাদার ও কয়েদ হওয়ার ভয়ও দূর হয়। আর সর্বোপরি পরকালীন আযাব থেকে বাঁচার পথটিও খুলে যায়।

তবে হাসান যে ব্যবসায়ের ঋণ না হওয়া ও কর্য লওয়ার ঋণ হওয়ার শর্ত করেছেন, এ ব্যাপারটি অবশ্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। ঋণে বা বাকীতে বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসায়কে ছড়িয়ে দেয়া হয়। খুব বেশী মুনাফা লাভের লোভে পড়ে, তাতে এ ভয়টা তীব্র হয়ে রয়েছে। যখন সে ঋণের দাবিতে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, তখন যাকাত থেকে কেটে নেবে। এতে যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে।

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ এ পর্যায়ে একটি মাস্‌লা উপস্থাপন করেছেন। তা হচ্ছে, কেউ যদি কোন ইয়াতীম বা মেহমান ফকীরকে খাবার খাওয়ায় যাকাত দেয়ার নিয়তে, তাকে যে খাবার দিল তা কি যাকাত গণ্য হবে যদি তার নিয়ত করে ?.... এ হিসেবে যে, সে তা তাদের জন্যে মুবাহ্ মনে করে নিয়েছে ?

হানাফী ও অন্যান্য আলিমগণ অকাট্যভাবে বলেছেন, এ খাবার দেয়া যাকাত আদায় বলে গণ্য হবে না। কেননা যাকাত প্রদানে 'মালিক বানানো' জরুরী; কিন্তু খাবার খওয়ালে 'মালিক বানানো' হয় না। এ তো তাদের জন্যে অনুমতি দানমাত্র।

কিন্তু তাঁরা বলেছেন, খাদ্যদ্রব্য কাউকে যাকাতের বিকল্প হিসেবে দিলে তাতে যাকাত আদায় হবে। যেমন কাউকে কাপড় পরিয়ে দেয়া হল, কেননা তা ফকীরকে

---

১. سورة البقرة - ٢٨٠.

যাকাত আদায়ের নিয়তে দিয়ে তাকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে যে খাবার খেলো সে তার মালিক হয়ে গেল আর যদি নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ানো হয়, তাহলে তাতে যাকাত আদায় হবে না।[১]

জায়দীয়া ফিকাহ্র কেউ কেউ ফকীর মেহমানদের সম্মুখে যা পেশ করা হবে তা যাকাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে বলে মত দিয়েছেন পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে ঃ

(১) যাকাতের নিয়ত করতে হবে। (২) মূল খাদ্য অবশিষ্ট থাকতে হবে—যেমন খেজুর ও কিশমিশ। (৩) প্রত্যেককে এমন জিনিস দিতে হবে যার মূল্য আছে এবং এ কাজের ভুল করা যাবে না। (৪) ফকীর তা নিজের মুঠোর মধ্যে নেবে কিংবা তারও সেই জিনিসের মধ্যে পথ উন্মুক্ত করে দেবে—তার জানা-শোনা সহকারে এবং (৫)ফকীর জানবে যে, এটা যাকাতের মাল। অন্যথায় যাকাত হল বলে বিশ্বাস করা যাবে না। জামীল এ কথার প্রতিবাদ করেন।[২]

১. الدر المختار وحاشية ج ٢ ص ٣
২. شرح الازهار وحواشيه ج ١ ص ٥٤٢

তৃতীয় অধ্যায়

যাকাতের লক্ষ্য এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে তার প্রভাব

- *যাকাতের লক্ষ্য এবং ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাব*
- *যাকাতের লক্ষ্য এবং সামষ্টিক জীবনে তার প্রভাব*

ভূমিকা

'কর'-এর যে কোন মানবিক বা সামষ্টিক কিংবা অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকতে পারে, অর্থনীতি ও কর পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই চিন্তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। তাঁদের ভয় ছিল, এই ব্যাপারটি তাঁদের নিজেদের প্রথম লক্ষ্য—অর্জিত সম্পদের প্রাচুর্যের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না বসে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ভাণ্ডারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কেবলমাত্র আদায়ের মাধ্যমে। এই চিন্তা-ভাবনার নাম দেয়া হয়েছে 'কর সংক্রান্ত নিরপেক্ষতার মত'।

শেষ পর্যন্ত চিন্তার বিবর্তন, অবস্থার পরিবর্তন এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার পর তাঁরা উক্ত পুরাতন অন্ধ অনুসরণের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে সুনির্দিষ্ট সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে 'কর'-এর কল্যাণ গ্রহণের আহ্বান ও ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। সে উদ্দেশ্যস্বরূপ বলা হয় শ্রেণীসমূহের মধ্যকার পার্থক্য হ্রাসকরণ এবং সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুনঃস্থাপনে...... ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলামের যাকাত ব্যবস্থার একটা ভিন্নতর বিশেষত্ব রয়েছে। ইসলাম যাকাতকে তার অন্যতম রুকন স্তম্ভ বানিয়েছে। তার বহু বিশেষত্বমূলক নিদর্শনের অন্যতম হচ্ছে যাকাত। উপরন্তু ইসলামের উপস্থাপিত ইবাদতসমূহের মধ্যে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে দাঁড় করেছে এ যাকাতকে। মুসলিম ব্যক্তি তা একটা পবিত্র দ্বীনী গুণসম্পন্ন ফরয হিসেবে দিয়ে থাকে—দিয়ে সে আল্লাহ্র স্পষ্ট অকাট্য আদেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার লক্ষ্যে। দেয় সে স্বীয় মনের পবিত্র প্রেরণার দরুন, সে ব্যাপারে তার নিয়ত থাকে খালেস, নিষ্কলুষ,যেন তা মহান আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

انّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَانَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَانَوٰى -

নিয়ত অনুযায়ীই আমলের মূল্যায়ন হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যার সে নিয়ত করে।[১]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ -

লোকদের আদেশ করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁর জন্যে আনুগত্য একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। আর এ হচ্ছে সুদৃঢ় দ্বীন।[২]

১. এ হাদীসের উৎসের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ২. سورة البينه – ٥

প্রথম পর্যায়ে যাকাত, মুসলিম ব্যক্তি তা পালন করে আল্লাহ্র কাছ থেকে মানুষের জন্যে জীবন বিধান অবতীর্ণ হয়েছে তার একটি অংশ হিসেবে। এ মানুষকেই তো আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। পৃথিবীকে সত্য ও ইনসাফ দ্বারা পুনর্গঠিত ও সুবিন্যস্ত করে তুলবে, যেন তার সুফল সে পরকালে সংগ্রহ করতে পারে। মানুষ প্রস্তুতি নেয়, পরিচ্ছন্ন হতে থাকে শরীয়াতী দায়িত্ব পালনের কঠিন রক্ত পানি করা কষ্ট ও শ্রমসাধনার মাধ্যমে। এ সবের মধ্যে পড়ে সে পরীক্ষা দিয়ে তৈরী হয় যেন সে নিজেকে পরকালীন জান্নাতের চিরন্তন অধিবাসী হওয়ার যোগ্য করে তুলতে পারে। এভাবে তার মন ও মানসিকতা যখন পবিত্র হবে, তার অন্তর হবে পরিশুদ্ধ আল্লাহ্র কড়া আইনসমূহ পালনের মাধ্যমে ও তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার ফলে, তবেই সে পরকালীন জীবনের নিয়ামতসমূহ পেতে পারবে, আল্লাহ্র জান্নাতে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পাবে। সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতে পারবে, যাদের কথা বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

ফেরেশতাগণ যাদেরকে মৃত করেন পবিত্র থাকা অবস্থায়, তারা বলবে ঃ তোমাদের ওপর সালাম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা যা করেছ তার ফলস্বরূপ।[১]

ঠিক এ কারণেই কুরআন মজীদে নামায ও যাকাতকে ২৮টি স্থানে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসে এ দুটির উল্লেখ পাশাপাশি হয়েছে দশ-দশটি স্থানে। ইসলামে একথা সর্বজন পরিচিত যে, যাকাত হচ্ছে নামাযের বোন। এ দুটির মধ্যে কোন বিচ্ছেদ বা পার্থক্যকরণ স্বীকার করা যেতে পারে না। তা জায়েযও নয়। কেননা আল্লাহ্ই এ দুটিকে একত্র করেছেন। এ কারণে যে সব লোক নামায কায়েম করত, কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যে সব সাহাবী ইতস্তত ঃ করছিলেন, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁদের বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্র কসম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব।

এ কারণেই ইসলামী ফিকাহর কিতাবসমূহে মাযহাবী মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যাকাত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম 'ইবাদত' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে নামায সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের পরে পরে।[২] তাতে কুরআন ও সুন্নাহকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

---

১. سورة النحل -٣٢

২. এটা অধিকাংশ ফিকাহর কিতাব সম্পর্কে সত্য। অল্প সংখ্যক কিতাবে অবশ্য নামাযের পর রোযা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তার ভিত্তি হচ্ছে, এই দুটিই দৈহিক ইবাদত অর্থাৎ এ দুটি পালনে দৈহিক কষ্ট ও শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করতে হয়। কিন্তু যাকাত হচ্ছে শুধু আর্থিক ইবাদত আর হজ্জ আর্থিক ও দৈহিক উভয় দিকের ইবাদত এক সাথে।

যাকাতে ইবাদতের ভাবধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তাতে একটা মহান মানবিক কল্যাণের লক্ষ্য প্রকট হয়ে আছে। তা নৈতিকতার দিক দিয়ে অতি উন্নতমানের আদর্শও বটে। উচ্চতর আধ্যাত্মিক মূল্যমানও তাতে নিহিত রয়েছে। ইসলাম তা বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যাকাতের ফরয আদায়ের মাধ্যমে। উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ সে বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করেছে। এ ছাড়া ইসলামের বহু মনীষীও এ দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন।

প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা যখন ইসলামী শরীয়াতকে বাস্তবে কার্যকর করেছিলেন—যেমন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, তখন এ সব মহান লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে ফুটে উঠেছিল, ব্যক্তি মুসলিমের জীবনে তার প্রভাব স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। আর ইসলামী সমাজ সমষ্টি সে অপূর্ব ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ভরে উঠেছিল। দুনিয়ার চক্ষুসমূহের সম্মুখে তা জ্বলজ্বল করছিল।

এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেহায়েত বস্তুগত নয় আদৌ। নয় একান্তভাবে আধ্যাত্মিক। এ বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকই সমন্বিত ছিল তাতে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক লক্ষ্যের অবদান সেখানে সর্বোতভাবে একাকার হয়ে দেখা দিয়েছিল অর্থনৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে।

এ লক্ষ্যসমূহ নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় যেমন, তেমনি নয় নিছক সামষ্টিক। তার অনেকগুলি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয়, সে যাকাতদাতা হোক কি গ্রহীতা। আবার তার অনেকগুলো ভাবধারা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয় তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে, তার কল্যাণময় দায়িত্বের সম্প্রসারণে এবং তার সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানে। পরবর্তী অধ্যায়টি দুটি মৌলিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম ঃ যাকাতের লক্ষ্য ও মুসলিম ব্যক্তির জীবনে তার প্রভাব পর্যায়ের আলোচনা। আর দ্বিতীয় ঃ যাকাতের লক্ষ্য ও মুসলিম সমাজের ওপর তার প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তি জীবনে যাকাতের লক্ষ্য ও প্রভাব

এ পরিচ্ছেদে দুটি আলোচনা সংযোজিত হচ্ছে ঃ

প্রথম, যাকাতের লক্ষ্য—দাতার প্রসঙ্গে। দাতা হচ্ছে সেই ধনী ব্যক্তি, যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে।

আর দ্বিতীয়, যাকাতের লক্ষ্য—গ্রহণকারীরও তা থেকে উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গে। এ সেই অভাবগ্রস্ত লোক যাকে যাকাত দেয়া হয় এবং যাকাত ব্যয় করা হয় এমন লোকের জন্যে, যার প্রতি মুসলমানরা ঠেকা—যেমন মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম, ঋণগ্রস্ত, পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার্থে, আল্লাহ্র পথের যোদ্ধা, যাকাতের জন্যে নিযুক্ত কর্মচারী। এসব লোক যাকাতের সামষ্টিক লক্ষ্য সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রথম আলোচনা

যাকাতের লক্ষ্য ও দাতার জীবনে তার প্রভাব

যাকাত বিধান জারি করার মূলে ইসলামের লক্ষ্য শুধু মাল সম্পদ সংগ্রাহ করা নয়। রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার বিপুল সম্পদ সম্ভারে ভরপুর হবে, তাই একমাত্র কাম্য নয়। দুর্বল, অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীভূত করাই কেবল উদ্দেশ্য নয়। বরং তার প্রথম লক্ষ্য, মানুষ বস্তুর ঊর্ধ্বে উঠবে; বস্তুর দাসানুদাস নয়, তার পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও কর্তা হয়ে বসবে। এখান থেকেই দাতার ব্যাপারে যাকাতের লক্ষ্য, তার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের পূর্ণ মাত্রার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মানুষের সাধারণভাবে ধার্যকৃত কর থেকে যাকাত একটি ফরয কার্যরূপে বিশেষ বিশেষত্বের অধিকারী হয়েছে। কেননা 'কর' ধার্যকরণে দাতাকে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের একটি আয়ের মাধ্যম কিংবা ভাণ্ডারে ভর্তিকারী ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয় না।

কুরআন মজীদ যাকাতের লক্ষ্যের ব্যাখ্যায় সেই ধনীদের প্রতি গুরুত্বের লক্ষ্য আরোপ করেছে, যাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হয় কয়েকটি অক্ষরের সমন্বয়ে গড়া দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দে তা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত শব্দদ্বয় যাকাতের বিপুল গভীর তত্ত্ব ও তার বিরাট মহান লক্ষ্যে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। সে শব্দদ্বয় হচ্ছে ঃ التطهير। 'পবিত্রকরণ,' এবং التزكية। 'পরিশুদ্ধকরণ' কুরআনের আয়াতে এ শব্দদ্বয় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

তাদের ধন-মাল থেকে তুমি যাকাত গ্রহণ কর, তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।

এই 'পবিত্রকরণ' ও 'পরিশুদ্ধকরণ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণমাত্রার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা নিহিত। তা বস্তুগত হোক, কি তাৎপর্যগত, তা ধনীর আত্মা, মন-মানসিকতা ও তার যাবতীয় মাল ও সম্পদ পূর্ণাঙ্গভাবে পরিব্যাপ্ত। পরবর্তী বাক্যসমূহের দ্বারা আমরা তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেশ করব।

যাকাত লোভ নিবারক ও তা থেকে পবিত্রকারী

মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে যাকাত প্রদান করে, তা তার নিজের জন্যে পবিত্রকারী সাধারণভাবে সমস্ত গুনাহের মলিনতা-কলুষতা থেকে এবং বিশেষভাবে লোভ ও কার্পণ্যের হীনতা, নীচতা, সংকীর্ণতা থেকে।

বস্তুত লোভ ও কার্পণ্য খুবই ঘৃণ্য ও নিন্দিত, মানব মন তাতে খুব বেশী আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তার আনীত কঠিন বিপদে নিমজ্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তঃকরণ বাগানে মনস্তাত্ত্বিক বা প্রকৃতিগত প্রতিরোধের বৃক্ষ রোপণ করার ইচ্ছা করলেন, যা মানুষকে পৃথিবীতে চেষ্টা-সাধনা ও সংগঠনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করে। মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মপ্রেম এবং ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার লিপ্সা ও স্পৃহা, দুনিয়ায় স্থিতি লাভের প্রেরণা। এ সব প্রকৃতিগত ভাবধারার লক্ষণ ও প্রকাশক হচ্ছে ব্যক্তির লোভ ও কার্পণ্য নিয়ে যা তার হাতে রয়েছে। অন্য মানুষের তুলনায় নিজেকে বেশী বেশী কল্যাণ ও মুনাফা-সুবিধার দৌলতে সমৃদ্ধ করে তোলার কামনা ও বাসনা। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا -

মানুষ বড় সংকীর্ণমনা হয়ে পড়েছে।[১]

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ -

মনকে কার্পণ্য ও লোভ পরিব্যাপ্ত করে নিয়েছে।[২]

অতএব ক্রমোন্নতিশীল বা মুমিন মানুষের জন্যে তার মনের জগতে প্রভাব বিস্তারকারী স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতার প্রতিরোধকারী ভাবধারা প্রবল হয়ে ওঠা একান্তই অপরিহার্য ছিল। আবশ্যক ছিল ঈমানী শক্তির বলে লোভ-লালসার লেলিহান জিহ্বাকে দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার। আর প্রকৃতপক্ষেই এ মারাত্মক লোভ ও কার্পণ্যের ওপর বিজয়ী হয়ে ওঠা ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে তার কল্যাণ লাভের আর কোনই উপায় ছিল না।

বস্তুত লোভ ও কার্পণ্য একটি কঠিনতর বিপদ—ব্যক্তির জন্যেও যেমন, সমষ্টির জন্যেও তেমন। যার ওপর তা সওয়ার হয়, তাকে রক্তপাতের দিকে তাড়িত করে, মান মর্যাদা নষ্ট হওয়ার কারণ ঘটায়। দ্বীন লংঘন করতে ও দেশ মাতৃকাকে শত্রুর হাতে বিক্রয় করে দিতেও প্ররোচিত করে। এ জন্যেই রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ লোভ ও কার্পণ্যেকে কয়েকটি মারাত্মক বিধ্বংসী ভাবধারার মধ্যে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন ঃ তিনটি ভাবধারা খুবই বিধ্বংসী—লোভ, যা অনুসৃত হয় লালসা—যা পূরণে নিয়োজিত হতে হয় এবং ব্যক্তির নিজেকে নিয়ে বড়ত্ব বোধ ও আত্ম-অংহকার।[৩] আল্লাহ তা'আলাও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

যারাই তাদের মন মানসের লোভ ও কার্পণ্যকে রোধ করতে সক্ষম হবে, তারাই কল্যাণধন্য ও সাফল্যমণ্ডিত হবে।[৪]

---

১. الاسراء – ١٠٠ ২. النساء – ١٢٨

৩. হাদীসটি তাবারানী তাঁর الاوسط গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে যয়ীফ সনদসূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, যেমন التيسير ج ١ ص ٥٧. গ্রন্থে বলা হয়েছে। ৪. الحشر – ٩، والتغابن – ١٦

কুরআনে এই একই আয়াত দুবার উদ্ধৃত হয়েছে। যারাই এ মারাত্মক রোগ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে, তারাই সফলকাম হবে, এটাই তিনি বোঝাতে ও সেদিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। নবী করীম (স) ভাষণ দান প্রসঙ্গ বলেছেন ঃ

> তোমরা লোভ ও কার্পণ্য থেকে দূরে থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ লোভ ও কার্পণ্যের দরুনই তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।
>
> এ লোভই তাদেরকে কার্পণ্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে তারা কার্পণ্য করতে শুরু করেছে। তা তাদেরকে নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে আদিষ্ট করেছে। তারা তাই করেছে, যা তাদেরকে শরীয়াতের বিধান লংঘন করে পাপানুষ্ঠানে প্ররোচিত করেছে, ফলে তারা তা-ই করেছে।[১]

এই বিচারে যাকাত বাস্তবিকই পবিত্রতাকারী অর্থাৎ তা ব্যক্তিকে বিধ্বংসী—লোভ-কার্পণ্য-কলুষতা থেকে পবিত্র করে দেয়। এ পবিত্রকরণ কার্যটি হবে যতটা তাকে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হবে। এ কার্পণ্য যতটা দূর করা যাবে ততটাই তার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। নিজেকে যত বেশী আল্লাহমুখী করতে পারবে, তার চিত্তও ততটা স্ফূরিত হবে।

যাকাত যেমন মন পবিত্রকরণের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করে, মনকে ঠিক সেই অনুপাতে মুক্ত ও স্বাধীনচেতা বানিয়ে দেয়, তার মুক্তি মালের বন্ধনের যিল্লাতী থেকে, মনের কাতরতা ও অধোগতি থেকে, টাকা-পয়সার দাসত্বের হীনতা-নীচতা থেকে। কেননা ইসলাম চায়, মুসলিম ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা হোক, অন্য সব কিছুর অধীনতা আনুগত্য থেকে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উঠুক। এ বিশ্বলোকে যা কিছু আছে—বস্তুগত উপাদান উপকরণ ও দ্রব্য সামগ্রী মানুষ সেই সবকিছুর কর্তা ও নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াক। আল্লাহ তো মানুষকে পৃথিবীর বুকে তাঁর খলীফা ও সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। কিন্তু সে শুরু করে দিয়েছে নিজের নফসের দাসত্ব করতে, বস্তু ও সম্পদের উপাসনা করতে—এর চাইতে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে!

এর চাইতে বড় দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে, ধনসম্পদ সংগ্রহ করাকেই মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য ও সবচাইতে বেশী চিন্তার বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করেছে। তার জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিধি বানিয়েছে, জীবনের লীলাকেন্দ্র বানিয়েছে, এ ধনসম্পদকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটা বিরাট দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তার লক্ষ্য তো খুবই উঁচু অতীব মহান।

সন্দেহ নেই, নবুয়তের দীপস্তম্ভ থেকে জ্যোতি এসেছে—ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। মুসলিমকে এই দুঃখজনক অবস্থা সম্পর্কে নানাভাবে হুশিয়ার ও সাবধান করে দিয়েছে। কেননা তার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির দাসত্ব ও আনুগত্য। রাসূলের বাণী ঃ

---

১. হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ী উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন ঃ مختصر المنذری ج ۲ ص ۲٦۳

টাকা-পয়সার দাস হতভাগ্য, অর্থ সম্পদের দাস ভাগ্যাহত। মখমল বস্ত্রের দাস ভাগ্যহীন.... এদের জন্য দুঃখ। তারা দুঃখ কুড়িয়েছে এবং বারবার সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে। আর যখনই বাধাদান করা হয়েছে, তখনই স্ফীত হয়ে উঠেছে।[১]

যাকাত অর্থদান ও ব্যয়ে অভ্যস্ত করে

যাকাত যেমন মুসলিম ব্যক্তির মন-মানসকে লোভ থেকে পবিত্র করে, তেমনি অর্থদান, সাধারণ ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতেও সাহায্য করে।

নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণ পারদর্শী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, মানুষের আদত অভ্যাসের একটা গভীর প্রভাব রয়েছে মানুষের চরিত্রে, আচারণ-আহরণে ও তার লক্ষ্য নির্ধারণে। এ কারণেই তো বলা হয় ঃ 'অভ্যাস দ্বিতীয় প্রকৃতি' তার অর্থ, অভ্যাসের একটা শক্তি ও আধিপত্য রয়েছে, যা মানুষের জন্মগত প্রথম প্রকৃতির অনুরূপ দৃঢ়তামূলক হয়ে থাকে।

যে মুসলমান অর্থ ব্যয় এবং ফসল কাটার সাথে সাথেই তার যাকাত 'ওশর' ও তার অন্যান্য আয়ের যখনই তা পাওয়া যায় যাকাত বের করে দিতে অভ্যস্ত হয়, তার গবাদি পশুর ও ব্যবসায় পণ্যের যাকাত বছর পূর্ণ হতেই দিয়ে দেয়, ঈদুল ফিতর নামাযের পূর্বেই যে ফিতরা-যাকাত দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে, এ মুসলমান দান ও অর্থব্যয়ের একটা মৌলিক গুণের অধিকারী হতে পারে। তার এই চরিত্রের প্রকৃতির গভীরে শিকড় গেড়ে ও ছড়িয়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ কারণে এ চরিত্রটি কুরআনের দৃষ্টিতে মুত্তাকী মুমিনের একটা অন্যতম গুণ হয়ে রয়েছে। মানুষ যখন মহান গ্রন্থ খুলে বসে ও সূরা আল-ফাতিহা পাঠের পর পরবর্তী পৃষ্ঠার দিকে তাকায় সূরা আল-বাকারা পাঠের উদ্দেশ্যে সেখানেই মুত্তাকীদের গুণাবলী পড়তে পারে। যারা মহান কিতাব পাঠে উপকৃত হতে পারে, তারা হচ্ছে ঃ

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

এই কিতাব....। কোন সন্দেহ নেই এতে। তা মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়েত, (মুত্তাকী) তারা, যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।[২]

এর পূর্বেও—আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ—মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনে মুমিনদের এ অন্যতম মহান চরিত্র সম্পর্কে কথা বলতে ভুলে যাওয়া হয়নি। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা الشورى। তে বলা হয়েছে ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ও রিকাক এ এবং ইবনে মাজা الزهد। -এ উদ্ধৃত।

২. البقرہ ١-٣।

فَمَـا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌوَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - وَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَاغَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ - وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ سُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّارَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

তোমাদেরকে যে জিনিসই দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী। আর যা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তা অতীব উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা ঈমান এনেছে। তারা যখন রাগান্বিত হয়, ক্ষমা করে দেয়। আর যারা তাদের আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে তাদের যাবতীয় ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম পায় এবং তাদের আমরা যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।[১]

এ কথার তাৎপর্য নির্ধারণে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, তার অর্থ ফরয যাকাত দেয়া। হযরত ইবনে আব্বাসের মতরূপে বর্ণিত। কেননা এখানে নামায কায়েম করার কথার সাথেই 'ইনফাক' অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। অতএব তার অর্থ হবে যাকাত প্রদান। কারো মতে নফল দান-সাদকা। দহ্হাক এ মত দিয়েছেন বলে বর্ণিত। তাঁর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ যে, যাকাতের কথা কুরআনের বিশেষভাবে সেই শব্দেই বলা হয়েছে। অন্য কারো কারো মতে পরিবার-পরিজনের জন্যে অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে।

অন্যদের মত হচ্ছে, শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক, সর্ব প্রকারের অর্থ ব্যয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।[২] এ কথাটাই যথার্থ। এরই আলোকে গোটা আয়াত অধ্যয়ন ও অনুধাবন আবশ্যক। এখানকার কথা ফরয যাকাত কিংবা নফল সাদ্‌কা অথবা পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় থেকেও অধিক ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। আসলে মুমিনদের চরিত্রসমূহের এ একটা বিশেষ চরিত্র গুণ ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّ وَعَلَانِيَةً -

যারা তাদের ধন-মাল ব্যয় করে রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে'[৩]

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ السَّـرَّاءِ وَالضَّـرَّاءِ -

যারা ব্যয় করে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় এবং অভাব- অনটনের সময়।[৪]

اَلصَّابِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَاَلْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -

---

১. الشورى ٢٦-٣٧ ২. দেখুন ঃ القرطبى ج ١ص١٧٩
৩. البقره - ٧ ৪. ال عمران - ١٣٤

আর ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিনয়ী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে মাগফিরাত কামনাকারী ..... ।[১]

মক্কী আয়াতসমূহে মুত্তাকীদের যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তাও এ কথাই বোঝায়ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ - كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ - وَبِالْاَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ - وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ জান্নাতে ও ঝর্ণাধারাসমূহে অবস্থান করবে, গ্রহণকারী হবে তাদের আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তার। পূর্বে তারা ইহ্সানের নীতির অনুসারী ছিল। রাতে তারা খুব কমই নিদ্রা যেত। শেষ রাতে তারা মাগফিরাত চাইত এবং তাদের ধন-মালে হক রয়েছে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের জন্যে।[২]

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا - اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّجَزُوْعًا - وَّاِذَامَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا - اِلَّاالْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ - وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ - لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা—ছোট আত্মার—সৃষ্ট হয়েছে। তার ওপর যখন বিপদ আসে, তখন ঘাবড়িয়ে ওঠে এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। কিন্তু সেসব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত) যারা নামাযী, যারা নিজেদের নামায রীতিমত আদায় করে, যাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট হক রয়েছে।[৩]

যারা অর্থ ব্যয় করতে অভ্যস্ত নিজেদের তহবিল থেকে অন্যদের জন্যে, ভাইদের প্রতি সহানুভূতিস্বরূপ নিজেদের মালিকানা থেকে ত্যাগ স্বীকার করে এবং নিজেদের জাতির সামষ্টিক কল্যাণের লক্ষ্যে তারা অন্য লোকের ধন-মাল ও মালিকানার ওপর হস্তক্ষেপ করা—চুরি বা অপহরণ থেকে অবশ্য অবশ্যই বিরত থাকবে। যারা নিজেদের ধন-মাল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে অন্যদের দান করে, তাদের পক্ষে যা তাদের নয় তা হস্তগত করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কেননা তাতে আল্লাহ্র গজবই তো টেনে আনা হবে নিজেদের ওপর।

মক্কায় প্রাথমিক দিক দিয়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম হচ্ছে সূরা 'আল-লাইল'। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন ঃ

---

১. ال عمران - ١٧

২. الذاريات ١٥-١٩ ৩. المعارج ١٩-٢٤

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى - فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى، - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى - اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى - وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى - فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى - لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى - الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى - الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى - وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى - اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى - وَلَسَوْفَ يَرْضٰى -

রাত্রির শপথ, যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয় শপথ দিনের যখন তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শপথ সেই সত্তার যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আসলে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরন ও প্রকারের। পরন্তু যে লোক (আল্লাহ্র পথে) ধন-মাল দিল (আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দান করব। আর যে কার্পণ্য করল, তার জন্যে আমি শক্ত ও দুষ্কর পথের সহজতা বিধান করব। তার ধন-মাল কোন্ কাজে আসবে—যখন সে-ই ধ্বংস হয়ে যাবে। পথ-প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব। আর পরকাল ও ইহকালের সত্যিকার মালিক তো আমিই। অতএব আমি তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিলাম জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম্পর্কে। তাতে ভস্মীভূত কেউই হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি যে অমান্য করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেজগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। তার ওপর কারো অনুগ্রহ এমন নেই, যার বদলা তাকে দিতে হতে পারে, সে তো শুধু নিজের মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

এক ভাগের লোকদের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্যে সহজতা বিধানেরও ওয়াদা করেছেন। কেননা সে দিয়েছে, আল্লাহকে ভয় করেছে ,পরম সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তাহলে 'দান' তাকওয়া ও মহান পরম সত্যকে সত্য বলে জানার ও মানার দিক দিয়ে একটা অতীব মৌলিক গুণ বিশেষ। কুরআন তার এ 'দান' করার গুণের উল্লেখ করেছে; কি দিয়েছে, কত দিয়েছে, কোন্ প্রকারের ও কোন্ প্রজাতীয় জিনিস দান করেছে তা বলেনি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি। কেননা তার লক্ষ্য হচ্ছে এমন মহান আত্মা গড়ে তোলা যা হবে দানশীল, ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারকারী। নিষিদ্ধকারী ও পরশ্রীকাতর নয়। তাই বলতে হবে দানশীল আত্মা ও মনই হচ্ছে কল্যাণকর ও ইহসানের নীতির অনুসরণকারী, যার প্রকৃতিই হচ্ছে লোকদের প্রতি দয়া ও

অনুগ্রহ করা, ধন-মাল লোকদের দান করা। সে তার ভাল জিনিস দেয়—নিজেকে ও অন্য মানুষকেও। তা যেন একটা প্রস্রবণ, তা পান করে ও করিয়ে বিপুল সংখ্যক লোক পরিতৃপ্ত হচ্ছে। পান করিয়েছে তাদের যানবাহন, চতুষ্পদ জন্তু ও তাদের কৃষি ক্ষেতকে। তারা তা থেকে উপকৃত হয় যেমন তারা ইচ্ছা করে। তা এই কাজের জন্যে খুবই সহজলভ্য। এ ধরনের মানুষ সব সময়ই বরকত লাভে ধন্য—যেখানেই প্রয়োজন কল্যাণ করতে ব্রতী হয়ে যায়। এর শুভ প্রতিফল হচ্ছে আল্লাহ্ তাকে 'মহাসহজতার জন্যে (জান্নাতের জন্যে) সহজতা দান করবে, যেমন তার মন দান-এর জন্যে সহজপন্থী ছিল।

অপর ধরনের লোক এর প্রতিকূলে, আল্লাহ্ তাদের নিন্দা করেছেন, এবং কঠিনতর দিক সহজ করে দেন। কেননা তারা কার্পণ্য করেছে তারা বিমুখ হয়েছে এবং মহাসুন্দরকে অস্বীকার করেছে। এ লোকেরা লোভী, পরশ্রীকাতর, নিজেদের ধন-মালের কার্পণ্য করেছে। নিজেদেরকে আল্লাহ থেকেও বিমুখ লোকদের থেকেও মুখাপেক্ষীহীন বানিয়েছে। আল্লাহ সত্যিকার মুমিনদের জন্যে যে উত্তম পরিণতির ওয়াদা করেছেন তাকে অসত্য মনে করেছে। এ কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের ভয় দেখিয়েছেন। তাতে যাবে শুধু সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যে সত্যকে সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং বিমুখ হয়ে গেছে। যেমন মহাসুন্দরকে যে লোক অসত্য মনে করে এবং দান ও তাকওয়া থেকে বিরত থাকে। আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহিজগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। তার ওপর কারো অনুগ্রহ নিয়ামত এমন নেই, যার বদলা তাকে দিতে হতে পারে। সে তো শুধু নিজের মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই এ কাজ করে। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

এই সূরাটি কুরআনের মক্কী সূরাসমূহের মধ্যে প্রথম দিকের অবতীর্ণ সূরা। তাতে এ দুটি আদর্শ চরিত্র প্রকট করে তোলা হয়েছে, ইসলাম ধন-মালের ক্ষেত্রে এবং ধন-মালের মালিক—ধনী লোকদের ব্যাপারে কোন্ সহজ পথটি প্রদর্শন করে, সে দিকেই ইঙ্গিত করেছে। ইসলাম যে ধরনের চরিত্রকে পসন্দ করে এবং আল্লাহ্ যে চরিত্রে সন্তুষ্ট হন তাও স্পষ্ট করে তুলেছে এ আয়াত।

আল্লাহ্র চরিত্রে ভূষিত হওয়া

মানুষ যদি কার্পণ্য ও লোভ থেকে পবিত্র হতে পারে, দান-ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতে পারে, তাহলেই সে মানবীয় লোভের পংকিলতা—'মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা হয়েছে'[১] বলে যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—থেকে উর্ধ্বে উঠতে পারে, আল্লাহ্ প্রদত্ত উচ্চতর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে পারে ভূষিত হতে। কেননা মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসীম গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে কল্যাণ, রহমত, অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ—আল্লাহ্র নিজের লভ্য কোন স্বার্থ ছাড়াই। এ গুণাবলী অর্জনের উদ্দেশ্যে মানবীয় শক্তি সামর্থ্যের যতটা কুলায়—চেষ্টা চালিয়ে আল্লাহ্র চরিত্রে ভূষিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। আর তা-ই হচ্ছে মানুষের উৎকর্ষের চরমতম মান।

---

১. الاسراء - ١٠٠

ইমাম আর-রাযী বলেছেন[১], 'মানুষ যে 'নফসে-নাতেকা'র দরুন মানুষ হয়েছে তার দুটি শক্তি ঃ মতবাদগত এবং বাস্তব কর্মগত। মতবাদগত শক্তির পূর্ণত্ব নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র আদেশ— আইন বিধানের বড়ত্ব স্বীকার ও তার প্রতি মর্যাদা দানে। আর বাস্তব কর্মগত শক্তির পূর্ণত্ব নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করাতে। এ কারণে আল্লাহ যাকাত ফরয করেছেন, যেন আত্মার মৌল শক্তি এই পূর্ণত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর তা হচ্ছে সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া অনুগ্রহশীল হওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া। তাদের কল্যাণ সাধনে সদা সচেষ্ট হওয়া, তাদের ওপর আপতিত বিপদ-আপদসমূহ বিদূরণকারী হওয়া। এই তত্ত্বকে[২] সম্মুখে রেখেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ -

তোমরা সকলে আল্লাহ্র চরিত্রে ভূষিত হও।[৩]

এহেন চরিত্র এবং সেই আত্মা—যাকে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে যাকাত প্রথার মাধ্যমে সৃষ্টি ও লালন করেছে—ত্যাগের চরিত্র ও কল্যাণের ভাবধারা—তা সেই সদা প্রবহমান ও সর্বক্ষণ কার্যকর দান-সাদকাসমূহ যা মুসলিম মহান ব্যক্তিগণ তাঁদের পরবর্তীকালের লোকদের উপকারার্থে রেখে গেছেন। কল্যাণমূলক ওয়াকফ ব্যবস্থা তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কল্যাণমূলক কাজের ঐকান্তিক আগ্রহে মুসলমানগণ ওয়াকফ ব্যবস্থা কায়েম করে তুলনাহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাদের দিলে যে মানুষের প্রতি কল্যাণবোধ ও আন্তরিক দরদ ছিল তারও প্রমাণ রেখে গেছেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের এই ভাবধারার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। লোকেরা বহু প্রকারের প্রয়োজনে বস্তুগত বা তাৎপর্যগত সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল—বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তারা। বরং মানব-বংশ ছাড়া কোন কোন জীবের ক্ষেত্রেও তাই।[৪]

---

১. التفسير الكبير ج ١٦ ص ١٠١

২. হাদীস হিসেবে রাসূলের এ কথাটি বর্ণনা করা হয় কিন্তু আমি তার কোন ভিত্তি পেলাম না। কে এ বর্ণনা করেছেন তাও জানা যায়নি।

৩. এই অর্থের নিকটবর্তী একটা কথাও রয়েছে। কোন জিনিস না পেয়ে তার মুখাপেক্ষী না থাকা কোন জিনিস পেয়ে মুখাপেক্ষীহীন হওয়ার চেয়ে অনেক বড় গুণ। কেননা কোন জিনিস পেয়ে যে মুখাপেক্ষী হয় তাতে সেই জিনিসের মুখাপেক্ষিতা প্রমাণিত হয়, তবে তা পেয়ে অন্য জিনিস থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা অর্জন করা ভিন্ন কথা। কিন্তু কোন জিনিস না পেয়ে তা থেকে মুখাপেক্ষীহীনতাই হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার সচ্ছলতা। এ কারণে কোন জিনিস না পেয়ে তা থেকে যে মুখাপেক্ষীহীনতা তা হচ্ছে মহান স্রষ্টার গুণ। তাই মহান আল্লাহ যখন তাঁর কোন কোন বান্দাকে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দিলেন, তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণ রিযিক দিলেন—এটা হল কোন জিনিস পেয়ে তা থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা হওয়া। তিনিই যখন তাকে যাকাত দেবার নির্দেশ দিলেন তখন তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, কোন জিনিস পেয়ে যে মুখাপেক্ষীহীনতা সে স্তর থেকে সেই উন্নত স্তরে তাকে নিয়ে যাওয়া, যা তার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন। আর তা হচ্ছে জিনিস পেয়ে তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন হওয়া।

৪. এই পর্যায়ের কিছু নমুনা দেখা যাবে এ গ্রন্থকার প্রণীত الايمان والحياة। গ্রন্থের الرحمة। পরিচ্ছেদ।

যাকাত আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সুন্দরকে সুন্দর বলে স্বীকার করা এবং নিয়ামতের শোকর—দাতার কৃতজ্ঞতা একান্তই অপরিহার্য। মানুষের বিবেক তার জন্যে তাড়া করে, প্রকৃতি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, নৈতিকতা তার দাবি করে এবং সকল প্রকার ধর্ম ও আইন ব্যবস্থা সেজন্যে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করে।

যাকাতদাতার মন-মানসিকতায় আল্লাহ্র শোকরের ভাবধারা জাগিয়ে দেয়। ইমাম গাযালী যেমন বলেছেন, আল্লাহর বান্দাগণের ওপর অফুরন্ত নিয়ামত—তার মনে, তার ধন-মালে। দৈহিক ইবাদতসমূহ দৈহিক নিয়ামতের শোকর, আর্থিক নিয়ামতের শোকর হয় আর্থিক ইবাদত পালন করে। যে দরিদ্র ব্যক্তির রিযিক সংকীর্ণ, নানাভাবে অভাবগ্রস্ত তার প্রতি যার দৃষ্টি পড়ে, তারপরও যার মনে আল্লাহ্র শোকরের ভাবধারা জাগে না এই ভেবে যে, আল্লাহ তাকে অন্য মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত দরাজ করার হীনতা থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং সে তার সম্পদের দশ ভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ কিংবা দশ ভাগের এক ভাগ ফসল দিয়ে তার শোকর আদায় করে না, তার মত সংকীর্ণমনা ও হীন চরিত্রের লোক আর কে হতে পারে?[১]

মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনায় যে গভীর ভাবধারা জাগ্রত হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই ভাবধারা যে, যাকাত হচ্ছে আল্লাহ্র নিয়ামতের বিনিময়। প্রতিটি নিয়ামতের বিনিময়ে মানুষের যাকাত দেয়া একান্ত আবশ্যক—সে নিয়ামত বস্তুগত হোক, কি তাৎপর্যগত। এ কারণে মুসলিম সমাজে এ কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত ঃ 'তুমি তোমার সুস্থতার যাকাত দাও, তোমার দৃষ্টিশক্তির যাকাত দাও, চোখের জ্যোতির যাকাত দাও, তোমার ইলমের যাকাত দাও, তোমার সন্তানদের পরম ভাল ও মহাসৌভাগ্যের যাকাত দাও' ..... এমনিভাবে একটি নির্মল ভাবধারা মুসলিমের মনে জেগে ওঠে। হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ 'প্রতিটি জিনিসেরই যাকাত দিতে হয়।'[২]

দুনিয়া প্রেমের চিকিৎসা

অপর দিক দিয়ে যাকাত মুসলিমের মনকে আল্লাহ্র প্রতি—পরকালের ব্যাপারে তার কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করে তোলে। দুনিয়ার প্রেমে মনের ভরপুর হওয়ার—ধন-মালের জন্যে পাগলপ্রায় হওয়ার চিকিৎসা হচ্ছে এ যাকাত। এ কারণে শরীয়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসেবে ধন-মালের মালিককে তার মালের কিছু অংশ তার হাত থেকে বের করার জন্যে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া একান্তই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছে। এই কিছু পরিমাণ মাল আলাদা করে কাউকে দিয়ে দেয়া ধন-মালের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ এবং মায়া মালিকের মনে রয়েছে তা চূর্ণ করে দিতে পারে। মনকে সেদিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়ে

---

১. الاحياء ج ١ص ١٩٢ ط الحلبى

২. হাদীসটি ইবনে মাজাহ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ৬দ্ধৃত করেছেন। তাবারানী উদ্ধৃত করেছেন সহল ইবনে সায়াদ থেকে, সুয়ূতী হাদীসটির যয়ীফ হওয়ার ইশারা করেছেন। মুনযেরী الترغيب। গ্রন্থেও এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

দেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। তার জন্যে হুঁশিয়ারী হতে পারে এদিক দিয়ে যে, ধন-মালের সন্ধানে নিমজ্জিত হলে মানুষ পরম সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। বরং পরম সৌভাগ্য লাভের অন্যতম পন্থা হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধন-মাল ব্যয় করা। অতএব বলা যায়, যাকাত ফরয করা হয়েছে অন্তর থেকে দুনিয়া ও ধন-মালের প্রেম রোগের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক চিকিৎসা বিধানের লক্ষ্যে।[১]

মানব মনের ওপর মালের প্রেম আধিপত্যশীল হয়ে পড়ার পরিণতি কি হতে পারে, এ পর্যায়ে ইমাম রাযী স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ[২]

> ধন-মালের আধিক্য ও প্রাচুর্য শক্তির তীব্রতা ও সামর্থ্যের পূর্ণত্ব সৃষ্টি করে। আর ধন-মাল বেশী বেশী চাওয়ার মানে বেশী বেশী শক্তি লাভের চেষ্টা। আর বেশী বেশী শক্তি লাভের চেষ্টা সেই শক্তিতে বেশী বেশী স্বাদ পাওয়ার বেশী বেশী চেষ্টা চালানো। আর স্বাদ আস্বাদনের বেশী বেশী আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বাধ্য করে সেই মাল লাভের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে, যা এই বেশী বেশী মাত্রার স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ করে দেয়। এভাবে ব্যাপারটি আবর্তনশীল হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মালের প্রাচুর্য বিধানে যদি চরম মাত্রার চেষ্টা চালানো হয়—ফলে বেশী মাত্রার শক্তি অর্জিত হবে। আর তা স্বাদ আস্বাদনের ইচ্ছা বেশী হবে, তা-ই আবার মানুষকে বেশী বেশী মাল পাওয়ার জন্যে চেষ্টানুবর্তী বানাবে—এভাবে। আর ব্যাপারটি যখন চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকবে, তখন আর কোন শেষ মাত্রা বা সীমা কখনই দেখা যাবে না। এ কারণে শরীয়াত একটা শেষ পর্যায় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর তা এভাবে যে, ধন-মালের মালিকের ওপর তার ধন-মালের একটা অংশ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন মনকে সেই অন্ধকারময় শেষহীন আবর্তনশীলতার চক্র থেকে নিষ্কৃতি দেয়া যায় এবং তাকে আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার পরিমণ্ডলে ফিরিয়ে এনে তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধানে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়।

তার অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাকে একটা শেষহীন চক্রের মধ্যে পড়ে অনন্ত কাল ধরে আবর্তিত হতে দেয়া পসন্দ করেন না। সে চক্রটি হচ্ছে ধন-মাল সংগ্রহ সঞ্চয়ের চক্র। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, ধন-মাল একটা উপায় মাধ্যম মাত্র, চরম লক্ষ্য নয়। একটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর তিনি তাকে বলে দিতে চান ঃ থাম, যা অর্জন করেছ তা থেকে ব্যয় কর, দান কর—এর মধ্যে আল্লাহ্‌র হক রয়েছে, তা আলাদা করে বের করে দিয়ে দাও—ফকীরের হক দিয়ে দাও —সমাজ সমষ্টির অধিকার আদায় কর।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য ধন-মাল উপার্জন ও সঞ্চয় করাকে 'মুবাহ' করে দিয়েছেন। দুনিয়ার যাবতীয় পাক-পরিচ্ছন্ন জিনিসই তার জন্যে জায়েয। কিন্তু তাকেই জীবনের একমাত্র চিন্তা-ধান্দার ব্যাপার ও চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করাতে আল্লাহ আদৌ রাজী নন। কেননা মানুষ তো তার চাইতেও অনেক উঁচু ও মহান উদ্দেশ্যের জন্যে সৃষ্ট

---

১. ও ২. তাঁর তাফসীর, ঐ, ১০১ পৃষ্ঠা।

হয়েছে। তার জন্যে নির্মিত হয়েছে সেই ঘর যা চিরন্তন। এ বিশ্বলোক—এ দুনিয়া মানুষের জন্যে সৃষ্ট। আর সে নিজে সৃষ্ট পরকালের জন্যে—আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্যে। এ দুনিয়াটা তো পরকালেরই পথ। মানুষ এই 'পথ'কে সুন্দর সুসজ্জিত করে গড়ে তুলুক, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সে একটা লক্ষ্যের পানে চলমান, একটা মহান লক্ষ্যের জন্যেই সে চেষ্টাকারী।

আল্লাহ তো ধন-মাল দেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন তাকেও, যাকে ভালোবাসেন না তাকেও। মুমিন ও কাফির উভয়কেই দেন। পাপী ও আল্লাহভীরু কাউকেই বঞ্চিত রাখেন না। বলেছেন ঃ

كُلاًّ نُّمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا –

এদেরকেও এবং ওদেরকেও উভয় শ্রেণীর লোকদেরকে আমরা (দুনিয়ায়) জীবনের সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি, এটা তোমার আল্লাহ্‌র দান। আর তোমার আল্লাহ্‌র দানকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন কেউ নেই।[১]

অতএব কোন লোকের হাতে ধন-মালের অবস্থিতি প্রমাণ করে না যে, সে খুবই উত্তম ব্যক্তি, খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি। বৈশিষ্ট্য মর্যাদা ও সার্বিক ভাল আল্লাহ্‌র জন্যে ধন-মাল ব্যয় করাতে নিহিত। আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করলেই ভাল ও বিশেষত্বের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব। তার হাতের জিনিস ব্যয় করতে হবে সে জিনিস পাওয়ার জন্যে যা আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-মাল একটা বড় নিয়ামত, কল্যাণের উৎস। কিন্তু তা এমন কল্যাণ যা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় যেমন পরীক্ষা করা হয় খারাপ জিনিস দিয়ে। বলেছেন ঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً –

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে কল্যাণে নিমজ্জিত করি, অকল্যাণেও।[২]

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ –

জেনে রাখ তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান পরীক্ষাস্বরূপ।[৩]

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ –

মানুষকে তার রব্ব যখন পরীক্ষা করেন, তখন তাকে সম্মানিত করেন এবং নিয়ামতদানে ভূষিত করেন।[৪]

এরূপ অবস্থায় মহাভাগ্যবান সে, যে নিজেকে ধন-মালের আমানতদার এবং তাতে সে আল্লাহ্‌র খলীফা মনে করে কাজ করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তা ব্যয় করে ঃ

---

১. بنى اسراءيل – ٢٠ ২. الانبياء – ٣٥

৩. التغابن – ١٠ ৪. الفجر – ١٥

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ -

এবং তোমরা ব্যয় কর সে জিনিস থেকে, যাতে তোমাদেরকে খলীফা বানানো হয়েছে।[১]

যাকাত ব্যবস্থা দুনিয়ার ফেতনা ও ধন-মালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রশিক্ষণ দেয় মুসলিম ব্যক্তিকে এভাবে যে, তা তাকে অর্থ ব্যয়ে অভ্যস্ত করে। আল্লাহ্র আদেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে চেষ্টা সাধনা করতে প্রস্তুত করে।

দুনিয়ায় জাতিসমূহ অনেক সময় নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। তার সমস্ত ভয়াবহ প্রস্তুতিও বন্যার তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায়, তার শত্রুরা তাতে হয়ত উত্তেজিত হয়, তা হচ্ছে, তার লোকেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে পড়ে যায়, সাহস-হিম্মত হারিয়ে ফেলে। মন-মানসিকতা চেতনাহীন হয়ে পড়ে, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা কর্পূরের মত উড়ে যায়। অন্তর্নিহিত আত্মা নিহত হয়। রাসূলে করীম (স)-এর এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ দুর্বলতা দুটি কারণে ঘটে থাকে ঃ দুনিয়া-প্রেম ও মৃত্যুভয়।

কাজেই মুসলমান যখন জানতে পারবে দুনিয়াকে পরকালের জন্যে কিভাবে ছাড়তে হয় এবং আল্লাহ্র জন্যে ধন-মাল ব্যয় করতে অভ্যস্ত হবে, অন্য লোকের কল্যাণ কামনায়—অন্য লোকের প্রয়োজন পূরণে সে স্বীয় মনের লালসা-বাসনাকে দমন করতে সক্ষম হবে, তখনই এ দুর্বলতার জমাট বাঁধা বরফ গলবে, মনে এক পরম শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটবে আর শেষ পর্যন্ত গোটা জাতি জেগে উঠবে, শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ধনী ব্যক্তিত্ব বিকাশে যাকাত

যাকাত যে 'তাজকিয়া' করে, তার তাৎপর্য হচ্ছে, ধনী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি, তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধন। তাই যে লোক কল্যাণের হাত প্রসারিত করে, ন্যায়সঙ্গত কাজ সম্পন্ন করে এবং তা নিজের ও তার হাতের সম্পদ ও শক্তি নিয়োজিত করে তার দ্বীনী ভাই ও মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, যেন তার ওপর আল্লাহ্র যে অধিকার আরোপিত তা সে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়, সে তার নিজের মধ্যে একটা প্রশান্তি, সম্প্রসারতা এবং তার বক্ষে উদারতা, বিশালতা-বিপুলতা অনুভব করতে শুরু করবে, যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সুখ অনুভব করবে। সে কার্যতই তার দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠে, তার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে এবং তার লালসা ও লোভের শয়তানকে দমন করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করবে।

এটাই হচ্ছে মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ—আত্মিক ঐশ্বর্য লাভ। কুরআনের আয়াতঃ تطهرهم وتزكيهم থেকে আমরা এ তাৎপর্যই অনুধাবন করতে পারছি। আয়াতে تزكيه শব্দটি تطهير শব্দের পরে 'এবং' বলে আনা হয়েছে। এ থেকেই উপরিউক্ত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা কুরআনের প্রতিটি শব্দ—প্রতি অক্ষরেরই একটা অর্থ আছে—একটা তাৎপর্য আছে।

---

১. الحديد - ٦

যাকাত ভালোবাসা উদ্ভাবক

যাকাত ধনী ব্যক্তি এবং তার সমাজ সমষ্টির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা—একটা গভীর সূক্ষ্ম সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কটি হয় খুবই দৃঢ়, দুশ্ছেদ্য। ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতাই এর মূল সূত্র। কেননা মানুষ যখন অন্য কারো সম্পর্কে জানতে পারে যে, তার কল্যাণে সে আগ্রহ রাখে—তার যাতে ভালো হয় সেই চেষ্টাই সে করে, তার জন্যে যা ক্ষতিকর তা সে দূর করতে চায়, তা হলে সে তাকে ভালোবাসবে স্বাভাবিকভাবেই। তার মন-মানস তার প্রতি আকৃষ্ট হবে অনিবার্যভাবে। এজন্যে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে লোক যার কল্যাণ করল তার হৃদয়ে তার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই ভালোবাসা জাগবে। আর যে তার অকল্যাণ করেছে, তার প্রতি স্বভাবতই জাগাবে অসন্তোষ ও ক্রোধ।[১] ফকীর- মিসকীনরাও যখন জানবে যে, এ ধনী ব্যক্তি তার ধন-মালের একটা অংশ তাদেরকে দেবে। তার ধন-মাল বেশী বেশী তাদের জন্যে, তার ব্যয়ের পরিমাণও অবশ্য বেশী হবে। তখন তারা তার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে, তার সাহস বৃদ্ধি করে। আর জনগণের এ মনোভাবের একটা প্রভাব অবশ্যই আছে। হৃদয়গুলোর উত্তাপ তাকে অধিক উৎসাহিত করবে। সে সব দো'আ—আন্তরিক শুভেচ্ছা সেই ব্যক্তি সর্বক্ষণ কল্যাণকর ও মহানুভবতার কাজে নিমগ্ন থাকার কারণ হয়ে দাঁড়াবে—যেমন ইমাম রাযী বলেছেন। আল্লাহ্‌র এ কথায় সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে ঃ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ -

যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তাই দুনিয়ায় টিকে থাকে।[২]

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ حَصِّنُوْا اَمْوَا لَكُمْ بِالزَّكَاةِ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল যাকাত দ্বারা সংরক্ষিত কর।[৩]

একই তাৎপর্য বহন করে।

যাকাত ধন-মালের পবিত্রতা বিধান করে

যাকাত যেমন মন-অন্তর-হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার বিধান করে, তেমনি তা ধনীর ধন-মালের পবিত্রতা সাধন করে, তার প্রবৃদ্ধি ঘটায়।

যাকাত ধন-মাল পবিত্র করে এভাবে যে, মালের সাথে অপর লোকের মাল মিলেমিশে থাকলে তা কলুষিত হয়। সেই অপরের মাল তা থেকে বের করে না দেয়া পর্যন্ত তা

---

১. ইবনে আদী الكامل। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, আবূ নয়ীম উদ্ধৃত করেছেন الحلية। গ্রন্থে, আর বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন شعب الايمان। গ্রন্থে—ইবনে মাসউদ থেকে, রাসূলের কথা হিসেবে। তবে সনদ যয়ীফ। বরং এটিকে 'সউজ' 'রচিত' বলা হয়েছে। বায়হাকী অবশ্য সহীহ বলেছেন ইবনে মাসউদের কথা হিসেবে। মাথাভী বলেছেন, এটি রাসূলের কথাও নয়, সাহাবীর কথাও নয়—বাতিল। التيسير ج١ ص ٤٨٥।

২. سورة الرعد – ١٧

৩. আবূ দাউদ 'মুরসাল' হিসেবে তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখও উদ্ধৃত করেছেন অনেক কয়জন সাহাবী থেকে রাসূলের কথা হিসেবে। সনদ ধারাবাহিক। মুনযেরী বলেছেনঃ মুরসাল হওয়াই অধিক গ্রহণীয়।

পবিত্র হতে পারে না। এদিকে লক্ষ্য রেখেই পূর্বকালের কেউ কেউ বলেছেন ঃ অপহৃত ইট কোন দালানে থাকলে তার ধ্বংস তাতেই গচ্ছিত হয়ে আছে। অনুরূপভাবে যে পয়সা ফকীর মিসকীনের—ধনীর মালের মধ্যে শামিল রয়ে গেছে, তার সবটাই তাতে কলুষিত হয়ে গেছে। এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে তখন তুমি তা থেকে খারাবীটা দূর করে দিলে।'[১]

রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত ও পূর্বে উদ্ধৃত ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালকে সংরক্ষিত কর' হাদীসটি সবচাইতে বড় কথা। ধনী ব্যক্তিরা এ সংরক্ষণ ব্যবস্থার খুব বেশী মুখাপেক্ষী। বিশেষ করে আমাদের এ যুগে—যখন চারদিকে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চলছে ও লাল বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

বস্তুত ধনীর মালের সাথে দুর্বল অক্ষম ফকীরের সম্পর্ক খুবই দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন। এমন কি কোন কোন ফিকাহবিদ এতদূর বলেছেন ঃ 'যাকাত মূল মালের মধ্যে শামিল, তা ধনীর কোন দায়িত্বের ব্যাপার নয়। তাই মূল মালটাই ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে যতক্ষণ না তা থেকে যাকাত বের করে দেয়া হবে। এ বিষয়েই বলা হয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসে ঃ

যাকাত যদি কোন মালের মধ্যে শামিল হয়ে মিলেমিশে থাকে তাহলে তা এ মালকে ধ্বংস করবে।

কোন কোন বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'তোমার মালের ওপর যাকাত ফরয ধার্য হয়ে থাকতে পারে। তা যদি তুমি বের করে না দাও তাহলে হারামটা হালালটাকে ধ্বংস করবে।[২]

শুধু তাই নয়, গোটা জাতির ধন-মাল হ্রাস পাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, আসমানী মুসিবত এসে যে সাধারণ উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং জাতীয় আয়ের হার নিম্নগামী হয়ে পড়ে, তাতে বুঝতে হবে তা মহান আল্লাহ্র গজব ছাড়া আর কিছু নয়। তা নেমে এসেছে এমন সমাজ ও জাতির লোকদের ওপর যারা পরস্পরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে না, পারস্পরিক সাহায্যের কোন ব্যবস্থা যাদের মধ্যে নেই, যাদের শক্তিমান ব্যক্তি তাদের দুর্বল ব্যক্তিকে ধারণ করে না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

> যে জাতি যাকাত দিতে অস্বীকৃত হয়েছে সে জাতি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হওয়াকে বাধা দিয়েছে। জন্তু-জানোয়াররা যদি না থাকত তাহলে সেই অবস্থায় বৃষ্টিপাত আদৌ হত না।[৩]

ব্যক্তি ও সমষ্টির ধন-মাল থেকে ধ্বংস ও হ্রাসপ্রাপ্তির কারণসমূহ থেকে পবিত্রকরণ ও সংরক্ষণের একটি মাত্র পন্থা হচ্ছে, তা থেকে আল্লাহ্র হক ও গরীবের হক বের করা। আর তাই হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা।

---

১. ইবনে খুজাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং হাকেম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন হযরত জাবি থেকে। এ হাদীস সম্পর্কে কথা আছে, তা বলা হবে অষ্টম অধ্যায়ে।

২. এ হাদীসের সূত্র পূর্বে বলা হয়েছে। ৩. এর উৎস ও সূত্র পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাকাত হারাম মাল পবিত্র করে না

আমরা যখন বলি, যাকাত ধন-মালের পবিত্রতা বিধানকারী, তার প্রবৃদ্ধির কারণ, তাতে বরকত হওয়ার উসিলা তখন আমরা হালাল মালের কথাই বলি। হালাল মাল সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। যে মাল তার মালিক বা দখলদারের হাতে শরীয়াতসম্মত পন্থায় পৌঁছেছে, তা-ই হালাল মাল, কিন্তু খবীস খারাপ মাল তা যা অপহরণ, ছিনতাই, ঘুষ, অকারণ মূল্য বৃদ্ধিকরণ কিংবা সুদ ও জুয়া খেলা থেকে প্রাপ্ত কিংবা লোকদের ধন-মাল হরণ করার যে কোন হারাম পন্থায় লব্ধ ধন-মালকে যাকাত পবিত্র করে না, তাতে বরকত সৃষ্টি করে না। কোন কোন বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানী খুব সত্যই বলেছেনঃ 'হারাম মাল যাকাত দ্বারা পবিত্রকরণটা ঠিক প্রস্রাব দিয়ে পায়খানা ধোয়ার মত।'

বড় বা ছোট বহু চোর-ডাকাত—যারা চৌর্যবৃত্তি বা নানা মিথ্যা ও বিভ্রান্তকারী নামের অধীন লুকিয়ে নেয়ার দক্ষতায় খুব খ্যাতি অর্জন করেছে—তারা মনে করে যে, তারা সুদ-ঘুষের মাধ্যমে যা উপার্জন করেছে এবং যে সব হারাম মাল সঞ্চয় করেছে তা থেকে কিছু অংশ সাদকা করে দিলেই যথেষ্ট হবে। আর এভাবে তারা যখন আল্লাহ্র কাছে 'মকবুল' হয়ে যাবে তখন জনগণের কাছেও নির্দোষ নিষ্পাপ ও পবিত্র সাব্যস্ত হবে।

আসলে এটা একটা মিথ্যা ধারণা। ইসলাম এ ধারণাকে অসত্য বলছে, তা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। ইসলামের নবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাইয়্যেব পবিত্র মহান, তিনি তাইয়্যেব—পবিত্র ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না।[১] বলেছেন ঃ 'যে লোক হারাম উপায়ে মাল সংগ্রহ করল, পরে তা দান করে দিল, এতে তার কোন শুভ ফল প্রাপ্য হবে না। বরং তা বোঝাটা তার ওপরই চাপবে।'[২] আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা বা চুরি করা মালের সাদকা (যাকাত) কবুল করেন না, অযুবিহীন নামাযও গ্রহণ করেন না।'[৩]

বস্তুত এই ধরনের কলুষযুক্ত ধন-মালের যাকাত আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না, যেমন অযুর পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না।

তিনি আরও বলেছেন ঃ যার মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কোন বান্দাহ যদি হারাম মাল উপার্জন করে তা দান করে তার পরিমাণ হ্রাস পাবে—তা থেকে ব্যয় করা হলে তাতে তার জন্যে কোন বরকত হবে না। আর তা তার পিঠের পিছনে রেখে দিলে তা জাহান্নামের দিকেই তার পথ প্রশস্ত করবে। আল্লাহ খারাপকে খারাপ দ্বারা দূর করেননা; বরং খারাপকে দূর করেন ভালোর দ্বারা। কেননা খারাপ খারাপকে নির্মূল করতে পারে না।[৪]

---

১. হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী (الترغيب والترهيب ج ٢ ص ١١) উদ্ধৃত করেছেন। সহীহ বুখারীতে অনুরূপ বর্ণনা হয়েছে كتاب الزكاة - باب الصدقة من كسب طيب

২. হাদীসটি ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বান তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এবং হাকেম উদ্ধৃত করেছেন। হাকেম বলেছেন হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ। (الترغيب والترهيب ج ١ ص ٢٦٦)

৩. হাদীসটি আবূ দাউদ সহীহ সনদে উদ্ধৃত করেছেন। উপরে তারই ভাষা। মুসলিমও তাঁর সহীহ গ্রন্থে তুলেছেন। (فتح البارى ج ٣ ص ١٧٨)

৪. হাদীসটি আহমাদ প্রমুখ এমন সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, যাকে ইলমে হাদীসের কোন কোন আলেম 'হাসান' বলেছেন। (الترغيب والترهيب ج ٢ ص ١٤)

কুরতুবী বলেছেন, আল্লাহ্ হারাম মালের 'দান' কবুল করেন না; কেননা তা তো দানকারীর মালিকানাভুক্ত নয়, সে মালের ওপর তার হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ তা দান করে সে তার ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। তা যদি তার কাছ থেকে কবুল করা হয় তাহলে যা একদিক দিয়ে নিষিদ্ধ, তাই আদিষ্ট হয়ে পড়া আবশ্যক হয়।' কিন্তু তা অসম্ভব।[১]

বরং হানাফী আলিমদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ কেউ যদি ফকীরকে হারাম মাল থেকে কিছু দেয় ও তার ফলে সে সওয়াব পাওয়ার আশা করে, তাহলে এ কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। আর সে ফকীর যদি সে কথা জানতে পারা সত্ত্বেও তার জন্যে দো'আ করে, তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে। অপর কোন লোক তা শুনতে পেয়ে তার দো'আর ওপর সে যদি 'আমিন' বলে—অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও—তাহলে সেও অনুরূপ কাফির হবে। এমনিভাবে হারাম মাল দ্বারা যদি কোন মসজিদ নির্মিত হয়—তার ফলে আল্লাহ্র নৈকট্যের আশা করা হয়—তাহলেও অনুরূপ পরিণতি হবে। কেননা সে এমন কাজের সওয়াব পেতে চাচ্ছে যার পরিণাম আযাব ছাড়া কিছু নয়। আর তা হতে পারে কেবল তখনই যদি হারামকে হালাল মনে করা হয়। কিন্তু সেটাও কুফরী। তবে এ সব কথা কেবল সেই হারাম সম্পর্কে যা নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। কোন সন্দেহপূর্ণ জিনিস সম্পর্কে উপরিউক্ত কথা প্রযোজ্য হবে না।[২]

তাই কেউ যেন এমন ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ না করে যে, যাকাত কাফফারা হবে অপহরণকারীর অপহরণ অপরাধের, ঘুষখোরের ঘুষখোরীর অপরাধের, সুদখোরীর সুদী কারবারের অপবিত্রতা থেকে। না তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও দুঃখজনক। কেননা হারাম মালের কোন যাকাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আসলে তাতে যাকাতই ফরয হয় না। যাকাত ফরয হয় কেবলমাত্র সেই মালে, যা একজনের হালালভাবে মালিকানাভুক্ত। আর ইসলাম হারাম মালের কোন মালিকানাই স্বীকার করে না, তার ওপর যত আশার জালই বুনানো হোক-না কেন। ইসলাম পরের ধন হরণকারী ঘুষখোর ও ছোট বা বড় চোরদের কখনও বলে না ঃ 'তোমরা যাকাত দাও; বরং তাদেরকে সর্বাগ্রে বলে, তোমাদের দখলে যে সব মাল-সম্পদ রয়েছে তা সবই তার আসল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দাও।'

যাকাত ধন-মালের প্রবৃদ্ধির কারণ

এ সবের পর যাকাত পর্যায়ে বক্তব্য হচ্ছে তা ধন-মালের প্রবৃদ্ধির কারণ। তা তাতে বরকত সৃষ্টি করে। অবশ্য কেউ কেউ এ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে। কেননা যাকাত তো বাহ্যত মালের পরিমাণ হ্রাস করে—তার একটি অংশ অপরকে দেয়া হয় বলে। তাহলে তা মালের প্রবৃদ্ধি ও পরিমাণে বেশী হওয়ার কারণ হয় কি করে?

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত লোকেরা জানেন যে, বাহ্যত এ হ্রাস প্রাপ্তি

---

১. فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۰

২. দেখুন ঃ حاشية ردالمختار على الدر المختار ج ۲ ص ۲۷

প্রকৃতপক্ষে প্রবৃদ্ধিতে পরিণতি লাভ করবে। সামষ্টিক ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি ধনীর মূল সম্পদেই প্রবৃদ্ধি ঘটবে। কেননা যাকাত বাবদ দিয়ে দেয়া এ সামান্য অংশ তার কাছে কয়েকগুণ বেশী হয়ে ফিরে আসে এমনভাবে যা সে হয় জানতে পারে, না হয় জানতেই পারে না।

এরই কাছাকাছি একটি ব্যাপার আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি। তা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ ধন-মালের মালিক কোন কোন দেশ কোন কোন দরিদ্র দেশকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে—আল্লাহর ওয়াস্তে নয়—দেয় এই উদ্দেশ্যে, যেন সে দেশের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সে দেশ সেই ধনী দেশেরই উৎপাদন ক্রয় করবে।

আমরা আরও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখতে পাব, এক ব্যক্তির হাতে একটি টাকার জন্যে তার প্রাণ ধুক ধুক করে ওঠে তার মায়ায় এবং তার জন্যে দো'আয় মুখগুলো নড়ে ওঠে, ধ্বনি করে। সাহায্য ও সংরক্ষণের হস্ত তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। টাকাসহ এই ব্যক্তি বিপুল শক্তির অধিকারী হয়ে পড়ে, অন্যের হাতের বিপুল টাকার তুলনায় সে অধিক গতিশীল ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যাখ্যার দিকেই সম্ভবত কুরআনের এই আয়াতসমূহ ইঙ্গিত করে ঃ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

তোমরা যা ব্যয় কর তা তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দেয়। আসলে সেই আল্লাহই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১]

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং নির্লজ্জ কার্যাবলীর আদেশ করে তোমাদেরকে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা দানের ওয়াদা করেন এবং অনুগ্রহ দানের। আর আল্লাহ বিপুল বিশাল সর্বজ্ঞ।[২]

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

তোমরা যে যাকাত দাও, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার ইচ্ছা কর তোমরা, তাহলে তারাই প্রবৃদ্ধির অধিকারী।[৩]

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ -

আল্লাহ সুদ নির্মূল করে দেন এবং দান-সাদকা-যাকাত বৃদ্ধি করে দেন।[৪]

১. سباء – ٣٩ ২. البقره – ٢٦٨
৩. الروم – ٣٩ ৪. البقره – ٢٧٦

এই স্থলাভিষিক্তকরণ ও প্রবৃদ্ধি সাধনে মহান আল্লাহ তা'আলার যে অনুগ্রহের বিরাট অবদান রয়েছে তার কার্যকারিতার কথা তোমরা ভুলে যাবে না, যদিও আমরা তার কার্যকরণের কোন খবর রাখি না। আল্লাহ্ তো তাই দান করেন—যা তিনি চান, যার জন্যে তিনি চান। আর আল্লাহ অসীম বিরাট অনুগ্রহশীল

উপরন্তু মুসলমানের ধন-মাল থেকে প্রতি বছর যে সম্পদ যাকাত বাবদ গৃহীত হয়, পিছন দিক থেকে তা-ই তার ধন-মালকে অধিক মুনাফা ও তার সম্পদকে অধিক প্রবৃদ্ধি দানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হয় তা স্বতঃই কিংবা অন্যের সাথে শরীকানার ভিত্তিতে। শেষ পর্যন্ত যাকাত সে মূলধনকে খেয়ে ফেলে না। আর এই বেশী মুনাফা ধন-মালের মালিকরাই পেয়ে থাকে, এটাই আল্লাহ্র স্থায়ী নিয়ম। তিনি যা গ্রহণ করেন তা কয়েক গুণ বেশী তাকে প্রদান করাই আল্লাহ্র রীতি। তাতে অন্যথা হতে পারে না।

দ্বিতীয় আলোচনা

গ্রহণকারীর জীবনে যাকাতের লক্ষ্য ও প্রভাব

যাকাত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে তা মানুষের জন্যে মর্যাদাহানিকর অবস্থা থেকে মুক্তি বিধায়ক। জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনা ও কালের আবর্তন-বিবর্তনসমূহের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামের তা এক কার্যকর ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ। কোন্ লোক যাকাত গ্রহণ করে এবং কোন্ সব ব্যক্তি তা পেয়ে উপকৃত হয়?

সে হল ফকীর-দরিদ্র ব্যক্তি, দারিদ্র্য যাকে পর্যুদস্ত করেছে;

অথবা সেই মিসকীন, অভাবগ্রস্ততা যাকে ধূলি লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত অবমানিত করেছে;

অথবা সেই ক্রীতদাস, দাসত্ব শৃংখল যাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত করেছে;

অথবা সেই ঋণগ্রস্ত, ঋণ যাকে হেস্ত-নেস্ত করেছে;

অথবা সেই নিঃস্ব পথিক, যে তার পরিবারবর্গ ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে অসহায় হয়ে পড়েছে।

যাকাত তার গ্রহণকারীকে অভাবগ্রস্ততা থেকে মুক্তি দেয়

ইসলাম চায় মানুষ অতীব উত্তম ও পবিত্র জীবন যাপন করুক। এ জীবনে তারা প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনকে ধন্য করে তুলুক। আসমান ও জমিনের সব 'বরাকাত' তারা লাভ করুক। ওপর থেকে ভ্রান্ত নিয়ামতসমূহ এবং নীচ থেকে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ আয়ত্ত করে তারা ধন্য হোক, সেই সৌভাগ্য তারা অনুভব করুক, যা তাদের অবয়বসমূহকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে দেবে, পরম শান্তি ও সমৃদ্ধিতে তাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরে দেবে, আল্লাহ্র নিয়ামতের চেতনায় তাদের মন ও জীবন ভরপুর হয়ে উঠুক।

বস্তুত মানুষের সৌভাগ্য বিধানে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার বাস্তবায়নকে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বানিয়ে দিয়েছে ইসলাম। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

ثَلاَثٌ مِنَ السَّعَادَةِ - اَلْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتُعْجِبُكَ - وَتَغِيْبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلٰى نَفْسِهَا وَمَالِكَ - وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ وَطِيْئَةً فَتُلْحِقُكَ بِاَصْحَابِكَ - وَالدَّارُ تَكُوْنُ وَاسِعَةً كَثِيْرَةَ الْمُرَافِقِ -

তিনটি হচ্ছে মহাসৌভাগ্যের অবলম্বন ঃ সেই স্ত্রী, যাকে তুমি দেখলে সে তোমাকে উৎফুল্ল সন্তুষ্ট করে দেবে, তুমি তার কাছে অনুপস্থিত থাকলে সে নিজেকে ও তোমার ধন-মালকে সংরক্ষিত রাখে। সেই যানবাহন যা স্থিতিশীল সুদৃঢ় হবে এবং তা তোমাকে তোমার বন্ধু-স্বজনদের সাথে মিলিত করবে। আর ঘরবাড়ি, যা প্রশস্ত হবে এবং খুবই আরামদায়ক হবে।[১]

অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ চারটি হচ্ছে সৌভাগ্যের উপাদান—সত্যাচারিণী স্ত্রী, প্রশস্ত বসত ঘর, চরিত্রবান প্রতিবেশী, সহজগামী যানবাহন। আর চারটি হচ্ছে দুর্ভাগ্যের কারণ—দুশ্চরিত্র প্রতিবেশী, খারাপ স্ত্রী, খারাপ যানবাহন ও সংকীর্ণ বসত ঘর।[২]

এ হচ্ছে দাম্পত্য জীবন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বসতবাটি ও প্রতিবেশের দিক দিয়ে মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে নবুয়তের সূত্রে প্রাপ্ত দিগন্ত উজ্জ্বলকারী আলোকসম্পাত। বাস্তব জীবন এ কথার সত্যতা সর্বাধিক মাত্রার বাস্তবতার আলোকে সত্যায়িত করে তুলেছে।

হ্যাঁ, ইসলাম চায় মানুষ ধনাঢ্যতায় সৌভাগ্যবান হোক। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় জর্জরিত হোক কোন মানুষ তা ইসলামের কাম্য নয়। কিন্তু সে দারিদ্র্য যদি বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি ও সামষ্টিক জুলুম পীড়ন-বঞ্চনার দরুন হয়, কেউ অন্য কারোর অধিকার হরণ করেছে—এ কারণে দেখা দেয়, তা হলে দারিদ্র্যের সাথে ইসলামের শত্রুতা—দারিদ্র্যের প্রতি ইসলামের ঘৃণা ও বিদ্বেষ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ইসলামী সমাজ বিধান ও বস্তুবাদী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে উদরপূর্তি ও যৌন তৃপ্তিতে চরিতার্থ করতে চায়। বস্তুগত দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছান্দ্যের পরিধি অতিক্রম করা তার সাধ্যাতীত। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততা তার দূরতম লক্ষ্য। তার স্বপ্ন স্বর্গ সবই এ পৃথিবীতে। এ ছাড়া কোন 'স্বর্গের চিন্তা করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু ইসলামী জীবন বিধান ধনাঢ্যতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে মানুষের 'রূহ'কে মহান আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করতে চায়। চায়, তারা যেন খাদ্যের সন্ধানে একান্তভাবে মশগুল এবং খাদ্যের সংগ্রামে সংগ্রামলিপ্ত হয়ে না পড়ে, যেন ভুলে না যায় আল্লাহ্‌র পরিচিতি, আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সেই সাথে পরকালীন জীবনের বিষয়টিও যেন তাদের চোখের আড়াল পড়ে না যায়। কেননা সেই জীবনটাই তো অধিকতর কল্যাণময় এবং চিরন্তন।

মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যখন বৃদ্ধি পায়, তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ যখন নিশ্চিন্ততার মাত্রায় পৌঁছায়, তখনই তার জীবনে স্বস্তি আসে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে গভীর তন্ময়তা সহকারে আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। সেই আল্লাহই তো মানুষকে ক্ষুধার অন্ন যোগান এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেন।

---

১. رواه الحاكم (الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٦٨)

২. رواه ابن حبان فى صيحه (المصدر نفسه)

ইসলাম যে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে, ধনাঢ্যতা পসন্দ করে এবং মানুষের পবিত্র স্বচ্ছন্দ জীবন কামনা করে, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তার দরিদ্র রাসূলকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছিলেন ঃ

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ -

এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাকে দরিদ্র পেয়েছেন, অতঃপর তিনিই তোমাকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন।[১]

হিজরতের পর মুসলমানদের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ

فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর বিশেষ সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন পবিত্র দ্রব্যাদি—যেন তোমরা শোকর কর।[২]

রাসূলে করীম (স)-এর একটা প্রসিদ্ধ দো'আ হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

হে আমাদের আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, নৈতিক পবিত্রতা, রোগ নিরাময়তা এবং ধনাঢ্যতার প্রার্থনা করছি।[৩]

রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র শোকর আদায়করী ধনী ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল দরিদ্র ব্যক্তির ওপর অধিক মর্যাদাবান বলে ঘোষণা করেছেন।[৪]

কুরআন মজীদ ধনাঢ্যতা ও পবিত্র জীবনকে নেককার মুমিনদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া তাৎক্ষণিক সওয়াব বা শুভ প্রতিফলস্বরূপ দান বলে ঘোষণা করেছে। আর কাফির-ফাসিক ব্যক্তিদের জন্যে দারিদ্র্য ও জীবন সংকীর্ণতাকে তাৎক্ষণিক আযাব হিসেবে ব্যবস্থা করে থাকেন বলে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً -

যে পুরুষ বা নারীই নেক আমল করবে, ঈমানদার হয়ে তাকেই আমরা পবিত্র জীবন যাপনের সুযোগ করে দেব।[৫]

---

১. سورة الضحى - ٨ ২. سورة الانفال - ٩٦

৩. رواه مسلم - ترمذى - ابن ماجه عن ابن مسعود

৪. যেমন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ বিলুপ্তি বলে লোকের মজুরী নিয়ে গেছে (বুখারী, মুসলিম)।

৫. سورة النحل - ٦٧

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ -

নগরবাসীরা যদি ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে আমরা তাদের জন্যে আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দেব।[১]

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا - وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

যে লোক আল্লাহকে ভয় করবে তিনি তার জন্যে মুক্তির পথ বানিয়ে দেবেন এবং তাকে রিযিক দেবেন এমন পথে। যা সে চিন্তাও করতে পারে না।[২]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -

এবং আল্লাহ দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন একটি নগরের কথা যা খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল। তথায় প্রাচুর্য সহকারে রিযিক আসত সব দিক দিয়ে। সেই নগরবাসীরা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি। ফলে আল্লাহ তাদেকে ক্ষুধার পোশাক পরিয়ে ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করান তাদের কার্যকলাপের বিনিময়ে।[৩]

হযরত আদম ও হাওয়া যেদিন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন তখনই সৃষ্টিকুলে আল্লাহ্‌র চলিত বিধানের কথা তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ

اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى - وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى -

তোমরা দুইজন নেমে যাও একত্রে। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার কাছ থেকে হেদায়েত আসতে থাকবে। পরে যে আমার হেদায়েত অনুসারে চলবে সে পথভ্রষ্ট হবে না—হতভাগ্য হবে না। আর যে লোক আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে তার জন্যে সংকীর্ণতাপূর্ণ জীবন যাত্রা হবে এবং কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশরের ময়দানে নিয়ে আসব। —(সূরা ত্ব-হা ঃ ১২৪)

এসব আয়াতের আলোকে আমাদের সম্মুখে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাসাউফপন্থীদের পরিবেশে দারিদ্র্যকে যেভাবে মহান মনে করা হচ্ছে, তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে এবং সাধারণভাবে ধনাঢ্যতার নিন্দা করা হচ্ছে সেদিক দিয়ে লোকদের

---

১. الاعراف - ٩٦ ২. الطلاق ٢-٣ ৩. النحل - ١١٢

ভীত-সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে—এ সব নতুন সৃষ্টি চিন্তাধারা আসলে পারসিক মানুষের উৎক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, ভারতীয় বৈষ্ণববাদী চিন্তাধারা, খৃষ্টীয় পাদ্রীসুলভ চিন্তাধারা। এই সব চিন্তা ইসলামের নয়, বাইরে থেকে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী চিন্তাধারা এবং বিদ'আত।[১]

এ সব কারণেই আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরয করেছেন এবং তাকে দ্বীন ইসলামের একটা বড় অবদানরূপে গণ্য করেছেন। তা ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্র্যের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে। তা পেয়ে দরিদ্ররা তাদের বস্তুগত প্রয়োজন ও অভাব-অনটন দূর করবে—খাবার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবে। সেই সাথে জৈব-মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে—যেমন বিয়ে। মনীষিগণ তাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনের জরুরী অংশ বলে গণ্য করেছেন, মানুষের আত্মিক প্রয়োজনের দিক দিয়েও তার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন লেখাপড়ায় নিয়োজিত লোকদের জন্যে বইপত্র প্রয়োজন।

এ ফকীর-দরিদ্র ব্যক্তি যদি এসব জিনিস পায়, তবেই সে জীবন যাত্রা শুরু করতে ও তা চালিয়ে নিতে পারে। পারে আল্লাহ্র আনুগত্য অনুসরণে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে। আর তখনই সে অনুভব করতে পারবে যে সেও সমাজদেহের একটা জীবন্ত 'অংশ' বিশেষ। তাকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া হবে না। সে নয় কোন অর্থহীন মূল্যহীন ব্যক্তি। সে মানুষের মহান সমাজের একজন, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে, তার গুরুত্ব যথাযথভাবে স্বীকার করা হচ্ছে। সে বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করা হবে, তার প্রতি সহায়তা-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা হবে—খুবই সম্মানজনকভাবে। তার ওপর কারো ব্যক্তিগত দয়া-অনুগ্রহের বোঝা চাপানো হবে না। তার দোহাই দিয়ে কেউ তাকে জ্বালাযন্ত্রণাও দেবে না। তার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা সমাজে কার্যকর রয়েছে। রাষ্ট্রের হস্তই তার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। সে মর্যাদাবান, উন্নত শির, উচ্চতর সম্মানের অধিকারী। কেননা সে তো তার জন্যে নির্দিষ্ট ও সর্বজনজ্ঞাত অধিকার পাচ্ছে। তার ন্যায্য অংশ পাওয়ায় কোন অনিশ্চয়তাই নেই।

এমন কি ইসলামী সমাজ সংস্থার কাঠামো চুরমার হয়ে গেলেও এবং মুসলিম ব্যক্তিগণ নিজেরাই যাকাত বন্টনকারী হয়ে পড়লেও কুরআন মজীদ তাদের সাবধান করে দিয়েছে দরিদ্র মিসকীনদের কোনরূপ অপমান-লাঞ্ছনা দেয়া—তাদের অনুভূতির ওপর আঘাত হানা—গ্রহীতার ওপর দাতার উচ্চ কর্তৃত্ব দেখানোর মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে। তাদের ওপর কোনরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেও নিষেধ করেছে। কোন দিক দিয়েই তার মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কোন কাজ করাই সম্ভবপর রাখা হয়নি। সে যেন একজন মুসলিম হিসাবে প্রাপ্য মর্যাদা পেতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

---

১. দেখুন মৎপ্রণীত نظرة الاسلام الى অধ্যায় مشكاة الفقر وكيف عالجها الاسلام الفقر।

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَـاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَـوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَ صَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَ كَهٗ صَلْدًا -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা তোমাদের দান-সাদকাকে অর্থহীন বানিয়ে দিও না অনুগ্রহ দেখিয়ে ও কষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির মত, যে তার মাল খরচ করে লোক দেখানোর জন্যে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না। এ ব্যক্তির এই কাজের দৃষ্টান্ত হচ্ছে শক্ত প্রস্তর, তার ওপর মাটি, মুষলধারার বৃষ্টি পৌছে শূন্য শক্ত প্রস্তরই ফেলে রাখাল।[১]

ফকীর-মিসকীনের এ চেতনা থাকতে হবে যে, সে সমাজে অসহায় ধ্বংসশীল ব্যক্তি নয়। সমাজ তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করে। কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। তার ব্যক্তিত্বের জন্যে একটা বিরাট উপার্জন রয়েছে। তার মানসিকতার পবিত্রতা বিধানের ব্যবস্থাও আছে। তার এই চেতনাই তার জন্যে একটা বিরাট সম্পদ, গোটা উম্মতের জন্যে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব এবং মহান আল্লাহর নিকট তার সম্মান ও মর্যাদা—উভয়ই যুগপতভাবে দাবি করে যে, সমাজে এমন দারিদ্র্য থাকতে দেয়া হবে না, যা ব্যক্তিকে নিজেকে ও তার আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হতে বাধ্য করে, তার দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে তাকে উদাসীন বানায়, তাকে গোটা জাতি থেকেও তার দায়িত্ব কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সে কেবল তার ক্ষুধা নিবৃত্তি, লজ্জা নিবারণ ও আশ্রয় অর্জনের চিন্তায়ই দিনরাত মশগুল থাকতে বাধ্য হবে। শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

ইসলাম দারিদ্র্য ও লোকদের অভাব-অনটনকে ঘৃণা করে। কেননা ইসলাম চায় তাদের বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ হোক—যেন সে তার চাইতেও বিরাট ও জাতীয় ব্যাপারসমূহে অংশ গ্রহণের অবসর পায়—যা মানবতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, আল্লাহ বনি আদমকে মর্যাদা দিয়েছেন তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। 'নিশ্চয়ই আদম বংশকে আমরা সম্মানিত করেছি স্থল ও জলভাগে এবং তাদের রিযিক দিয়েছি পবিত্র জিনিসসমূহ এবং তাদের মর্যাদাবান বানিয়েছি যথার্থভাবে আমার বহু সৃষ্টির ওপর।[২]

আল্লাহ মানুষকে কার্যত সম্মানিত করেছেন বিবেক-বুদ্ধি পারস্পরিক আকর্ষণ এবং দৈহিক প্রয়োজনেরও উর্ধ্বে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও চেতনা দিয়ে। এক্ষণে জীবনের

---

১. سورة البقره - ٢٦٤

২. العدالة الاجتماعية فى الاسلام ص ١٣٢ - ١٣٣

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য থাকলেই মানুষ এসব চিন্তামূলক ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক চেতনা পরিতৃপ্ত রাখার সুযোগ পেতে পারে। আর যদি তা থাকে তাহলে তার এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়। তখন মানুষ নিতান্ত জীবজন্তুর পর্যায়ে নেমে যায়। তা-ও নয়, কেননা জন্তু-জানোয়াররা তো স্বাভাবিক নিয়মেই খাদ্য ও পানীয় পেয়ে থাকে এবং প্রায়ই তা থেকে বঞ্চিত থাকে না, উপরন্তু জন্তুরা খেলা করে, লম্ফ-ঝম্ফ দেয়, আনন্দ-উল্লাস করে। অনেক পাখী গলা খুলে গান গায়—ধ্বনি করে, জীবন নিয়ে নৃত্য করে এবং তা করে পেটভরা খাদ্য ও পানীয় পাওয়ার পর।

কিন্তু মানুষের কি হয়েছে, আল্লাহ্র নিকট তার মান-মর্যাদারই বা কি মূল্য ? তাকে তো খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন এতটা মশগুল করে রাখে যে পাখী ও জন্তু-জানোয়ারেরা কি পাচ্ছে; তা অনুধাবন করার মত শক্তিও তার থাকে না। তারা আল্লাহ্র নিকট সম্মানার্হ হওয়ার পর তাদের ওপর যে কর্তব্য-দায়িত্ব চেপেছে তা যথাযথভাবে পালন করার মত অবকাশও তারা পায় না। তার সময় ও শ্রম নিঃশেষ করেও যখন সে প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যপানীয় পায় না, তখন তা তার ওপর এমন একটা আঘাত হয়ে পড়ে, যা আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জিকে আয়ত্ত করার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। মানুষ যে সমাজে বাস করে, তা-ও তার ব্যাপারে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তখন স্পষ্ট মনে হয়, এ এমন একটা পতিত সমাজ, যা আল্লাহ্র কাছে সম্মানার্হ হওয়ারও কোন অধিকার রাখে না। কেননা এই গোটা সমাজ-সমষ্টিই আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলেছে।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা। তাকে খলীফা বানানো হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, সে এ দুনিয়ার জীবনকে প্রবৃদ্ধি দান করবে, তাকে উন্নত করে তুলবে। পৃথিবীকে সুন্দর চাকচিক্যময় করে সজ্জিত করবে। পরে তার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য সে উপভোগ করবে। তারপরে আল্লাহ্র দেয়া এই অমূল্য নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করবে। কিন্তু মানুষ এ সবের কোন একটাও করতে পারে না, যদি তার জীবনটাই নিঃশেষ হয়ে যায় একমুঠি অন্নের সন্ধানে, তা যতই যথেষ্ট ও পেটভরা হোক না কেন। তাহলে সেই তার জীবনের প্রয়োজনই যদি কেউ পূরণ করতে না পারল, তাহলে সে তার জীবনটা কীভাবে কাটাবে?

যাকাত হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে

যাকাত হিংসা ও ঘৃণা প্রভৃতি রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত করে—দাতাকে যেমন, গ্রহীতাকেও তেমনি। তাই কোন মানুষকে যদি তার দারিদ্র্যের দন্ত দংশন করতে থাকে, প্রয়োজনের আঘাত যদি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়—অথচ সে তার চতুর্দিকের মানুষকে মহা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে দিনাতিপাত করতে দেখতে পায়—মহাপ্রাচুর্যের পাহাড় জমে উঠতে দেখে তাদের ঘরে-সংসারে; কিন্তু তারা কেউ তার সাহায্যে হস্ত প্রসারিত না করে—দারিদ্র্যের উপর্যুপরি আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার জন্য তাকে অসহায় করে ছেড়ে দেয়, তাহলে এ ব্যক্তির হৃদয় হিংসা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প থেকে কি করে মুক্ত থাকতে পারে ? তার হৃদয়ে পরশ্রীকাতরতা কেন জাগবে না ? তার ক্ষতি সাধনের প্রবৃত্তি কেন

তীব্র হয়ে উঠবে না সেই সমাজের প্রতি যা তাকে অসহায় করে ছেড়ে দিয়েছে ধ্বংস হওয়ার জন্যে ? সে সেই সমাজের কল্যাণের কোন চিন্তাই করতে পারে না। আসলে লোভ ও আত্মম্ভরিতা প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষই সৃষ্টি করে।

ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের সমন্বয়কারী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলে। আর সেই ভ্রাতৃত্বের আসল কথা হচ্ছে অভিন্ন মনুষ্যত্ব ও আকিদা বিশ্বাসের পরম ঐক্য ও একাত্মতা। ইসলামের আহ্বান ঃ

كُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দাহ ভাই হয়ে যাও।[১]

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ -

মুসলমান মুসলমানের ভাই।[২]

কিন্তু এক ভাই যদি পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে আর অন্য ভাইদের ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয় আর সে তাদের দেখতে থাকে কিন্তু তাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করে, তাহলে তাদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃত্ব কখনই কায়েম হতে ও স্থায়ী হতে পারবে না।

তার পরিণতি হচ্ছে ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করা এবং ফকীর ও বঞ্চিতের মনে ঘৃণা ও হিংসার আগুন প্রজ্বলিত করা ধনী ও পরিতৃপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইসলাম তা চায় না। মুসলমান সমাজকে সে অবস্থা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর।

কেননা হিংসা ও বিদ্বেষ বিচ্ছিন্নকারী রোগ, হত্যাকারী বিপদ, ব্যক্তি ও সমাজকে পর্যুদস্তকারী মহাক্ষতির কারণ।

হিংসা দ্বীনের একটা মহাবিপর্যয়। কেননা তা হিংসাকারীর দুশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের রিযিকদানের ক্ষেত্রে যে বণ্টননীতি কার্যকর করেছেন, সে সম্পর্কে তার মনে অনেক প্রকারের খারাপ ধারণা জেগে ওঠে। লোকদের পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক জুলুম নির্যাতন চলতে থাকে, তাই চরম বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। এ কারণে কুরআন মজীদ ইয়াহুদীদের পরিচিতিস্বরূপ বলেছে ঃ

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه -

ওরা কি লোকদের প্রতি হিংসা পোষণ করে আল্লাহ তাঁর যে অনুগ্রহ তাদের দিয়েছেন সে জন্যে ?[৩]

---

১. মুসলিম, আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত।

২. বুখারী, মুসলিম ইবনে উমর থেকে, মুসলিম উকবা ইবনে আমের থেকে আবূ দাউদ, আমর ইবনুল আহওয়াস ও কিবলা বিনতে মাখরামা থেকে। দেখুনঃ كشف الخفاء ج ٢ ص ٢١.

৩. سورة النساء - ٥٤

হিংসা ও শত্রুতা, ক্রোধ ও আক্রোশ এমন সব বিপদ, যা জরাজীর্ণ করে দেয় ব্যক্তির দৈহিক ও আত্মিক সত্তাকে। সমাজের বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্থাকেও ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি হৃদয় হিংসার লড়াইয়ে তৎপর হয়, ঘৃণা ও ক্ষতির ইচ্ছা তাকে করায়ত্ত করে, সে কখনই পূর্ণ ঈমানদার মানুষ হতে পারে না। কেননা আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি হিংসা যে হৃদয়কে বিষাক্ত করে তোলে সেখানে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কখনই স্থান পেতে পারে না।

হিংসা ও ঘৃণা আক্রোশ—একটা প্রকৃতিগত রোগ, যেমন তা মনস্তাত্ত্বিক রোগও। তা মানবদেহে নানা প্রকারের রোগের সৃষ্টি করে। যেমন পাকস্থলীতে জখম ও রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া। হিংসা ও ঘৃণা সামাজিক উৎপাদন ও অর্থনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। হিংসুক ঘৃণা জর্জরিত মানুষ উৎপাদনকে দুর্বল করে—যদিও সম্পূর্ণ বন্ধ্যা বানিয়ে দেয় না। সে কাজ ও উৎপাদনে মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে হিংসা ও ঘৃণা ও আক্রোশেই সমস্ত ক্ষমতা নিঙড়িয়ে ব্যয় করে । এ কারণে ইসলামের নবী যদি এ সব বিপদকে 'জাতীয় রোগ' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং সে বিষয়ে লোকদের সাবধান করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তা কিছু মাত্র বিস্ময়ের কথা নয়। এগুলো বিচ্ছু ও বিষাক্ত কীটের মত নিঃশব্দে লোকদের মধ্যে প্রবেশ করে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহ থেকে জাতীয় রোগসমূহ নিঃশব্দে তোমাদের মধ্যে এসে গেছে, তা হচ্ছে—হিংসা-ক্রোধ, আক্রোশ ও প্রতিহিংসা—এগুলো তো নির্মূলকারী। তবে আমি একথা বলছি না যে, তা চুল কামিয়ে দেয় বরং বলছি, তা দ্বীনকে নির্মূল করে।[১]

ইসলাম এসব মনস্তাত্ত্বিক সামষ্টিক কঠিন রোগসমূহের কেবল ওয়ায-নসীহত ও মৌলিক উপদেশ দ্বারাই মুকাবিলা করেনি এবং তা করাকেই যথেষ্ট মনে করেনি। বরং ইসলাম কার্যত ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সবের কারণসমূহকে জীবন ও সমাজ থেকে উৎপাটিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, কেননা ক্ষুধা-কাতর বঞ্চিত বিবস্ত্র মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষের বিপদ বিপর্যয় সম্পর্কে একটা মর্মস্পর্শী ওয়ায শুনিয়ে দেয়াই কখনও যথেষ্ট হতে পারে না। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তো দুঃখময়, শুষ্ক, নির্মম। আর তার চতুর্দিকে রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিতৃপ্ত মহাবিলাসী মানুষের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনধারা। তা তাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের বাস্তব নিদর্শনাদি উপস্থাপিত করছে। এরূপ অবস্থায় তাদের মনে-প্রাণে হিংসা জাগবে না কেন ? পরশ্রীকাতরতায় তারা জর্জরিত হবে না কেন ? বিদ্বেষের আগুন তাদের হৃদয় মনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে না কেন ? এই কারণেই তো ইসলাম যাকাত ফরয—বাধ্যতামূলক করেছে। করেছে এজন্যে যেন বেকার কাজ পায়, অক্ষম উপার্জনহীন মানুষও বাঁচার নিরাপত্তা পায়, ঋণগ্রস্তের ঋণশোধের ব্যবস্থা হয়, নিঃস্ব পথিক যেন তার নিজের স্থানে আপন জনের মধ্যে ফিরে যেতে পারে। তবেই না মানুষ অনুভব করতে পারবে—তারা পরস্পরের ভাই, পরস্পরের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। প্রয়োজন ও অভাবের সময় অন্য

---

১. হাদীসটি বাজ্জার উদ্ধৃত করেছেন উত্তম সনদে এবং বায়হাকী প্রমুখও। الترغيب والترهيب ج ٤ ص ١١

লোকদের ধন-মাল তাদেরই ধন-মাল হবে। ব্যক্তি অনুভব করবে তার ভাইয়ের শক্তি সে তো তারই শক্তি—যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার ভাইয়ের ধনাঢ্যতা তার জন্যে সাহায্য, যদি সে দরিদ্র হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই ঈমানের ছায়া বিস্তার হওয়া সম্ভব, লোকদের মধ্যে জাগতে পারে ভালোবাসা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা। রাসূলের কথা ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্যে তাই পসন্দ করবে, যা পসন্দ করে সে নিজের জন্যে।[১]

২. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা আনাস থেকে।
كمافى الجامع الصغير

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাতের লক্ষ্য এবং সমাজ-জীবনে তার প্রভাব

যাকাতের সামাজিক সামষ্টিক লক্ষ্য স্পষ্ট অতীব প্রকট। এতে কোন সন্দেহ নাই। যাকাতের ব্যয় খাতসমূহের ওপর চোখ বুলালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার ওপর এক তড়িৎ দৃষ্টিও আমাদের সম্মুখে এই মহাসত্য প্রতিভাত করে তোলে যেমন রাতের অবসানে পৃথিবী চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে প্রত্যক্ষ হয়ে।

সূরা তওবার এ আয়াতটি যখন আমরা পাঠ করি ঃ

> নিঃসন্দেহে যাকাত-সাদকাত কেবলমাত্র ফকীর-মিসকীন, তার জন্যে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট করতে হবে—এদের জন্য এবং ক্রীতদাস ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র পথ ও নিঃস্ব পথিকের ব্যাপারে নিয়োজিত হওয়ার—আল্লাহ্র নিকট থেকে ফরয করে দেয়া।

তখন আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ লক্ষ্যসমূহের একটা দ্বীনী রাজনৈতিক রূপ রয়েছে। কেননা তা দ্বীন ও রাষ্ট্র হিসেবেই ইসলামের সাথে মিলিত হয়। যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট করতে হবে এবং আল্লাহ্র পথে—প্রধানত এ দুটি অংশই সেদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে।

এ দুই ব্যয়খাত দাবি করছে, দ্বীন-ইসলাম একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান, এ রাষ্ট্র যাকাতসমূহ ধন-মালের মালিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে তার জন্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে। পরে তা ব্যয় করা হবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও তার কালেমার বিস্তার সাধনের কাজে, তার ভূমিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে আর তা হবে লোকদের হৃদয় আকৃষ্টকরণ এবং জাতিসমূহকে সেদিকে দাওয়াত দেয়ার দ্বারা। কেননা 'আল্লাহ্র পথের দিকে রয়েছে ইসলামের উদাত্ত আহ্বান।

'যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যার আলোচনায় আমরা এ দুটি খাত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা বলে এসেছি। এক্ষণে তার ওপর নতুন করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক। এ পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব 'মুসলিম সমাজ ও ইসলামী উম্মতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সাথে যাকাতের সম্পর্ক।'

যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তা

উপরিউক্ত লক্ষ্য ও খাতসমূহ সামাজিক-সামষ্টিক রঙে রঙিন। অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা, ফকীর-মিসকীন ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব পথিক প্রভৃতি দুর্বল লোকদের হাত ধরে উপরে উঠানো ইত্যাদি, এদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান তাদের ওপর প্রভাব ফেলবে

তাদের ব্যক্তি হওয়া হিসেবে যেমন, তেমনি সমাজসমষ্টির ওপরও পড়বে এ হিসেবে যে, তারা সকলে পরস্পর সংযুক্ত এক অভিন্ন দেহ সংস্থা বৈ কিছু নয়।

সত্যি কথা। ব্যক্তি ও সমষ্টির সীমা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ব্যক্তিদের সমষ্টিই সমাজ। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যতটা শক্তিশালী হবে, তার প্রতিভাসমূহ উৎকর্ষিত হবে এবং তার বস্তুগত ও অন্তর্নিহিত শক্তিসামর্থ্য যতটা বিকশিত হবে, সমাজ ঠিক ততটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ততটাই উৎকর্ষ লাভ করবে—এতে আর কোনই সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সমাজের ওপর যা কিছু সাধারণভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, তা তার ব্যক্তিদের ওপরও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে—তারা তা অনুভব করতে পারুক আর নাই পারুক।

অতএব বেকারকে কাজ দেয়া, অক্ষমকে সহযোগিতা দেয়া এবং ফকীর-মিসকীন দাস-ঋণগ্রস্ত প্রভৃতি ঠেকে যাওয়া লোকদের সাহায্য করা 'সামাজিক সামষ্টিক লক্ষ্য' গণ্য করা—কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা এ সব কাজের মাধ্যমেই সমাজ-সমষ্টিক ধারণ করা সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ সব কাজ একই সময় যেমন ব্যক্তি পর্যায়ের লক্ষ্য এ সব যাকাত গ্রহণকারী লোকদের বিচারে, তেমনি সামষ্টিক সামাজিকও।

বস্তুত যাকাত ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা অংশ। পাশ্চাত্য এ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে খুবই সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করে। তা কেবল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। দরিদ্র অক্ষম লোকগুলোকে আর্থিক সাহায্য দিয়েই তারা এ কার্য সম্পাদন করে। কিন্তু ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তার এ ব্যবস্থাকে একটি বিশাল ও গভীর পরিমণ্ডলে তুলে ধরেছে। বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় জীবনের সমগ্র দিকই তার অন্তর্ভুক্ত। এখানে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা আছে, জ্ঞান ও শিক্ষাগত নিরাপত্তা আছে, রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষামূলক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, ফৌজদারী ইবাদতমূলক সভ্যতা সংক্রান্ত এবং সর্বশেষে জৈবিক জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা কার্যকর অথচ আজকের দিনে ভুলবশত তার নাম দেয়া হয়েছে শুধু 'সামাজিক নিরাপত্তা।'[১]

'সামাজিক নিরাপত্তা' এখন যাকাত অপেক্ষাও অধিক ব্যাপক ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা। কেননা সমগ্র জীবনের শাখা প্রশাখাসমূহে তা বাস্তবভাবে কার্যকর হয়ে চলছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্ত দিক-ই তার অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত শাখা বা প্রশাখার একটা অংশ হচ্ছে যাকাত। তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এখানকার সামাজিক বীমা ও সামাজিক নিরাপত্তা দুটিই। 'সামাজিক বীমা' ও 'সামাজিক নিরাপত্তা' এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বীমায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের আয় থেকে কিস্তি দিতে হবে। আর সামাজিক বা স্থায়ী অক্ষমতা দেখা দিলে তখন সে তা থেকে উপকৃত হবে। কিন্তু 'নিরাপত্তা' ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই তার রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সমাজের ব্যক্তিদের সেজন্যে নির্দিষ্ট হারে কোন কিস্তি দিয়ে তাতে শরীক হতে হবে না।

---

১. ডঃ মুস্তফা সাবায়ী রচিত اشتر ।الكية ।لاسلام। গ্রন্থে এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন দেখা গেছে, বহু লোক যারা এ বছর যাকাত দিয়েছে, পরবর্তী বছর হয়ত তারাই যাকাত পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। কেননা তখন তাদের হাতে তাদের প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকেনি অথবা উপর্যুপরি এমন সব বিপদ-আপদ এসেছে, যার ফলে তারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্যে হয়ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা তারা নিজেদের দেশ ঘর-বাড়ী থেকে বহু দূরে হঠাৎ নিঃস্ব হয়ে যাকাতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনি তারা আরও অনেক কিছু হতে পারে। এ দিক দিয়ে তা সামাজিক বীমা পর্যায়ের। এদের মধ্যে এমন অনেক লোকই হয়ত আছে পূর্বে যাদের ওপর যাকাত ফরয হয়েছিল। এজন্যে তখন তারা যাকাতের কোন অংশ পায়নি। কিন্তু এক্ষণে তাদের দারিদ্র্য ও অভাবের জন্যে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। এ হিসেবে যাকাত হচ্ছে 'সামাজিক' ব্যবস্থা।[১]

তা ছাড়া যাকাত বাস্তবিকপক্ষে বীমার পরিবর্তে 'সামাজিক নিরাপত্তার নিকটবর্তী ব্যবস্থা।' কেননা তাতে বীমার মত ব্যক্তিদের কোন পরিমাণের কিছু (প্রিমিয়াম) দিতে হয় না, ব্যক্তিকেও তা থেকে দেয়া হয় ততটুকু পরিমাণ, যা তার জন্যে প্রয়োজন। তা কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে।

যাকাত এ কারণে 'সামাজিক নিরাপত্তা'র পথে সর্বপ্রথম বাস্তব ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত নফল দান সাদকার ওপর তা নির্ভরশীল নয়। বরং তা সরকারী সুসংগঠিত ও আবর্তনশীল সাহায্যদানের ওপর চলে। এ সব সাহায্যের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ। এ প্রয়োজন পূরণ খাদ্য, বস্ত্র-বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। তা হবে ব্যক্তির জন্যে, ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল পরিজনদের জন্যে—কোনরূপ অপচয় বা ব্যয় বাহুল্য কিংবা কার্পণ্য ছাড়াই।

বস্তুত মানুষের যত প্রকারের প্রয়োজনের কথাই চিন্তা করা যায়, যা ব্যক্তিগত অক্ষমতা কিংবা সামাজিক বিপর্যয়ের দরুন সৃষ্ট হয়—তা সবই পূরণ করে যাকাত। এমন সব অবস্থাও দেখা দিতে পারে যা থেকে কোন মানুষই সাধারণত রক্ষা পায় না। ইমাম জুহরী উমর ইবনে আবদুল আজীজ—খলীফাকে 'যাকাতের ক্ষেত্রে সুন্নতের ভূমিকা' সম্পর্কে যা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা আমরা পড়ি, নিশ্চয়ই তাতে অংশ রয়েছে সাময়িকভাবে অভাবগ্রস্ত বেকার বসে থাকা লোকদের জন্যে, প্রত্যেক মিসকীনের জন্যেও তাতে অংশ রয়েছে—যার কোন বিপদ বা রোগ হয়েছে, পরিবারবর্গের ভরন-পোষণ করতে এবং দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করতে সমর্থ হচ্ছে না। যেসব মিসকীন ভিক্ষা করে, তাদের জন্যেও অংশ রয়েছে—তাদেরও খাবার প্রয়োজন (শেষ পর্যন্ত তারা তাদের প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করবে, অতঃপর আর ভিক্ষা করার আবশ্যকতা থাকবে না।) যেসব মুসলমান কারাবন্দী হয়ে আছে, তাদের জন্যেও একটা অংশ রয়েছে—যাদের কোন অভিভাবক নেই। মসজিদসমূহে যেসব মিসকীন আছে ভিক্ষার জন্যে—যাদের সাধারণত দেয়া হয় না, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশও নেই। (যাদের জন্যে মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হয়নি—বিধিবদ্ধ সুসংগঠিত কোন অর্থ ব্যবস্থাও

---

১. فی ظلال القران للاستاذ سيد قطب ج ١٠ ص ٨١

নেই) তা সত্ত্বেও তারা লোকদের কাছে চেয়ে বেড়ায় না—ভিক্ষা করে না। যে লোক দরিদ্র হয়ে পড়েছে, তার ওপর ঋণও চেপেছে , সে ঋণ থেকে আল্লাহ্‌র নাফরমানির কাজে কিছুই ব্যয় করা হয়নি, তার দ্বীনী চরিত্রে কোন দোষারোপ নেই অথবা ঋণের মধ্যেও কোন ফাঁকি নেই। আশ্রয়হীন প্রত্যেক পথিকও তা থেকে অংশ পাবে, যার এমন লোকজনও নেই যাদের কাছে সে আশ্রয় পেতে পারে—এমনভাবে যে, তাকে আশ্রয় দেয়া হবে, খাবার দেয়া হবে এবং তার জন্তু বাহনকে ঘাস (এ কালে বাহন যন্ত্রকে তেল বা ভাড়া) দেয়া হবে যতক্ষণ না সে বসবাস ও অবস্থানের কোন স্থান লাভ করেছে অথবা তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে।[১]

এ ব্যবস্থা সকল প্রকার অভাবগ্রস্ত ও ঠেকায় পড়া লোকদেরই নিরাপত্তার জন্যে। তাদের সর্বপ্রকারের প্রয়োজনের জন্যেও, তা দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধি-বিবেকগত যা-ই হোক না কেন। বিবাহ করিয়ে দেয়াকেও মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তা কেমন করে হল, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। বিদ্যার্থীর জন্যে জ্ঞান আহরণের বই-পুস্তক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, তা কি করে হল, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

এ ব্যবস্থা কেবল মুসলমানদের জন্যেই নয়। মুসলমানদের রাষ্ট্রে ইয়াহুদী, খৃস্টান (হিন্দু, বৌদ্ধ) যারাই বসবাস করবে তাদের সকলের জন্যেই এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। হযরত উমর (রা) একজন ইয়াহুদীকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে তার জন্যেও এ ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা ছিল তার জন্যে এবং তার মত অন্যান্য লোকদের জন্যে একটা সূচনামূলক ব্যবস্থা।[২] তেমনি তিনি দামেশক যাওয়ার পথে খৃস্টান লোকদেরকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দেখতে পেয়ে ইসলামী বায়তুলমাল থেকে তাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩]

বস্তুত এই হচ্ছে 'সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা'। পাশ্চাত্য জগত এরূপ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছে খুব বেশী দিনের কথা নয়। তারা যা-ও বা চিন্তা করেছে খালেসভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে তা করেনি, দুর্বল লোকদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েও তা করেনি, ক্রমাগত বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট মতবাদের আঘাত তাদেরকে এরূপ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতিও তা করার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে। জনগণকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে। রক্ত ও ঘাম পানি করে শ্রম করে যেতে অব্যাহতভাবে তাদেরকে প্রস্তুত রাখার মতলবেই তা করেছে যেন তারা কখনই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে।

এরূপ সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বপ্রথম গৃহীত হয় ১৯৪১ সনে। এ সময় বৃটিশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক চুক্তিতে ব্যক্তিবর্গের সামাজিক নিরাপত্তা দানের বাধ্যবাধকতার ওপর একমত হয়।[৪]

---

১. দেখুন : الاموال ص ٥٧٨-٥٨٠ ২. الاموال ص ٤٦ ৩. تاريخ بلاذرى ص ١٧٧
৪. الضمان الاجتماعى للدكتور صادق مهدى ص ١٢٦

কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ইসলামী নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যায়ে দেশের সকল অধিবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করার এবং তাদের পরিবারের সার্বিক মৌল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নেয়ার দিক দিয়ে উন্নীত হতে পারেনি। ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সমর্থকবৃন্দ ফকীর-মিসকীনের সারা জীবনের প্রয়োজন পূরণ এবং যাকাত দ্বারা তাদেরকে স্থায়ীভাবে সচ্ছল বানিয়ে দেয়ার—যেন অতঃপর কোনদিনই আর কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী না হয়—যে কথা বলেছেন তার সমান ব্যবস্থা নেয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার।

ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে এ সব রাষ্ট্রের বহু বছর পূর্বেই যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। দ্বীন তা ফরয করেছে, রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন করার সংস্থা কায়েম করেছে। এ উদ্দেশ্যে তলোয়ারও চালিয়েছে ধনী লোকদের মুঠি থেকে গরীব জনগণের অধিকার আদায় ও মুক্ত করার লক্ষ্যে। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি, বহু লেখকই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইউরোপের অবদানকে অগ্রবর্তিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য কলম চালিয়েছেন। কিন্তু আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও উত্তরাধিকার তার ওপর মাটি নিক্ষেপ করছে।

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে, আরবী রাষ্ট্রসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় জোট দামেশক শহরে ১৯৫২ সনে সমাজবিদ্যা অধ্যয়নের একটা চক্র আহ্বান করে। এ চক্রকে 'সামাজিক নিরাপত্তা' বিষয়ে অধ্যয়নের বিশেষ দায়িত্ব দেয়। চক্রের পরিচালক—মিঃ দানীল এস জীরজ 'সামাজিক নিরাপত্তা' শিরোনামে একটা রচনা পেশ করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন ঃ

> প্রাচীনকালের অভাবগ্রস্ত লোকদের সম্মুখে না খেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচার জন্যে লোকদের কাছে সাহায্য চাওয়া বা সাদকা পেতে চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সরকারীভাবে গরীব লোকদের সাহায্য করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দীতে সূচিত হয়। জাতীয় সংস্থার পক্ষ থেকে গরীব লোকদের সাহায্য করার সংগঠন গড়ার প্রথম পদক্ষেপ তখন গৃহীত হয় ... [১]

এরূপ ইতিহাস রচনার কারণ ইসলামের ইতিহাস ও যাকাত ফরয হওয়ার মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। পূর্বে যেমন বলেছি, এতে সন্দেহ নেই যে, মুসলিম সরকারই যাকাত সংগ্রহ করে এবং তা বন্টনেরও দায়িত্ব পালন করে। তা ব্যক্তিগত কোন দয়া বা অনুগ্রহের ব্যাপার নয় আদৌ। আর তা কোন নফল দানও নয়। যাকাত বস্তুতই অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্যে নির্ধারিত ও সর্বজনজ্ঞাত অধিকার বিশেষ। আর ধনী লোকদের প্রতি তা বাধ্যতামূলকভাবে দেয় সুনির্দিষ্ট কর। মুসলিম রাষ্ট্রই এ কর আদায় করে এবং বন্টন করে। তবে যাকাত তার স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতার দিক দিয়ে সাধারণ রাষ্ট্রসমূহের ধার্য করা কর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর জিনিস। রাষ্ট্রসরকার যদি কখনও তার প্রতি অবহেলা করে এবং তা আদায় না করে তাহলে তখনও তা আদায় না করা পর্যন্ত কোন মুসলিম ব্যক্তির ইসলাম সহীহ হবে না, তার ঈমান পূর্ণ হবে না, এবং

---

১. حلقة الدراسات الاجتماعية الدورة الثالثة ص ٢١٧

তা আদায় করতে হবে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে মাত্র। আর নিজের তাজকীয়া এবং তার ধন-মালের পবিত্রতা এ উপায়েই হতে পারে। ব্যক্তির জন্যে যা ফরয করে দেয়া হয়েছে, সে তা নিজের মনের আগ্রহে ও উৎসাহে আদায় করবে। তাতে কোনরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শনের ও পীড়াদানের একবিন্দু ইচ্ছাও থাকবে না। এরূপ অবস্থায় যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে, সে তা গ্রহণ করবে—ইসলাম তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর কোন কোন বান্দাকে তার মালের ওপর খলীফা বানিয়েছেন, সেই মালে তার জন্যে হক নির্দিষ্ট করে ধার্য করা হয়েছে, এটা তার প্রাপ্য অধিকার। সমাজকে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে এজন্যে। এ জানা অধিকার আদায়ের জন্যে যুদ্ধ করতে হলেও সমাজ তা করতে বাধ্য।

যাকাত ও অর্থনৈতিক রূপায়ণ

গোটা অর্থনীতির ওপর যাকাত ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য। পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা বলে এসেছি, ধনীদের কাছে থেকে যাকাত বাবদ যা কিছু নেয়া হয়, তাই তাদেরকে অধিক কর্মে উদ্বুদ্ধ করে—যা নেয়া হয়েছে তার বিনিময়ে।

নগদ সম্পদের যাকাতের বেলায় এ কথাটি খুবই স্পষ্ট। কেননা ইসলাম নগদ সম্পদকে সঞ্চয় করাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। তার আবর্তিত ও উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগকৃত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করাও নিষিদ্ধ। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার বজ্রকঠিন ঘোষণা এসেছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْ نَهَافِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْ هُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

আর যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখবে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে না, তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

শুধু এ কঠোর ঘোষণা দিয়েই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি; বরং পুজিকরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেছে এবং নগদ সম্পদকে ভাণ্ডার ও ব্যাংক হিসাবে থেকে বের করার সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছে। তা এভাবে যে, ইসলাম যখন নগদ সম্পদের ওপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত বাবদ দেয়া ফরয করেছে—মালিক তা উৎপাদনে বিনিয়োগ করে থাকুক, কি না-ই করুক তখন এ যাকাত বাবদ বের করা নগদ সম্পদই একটা চাবুক হয়ে তাকে পরিচালিত করবে অধিক শ্রম করে, উৎপাদন করে উপার্জন করতে ও প্রবৃদ্ধি লাভ করার দিকে। এ কাজ সে বছরের পর বছর করে যেতে থাকবে। এ পর্যায়ে বহু হাদীস এবং সাহাবীদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন ঃ

اتَّجِرُوْا بِاَمْوَالِ الْيَتَامٰى حَتّٰى لَاتَاكُلُهَا الزَّكَاةُ -

তোমরা অভিভাবকরা ইয়াতীমদের মাল নিয়ে ব্যবসা কর, যেন তাদের মাল যাকাত খেয়ে না ফেলে।

নগদ সম্পদের যাকাত পর্যায়ে আমরা অনেক কথা বলেছি। যাকাত যে মূলধনের ওপর ধার্য হয়, তাও ব্যাখ্যা করেছি।

যাকাত ও জাতির আধ্যাত্মিক উপাদান

সর্বোপরি যাকাতের অনেক লক্ষ্য রয়েছে—প্রভাব রয়েছে মুসলিম উম্মতের উন্নতমানের জীবন যাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা বাস্তবায়নে। এ উম্মত সেভাবেই জীবন যাপন করবে তার আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহ যার ওপর তার ভিত্তি স্থাপিত, তার কাঠোমো সংস্থাপিত—সংরক্ষিত হবে এবং তার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হবে।

উস্তাদ বহী আল খাওলী যেমন বলেছেন, উম্মত তার আধ্যাত্মিক শক্তি-সামর্থ্যের বলেই গড়ে উঠতে পারে, কেবল বস্তুগত শক্তির বলে নয়। বরং জাতি গঠনের বস্তুগত শক্তি সামর্থ্যের কোন মূল্যই নেই, আধ্যাত্মিক শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া তার সংগঠন সত্তা গড়ে উঠতে পারে না। এজন্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমষ্টির ধন-মাল ব্যক্তিবর্গের জন্যে ব্যয় করা এবং ব্যক্তিগণের সাহায্য কাজে তৎপর হওয়াকে ইসলাম ফরয ঘোষণা করেছে—অপরিহার্য কর্তব্য বলেছে। তা সমষ্টির আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, যেমন খাদ্যপানীয় ইত্যাদি তার বস্তুসত্তা রক্ষার জন্যে অপরিহার্য। ইসলাম এ আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে তিনটি মৌল নীতিতে সন্নিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছে—যাকাত ব্যয় সংক্রান্ত আয়াত সে দিকে ইঙ্গিত করেছে।

প্রথম মৌল নীতি ঃ সমাজের ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা। কিন্তু এ স্থানে দাসমুক্তির ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্রীতদাসদেরকে দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করার—এ লাঞ্ছনা তিরোহিত করা। দাসমুক্তির পর্যায়ে উচ্চতর আইন ক্ষেত্রে বিশ্বমানবতা সর্বপ্রথম ইসলামের এ অবদানই লাভ করেছে। তাদের ধন-মালের নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে তদের মুক্তকরণকে মুসলমানদের জন্যে ফরয করে দিয়েছে। যাকাত সংক্রান্ত আয়াতে এ সত্যটি ধ্বনিত ও স্থাপিত হয়েছে আল্লাহ্র কথা وفى الرقاب 'এবং দাস মুক্তিতে'।

দ্বিতীয় মৌল নীতি ঃ ব্যক্তিগণের সংকল্প ও পুরুষোচিত ভাবধারাকে কল্যাণময় কাজে নিয়োজিতকরণ, যা সমষ্টির জন্যে সাংস্কৃতিক ও অনুভবনীয় লাভ সৃষ্টি করে অথবা কোন অপসন্দনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

তা এজন্যে যে, ব্যক্তিগণের মধ্যে কল্যাণ প্রেমের সীমাহীন শক্তি নিহিত রয়েছে। বিভিন্ন সামষ্টিক অবদান রাখার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে রয়েছে। তা বিবেক, বুদ্ধির অবদানের মতই অমূল্য। আল্লাহ তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজ সত্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে যেন সে জীবনে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। কেননা মানসিক শক্তিকে উৎকর্ষদান এবং তার ভূমিকা বাস্তবায়ন একান্তই কর্তব্য—যেন সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে জীবনে। তাই ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রকৃতিগত প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন অধিক উত্তম এবং বেশী অধিকারসম্পন্ন। কেবল

তার ফলশ্রুতি এবং জীবনে যে ঔদার্যের ভাবধারা ফুটে ওঠে কেবল সেজন্যে নয়। বরং এজন্যে যে, আমাদের জন্যে মূল্যবান ব্যক্তি তৈরী করার একমাত্র পন্থাও তাই। উম্মতের জন্যে তার উচ্চ মহান মানসিকতার মৌলিক সম্পদ কেবল এভাবেই পাওয়া সম্ভব। কোন কল্যাণময় কাজই ভাল নয়—যে মন তা করে কেবল তা-ই ভাল। আর যে নিয়ত মনোভাব তা করায়, তা-ই ভাল। যে জাতি এ পন্থাকে অবলম্বন করে সে শক্তির কার্যকারণ ও মর্যাদার সমস্ত উপকরণে সমৃদ্ধ হতে পারে। তাই মর্যাদাও জীবনের যোগ্যতার জন্যে যথেষ্ট। তা-ই কল্যাণে দৃঢ় সংকল্প জাগিয়ে তোলে ভালোবাসার মাহাত্ম্য সৃষ্টি করে। সত্যের প্রতি পুণ্যময় আহরণের জন্যে তা যথেষ্ট, মূল জীবনের জন্যেও তা কল্যাণকর। মন ও প্রকৃতির উৎস থেকে তা যা কিছু বের করে তা খুবই মূল্যবান সম্পদ। মন খনির সর্বোত্তম উৎপাদন তা। জীবনকে তা উত্তম তাৎপর্য দান করে। মনুষ্যত্বকে তা সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করে। আর তা-ই হচ্ছে সেই উচ্চতর আদর্শ যার ওপর মনুষ্যত্ব ও মানুষের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন।

অতএব সমাজের কর্তব্য হচ্ছে তার ব্যক্তিগণের মনের মধ্যে সেই শক্তিসমূহ জাগ্রত করবে, তদ্দ্বারা তাকে হুঁশিয়ার করবে। জাগিয়ে তুলবে এবং প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। তাকে নিষ্ক্রিয় ও স্থবির করে রাখবে না—যার ফলে তার কর্মশক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, তার ভিতরে নিহিত শক্তি উৎসসমূহ মুছে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন তাদের একেকজন প্রস্তুত থাকবে তার ধন-মাল সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করতে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যেতে—যেন তার উম্মতের এমন এক-একটি অন্যায়ের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়, যার দরুন গোটা জতির শান্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারত। তাদের কিছু লোকের হৃদয়ে যে প্রতিহিংসা ও ক্রোধ জেগে ওঠেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এ ব্যক্তিকে—যার মনুষ্যত্ববোধ এতটা করেছে—যদি দারিদ্র্যের ক্রোড়ে ঠেলে দেয়া হয় এবং তার এ কর্মের সুফল থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সে আবার কখনই অনুরূপ মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন কল্যাণকর কাজে ফিরে আসবে না, যদি একবার এ আছাড় খাওয়া থেকে সে উঠবার সুযোগ পায়। অতঃপর সে অপর কোন মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের অনুসরণও করবে না। অতএব সত্য ও ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে, এই যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সমাজের ধন সম্পদে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট অংশ থাকা অথবা এ সামষ্টিক সম্পদে সাধারণভাবে মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে একটা অংশ ধার্য হওয়া একান্তই আবশ্যক। তাদের মধ্যে যে জনকল্যাণমূলক কাজ করার প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলে তাদের কেউ দারিদ্র্যের আঘাতে আহত হবে না।—পূর্বে জাতির জন্যে সে যে কল্যাণমূলক কাজ করেছে, তার জন্যে। ঠিক এ কারণেই ইসলাম তাদের জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং মহান আল্লাহ তা'আলাও যাকাতের আয়াত স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ والغارمين, 'এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ'।

তৃতীয় মৌল নীতি ঃ মানুষের অন্তরে নিহিত প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের 'তাজকিয়া'র উদ্দেশ্যে' যে সব আকীদা-বিশ্বাস এবং শিক্ষা ও আদর্শ অবতীর্ণ হয়েছে, বিশেষ করে আল্লাহর কাছে সম্পর্ক রক্ষা পর্যায়ের হুকুম-আহকাম, ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে

সচেতনকরণ এবং তার পরকালীন পর্যায়সমূহ—যা প্রত্যেককে অতিক্রম করতে হবে অনন্তকালের অধ্যায়সমূহে বিবর্তিত হওয়ার তাগিদে—তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ একান্তই আবশ্যক। উক্ত মূল আয়াতের এ দিকের গুরুত্ব লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ وفى سبيل الله 'এবং আল্লাহ্‌র পথে।'

এ 'আল্লাহর পথে' কথাটির তাৎপর্যে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষামূলক অর্থাৎ সামরিক প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইসলামে প্রতিরক্ষা ও জিহাদ আসলে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণ। আর এ পথে জিহাদ করাটা নিছক নাগরিক দয়িত্বমূলক কাজ নয়। নয় শুধু দেশমাতৃকার জন্যে যুদ্ধ, যেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কোন ভাবধারা নেই বরং তা প্রথমত ও সব কিছুর আগে মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সবচাইতে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে, তা হয় ইসলামের আকীদা রক্ষা, বহিরাক্রমণ থেকে তার প্রতিরক্ষা এবং তার ওপর স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের লক্ষ্যে এ আকীদার প্রভাববলয় সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে।[১]

এ তিনটি মৌল নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যাকাত উচ্চতর মূল্যমান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তার ভূমিকা পালন করে। এ আসল তাৎপর্যগত বিশেষত্বের জন্যেই মুসলিম সমাজ অধিক আগ্রহী। বরং এর ওপরই তার গোটা সংস্থা গড়ে ওঠে—যেমন পূর্বে বলেছি।

বস্তুত ইসলামী জীবনে পরিপূরকতা ও পূর্ণত্ব এসবের মাধ্যমেই আসে। সমস্ত ইসলামী সংস্থাও তাই। অতএব যাকাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটা অর্থনৈতিক বিধান হলেও ইসলামের মৌল আকীদা থেকে—ইসলামের ইবাদত থেকে তা কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। মূল্যমান ও নৈতিকতা কখনই উপেক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রনীতি ও জিহাদের সাথে তার সম্পর্ক চিরন্তন। ব্যক্তি ও সমষ্টির সমস্যা ও জটিলতা দূর করাই তার বড় অবদান। জীবনে বেঁচে থাকা ও অন্যদের জীবনে বাঁচিয়ে রাখাই তার মৌল ভাবধারা।

পরবর্তী আলোচনাসমূহে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক জটিলতার উল্লেখ করব, আমাদের সমাজ-সমষ্টি যা নিয়ে খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করে। সমাজ সংস্কারকগণ সে সবেরই সংশোধন চান। এসব জটিলতার চিকিৎসা কিংবা এসবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লাঘব করার ব্যাপারে যাকাত ব্যবস্থার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

আমার লিখিত ঃ مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام

(ক) 'দারিদ্র্য সমস্যা ও তার সমাধান ইসলাম কিভাবে করেছে' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ সংশোধন ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এ স্বতন্ত্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছি।[২] তা যার ইচ্ছা পড়ে নিতে পারেন।

---

১. উস্তাদ আল বাহী আল খাওলী লিখিত – الاشتراكية فى المجتمع الاسلامى ١٤١ – ١٤٤ থেকে উদ্ধৃত।

২. প্রকাশক دار العربية بيروت

পার্থক্য সমস্যা

সাময়িক বা আবর্তনশীল সাহায্য দিয়ে কেবল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই যাকাতের একমাত্র ও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। মালিকানা নীতির ব্যাপ্তি ও প্রশস্তি বিধান, সম্পদের মালিক ধনী লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ধনী লোকদের প্রতি মুখাপেক্ষী দরিদ্র জনগণের মধ্যে এমন বিপুল সংখ্যক লোক গড়ে তোলা—যারা সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হবে—ইত্যাদিও যাকাতের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তা এভাবে যে, যাকাতের লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনী ও সচ্ছল বানানো—যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদে যতটা সংকুলান হয় এবং তাকে অভাবের পরিমণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত করে স্থায়ী সচ্ছলতার দিকে নিয়ে যাওয়া। আর তা হবে প্রত্যেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক বানানোর দ্বারা। যেমন ব্যবসায়ী ব্যবসায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির মালিক হয়। কৃষক একখণ্ড ভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসের মালিক হয়। কোন পেশার লোক মালিক হয় তার পেশার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি—অনুরূপ অন্যান্য জিনিসের। যাকাতের ব্যয়খাত সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা এ পর্যায়ে স্পষ্ট কথা বলে এসেছি।[১] এভাবেই যাকাত তার বিরাট লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। আর তা হচ্ছে নিঃস্ব লোকদের সংখ্যা কমানো এবং মালিক শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে ইসলামের অন্যতম ও বড় লক্ষ্য—যে জনগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র সৃষ্ট যাবতীয় কল্যাণ ও সুখশান্তিমূলক দ্রব্যাদি ও উপায়-উপকরণ সমানভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে; সেগুলো কেবলমাত্র ধনী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই সীমিতভাবে আবর্তিত হতে থাকবে না—যার ফলে অন্যান্য লোক সে সব থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বরং তা নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সমস্ত লোকের জন্যে পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।[২]

আয়াতের جميعا 'সমস্ত লোক' শব্দটি পৃথিবীর সব কিছুর তাগিদস্বরূপ বলা হয়েছে মনে করা সহীহ। তাতে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে সে সমস্ত মানুষ বোঝাবার ওপর গুরুত্বারোপও বোঝাতে পারে। আর এক সাথে উভয় অর্থ বোঝাতে চাইলেও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এ প্রেক্ষিতে অর্থ হবে ঃ পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তা সবই সৃষ্ট হয়েছে সমস্ত মানুষের জন্যে, অল্প সংখ্যক লোকেরা অন্যদের বঞ্চিত করে তা নিরংকুশভাবে আয়ত্তাধীন করে নেবে এজন্যে নয়।

---

১. 'ফকীর-মিসকীনকে কত দেয়া হবে, চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২. سورة البقرة - ٢٩

এ পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলাম সুবিচারপূর্ণ বন্টনের নীতি গ্রহণ করেছে। সমষ্টির ধন-মালে মালিকত্ব অভিন্ন হবে। ইসলাম এক্ষেত্রে ভারসাম্য কার্যকর করার জন্যে যাকাত, ফাই প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তাতে মানুষ পরস্পরের সমান মানে এসে যায়। 'ফাই' বন্টন সংক্রান্ত আয়াতে কুরআন মজীদে তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। বলেছেন ঃ

مَـآ اَفَـآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নগরবাসীদের কাছ থেকে যা কিছুই দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র জন্যে এবং রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে—যেন তা কেবল তোমাদের মধ্যকার ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে।[১]

ইসলাম জীবিকা ও রুটি রুজির দিক দিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেছে। কেননা তা যে জন্মগত কর্মক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য, প্রতিভা ও বুদ্ধিসত্তার দিক দিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নিহিত পার্থক্যের ফলশ্রুতি, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সে সাথে একথাও স্বীকার্য যে, এ পার্থক্য কমবেশী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম ধনীদের ধন বৃদ্ধির কাজ করবে এবং দরিদ্রদের তিল তিল করে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবে, যার ফলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যটা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, ধনীরা সমাজে এমন একটা শ্রেণী হয়ে দাঁড়াবে যার জন্য লিখে দেয়া হবে যে; তারা গজদন্তের উচ্চ শিখরে বসবাস করবে, সর্বপ্রকারের যে ধনসম্পদ ও নিয়ামতের উত্তরাধিকারী কেবল তারা হবে আর দরিদ্র লোকেরা এমন একটা শ্রেণী হয়ে বসবে, পর্ণকুটিরে থেকে নিঃস্বতা ও বঞ্চনার আঘাতে মৃত্যুবরণ করাই হবে যাদের একমাত্র ভাগ্যলিপি। .... না, ইসলাম এরূপ অবস্থার পক্ষপাতী নয়।

বরঞ্চ ইসলাম আইন বিধান রচনা ও বাস্তব সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে এজন্যে কাজ শুরু করেছে। তার উপদেশ, উৎসাহ দান ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধানকরণকেও এজন্যে কাজে লাগিয়েছে। সমাজের এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যকার পার্থক্য দূরত্ব হ্রাস করাই ইসলামের লক্ষ্য। এজন্যে ধনীদের অত্যাচারে-উৎপীড়ন ও শোষণের সীমা নির্ধারণ এবং দরিদ্রদেরকে সমান মানে উচ্চে উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এ পর্যায়ে ইসলাম গৃহীত উপায় ও পন্থাসমূহ সম্পর্কে আমি খুব বেশী কিছু বলতে চাই না। সে সবের মধ্যে যাকাত যে একটা স্পষ্ট ও প্রধান উপায়, সে পর্যায়ে আমি পরে বিস্তারিত কথা বলব। কেননা তাতো ধনীদের কাছ থেকে নেয়া হয় এবং দরিদ্রের দেয়া হয়।

আমরা যখন সুষ্ঠু সহীহ ইসলামী সমাজের চিন্তা করি, দেখতে পাই তার ব্যক্তিগণ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে ইসলামের আহ্বানের সাড়া দিয়ে। জমিনের পরতে পরতে

---

১. الحشر - ٧

গমন করছে, তার অভ্যন্তরে নিহিত কন্দর থেকে রিযিকের সন্ধান করছে, তা বের করে নিয়ে আসছে বাইরের জগতে। চতুর্দিকে কৃষি কাজ ও শিল্পোৎপাদন ছড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে, ব্যবসায়ী হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। বহু ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কর্মতৎপর হয়ে রয়েছে। নানা পেশায় মানুষ ব্যতিব্যস্ত, সর্বশক্তি নিয়োগ করে উৎপাদন বাড়াচ্ছে, আসমান ও জমিনের সর্বত্র আল্লাহ তাদের নিয়ন্ত্রণে যা কিছু দিয়েছেন, সর্বশক্তি দিয়ে তার কল্যাণ গ্রহণ করছে। এ ধরনের একটি সমাজের চিত্র যখন আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে তখন দেখতে পাই অসংখ্য মানুষ এমন সক্ষম, যাদের ওপর যাকাত ফরয হতে পারে তাদের ধন-সম্পদে, তাদের আয়ে উৎপন্নে।

হারটা নিশ্চয়ই খুব বড় হবে এবং এ শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে।

তথায় এমন লোকও বিরল হবে না, যারা অক্ষমতার দরুন কাজ থেকে দূরে বসে থাকবে অথবা পরিবারের লোকসংখ্যা বিপুল ও আয়ের মাত্রা কম হওয়ার দরুন খুবই অসচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করবে।

কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না। যতই হোক, সংখ্যাটা অবশ্যই সীমিত হবে।

তার ফলে এখানে যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদের তুলনায় প্রাপকদের প্রাপ্তি পরিমাণ বিপুল হবে। তখন কম আয়ের বা আয়হীন লোকদের মালিক বানানোর জন্যে বিপুল সম্পদ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে জাতির 'আছে' ও 'নেই' লোকদের মধ্যকার পারস্পরিক পার্থক্য দূরত্ব অনেকখানি হ্রাস করা খুবই সহজ হয়ে দেখা দেবে।

কষ্টদায়ক দারিদ্র্যের মাত্রা বেশী হওয়া—একদিকে বিপুল ধনসম্পদের মালিক এবং অপরদিকে দিনের খোরাক বঞ্চিত লোকদের অবস্থিতিই—একটা সমাজের জন্যে খুব বড় বিপদ। এ বিপদটা সমাজ-সংস্থাটিকেই বিপর্যস্ত করে তার অস্থিমজ্জা জরাজীর্ণ করে দেয়—তার চেতনা হোক আর না-ই হোক। কিছু লোক পেটের ওপর হাত রেখে অতিভোজজনিত বদহজমের অভিযোগ করে আর তাদেরই পার্শ্বে থাকে এমন লোক, যারা পেটের ওপর হাত রেখে ক্ষুধার আগুন দমনে প্রয়াসী। কিছু লোক আকাশচুম্বী প্রাসাদের মালিক—বাসকারী লোকের অভাব বা স্বল্পতা আর কাছেই জরাজীর্ণ পর্ণকুটির—পা বিছিয়ে শোয়ারও সংকুলান হয় না, বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মাথা গুঁজে থাকতেও পারে না! এ এক অমানুষিক দৃশ্য!

কিন্তু যাকাত মানুষে মানুষে এ বীভৎস ও কুৎসিত পার্থক্য দূরীভূত করে দেবে। অন্তত এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যে প্রয়োজন পরিমাণ ও খাদ্য পোশাক বাসস্থান পাচ্ছে না, এরূপ লোক কোথাও পাওয়া যাবে না। অধিকন্তু যাকাত এ শ্রেণীর লোকদের অর্থনৈতিকভাবে উর্ধ্বে তুলে নেয়ার—এবং ধনী লোকদের পর্যায়ে গণ্য হওয়ার সুযোগদানের অনুকূল কাজ করবে।

ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা

ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে ঃ বাস্তবভাবে ইসলাম মুসলমানের মনে লোকদের কাছে ভিক্ষার হাত দরাজ করার প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে। সেজন্যে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ জাগাবার জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়। সর্বপ্রকারের নীচতা ও হীনতার উর্ধ্বে উঠবার প্রেরণা যোগায়। ইসলামের নবী রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের কাছ থেকে যেসব বিষয়ে 'বায়'আত' গ্রহণ করতেন, তার শুরুতেই এ বিষয়ের অঙ্গীকারের উল্লেখ করতেন। তাকে 'বায়'আতের' অন্যতম 'রোকন' হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতেন। আবূ মুসলিম আল খাওলানী থেকে বর্ণিত—তিনি বলেছেন, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আউফ ইবনে মালিক আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এক হিসেবে আমার বন্ধু। অন্য হিসেবে তিনি আমার দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত আমানতদার। বলেছেঃ 'আমরা সাত বা আট কিংবা নয়জন লোক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি রাসূলে করীম (স)-এর হাতে 'বায়'আত' করবে না। আমরা নও-মুসলিম হিসেবে বয়'আত করেছি বেশী দিন হয়নি—বললাম ঃ আমরা তা আপনার কাছে বায়'আত করেছি। ... পরপর তিনবার বললেন ...তা সত্ত্বেও আমরা হাত প্রসারিত করেছিলাম, তারপর বায়'আতও করলাম। একজন বললেন ঃ হে রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে ইতিপূর্বে 'বায়'আত' করেছি। এখন আবার কিসের ওপর 'বায়'আত' করব। তিনি বললেন ঃ বায়আত করবে একথার ওপর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে, তাঁর সাথে একবিন্দু শিরক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, তোমরা শুনবে ও আনুগত্য করবে। পরে খুব আস্তে করে বললেন ঃ 'তোমরা লোকদের কাছে কিছু চাইবে না।

হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেছেন, সেই লোকদের কেউ কেউ তার চাবুক ফেলে দিচ্ছিল—অতঃপর কেউই তাকে কিছু দেয়ার জন্যে কারো কাছেই এবং কখনই সওয়াল করবে না।[১]

নবীর কাছে বায়'আতকারী লোকেরা এমনিভাবে বায়'আতের আক্ষরিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। অতঃপর বাস্তবিকই তাঁরা কারোর কাছেই কিছু চাননি—অর্থ পর্যায়ের কোন জিনিস কিংবা কোনরূপ কষ্টের কাজ—কোন ক্ষেত্রেই নয়। এজন্যে আল্লাহ্ সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। বস্তুত তারা দুনিয়াকে জয় করেছিলেন নিজেদের নফসকে জয় করার পর। (যারা নিজের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে, তারাই পারে অন্য মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করতে।) তাঁরা নিজেদেরকে সীরাতুল মোস্তাকীমে চালিয়েছিলেন বলেই দুনিয়াকে সীরাতুল মুস্তাকীম দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূল করীম (স)-এর মুক্ত গোলাম সওবান (রা) থেকে বর্ণিত, বলেছেন রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে লোক আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে, সে লোকদের কাছে কিছুই চাইবে না, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

---

১. হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত করেছেন যেমন الترغيب والترهيب গ্রন্থে ২য় খণ্ড الترهيب من المسالة —এ বলা হয়েছে।

সওবান বললেন ঃ 'আমি হে রাসূল! বললেনঃ হ্যাঁ, লোকদের কাছে কিছুই চাইবে না এবং অতঃপর তিনি বাস্তবিকই কারো কাছে কিছুই চাইতেন না।'[১]

নবী করীম (স) সাহাবীদের কাছে গ্রহণকারী হাতকে 'নীচের হাত' বলে চিহ্নিত করেছেন। আর আত্মসংযম রক্ষাকারী বা দাতা হাতকে 'উপরের হাত' বলে দেখিয়েছেন। তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা যেন (ভিক্ষা) চাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করায় নিজেদের রাজী করেন, তাহলে আল্লাহ্ও তাদের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাঁরা যেন অন্য লোকের প্রতি মুখাপেক্ষী না হন, তাহলে আল্লাহ তাদের মুখাপেক্ষীহীন বানাবেন। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারদের কতিপয় লোক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাদের তা দিলেন। পরে আবার চাইলে তখনও দিলেন। শেষে রাসূলের কাছে যা ছিল তা তখন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, বললেন, আমার কাছে কোন মাল থাকলে আমি তা তোমাদের না দিয়ে পুজি করে রাখতাম না। আর যে লোক চাওয়া থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্ও তাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করবেন। যে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল বানাবেন। আর ধৈর্য থেকে অধিক প্রশস্ত জিনিস কেউ কাউকে দিতে পারে না।[২]

কাজই আসল ভিত্তি

রসূল (স) সাহাবিগণকে ইসলামের মূলনীতিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌল নীতি শিখিয়েছেন।

প্রথম মৌলনীতি ঃ কর্মই উপার্জনের ভিত্তি। মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য পৃথিবীর—জমির—পরতে পরতে গমন করা এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করা। আর কাজ—যদিও কেউ কেউ তাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে—লোকদের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকা অপেক্ষাও অনেক উত্তম। লোকদের কাছে চাওয়ায় মুখের পানি ফেলানোর তুলনায়ও তা ভাল। কেউ যদি পিঠের ওপর রশি রেখে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আসে তা বিক্রয় করে, তাহলে আল্লাহ্ তার মুখ রক্ষা করবেন। তা অনেক ভালো লোকদের কাছে চাওয়া থেকে—তারা দিল কি দিল না, তা তো অনিশ্চিত।[৩]

লোকদের কাছে চাওয়া হারাম

আর দ্বিতীয় মৌলনীতি হচ্ছে, মূলত লোকদের কাছে চাওয়া এবং তাদের জড়িয়ে ধরে দিতে বাধ্য করা হারাম। কেননা তাতে একটি মানুষকে স্বীয় মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে চমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়। অতএব কোন মুসলমানেরই চাওয়ার পথ ধরা উচিত নয়। তবে বাস্তবিকই কোন কঠিন প্রয়োজন—অভাব, দারিদ্র্য—যদি তাকে

---

১. হাদীসটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছে—পূর্বে সূত্র। বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন السنن الكبرى ৪র্থ খণ্ড ১৯৭ পৃ.

২. ইবন মাজা ছাড়া অন্যান্য সকলে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। দেখুনঃ السنن الكبرى ج ٤ ص ١٧٠এবং তার পরে।

৩. বুখারী জুবাইর থেকে উদ্ধৃত করেছেন كتاب البيع-এর শুরুতে।

চাইতে বাধ্যই করে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। যদি কেউ অন্য লোকের কাছে চায় অথচ তার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ তার কাছে রয়েছে, তা হলে তার এ 'চাওয়া'টা কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে 'জখম' হয়ে দেখা দেবে।

এ মর্মে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যাতে লোকদের কাছে 'চাওয়া' সম্পর্কে হুঁশিয়ারী করে দেয়া হয়েছে, এমন সব ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, যা শুনলে অন্তর কেঁপে ওঠে।

তন্মধ্য থেকে বুখারী মুসলিম নাসায়ী কর্তৃক হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে রাসূল (স)-এর কথা হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

লোকদের কাছে চেয়ে বেড়ানো তোমাদের মধ্য থেকে কারোর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সে যখন আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখে গোশতের এক টুকরাও থাকবে না।

'সুনান' প্রণেতাগণ উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'যে অন্যদের কাছে চাইল অথচ তার যথেষ্ট পরিমাণ ধনাঢ্যতা আছে, কিয়ামতের দিন সে ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল নিয়ে আসবে। বলা হল ঃ হে রাসূল! ধনাঢ্যতা হয় কিসে ? বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা সেই পরিমাণ স্বর্ণমূল্য।'[১]

অর্থাৎ লোকদের কাছে 'চাওয়া' কাজটির পরিণতি ব্যক্তির মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা প্রকাশকারী মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হবে।

আর একটি হাদীস ঃ 'যে চাইল' অথচ তার কাছে যথেষ্ট আছে, সে আগুনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে চাইছে অথবা জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিংগ বেশী করতে চেয়েছে।' সাহাবিগণ বললেন ঃ হে রাসূল! 'যথেষ্ট পরিমাণটা কি ? বললেন ঃ যে পরিমাণে তার সকাল-সন্ধ্যা চলে যায়।[২]

অপর হাদীস ঃ যে চাইল, অথচ তার কাছে এক আউকিয়া রয়েছে, সে তো লোকদের জড়িয়ে ধরার অপরাধ করল।[৩] 'আউকিয়া'—চল্লিশ দিরহাম।

উপরের হাদীসের অর্থ কি এই যে, যার কাছে একদিনের সকাল-সন্ধ্যার খোরাক আছে ? অথবা তার তাৎপর্য এই যে, সে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপার্জন করে, ফলে সে সব সময়ই সকাল-সন্ধ্যার খোরাক পায় ?

সম্ভবত এ শেষোক্ত তাৎপর্যটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, এটাই অধিক সমীচীন। অতএব যে লোক এভাবে নিত্য নতুন রিযিক পাচ্ছে, তার এ পাওয়াই চাওয়ার লাঞ্ছনা থেকে বিরত থাকার জন্যে যথেষ্ট।

যে ধনাঢ্যতা ভিক্ষা হারাম করে

উপরিউক্ত হাদীসসমূহে ভিক্ষা চাওয়া হারাম হয় যে পরিমাণ ধনাঢ্যতায়, তাতে বিভিন্ন পরিমাণের উল্লেখ করা হয়েছে—তার কারণ কি ? শাহ্ অলী উল্লাহ্ দিহলভী তাঁর

---

১. চারখানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত ২. আবূ দাউদে উদ্ধৃত। ৩. আবূ দাউদ,নাসায়ী উদ্ধৃত।

অনন্য গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। তিনি বলেছেন ঃ

> আমাদের মতে এসব হাদীস পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা মানুষ বিভিন্ন স্থানে বাস করে। প্রত্যেকেরই একটা উপার্জন আছে, তা থেকে ভিন্ন দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব যে লোক কোন পেশার মাধ্যমে উপার্জনকারী হবে, সে সেই পেশার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-হাতিয়ার না পাওয়া পর্যন্ত অক্ষম। যে চাষী তার চাষের প্রয়োজনীয় হাল-গরু না পাওয়া পর্যন্ত, যে ব্যবসায়ী সে পণ্যদ্রব্য না পাওয়া পর্যন্ত এবং যে লোক জিহাদে যোগদান করে সকাল-সন্ধ্যায় পাওয়া গনিমতের মাল দিয়ে রিযিকের ব্যবস্থা করে—যেমন রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবিগণ ছিলেন—এ সকলের জন্যে নির্ধারিত পরিমাণ হচ্ছে এক 'আউকিয়া' অথবা পঞ্চাশ 'দিরহাম'।
>
> আর যে লোক উপার্জন করে হাটে-বাজারে বোঝা বহন করে; কিংবা কাঠ সংগ্রহ ও বিক্রয় করে এবং অনুরূপ অন্যান্য উপার্জনকারী, তাদের বেলায় নির্ধারিত পরিমাণ তা—যা সকাল-সন্ধ্যা খাবার জোটাতে পারে।[১]

বিবেচনাসম্মত কথা হচ্ছে, যে পরিমাণ ধনাঢ্যতা ভিক্ষা চাওয়া হারাম করে, তা যাকাত গ্রহণ হারাম করে যে পরিমাণ ধনাঢ্যতা, তা থেকে অনেক কম। কেননা শরীয়াতের বিধানদাতা ভিক্ষাবৃত্তির ওপর কাঠোরতা গ্রহণ করেছেন। সে ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন মুসলিমের জন্যেই ভিক্ষাবৃত্তি জায়েয নয়। আর ভিক্ষা করার সময়টিতেও প্রয়োজন পরিমাণ যার আছে, তার তো ভিক্ষা করার প্রয়োজন থাকতে পারে না—খাত্তাবী তাই বলেছেন।

ইসলাম তার প্রতি ঈমানদার লোকদের জন্যে এ প্রশিক্ষণেরই ব্যবস্থা করেছে। আর তাদের জন্যে ওসবই হচ্ছে মূল্যবান উপদেশ, নসীহত।

কিন্তু কেবল নীতিগত উপদেশ ও নৈতিক আবেদন এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ কখনই যথেষ্ট হতে পারে না, যদি সাথে ভিক্ষুক লোকদের জন্যে—যারা সমুপস্থিত প্রয়োজনেই, শক্তিশালী বাধ্যবাধকতায়ই ভিক্ষাবৃত্তি করে—বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হবে। এজন্যেই বলা হয়েছে, 'জবরের আওয়াজ বিবেকের ধনীর চাইতে অনেক শক্তিশালী।'

কর্মক্ষম লোকদের কর্মসংস্থানই ভিক্ষাবৃত্তি রোধের বাস্তব উপায়

ভিক্ষাবৃত্তি রোধের বাস্তব কর্মপন্থা দুটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। প্রথম, প্রত্যেক

---

১. ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃঃ المنيريه। ط-হানাফী আল্লামা আবূ জাফর তাহাভী مشكل الاثار গ্রন্থে বলেছেন, নবী করীম (স) প্রথম দিক দিয়ে ভিক্ষা চাওয়া হারাম হয় যে পরিমাণ খাদ্য থাকলে-তা নির্ধারণে খুব কড়াকড়ি করেছেন। পরে ক্রমশ সে কঠোরতাকে হালকা করেছেন। শেষে বলেছেন পাঁচ 'আউকিয়া'—আর তা রৌপ্যে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ। কিন্তু এ কথার কোন দলিল নেই। তাই শাহ্ দিহলভীর ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণীয়। আল্লামা তাহাভী পাঁচ 'আউকিয়া'র যে হাদীসের কথা বলেছেন, সে হাদীসের শুদ্ধতা প্রমাণিত হয়নি।

কর্মক্ষম বেকার লোকের জন্যে উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা। এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার নাগরিকদের প্রতি। যে দায়িত্বশীল, সে তার জনগণের জন্য দায়ী (Responsible)। দেশবাসীর মধ্যে কর্মক্ষম বেকার লোকদের সম্মুখে তার হাত কচলাতে থাকা কোনক্রমেই উচিত নয়। তেমনি তাদের প্রতি স্থায়ীভাবে যাকাত-সাদ্‌কা'র সাহায্য দানে হাত প্রসারিত করতে থাকাও জায়েয নয়—পরিমাণ কম কি বেশী। যাকাতের ব্যয়খাত পর্যায়ে আমরা রাসূলে করীম(স)-এর হাদীস উল্লেখ করে এসেছি ঃ 'যাকাত ধনীর জন্যে বা সুস্থদেহ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে হালাল নয়। সুস্থদেহ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে বস্তুগত সাহায্যই দেয়া হবে, তা এক দিক দিয়ে বেকারত্বে উৎসাহিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর অপর দিক দিয়ে তা দুর্বল অক্ষম অপূর্ণাঙ্গ দেহ লোকদের অধিকারে বেশী লোকের ভিড় সৃষ্টি মাত্র।'

ওসব ভিক্ষা-চাওয়া লোকদের একজনের প্রতি রাসূলে করীম (স) যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা-ই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় ও কর্তব্য পদক্ষেপ।

আনাস ইবনে মালিক (রা)[১] থেকে বর্ণিত, একজন আনসার বংশীয় লোক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ঘরে কি কিছুই নেই' ? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। উটের পিঠে পরাবার বা ঘরে গরম কাপড়ের নিচে বিছানোর একটা কাপড়—তার একটা অংশ পরিধান করি, আর অপর অংশ বিছাই, আর একটি পাত্র। তাতে পানি পান করি।' তখন নবী করীম (স) বললেন, জিনিস দুটি আমার কাছে নিয়ে এসো।' সে তা তাঁর কাছে নিয়ে এল। রাসূলে করীম (স) তা হাতে নিয়ে বললেন, এই দুটি কে কিনবে ? এক ব্যক্তি বলল, আমি নেব এক দিরহাম মূল্যে।' তিনি বললেন, 'তার বেশী দিতে কেউ প্রস্তুত আছে ?'.. দুবার... তিনবার। তখন অপর একজন বলল, 'আমি এ দুটি জিনিস দুই দিরহামে কিনব।' তখন নবী করীম (স) জিনিস দুটি সে লোকটিকে দিলেন ও দুটি দিরহাম গ্রহণ করলেন। দিরহাম দুটি তিনি আনসারীকে দিয়ে বললেন, 'একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবারের কাছে পৌঁছাও। আর অপর দিরহামটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো'। পরে রাসূলে করীম (স) নিজ হাতে তাতে হাতল লাগিয়ে দিলেন। তাকে বললেন, 'যাও, কাঠ সংগ্রহ কর এবং বিক্রয় কর এবং আমি যেন তোমাকে পনের দিন পর্যন্ত না দেখি।' অতঃপর লোকটি চলে গেল। সে কাঠ নিয়ে এসে বিক্রয় করতে লাগল। পরে যখন সে ফিরে এলো, এ সময়ে সে দশ দিরহাম উপার্জন করেছে। তার কিছু দিয়ে সে কাপড় ক্রয় করল এবং কিছু দিয়ে সে খাদ্য ক্রয় করল। এ সময় রাসূলে করীম (স) বললেন, 'কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে ভিক্ষার কালো

---

১. হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি 'হাসান' —কেবল আখ্‌জার ইবনে আজলান সূত্রেই আমরা তা জানি। তার সম্পর্কে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুয়ীন বলেছেন ঃ وصالح আবূ হাতেম আর রাজী বলেছেন ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীস লেখা হত। দেখুন ঃ مختصر سنن ابى داؤد للمنذرى ج ٢ ص ٢٣٩-٢٤٠

চিহ্ন পড়ুক, তার চাইতে এটা অনেক ভালো। কেননা ভিক্ষা চাওয়া তিনজন লোক ছাড়া শোভা পায় না। কঠিন দারিদ্র্যে পীড়িত ব্যক্তি[১] অথবা ন্যক্কারজনক বিরক্তিকর ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি অথবা এমন দিয়েত দিতে বাধ্য ব্যক্তি, যা দিলে সে এত দরিদ্র হয়ে পড়বে যে, তার জন্যে ভিক্ষা চাওয়া হালাল হয়ে যাবে।

এ সুস্পষ্ট হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবী করীম (স) প্রার্থী আনসারীকে যাকাত গ্রহণ করতে দেননি। কেননা সে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আর তার জন্যে তা জায়েয নেই। জায়েয হতে পারে কেবল তখন, যখন তার সম্মুখে চলার পথ সম্পূর্ণরূপে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, কোন পন্থা গ্রহণও অসম্ভব হয়ে পড়ে অথচ রাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তার জন্যে হালাল উপার্জনের সুযোগ করে দেয়া এবং তার সম্মুখে কর্মের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া।

এ হাদীসটি থেকে ইসলামের এমন কতগুলো অগ্রবর্তী পদক্ষেপের কথা জানা যায়, ইসলামের আত্মপ্রকাশের পর দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী কাল অতিবাহিত হওয়ার পরই মানবতা এ সব বিষয়ে অবহিত হতে পেরেছে।

নবী করীম (স) অভাবগ্রস্ত ভিক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে কিছু বস্তুগত সাহায্য দিয়েই তার সমস্যার সমাধান করতে চান নি—যেমন অনেকে তাই চিন্তা করেছে। নিছক উপদেশ—ওয়ায বলেও ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে দিয়েও তিনি দায়িত্ব পালন করেননি—যেমন অনেকে সাধারণত করে থাকে। তিনি স্বহস্তে সমস্যাটির বাস্তব সমাধান দেয়ার এবং এক সফল পন্থায় তার দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করেছেন।

তাকে শিক্ষাদান করেছেন যে, তার মধ্যে যত শক্তি ও কর্মক্ষমতা রয়েছে, তাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে—সে শক্তি যত ক্ষুদ্রই হোক, যত উপায় ও পন্থা প্রয়োগ করা সম্ভব, তাও অবলম্বন করতে হবে—তা যতই দুর্বল কিন্তু তবুও ভিক্ষা করবে না—যদি তার কাছে এমন জিনিস থাকে যা ব্যবহার করলে প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করা সম্ভব হতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই ব্যবহার করবে।

তাকে এও শিক্ষা দিলেন যে, যে কাজই হালাল রিযিক এনে দেয় তা-ই ভাল ও ভদ্রজনোচিত কাজ, যদিও তা কাঠ যোগাড় ও বোঝা বহন করে নিয়ে এসে বিক্রয় করার কাজই হোক-না-কেন। তা হলেই আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন।

রাসূল (স) তাকে এমন কর্মের পথ দেখালেন, যা তার ব্যক্তিত্ব, শক্তি–সামর্থ্য, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সবদিক দিয়েই তার উপযোগী। তার জন্যে কাজের একটা হাতিয়ারও যোগাড় করে দিলেন। সেটি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পথ দেখালেন; তাকে দিশেহারা করে ছেড়ে দিলেন না—না খেয়ে তিল-তিল করে মরে যাওয়ার জন্যে।

---

১. কঠিন দারিদ্র্য বলতে—মূলে ব্যবহৃত শব্দের দৃষ্টিতে—বোঝানো হয়েছে এমন দারিদ্র্য যা ব্যক্তিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় অর্থাৎ তার কাছে এমন জিনিসও থাকে না যা দিয়ে সে মাটি থেকে সরে থাকতে পারে।

তাকে পনের দিনের একটা মেয়াদও নির্দিষ্ট করে দিলেন; এ কাজ তার জন্যে শোভন কিনা এ মেয়াদের শেষে তা তিনি জানতে পারবেন বলে। এই মেয়াদের মধ্যে যদি সে কাঙ্খিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম প্রমাণিত হয় তা হলে তাকে এ কাজে বহাল রাখবেন। অন্যথায় তার জন্যে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।

লোকটির সমস্যার বাস্তব সমাধান পেশ করার পরই তিনি সেই নীতিগত সংক্ষিপ্ত উপদেশ তার সম্মুখে পেশ করলেন, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে উচ্চমানের সতর্কতা ও ভয় প্রদর্শন রয়েছে। সেই সীমার কথাও বলে দিলেন, যার মধ্যে বিচরণ জায়েয। আমরা মুসলিমদের জন্যে নবী প্রদর্শিত এ নির্ভুল পন্থা অবলম্বন ও অনুসরণ করা একান্তই কর্তব্য। মুখের কথা ও ওয়ায-নসীহতের সাহায্যে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই আমাদের উচিত সমস্যাসমূহের বাস্তব সমাধান পেশ করা—প্রত্যেক বেকার ব্যক্তির জন্যে কাজের সংস্থান করা।[১]

এ প্রেক্ষিতে যাকাতের ভূমিকা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাকাত সম্পদ থেকে কর্মক্ষম বেকার লোকদের জন্যে যে ধরনের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা কিনে দেয়া কিংবা ব্যবসায়ের জন্যে মূলধন সংগৃহীত যাকাত .সম্পদ থেকে দেয়া সম্ভব হলে তাই দেয়া। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বিশ্লেষণে আমরা তা বিস্তারিত বলে এসেছি। এ থেকে সেবামূলক কাজের প্রশিক্ষণও দেয়া যেতে পারে, যাকে কেউ পেশা বা উপার্জন-উপায়রূপে গ্রহণ করবে এবং তা থেকেই সে জীবিকার সংস্থান করবে। যৌথ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা, শিল্প কারখানা স্থাপন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, কৃষি ফার্ম কায়েম করা ইত্যাদি ধরনের বহু কাজের ব্যবস্থাই তা থেকে করা যেতে পারে। বেকার কর্মক্ষম লোকেরা সেখানে কাজ করবে, উপার্জন করবে এবং শরীকানায় বা সমগ্রটার কিংবা তার কোন অংশের তারা মালিক হয়ে বসবে।

অক্ষম লোকদের জীবিকার নিরাপত্তা

দ্বিতীয়—অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি ও লোকদের কাছে চেয়ে বেড়ানো সমস্যার বাস্তব কর্মের মাধ্যমে সমাধান করার উপায়সমূহের মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, উপার্জনে অক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে উপযুক্ত ও যথেষ্ট মাত্রার রিযিকের নিরাপত্তা দান। তার অক্ষমতা দুটি কারণে হতে পারে ঃ

ক. দৈহিক দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার দরুন তা হতে পারে। অল্প বয়স্কতাও তার ও উপার্জনের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে, আশ্রয়দাতা বা অভিভাবক না থাকা যেমন ইয়াতীমদের বেলায় হয় কিংবা কোন কোন ইন্দ্রিয় শক্তির বা কোন অংগের অক্ষমতার দরুনও তা হতে পারে। হতে পারে দীর্ঘ মেয়াদী ও অক্ষমকারী রোগের দরুন.... ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো দৈহিক কারণ, যে কেউই এ অক্ষমতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে এবং তার ওপর বিজয়ী হওয়া কিংবা তাকে দমিত করার কোন উপায়ই

১.এ গ্রন্থকার প্রণীত مشكاة الفقر وكيف عالجها الاسلام থেকে উদ্ধৃত।

হয়ত সে পেতে পারে না। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত থেকে এমন পরিমাণ দিতে হবে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হবে, তাকে সচ্ছল বানিয়ে দেবে, তার দুর্বলতা দূর করার ও তার অক্ষমতার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তা করতে হবে—যেন সে সমাজের ওপর একটা বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। যদিও আমাদের এ আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে আংশিক অক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করে জীবনযাত্রা সহজ করে তোলা সম্ভবপর—যেমন অন্ধ, বধির ইত্যাদি। তাদেরকে নানা শিল্প ও পেশা শেখানো যেতে পারে—যা তাদের উপযোগী হবে, তাদের অবস্থার সাথে সংগতিসম্পন্ন হবে এবং ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে তাদের রক্ষা করবে, সম্মানজনক জীবিকার সংস্থান করবে। তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানে যাকাতের মাল ব্যয় করায় কোনই অসুবিধা থাকতে পারে না।

খ. উপার্জনে অক্ষমতার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও হালাল কাজ বা উপার্জন পন্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া। কাজ চাইলেও পাওয়া না যাওয়ার মত অবস্থা হওয়া, কাজের জন্যে বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়া। রাষ্ট্রকর্তার পক্ষ থেকে এ...... এ লোকদের জন্যে উপার্জনের সুবিধা দান সত্ত্বেও তা না পাওয়া—দৈহিকভাবে অক্ষম লোকদের মতই এদের অবস্থা মনে করত হবে, যদিও তারা শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার অধিকারী। এজন্যে যে, কেবল দৈহিক ক্ষমতা ও যোগ্যতাই তো আর খেতে দেয় না, ক্ষুধা নিবৃত্ত করে না—যতক্ষণ তদ্দারা উপার্জন করা না যাবে।

ইমাম আহ্মাদ প্রমুখ সে দুই ব্যক্তির কিস্সা বর্ণনা করেছেন, যারা রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে যাকাতের অংশ চেয়েছিল। নবী (স) তাদের দুজনের আপাদমস্তক দেখে নিলেন; দেখলেন, দুজনই খুব স্বাস্থ্যবান শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। পরে তাদের বললেন ঃ 'তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেব; কিন্তু জেনে রাখ, যাকাতে ধনী ও উপার্জনশীল শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কোন প্রাপ্য নেই। অতএব শক্তিসম্পন্ন উপার্জনকারী ব্যক্তির যাকাত পাওয়ার কোন অধিকার নেই।

উপরিউক্ত বর্ণনায় আমাদের সম্মুখেই বহু লোকেরই বিভ্রান্তিমূলক চিন্তার ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যাদের ধারণা হচ্ছে, যাকাত বুঝি প্রার্থীমাত্রকেই দেয়া যেতে পারে—যে-ই তা পেতে চাইবে, তাকেই বুঝি তা দিতে হবে! না, তা নয়। অনেকে এও মনে করেন যে, যাকাত বুঝি বিপুল সংখ্যক প্রার্থী ও ভিক্ষুককে সাহায্য করে। না, বরং আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম যেভাবে যাকাতের বিধান বিধিবদ্ধ করেছে তা যদি বাস্তবিকই অনুধাবন করা হয়—ইসলামের বিধান অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয় এবং ইসলাম যেভাবে বন্টন করার বিধান দিয়েছে সেই অনুযায়ী অংশ ভাগ করে ও সেভাবে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে অকারণ ভিক্ষাকারী ও কৃত্রিমভাবে ভিক্ষুক সাজার পথ চিরতরে ও স্থায়ীভাবে বন্ধ করা খুবই সম্ভবপর হবে।

পারস্পরিক শত্রুতা ও সম্পর্ক বিনষ্টির সমস্যা

সৌভ্রাতৃত্ব মৌল ইসলামী লক্ষ্য

ইসলামের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলা—বিশেষভাবে ইসলামী সমাজের লোকদের পরস্পরের মধ্যে। এরূপ ভ্রাতৃত্ব—যার মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসার গভীরতা রয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হলেই প্রকৃত শান্তি ও নির্বিঘ্নতা স্থাপিত হতে পারে। তখন এ শান্তিই হবে সমাজ-সমষ্টির বিশেষত্ব। তখন লোকেরা ছোট ছোট ব্যাপারে বড় বড় ঝগড়া-বিবাদ অনুষ্ঠিত হতে এবং বিলাসপূর্ণ জীবনের স্বার্থে স্থায়ী দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হওয়ার মত অবস্থা চলতে দেখতে পারে না।

কিন্তু এরূপ একটি সামাজিক অবস্থা কেবলমাত্র তখনই পাওয়া যেতে পারে, যদি লোকদের অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি এর পরকালের প্রতি প্রকৃত ও গভীর ঈমান গড়ে ওঠে ও স্থায়ী হয়ে থাকে। বিরাট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মানুষ বাঁচে এবং প্রয়োজন হলে তারই জন্য মৃত্যুও বরণ করে। সে লক্ষ্য হচ্ছে মহাসত্যের ও মহাকল্যাণের সাহায্য কাজ। এরূপ লক্ষ্য গ্রহণ করা হলেই মুমিন ব্যক্তির পক্ষে সামান্য নগণ্য সামগ্রী বা ব্যাপারাদি উপেক্ষা করা সম্ভবপর। তখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে ঊর্ধ্ব দিগন্তে, পথিমধ্যে বৈষয়িক স্বার্থের জন্য লড়াই করতে প্রবৃত্ত হবে না তারা। কেননা তা খুবই সামান্য মূল্যের জিনিস আর পরকাল হচ্ছে সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্তমূলক সমাজ

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব-ভালোবাসাসম্পন্ন লোকদের সমাজের একটা দৃষ্টান্ত রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি প্রথম ইসলামী সমাজে। রাসূল করীম (স)-এর নেতৃত্বে মদীনা শহরকে কেন্দ্র করে এই সমাজটি গড়ে উঠেছিল। যদিও তথায় পারস্পরিক বিরোধিতা ও শত্রুতার অনেক দিক ছিল। তা সত্ত্বেও এই প্রোজ্জ্বল ভ্রাতৃত্বের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। এ সমাজ প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছিল মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে। মুহাজিররা ছিলেন বহিরাগত ও নগরবাসীদের ওপর অনুপ্রবেশকারী। তাঁরা আদনানী আরব ছিলেন। আর আনসাররা ছিলেন নগরের আদিম অধিবাসী। তাঁরা আরবা আরবের লোক ছিলেন অর্থাৎ কাহতানী। এ কাহ্তানী ও আদনানী আরবদের প্রত্যেকের মধ্যে ছিল প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পারস্পরিক গৌরব-অহংকার প্রকাশের রীতি। এমন কি, এ আনসাররা দুটো বড় বংশধারায় দানা বাঁধছিলেন—দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাতও চলছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে তা অব্যাহতভাবে শত্রুতা নিয়ে আসছিল। তারা ছিল 'আওস' বা 'খাজরাজ' নামে পরিচিত। তা সত্ত্বেও এ লোকদের মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ বিলাল

হাবসীকে, সালমান ফারসীকে এবং সুহাইব রুমীকে। সেখানে এ দুর্ধর্ষ মরুচারীদের উপরে দেখবে আবূ যারকে এবং সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ও নিয়ামতের ক্রোড়ে লালিত মুচয়িচ্ ইবনে উমাইর (রা) কে।

এসব সত্ত্বেও ঈমানের ভিত্তিতে এমন অনন্য ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল যা দুনিয়ার চক্ষু কোনদিনই দেখতে পায়নি। আমরা তথায় এমন এক সমাজ সংস্থা দেখতে পাচ্ছি, যেথায় ব্যক্তি তার দ্বীনী ভাইয়ের জন্যে তাই পসন্দ করছে, যা পসন্দ করছে সে নিজের জন্যে, তা-ই অপসন্দ করছে, যা সে অপসন্দ করছে নিজের জন্যে। তারা প্রত্যেকেই মনে করছে যে, এরূপ না হলে তার ঈমানই পূর্ণ ও যথার্থ হবে না। উপরন্তু আমরা সেখানে এও দেখতে পাই যে, এক ভাই অপর ভাইকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নিজে দুঃসহ ক্ষুধায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষুধার্ত ভাইকে খাবার দিচ্ছে, নিজে পিপাসায় প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে পড়েও তার পিপাসার্ত ভাইকে অগ্রে পানি পান করার সুযোগ করে দিচ্ছে। এহেন উন্নত মানের সমাজ সংস্থার আরেকটি চিত্র কুরআন মজীদ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

('ফাই' লব্ধ মাল) সেসব মুহাজির ফকীরদের জন্যে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও বিত্ত-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত বিতাড়িত হয়েছে। এ লোকেরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পেতে চাচ্ছে। এরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য সমর্থনে সদা সক্রিয় থাকে। এরাই সত্যপন্থী লোক। (তা সেই লোকদের জন্যেও) যারা এ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে হিজরত কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এরা সেই লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। আর যা কিছুই তাদের দেয়া হয়, তারা নিজেদের হৃদয়ে তার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না এবং তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে—নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক-না-কেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যারা নিজেদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, তারাই সফলকাম।[১]

ইসলাম বাস্তবভিত্তিক আইন তৈরী করে

ইসলাম এ ধরনেরই একটি সমাজকে আদর্শ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ সম্মুখে রেখেছে।

---

১. سورة الحشر ٨-٩

সেদিকেই জনগণের মন আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট। সেদিকেই চক্ষু নিবদ্ধ রেখেছে ইসলামে বিশ্বাসী লোকেরাও এবং বাস্তবভাবে এরূপ একটি আদর্শ সমাজ গঠন ও কায়েমের লক্ষ্যে দুনিয়ার নিষ্ঠাবান লোকেরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বস্তুত ইসলাম বাস্তববাদী দ্বীন। ইসলাম উচ্চতর আকাশ-মার্গের জন্যে আইন তৈরী করে না—ভুলে যায় না নিম্নে ধরনীতল। ইসলাম বিরল সংঘটিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আইন তৈরী করে না—স্বাভাবিক ও প্রায়ই সংঘটিতব্য অবস্থাকে উপেক্ষা করে। ইসলাম মানুষকে ফেরেশতা মনে করে না, মনে করে সেই মানুষ, যারা পৃথিবীর উপরে বিচরণ করে, আকাশ-মার্গে—শূন্যলোকে পাখার ওপর ভর করে ফেরেশতাদের মত তারা উড়ে বেড়ায় না। ইসলাম মানুষ সম্পর্কে এ ধারণা দিয়েছে যে, কুপ্রবৃত্তি তাদের তাড়না করে, তাদের মধ্যে নিহিত 'নফসে আম্মারা' তাকে খারাপ কাজের প্ররোচনাও দেয়। মানুষ শয়তান ও জ্বিন-শয়তান তাদের মনে 'ওয়াস্ওয়াসার' সৃষ্টি করে। পরস্পরের মনে গোপনভাবে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা চাকচিক্যময় ও লোভনীয় করে জাগ্রত করে দেয়। বৈষয়িক জীবনের স্বার্থ লোভ তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। ফলে ফেত্না-ফাসাদ, অত্যাচার-নিপীড়নের ঝঞ্ঝা-বাত্যা ছুটতে শুরু করে। এ কারণেই মানুষ পারস্পরিক ঝগড়া বা বিপদে নিমজ্জিত হয়, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও শুরু করে দেয়। তখন মানুষের ধন-মাল যেমন লুণ্ঠিত হয়, তেমনি ইযযত-আবরুও হয় পদদলিত।

যুদ্ধ-বিগ্রহ মানব সমাজের আদিম ক্রিয়া

পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের এ ব্যাপারটি সেদিন থেকেই সূচিত, যেদিন প্রথম এ বিশাল পৃথিবীতে পিতামাতা ও সন্তানসমন্বিত একটি পরিবার বাস করতে শরু করেছে। হযরত আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের পুত্র ও কণ্যাগণের সমন্বয়েই এ পরিবারটি গঠিত হয়েছিল। তখনও ভাই ভাইয়ের ওপর সীমালংঘন করেছে, শত্রুতা ও সীমালংঘনমূলক ভূমিকায় পড়ে তাকে হত্যা করেছে। এ কারণেই ফেরেশতাগণ এ নব্য সৃষ্টি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করত, যাকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়েছিলেন। তখন খিলাফতের মর্যাদা অনুধাবন করতে না পেরে ফেরেশতাগণ বলেছিলেন ঃ

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ -

হে আল্লাহ! তুমি কি পৃথিবীতে এমন সৃষ্টি নিয়ে আসবে, যা তথায় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[১]

হযরত আদমের দুই পুত্রের কিস্সা কুরআন মজীদ বিবৃত করেছে। মানুষ যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় চলতে শুরু করে এবং ঈমানের তাগিদ উপেক্ষা করে চলে, তাহলে

১. سورة البقرة ៖

কি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, তা আমরা সেই কিস্সায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ - اِذْقَرَّبَاقُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِ هِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ بِتَقْتُلَنِىْ مَاَاَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ج اِنِّىْ اَخَفُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ - اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ج وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ - فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ - فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ط قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ج فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ -

তাদের সম্মুখে আদমের দুই সন্তানের কিস্সা সত্যতা সহকারে বর্ণনা কর। যখন দুজনই কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয় এবং অপরজনের পক্ষ থেকে তা গৃহীত হয় না। তখন সে বলল ঃ আমি নিশ্চয়ই তোকে হত্যা করব। সে বলল ঃ আল্লাহ্ তো কেবল মুত্তাকী লোকদের কাছ থেকেই কবুল করেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার প্রতি তোমার হস্ত প্রসারিত কর, আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার হাত তোমার দিকে প্রসারিত করব না। আমি তো সারা জাহানের রব্ব্ আল্লাহ্কে ভয় করি। আমি তো চাই, তুমি আমার গুনাহ্ এবং তোমার গুনাহ্ উভয়ই নিয়ে যাও। তাহলে তুমি একজন জাহান্নামী হবে। আর জালিম লোকদের এটাই কর্মফল। অতঃপর তার নফ্স তাকে তার ভাইকে হত্যা করার জন্যে প্রবুদ্ধ করে, পরে সে তাকে হত্যা করে ফেলে। এতে করে সে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। পরে আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, কাকটি মাটি খুঁড়ছিল—যেন সে তার ভাইয়ের লাশ সমাধিস্থ করার পন্থা শেখাতে পারে। তখন সে বলল ঃ হায়, আমি এ কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়ে পড়লাম আমার ভাইয়ের লাশ দাফনের পদ্ধতি জানতে পারিনি।.....এভাবে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে গেল।[১]

এ ছিল মানব জীবনের সূচনাকাল। মানুষ তখন পর্যন্ত লাশ দাফনের প্রক্রিয়াও জানতো না। ইতিপূর্বে কোন লাশ দাফন হতেও দেখেনি।... একজন মানুষ তার ভাই মানুষকে হত্যা করে বসল.... সে ছিল তার আপন ভাই।

---

১. سورة المائدة ٢٧ - ٣١

ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে ইসলামের ভূমিকা

এ প্রাচীনতম অথচ একালের এ মানবীয় সমস্যার সমাধানের জন্যে বাস্তবপন্থী আদর্শ স্থানীয় জীবন-বিধান ইসলাম কি কার্যকর পন্থা গ্রহণ করেছে ?

মানবীয় প্রকৃতির দিক দিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ যখন এমনই যে, তা থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই, তখন তার বিপদটা ঘনীভূত হয়ে আসবার, তার স্ফুলিংগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং দিনের পর দিন তার খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেয়ার জন্যে উন্মুক্ত করে ছেড়ে দেয়ার কোনই অর্থ হয় না। তাই যখনই কোন ঝগড়ার সৃষ্টি হবে, দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠবে যখনই সে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন কি তাকে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছুই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবার জন্যে সুযোগ করে দেয়া হবে ?.... না, ইসলামের তা নীতি নয়। অবিলম্বে সমাজ-সমষ্টির তাকে হস্তক্ষেপ করা একান্ত আবশ্যক। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে যত শীঘ্র সম্ভব এ আগুন নিভিয়ে ফেলতে চেষ্টা করা সমাজের একটা বড় দায়িত্ব। আর সেজন্যে সমাজের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক লোককে এ কাজের জন্যে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হবে এবং সেজন্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার প্রস্তুতি ও শক্তি-সামর্থ সহকারে তাদেরকে এ কাজে অগ্রসর হতে হবে।

যে কোন আগুন জ্বলবে—জ্বালাবে একটি ঘর কিংবা বেশী, তা নির্বাপনের ব্যবস্থা করা এবং এদিক দিয়ে জনগণকে নিরাপত্তা দান সমাজ-সমষ্টিরই দায়িত্ব। অনুরূপভাবে যে বিবাদ-বিসম্বাদের প্রক্রিয়া গোটা সমাজকে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে ভয় হবে, তা মিটাবার ও নির্মূল করার দায়িত্বও তাকেই বহন করতে হবে।

মীমাংসার জন্যে হস্তক্ষেপ করা সমষ্টির দায়িত্ব

পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ এক ভিন্ন ধরনের আগুন। এ আগুন কেবল ঘর বাড়ি পাথরই ধ্বংস করে না, কেবল বাঁশ, গাছ ও দ্রব্যসম্ভারই ভস্ম করে না, সমাজের লোকদের হৃদয়, মন ও আত্মাকে খেয়ে ফেলে, ভালোবাসা, প্রেমপ্রীতির ভাবধারা হৃদয় মনকে নির্মূল করে দেয়। এই বিপদটি মানুষের ঈমান ও নৈতিকতাকেও ধ্বংস করে। কাজেই সমাজ-সমষ্টি এ আগুন নির্বাপনের জন্যে এবং তা থেকে জনগণকে নিরাপত্তা দান করার জন্যে দায়ী। রাসূলে করীম (স) এরূপ ঘটনার খারাপ প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন এভাবে 'পারস্পরিক সম্পর্কের বিপর্যয়—তা-ই নির্মূলকারী ?'[১] তাঁর এ কথাটিও বর্ণিত হয়েছে ঃ আমি বলি না তা চুল নির্মূলকারী এবং বলছি তা দ্বীন—তথা দ্বীনদারীকেই নির্মূল করে দেয়।'[২]

সমাজের লোকদের পরস্পরে যে ভাঙন-ফাটল-বিবাদই দেখা দিক, তা নির্মূল করার জন্যে হস্তক্ষেপ করা সমাজ সমষ্টিরই কর্তব্য। এমন কি, তা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও

১. আবু দাউদ ও তিরমিযী উদ্ধৃত।

২. তিরমিযী এই বাড়তি কথাটুকু উদ্ধৃত করেছেন বটে। কিন্তু কোন সনদের উল্লেখ করেননি।

দেখা দেয়, তবু সে ব্যাপারে সমাজ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্যে এবং তার আগুন নির্বাপনের জন্যে তাদের নিকটাত্মীয়দেরই দায়িত্ব নিতে হবে সর্বপ্রথম।—যেন ছেঁড়াজীর্ণ কাপড়ে তালি লাগানোর প্রশ্ন দেখা না দেয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا -

যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ফাটল ধরার আশংকা বোধ কর, তাহলে তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে একজন মীমাংসাকারী এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত কর। তারা দুজন মীমাংসায় আসতে চাইলে আল্লাহ্ তার তওফীক দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা-নিসা ঃ ৪৩)

আয়াতটি স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, মীমাংসাকারীদ্বয় স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পরিবারস্থ লোক হতে হবে। কিন্তু এ মীমাংসাকারী প্রেরণ এবং 'পারিবারিক মজলিশ' সংগঠনের দায়িত্ব সমাজের ওপর অর্পিত। 'নিযুক্ত কর'—বা 'পাঠাও' বলে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ ধরনের লোক পাওয়া না গেলে গোটা সমাজই সেজন্যে দায়ত্বশীল হবে—নিরাপত্তাদান মূলক দায়িত্ব।

একটি পরিবারে সৃষ্ট ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্যে সমাজ-সমষ্টিই যখন দায়িত্বশীল, তখন দুটো ভিন্ন ভিন্ন পরিবার, গোত্র বা দেশ কিংবা জাতির মধ্যে সৃষ্ট অতিশয় বড় আকারের বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা করার দায়িত্বও সমাজ-সমষ্টির ওপরই অর্পিত হবে স্বাভাবিকভাবেই। এ দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বড়, নিঃসন্দেহে অধিকতর বাধ্যতামূলক এবং জটিল।

এ প্রেক্ষিতেই কুরআন মজীদ দুই পক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার জন্যে—বিবাদ থামাবার জন্যে—সমাজকেই দায়িত্বশীল বানিয়েছে, সেজন্যে যদি অস্ত্রধারণও করতে হয়, তবু এ দায়িত্ব সমাজকেই পালন করতে হবে।

কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِاللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

মুমিনদের দুটো দল যদি পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মীমাংসা করে দাও। পরে যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর সীমা লংঘন করে তাহলে সেই সীমা লংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর—যেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তাহলে সে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ন্যায়পরতা সহকারে মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার কর। আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। নিঃসন্দেহে মুমিনরা ভাই-ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পরস্পরে মীমাংসা কর। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে।[১]

কুরআন মজীদ বহুতর স্থানে লোকদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে উপদেশ দিয়েছে, উৎসাহ প্রদান করেছে। একটি আয়াতে বলেছে ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَاَطِيْعُوااللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমাদের পরস্পরে মীমাংসা কর। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেকে মানো—যদি তোমরা মুমিন হও।[২]

অন্য আয়াত ঃ

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا-

লোকদের বহু কানপরামর্শেই কোন কল্যাণ নেই। তবে যে লোক দান করা বা কোন ভালো কাজ অথবা লোকদের মধ্যে মীমাংসার্থে যে পরামর্শ করা হয়, তা স্বতন্ত্র। আর যে লোক এ কাজ করবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, আমরা নিশ্চয়ই তাকে বিরাট শুভ কর্মফল দেব।[৩]

রাসূলে করীম (স)-এর বহু সংখ্যক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যা এ কাজটির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করে এবং মীমাংসা কাজের উৎসাহ দেয় ঠিক উক্তরূপ শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতিতে। একটি হাদীস ঃ

আমি কি নামায, রোযা ও দান-সাদ্কার তুলনায়ও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন উত্তম কাজের কথা তোমাদের বলব ?....তা হচ্ছে পারস্পরিক মীমাংসা করা। কেননা পারস্পরিক বিবাদই হচ্ছে নির্মূলকারী।[৪]

---

১. سورة الحجرات ٩-١٠

২. سورة الانفال - ١ ৩. سورة النساء - ١١٤

৪. আবূ দাঊদ كتاب الادب এ উদ্ধৃত, তিরমিযী উদ্ধৃত صفة القيامة বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ্।

মীমাংসাকারী কমিটি

সমাজকে কেবলমাত্র পুরুষ লোকদেরকে বিবাদাগ্নি নির্বাপনের কাজে নিযুক্ত করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে গাড়ি ও পানি 'শোষ পাইপ' ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সঙ্গে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কার্য সম্পাদনের জন্যে বিশেষভাবে পুরুষদেরকে নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে এ মীমাংসা কার্যে অংশ গ্রহণের জন্যে নানা কমিটি গঠন করতে হবে প্রতিটি দিকে ও গ্রামে। যে কোন বিবাদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সেসব কমিটিকে দিতে হবে। সেই কমিটিগুলোর জন্যে সকল উপায় প্রয়োগে কাজ করার সুযোগও থাকতে হবে।

অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব

অস্বীকার করার উপায় নেই, লোকদের পারস্পরিক বিবাদ নিরসন ও মীমাংসা বাস্তবায়নে একটা দায়দায়িত্ব থাকে এবং বিশেষভাবে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব। কেননা এ বিবাদের কারণ 'দিয়েত' বা 'রক্তমূল্য' হতে পারে অথবা দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের ওপর ধার্য জরিমানাও হতে পারে এবং হতে পারে, সে জরিমানা দিতে এক পক্ষ সক্ষম হচ্ছে না কিংবা তা দেয়ার যৌক্তিকতা সে স্বীকার করে না; কিন্তু অপর পক্ষ তা ছেড়ে দিতে মোটেই রাজী নয়। আর শক্তি প্রয়োগ করা হলে মীমাংসার পথই বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। আর আঘাত ভুলানো ও জখম শুকানোর লক্ষ্যে তা করা সমীচীনও মনে হয় না। তা হলে তখন কি করা যাবে? পারস্পরিক মীমাংসা সৃষ্টির কি উপায় হতে পারে তখন? এ অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বটা কার মাথায় চাপানো চায়?

সমাধান অতীব সহজ এবং এ সহজলভ্য সমাধান আমাদেরকে যাকাতই দিচ্ছে। যাকাতের অন্যতম ব্যয়খাত হচ্ছে 'আল-গারেমীন'—ঋণগ্রস্ত লোকগণ। 'যাকাত ব্যয়ের খাত' আলোচনায় আমরা বলে এসেছি এ ঋণগ্রস্ত লোকদের মধ্যে সে সব বড় বড় হৃদয়ওয়ালা লোকও গণ্য—ইসলামী সমাজ যাদের পরিচিতি উপস্থাপিত করেছে। তাদের এক-একজন দুটো পরিবার বা দুটো গোত্রের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্যে অগ্রসর হত এবং মীমাংসা বাস্তবায়িত করার জন্যে 'দিয়েত' বা জরিমানাটা নিজের মাল থেকে দিয়ে দিতে বাধ্য হত—বিবাদের আগুন নিভানোর এবং শান্তি ও স্বস্তি কায়েমের উদ্দেশ্যে। এসব লোককে সাহায্য দেয়ার জন্যে যাকাতের এ খাতটি নির্ধারিত হয়েছে। এটা ইসলামের এক অনন্য অবদান।

কুবাইচাতা ইবনুল মাখারিক আল-হিলালী (রা) যিনি এমনি এক মীমাংসার কাজে গিয়ে একটা বড় বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন—পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রার্থনা করেছিলেন। এ সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নি। নবী করীম (স) তখন তাঁকে বলেছিলেন: অপেক্ষা কর, যাকাতের মাল আসুক, তখন তা থেকে আমরা তোমাকে দিতে বলব। পরে তিনি তাকে বললেন: যে ব্যক্তিই এরূপ কোন ঋণের বোঝা নিজের মাথায় গ্রহণ করবে, তার পক্ষে 'চাওয়া' হালাল। যেন সে তা পায় এবং পরে সে সতর্ক হয়। (আহমাদ ও মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন)।

ইসলামের অবদানের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—ফিকাহ্‌বিদগণ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন—পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করতে গিয়ে যে লোক ঋণগ্রস্ত হবে, যাকাত থেকে তাকে দিতে হবে—যদিও সেই মীমাংসার ব্যাপারটি ইহুয়াদী-খৃস্টান যিম্মীদের মধ্যকারই হোক-না-কেন।[১]

কেননা ইসলামী সমাজ-পরিধির মধ্যে যারা বাস করে, তাদের সকলের মধ্যে শান্তি ও চুক্তি-সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অতীব মৌলিক লক্ষ্য।

একটি ফিকহী প্রশ্ন

কিন্তু সেজন্যে কি এক ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নিজের মাল থেকে সন্ধি-সমঝোতার জরিমানা দিয়ে দিতে হবে, পরে সে যা দিয়েছে তা যাকাতের মাল থেকে তাকে দিয়ে দিতে হবে, যেন প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিকে যাকাত থেকে দেয়ার কাজটি হয়? জবাবে বলা যায়—সাধারণভাবে ফিকাহ্‌বিদদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, হ্যাঁ, এ শর্তটি রক্ষা করা আবশ্যক। তাহলেই যাকাত সংক্রান্ত আয়াতের আক্ষরিক মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে।[২]

কিন্তু আয়াতটির ভাবধারা এবং যাকাতের এ অংশটি রেখে বিধানদাতা যে লক্ষ্য পেতে চান, তা হচ্ছে, সালিশী কমিটিকে তা দিয়ে দিতে নিষেধ করা যাবে না, যেন সে তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাওনাদারকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিতে পারে। অবশ্য যখন কোন কমিটির দায়িত্বে এ কাজটি হবে, সমাজ তার রায়কে গুরুত্ব দেবে। কেননা সমাজই এ কমিটি গঠন করেছে এবং তাতে রাজী হয়েছে। আর যদি কুরআনে প্রস্তাবিত রূপটা সংরক্ষণ করাই অপরিহার্য হয়, তাহলে কমিটির একজন সদস্যকে তা কোন লোকের বা কোন সংস্থার কাছ থেকে করজ নিয়ে দিয়ে দেবার জন্যে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। পরে যাকাতের এ ঋণগ্রস্তের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ থেকে তাকে তা দিয়ে দেয়া যাবে। ঋণগ্রস্তদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশই হচ্ছে 'সন্ধি-সমঝোতার ফাণ্ড'।

তবে এ ব্যাপারের গুরুত্ব অস্বীকার করা উচিত নয় যে, প্রথম প্রকার—সমাজের হৃদয়-কন্দর থেকে যা ফুটে ওঠেছে—যে দয়াপরবশ হয়ে মীমাংসার উদ্দেশ্যে নিজের কাছ থেকে ব্যয় করেছে, তা ফেরত পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছাড়াই, নৈতিকতার মানদণ্ডে এ প্রথম পন্থাটি মূলত লক্ষ্যভূত। ইসলামের নির্ধারণে তা খুব বেশী গুরুত্ব পাবে। 'জাতীয় আধ্যাত্মিক মূল্যমানের সাথে যাকাতের সম্পর্ক' পর্যায়ে আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত কথা বলেছি।

---

১. مطالب اولى النهى ج ٢ ص ١٤٣

২. غاية المنتهى গ্রন্থ এবং তার শরাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ষষ্ঠ হচ্ছে সেই ঋণী যে পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, সে ধনী হলেও, সে যদি নিজের মাল থেকে তা না দিয়ে থাকে। কেননা নিজের মাল থেকে দিয়ে থাকলে তো সে ঋণগ্রস্ত হ'ল না। যদি সে ঋণ নিয়ে তা দিয়ে থাকে, তাহলে তা পূরণের জন্যে সে যাকাত থেকে নিতে পারে। কেননা ঋণ তো রয়ে গেছে।
المصدر السبق ج ص ١٤٤

কঠিন দুঃখপূর্ণ ঘটনার সমস্যা

প্রাচুর্য ও বিপদমুক্ততা

ইসলামের কাম্য হচ্ছে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি জীবন সামগ্রীর প্রাচুর্য ও ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে বসবাস করুক, যেন সে আল্লাহ্‌র ইবাদত পালন করতে পারে—ঐকান্তিক আল্লাহ্‌র ভয়, নতি স্বীকার ও আত্মোৎসর্গের ভাবধারা সহকারে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের কাছে তাঁর ইবাদতের দাবি করেছেন এ দুটো নিয়ামতের বিনিময়ে ঃ প্রাচুর্য ও ভয়হীনতা। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ - اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ - فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ - اَلَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ -

যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে অর্থাৎ শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত। কাজেই তাদের কর্তব্য হচ্ছে এ ঘরের আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দূরে রেখে নিরাপত্তা দান করেছেন।

বস্তুত একটি স্থান বা দেশের পক্ষে সবচাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, উক্ত দুটো—খাবার ও নিরাপত্তার—নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাই বলেছেন, 'আল্লাহ্ একটি নগরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন, যা নিরাপত্তাপূর্ণ, নিশ্চিত ছিল, সেখানকার প্রয়োজনীয় রিযিক সর্বদিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আসত। পরে নগর (বাসী) আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের প্রতি কুফরী করে। তার ফলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষুধার ভয়ের পোশাক পরিয়ে দিলেন—যা তারা করত তার কুফল হিসেবে।

এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করছি ইসলামী বিধান তার অধীন বসবাসকারী প্রত্যেকটি—মুসলিম বা অমুসলিম—মানুষের জন্যে সমহারে ও মানে উপযোগী জীবিকার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, তাতে সে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান পাবে—যেমন পাবে চিকিৎসা ও শিক্ষা অতীব সহজ ও আয়াসহীনভাবে।

যাকাতের বিধান প্রণয়নে তা বেকার কার্যক্ষম লোকদের জন্যে কাজের ব্যবস্থা এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য দেয়ার ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে চেয়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এ প্রাচুর্যের ব্যবস্থা হবে তার জন্যে ও তার পরিবারের জন্যে—একটি মতে এক বছরকালের জন্যে আর অপর মতে

তার সমগ্র জীবনের জন্যে প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করাই লক্ষ্য। যার কাছে যথেষ্ট মাত্রার কম অংশ রয়েছে, তাকে তা পূর্ণ করে দেয়া হবে তার জীবিকার মান উন্নত করার লক্ষ্যে।

কালের ঘাত-প্রতিঘাত

কিন্তু দেখা গেছে, মানুষ প্রয়োজন পরিমাণ বরং বিপুল প্রশস্ততা সহকারে জীবিকা পাচ্ছে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কালের বিষদাঁত তাকে দংশন করে বসল। আকস্মিকভাবে তার ওপর আঘাতের ওপর আঘাত হানল। ধনী ছিল, হঠাৎ তাকে নিতান্ত নিঃস্ব দরিদ্র বানিয়ে ফেলল। সম্মানিতকে করে দিল লাঞ্ছিত অবমানিত—পরম শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তার পর চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দিল এবং চূর্ণ করে দিল তাকে এ আকস্মিক বিপদ ও দুঃখপূর্ণ ঘটনার আঘাত যা থেকে তার রক্ষা পাওয়ার বা তা প্রতিরোধ করার কোন উপায়ই থাকে না।

একজন ব্যবসায়ী মহাস্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করছিল, তার পণ্য বহনকারী নৌকা বা জাহাজ হঠাৎ নদী-সমুদ্রে নিমজ্জিত হল কিংবা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর তাতে নিয়োজিত ছিল তার সমস্ত মূলধন।

কৃষক, বাগান মালিক—আসমানী মুসীবতে তার ফসল বা গাছপালা সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দরুন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়ল, চাষীর সোনার ফসল খেয়ে ফেলল কীট-পতঙ্গ-পোকা। সে ফসল সে ঘরে আনতে পারল না—তুলা,গম, ধান যে ফসলই হোক অথবা চাষের গরু মরে গেল, সেই দুঃখে মালিকই মরণাপন্ন হয়ে পড়ল।

আকস্মিক দুর্ঘটনা উত্তরকালে বীমা ব্যবস্থার সূচনা করেছে

এ ধরনের বহু প্রকারের আকস্মিক দুর্ঘটনা—দুঃখজনক ঘটনাবলী দীর্ঘদিন ধরে বহু সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং সচ্ছলতার সোনালী পরিবেশে বসবাসকারী বহু মানুষকে চরম দারিদ্র্যের নিম্নতম পংকে ডুবিয়ে দিয়েছে। লোকেরা তাদের ব্যবসায় শিল্প-কারখানা ও মূলধনের ব্যাপারে—এবং তাদের অন্তর্ধানের পর তাদের বংশধরদের ব্যাপারে কোনরূপ নিরাপত্তার সন্ধান পাচ্ছিল না। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন তারা কালের আঘাত ও সময়ের ভ্রূকুটি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সন্ধানে আত্মনিমগ্ন হল। এর ফলেই বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব হল। বিগত শতাব্দীতেই পাশ্চাত্য এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তার রূপ ও সংগঠন বিভিন্ন, ক্ষেত্র নানাবিধ।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা

শতাব্দীকাল পূর্বে পশ্চিমা সমাজ যে বীমাব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছে তারও বহু পূর্বে ইসলামী সমাজব্যবস্থা একটা বিশেষ পন্থায় ব্যক্তিগণের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে। মুসলমানদের জন্য বায়তুলমালই ছিল এ ব্যবস্থা। তা একটা বিরাট সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কালের আঘাতে জর্জরিত প্রত্যেকটি ব্যক্তি এ ব্যবস্থার আশ্রয় পেতে পারে, তা হলে সে পাবে সাহায্য এবং আশ্রয়।

এরূপ বিপন্ন ব্যক্তিকে লোকদের অনুগ্রহের দানের ওপর নির্ভরশীল থাকার জন্যে ছেড়ে দেয়া হবে না। লোকদের পক্ষ থেকে দুটো কল্যাণ সে পেতে পারে—যদি সে তা নিষেধ না করে। তার ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করা হবে। কল্যাণমূলক ভাবধারা প্রবৃদ্ধি এবং লোকদের মধ্যে পারস্পরিক দয়ামূলক আচরণ। নবী করীম (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি তার ওপর আগত বিপদের অভিযোগ করল। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা সকলে লোকটাকে দান-সাদকা দাও। অতঃপর লোকেরা তাই করল।[১]

ঋণগ্রস্তদের অংশে আকস্মিক দুর্ঘটনার সাহায্য

ইসলাম বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নেক লোকদের স্বেচ্ছামূলক দানের ওপর নির্ভরশীল করে ছেড়ে দেয়নি। বায়তুলমালে তার জন্যে একটা অংশ রয়েছে—যাকাতের মালে তো বটেই। এজন্যে রাষ্ট্রপ্রধান বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে দাবি করা যাবে। তাতে কোন ভয় বা লজ্জার কারণ নেই। কেননা সে একজন মুসলিম নাগরিক—মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে সে তার অধিকার চেয়ে—আদায় করে নেবে।

পূর্বে উল্লিখিত কুবাইচাতা ইবনুল মাখারিক সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ ভিক্ষা চাওয়া তিনজন লোক ছাড়া আর কারোর জন্যে জায়েয নয়। তার মধ্যে রয়েছে সেই ব্যক্তি, যে আকস্মিকভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার যথাসর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার জন্যে ভিক্ষা চাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয—যেন সে বেঁচে ও সক্রিয় থাকার মত জীবিকা পায়।

'আল-গারেমীন'-এর ব্যাখ্যায়—যাকাত ব্যয়ের খাত সংক্রান্ত আয়াতে প্রাচীন কালের তাফসীরকারেরা বলেছেন ঃ যার ঘর পুড়ে গেছে, কিংবা বন্যায় ধন-মাল ভাসিয়ে নিয়েছে, ফলে সে পরিবারবর্গকে নিয়ে কঠিন বিপদে পড়েছে, সে লোকও এ পর্যায়ে গণ্য।[২]

আকস্মিক বিপদগ্রস্তকে কত দেয়া হবে

কুবাইচাতা সংক্রান্ত রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসে আমরা দেখেছি, তার হক্ চাওয়ার অধিকার আছে এবং সেজন্যে দায়ীত্বশীলদের কাছে সে চাইতে পারে—যেন জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাহায্য পেতে পারে। 'জীবনে বেঁচে থাকার পরিমাণ' বলতে বোঝায় প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক মান ও সমাজকেন্দ্রিক পরিবেশ উপযোগী পরিমাণ পাওয়া। অতএব যার ঘর পুড়ে গেছে তার জন্যে উপযুক্ত এবং তার ও তার পরিবারবর্গের সংকুলান হয় এমন প্রশস্ত একটা ঘর—তার অবস্থার সাথে সংগতিসম্পন্ন আসবাবপত্রসহ। যে ব্যবসায়ী ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিপদে পড়েছে, তার

---

১. পূর্বে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এক স্থানে। আহমাদ এটি উদ্ধৃত করেছেন, ৩য় খণ্ড, ৩৬পৃ. মুসলিম كتاب المسافاة। আবূ দাঊদ-নাসায়ী كتاب البيوع। তিরমিযী كتاب لزكاة ইবনে মাজাহ' الاحكام।

২. আলগারেমীন' যাকাত ব্যয়ের খাত সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন।

উপযোগী বেঁচে থাকা ব্যবস্থা হচ্ছে, তার ব্যবসায়ের চাকাটাকে আবার আবর্তিত করে দেয়া। পূর্বের ন্যায় প্রশস্ততা ও সম্পদশীলতা না হলেও কোন দোষ নেই। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সাথে সংগতিসম্পন্ন ব্যবস্থা পাবে।

কোন কোন ফিকাহবিদ মনে করেন, তাকে তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মত ব্যবস্থা করে দিতে হবে।[১] কিন্তু আমি মনে করি এ মত বা অন্য মত গ্রহণ করা নির্ভর করে যাকাত-ফাণ্ডের সামর্থ্যের ওপর। তা বেশী হলে একরূপ আর কম হলে অন্য রূপ, সেই সাথে অন্যান্য ব্যয়-খাতগুলোর চাহিদার তীব্রতা বা দুর্বলতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

চাষের জমির বিপদ

চাষের জমির যে সব মালিক কষ্ট করে—শ্রম করে চাষকার্য করে কোন বিপদে পড়েছে, তারা যাকাতের অংশ পেয়ে উপকৃত হওয়ায়—অন্যদের তুলনায় বেশী অধিকারী। তাদের প্রয়াজনও অনেক তীব্র। প্রাচীনকালে গ্রামবাসীরা এ সব অবস্থায় পারস্পরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা করে নিত। কারোর ওপর তেমন বিপদ এলে তারা পারস্পরিকভাবে সাহায্য সংগ্রহ ও একত্রিত করত। তারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুঃখ দূর করা ও পিঠ শক্ত করার উদ্দেশ্যে এ সাহায্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়ে দিত।

পরবর্তীকালে লোকদের মন থেকে কল্যাণমূলক ভাবধারা যখন কর্পূরের মত উবে যায় কিছু সংখ্যক বাদে—মিসকীন চাষী এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তার চাষের গরু মরে গেলে কপালে হাত চাপড়িয়ে দুঃখ করত, যেন সেটি তার পরিবারেরই একজন। তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা সেজন্যে কান্নাকাটি করত, যেন অতি প্রিয়জন মরে গেছে। মা কিংবা বাপ। লোকেরা জানতে পারত যে, অমুক ব্যক্তির কোমর ভেঙে গেছে। এমনিভাবে যার ফসল আসমানী বিপদে নষ্ট হয়ে যেত কিংবা তার চাইতেও কঠিন—আগুনে ঘরবাড়ি জ্বলে যেত, তার জীবিকা ও সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যেত। এ সব বিপদগ্রস্ত লোকই যাকাতের এ 'আল-গারেমুন' খাত থেকে এবং ফকীর-মিসকীনের জন্যে নির্দিষ্ট খাত থেকে সাহায্য লাভ করতে পারত, যেন লোকটি আকস্মিক বিপদের আঘাতে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে না যায়। তার হাত ধরে তুলে দেয়া হত যেন সে চলমান জীবনের কাফেলায় শরীক থেকে সক্ষমতায় চলতে পারে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, কেননা তা হলে সেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া লোকদের সঙ্গে থেকে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।

---

১. গাজালী একথা উল্লেখ করেছেন তাঁর احياء العلوم الدين গ্রন্থে। 'ফকীর ও মিসকীন' শীর্ষক যাকাত ব্যয় খাত পর্যায়ে আমরা একথা উদ্ধৃত করেছি।'

কুমারিত্বের সমস্যা

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই

ইসলাম মানব প্রকৃতিতে নিহিত যৌন প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতী নয়। তাহলে তা যথেচ্ছভাবে বিচরণ শুরু করে দেবে। কোন বাঁধন—কোন নিয়ন্ত্রণই তা মানবে না তখন। এ কারণে ইসলাম জ্বিনা-ব্যভিচারকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। যেসব কাজ বা অবস্থা মানুষকে সেদিকে অগ্রসর করে এবং তার মধ্যে নিক্ষেপ করে, সেগুলোকেও হারাম করা হয়েছে। কিন্তু তার সাথে চরম শত্রুতামূলক আচরণ গ্রহণ করা—তাকে সম্পূর্ণ দমন করতে চেষ্টা করা—সমূলে বিনষ্ট করার পন্থা অবলম্বন করাকেও ইসলাম আদৌ সমর্থন করেনি। এজন্যে ইসলাম বিয়ে করার পন্থা উদ্ঘাটন করেছে, সেজন্যে আহ্বান জানিয়েছে ও উৎসাহ দিয়েছে এবং স্ত্রী বা স্বামী বিবর্জিত জীবন যাপন ও 'খাসি' করে পৌরুষকে চিরতরে খতম করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ্‌র জন্যে একান্ত হয়ে যাওয়ার কিংবা ইবাদত, বৈরাগ্যবাদ এবং দুনিয়া ত্যাগ করার দোহাই দিয়ে অবিবাহিত হয়ে থাকা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

নবী করীম (স) তাঁর কোন কোন সাহাবীর মধ্যে এরূপ মনোভাব গ্রহণের ইচ্ছা বা সংকল্পের কথা জানতে পেরে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ 'এটা ইসলামের জীবন পদ্ধতি থেকে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি, নবী (স)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।' তিনি তাঁদের এও বললেন ঃ

> আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে বেশী জানা লোক এবং তোমাদের তুলনায় তাঁর কাছে বেশী ভীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করি—ঘুমাইও। আমি নফল রোযা রাখি আবার ভাংগিও। আমি বিয়ে এবং স্ত্রী সঙ্গমও করি। অতএব আমার এ সুন্নাত যে পরিহার করে চলবে, সে আমার মধ্যে গণ্য হবে না।[১]

হযরত সায়াদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স) উসমান ইবনে মজ্‌উনের (রা) স্ত্রীহীনতা ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে একনিষ্ঠতা গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলে আমরা সকলেই 'খাসি' হয়ে যেতাম'।[২] তিনি যুব সমাজকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে-ই যৌন মিলনে সক্ষম, তার বিয়ে করা কর্তব্য । কেননা তা দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌন শক্তিকে সংরক্ষিত করে।[৩]

---

১ ও ২ .বুখারীতে এসব হাদীস উদ্ধৃত। ৩. বুখারীতে এ সব হাদীস উদ্ধৃত

এ প্রেক্ষিতে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন ঃ বিয়ে করা মুসলিম মাত্রের জন্যেই ফরয। যতক্ষণ সে কাজে সক্ষম থাকবে, তা ত্যাগ করা তার পক্ষে হালাল নয়।

'রিযিক' বা জীবিকা কম বা সংকীর্ণ হয়ে পড়ার ভয়েও কোন মুসলিমের উচিত নয় বিয়ে থেকে বিরত থাকা। তার কাঁধে পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগানোর দায়িত্বের দুর্বহ বোঝা চাপবে, এ ভয়েও বিরত থাকা উচিত নয়। তার তো কর্তব্য মুকাবিলা করা। চেষ্টা করা, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সে সাহায্য পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করা যার ওয়াদা তিনি করেছেন বিবাহিত লোকদের দেবেন বলে এবং বিবাহ করার মাধ্যমে যারা নিজেদের নৈতিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা রক্ষা করতে চেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه -

এবং বিবাহ দাও তোমাদের বয়স্ক সন্তান ও নেককার দাসদের ও দাসীদেরকে—তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল বানিয়ে দেবেন।[১]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তিনজন লোকের সাহায্য করা আল্লাহ্র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় বিবাহিত, দাসমুক্তির চুক্তিকারী—যে তা আদায় করতে ইচ্ছুক—যে দাস একটা পরিমাণের মালের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায় এবং সে শর্তের চুক্তিপত্র করে আর আল্লাহ্র পথের যোদ্ধা।[২]

আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর সে সাহায্য—যার ওয়াদা তিনি করেছেন বিয়ে করে নিজেকে পবিত্র রাখতে ইচ্ছুক মুমিন ব্যক্তিকে তার মধ্যে এ ব্যাপারটিও গণ্য যে, মুসলিম সমাজ সরকার বা যাকাত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত হলে মোহরানা ও বিয়ের ব্যয় বহনে তার প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে। যেন সে দৃষ্টি নীচু রাখা ও যৌন-অংগের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যে ঘোষিত ইসলামের আহ্বানে পুরামাত্রায় সাড়া দিতে পারে; একটি মুসলিম পরিবার গঠন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যে স্পষ্ট উজ্জ্বল আয়াত সম্পর্কে অবহিত করেছেন তা অনুধাবন করা তার পক্ষে যেন সম্ভব হয়। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ -

আল্লাহ্র একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের

---

১. سورة النور - ٣٢

২. আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও হাকেম—আবু হুরায়রা থেকে সহীহ্ সনদে। যেমনঃ التيسير ج ١ص ٤٧٤-এ বলা হয়েছে।

জন্যে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তার কাছে শান্তি লাভ করা এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব দয়া-মায়া উদ্রেক করেছেন। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থায় বহু নিদর্শন নিহিত রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।[১]

উপরিউক্ত কথা আমি নিজ থেকে নতুন করে কিংবা নিজের মতে ইজতিহাদ করে বলিনি। আমার একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দ কয়েক যুগ ধরে বিয়েকেই 'পূর্ণ মাত্রার প্রাপ্তি' বা 'যথেষ্ট মাত্রা' নির্দিষ্ট করে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ গরীব ব্যক্তির যথেষ্ট মাত্রার প্রাপ্তি হচ্ছে এমন পরিমাণ পাওয়া যদ্দারা যে বিয়ে করতে পারবে—যদি তার স্ত্রী (বা স্বামী) না থাকে এবং বিয়ে করার প্রয়োজন বোধ করে। যাকাতের ব্যয়খাত পর্যায়ের আলোচনায় যথাস্থানে আমরা বিস্তারিত আলাচনা করেছি।[২]

১. سورة الروم – ٢١

২. দেখুন ঃ 'বিয়ে যথেষ্ট মাত্রার প্রাপ্তি' বিষয় ।

পালিয়ে যাওয়ার সমস্যা

কুরআন মজীদ নিঃস্ব পথিকের সমস্যাটির ওপর মক্কী ও মাদানী উভয় পর্যায়ের আয়াতসমূহে কত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, 'যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র' অধ্যায়ে আমরা তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। কুরআনের অধিকাংশ স্থানেই নিঃস্ব পথিকের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং তাকে তার অধিকার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে যাকাতের মালে তার জন্যে একটা অংশও নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এটা এজন্যে যে, ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্যে একটি বাসস্থান বা ঘর থাকা একান্তই প্রয়োজন বলে মনে করে, কেউ 'পথের সন্তান' হোক, তা তার কাম্য নয়, পসন্দও নয়। এ প্রেক্ষিতেই ইসলামী শরীয়াত প্রতিটি মানুষের জন্যে তার উপযোগী একটি ঘর থাকা সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক করেছে—যেখানে সে এবং তার পরিবারবর্গ আশ্রয় নেবে। এটাকে মৌল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকা ও স্থিতি গ্রহণের জন্যে এ ঘরের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

যতটুকু প্রাচুর্য বা 'যথেষ্ট মাত্রার সম্পদ' না থাকলে মানুষ ফকীর বা মিসকীন গণ্য হয়, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণে ইমাম নববী বলেছেন ঃ এ পর্যায়ে গণ্য হচ্ছে ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান—অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—কোন রূপ অপচয় বা কার্পণ্য করা ছাড়াই তার জন্যে শোভন হয় এমন। তা এক ব্যক্তির জন্যে এবং তার ব্যয় বহনের ওপর নির্ভরশীল যারা তাদের সকলের জন্যে।[১]

ইবনে হাজম মৌলিক দ্রব্যাদি—ইসলামী সমাজ বিধানে যা প্রতিটি মানুষের জন্য প্রচুর মাত্রার হওয়া আবশ্যক—বর্ণনায় বলেছেন ঃ

> প্রত্যেক দেশ (বা স্থানের) ধনী লোকদের কর্তব্য হচ্ছে সেখানকার গরীব লোকদের দায়িত্বশীল হয়ে দাঁড়ানো। রাষ্ট্র সরকার তাদের সেজন্যে বাধ্য করবে। যদি যাকাত ও ফাই সম্পদ দ্বারা সমস্ত মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ না হয়, তাহলে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য, শীত-গ্রীষ্ম উপযোগী পোশাক এবং সূর্যের তাপ, বৃষ্টি ও পথিকদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পওয়ার মত একটা ঘরের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।[২]

যাকাতের ব্যয়খাত পর্যায়ে 'ইবনুস্ সাবীল' আলোচনায় আমরা বলে এসেছি যে, একালের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ 'ইবনুস্ সাবীল' বলতে 'পথে হারানো অবস্থায় পাওয়া লোক' বোঝানো হয়েছে বলে মনে করেছেন। আমার মতে তা খুব বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। কেননা উক্ত রূপ ব্যক্তির জন্যে পথই হচ্ছে তার পরিজন, তার মা, তার বাপ। 'পথ হারিয়ে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া' মানুষ অন্য অন্য মানুষের কৃত অপরাধের ফলশ্রুতি। কিন্তু তারা সে অপরাধের বোঝা বহন করে না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

---

১. জীবন-উপযোগী মান দ্রষ্টব্য। ২. المحلى ج ٦ ص ١٥٦।

وَلَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّاعَلَيْهَا ج وَلَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَاُخْرٰى -

প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জন তারই জন্যে। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করে না।[১]

অতএব এ 'পথে পড়ে পাওয়া লোকদের' জন্যে যাকাত সম্পদের একটা অংশ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হবে। তাদের উত্তম প্রশিক্ষণে তা ব্যয় করা হবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপযোগী করে তাদের তৈরী করা হবে।

যারা 'ইবনুস-সাবীল'-এর মধ্যে এ 'পথে পড়ে পাওয়া লোকদের' গণ্য করেন না, তারা তাদেরকে নিশ্চয়ই 'ফকীর' 'মিসকীন'দের মধ্যে গণ্য করেন আর তাও যে যাকাত ব্যয়ের খাত তাতে কোন মতপার্থক্য নেই।

একটি জরুরী সতর্কবাণী

এ অধ্যায়ের উপসংহারে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া আবশ্যক বলে মনে হয় যে, যাকাত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধানের অংশ। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিধান দিয়েছেন দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েত দান এবং তাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। সমাজের সর্ব প্রকারের সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র যাকাত দ্বারাই করা যাবে বলে মনে করা ঠিক নয়। এ পর্যায়ে কিছু কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। বিশেষ করে যে সমাজের জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ থেকে ইসলাম এবং তার শরীয়াতকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যেখানকার আচার-আচরণ ও নীতি নির্ধারণ ইসলামী নৈতিকতাকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলা হয় না—ইসলামী রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয় না, তথায় একা যাকাত কি করতে পারে ?

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরস্পর অবিচ্ছিন্ন শরীয়াত। তার কিছু অংশ গ্রহণ এবং অপর কিছু অংশ বাদ দিয়ে চলা কোনক্রমেই সমীচীন হতে পারে না। ঠিক তেমনি জীবনের কোথাও ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান 'আমদানী' করাও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। ইসলামের কোন একটা অংশ—যেমন যাকাত—দিয়ে গায়র ইসলামী বিধানের সাথে জোড়াতালি দিলে যেমন অশোভন হবে, তেমনি হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এরূপ জোড়াতালি দেয়া নীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

ইয়াহুদীরা এ নীতি গ্রহণ করেছিল বলে আল্লাহ্ তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের প্রশ্ন করেছেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ -

তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর ?[২]

---

১. سورة الانعام - ١٦٤

২. البقره - ٨٥

রাসূলে করীম (স) এবং তার পর প্রত্যেক শাসককে যারাই মহান আল্লাহ্‌র বিধানের কিছু অংশ বাদ দিয়েছে—আল্লাহ্ তা'আলা সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَآءَ هُمْ وَاحْذَرْ هُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ -

আল্লাহ্‌র নাযিল-করা বিধান অনুযায়ী লোকদের ওপর প্রশাসন চালাও, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে—তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের কিছু অংশ থেকে তারা তোমাকে বিরত রাখতে পারে।[১]

আসলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হচ্ছে ইসলামকে গ্রহণ—পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তবায়ন।[২]

---

১. المائده - ٤٩

২. দেখুন মৎ প্রণীত গ্রন্থ ঃ مشكلة الفقر - فصل : شرط الابد منه

চতুর্থ অধ্যায়

ফিতরের যাকাত

- *তার অর্থ, তার বিধান, তার যৌক্তিকতা-বৈশিষ্ট্য।*
- *কার ওপর তা ওয়াজিব? কাদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব?*
- *দেয় পরিমাণ, কিসে তা ওয়াজিব হয়?*
- *ওয়াজিব হওয়ার সময় এবং দিয়ে দেয়ার সময়।*
- *ফিতরের যাকাত কার জন্যে ব্যয় করা হবে?*

এ অধ্যায়ের পাঁচটি পরিচ্ছেদ

প্রথম ঃ 'ফিতরের যাকাত-এর তাৎপর্য, তার বিধান বর্ণনা এবং তার বিধিবদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা।

দ্বিতীয় ঃ কার ওপর তা ওয়াজিব ? এবং কাদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব ?

তৃতীয় ঃ ওয়াজিবের পরিমাণ, কোন জিনিসে তা হবে ? মূল্য দিয়ে আদায় করার হুকুম কি ?

চতুর্থ ঃ ওয়াজিব হওয়ার সময়—দেয়ার সময়।

পঞ্চম ঃ ফিতরের যাকাত কার জন্যে ব্যয় করা হবে ?

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিতরের যাকাত-এর অর্থ, তার হুকুম ও যৌক্তিকতা

ফিতরের যাকাত-এর অর্থ

'যাকাতুল ফিতর'—'ফিতরের যাকাত' বলতে সেই যাকাত বোঝায়, যা রমযানের রোযা শেষ করার কারণে ধার্য হয়। তাকে 'সাদকায়ে ফিতর'-ও বলা হয়। আমরা বলেছি, الصدقة। শব্দটি শরীয়াতের ব্যবহারে 'ফরয যাকাত' বোঝায়। কুরআন ও সুন্নাতে এর বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। একে 'যাকাতুল ফিত্রাতও নাম দেয়া হয়েছে: তা যেন প্রকৃতি বা স্বভাবসম্মত—সৃষ্টিত্বের সাথে সম্পর্কিত। মানব প্রকৃতির ওপর তা ওয়াজিব করা হয়েছে আত্মার 'তাজকীয়া' এবং তার কার্যাবলী পরিচ্ছন্ন-নির্ভুল-নিষ্কলুষ করার লক্ষ্যে। এখানে উৎসকে 'ফিত্রাত' বলা হয়—অর্থাৎ 'জন্ম দানকারী'। তা আরবী নয়, বাইরে থেকে এসে আরবী হয়ে যাওয়া শব্দও নয়। এটা হচ্ছে ফিকাহবিদদের পরিভাষা।[১]

'সাদকায়ে ফিতর' হিজরতের দ্বিতীয় বছর ধার্য করা হয়েছে। আর এ বছরই ফরয হয়েছে রমযান মাসের রোখা।[২] 'ফিত্রা' ওয়াজিব হয়েছে রোযাদারের বেহুদা ও অশ্লীল

---

১. ইবনে আবেদীন তাঁর টীকায় বলেছেন ঃ النهر عن شرح الوقاية। গ্রন্থে বলা হয়েছে, الفطارة। শব্দটি ফিকাহবিদ প্রমুখের কালামে 'জন্ম স্থান' অর্থে ব্যবহৃত। কেউ কেউ এটিকে 'সাধারণের কথা' বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ 'ফিত্রাত' অর্থ সাদ্কা—অ আভিধানিক ব্যবহার। কেননা অভিধানে এইরূপ অর্থ লেখা হয়নি। 'আল-কামুস'-এ বলা হয়েছে, 'আলফিত্রাতু' অর্থ 'সাদাকাতুল ফিতর'—রোযা না রাখার সাদকা। আর একটি অর্থ ঃ 'সৃষ্টিতত্ব الخلقة। কোন কোন বিশেষজ্ঞ প্রথমটি অসহীহ্ বলে আপত্তি করেছেন। কেননা এর উৎস শরীয়াতদাতা ছাড়া কেউ জানে না। 'আল-কামুস'-এর ভ্রান্তির মধ্যে গণ্য—যা বেশীর ভাগই হয় শরীয়াতী তত্ত্বকে আভিধানিক তত্ত্বের সাথে সংমিশ্রিত করার কারণে। المغرب। গ্রন্থে লেখা হয়েছেঃ 'ফিত্রাত' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ইমাম শাফেয়ীর রচনায় আর তা অভিধানের দৃষ্টিতে সহীহ্, যদিও আমার কাছে রক্ষিত মৌল গ্রন্থাবলীতে তা পাওয়া যায়নি। নববী রচনায় বলা হয়েছে, 'ফিত্রাত' জন্ম স্থান বোঝায়, সম্ভবত তা সেই 'ফিত্রাত' থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'সৃষ্টি কার্য'। আবূ মুহাম্মাদ আল-আরহরী বলেছেন, তার অর্থ, 'যাকাতুল খিলকাত—'সৃষ্টির যাকাত' অন্য কথায় তা 'দেহের যাকাত'। المصباح। গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ আল ফিতরাত' অর্থ 'মূল'। ফিতরার যাকাত ওয়াজিব অর্থ দেহের যাকাত। 'দেহ' শব্দটি উহ্য করে "ফিতরাত' শব্দটিকে তদস্থানে বসানো হয়েছে। এতেই অর্থ বোঝা যায় বলে এরূপ ব্যবহার যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আল-কাহাস্তানীও এ কথা বলেছেন। এজন্যে কারো কারো কথা ঃ মাথার সাদকা, দেহের যাকাত। সারকথা, 'আল-ফিতরাতু' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিঃসন্দেহে 'সৃষ্টিতত্ব'। তা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার তার উৎস বোঝাবার জন্যে। কোন উহ্য না ধরে তা ব্যবহার করা হলে তা জন্মস্থানের শরীয়াতসম্মত পরিভাষা গণ্য হবে। আর উহ্য ধরা হলে তার আভিধানিক অর্থ গণ্য হবে। সম্ভবত المغرب। গ্রন্থকার এ কথাই বলতে চেয়েছেন। দেখুন ঃ رد المختار ج ٢ ص ٧٨

২. المرقاة ج ٤ ص ١٥٩

কথা-কাজ থেকে তাকে পবিত্রকরণের লক্ষ্যে। সেই সাথে মিসকীনদের জন্যেও খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, অভাবের লাঞ্ছনা থেকে—ঈদের দিনে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তাদের বাঁচানো এর সুফল।

এ যাকাতটি অন্য সব যাকাত থেকে স্বতন্ত্র এক প্রকারের কর। কেননা এটা ব্যক্তিদের ওপর ধার্য হয়। আর অন্যগুলো ধার্য হয় ধন-মালের ওপর। এ কারণে অপরাপর যাকাতে যা কিছু শর্ত, এখানে সেগুলো গণ্য করা হয়নি। নিসাব পরিমাণের মালিকানা থাকা শর্ত নয়—যার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। পরেও এর ওপর আলোকপাত করা হবে। ফিকাহবিদগণ এ যাকাতের নাম দিয়েছেন, 'মাথার যাকাত' 'ঘাড়ের যাকাত' 'শরীরের যাকাত' ইত্যাদি। আর শরীর বলতে ব্যক্তি বোঝায়—প্রাণ বা আত্মা নয়।

ফিতরের যাকাতও ওয়াজিব

বহু কয়জন হাদীস গ্রন্থ সংকলক আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (স) রমযানের ফিতরের যাকাত ধার্য করেছেন এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' গম প্রত্যেক স্বাধীন বা ক্রীতদাস ব্যক্তির ওপর—পুরুষ কিংবা মেয়েলোক—মুসলিমদের মধ্য থেকে।[১]

পূর্বের ও পরবর্তী জমহুর আলিমগণ বলেছেন ঃ হাদীসের শব্দ فرض অর্থ বাধ্যতামূলক করেছেন, ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অতএব ফিতরের যাকাত—তাঁদের মতে ওয়াজিব বা ফরয। কেননা তাও আল্লাহ্‌র সাধারণ অর্থবোধক আদেশ।وآتوا الزكاة। 'এবং যাকাত দাও'-এর আওতাভুক্ত। রাসূলে করীম (স) একে 'যাকাত' বলেছেন। কেননা তা আল্লাহ্‌র আদেশের আওতাভুক্ত। আর রাসূলে করীম (স)-এর কথা فرض -বেশীর ভাগ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

একটা তাগিদের দিক হল فرض অর্থ 'ওয়াজিব করেছেন'—বাধ্যতামূলক করেছেন। এ শব্দটির পরই على (ওপর) ব্যবহৃত হয়েছে। তাও 'ওয়াজিব'ই বোঝায়। কেননা হাদীসে প্রত্যেক স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর বলা হয়েছে। সহীহ বর্ণনাসমূহে তাই উদ্ধৃত হয়েছে امر। 'আদেশ করেছেন'; আর বাহ্যত امر। 'ওয়াজিব' বোঝায়।[২]

আবুল আলীয়া, আতা ও ইবনে সিরীন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ তা ফরয—যেমন বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।[৩] আর তাই মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদের মত।

---

১. منتقى الاخبار। গ্রন্থে উদ্ধৃত নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা উসমানীর ছাপা।

২. شرح النووى على مسلم ج ٧ ص ٥٨ এবং المحلى ج ٦ ص ١١٩।

৩. তা تعليق হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুলবারী ' গ্রন্থে বলেছেন ঃ আবদুর রাজ্জাক হাদীসটিকে ইবনে জুরাইজ থেকে—আতা থেকে—এ সূত্রে 'মুত্তাছিল'রূপে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আবূ শায়বা আছেমুল আহওয়াল থেকে—অন্যান্যদের থেকে—এ সূত্রে 'মুত্তাছিল'রূপে উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী শুধু এদের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। কেননা তারা ফিতরা ফরয বলেছেন নতুবা ইবনুল-মুনযির প্রমুখ বলেছেন যে, এর ওপর 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হানাফীদের মতে তা ওয়াজিব, ফরয নয়। এটা ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যকার পার্থক্যের নিয়মের ওপর ভিত্তিশীল। তাঁদের মতে ফরয হচ্ছে শুধু তা যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আর ওয়াজিব হচ্ছে তা, যা ظني অপ্রত্যয়মূলক দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এ পার্থক্যটার ফলশ্রুতি হচ্ছে, ফরয অমান্যকারী কাফির হবে; কিন্তু ওয়াজিব অমান্যকারী কাফির হবে না। এ কারণে তাঁরা ওয়াজিবকে বলেন, 'বাস্তব কর্মীয় ফরয' الفرض العملي। আর তার মুকাবিলায় রয়েছে 'আকীদাগতভাবে ফরয। কিন্তু অপর তিনজন ইমামের মতে ফরয এ থেকে ভিন্ন। তা দুভাগের সমন্বয় ঃ যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, আর যা ظني দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এ থেকে আমরা জানতে পারি ঃ হানাফীরা হুকুমের ক্ষেত্রে অপর তিনটি মাযহাবের বিরোধী নন।[১] আসলে এটা পরিভাষাগত মতপার্থক্য। আর পরিভাষায় কোন দোষ নিহিত নেই।

মালিকী মতে লোকেরা 'আশহুব' থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা সুন্নতে মুয়াক্কিদাহ।[২] আর জাহিরী মতের কারো কারো কথাও এই। শাফেয়ী মতের ইবনুল-লুবান এ মত দিয়েছেন। তারা فرض শব্দটির যা হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে-'নির্ধারণ করেছেন' এ অর্থ মনে করেছেন। পূর্বে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা তাদের জবাব।

ইবনে দকীকুল ঈদ বলেছেন ঃ অভিধানে فرض অর্থ قدر 'পরিমাণ ঠিক করা'। কিন্তু শরীয়াতী বচনে তার অর্থ 'ওয়াজিব' করা। অতএব এ অর্থে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন ঃ শরীয়াতদাতার কালামে ব্যবহৃত শব্দকে তার শরীয়াতী প্রকৃত তাৎপর্যে গ্রহণ করা একটা স্থির সিদ্ধান্ত—যতক্ষণ অন্য কোন অর্থ গ্রহণে বাধ্যকারী কিছু না আসে। আর শরীয়াতী তত্ত্ব নিছক একটা নির্ধারণই নয়—বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে ব্যবহৃত শব্দে। নবী করীম (স) ফিতরের যাকাত দেয়ার আদেশ امر। করেছেন। আর فرض শব্দের অর্থ امر। 'আদেশ করেছেন।'

তাকে যাকাত বলায় তার 'ওয়াজিব' (ফরয) হওয়াটারই সমর্থন মেলে। তাই তা সাধারণ যাকাতের অন্তর্ভুক্ত—যার আদেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলা এবং তা দিতে অস্বীকারকারীদের কঠিন আযাব দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

---

১. মুহাক্কিক ইবনুল হুম্মাম বলেছেন ঃ তাৎপর্যের দিক দিয়ে এ দুই অর্থের মাঝে কোন পার্থক্য নেই—মতবিরোধ নেই। কেননা তাঁরা যাকে ফরয বলেন তা এ রকম নয় যে, তা অস্বীকার করলে কাফির হতে হবে। তা ওয়াজিব অর্থে যাকে আমরা ওয়াজিব বলি। সারকথা হচ্ছে, তাঁদের পরিভাষায় যা ফরয, তা আমাদের বচনে ওয়াজিব। তার দুটি অংশের একটিতে আমরা প্রয়োগ করেছি। হানাফীরা ফিতরাকে ওয়াজিব বলেন—ফরয নয় এজন্যে যে, তার ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেই কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে সেসব হাদীস এ পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। তার তাৎপর্যও নয় অকাট্য। দেখুন ঃ المرقاة على المشكاة ج ٤ ص ١٦٠।

২. ইবনে হাজম 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড- ১১৮ পৃ.) মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ফিতরের যাকাত ফরয নয়। শায়খ শাকের তার ওপর টীকায় লিখেছেন যে, এটা ইবনে হাজমের বোঝার ভুল কিংবা যে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার ভুল। ইমাম মালিক الموطاء। গ্রন্থে বলেছেন ঃ যাকাত ওয়াজিব হয় মরুবাসীদের ওপর, যেমন ওয়াজিব হয় নগরবাসীদের ওপর। আর তা এজন্যে যে, 'রাসূলে করীম (স) রমযানের ফিতরা লোকদের ওপর ফরয করেছেন'।... ইবনে রুশদ তাঁর بداية المجتهد। গ্রন্থে (১ম খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠা) মালিকী মাযহাবের শেষে দিকের কোন কোন আলিম থেকে এ কথা উদ্ধৃত করেছেন—নির্দিষ্ট করেননি।

এ প্রেক্ষিতে ইমাম নববী ইবনুল লুবানের মত উদ্ধৃত করেছেন যে, তা সুন্নাত। পরে বলেছেন, এটা বিরল, অগ্রহণীয়। বরং সুস্পষ্ট গলদ।

ইসহাক ইবনে রাহ্আই বলেছেন, ফিতরের যাকাতকে ওয়াজিব মনে করা 'ইজমা' সমর্থিত। বরং ইবনুল মুন্যির বলেছেন ঃ তার ওয়াজিব হওয়ার ওপর 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইসহাকের এ কথাটি দুর্বোধ্য। কেননা তাতে ত্রুটিপূর্ণ অপর্যাপ্ত মতপার্থক্য রয়েছে যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। আরও এজন্যে যে, ইবরাহীম ইবনে উলিয়া ও আবূ বকর আল-আসম বলেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার দরুন তার ওয়াজিব হওয়াটা নাকচ হয়ে গেছে।

তাঁদের উভয়ের দলিল হচ্ছে কাইস ইবনে সায়াদ ইবনে উবাদা থেকে আহমাদ ও নাসায়ী উদ্ধৃত বর্ণনা তাঁকে সাদকায়ে ফিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছেন ঃ

> রাসূলে করীম (স) যাকাত সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে 'সাদকায়ে ফিতর দেয়ার জন্যে আদেশ করেছিলেন। পরে যখন যাকাতের আয়াত নাযিল হয়, অতঃপর তিনি আমাদের আদেশও করেন নি, নিষেধও করেন নি অথচ আমরা দিয়ে যাচ্ছিলাম।

এ বর্ণনার সনদে আপত্তি আছে। কেননা তার একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। হাফেজ ইবনে হাজার যেমন বলেছেন।[১] তা সহীহ্ হবে ধরে নিলে তাতে এমন দলিল নেই যা তার মনসূখ হওয়া প্রমাণ করতে পারে। কেননা রাসূলে করীম (স) প্রথমবার আদেশ দেয়াকে যথেষ্ট মনে করেছেন, আবার আদেশ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কেননা একটি ফরযের আদেশ নাযিল হলে অপর ফরযটি নাকচ হওয়া বাধ্যতামূলক করে না।[২] আল্লাহ্ ও রাসূলে (স)-এর আদেশের মৌল কথা হচ্ছে, তা সব সময় সুদৃঢ় ও স্থায়ী থাকে। আর শুধু সম্ভাব্যতার দ্বারা 'মনসূখ' হওয়া প্রমাণিত হয় না।

এ কারণে মুসলমানদের কাছে চূড়ান্তভাবে স্থিত যে, ফিতরের যাকাত ওয়াজিব। কেউ বিরূপ মত পোষণ করলে সেজন্যে কারোর কোন পরোয়া নেই। কেননা তা তার পূর্বে ও পরে অনুষ্ঠিত ইজমা'র বিরোধী।[৩]

---

১. সয়ূতী নাসায়ীর শরাহ গ্রন্থে এটারই অনুসরণ করেছেন। আর শাওকানী তাঁর 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড-১৮০ পৃ.) উসমানিয়া ছাপা) কিন্তু শায়খ আহমাদ শায়েক ইবনে হাজার তার মতের লোকদের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন —হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর যেমন নাসায়ী উদ্ধৃত করেছেন (৫ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.) দু'টি সনদ সূত্রে। সনদ দুটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'দুটি সহীহ সনদ; ফিকাহ বর্ণনাকারীরাই তা বর্ণনা করেছেন। তাতে অজ্ঞাত পরিচয় কেউ নেই আদৌ। (حاشية المحلى ج ٦ ص ١١٩)

২. فتح البارى ج ٤ ص ١١٠، ١١١ ط مصطفى الحلبى المحلى ج ٦ ص ١١٨، ١٩٩ المرقاة ج ٤ ص ١٥٩ - ١٦٠ ط العثمانه - نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٠ - شرح مسلم ج ٧ ص ٥٨ - الروضة للنووى ج ٢ ص ٢٩١ - الفتح الربانى وشرحه ج ٩ ص ٢٢٨ و ١٢٧ البحر الزخار ج ٢ ص ١٩٥

৩. দেখুন

প্রাচ্যবিদ শাখ্‌ত এ পর্যায়ে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তাতে বহু এলোমেলো কথা রয়েছে।[১]

ফিতরের যাকাত বিধিবদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা

এ যাকাত (ফিতরা) ওয়াজিব হওয়ার যৌক্তিকতা পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنَ -

রাসূলে করীম (স) ফিতরের যাকাত নির্ধারিত করেছেন রোযাদারকে বেহুদা অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে পবিত্র রাখা এবং মিসকীনদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থাস্বরূপ।[২]

---

১. শাখত ٣٦١ ص ١٠ ج دائرة المعارف الاسلامية বলেছেন, ফিতরার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, শেষ পর্যন্ত যে মতটি প্রাধান্য পেয়েছে তা ফিতরের যাকাতকে ওয়াজিব বলেছে। আর মালিকীদের মতে তা সুন্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

এ কথায় বহু ভুল রয়েছে। আমরা দেখেছি, ফিকাহবিদগণ ফিতরার ওয়াজিব হওয়ার মতে সকলেই ঐক্যবদ্ধ। ইবনুল মুনযির তাঁর ওপর ইজমা হওয়ার কথা বলেছেন। বিভিন্ন যুগে দুই জন বা তিনজন যদি ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন, তা হলে তাদের এ বিরূপ মত ধর্তব্য নয়। তবে মালিকীদের মতে তা ওয়াজিব ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে তাই বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

الشرح الكبير وحاشية الدسوقى - ج ١ص ٥٠٤

وبلغة السالك على الشرح الصغير ح ١ ص ٢٣٧

দ্রষ্টব্য 'আশহুব যা উল্লেখ করেছেন, তা এ মযাহাবে নির্ভরযোগ্য নয়। শাখত-এর দলিল الرسالة। গ্রন্থে উদ্ধৃত ইবনে আবূ জায়দের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছে। তাতে লেখা আছে ঃ 'ফিতরের যাকাত সুন্নাত, ওয়াজিব, রাসূলে করীম (স) তা ছোট বড় সকলের ওপর ফরয করেছেন। তিনি যদিও শুধু 'সুন্নাত' বলেই ক্ষান্ত হন নি। বরং বলেছেন, ওয়াজিব, রাসূলে করীম (স) তা নির্ধারিত করেছেন। এজন্যে ব্যাখ্যাকারীরা বলেছেন ঃ প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, তা সুন্নাত নির্ধারিত। দেখুন ঃ شرح الرسالة الزروق ج ١ ص ٣٤١ মালিক আল-মুয়াত্তা গ্রন্থে স্পষ্ট করে লিখেছেন, তা ওয়াজিব এবং হাদীসের দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত করেছেন—যেমন পূর্বে বলেছি। এ ক্ষণে প্রমাণিত হল যে, ফিতরার ওয়াজিব হওয়াটা কেবল 'রায়' দ্বারা ঠিক করা হয়নি—যেমন শাখত মনে করেছেন। বরং তা রাসূলে করীম (স)-এর সময় থেকেই সমাজে চালু হয়েছে।

২. হাদীসটি আবূ দাউদ কর্তৃক زكاة الفطر অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি মুনযেরী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তার হাদীসে বর্ণিত যৌক্তিকতা দুটি ব্যাপারের সমন্বয়। অর্থ, দুজনই হাদীসটিকে 'হাসান' মনে করেন—যেমন বলা হয়েছে। হাকেমও উদ্ধৃত করেছেন (১ম খণ্ড–৪০৯ পৃ.) এবং বলেছেন, হাদীসটি সহীহ বুখারীর শর্তে। যাহবী তা সমর্থন করেছেন। ইবনে মাজাহও উদ্ধৃত করেছেন 'যাকাতুল ফিতর' অধ্যায়ে। দারে কুতনী (২১৯ পৃ.) বলেছেন ঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ 'দোষী' বা 'আহত' নয়। বায়হাকী ১৬৩ পৃষ্ঠার। দেখুন ঃ মিরকাত–৪র্থ খণ্ড, ১৭৩ পৃ. نصب الراية ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃ.। আর হাদীসটির শেষ অংশ হচ্ছে ঃ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي

হাদীসে বর্ণিত যৌক্তিকতা দুটি ব্যাপারের সমন্বয়।

প্রথম ব্যাপার রমযান মাসের রোযাদারদের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের রোযা কোন বেহুদা কথা ও অশ্লীল কাজের দোষযুক্ত হয়ে যেতে পারে এ আংশকা আর পূর্ণাঙ্গ রোযা তো তাই যা মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পালন করে—যেমন রোযা থাকে পেট ও যৌন অঙ্গ। কাজেই রোযাদারকে তার মুখ, তার কান, তার চক্ষুদ্বয়, তার হাত কিংবা তার পা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নিষিদ্ধ কথা কাজ দ্বারা কলুষিত হলে তা ক্ষমা করা হবে না। আর রোযাদার সাধারণতই এ সব থেকে রক্ষা পেতে পারে না—বিজয়ী মানবীয় দুর্বলতার দরুন। এ কারণে রোযা শেষ হওয়ার পর এ যাকাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে—ঠিক 'গোসল' বা 'হাম্মামের' মত—মন দুষিত হলে তার ক্ষতি থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে অথবা রোযা দোষযুক্ত হলে তার ত্রুটির ক্ষতি পূরণের জন্যে এ ব্যবস্থা। 'কেননা ভাল ও উত্তম কার্যাবলী খারাপকে ধুয়ে মুছে দেয়'—এতো জানা কথা।

যেমন শরীয়াতের বিধানদাতা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সাথে নিয়মিত সুন্নাত নামায চালু করেছেন। কেননা ফরয নামাযে কোন ত্রুটি বা কোন কোন নিয়ম পালনে অসুবিধা হতে পারে। কোন কোন ইমাম এ ব্যবস্থাকে 'সহু সিজদা'র সাথে তুলনা করেছেন। অকী, ইবনুল জাররাহ বলেছেন, 'রমযান মাসের জন্যে ফিতরের যাকাত নামাযের 'সহু সিজদা'র সমতুল্য। তা রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতি পূরণ করে দেয়, যেমন সহু সিজদা নামাযের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে।'[১]

আর দ্বিতীয় ব্যাপার সমাজ-সমষ্টির সাথে সম্পৃক্ত, তার সর্বত্র—বিশেষ করে মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে ভালোবাসা, প্রীতি ও আনন্দ বিস্তৃত করা একটা বড় লক্ষ্য।

কেননা ঈদ তো সাধারণভাবে আনন্দ স্ফূর্তির দিন। কাজেই সে দিন সমাজের সমস্ত লোক যাতে করে এ আনন্দ স্ফূর্তিতে যোগদান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মিসকীনরা কখ্খনই আনন্দ লাভ করতে পারে না যদি কেবল ধনী সচ্ছল লোকেরাই চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় ভোগ করে, আর তারা এ মহা ঈদের দিনে খাবারও না পায়।

এ কারণে শরীয়াতের যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ এ দিনে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের অপরিহার্যতা মনে করেছে, যার ফলে অভাবগ্রস্তরা অভাব ও ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। সেই সাথে তার মনে এ চেতনাও জাগবে যে, সমাজ তাকে ভুলে যায়নি, তার

زكاة مقبولة 'যে তা নামাযের পূর্বে আদায় করবে, তার যাকাত গৃহীত, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات আর যে তা নামাযের পরে দেবে, তা একটি সাধারণ দান হবে। হাদীসের اللغو। শব্দটি অর্থহীন—ফায়দাহীন কাজ বোঝায়—যার কোন তাৎপর্য থাকে না অথবা 'বাতিল'ও হতে পারে। আর الرفث। মূলত যৌন মিলন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কাজ বোঝায়। পরে তা সকল অশ্লীল বীভৎস কাজ বোঝাচ্ছে সাধারণ অর্থে।

১. نهاية المحتاج ج ٢ ص ١٠٨

প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি। বিশেষ করে এ জাতীয় আনন্দ ও উৎসবের দিনে। এ কারণে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اغْنُوهُمْ فِىْ هذَا الْيَوم -

তোমরা এ দিনে তাদের সচ্ছল করে দাও।[১]

শরীয়াতের বিধানদাতার সম্মুখে ওয়াজিব পরিমাণটা হ্রাস করাও লক্ষ্য হিসেবে ছিল—যেমন পরে বলা হবে এবং লোকদের নিজেদের খাদ্য থেকে যাতে সহজেই দিয়ে দিতে পারে তার ব্যবস্থা করাও বাঞ্ছনীয় ছিল যেন সম্ভাব্যভাবে জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ মহাউৎসবে যোগদান করতে পারে। এ মহান উপলক্ষেই শরীয়াতে তাৎক্ষণিক অবদান হিসেবে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

১. 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ শাদীসটি বায়হাকী ও দারেকুতনী কর্তৃক ইবনে উমর থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَاف هذَا الْيَوْمَ এ দিনে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ানো থেকে তাদের বাঁচাও। ইবনে সায়াদ 'তাবাকাত' গ্রন্থে আয়েশা ও আবূ সায়ীদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন ৪র্থ খণ্ড, ১৮৬ পৃ. ط العثمانيه দেখুন ঃ نصب الراية ج ٢ ص ٤٣٢ وحاشيج المحلى ج ٦ ص ١٢.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব এবং কাদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব

ফিতরের যাকাত কার ওপর ওয়াজিব

উপরে বহু কয়জন হাদীস গ্রন্থকার উদ্ধৃত ও হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটির ভাষা হচ্ছে ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ...عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْعَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

রাসূলে করীম (স) রমযানের ফিতরের যাকাত ধার্য করেছেন প্রত্যেক স্বাধীন মুক্ত ও ক্রীতদাস—পুরুষ বা স্ত্রী মুসলমানের ওপর।

বুখারী তারই থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ

রাসূলে করীম (স) ফিতরের যাকাত বাবদ এক ছা' খেজুর বা এক ছা' গম ধার্য করেছেন দাস, মুক্ত স্বাধীন পুরুষ-স্ত্রী এবং ছোট ও বয়স্ক মুসলমানদের ওপর।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ফিত্‌রের যাকাত পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক মুক্ত ও দাস পুরুষ ও নারী, ছোট ও বয়স্ক, ধনী ও গরীবের ওপর।[১]

এ আবূ হুরায়রা (রা)-এর কালাম। কিন্তু এরূপ কথা কেউ নিজের ইচ্ছামত বলতে পারে না। তাই তা অবশ্যই রাসূলে করীম (স)-এর কাছ থেকে শোনা কথা হবে।

এ সব হাদীস প্রমাণ করেছে যে, এ যাকাতটা মুসলমানদের ব্যক্তি ও মাথাপিছু সাধারণভাবে ফরয ধার্য করা। স্বাধীন, মুক্ত ও ক্রীতদাস বা পুরুষ-স্ত্রী কিংবা ছোট ও বয়স্ক, ধনী ও গরীব এবং সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত ও মরুবাসী—এদের মধ্যে এদিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। জুহরী, রাবীয়াতা ও লাইস বলেছেন ঃ ফিত্‌রের যাকাত কেবল সভ্যতালোকিত নগরবাসীর ওপর বিশেষভাবে ধার্যকৃত, মরুবাসীদের ওপর তা ওয়াজিব নয়। আর উপরিউদ্ধৃত হাদীসসমূহ বাহ্যত এ কথার প্রতিবাদ করে। অতএব সঠিক ও যথার্থ কথা তাই যা জমহুর ফিকাহবিদগণ বলেছেন।[২]

---

১. হাদীসটি আহ্‌মাদ 'বুখারী' মুসলিম ও নাসায়ী উদ্ধৃত করেছেন। তা কিতাবুয্ যাকাতের ১৮৬ নম্বর হাদীস—ফত্‌হুর রাব্বানী ৯ম খণ্ড. ১৩৯ পৃ.।

২. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨١

ইবনে হাজম এ কথাটি আতা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এই বলে তার প্রতিবাদ করেছেন যে, রাসূলে করীম (স) এ ব্যাপারে বদ্দু ও এ রাবীকে অন্য থেকে আলাদা করেন নি—(বিশেষভাবে কারোর ওপর নয়, সব মুসলিমের ওপরই তা ধার্য হয়েছে) অতএব এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্য থেকে কাউকে আলাদা করা—এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া জায়েয নয়।[১]

স্ত্রী ও শিশুর ওপরও কি ওয়াজিব

হাদীসের 'পুরুষ বা স্ত্রী' কথাটি আবূ হানীফার মাযহাব সমর্থন করে অর্থাৎ তা নারীর ওপরও ওয়াজিব—তার স্বামী থাক আর না থাক। স্ত্রীর ওপর নিজস্বভাবেই তা ওয়াজিব এবং তার নিজের মাল থেকে আদায় করা কর্তব্য। জাহিরী ফিকাহর মাযাহাব এই।[২]

অন্য তিনজন ইমাম এবং লাইস ও ইসহাকের মতে স্বামীরই কর্তব্য তার স্ত্রীর ফিত্রের যাকাত আদায় করে দেয়া। কেননা তার যাবতীয় ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হয় এবং এটিও তার মধ্যে গণ্য। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, এ কথাটিতে আপত্তি আছে। কেননা তারা বলেছেন ঃ 'স্বামী যদি দরিদ্র হয় এবং স্ত্রী হয় ক্রীতদাসী, তা হলে তার ফিত্রা আদায় করা মনিবের কর্তব্য হবে। সাধারণ ব্যয়ভারের কথা স্বতন্ত্র। তাহলে দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তাঁরা সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলিম ব্যক্তি তার কাফির স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিত্রা দেবে না অথচ তার সাধারণ ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে। শাফেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-বাকের সূত্রে বর্ণিত 'মুরসাল' হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তা হচ্ছে ঃ 'তোমরা সাদকায়ে ফিতর সেই সকলের পক্ষ থেকে দাও, যাদের যাবতীয় খরচ তোমরা বহন কর।'[৩]

কিন্তু এ ধরনের বর্ণনা 'যয়ীফ' বলে তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, অথচ শাফেয়ী এবং তার সমমতের ফিকাহবিদগণ ব্যক্তির কর্মচারী এবং তার কাফির দাসের পক্ষ থেকেও ফিত্রা দেয়া বাধ্যতামূলক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইবনুত্তার

---

১. المحلی ج ٦ ص ١٣١

২. الفتح الرباني وشرحه ج ٩ ص ١٤٠। কিতাবুয যাকাতের ১৮৭ নম্বরের হাদীস।

৩. বায়হাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এ সূত্রেই—৯ম খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠার সনদে 'আলী'কে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি منقطع ইবনে হাজম বলেছেন, এখানে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার রয়েছে। আর তা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী হাদীসটিকে مرسل বলেন নি। পরে এখানে বলতে শুরু করেছে যে, তা 'মুরসাল'—ইবনে আবূ ইয়াহইয়ার বর্ণনা থেকে। المحلی ج ٦ ص ١٣٨। বায়হাকী ইবনে উমরের হাদীস হিসেবে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ ممن تمونون এর সনদ অশক্তিশালী, যেমন বলেছেন (৪র্থ খণ্ড ১৬১ পৃ)। দারে কুতনীও বর্ণনা করেছেন। نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨١ বায়হাকী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ননা উদ্ধৃত করেছেন ঃ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ فَاَطْعِمْ عَنْهُ – যার ওপর তোমার ব্যয়ভার বহন চালু হয়েছে, তার পক্ষ থেকে খাইয়ে দাও। এর বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা অশক্তিশালী—যেমন বায়হাকী বলেছেন। কিন্তু তার পূর্ববর্তী বর্ণনার সাহায্যে তা শক্তিশালী হয়ে যায়। البحر الزخار। গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এটা توقيف (২য় খণ্ড ১৯৯ পৃ.) দেখুন ঃ نصب الراية ج ٢ ص ٤١٢ ঃ

কুমানীও এ কথা বলেছেন।[১] কেননা মালিক তো দুই জনেরই যাবতীয় খরচ বহন করে থাকে।

অনুরূপভাবে ইমামীয়া বলেছেন, ফিতরের যাকাত নিজের এবং যার যার খরচ বহন করা হয় তাদের সকলের পক্ষ থেকে দিতে হবে।[২]

লাইস বলেছেন, যে কর্মচারীর মজুরী সুনির্দিষ্ট নয় সে কর্মচারীর পক্ষ থেকে মালিক ফিত্‌রা দেবে। আর তার মজুরী সুনির্দিষ্ট হলে তার ফিত্‌রা তার আদায় করা জরুরী নয়।[৩]

আর জায়দীয়া মতের লোকেরা শুধু যার খরচ বহন করা হয় নিকটাত্মীয় বা স্ত্রী অথবা দাস হওয়ার কারণে, কেবল তার ফিত্‌রা দেয়া কর্তব্য বলে শেষ করেছেন।[৪]

আর 'ছোট বা বয়স্ক' কথাটি প্রমাণ করে যে, ছোট বয়সের নাবালেগ কোন শিশুও যদি ধন-মালের মালিক হয়, তা হলে তার ওপরও তা ওয়াজিব। তার অভিভাবকই তার পক্ষ থেকে তা দিয়ে দেবে। আর তার ধন-মাল না থাকলে তার ফিত্‌রাটা দেয়া ওয়াজিব হবে যে তার খরচাদি বহন করে তার ওপর। এটা জমহুরের মাযহাব।

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন ঃ তা দেয়া ওয়াজিব শুধু তার পিতার ওপর, তার বাপ না থাকলে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়।[৫]

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও হাসান বসরীর মত হচ্ছে ঃ ফিতরের যাকাত ওয়াজিব শুধু তার ওপর যে রোযা থাকে। কেননা রোযাকে পবিত্রকরণের লক্ষ্যেই তা ওয়াজিব করা হয়েছে। আর অল্প বয়স্ক নাবালেগ এ পবিত্র করণের মুখাপেক্ষী নয়। কেননা তার কোন গুনাহ্ হয় না।

তার দলিল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স) ফিতরের যাকাত ধার্য করেছেন রোযাদারকে বেহুদা ও লজ্জাকর কাজকর্ম থেকে পবিত্রকরণের লক্ষ্যে।'

এর জবাবে বলা হয়েছে, হাদীসে 'পবিত্রকরণ' কথাটি সাধারণভাবে ও বেশী ভাল লোকের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে।[৬] যেমন কোন হাদীসে ফিত্‌রা ওয়াজিব করার ভিন্নতর হেকমতের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ 'মিসকীনদের খাবারের ব্যবস্থাস্বরূপ'। আর যেমন অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'এ দিনে তাদের সচ্ছল বানিয়ে দাও।'

---

১. الجوهر النقى مع السنن الكبرى ج ٤ ص ١٦٠.

২. فقه الامام جعفر ج ٢ ص ١٠٣ - ١٠٤

৩. المحلى ج ٦ص ١٢٧

৪. البحر ج ٢ ص ١٩٩

৫. المحلى ج ٦ ص ١٢٧ - نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٠ - ١٨١
দেখুন ঃ البحر الذخار ج ٢ ص ١٣:,

৬. পূর্বোল্লিখিত উৎসসমূহ

এ ফিত্‌রা যখন এক হিসেবে পবিত্রকরণের লক্ষ্যে ধার্যকৃত, তখন অন্য হিসেবে তা গরীবদের খাদ্য ও তাদের সচ্ছল বানানোর পন্থা। আর এ লক্ষ্যটা অল্প বয়স্কের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি প্রযোজ্য—যেমন বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গর্ভস্থ সন্তানের ফিত্‌রাও কি ওয়াজিব

জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মতে গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব নয়।

ইবনে হাজম বলেছেন, গর্ভস্থ সন্তান যদি তার মায়ের গর্ভে একশ বিশ দিন—চার মাস কাল—পূর্ণাঙ্গ লাভ করে থাকে ফিতরের রাতের ফজর হওয়ার পূর্বে, তা হলে তার পক্ষ থেকেও সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, এ সময়ে ভ্রূণের দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়ে থাকে।

ইবনে হাজম দলিলস্বরূপ উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (স) ছোট বয়সের ও বড় বয়সের সকলের ওপরই সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন। আর গর্ভস্থ সন্তানকে 'ছোট বয়সের' বলা চলে। আর 'ছোট বয়স'-এর শিশুর ওপর যে হুকুম প্রযোজ্য তার ওপরও তাই প্রযোজ্য।

হযরত উসমান ইবনে আফফাত থেকে ইবনে হাজম বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি ছোট বড় ও গর্ভস্থ (সন্তানের) সন্তানেরও সাদকায়ে ফিতর আদায় করতেন।

আবূ কালাবা থেকে বর্ণিত, তিনি ছোট ও বড় এমনকি মায়ের গর্ভে অবস্থিত সন্তানের পক্ষ থেকেও সাদকায়ে ফিতর দেয়া খুব পসন্দ করতেন। ইবনে হাজম বলেছেন, আবূ কালাবা সাহাবাদের দেখতে পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গও পেয়েছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন (তাবেয়ী)। সুলায়মান ইবনে ইয়াসারকে গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—তারও ফিত্‌রা দেয়া হবে কি? বললেন: হ্যাঁ। বলেছেন, এ ব্যাপারে সাহাবীদের কেউ হযরত উসমানের বিরোধিতা করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়নি।[১]

সত্যি কথা হচ্ছে, ইবনে হাজম যা-ই বলুন, গর্ভস্থ সন্তানের ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণকারী কোন দলিল নেই। আর হাদীসের শব্দ 'ছোট' বলতে গর্ভস্থ সন্তানও বোঝায়—এ বলা খুব গোঁড়ামি ও জোরপূর্বক বলা ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত ওসমান ও অন্যদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাতেও বড় জোর 'মুস্তাহাব' প্রমাণিত হতে পারে মাত্র। আর নফল ইবাদতের কোন সীমা শেষ নেই, যেই তা করবে সেই বিপুল সওয়াব পাবে, সন্দেহ নেই।

ইমাম শাওকানী উল্লেখ করেছেন, ইবনুল মুনযির গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব নয় বলে 'ইজমা' হওয়ার কথা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমাদ তাকে মুস্তাহাব মনে করতেন। ওয়াজিব নয়।[২]

---

١ المحلى ج ٦ ص ١٣٢ ٢. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨١

সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য 'নিসাব' কি শর্ত

ইবনে উমর বর্ণিত উপরিউদ্ধৃত হাদীসে 'মুক্ত ও গোলাম' কথাটি ধনী ও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় এমন ফকীরকেও শামিল করে। আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, 'ধনী ও গরীব' উভয়ের ওপর ওয়াজিব। জমহুর এবং তিনজন ইমাম এ মত দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে শুধু ইসলামের বিশ্বাসী এবং ফিত্‌রা পরিমাণটা, তার সেই দিনের খোরাকের অতিরিক্ত হওয়ার শর্ত করেছেন মাত্র। এ খোরাকে তার নিজের এবং যে সব লোকের খোরাকী দেয়া তার দায়িত্ব তাদের খোরাকও শামিল করতে হবে। আর সে দিন অর্থ রাতসহ দিন। আর অতিরিক্ত হওয়ার শর্ত হচ্ছে তার বাসস্থান, ঘরের জিনিসপত্র ও মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অতিরিক্ত।

শাওকানী বলেছেন ঃ এটাই ঠিক। কেননা এ পর্যায়ের দলিলসমূহ নিঃশর্ত। গরীব ধনীর কোন বিশেষত্ব নেই। যে পরিমাণের মালিক হলে ফিত্‌রা দিতে হবে তা নির্ধারণে ইজতিহাদ করার কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে যে 'কারণে' ফিত্‌রা বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা গরীব ধনী সকলের মধ্যেই বর্তমান থাকে। আর তা হচ্ছে বেহুদা ও অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে পবিত্রকরণ। আর এক দিন ও রাত্রির খাবারে মালিক হওয়াটা তো জরুরী শর্ত। কেননা ঈদের দিনে যারা গরীব তাদের সচ্ছল বানানোই হল ফিত্‌রা বিধান করার লক্ষ্য। এখন সেদিনের খোরাক থাকার শর্ত না পাওয়া গেলে সে তো বরং সে লোকদের মধ্যে গণ্য হবে যাদের সেদিন সচ্ছল বানানোর জন্যে আদেশ করা হয়েছে। এ আদেশ যাদের প্রতি করা হয়েছে তাদের মধ্যে সে গণ্য বা শামিল হবে না।[১]

আবূ হানীফা ও তাঁর মাযহাবের লোকেরা উপরিউক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব শুধু তার ওপর, যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। তাঁদের দলিল বুখারী[২] ও নাসায়ী বর্ণিত হাদীসে ঃ 'যাকাত শুধু ধনীদের দেয়—ধনের প্রকাশ।' আর 'ধনী' সে যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। যে ফকীর তার কোন ধন নেই। অতএব তার ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয। যেমন যার যাকাত দেয়ার সমর্থ্য নেই, তার ওপর তা দেয়া ফরয নয়। তাঁরা মালের যাকাত ফরয হওয়ার ওপর কিয়াস করেছেন।

অন্যান্যরা এর জবাবে বলেছেন—যেমন শাওকানী উল্লেখ করেছেন, তাঁরা যে হাদীসের উল্লেখ করেছেন তা দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, আসলে আবূ দাউদ[৩] এ হাদীসটি এ ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

১ نيل الوطار ج ٤ ص ١٨٦

২. বুখারী তাঁর গ্রন্থের كتاب الوصايا তে معلق হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। আর তার تعليقاتসহীহ ধরে নিতে হবে, জমহুরের তাই মত। ইবনে হাজম এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

৩. শাওকানী কেবল আবূ দাউদের নাম করেই ক্ষান্ত রয়েছেন অথচ বুখারী كتاب النفقات -এ নাসায়ী

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى -

যা ধনের বাহ্যিক দিক থেকে দেয়া হয় তাই উত্তম যাকাত।

এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। সে হাদীসটি আবূ দাউদ ও হাকেম কর্তৃক মরফু—রাসূলের কথা হিসেবে উদ্ধৃত। তা হচ্ছে ঃ افضل الصدقة جهد المقل

আর তাবারানী কর্তৃক আবূ ইমামা থেকে বর্ণিত মরফূ হাদীস হচ্ছে ঃ

افضل الصدقة سرالى فقير وجهد من مقل -

'নিহায়া' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমন পরিমাণ যা স্বল্প মালের অবস্থা ধারণ করে।

এবং আবূ হুরায়রার হাদীস নাসায়ী, ইবনে খুজায়মা ও ইবনে হাব্বানের গ্রন্থে উদ্ধৃত। শব্দ ইবনে হাব্বানের গ্রন্থে ব্যবহৃত। হাকেম হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

একটি দিরহাম এক লক্ষ দিরহামকে ছাড়িয়ে গেছে। এক ব্যক্তি বলল ঃ তা কি করে হল হে রাসূল ? তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তির বিপুল ধনসম্পদ ছিল। সে তার মাল সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করেছিল। আর এক ব্যক্তির ছিল মাত্র দুটি দিরহাম। সে তার একটি নিয়ে দান করে দিল। এ লোকটি তার মোট সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দিল.....

তবে মালের যাকাতের ওপর কিয়াস করে যে দলিল দেয়া হয়েছে, তা সহীহ্ নয়—যেমন শাওকানী বলেছেন। কেননা এটা অসম কিয়াস। কিয়াসের জন্যে যে ভিত্তির সাদৃশ্যের প্রয়োজন, তা এখানে নেই। যেহেতু ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়াটা দেহ সংশ্লিষ্ট, আর অন্যান্য যাকাত ওয়াজিব হওয়াটা ধনমালের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।[১]

এ ছাড়া অন্যরা যে বলেছেন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকানা হলেই ধনী গণ্য হয় আর ফকীরের ধনসম্পদ নেই, অতএব তার ওপর ফিত্‌রাও ওয়াজিব নয়—এ মতটির প্রতিবাদে সেসব সহীহ্ হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যের কথা বলা হয়েছে, যা ধনী-গরীব সব মুসলমানের ওপর ফিতর ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর হাদীসে 'ধনী' বা 'গরীব' শব্দদ্বয় দ্বারা এ কথা স্পষ্ট করে তুলেছেন। আহমাদ ও আবূ দাউদ সালাবাতা ইবনে আবূ সগীর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা ফিতরের সাদকা বাবদ দাও এক ছা'

كتاب الزكاة এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২য় খন্ড, ৩৪৫—৩৭৮ পৃ.) ও মুসলিম যাকাত অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম-এর ভাষা এই ঃ افضل الصدقة - اوخير الصدقة - عن ظهر غنى

১. দেখুন ঃ نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٥ - ١٨٦

গম (মূল শব্দ قمح বা بر অর্থ একই) ছোট বা বড়, মুক্ত বা গোলাম, ধনী বা গরীব, পুরুষ বা স্ত্রী—প্রতিটি মানুষের পক্ষ থেকে। তারপর তোমাদের ধনী লোকেরা তো যাকাতও দেবে। আর গরীব লোকেরা যা দেবে তার চাইতে অনেক বেশী আল্লাহ্ তাদের ফিরিয়ে দেবেন। আবূ দাউদের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ প্রত্যেক দুজনের পক্ষ থেকে ছা' গম দাও।

ইবনে কুদামাহ যেমন বলেছেন, এ সাদকাটা মালের হক কিন্তু মাল বেশী হলেই তার পরিমাণ বেশী হয় না। অতএব তাতে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া শর্ত হতে পারে না—যেমন কাফফারার ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়। তার থেকে নিতেও কোন বাধা নেই, দিতেও বাধা নেই। যেমন যার কৃষি ফসলে ওশর ওয়াজিব—পরে সে তার ও তার পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। (তাই সে যেমন দেবে, তেমনি পাবেও অন্য কথায়, তার কাছে থেকে যেমন নেয়া হবে, তেমনি তাকে দেয়াও হবে।'—অনুবাদক)

আর 'ধরনের প্রকাশ থেকেই যাকাত দিতে হয়' হাদীসটি মালের সাদকা—মালের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এ ফিতরের যাকাতটি বিশেষভাবে দেহ ও মনের তরফ থেকে দিতে হয়।[১]

আমি মনে করি, ফিতরের যাকাত প্রত্যেক ধনী-গরীব মুসলিমের ওপর ধার্য করার মূলে শরীয়াতের বিধানদাতার একটা নৈতিক প্রশিক্ষণমূলক লক্ষ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে, মুসলমানকে সচ্ছলতার অবস্থার মত দারিদ্র্যাবস্থাতেও আল্লাহ্র জন্যে অর্থ ব্যয়ে অভ্যস্ত করে তোলা। তাতে দারিদ্র্যের কঠিন অবস্থায়ও ত্যাগ স্বীকারের অভ্যাস হবে সচ্ছল অবস্থার মতই। আর কুরআন মজীদ মুত্তাকী লোকদের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছে ঃ

يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -

তারা অর্থব্যয় করে সচ্ছল অবস্থায় এবং কষ্ট-দারিদ্র্যের অবস্থায়।[২]

এ থেকে মুসলিমরা এ শিক্ষা লাভ করে যে, সে ধন-দৌলতের দিক দিয়ে দরিদ্র এবং চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হলেও তার হাতটাও 'উঁচু হাত' হতে পারে এবং সেও অন্যকে দান করা—অন্যের জন্যে ব্যয় করার স্বাধ আস্বাদন করতে পারে—যদিও তা বছরের মাত্র একবার, একটি দিনের জন্যে। এ কারণে জমহুর ফিকাহবিদগণ এ সাদকা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়ার শর্ত না করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর নিজের মাল থাকলে তা থেকে এ সাদকা দেয়া ওয়াজিব—আবূ হানীফা প্রমুখের এ মতটিকেও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কেননা তার ফলে একজন মুসলিম মহিলা তার সমান কর্তব্যের অনুভূতি লাভ করতে পারবে। তাকে তার নিজের

---

১. দেখুন ঃ المغنى ج ٣ ص ٧٤

২. ال عمران - ١٣٤

মাল থেকে ব্যয় করতে অভ্যস্ত করাও হবে, কেবল স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকেও—অন্তত এ ক্ষেত্রে তাকে বাঁচানো যাবে। তা সত্ত্বেও স্বামী যদি সদিচ্ছা পরবশ হয়ে স্ত্রীরটাও দিয়ে দেয় তাহলে তা অবশ্যই আদায় হবে।

দরিদ্রের ওপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

দরিদ্র বা ফকীর ব্যক্তির ওপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ এ শর্ত আরোপ করেছেন যে; এ ফিত্‌রার পরিমাণটা তার ও তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের ঈদের দিন ও রাত্রির প্রয়োজনীয় খাবারের অতিরিক্ত হতে হবে। তার বাসস্থান, দ্রব্যসামগ্রী ও তার মৌলিক প্রয়োজনেরও বাড়তি হতে হবে। তাই যার একটা ঘর আছে, যা তার নিজের বসবাসের জন্যে দরকার অথবা তার নিজের ব্যয় পূরণের জন্যে তার ভাড়াটা তার প্রয়োজন অথবা একটা কাপড় যা তার নিজের বা তার ওপর নির্ভরশীলদের জন্যে আবশ্যক কিংবা কোন জন্তু যা তার চলাচল ও তার মৌল প্রয়োজন পুরণে তার নিজের দরকার অথবা গৃহপালিত গবাদিপশু যার প্রবৃদ্ধি তার প্রয়োজন অথবা এমন পণ্য যা থেকে ফিত্‌রা দিলে তার মুনাফাটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এরূপ ফকিরের ওপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার যা আছ তা সবই তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে জরুরী। অতএব তা বিক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, তার নিজের বন্দোবস্তের মতই। আর যার অনেক বইপত্র রয়েছে যা পড়া তার দরকার বা তা থেকে কিছু মুখস্থ করা তার প্রয়োজন, ফিত্‌রা দেয়ার জন্যে তাকে তা বিক্রয় করতে বলা যাবে না। এ ছাড়া তার মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকবে, যা বিক্রয় করে ফিত্‌রা দেয়ার জন্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে, তা দিয়ে ফিতরা দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা তার আসল প্রয়োজন পূরণকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না করেই তা দেয়া সম্ভব। এটা ঠিক সে রকম যে, কারো কাছে তার নিজের খাদ্যের অতিরিক্ত থাকলে সে তা দেবে।[১]

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ফিত্‌রা দেয়ার প্রতিবন্ধক নয়

যে লোকের কাছে সাদকায়ে ফিত্‌র দেয়ার মত সম্পদ আছে, কিন্তু তার ওপর অতটা পরিমাণ ঋণের বোঝাও রয়েছে, তারও কর্তব্য হবে ফিত্‌রা দেয়া। তবে ঋণ শোধের খুব বেশী তাকীদ ও চাপ থাকলে ভিন্ন কথা হবে। তখন তার ঋণ শোধ করাই উচিত হবে, ফিত্‌রা দিতে হবে না।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, ঋণ ফিত্‌রা দেয়ার প্রতিবন্ধক নয়, যদিও তা প্রতিবন্ধক মালের যাকাত দেয়ার; কেননা ফিত্‌রার ওয়াজিব হওয়াটা খুব বেশী তাগিদপূর্ণ। তার বড় প্রমাণ তা গরীব মানুষের ওপরও ওয়াজিব এবং দিতে পারে এমন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপরই তা ধার্য। এমন কি যার যাবতীয় ব্যয়ভার অন্য কেউ বহন করে তার পক্ষ থেকেও তা দেয়া ওয়াজিব। কোন বিশেষ পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্তও নয় এখানে। অতএব তা সাধারণ ব্যয়ের মধ্যে গণ্য। আরও এজন্যে যে, মালের যাকাত

---

১. দেখুন ঃ المغنى ج ٢ ص ٧٦ ، الروضة ج ٢ ص ٢٩٩ - ٣٠٠

ফরয হয় মালিকানার কারণে। ঋণ তো এই মালিকানাকে প্রভাবিত করে ফিত্‌রা ওয়াজিব হয় ব্যক্তির দেহের ওপর, ঋণ তার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে ঋণের দাবি যদি খুব তীব্র ও তাৎক্ষণিক হয়, তা হলে ফিত্‌রা প্রত্যাহৃত হবে। কেননা ঋণ ফেরত চাইলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর তা বিশেষ এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির পাওনা, কারোর অসচ্ছলতা বা দারিদ্র্যে তা প্রত্যাহৃত হয় না। আর তা কার্যকারণের দিক দিয়ে অগ্রবর্তী, ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়েও তার গুরুত্ব সর্বাধিক। তা দিতে বিলম্ব করলে গুনাহগার হতে হবে। অতএব তা ফিত্‌রা ছাড়া আর সবকিছুই প্রত্যাহার করে—যদি তার তাগাদা করা নাও হয়। কেননা ঋণের তাগাদা আদায়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং বিলম্ব করা হারাম হয়ে যায়।[১]

---

১. দেখুন ঃ المغنى ج ٢ ص ٧٦ ا الروضة ٢ ص ٢٩٩ - ٣٠٠

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াজিব ফিত্‌রার পরিমাণ এবং কি থেকে দিতে হবে

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রমযানের ফিতরের যাকাত হিসেবে রাসূলে করীম (স) এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' গম ধার্য করেছেন। হাদীসটি বহু কয়খানি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় ফিত্‌রের যাকাত বাবদ এক ছা' খাদ্য অথবা এক ছা' খেজুর কিংবা এক ছা' গম বা এক ছা' কিশমিশ অথবা এক ছা' পনির দিতাম। আমরা এভাবেই দিয়ে আসছিলাম। শেষে একবার মুয়াবীয়া মদীনায় আগমন করেন এবং বলেন ঃ আমি দেখেছি, সিরিয়ার লোকেরা দুই 'মদ্দ'কে এক ছা' খেজুর দ্বারা বদল করে। পরে লোকেরা তাই গ্রহণ করল। হাদীসটি কয়েকজন গ্রন্থ প্রণেতা উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী ছাড়া অন্যরা একটু বাড়তি বর্ণনা দিয়েছে। তা হচ্ছে—আবূ সায়ীদ বলেছেন ঃ অতঃপর আমি সব সময় সেই পূর্বের মতই দিয়ে যাচ্ছিলাম।

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় প্রমাণ করছে যে, ফিত্‌রের যাকাত বাবদ সর্বপ্রকার জিনিস থেকে এক ছা' পরিমাণ দেয়।

শাহ্ দিহলভী লিখেছেন—এক ছা' পরিমাণ নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে, এ পরিমাণ খাদ্য ঘরের লোকদের পরিতৃপ্তি দিতে পারে। এতে এত খাদ্য থাকে যা যথেষ্ট এবং গরীবরা সে পরিমাণ খাদ্যে অভ্যস্ত। আর দাতাদের পক্ষেও এ পরিমাণ খাদ্য দান করলে সাধারণত কারোর কোন ক্ষতি হয় না।[১]

গম ও কিশমিশ ছাড়া অন্য জিনিসের বেলায় এক ছা' পরিমাণ দেয়া ইজমার ভিত্তিতে ওয়াজিব। আর তিনজন ইমামের মতেও সে অন্য জিনিসের ক্ষেত্রে এক ছা' পরিমাণ ওয়াজিব। আবূ সায়ীদ খুদরী, আবূল আলীয়া, আবূশ শা'মা, হাসানুল বসরী, জাবির ইবনে জায়দ, ইসহাক, আল-হাদী, আল-কাসেম, আন-নাসের ও আল-সুয়াইয়্যাদ বিল্লাহ প্রমুখেরও এ মত—শাওকানী এ কথাই লিখেছেন।[২]

---

১. الحجة الله البالغه ج ٢ ص ٥٠٩

২. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٨٢ - المغنى ج ٣ ص ٥٧ - এ গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ আলী, ইবনে আব্বাস ও শ'বী থেকে বিভিন্ন কথার বর্ণনা পাওয়া গেছে। কোনটিতে এক ছা' আবার কোনটিতে অর্ধ ছা'। ইবনে হাজম আবূ সায়ীদ থেকে এমন বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যা এক ছা' ওয়াজিব হওয়ার সুপরিচিত মতের বিপরীত। এটা খুবই বিস্ময়কর। المحلى ج ٢ ص ١٣٠

অর্ধ ছা' গম দেয়ার কথা যাঁরা বলেছেন,তাঁদের মত

আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেছেন ঃ অর্ধ ছা' পরিমাণ গম যথেষ্ট। তবে কিশমিশে তাঁর থেকে বিভিন্ন মতের বর্ননা এসেছে।[১] এটা জায়দ ইবনে আলী ও ইমাম ইয়াহ্ইয়ার মাযহাব—যেমন শাওকানী বলেছেন।[২] ইবনে হাজম বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ. তায়ূস, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ওরওয়া ইবনুজ্ জুবাইর, আবূ সালামাতা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর প্রমুখ থেকেও সহীহ্ বর্ণনা পাওয়া গেছে এ মতের সমর্থনে। আওজায়ী, লাইস ও সুফিয়ান সওরীর কথাও তাই। যেমন ইবনে হাযম বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে উপরিউক্ত মতের সমর্থনে বহ্ কয়টি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর, আবূ হুরায়রা, জারির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনুজ জুবাইর, আবূ সায়ীদ খুদরী প্রমুখ উল্লেখ্য। তবে আবূ বকর ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ ছাড়া আর সকল থেকেই উক্ত মত সহীহ প্রমাণিত হয়েছে।[৩]

এক ছা' পরিমাণ ওয়াজিব যাঁরা বলেছেন, তাঁদের দলিল

জমহুর ফিকাহবিদদের দলিল হচ্ছে আবূ সায়ীদ বর্ণিত হাদীস। তাঁর কথায় এক ছা' খাদ্য কিংবা এক ছা' খেজুর কিংবা এক ছা' গম অথবা এক ছা' কিশমিশ বা এক ছা' পনির।

নববী বলেছেন, দুটি দিক দিয়ে তা প্রমাণ করে ঃ একটি হিজাজবাসীদের পরিভাষায় 'খাদ্য' বলতে বিশেষভাবে গম বোঝায়। তার সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য উল্লিখিত জিনিস।

এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, হাদীসে বিভিন্ন জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মূল্য বিভিন্ন অথচ প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য থেকে এক ছা' পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে। তাতে বোঝা গেল ছা'-ই আসলে গণ্য, মূল্যের প্রতি কোন নজর নেই।[৪] বলেছেন, তাঁদের কাছে কোন প্রমাণ নেই শুধু হযরত মুয়াবিয়ার হাদীস ছাড়া। আর কয়েকটি হাদীসও অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাদীস পারদর্শীরা সেগুলোকে যয়ীফ বলেছেন। এ গুলোর দুর্বল হওয়াটা প্রকট ও অকাট্য।[৫]

জমহুর ফিকাহবিদগণ হযরত মুয়াবিয়ার হাদীসের জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, তা একজন সাহাবীর উক্তিমাত্র আবূ সায়ীদ ও অন্যান্য যে সব সাহাবী (রা) রাসূলে করীম

---

১. আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ কিশমিশকে খেজুরের মতই মনে করেছেন।—এটা ইমাম আবূ হানীফা থেকেও বর্ণিত। কোন কোন হানাফী আলিম এ বর্ননাকে সহীহ বলেছেন। ইবনুল হুমাম 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে দলিলের দিক দিয়ে উক্ত মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর 'সররুল মুখতার' গ্রন্থে বহু কয়জনের বক্তব্য উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ মতের ওপর ফতোয়া হয়েছে। الدروحلشية ج ٢ ص ٨٢।

২. نيل الاوطار السابق

৩. نصب الرايه مع بغية الالمعى ج ٢ ص৪ এবং দেখুন। المحلى ج٦ ص ١٢٨ - ١٣١ ٤٤٦-٤٤٧

৪ ৩ ৫ .٦. ص ٧ ج شرح النووى على صحيح مسلم

(স) সংস্পর্শ তাঁর চাইতে বেশী দিন পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর এ কথার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে জানেনও বেশী। আর একটি নীতি হচ্ছে. সাহাবিগণের মত বিভিন্ন হলে তাঁরা কেউ অন্যদের তুলনায় উত্তম বিবেচিত হবেন না। এমতাবস্থায় অন্য দলিল সন্ধান করা আবশ্যক। তাঁরা বলেছেন ঃ বহু হাদীস ও কিয়াস অন্যান্য জিনিসের মতো গমেরও এক ছা' হওয়ার শর্তকরণে ঐক্যবদ্ধ, অতএব তার ওপর নির্ভর করতে হবে। মুয়াবিয়া (রা) তো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি যা বলেছেন, তা তাঁর একটা মত—একটা বিবেচনা মাত্র। তিনি তা নবী করীম (স)-এর কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন, এমন কথা তিনি বলেন নি। তাঁর উক্ত মজলিসে বহু লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একজনও যদি জানতেন যে, মুয়াবিয়ার কথা রাসূলে (স)-এর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল, তাহলে তিনি তার উল্লেখ করতেন। অন্যান্য সব ব্যাপারেও তেমনটাই হয়েছে।[১]

'রায়' এবং 'ইজতিহাদ' উভয়ই শরীয়াতসম্মত। মুয়াবিয়া ও অন্যান্য সাহাবী (রা)-এর অনুসৃত নিয়মাবলী থেকে তা প্রমাণিত হয়, কিন্তু যে বিষয়ে অকাট্য সম্পদ দলিল পাওয়া যাবে, সেখানে তা অগ্রহণীয়।[২]

অর্ধ ছা' যথেষ্ট বলার সমর্থনে আবূ হানীফার দলিল

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মতের লোকদের দলিল হচ্ছে ঃ

প্রথম—আবদুল্লাহ ইবনে সালাবাতা অথবা সালাবাতা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সূয়াইর বর্ণিত ও আবূ দাউদ উদ্ধৃত হাদীস। তাঁর কথা ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ ফিতরের সাদকা হচ্ছে এক ছা' গম (বা قمح গম) প্রত্যেক দুইজনের পক্ষ থেকে।[৩]

আর হাকেম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রাসূলে করীম (স) এ কথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

صَدَقَةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ الْقَمْحِ -

সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে দুই 'মদ্দ' গম।'

আর আমরা জানি দুই 'মদ্দ' অর্থ অর্ধ ছা'। অনুরূপভাবে তিরমিযী আমর ইবনে শুয়াইব—তাঁর পিতা—তাঁর দাদা সূত্রে রাসূলের কথা হিসেবে এবং আবূ দাউদ ও নাসায়ী হাসান থেকে মুরসাল হিসেবে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) এ সাদকা নির্ধারণ করেছে, এক ছা' খেজুর কিংবা গম অথবা অর্ধ ছা' গম (قمح)।[৪]

---

১. শرح النووى على صحيح مسلم ج ٧ ص ٦٠. ৬১, ৬২

২. فتح البرى ج ٣ ص ٢٧٤ ط السلفيه

৩. আবূ দাউদ হাদীসের ভাষা ও সূত্র দেখা যেতে পারে। دار قطنى এবং كتاب الزكاة
البيهقى السنن الكبرى ج ٤ ص ١٦٧ ঃ এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজমের বক্তব্য ٢٢٣-٢٢٤
-١٦٨- المحلى ج ٦ص ١٢١ والزيلغى فى نصب الرايه ج ٢ص٤٠٦ - ٤١٠.

৪ দেখুন ঃ المحلى ج ٦ ص ١٢٢ - ١٢٣ - نيل الاوطار ج٤ ص ١٨٣ - نصب الرايه ج ٤ ص ٤١٨ - ٤٢٩

এভাবে আরও বহু কয়টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যার সমষ্টি প্রমাণ করে যে, এক ছা' পরিমাণটাই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। শাওকানী তাই বলেছেন এ কথা মেনে নিয়ে যে, যে 'খাদ্য' কথাটি সহীহ্ বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে بر (গম)ও শামিল।[১]

দ্বিতীয়, বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ তাঁরা অর্ধ ছা' গম দিতে দেখেছেন। সুফিয়ান সওরী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর কথা হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন ঃ অর্ধ ছা' গম। চারজন খলীফা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।[২]

এ সব সাহাবীর উক্তির ওপর আল-মুনযেরী নির্ভর করে বলেছেন ঃ গম সম্পর্কে কোন কথা নবী করীম (স) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বলে আমরা জানি না।[৩] আর তখনকার সময়ে মদীনায় গম ছিল অত্যন্ত সহজলভ্য (قمح অপেক্ষা)। সাহাবীদের সময় যখন তা বিপুল হয়, তখন তাঁরা দেখলেন যে, অর্ধ ছা' بر (ময়দা) এক ছা' شعير (উন্নতমানের গম) সমান হয়। আর তাঁরাই তখন নেতৃবৃন্দ। অতএব তাঁদের কথা বাদ দেয়া যেতে পারে কেবল তখন যখন তাঁদেরই মত লোকদের কথা গ্রহণ করা হবে। পরে ইবনুল মুনযির হযরত উসমান, আলী, আবূ হুরায়রা, জাবির, ইবনে আব্বাস, ইবনুজজুবাইর—তাঁর মা আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে সহীহ্ সনদে উদ্ধৃত করেছেন—যেমন ইবনে হাজার লিখেছেন ঃ তাঁরা মনে করেন, ফিতরের যাকাত হচ্ছে অর্ধ ছা' قمح (গম)। এ কথার পরিণতিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা'র মত।

---

১. نيل الاوطار المذكور

২. ঐ

৩. হাকেম এক ছা' গম পর্যায়ে যে সব হাদীস উদ্ধৃত (১ম খণ্ড-৪১০—৪১১ পৃ.) করেছেন, যার সব কয়টিকে সহীহ্ বলেছেন—যাহবী তন্মধ্যে দুটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন—তা পানি ঘোলা করেছে। এ দুটির একটি সায়ীদ জুমহী ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু বায়হাকী বলেছেন ঃ এতে গম-এর উল্লেখ সুরক্ষিতভাবে হয়নি। (৪র্থ খণ্ড—১৬৬ পৃ.) অতএব তা দলিল হতে পারে না। আর দ্বিতীয় হাদীসটিকে হাকেমের মতই ইবনে খুজায়মাও তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে ইসহাক, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে হুকাইম, ইয়াজ ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে। আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ লোকেরা তাঁর কাছে রমযানের সাদ্কার উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ আমি তো তাই দিই যা রাসূলে করীম (স)-এর যুগে দিতাম—এক ছা' খেজুর কিংবা এক ছা' গম বা এক ছা' আটা অথবা এক ছা' পনির। তখন একজন লোক বলল ঃ দুই মদ্দ গম ? বললেন ঃ না, ওটা তো মুয়াবিয়ার মূল্যায়ন। আমি তা গ্রহণ করি না, তদনুযায়ী আমলও করি না। কিন্তু ইবনে খুজায়মা বলেছেন ঃ আবূ সায়ীদের কথায় গম বা আটার উল্লেখ ভুলবশত হয়েছে। কেননা আবূ সায়ীদ যদি বলেই থাকতেন যে, তাঁর কথা ঃ 'একজন লোক বলল' থেকে বুঝা যায় যে, কাহিনীর শুরুতে গমের উল্লেখ সুরক্ষিত নয়। ভুলটা কার, তা আমি জানি না। তাঁরা রাসূল (স)-এর যুগে এক ছা' গম দিতেন, তাহলে লোকটি তাঁকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করত না ঃ 'দুই মদ্দ গম ? আবূ দাউদ ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনাটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ তাতে গমের উল্লেখ সুরক্ষিত নয়।' —ফতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড-৩৭৩ পৃ. 'ইবনে হাজম এ হাদীসটি তাঁর المحلى। গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড—১৩০) উদ্ধৃত করেছেন ইবনে ইসহাকের সূত্রে। কিন্তু তাতে এক ছা' গমের উল্লেখ নেই। সে দলিলের ভিত্তিতে বলেছেন যে, আবূ সায়ীদ গম দিতে মোটামুটি নিষেধ করেন। কিন্তু আল্লামা শায়খ আহমাদ শাকের দারে কুতনী উদ্ধৃত (২২২) বর্ণনা এনে তার বিরোধিতা করেছেন। হাকিম আল–মুস্তাদারক (১ম খণ্ড-৪১১ পৃ.) গ্রন্থে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, সেটিই আমরা এখানে উদ্ধৃত করেছি। তাতে এটুকু কথা অতিরিক্ত

কিন্তু আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে যে, তিনি সেই কথা সমর্থন করেন নি। ইবনে উমর (রা)-ও তাই। অতএব এক্ষেত্রে কোন ইজমা হয় নি বলেই মনে করতে হবে যদিও তাহাভী ভিন্ন মত পোষণ করেন।[১]

হানাফী মতের লোকেরা বলেছেন, আবূ সায়ীদ খুদরী বর্ণিত হাদীসে ওয়াজিব হওয়ার কোন দলিল নেই। সেটা এ কাজের বর্ণনামাত্র। অতএব তা জায়েযমাত্র। আমরাও তাই বলি। তাহলে ওয়াজিব পরিমাণ হল অর্ধ ছা'। আর বেশী দিলে তা হবে নফল দান।[২]

আবূ সায়ীদ বর্ণিত হাদীসে طعام বা খাদ্য বলতে حنطه বা গমই বোঝায় বলে বলা হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। ইবনুল মুনযির বলেছেন ঃ আমাদের কেউ কেউ ধারণা করেছেন—'আবূ সায়ীদ বর্ণিত হাদীসে صاعا من طعام 'এক ছা' পরিমাণ খাদ্য' তাঁদের পক্ষের দলিল, যারা এক ছা' পরিমাণ গম ফিত্‌রা দেয়ার মত পোষণ করেন। কিন্তু এটা ভুল। কেননা আবূ সায়ীদ সংক্ষেপে 'খাদ্য'-এর উল্লেখ করেছেন। পরে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।...... পরে হাফস ইবনে মাইমারাতা সূত্রে বুখারী প্রমুখ উদ্ধৃত হাদীস তুলেছেন এই মর্মে যে, আবূ সায়ীদ বলেছেন ঃ আমরা রাসূলে করীম(স)-এর সময়ে ঈদের দিনে এক ছা' পরিমাণ খাদ্য ফিত্‌রা বাবদ প্রদান করতাম। আবূ সায়ীদই বলেছেন ঃ তখন আমাদের খাদ্য ছিল গম, কিশমিশ পনির ও খেজুর'। পূর্ব কথার একটা ব্যাখ্যা। তাহাভী প্রমুখ অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ কথাটুকুও রয়েছে ঃ আমরা তা ছাড়া আর কিছু দিতাম না।[৩]

রয়েছেঃ অথবা এক ছা' গম। বলেছেন ঃ 'এটা বর্ণনাকারীদের পার্থক্য'। কেউ একটার উল্লেখ করেন অথবা অন্যটার উল্লেখ করেন। আসলে সবই সহীহ। সিকাহ বর্ণনাকারী কিছু বাড়তি বললে তা গ্রহণীয়। উক্ত শায়খ ইবনে খুজায়মা ও আবূ দাউদের এ বাড়তি অংশ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা জানতে পারেন নি। ফতহুল বারী তা উদ্ধৃত করেছে। হ্যাঁ সিকাহ বর্ণনাকারীর বাড়তি কথা গ্রহণীয় হয় যদি তাঁর চাইতেও অধিক সিকাহ বর্ণনাকারী তার বিরোধিতা না করেন অথবা কালামে এমন কিছু না থাকে যা তার ভ্রান্তি বোঝায়। আবূ সায়ীদ প্রমুখ থেকে বহু সংখ্যক হাদীস এসেছে, যা প্রমাণ করে যে, সেকালে গম তাঁদের খাদ্য ছিল না। তার কিছু কিছু পরে উল্লেখ করব। তবে যে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা এসেছে তিনি সমালোচকদের দৃষ্টিতে تدليس করেন বলে খ্যাত—যদি 'হাদীস' স্পষ্ট ভাষায় না বলেন। এখানে عن—عن ধারায় বর্ণনা এসেছে, 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে তাই আছে। এ সবকিছু প্রমাণ করে যে, হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন এবং যাহরী তা মেনে নিয়েছে, তা আসলে ভ্রান্তি।

ফল কথা, ইমাম ইবনুল মুনযির নবী করীম (স) থেকে 'গম' সম্পর্কিত কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়নি বলে যে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, ত৷ যথার্থ, তাতে আপত্তির কিছু নেই। হাফেজ বায়হাকীও তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড—১৭০ পৃ.) তাই বলেছেন। এক ছা' গম পর্যায়ে হাদীস রাসূলে করীম (স) থেকে এসেছে। আর অর্ধ ছা' পর্যায়েও হাদীস বটে; কিন্তু তার কোনটিই সহীহ নয়। তার কারণ خلافيات এ বলা হয়েছে। আবূ সায়ীদ খুদরীর হাদীস এবং ইবনে উমর থেকে প্রমাণিত হাদীসে আমাদের দেখানো হয়েছে যে, এক ছা' গম দুই 'মদ্দে' অর্ধ ছা'—বিনিময় হওয়ার ঘটনা রাসূলে করীম (স)-এর পরে সংঘটিত।

১. দেখুন ঃ فتح البرى ج ٣ ص ٣٧٤المحلى ج ٦ ص ١٢٨ – ١٣١ – ط السلفيه

২. نصب الرايه ج ٢ ص ٤١٨ – بدائع الصنائع ج ٢ ص ٧٢

৩. দেখুন ঃ فتح البارى ايضا – نيل الاوطار ج ٤ ص ١٩٢ – ١٩٣

বরং ইবনে খুজায়মা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে খেজুর, কিশমিশ ও গম ছাড়া আর কিছু দিয়ে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা হতো না। حنطة তখন প্রচলিত ছিল না। মুসলিম শরীফে অপর এক সূত্রে আবূ সায়ীদ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমরা তিন প্রকারের জিনিস দিয়ে ফিত্‌রা দিতাম—এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' পনির, অথবা এক ছা' গম। এ বর্ণনাটিতে কিশমিশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি—অপর তিনটির তুলনায় তার প্রচলন কম বলে। ইবনুল হাজার বলেছেন ঃ এসব কয়টি সূত্রই প্রমাণ করে যে, আবূ সায়ীদের বর্ণনায় যে 'খাদ্যের' উল্লেখ হয়েছে, তা حنطة ছাড়া অন্য কিছু। হতে পারে তা ذره হবে। কেননা তা হিজাজবাসীদের কাছে এখন পর্যন্ত পরিচিত এবং তা তাদের প্রধান খাদ্য। জাওজাকী ইবনে আজলান-ইয়াজ সূত্রে আবূ সায়ীদের হাদীসেই এ অংশটুকু বর্ণিত আছে ঃ 'এক ছা' খেজুর এক ছা' রুটি অথবা ذره।[১]

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

উপরিউদ্ধৃত সমস্ত হাদীস একত্রিত করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গম قمح তাদের খুব সাধারণ খাদ্যের মধ্যে শামিল ছিল না রাসূলে করীমের সময়ে। আর নবী করীম (স) ও তার এক ছা' ধার্য করেন নি, যেমন গম ও খেজুর এবং কিশমিশ ও পনির থেকে ধার্য করেছেন। বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে, তা উপরিউক্ত কথাকে বলিষ্ঠ করে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) ফিতরের যাকাত বাবদ দেবার আদেশ করেছেন এক ছা' খেজুর বা এক ছা' গম। বলেছেন, পরে লোকেরা তার বদলে দুই 'মদ্দ' حنطة (গম) দিতে শুরু করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'পরে লোকেরা তার বদলে অর্ধ ছা' ময়দা দিতে শুরু করল।[২]

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন ঃ এটা সুপরিচিত ও জ্ঞাত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব এক ছা'-এর পরিবর্তে অর্ধ ছা' মায়দার প্রচলন করলেন। আবূ দাউদ এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন।[৩] বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত, মুয়াবিয়াই তা চালু করেছেন। তাতে নবী করীম

---

১. দেখুন ঃ فتح البارى ج ٣ ص ٣٧٣ ط السلفيه

২. صحيح مسلم بشرح النووى ج ٧ص ٦٠. فتح البارى ج ٣ ص ٣٧١ - ٣٧٢ ط السلفيه

৩. ইবনে হাজার বলেছেন ঃ ইবনে উমর 'লোকেরা' বলে মুয়াবিয়া ও তাঁর অনুসারীদের বুঝিয়েছেন। 'নাফে' থেকে বর্ণিত আইউবের হাদীসে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। হুমাইদী তাঁর মুসনাদে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলেছেন ঃ ইবনে উমর বলেছেন, পরে মুয়াবিয়ার সময়ে লোকেরা এক ছা' গমের বদলে অর্ধ ছা' ময়দা দিতে শুরু করল। ইবনে খুজায়মা তাঁর সহীহ গ্রন্থে এরূপ উদ্ধৃত করেছেন। অপর এক সূত্রে —তা সুফিয়ান এবং নির্ভরযোগ্য। তা আবূ সায়ীদের কথার সমর্থক এবং তার চাইতেও সুস্পষ্ট। ইবনুল কাইয়্যেম আবূ দাউদের যে বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, ইবনে হাজার তার উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, মুসলিম كتاب التميز বর্ণনাকারীর বিভ্রান্তি হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি তার 'রদ্দ' করেছেন স্পষ্টভাবে দেখুন ঃ فتح البارى ج ٣ ص ٣٧٢ ط السلفيه

(স) থেকে বহু 'মুরসাল আসার' উপস্থাপিত হয়েছে যা সনদযুক্ত এবং পরস্পর দ্বারা শক্তিশালী।[১]

ইবনুল কাইয়্যেম ইবনে আবূ চায়াইর প্রমুখের হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং হাসান বসরীর হাদীসও। বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাস বসরার মসজিদের মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে রমজানের শেষে ভাষণ দিলেন। বললেন, 'তোমরা তোমাদের রোযার সাদকা প্রদান কর।' কিন্তু লোকেরা তা জানতে (বা বুঝতে পারল না)। পরে বললেনঃ 'এখানে মদীনার কোন লোক আছে কি ? তোমরা ওঠ, তোমাদের ভাইদের কাছে চলে যাও এবং তাদের শিক্ষা দান কর। কেননা তার জানে না। রাসূলে করীম (স) এ ফিত্‌রা সাদকা বাবদ এক ছা' খেজুর বা গম অথবা অর্ধ ছা' قمح ধার্য করেছেন প্রত্যেক মুক্ত বা দাস, পুরুষ বা মহিলা, ছোট বা বড় সকলের ওপরে .... পরে হযরত আলী যখন এলেন এবং তিনি জিনিসপত্রের সস্তা মূল্য দেখলেন। তখন বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি প্রশস্ততা এনে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি তার জন্যে প্রত্যেক জিনিসের এক ছা' পরিমাণ চালু করতে (তাহলে কতোই না ভালো হত)—আবূ দাউদ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ওপরে তাঁরই বক্তব্য। নাসাইও উদ্ধৃত করেছেন।[২] তাতে আছে ঃ অতঃপর আলী (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহই যখন তোমাদের জন্যে প্রশস্ততা এনে দিয়েছেন, তখন তোমরা উদরতার সঙ্গে দিতে থাক—ময়দা ইত্যাদি থেকে এক ছা' পরিমাণ দাও।

---

১. زاد المعاد ج ٤ ص ٣١٢

২. নাসায়ী বলেছেন ঃ হাসান ইবনে আব্বাস থেকে শুনতে পাননি। অনুরূপ বলেছেন আহমাদ ইবনুল মদীনী প্রমুখ ইমামগণ। এ দৃষ্টিতে হাদীসটি منقطع তাঁরা এরূপ বলেছেন, এজন্যে ইবনে আব্বাস হযরত আলীর সময়ে বাসরায় অবস্থান করতেন। আর হাসান আলী ও উসমান উভয় আমলে মদীনায় রয়েছেন। শায়খ আহমাদ শাকের এ কথার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এসব বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। কেননা হাসান ইবনে আব্বাসের সময় অবশ্যই বেঁচে ছিলেন। তিনি মদীনায় ছিলেন সে দিনগুলোতে যখন ইবনে আব্বাস বসরাতে শাসনকর্তা ছিলেন। কাজেই এ সময়ের পূর্বে ও পরে তাঁর নিকট হাদীস শোনা হাসানের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। হাদীসে পারদর্শীগণ শুধু সমসাময়িকতার ভিত্তিকেও যথেষ্ট মনে করেছেন। পরে তাঁর কাছে থেকে হাদীস শোনা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত প্রমাণ করে আহমাদ কর্তৃক তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে উদ্ধৃত হাদীস (৩১২৬)। তা ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত ঃ একটি জানাজা হাসান ও ইবনে আব্বাসের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তা দেখে হাসান দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন না। তখন হাসান ইবনে আব্বাসকে বললেন ঃ 'রাসূলে করীম (স) তো জানাযা দেখলে দাঁড়াতেন ? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ হ্যাঁ দাঁড়িয়েছেন, বসেও রয়েছেন ? সাক্ষাত এবং শ্রবণ প্রমাণকারী এর চাইতে বড় দলিল আর কি হতে পারে.... المختصر المنذرى ج ٢ ص ٢٢٢ مع معالم السنن وحواشيه দেখুন ঃ আমি বলব, শুধু এক সময়ের লোক হলেই বসরার মিম্বরে দেয়া একটা ভাষণ শোনবার জন্যে যথেষ্ট প্রমাণ নয়। এটা এমন সময়ের ব্যাপার, যখন হাসান নিশ্চই বসরাতে ছিলেন না। তা হলে তিনি সাক্ষাতে শুনতে পাওয়া কোন লোকের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসের ক্ষেত্রে সমসাময়িকতা যথেষ্ট হয় যদি তাতে কোন স্থান বা সময়ের বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকে। অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের ভাষণ অবশ্যই বসরাবাসীদের কাছে সুপরিচিত ছিল। হাসানের তা ইবনে আব্বাস থেকে সরাসরি শোনা জরুরী ছিল না। মুয়ায থেকে তায়ূমের বর্ণনা প্রসঙ্গে হাদীসবিদগণ এ কথাই বলেছেন। কেননা তায়ূম মুয়ায সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে অবহিত, তবে সাক্ষাত হয়নি। ইবনে আব্বাসের এ ভাষণে 'এক ছা' খাদ্য উদ্ধৃত ছিল। দেখুন ঃ السنن الكبرى والجوهر النقى ج ٤ ص ١٢٧ - ١٦٨ نصب الرايه ج ٢ ص ٤١٨ -٤١٩

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন ঃ আমাদের শায়খ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রা) এ মতটিকেই শক্তিশালী মনে করতেন। বলতেন ঃ আহ্‌মদ কাফ্‌ফারা পর্যায়ে যা বলেছেন, এটা তার ওপর কিয়াস। তিনি বলেছেন ঃ সাদকায়ে ফিতর বাবদ যে পরিমাণ ময়দা ওয়াজিব, তা অন্য ক্ষেত্রে ওয়াজিব পরিমাণে অর্ধেক।[১]

উপরে উল্লিখিত সব কথা থেকে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যেসব হাদীসে অর্ধ ছা' গমের কথা এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করার মত যয়ীফ নয়। বিশেষ করে ইবনে আব্বাস থেকে হাসানের বর্ণনা যখন সহীহ্ প্রমাণিত। কিন্তু তা সাহাবীদের মধ্যে এতটা খ্যাত ও সহীহ্ ছিল না যে, খেজুর, গম, পনির ও কিশমিশের এক ছা' পরিমাণের মত অকাট্যভাবে প্রমাণিত বলে মনে করা যেতে পারে!

তা যদি সহীহ্ হতো, তা তাহলে ইবনে উমর, আবূ সায়ীদ, মুয়াবিয়া এবং যেসব সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর কথা শুনেছেন, তাদের মত লোকদের কাছে তা গোপন থাকতে পারত না।

মুয়াবিয়ার কাজ তো স্পষ্ট। তিনি এক ছা' পরিমাণ খেজুরের বিকল্প ঠিক করেছেন অর্ধ ছা গম قمح। এটা বিনিময়ে ও মূল্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এ কারণে আবূ সায়ীদ বলেছেন, 'এটা মুয়াবিয়ার মূল্য নির্ধারণ—আমি গ্রহণও করি না, তদানুযায়ী আমলও করি না'।[২]

অন্য সাহাবিগণও তাঁদের সময়ে গমের প্রাচুর্য দেখা দিলে এরূপই করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, অর্ধ ছা' قمح এক ছা' গমের স্থলাভিসিক্ত হতে পারে।—ইবনুল মুনযির যেমন বলেছেন।

এসব বর্ণনার ওপরে ভিত্তি করে চিন্তা করলে মন আশ্বস্ত হয় এ কথায় যে, খেজুর, গম, কিশমিশ, পনির—এ চার প্রকারের খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে এক ছা' পরিমাণটা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু সেই রকম দলীল দ্বারা এক ছা' পরিমাণ قمح প্রমাণিত হয়নি। এটা সত্যানুসন্ধানের ফলশ্রুতি। যেমন অর্ধ ছা' সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সহীহ হওয়ার মানে পর্যন্ত পৌছায়নি। যে লোক অর্ধ ছা' قمح পরিমাণ ঠিক করেছেন—যেমন মুয়াবিয়া ও তাঁর সমর্থক সাহাবিগণ—এক ছা' গম বা খেজুরের বিকল্প, তা তিনি করেছেন ইজতিহাদের সাহায্যে। এ ইজতিহাদের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, قمح ছাড়া অন্যান্য সবজিনিসের মূল্য সমান। قمح তখন খুব বেশী মূল্যে পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁদের কথানুযায়ী প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক জায়গার সাধারণ মূল্যকেই গণ্য করতে হবে। কিন্তু তাতে অবস্থা বিভিন্ন হয়ে যাবে, তা নিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত করা যাবে না। অনেক সময় কয়েক ছা' পরিমাণ قمح দেয়ার প্রয়োজনও হতে পারে।[৩]

---

১. زاد المعاد ج ١ ص ٣١٤

২. ইবনে খুজায়মা ও হাকেম নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে ইসহাকের সূত্রে 'ফত্‌হুল বারী' গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে (২য় খন্ড-৩৭৩ পৃ.) এবং দেখুন 'আল-মুস্তাদরাক'-(১ম খন্ড ط سلفيه-৪১১ পৃ., আল-মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩০ পৃ. نصب الرايه ২য় খণ্ড, ৪ ৭-৪১৮ পৃ.

৩. فتح البارى ج ٢ ص ٣٧٤ ط السلفيه

পাকিস্তান সফরকালে সেখানকার কোন কোন আলিম আমাকে বলেছেন, তাদের দেশে قمح-এর মূল্য খেজুরের তুলনায় অনেক কম। তাহলে সেখানে খেজুরে যা ওয়াজিব পরিমাণ তার অর্ধেক দিয়ে ওয়াজিব কি করে আদায় করা যেতে পারে? কিশমিশের অবস্থাও অনুরূপ। এ কালে বহু দেশেই قمح ও খেজুরের তুলনায় তার মূল্য অনেক গুণ বেশী।

এ প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান কেবল তখনই হতে পারে, যদি এক ছা' পরিমাণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এই যা বললাম, সাহাবায়ে কিরাম (রা) মূল্যের প্রতি নজর দিতেন—মূল্যের হিসাবটাই গণ্য করতেন,তার প্রমাণ হচ্ছে, হযরত আলী (রা) যখন বাসরাতে সস্তা মূল্য দেখতে পেলেন সব জিনিসের, তখন তিনি লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা গম ও অন্যান্য জিনিসের এক ছা' পরিমাণই দিতে থাক। অতএব বোঝা গেল, হযরত আলী (রা) এ ব্যাপারে মূল্যের ওপর দৃষ্টি রেখেছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার এ কথাই বলেছেন।[১]

এ পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই বাঞ্ছনীয় হচ্ছে, ব্যক্তির অথবা দেশের সাধারণ বা প্রধান খাদ্যের এক ছা' পরিমাণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যদি قمح গম প্রধান খাদ্য হয়, এবং তা দিয়ে ফিত্‌রা দেয়ার ইচ্ছা করা হয়, তাহলে তার অর্ধ ছা' পরিমাণ দেয়া জায়েয হবে—যদি তার মূল্য স্থানীয় লোকদের প্রধান খাদ্রের এক ছা' পরিমাণের মূল্যের সমান হয়। قمح গমের মূল্য প্রদানের ব্যাপারে সাহাবীদের যে ইজতিহাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে এটা তারই ভিত্তিতে হবে।

তবে সর্বাবস্থায় এক ছা' পরিমাণ দেয়াটাই সর্বাধিক সতর্কতামূলক নীতি। তাহলে মত বিরোধ থেকে বাঁচা যাবে এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত দলিল মেনে চলা হবে। এর ফলে মুসলিম ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ ব্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে কাজ করতে সক্ষম হবে, যাতে কোনরূপ সংশয় নেই। আর যাকে আল্লাহ্ প্রশস্ততা দান করেছেন, তার কর্তব্য সে প্রশস্ততা অনুযায়ী কাজ করা—যেমন হযরত আলী (রা) বলেছেন।

এক ছা' পরিমাণের বেশী দেয়া কি জায়েয

আমার জন্যে এটা বিস্ময়কর যে, মালিকী মাযহাবের কোন কোন গ্রন্থে আমি এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছি যে, ফিতরা দানকারীর জন্যে মুস্তাহাব নীতি হচ্ছে এক ছা' পরিমাণের বেশী না দেয়া। বরং তার অধিক দেয়া মাকরূহ বলা হয়েছে। কেননা তাঁরা বলেছেন, শরীয়াত তো এ পরিমাণটাই সীমিত করে নির্ধারিত করে নিয়েছে। অতএব তার বেশী দেয়াটা যেমন বিদয়াত হবে, তেমনি মাকরূহ। যেমন তেত্রিশ বারের বেশী বার তাসবীহ্ —'সুবহানাল্লাহ'—পড়া। মকরূহ ও বিদয়াত হবে যদি জেনে শুনে তা করা হয়। ভুলবশত করা হলে তা বিদয়াত বা মাকরূহ হবে না।[২]

---

১. فتح البارى ج ٣ ص ٢٧٤ ط السلفيه

২. দেখুনঃ الشرح الكبير لدردير ج ١ ص ٥٠٨

আমি মনে করি, এ দৃষ্টান্ত বা নজীর দেখানো সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা যাকাত বা সাদকা তো নামাযের ন্যায় নিছক ইবাদত পর্যায়ের কাজ নয়। আর যিকির-তাসবীহ ইত্যাদিতে ওয়াজিব পরিমাণের অধিক করায় কোন দোষ হওয়ার কথা নয়—বরং তা খুবই উত্তম ও পছন্দনীয়। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ -

যে লোক নফলস্বরূপ কোন কাজ করবে, তা তার জন্যে ভালো হবে।[১]

রোযার ফিত্‌রা'র ব্যাপারে এ আয়াত খুবই প্রযোজ্য। কেননা তা হচ্ছে মিসকীনের খাদ্য।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাঊদ উবাই ইবনে কায়াব (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, এক ব্যক্তির মালের যাকাতস্বরূপ একটা এক বছরে উপনীতা উষ্ট্রী ফরয হয়েছিল। কিন্তু সে তা যাকাত সংগ্রহকারীকে দিতে রাযী হল না। কেননা তা এখনো দুধওয়ালী হয়নি এবং বোঝা বহন ও সওয়ারী বহনেরও যোগ্য হয়নি। তখন তার পরিবর্তে মাটির টিবির মত উঁচু একটা উষ্ট্রী ছাড়া আর কিছু দিতে রাযী হল না। উবাইও রাযী হলেন না তা গ্রহণ করার জন্যে। কেননা তা ফরয পরিমাণের অনেক বেশী অতিরিক্ত। তারা দুজনই নবী করীম (স)-এর কাছে বিচার চাইলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ওপর ফরয তো ঐটা। এক্ষণে তুমি যদি নফলস্বরূফ তা বেশি দিতে চাও তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে এর শুভ ফল দান করবেন। আমরা তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে নিলাম। পরে তিনি সেটি নিয়ে নেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার মালে বরকত হওয়ার জন্যে তিনি দো'আ করলেন।[২]

ওয়াজিব পরিমাণের বেশীও যে গ্রহণ করা যেতে পারে, উপরিউক্ত বর্ণনা তার অকাট্য দলিল। তাতে বেশী সওয়াব পাওয়ারও ওয়াদা রয়েছে, তাতে কোন অসন্তুষ্টিরও লক্ষণ নেই। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ই যখন তোমাদের প্রতি প্রশস্ততা দেন তখন তোমরাও তদানুযায়ী দান কর প্রশস্ততা সহকারে।

তবে বেশী দান করে নফল ইবাদত করা যদি বিদয়াত প্রমাণিত হয়, তাহলে তো সম্পূর্ণ হারাম হতো, শুধু মাকরূহ নয়। কেননা বিদয়াতমাত্রই গুমরাহী।

হ্যাঁ, শুধু বাড়াবাড়ি, দেখানোপনা ও সূক্ষ্মতা অবলম্বনস্বরূপ—দানে উদারতা ও নফলস্বরূপ নয়—এক ছা' পরিমাণের বেশী যে দেবে তাকে বলা যেতে পারে সে বিদয়াত করেছে আর সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হোক।[৩]

---

১. سورة البقرة - ١٨٤

২. আহমদ, আবূ দাঊদ ও হাকেম এ বর্ণনাটি নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, এটাকে সহীহ বলেছেন। যাহবী তা সমর্থন করেছেন। নবম অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে এর সম্পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করা হবে।

৩. আহমাদ, মুসলিম।

এক ছা'-এর পরিমাণ

পূর্বে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, এক ছা' ওজনে মিশরীয় মাপের হয় অর্থাৎ -এক পাত্র ও এক-তৃতীয়াংশ। শরহিদ দারদীর গ্রন্থেও তাই বলা হয়েছে। আর তা ২১৭৬ গ্রামের ওজনের সমান। (সেটা قمح -এর ওজন হিসেবে)।

এক ছা' قمح -এর ওজন যদি তাই হয় তাহলে—ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ওটা ছাড়া অপরাপর প্রকারের জিনিস তার তুলনায় হালকা হবে। তার এ পরিমাণ মাল দেয়া হলে তা এক ছা'র বেশী হয়ে যাবে।

সেখানে যদি লোকদের ওজন করে বিক্রি করার অন্য কোন প্রকারের জিনিস থাকে যা قمح-এর তুলনায় ভারী যেমন চাউল, তাহলে উল্লিখিত ওজনের পার্থক্যের তুলনাস্বরূপ বেশী পরিমাণ ওয়াজিব ধরা হবে।

এ প্রেক্ষিতেই কোন কোন আলিম পাল্লায় ওজনের পরিবর্তে পাত্র দিয়ে পরিমাপ করার ওপর বেশী নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, কেননা শস্য দানার মধ্যে হালকা-ভারী উভয় ধরনেরই রয়েছে।

ইমাম নববী الروضه। গ্রন্থে লিখিছেন ঃ

'ছা'কে 'উতন' দ্বারা চিহ্নিত করা কঠিন। কেননা রাসূলের জামানায় যে ছা' দ্বারা মেপে দেয়া হতো তা একটা পরিচিত পরিমাপ পাত্র। কিন্তু যে জিনিস দেয়া হয় তা বিভিন্ন হওয়ার কারণে তার পরিমাণটাও বিভিন্ন হয়ে যায়। যেমন জনার বা ভুট্টা (maize) ও চনা প্রভৃতি। এ পর্যায়ে দীর্ঘ কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। যিনি সেই বিস্তারিত ও গবেষণাপূর্ণ কথা জানতে চান, তিনি شرح المهذب। পাঠ করবেন। তার সংক্ষিপ্ত কথা 'আমাদের মতের ইমাম অবুল ফারজ দারেমী যা বলেছেন, তাই ঠিক কথা। তা হচ্ছে, এ পর্যায়ে পাত্র দ্বারা পরিমাপের ওপর নির্ভর করতে হবে—পাল্লার ওজনের ওপর নয় এবং রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে যে 'মুয়ায়ার' معاير ছা' দিয়ে পরিমাপ করে দেয়া হতো সেই রকম ছা' দিয়ে পরিমাপ করেই দেয়া উচিত। এরূপ ছা' বর্তমানেও আছে। তা যে পাবে না, তার উচিত এমন একটা পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা যে সম্পর্কে এ নিশ্চয়তাবোধ হবে যে, তা সে ছা'র চাইতে কম বা ছোট হবে না। এ প্রেক্ষিতে পরিমাণ নির্ধারণ হবে 'রতল' এবং এক-তৃতীয়াংশ প্রায়। (সম্ভবত সঠিক কথা হচ্ছে, কাছাকাছি বা নিকটবর্তী) কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন, এক ছা'র পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম ধরনের দুই সমান হস্তের কোষ ভর্তি চারবারে যা হয় তাই। সঠিক কথা তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন।[১]

ইমাম নববীর এ কথা আমাদের এ যুগে মেনে নেয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। কেননা এখনকার সময়ে দুনিয়ার সর্বত্রই সব জিনিসই প্রায় পাল্লায় ওজন করা হয়।

---

১. الروضه ج ٢ ص ٣٠١ - ٣٠٢

ইবনে হাজাম বলেছেন ঃ আমি মদীনাবাসীদের মধ্যে দুইজন লোককেও এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করতে দেখিনি যে, নবী করীম (স) যে-মদ্দ দ্বারা পরিমাণ করে সাদকাসমূহ দিতেন তা এক রতল ও অর্ধরতলের অধিক ছিল না যেমন, তেমনি এক 'রতল' ও এক-চতুর্থাংশ রতলেরও কম নয়। অনেকে বলেছেন, তা এক ও এক-তৃতীয়াংশ রতল ছিল।

বলেছেন, এটা বিশেষ কোন পার্থক্যের বিষয় নয়। তবে তা গম, খেজুর ও شعير-এর পাত্র মাপের গাম্ভীর্য অনুপাতে।[১]

আল-মুগনী গ্রন্থে ইমাম আহমাদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, ইবনে আবূ যিবের ছা' পাঁচ রতল ও এক-তৃতীয়াংশ মাপের ছিল। আবূ দাউদ বলেছেন, সেটাই হচ্ছে রাসূলে করীম (স) ব্যবহৃত ছা' মাপ। বলেছেন, যে লোক ভারী খাদ্য সাদকায়ে ফিত্‌র বাবদ দেবে, তার উক্ত মাপের ওপর সতর্কতাস্বরূপ কিছুটা বেশী দেয়া উচিত।[২]

হানাফীদের কাছে এক ছা' হয় আট 'রতলে' কৃষি ফসলের যাকাত পর্যায়ে আমরা তার উল্লেখ করে এসেছি। তা জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের পরিমাপ এক ছা' ও অর্ধ ছা'-এর সমান হয়। তার অর্ধেক $\frac{2}{3}$ এক ছা'-এর দুই তৃতীয়াংশ অন্যদের কাছে এক ছা'। এই অর্ধ-ছা'-এর পরিমাপ কোন কোন হানাফী শায়খ করেছেন একপাত্র এ তার ষষ্ঠ ভাগ—মিশরীয় নিয়মে। আর কেউ কেউ তার পরিমাপ করেছেন একপাত্র ও এক-তৃতীয়াংশ।[৩]

এ দৃষ্টিতে উভয়ের কাছে قمح গম-এর ওয়াজিব পরিমাণ এক ও অভিন্ন হয়ে যায় পরিণামে—এত সব মতপার্থক্য সত্ত্বেও। তবে قمح ছাড়া অন্য কোন শস্য ফিত্‌রা হিসেবে দিতে গেলে সেক্ষেত্রে পার্থক্যটা প্রকট হয়ে উঠে। সেখানে হানাফীরা যে মাপের কথা বলেন, অন্যরা তাকে যয়ীফ বলেন। এরূপ এর বিপরীতটাও।

আর যার কাছে পরিমাপের পাত্র বা ওজন করার দাড়ি পাল্লা নেই, তার উচিত চার 'মদ্দ'-পরিমাণ দেয়া। ফিকাহ্‌বিদদের মতে এক মদ্দ (Bushel) হচ্ছে মধ্যম আকার-আকৃতির এক ব্যক্তির দুই হাতের ভরা কোষ। আর এভাবে চার হাত কোষ পরিমাণ এক ছা'র সমান হবে। কেউ তার অধিক পরিমাণ দিলে তা তার নফল দান এবং তার জন্যে কল্যাণকর হবে।

যেসব জিনিস ফিত্‌রা বাবদ দেয়া হয়

ফিত্‌রার যাকাত প্রদান পর্যায়ে যত হাদীস এসেছে, তা বিভিন্ন প্রকারের নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্যকে চিহ্নিত করেছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ খেজুর, গম, বার্লি, কিশমিশ ও পনির। (পনির হচ্ছে পানি নিষ্কাষিত শুষ্ক দুধ—যার মাখন বের করা হয়নি।) কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে قمح -এর উল্লেখ রয়েছে। আবার কোন কোনটিতে

---

১. المحلى ج ٥ ص ٢٤٥ ২. المغنى ج ٣ ص ٥٩

৩. ردالمختار ج ٢ ص ٨٣ - ٨٤

যব বা দানারও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ জিনিসগুলোর কোন একটা দেয়া কি নির্দিষ্ট এবং ইবাদত পর্যায়ের ?—এই অর্থে যে, এগুলোর বাইরে অন্যান্য খাদ্যশস্যের কোন একটি দেয়া মুসলমানের জন্যে জায়েযই হবে না ?

মালিকী ও শাফেয়ী মযহাবের আলিমগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এ সব জিনিস দেয়াই ইবাদত পর্যায়ে নির্দিষ্টভাবে লক্ষীভূত নয়।—এগুলোর কোনটি ছাড়া দেয়াই যাবে না, দিলে ইবাদত হবে না, এমন নয়। বরং মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, দেশের সাধারণ খাদ্য থেকে তার ফিত্‌রা আদায় করা। আর অন্য এক মতে ব্যক্তির সাধারণ খাদ্য–ব্যক্তি বেশীর ভাগ যে খাদ্য খায়, তা থেকেই দেয়া।

এর ওপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সারা বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় যে খাদ্য খাওয়া হয় তাই লক্ষ্য, না বিশেষভাবে রমযান মাসে যা বেশীর ভাগ সময়ে খায় অথবা ফিত্‌রা দেবার দিনে বেশীর ভাগ যা খায় কিংবা ওয়াজিব হওয়ার দিন যা বেশীর ভাগ খাবার হয়, তাই দেয়া লক্ষ্য ?

মালিকী মাযহাবের লোকেরা এসব সম্ভাবনার কথাই বলেছেন, তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য ফিত্‌রা দেবার দিনের কথা বলেছেন। কিন্তু অন্যরা রমযান মাসের বেশীর ভাগ খাদ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১]

শাফেয়ীদের সম্পর্কে ইমাম গাযযালী الوسيط। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়ার সময়ে—সারা বছরের নয়—দেশের লোকদের বেশীর ভাগ খাদ্য যা হবে, তাই দিতে হবে। আর الوجيز। গ্রন্থে লিখেছেন, ঈদুল ফিতরের দিনে দেশের বেশীর ভাগ লোকের যে খাদ্য থাকে, তাই দিতে হবে।[২]

মালিকী মাযহাবের লোকেরা শর্ত করেছেন যে, সাধারণ ও বেশীর ভাগ খাদ্যশস্য হতে হবে সীমিতভাবে এ নয় প্রকারের খাদ্যের মধ্যে বার্লি, খেজুর, কিশমিশ, গম, যাররা, ছোলমুক্ত যব, চাল, বাজরা ও পনির। যখন এই নয়টি বা এর কোন কোনটি পাওয়া যাবে আর খাদ্য হিসেবে তা সমানভাবে গৃহীত হবে, তখন এর মধ্যে যে কোন একটি থেকে ফিত্‌রা দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে—ব্যক্তি যে যেটা ইচ্ছা দিতে পারবে। আর এর মধ্যে কোন একটি প্রাধান্য পেলে তা থেকেই দিতে হবে। যেমন কোন একটি এককভাবে প্রাধান্য পেয়ে থাকলে, তা-ই দিতে হবে। যদি তার পাওয়া যায় বা তার কোন কোনটি পাওয়া যায়—কিন্তু তা ছাড়া অন্যটাই যদি বেশী খাওয়া হয়, তাহলে সেটি দেয়াই নির্দিষ্ট উত্তমকে গ্রহণ করার দিক দিয়ে।

আমি কিন্তু এসব খুঁটিনাটি ও দূরবর্তী শাখা-প্রশাখা পর্যায়ের কথাবার্তার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য কোন দলিল পাইনি। এ কারণে উক্ত মাযহাবের কোন কোন সত্যসন্ধানী ব্যক্তি বলেছেন, এ নয়টি ছাড়া অন্য জিনিস যখন খাদ্য হিসেবে গ্রহীত হবে, তখন সেই খাদ্য হিসেবে গৃহীত দ্রব্যই ফিত্‌রা বাবদ দিতে হবে।—সেই নয়টির সব বা তার কোন–কোনটি পাওয়া গেলেও।

---

১. حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٥ ২. الروضه ج ٢ ص ٣٠٥

এ কারণে ফিকাহবিদদের মতে গোশত, দুগ্ধ ও এ ধরনের জিনিস খাদ্য হয়ে থাকলে তা দেয়াও জায়েয হবে। তখন তা ওজন করে দিতে হবে। তবে ছাতু দেয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

মালিকী মতের লোকেরা এ পর্যায়ে একটি বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। তা হল, ব্যক্তি যদি নিম্নমানের খাবার গ্রহণ করে তার অক্ষমতার দরুন, তাহলে সেই খাদ্য থেকে ফিত্‌রা দেয়া জায়েয হবে। এতে কোন দ্বিমত নেই। আর যদি সে কার্পণ্য ও অর্থ লোভের দরুন এরূপ করে, তাহলে তা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয হবে। যদি তার হজম শক্তির কারণে অথবা তার অভ্যাসের দরুন এরূপ হয়, যেমন মরুবাসী শহরে গিয়েও নিম্নমানের গম شعير খায়, অথচ শহরবাসীরা খায় قمح উচ্চমানের গম। এরূপ অবস্থায় মতভেদ রয়েছে। তাতে নির্ভরযোগ্য কথা হল তার নিজের খাদ্য—যা-ই হোক—তা দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করা জায়েয হবে।[১]

শাফেয়ীদের মতে যেসব শস্যদানা ও ফলে 'ওশর' ধার্য হয়—যা কেবল ঠেকায় পড়ে নয়, ইচ্ছামূলকভাবে ও সাধারণ অবস্থায় খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে, তাই ফিত্‌রা হিসেবে দেয়ার যোগ্য। ইমাম শাফেয়ী থেকে তাঁর একটি প্রাচীন কথা এই বর্ণিত হয়েছে ঃ

ছোলাযুক্ত ভুট্টা, পিঁয়াজ ফিত্‌রা হিসেবে দেয়া জায়েয হবে না। তবে প্রসিদ্ধ মত প্রথমটি।

পনির সম্পর্কে তারা স্থির নিশ্চিত নন। নববী বলেছেন, ফিত্‌রা হিসেবে তা দেয়া জায়েয হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সে বিষয়ে যে হাদীস এসেছে তা সহীহ এবং তার প্রতিবাদী কিছু নেই।

সহীহতম কথা হচ্ছে, দুগ্ধ ও পনির একই অর্থের। কিন্তু ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পনির থেকে মাখন টেনে নেয়া হয়েছে, তা দেয়া জায়েয হবে না, যেমন জায়েয হবে না লবণাক্ত পনির দেয়া যা বেশী লবনের দরুন খারাপ হয়ে গেছে। ঘুণে ধরা ও দোষযুক্ত শস্যদানাও দেয়া যাবে না।

যে সব দ্রব্য ফিত্‌রা বাবদ দেয়া জায়েয, তা ওয়াজিব হওয়ার তিনটা দিক রয়েছে। জমহুরের মতে তার মধ্যে সহীহতম কথা হচ্ছে, দেশের সাধারণ ও বেশীর ভাগ খাদ্য যা দ্বিতীয় ব্যক্তির নিজের খাদ্য। আর তৃতীয় দিক হচ্ছে, উক্ত জিনিসগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবে।

ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ব্যক্তির খাদ্য কিংবা দেশের খাদ্য বাধ্যতামূলকভাবে চিহ্নিত হলে কেউ যদি তার চেয়ে নিম্নমানের খাদ্য দেয় তা হলে তা জায়েয হবে না। তবে উচ্চমানের দিলে তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয হবে।

---

১. الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج اص ٥٠٦ - ٥٠٧

আর যদি ব্যক্তির নিজের খাদ্য গণ্য করি, আর দেখি যে, তার তো بر (উন্নতমানের গম) খাওয়া উচিত; কিন্তু সে কার্পণ্যের কারণে নিম্নমানের গম খায়, তাহলে তার সেই উন্নতমানের গমই দেয়া উচিত। আর অবস্থার কারণে যদি নিম্নমানের গমই তার জন্যে শোভন হয়ে থাকে, কিন্তু সে বিলাসিতাস্বরূপ উন্নতমানের গম খেতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সহীহ মত হচ্ছে, নিম্নমানেরটা দেয়াই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। আর দ্বিতীয় মতে উন্নত মানেরটাই নির্দিষ্ট করতে হবে।[১]

যদি দেশের বেশীর ভাগ লোকের খাদ্য বাধ্যতামূলক করে দিই আর সেখানকার লোকেরা বহু প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে যে, তার মধ্যে কোন একটাকে প্রধান 'খাদ্য'রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেখানকার লোকেরা যেটা ইচ্ছা দিতে পারে। তবে যেটা উন্নতমানের সেটা দেয়াই উত্তম।[২]

ইমাম আহমাদের মাযাহাব হচ্ছে, যে পাঁচ প্রকারের খাদ্যের নাম হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে, তা পাওয়া সম্ভব হলে তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু দেয়া আদৌ জায়েয নয়। যেটি দেবে সেটি দেশের লোকদের খাদ্য হোক আর না-ই হোক।[৩]

ইমাম আবূ হানীফা ও আহমাদের মতে সূক্ষ্ম আটা ও ছাতু দেয়াও জায়েয। কেননা তাও খাওয়া হয়। তা পেলে গরীব মিসকীনরা উপকৃত হতে পারে। আটা পেষা চাক্কির মজুরী হিসেবেও তা দেয়া যেতে পারে।[৪]

যা বোঝা যায়, নবী করীম (স) যেসব জিনিসের উল্লেখ করেছেন, ওই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেননা তখনকার সময়ে সেগুলোই ছিল আরব পরিবেশের সাধারণ খাদ্য। এখন যদি কোন দেশের লোক কেবল চাল খেয়েই জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে থাকে—যেমন জাপান-এশিয়া এলাকার লোকদের অবস্থা। তাদের প্রকৃতি তাদের সেই খাদ্য থেকেই গড়ে ওঠেছে, অতএব তা থেকেই তাদের ফিত্‌রা দেয়া হবে। আর কোন দেশের লোকেরা যদি ذرة খাদ্যে জীবন ধারণ করতে থাকে—যেমন মিশরীয় রীফ তাদের উচিত হচ্ছে সেই খাদ্য থেকেই ফিত্‌রা দেয়া; অতএব আমার দৃষ্টিতে এ মতটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দেশের জনগণের সাধারণ খাদ্য দিয়েই তার ফিত্‌রা আদায় করবে অথবা তার নিজের সাধারণ খাদ্য যদি দেশের সাধারণ খাদ্য থেকে উন্নতমানের হয়, তাহলে তা থেকেই ফিত্‌রা দেবে।

ইবনে হাজমের মতে খেজুর ও شعير (গম বা বার্লি) ছাড়া অন্য কোন জিনিস আদৌ জায়েয হবে না। কিশমিশ, قمح, মিহি আটা, পনির ইত্যাদি কোন কিছুই নয়। এ কথার দলিল দিতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং এর বিপরীত মতের সব হাদীসই তিনি 'রদ্দ' করেছেন। তার মতের বিরোধী লোকদের তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এটাই তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসও বটে।[৫]

---

১. الروضة للنووى ج ٢ ص ٣٠٢ ২. ঐ ص ٣٠٥
৩. المغنى السابق ج ٣ ص ٦٢ ৪. ঐ ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃ.
৫. المحلى ج ٦ ص ١١٨ ومابعدها

তিনি যেসব হাদীস দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে ইবনে মুজলিজ থেকে। তাঁর সনদে বর্ণিত একটি হল; তিনি বলেছেন : 'আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম : আল্লাহ্ তো অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছেন ব্যাপারটি। بر (উন্নত মানের গম) কি খেজুরের তুলনায় উত্তম—সাদকায়ে ফিতর দেয়ার জন্যে ? তিনি তাঁকে বললেন : আমাদের সঙ্গীরা একটা পন্থা অনুসরণ করেছেন, আমিও সেই পন্থা অনুসরণ করা পসন্দ করি।[১]

একজন সাহাবীর এ উক্তিটিকে দলিল হিসেবে উপস্থাপিত করে ইবনে হাজম খুব বাড়াবাড়ি করেছেন বলতে হবে। এমন কি তিনি এটাকে সাহাবীদের ইজমারূপেও গণ্য করেছেন অথচ তার বিপরীত মতের সমর্থনে সাহাবিগণের বিপুল সংখ্যক উক্তি বা মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে হাজমের উক্ত মতের ওপর আল্লামা শায়খ আহমদ শাকের যে টীকা লিখেছেন 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থের ওপর, এখানে তার উল্লেখ করাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন :

ফিত্‌রার যাকাত পর্যায়ে যত হাদীসই উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোর সূত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলেই তার তাৎপর্য বোঝা যাবে যে, সাহাবিগণ (রা)-এর এসব উক্তিতে শব্দের বিভিন্নতা রয়েছে। একথাও জানা যাবে যে, ইবনে হাজম যে কেবলমাত্র খেজুর ও বার্লি ছাড়া অন্য কিছু ফিত্‌রা বাবদ দেয়া আদৌ সমর্থন করছেন না তাঁর সপক্ষে সত্যই কোন দলিল নেই। হযরত মুয়াবিয়া সাহাবিগণের উপস্থিতিতে এক ছা' পরিমাণ বার্লি ইত্যাদির বদলে সিরীয় গমের দুই 'মদ্দ' পরিমাণ দেয়া উত্তম বলে মনে করলেন অথচ তাঁদের কেউই এ বার্লির পরিবর্তে উন্নত মানের গম দেয়ার কথায় আপত্তি জানালেন না। হযরত আবূ সায়ীদ শুধু পরিমাণটার ওপর আপত্তি করেছিলেন এবং উন্নতমানের গম ও এক ছা' পরিমাণ দেয়াটাকেই সমর্থন করেছেন। ইবনে উমর (রা) নিজে তো বিশেষভাবে সেই জিনিস দিয়েই ফিত্‌রা আদায় করতেন যা দিয়ে তিনি আদায় করেছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে। সেই জিনিস ছাড়া অন্য কিছু দিতে তিনি কখনও আপত্তি করেন নি। তিনি যদি লোকদেরই 'আমল' বাতিল মনে করতেন—তারা তো সাহাবী ও তাবেয়ীনই ছিলেন—তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানাতেন ও নিষেধ করতেন। তিনি তো এ ধরনের বহু ব্যাপারেই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন কেবল বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যেই নয়, রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের তীব্র আগ্রহে। যেমন তিনি সে সব স্থানে যেতে ও অবস্থান করেছিলেন সেসব স্থানে স্বয়ং রাসূলে করীম (স) গেছেন ও অবস্থান করেছেন অথচ কোন একজন মুসলমানও তা ওয়াজিব বলে মনে করেন নি। ফিত্‌রা ওয়াজিব করা হয়েছে ঈদের দিনে গরীব জনগণের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে বেড়ানো থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে—যেহেতু এ দিন ধনী লোকরা নিজেদেরে ধনমাল ও পরিবার-পরিজন নিয়ে খুবই আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্বভাবে চিন্তা ভাবনা করা আবশ্যক যে, সে কি কোন গরীব ব্যক্তিকে এক ছা' পরিমাণ খেজুর বা এক ছা' পরিমাণ বার্লি দিয়ে ভিক্ষা থেকে বিরত

---

১. المحلى ج ٦ ص ١١٨ ومابعدها٧٢١।

রাখতে পারে ?.....এ দিনে.... এ দেশে ? গরীব ব্যক্তি এ দুটি নিয়ে কি করতে পারে ? ....পারে শুধু এই যে, সে দুটি কম-সে-কম মূল্যে কে ক্রয় করবে তাই তালাশ করে বেড়াবে, যেন সে তার ও তার সন্তানের জন্যে খাদ্য ক্রয় করতে পারে।[১]

মূল্য প্রদান

তিনজন ইমাম ফিত্‌রার যাকাত ও অন্যান্য সব যাকাতেই মূল জিনিসের মূল্য দেয়া জায়েয মনে করেন নি।

ইমাম আহমাদকে সাদকায়ে ফিতর বাবদ পয়সা প্রদান করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি ভয় করছি যে, তাতে আদায় হবে না। তাছাড়া তা রাসূল (স)-এর সুন্নাতের পরিপন্থীও।

তাঁকে বলা হল, লোকেরা বলে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ মূল্য গ্রহণ করতেন।

বললেন ঃ এ লোকেরা তো দেখছি রাসূল (স)-এর কথাকে বাদ দিয়ে অমুক-অমুকের কথাকে দলিল হিসেবে নিচ্ছে। ইবনে উমর বলেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স) ফরয (ধার্য করেছেন .....হাদীস) আর আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং মেনে চল রাসূলকে।[২]

এর অর্থ, তিনি দ্রব্যের মূল্য প্রদানকে রাসূলের বিরোধিতা মনে করতেন। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর কথাও তাই।[৩]

ইবনে হাজমও এরূপ কথাই বলেছেন ঃ মূলত দ্রব্যের মূল্য প্রদানে ফিত্‌রা আদায় হবে না। কেননা তা রাসূলে করীম (স)-এর ধার্য করা জিনিস ছাড়া অন্য কিছু। তবে জনগণের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্য দেয়া জায়েয হবে কেবলমাত্র পারস্পরিক সম্মতি-সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আর যাকাতের—ফিত্‌রার—নির্দিষ্ট কোন মালি নেই বলে তার অনুমতি বা সম্মতি পাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।[৪]

সওরী, আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গিগণ বলেছেন ঃ মূল্য প্রদান জায়েয। উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও হাসানুল বসরী থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে।[৫]

'বাসরায় অবস্থানরত (গর্ভনর) আদীর প্রতি লেখা উমর ইবনে আবদুল আজিজের চিঠি পড়তে আমি শুনেছিঃ 'দিওয়ানভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি থেকে তাদের দানসমূহ থেকে অর্ধ দিরহাম গ্রহণ করা হবে।[৬]

হাসানুল বসরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ইবনে আবূ শাইবা আউন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সাদকায়ে ফিত্‌র আদায়ে পয়সা (নগদ মূল্য) দেয়ায় কোন দোষ নেই।[৭]

---

১. هامش المحلى ج ٦ ص ١٣١ – ١٣٢ ২. النساء - ٥٩ ৩. المغنى ج ٣ ص ٦٥
৪. المحلى ج ٦ ص ١٣٧ ৫. المغنى ج ٣ ص ٦٥, المحلى – المغنى গ্রন্থে লিখিত রয়েছে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ থেকে তা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ৬. مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٣٧ – ٣٨ ৭. مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٣٧ – ٣٨

আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি লোকদের (সম্ভবত সাহাবীদের) এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁরা রমযানের সাদকা খাদ্যের মূল্য প্রদান করে আদায় করতেন।[১]

আতা থেকে বর্ণিত, তিনি সাদকায়ে ফিত্‌র বাবদ একটি রৌপ্য মুদ্রা দিতেন।[২]

ক. নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'এ দিন মিসকীনদের সচ্ছল বানিয়ে দাও' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মূল্য দিলেও তাদের সচ্ছল বানাবার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় যেমন খাদ্যবস্তু দিলে তা হয় । আর অনক সময় মূল্য দেয়াটা উত্তমও হয়। কেননা ফিত্‌রা বাবদ পাওয়া বিপুল খাদ্য সম্ভার ফকীর মিসকীনের কাছে জমা হলে তা বিক্রয় করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে অথচ নগদ পয়সা পেলে সে তার দ্বারা প্রয়োজন মত খাদ্যবস্তু ও অন্য দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

খ. ইবনে মুনযিরের কথা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে মূল্য দেয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে। খোদ সাহাবিগণই অর্ধ ছা' উন্নত মানের গম দেয়া জায়েয বলে মত দিয়েছেন। কেননা তাঁরা তাকে এক ছা' পরিমাণ খেজুর বা বার্লির মূল্য হিসেবে বিকল্প মনে করেছেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন ঃ আমি মনে করি, সিরীয় গমের দুই 'মদ্দ' পরিমাণ এক ছা' খেজুরের বদল হতে পারে।

গ. আমাদের এ যুগের দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেও এটাই সহজ মনে হবে। বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশ ও এলাকাসমূহে তো নগদ পয়সাই হয় বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম। অনেক দেশে—অনেক শহরে এবং অনেক সময়ই তা গরীব লোকদের জন্যে খুবই সুবিধাজনক হয়।

আমার যা মনে হয়, নবী করীম (স) ফিত্‌রার যাকাত দেয়ার জন্যে খাদ্যবস্তু দেয়া নির্ধারিত করেছেন দুটি কারণে ঃ প্রথম সেই সময়কার আরবে নগদ অর্থ ছিল বিরল। ফলে খাদ্যবস্তু দেয়াটাই ছিল লোকদের পক্ষে সহজ। আর দ্বিতীয়, নগদ মূল্যের ক্রয়ক্ষমতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এক ছা পরিমাণ খাদ্য সেরূপ নয়। তা মানবীয় প্রয়োজন খুব সীমিতভাবে পূরণ করতে পারে মাত্র। সেকালে খাদ্যসষ্য দেয়া যেমন দাতার পক্ষে সহজতর ছিল, গ্রহণকারীর পক্ষেও তা ছিল আধিক উপকারী (একালে নগদমূল্য দেয়াটা ঠিক তেমনি)। আল্লাহ্‌ই সঠিক কথা ভালো জানেন।

যাকাত আলোচনায় 'যাকাত আদায়ের পন্থা' পর্যায়ে প্রদান সম্পর্কে আমি বিস্তাবিতভাবে আলোচনা করেছি। তা আবার দেখে নেয়া যেতে পারে।

মূল্য প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াদি

নগদ মূল্য প্রদানের সাথে কতগুলো বিষয় জড়িত। হানাফী আলিমগণ তার উল্লেখ করেছেন।

---

১. مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٣٧ – ٣٨

২. مصنف ابن ابى شيبه ج ٤ ص ٣٧ – ٣٨

প্রথম, মূল্য প্রদান অর্থ গম অথবা বার্লি কিংবা খেজুরের মূল্যদান। এ তিনটির যে-কোন একটির মূল্য দেয়া যেতে পারে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফের মত অনুযায়ী আর ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র গমের মূল্যই দেয়া যাবে।[১]

আমার বিবেচনায় হচ্ছে, দেশের সাধারণ খাদ্যশস্যের এক ছা' পরিমাণের মূল্যদান। শস্যটা মধ্যম মানের হওয়া উচিত। আর উত্তম মানের হলে তো আরও উত্তম।

দ্বিতীয়, হাদীসে যে সব জিনিসের উল্লেখ হয়েছে, মূল্য হিসেবে তার মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় করে ফিত্রা দেয়া জায়েয হবে না যেমন গমের মূল্য হিসেবে গম দেয়া জায়েয নয়,—এভাবে যে, মধ্যম মানের এক ছা' পরিমাণের মূল্য বাবদ অর্ধ ছা' উত্তমমানের গম দেয়া যাবে না। তেমনি মূল্য হিসেবে গমের পরিবর্তে খেজুর বা বার্লি দেয়াও জায়েয হবে না বরং মূল জিনিসটির মূল্যটা দিতে হবে। অবশিষ্ট দ্রব্যাদি সম্পর্কেও এরই ভিত্তিতে ধারণা করতে হবে। কেন'না মূল্য গণ্য হবে যেসব জিনিসের উল্লেখ হাদীসে হয়নি, তার দ্বারা।[২]

তৃতীয়, হানাফীদের মধ্যে—মূল্য প্রদান না হাদীসে উল্লিখিত দ্রব্য দিয়ে ফিত্রা আদায় করা—এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম তা নিয়ে মতপার্তক্য রয়েছে।

তাদের কেউ বলেছেন, গম দেয়া সর্বাবস্থায় উত্তম। তা কঠিন কষ্টের সময় হোক কিংবা অন্য কিছু। কেন'না তাতে সুন্নাতের সাথে সাদৃশ্য ও সমতা রক্ষা করা হবে।

অন্যদের কথা হচ্ছে, সময়টা যদি খুব কষ্টের ও খাদ্যাভাবের হয়, তাহলে তখন মূল খাদ্যটা দেয়াই উত্তম। আর প্রশস্ততা ও সচ্ছলতাকালে মূল্য দেয়া উত্তম। কেননা তা গরীব মানুষের প্রয়োজন পূরণে অধিক সক্ষম।

এ থেকে আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উত্তম সাব্যস্ত করার ভিত্তি হচ্ছে গরীব ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌টা দিলে অধিক সুবিধাজনক হয়, সেই জিনিসটি দেয়া। যদি খাদ্যশস্য দিলে মূল্যের তুলনায় তার পক্ষে অধিক ভাল হয়, তাহলে সেটি দেয়া উত্তম। যেমন দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের সময় তা ভাল। আর নগদ পয়সা পেলে তার যদি বেশী সুবিধা হয়, তাহলে তাই দেয়া উত্তম।

হিসেবে গরীব ব্যক্তির একার সুবিধাটা না দেখে গোটা পরিবারের সুবিধাটার বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কেননা দেখা গেছে, অনেক পারিবারিক দায়িত্বসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তি নগদ পয়সা নিয়ে তা নিজের বাজে অভ্যাসে ব্যয় করে ফেলে অথচ তখন তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি হয়ত একবেলা খাবার থেকেও বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এরূপ অবস্থায় খাদ্যশস্য দেয়াই অধিক ভালো।

---

১. الدر المختار وحاشية

২. رد المختار ج ٢ ص ٨٠

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফিত্‌রা কখন ওয়াজিব হয় এবং তা কখন প্রদান করতে হবে

ফিত্‌রা কখন ওয়াজিব হয়

মুসলমানগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, রমযানের রোযা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই ফিতরা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। ইবনে উমর (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীস 'রমযানে ফিত্‌রার যাকাত রাসূলে করীম (স) ফরয (ধার্য) করেছেন। এটাই তার বড় দলিল। ... ওয়াজিব হওয়ার সঠিক সময় নির্ধারণে ফিকাহবিদদের মত বিভিন্ন প্রকারের। ইমাম শায়েফী, আহমাদ, ইসহাক, সওরী এবং একটি বর্ণনায় ইমাম মালিকের মত হচ্ছে, রমযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিত্‌রা ওয়াজিব হয়। কেননা তা রোযাদারের পবিত্রতা বিধানের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব করা হয়েছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে রোযাও শেষ হয়ে যায়। অতএব তখনই তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীরা, লাইস, আবূ সওর এবং মালিকের দুটো বর্ণনার একটির বক্তব্য হচ্ছে, ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিত্‌রা ওয়াজিব হয়। কেননা তা এমন নৈকট্য মাধ্যম ঈদের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই তা ঈদের দিনের আগে হতে পারে না—যেমন কুরবানী ঈদুল আযহার দিনেই করতে হয়।[১]

আসলে ব্যাপারটি সহজবোধ্য। পার্থক্যের ফলশ্রুতি প্রকাশিত হয় রোযার শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর এবং ঈদের দিনের সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে জন্মগ্রহণকারী শিশুর ব্যাপারে,—তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব হবে কি-না, এ নিয়ে। অনুরূপভাবে 'শরীয়াত পালনে বাধ্য' المكلف। ব্যক্তি যদি উক্ত সময় মৃত্যুবরণ করে তবে তার ব্যাপারেও।[২]

কখন প্রদান করা হবে

বুখারী ও মুসলিম ইবনে উমর (রা)-থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُوَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ -

রাসূলে করীম (স) লোকদের নামাযের জন্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই ফিত্‌রা দিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে নামায অর্থ ঈদের নামায

---

১. بداية المجتهد ج اص ٢٧٣ .২. المغنى ج ٣ ص ٦٧–٦٨ .১

ইক্‌রামা থেকে বর্ণিত, বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার ফিত্‌রা তার নামাযের আগেই পেশ করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَا سْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

প্রকৃত সাফল্য লাভ করল সে, যে পরিশুদ্ধতা গ্রহণ করল এবং তার আল্লাহর নাম স্মরণ করল—অতপর নামায পড়ল।[১]

ইবনে খুজায়মা কাশরী ইবনে আবদুল্লাহ—তার পিতা থেকে—তাঁর দাদা থেকে—এ সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলে করীম (স) কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ আয়াতটি ফিত্‌রার যাকাত পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।[২]

কিন্তু হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কেননা, 'কাসীর, নামের বর্ণনাকারী হাদীসের ইমামগণের বিচারে খুব বেশী 'যয়ীফ' ব্যক্তি বলে চিহ্নিত।[৩] মূলত আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরার। আর ফিত্‌রার যাকাত শরীয়াতবদ্ধ হয়েছে মদীনায় রমযানের রোযা ফরয হওয়া ও দুই ঈদের শরীয়াতবদ্ধ হওয়ার পর। 'ফিত্‌রার যাকাত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর এ কথাটির ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, আয়াতটি ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে ফিত্‌রার যাকাত বোঝায়।' ফিত্‌রার যাকাতের কারণে পারিভাষিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে তা নাযিল হয়নি।

বুখারী ও মুসলিম আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে ঈদুল ফিত্‌রের দিনে এক ছা' পরিমাণ খাদ্য প্রদান করতাম।' বাহ্যত মনে হয়, সারাটি দিন ধরে এ ফিত্‌রা দেয়া হত। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ দিনের প্রথমাংশেই দেয়ার কথা বলেছেন। আর এ সময়টি হচ্ছে ফযরের নামায ও ঈদের নামাযের মধ্যবর্তী সময়। 'ফত্‌হুল বারী' গ্রন্থে তাই লেখা হয়েছে।

শাফেয়ী (র) মনে করেছেন, নামাযের পূর্বে দেয়া শর্ত মুস্তাহাবস্বরূপ আরোপ করা

---

১. سورة الاعلى ص ١٤ – ١٥ ২. نيل الاوطا ج ٤ ص ١٩٥

৩. বরং আবূ দাউদ ও শাফেয়ী বলেছেন, এ লোকটি মিথ্যুক গোষ্ঠীর একজন সদস্য। ইবনে হাব্বান বলেছেন, এ লোকটি খুব বেশী মুনকারুল হাদীস। সে তার পিতা তার দাদা সূত্রে 'মওজু,' হাদীস বর্ণনা করে। কিতাবসমূহে তার উল্লেখ কেবল বিস্ময়বোধ হিসেবেই হতে পারে। তবে তিরমিযী তার হাদীস সহীহ বলেন। যাহ্‌বী উল্লেখ করেছেন, আলিমগণ তিরমিযীর এ সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে তার হাদীস গ্রহণ করবেন না। দেখুনঃ ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٠٦ – ٤٠٧،
المستدرك للحاكم ج ١ص ١٢٨
الجرح والتعديل ج ٢ ص ١٥٤
التاريخ الكبير للبخارى ج ٤ ص ٢١٧،
تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٢١-٤٢٢

হয়েছে। কেননা নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তোমরা এ দিনে মিসকীনদের সচ্ছল বানিয়ে দাও' এর 'এদিন' বলতে সারাটি ঈদের দিন বোঝায়।[১]

জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ মনে করেন, নামাযের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা মাকরূহ। কেননা ফিত্‌রা দানের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে , এ দিনে লোকদের নিকট চাওয়া—ভিক্ষা করা থেকে ফকীর মিসকীনকে বিরত রাখার এবং তাদের সচ্ছল করে দেয়া। কাজেই তা দেয়া বিলম্বিত হলে দিনের একটি অংশে এ 'সচ্ছলকরণ কার্যসূচী' অবাস্তবায়িত থেকে যাবে।[২]

ইবনে হাজম মনে করেন, সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া ও ঈদের নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিত্‌রা দানের সময়টাও শেষ হয়ে যায়। অতএব বিলম্ব করাটা তাঁর মতে হারাম।

বলেছেন, ফিত্‌রা দেয়ার সময় শেষ হওয়ার পূর্বে যে তা দেবে না, তা তার যিম্মায় ও তার মালের ওপর ধার্য হয়েই থাকবে। এটা তার একটা ঋণ বিশেষ। লোকদের জন্যে স্বীকৃত একটা অধিকার, তার মাল থেকে তা দিয়ে দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব। তার মালের মধ্যে তা আটকে রাখা হারাম। অতএব তা আদায় করা তার জন্যে একটা চিরন্তন কর্তব্য হয়ে থাকবে। দিয়ে দিলে মিসকীনদের হক আদায় হয়ে যাবে বটে; তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে না দেয়া—সময় নষ্ট করার দরুন আল্লাহ্‌র হকটা অবশিষ্ট থেকে যাবে। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া ও লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া এ ক্ষতির পূরণ করা তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হবে না।[৩]

শাওকানীর ঝোঁক হচ্ছে এদিকে যে, ঈদের নামাযের পূর্বেই ফিত্‌রা দিয়ে দেয়া ওয়াজিব—হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসের কারণে। তা হল ঃ 'যে তা নামাযের পূর্বে দিয়ে দেবে, তা গৃহীত যাকাত হবে আর যে তা নামাযের পর দেবে, তখন তা হবে একটা সাধারণ দান পর্যায়ের।'

'সাধারণ দান পর্যায়ের' কথাটির অর্থ, সে প্রদানের ফলে ফিত্‌রার যাকাত দানের যে সওয়াব সেই বিশেষ সওয়াব সে পাবে না তার আসল নৈকট্যমূলক গুণসহকারে যা পেত যথাসময়ে প্রদান করলে।

'আর ঈদের দিন গত হয়ে যাওয়ার পর তা দিলে কি হবে ? ... এ পর্যায়ের ইবনে রাসলান বলেছেন, তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। কেননা তা যখন ওয়াজিব যাকাত, তখন তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় ছাড়িয়ে দিলে গুনাহ ওয়াজিব হয়ে পড়ে—যেমন সময় ছাড়িয়ে নামায পড়া হলে হয়।[৪]

'আল-মুগ্‌নী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঈদের দিন ছাড়িয়ে ফিত্‌রা দিলে গুনাহগার হবে এবং তার কাযা করা বাধ্যতামূলক হবে।[৫] ইবনে সীরীন ও নখ্‌য়ী ঈদের দিন অতিবাহিত করার পরও তা দেয়ার রোখসত আছে বলে মত দিয়েছেন, এটা বর্ণনা করা

---

১. فتح البارى ج ٣ ص ٣٧٥ ২. المغنى ج ٣ ص ٦٧ ৩. المحلى ج ٦ ص ١٤٣
৪. نيلالاوطار ج ٤ ص ١٩٥ ৫. نيلالاوطار ج ٤ ص ١٩٥

হয়েছে। ইবনুল মুনযির আহমাদ থেকেও এ কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুন্নাত অনুসরণ করা যে উত্তম, তাতে সন্দেহ নেই।[১] আর তা করতে হলে নামাযের আগেই দিতে হবে।

কিন্তু তা অগ্রিম দেয়া—ঈদের দিনেরও পূর্বে দেয়া সম্পর্কে ইবনে হাজম নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের এক দিন বা তার কম সময়ও আগাম আদায় করা সমীচীন মনে করেন নি। বলেছেন, তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের অল্পক্ষণ পূর্বে দেয়াও মূলত জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২]

এ কথাটির ভিত্তি হচ্ছে, ফিত্‌রা অগ্রিম দেয়াকে তিনি আদৌ জায়েয মনে করেন না। এ মত সাহাবিগণের মতের বিপরীত। তাঁরা আগাম দেয়া জায়েয হওয়ার যে মত দিয়েছেন তা সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত।

বুখারী ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন—'সাহাবিগণ ঈদুল ফিত্‌রের এক বা দুই দিন পূর্বেই 'যাকাতুল ফিত্‌র' দিয়ে দিতেন। আর তাঁরাই হচ্ছেন মুসলমানদের জন্যে শরীয়াত পালনের ক্ষেত্রে আদর্শ, অনুসরণীয় পথ প্রদর্শনকারী। আহমাদও এ মত দিয়েছেন। বলেছেন, উক্ত সময়ের বেশী সময় পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান জায়েয নয় অর্থাৎ একদিন বা দুইদিন পূর্বে।

মালিকীরাও এ মতের ধারক। তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য তিন দিন আগে দেয়াও জায়েয বলেছেন।[৩]

হাম্বলী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, অর্ধমাসকাল পূর্বে দেয়াও জায়েয। আর শাফেয়ী বলেছেন, রমযান মাসের শুরু থেকেই দিতে শুরু করা জায়েয। কেননা ফিত্‌রা ব্যবস্থার কারণই হল রোযা রাখা ও রাখা শেষ করা। এই দুটি কারণের একটি পাওয়া গেলেই তা অগ্রিম দেয়া জায়েয হবে—যেমন নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর অগ্রিম যাকাত দেয়া জায়েয।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, বছরের শুরু থেকেই অগ্রিম দেয়া জায়েয। কেননা এটাও যাকাত পর্যায়ের। অতএব তা মালের যাকাত সদৃশ।

আর যায়দীয়া ফিকাহ্‌র মতে মালের যাকাতের মত দুই বছর পূর্বেও অগ্রিম দেয়া হলে তা জায়েয হবে।[৫]

---

১. দরদীর الشرح الكبير গ্রন্থে এ কথাই বলেছেন। সময়মত না দিলে ফিত্‌রা দেয়ার দায়িত্ব বাতিল হয়ে যায় না। তা তার যিম্মায় থেকে যায়—১ম খণ্ড, ৫০৮ পৃ.।

২. المحلى ج ٦ ص ١٤٣ - المغنى ج ٣ ص ٦٧। ইবনে হাজমের এ মত ইমামীয়া ফিকাহ্‌রও মত। ইমাম জাফরের ফিকাহ্ কিতাবে (২য় খণ্ড, ১০৬ পৃ.) তাই লেখা রয়েছে। তিনিও শওয়ালের চাঁদের পূর্বে দেয়া জায়েয মনে করেন নি।

৩. الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٨

৪. المغنى ج ٣ ص ٦٨ - ٦٩ ৫. البحر ج ٢ ص ١٩٦

মালিক ও আহমাদের মত অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং লক্ষ্য হাসিলের খুব নিকটবর্তী। সে লক্ষ্যটি হচ্ছে, মূলত ঈদের দিনে গরীবদের সচ্ছলকরণ।

একমাস পরও তা দেয়া জায়েয হওয়াটা জনগণের জন্যে অবশ্য খুবই সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক। বিশেষ করে রাষ্ট্রই যদি ফিত্‌রা সংগ্রহ কাজের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে। কেননা তা সংগ্রহ করা ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করার সংগঠন গড়ে তুলতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। তা এমনও হতে পারে যে, ঈদের দিনের সূর্যোদয় হল, ঠিক তখনই গরীব লোকদের কাছে তাদের প্রাপ্যটা পৌঁছে গেল। তাতে তারা ঈদের আনন্দ ও সুখ অনুভব বা উপভোগ করতে পারবে—ঠিক অন্যান্য সমস্ত লোকের মত।

কোন ইসলামী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান 'যাকাতুল ফিত্‌রা' আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব পালন করতে গেলে তার জন্যেও এ কথাই অনুসরণীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিত্রা কাদের দেয়া হবে

ফিত্রা মুসলমান গরীবকে দিতে হবে

ইবনে রুশদ লিখেছেন ঃ ফিত্রা কাকে দেয়া হবে, এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে—ফিকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ফিত্রা কেবলমাত্র মুসলিম ফকীর মিস্কীনকেই দেয়া হবে। কেননা নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, '...... তাদের সচ্ছল বানিয়ে দাও।'

যিম্মী মিসকীনদের ব্যাপারে মতানৈক্য

বলেছেন, যিম্মী (অমুসলিম) ফকীর মিস্কীনদের দেয়া জায়েয কিনা। এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত হচ্ছে, তা তাদের জন্যে জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ হ্যাঁ, তাদের জন্যেও তা জায়েয।

এ মতপার্থক্যের কারণ হচ্ছে এ প্রশ্নে যে, তা দেয়া জায়েয হওয়ার ভিত্তি কি শুধু দারিদ্র্য ? না দারিদ্র্য ও মুসলিম হওয়া—উভয়ই ভিত্তি। তাঁরা বলেছেন, যিম্মিদের জন্যে তা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যাঁরা দারিদ্র্যকেই একমাত্র ভিত্তি মনে করেছেন, তাঁরা তাদেরকেও ফিত্রা দেয়া জায়েয বলেছেন। কিছু লোক আবার শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা কেবল সে সব যিম্মীর জন্যে জায়েয, যারা রাহেব—পাদ্রী পর্যায়ের লোক।[১]

ইবনে আবূ শাইবা আবূ মাইসারা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাহেবদেরকে ফিত্রা বা সাদ্কা দিতেন।[২]

আমর ইবনে মাইমুন, আমর ইবনে শারাহ্‌বীল ও মুররাতুল হাযাদানী থেকে বর্ণিত, তাঁরা রাহেবদেরকে ফিত্রা দিতেন।[৩]

আসলে এ হচ্ছে মানবীয় বদান্যতা, ইসলামের ক্ষমাশীল ভাবধারার প্রকাশ। শুধু বিরোধিতাই কারোর প্রতি সদাচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করে না—যদি সে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও যুদ্ধ না করে। তাই ইসলামী পরিবেশে বসবাসকারী সব মানুষকেই ঈদের নির্মল আনন্দে পুরোপুরি অংশীদার করা অবশ্যই কর্তব্য হবে, তারা কারোর বিবেচনায় কাফির হলেও। তবে সে জন্যে শর্ত হচ্ছে প্রথমে মুসলিম ফকীর-মিসকীনদের সচ্ছল বানাতে হবে। তারপর উদ্বৃত্ত থাকলে যিম্মীকে তা দেয়া যাবে।

---

১. بداية المجتهد ج ١ ص ٧٣

২. المصنف ج ٤ ٣٩

৩. المغنى ج ٣ص ٧٨

'যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র' পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

ফিত্‌রাও কি যাকাতের আটটি খাতে বণ্টনীয়

ফিত্‌রা কেবলমাত্র ফকীর ও মিসকীনকেই দিতে হবে, না যাকাতের নির্দিষ্ট আটটি ব্যয় খাতে তা বণ্টন করে খরচ করতে হবে ?... এ একটি প্রশ্ন।

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, মালের যাকাত যে আটটি খাতে ব্যয় করা নিয়ম, ফিত্‌রাও সে খাতসমূহেই ব্যয় করা ওয়াজিব। এ আটটি খাতের উল্লেখ انما الصدقات। সূচক আয়াতে করা হয়েছে। এ আটটি খাতে তা সমানভাবে বণ্টন করতে হবে।[১] ইবনে হাজমের মতও তাই। ফিত্‌রার যাকাতদাতা নিজেই যদি তা বণ্টন করে, তাহলে যাকাত সংস্থায় নিয়োজিত কর্মচারী ও 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম খাতে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। কেননা এ দুটো খাতে যাকাত ব্যয় করা তো রাষ্ট্র প্রধানের কাজ, অন্য কারোর নয়।[২]

ইবনুল কাইয়্যেম এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, সাদকায়ে ফিত্‌র কেবলমাত্র এবং বিশেষভাবে মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করাই ছিল রাসূলে করীম (স)-এর নীতি। এটা তিনি আটটি খাতে মুঠি-মুঠি করে কখনই বণ্টন করেননি। সেরূপ করা কোন নির্দেশও তিনি দেননি। সাহাবীদের মধ্যেও কেউ এরূপ বণ্টন করেননি। তাবেয়ীরাও কেউ না। বরং আমাদের দুটো কথার একটা হচ্ছে, ফিত্‌রা কেবলমাত্র মিসকীন ছাড়া অন্য কাউকে দেয়াই জায়েয নয়

এ মতটি আটখাতের বণ্টন করার মতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[৩]

মালিকীদের মতে, ফিত্‌রা ফকীর মিসকীনদের দেয়া হবে, এ কাজে নিযুক্ত কোন কর্মচারী বা কারোর দিন সন্তুষ্টিকরণের জন্যে কাউকে কিছু দেয়া যাবে না। দাস মুক্তির কাজেও তা ব্যয় করা যাবে না। ঋণগ্রস্ত মুজাহিদ, নিঃস্ব পথিককে তার বাড়ীতে পৌঁছানো ইত্যাদি কোন খাতেই তা ব্যয়িত হবে না; বরং দেয়াই হবে দারিদ্র্যগুণ থাকলে। কোন স্থানে দরিদ্র লোক পাওয়া না গেলে নিকটবর্তী যেখানে গরীব লোক রয়েছে, সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। পাঠানোর খরচ কিন্তু ফিত্‌রা দাতার নিজ থেকে বহন করতে হবে—ফিত্‌রা থেকে নয়। তা ফিত্‌রা থেকে দেয়া হলে এক ছা'র পরিমাণে ঘাটতি পড়বে।[৪]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, এখানে তিনটি মত রয়েছে ঃ

১. আটটি খাতে ফিত্‌রা বণ্টন ওয়াজিব হওয়ার মত কিংবা তাদের মধ্যে যে যে খাতে লোক পাওয়া যাবে তাকে সমান পরিমাণে দিতে হবে। এটা শাফেয়ীদের প্রসিদ্ধ মত।

---

১. المجموع ج ٦ ص ١٤٤ ২. المحلى ج ٦ ص ١٤٣- ١٤٥ ৩. زاد المعاد ج ١

৪. الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٠٨ - ٥٠٩ ص ٢١٥

২. আটটি খাতে ফিত্‌রা বন্টন করা জায়েয হওয়ার মত। আর কেবল মাত্র দরিদ্রজনকে বিশেষভাবে দেয়ার মত। এটা জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত। কেননা সেটা সেই সাদকা যা কুরআনের কথা ঃ 'সাদকাত কেবল মাত্র ফকীর-মিসকীনদের জন্যে .... সাধারণত এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. কেবলমাত্র এবং বিশেষভাবে ফকীরদের দেয়া ওয়াজিব হওয়ার মত। এটা মালিকী মাযহাবের মত—যেমন পূর্বে বলেছি। ইমাম আহ্‌মাদের দুটো মতের একটা এই। ইবনুল কাইয়্যেম এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর উস্তাদ ইবনে তাইমিয়াও।

আল-হাদী, আল-কাসেম এবং আবূ তালেবও এ মতই গ্রহণ করেছেন ঃ ফিত্‌রা কেবলমাত্র ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে—অন্য কোন লোকের মধ্যে নয়। যাকাতের আটটি খাতের কোন একটিতেও নয়। কেননা হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'ফিত্‌রা মিসকীনদের খাদ্য'। আর হাদীস ঃ এ দিনে তাদের সচ্ছল বানিয়ে দাও।'[১]

এ কথার গাম্ভীর্য গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তা ফিত্‌রার যাকাতের প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিসম্পন্নও বটে। তার মৌল লক্ষ্যও তাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়ার এবং প্রয়োজনকালে ও অন্যান্য খাতে তার কল্যাণকর অবদান হতে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি।

তাঁরা যেসব হাদীসের উল্লেখ করেছেন, তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিশেষভাবে সেই দিনের জন্যে ফকীর-মিসকীনদের সচ্ছল বানিয়ে দেয়াই ফিতরার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। অতএব তাদের পাওয়া গেলে অন্যদের ওপর তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য। কিন্তু তা প্রয়োজন ও কল্যাণের দৃষ্টিতে অন্যান্য ব্যয় খাতেও তা ব্যয় করতে নিষেধ করে না। যেমন নবী করীম (স) মালের যাকাত পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন ঃ তা সমাজের ধনীলোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং সেই সমাজেরই দরিদ্র লোকদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়া হবে। কিন্তু এ ঘোষণা কুরআনের যাকাত সংক্রান্ত আয়াতে যে সব খাতের উল্লেখ রয়েছে, তাতে তা ব্যয় করতে নিষেধ করছে না।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের বিবেচনায় উত্তম মত হচ্ছে, ফকীর মিসকীনকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ইসলামী কল্যাণ বিবেচনায় অন্য কিছু গ্রহণীয় বিবেচিত হলে ভিন্ন কথা।

অধিকাংশ ফিকাহবিদের দৃষ্টিতে সহীহ্ মত হচ্ছে—একজন ব্যক্তির জন্যে করণীয় হল সে তার ফিত্‌রা একজন বা বহু কয়েকজন মিসকীনকে দেবে। অনুরূপভাবে একটি সমাজ সংস্থার পক্ষে তাদের ফিত্‌রা একজন মিসকীনকে দেয়াও জায়েব হবে। কেননা দলিলে এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।[২]

কেউ কেউ একজনের ফিত্‌রা অনেক কয়েকজনকে দেয়া অপসন্দ করেছে। কেননা

البحر ج ٢ ص ١٩٧ .٢   نيل الاوطار ج ١ ص ١٩٥ .٢

তাতে হাদীসে দরিদ্র ব্যক্তিদের যে সচ্ছল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হতে পারে না। অনুরূপভাবে বহু লোকের ফিত্‌রা একজন লোককে দিলে তারই মত বা তার চাইতেও অধিক বেশী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্যদের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় অথচ এরূপ অধিক গুরুত্ব দানের কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না।

ফিত্‌রা যাকে দেয়া যাবে না

সাদকায়ে ফিত্‌রা যতক্ষণ পর্যন্ত যাকাত থাকবে, ততক্ষণ তা মালের যাকাত যাদের দেয়া জায়েয নয়, তাদেরকে দেয়া জায়েয হবে না। ইসলামের দুশমন কাফির বা মুর্তাদ অথবা যে লোক তার ফিস্‌ক ফুজুরী দ্বারা মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করে, যে লোক স্বীয় মাল বা উপার্জনের দরুন ধনী অথবা উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শ্রম করে না বলে বেকার—তাছাড়া পিতামাতা, সন্তান—স্ত্রী, এদেরকে ফিত্‌রা দেয়া যাবে না। কেননা মুসলমান যদি এ লোকদের ফিত্‌রা দেয়, তাহলে কার্যত তা নিজেকেই দেয়া হবে।—এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'যাকাত ব্যয়ের খাত' পর্যায়ে আমরা করে এসেছি।

স্থানীয় দরিদ্র ব্যক্তি বেশী অধিকারী

মালের যাকাত স্থানান্তর করা সম্পর্কে আমরা যা বলে এসেছি, এখানেও তাই বলব। তা হচ্ছে, যে স্থানের লোকদের ওপর ফিত্‌রা ওয়াজিব—যেখানে ফিত্‌রাদাতা বসবাস করে, তাদের ফিত্‌রা সেখানকার দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই বিতরণ করতে হবে। তার কারণসমূহও সেখানেই উল্লেখ করে এসেছি। আরও এজন্যে যে, ফিত্‌রার যাকাত বিশেষভাবে দ্রুত সাহায্য দানের ব্যবস্থা—একটা বিশেষ সময়ের জন্যে। আর সময়টা হচ্ছে রমযানের ঈদ, কাজেই পাড়া-প্রতিবেশীরা স্থানীয় লোকেরাই তা পাওয়ার অধিক অধিকারী। তবে তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র না থাকলে ভিন্ন কথা। তখন তা নিকটবর্তী স্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে। মালিকীদের এ মত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'আল-বহর, গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ কোন মহত্তর উদ্দেশ্য ছাড়া স্থানীয় দরিদ্র লোকদের পরিবর্তে অন্যদের মধ্যে ফিত্‌রা বণ্টন করা মাকরূহ।[১]

---

১. البحر الذخار ج ٢ ص ٢٠٢

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত ছাড়া ধন-মালে কোন অধিকার কি স্বীকৃতব্য

- *ধন-মালে যাকাত ছাড়া আরও কোন অধিকার স্বীকৃত না হওয়ার মত।*
- *যাঁরা বলেন যে, ধন-মালে যাকাত ছাড়াও অধিকার আছে তাঁদের মত।*
- *বিরোধের বিষয় নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার দান।*

ধনমালে যাকাত ছাড়াও কোন অধিকার আছে কি

কোন কোন বিষয়ে বহু মতের বিশেষ একটি মত ব্যাপক খ্যাতি ও বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করে—এটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এমন কি অনেকে শেষ পর্যন্ত এ ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, এ পর্যায়ে এটাই একক ও অনুরূপ মত। এ ছাড়া ভিন্ন কোন মতই নেই। তার পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ যতই দুর্বল হোক এবং বলার মত কথা কিছু না-ই থাকে, সে দিকে তখন কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। এ পর্যায়ের একটি মত উল্লেখ্য। মতটি ফিকাহবিদদের মধ্যের শেষের দিকের লোকদের কাছে খুবই ব্যাপকভাবে প্রচারিত। আর তা হচ্ছে, ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার নেই। কেউ তার যাকাত হিসেব করে দিয়ে দিলে সে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেল। তার কাছে আর কিছু দাবি করা যেতে পারে না। এমন কি দ্বীনী ইলমের চর্চকারী বহু লোকের কাছেও এ ব্যাপারটি যেন সর্ববাদীসম্মত চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ঃ

প্রথমত ধন-মালে যাকাত ছাড়াও কোন প্রাপ্য আছে —এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁদের মতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা বলেন—ধন-মালে যাকাত ছাড়াও অধিকার আছে, তাদের মতের বিশ্লেষণ।

এবং তৃতীয়ত, দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধীয় স্থান উন্মুক্তকরণ এবং যেটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, সেটিকে অগ্রাধিকার দান।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধন-মালে যাকাত ছাড়া আরও কিছু অধিকার থাকার বিরোধী মত

বহু সংখ্যক ফিকাহবিদ এ মত গ্রহণ করেছেন যে, ধন-মালের ওপর একমাত্র অধিকার হচ্ছে যাকাত। যে লোক যাকাত দিয়ে দিল, সে তার ধন-মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নিল। তার দায়িত্ব পালিত হল এবং সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তার কাছে আর কিছুই চাওয়া বা দাবী করার সুযোগ থাকতে পারে না। তবে সে নিজে নফল দান-সাদকা করে আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সওয়াব পাওয়ার ও সওয়াবের বিপুলতা লাভের আশায়, তা হলে সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। শেষের দিকে ফিকাহবিদদের কাছে এ মতটাই অধিকতর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এমন কি তাঁরা মনে করে নিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে ভিন্ন কোন মতই নেই।

এ মতের সমর্থনে উপস্থাপিত হাদীসসমূহ

(১) এ মতের ধারকগণ হযরত তালহা (রা) থেকে বর্ণিত ও বুখারী মুসলিম প্রমুখের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হাদীসটির ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করেছেন। তা হচ্ছে, নযদের অধিবাসী এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। তার মাতার চুল বিধ্বস্ত, এলোমেলো, তার আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল কিন্তু কি বলছিল, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। লোকটি শেষ পর্যন্ত রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ রাত দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। বলল ঃ এছাড়াও কি আমার কিছু করণীয় আছে? বললেন ঃ না, তবে তুমি যদি নফল পড় তাহলে সে কথা আলাদা। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ আর রমযান মাসের রোযা। বলল, তা ছাড়াও কি রোযা রাখতে হবে আমাকে ? বললেন ঃ না, তবে তুমি যদি নফল রোযা থাক, তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা। অতঃপর তিনি যাকাতের উল্লেখ করলেন। লোকটি বলল ঃ যাকাত ছাড়াও আমার কিছু দেয় আছে ? বললেন ঃ না, তবে তুমি যদি নফল দান কর, সে আলাদা কথা। তখন লোকটি পিছনে সরে আসতে আসতে বলতে লাগল ঃ আমি এর অতিরিক্তও কিছু করব না আর এর চাইতে কমও করব না। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ লোকটি যা বলছে তা সত্য হলে সে নিশ্চয়ই সফল হবে অথবা বললেন ঃ লোকটি যা বলছে তা সত্যে প্রমাণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

---

১. হাদীসটি তিরমিযী ছাড়া অন্য ছয়খানি গ্রন্থে উদ্ধৃত। جمع الفوائد ج ١ ص ١١ গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে।

(২) অনুরূপ আর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ও বুখারী শরীফে উদ্ধৃত। এক বেদুঈন নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হল। সে বললঃ আমাকে এমন একটা কাজের ধারা বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে দাখিল হতে পারব। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক বানাবে না, ফরয নামায পড়বে, নির্দিষ্ট ধার্যকৃত যাকাত আদায় করবে এবং রমযান মাসের রোযা থাকবে। লোকটি বলল ঃ যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম করে বলছি, এর অধিক কিছু আমি করব না। লোকটি যখন চলে গেল, তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ যে কেউ একজন জান্নাতী লোক দেখতে চায়, সে যেন এ লোকটিকে দেখে।[১]

(৩) তাঁদের আর একটি দলিল হচ্ছে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি। নবী করীম (স) বলেছেন, তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে, তখন বুঝবে তোমার ওপর যা দেয় বর্তিয়েছে তা তুমি দিয়ে ফেলেছ।[২] আর যে লোক তার মালের ওপর ধার্য অধিকার আদায় করল, তার ওপর সে ব্যাপারে কোন হক ধার্য নেই মনে করতে হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে আরও কিছু দেয়ার জন্যে তার কাছে দাবি করা যাবে না।

(৪) হাকিম হযরত জাবির থেকে রাসূলের কথা হিসেবে যা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এ পর্যায়ের আর একটি দলিল। তা হচ্ছে ঃ তুমি যখন তোমার মালের যাকাত আদায় করে দিলে, তখন তুমি তার খারাপ অংশটা তা থেকে দূর করে দিলে।

বস্তুত মালের ওপর যে সব হক-হুকুক ধার্য হয়, তা সব আদায় করে দিয়ে দিলে দুনিয়া ও আখেরাতে মালের খারাপ অংশটা মানুষটি থেকে দূরে সরে যায়।

(৫) হাকিম উম্মে সালমা থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন, তাও একটি দলিল। উম্মে সালমা স্বর্ণালংকার পরতেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এতে কি তা নিষিদ্ধ পুঁজিকরণ হয়? নবী করীম বললেন ঃ তুমি যদি ওর যাকাত দিয়ে দাও তাহলে তা নিষিদ্ধ পুঁজিকরণ হবে না তাতে।[৩]

---

১. তিরমিযী ৯৮–৯৭ كتاب الزكاة ج ٣ ص উদ্ধৃত ترمذ مغ شرح ابن العربى তিনি বলেছেন, হাদীসটি حسن غريب হাকিমও উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন صحيح যাহবী এ কথার যথার্থতা মেনে নিয়েছেন—১মখণ্ড ৩৯০ পৃ. কিন্তু ইবনে হাজার التلخيص। গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ এর সনদ যয়ীফ।

২. ইবনে খুজায়মা ও হাকেম উদ্ধৃত করেছেন, ১মখণ্ড —৩৯০পৃ. বলেছেন, মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ। যাহবী এ কথা সমর্থন করেছেন। ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের (৩য় খণ্ড, ১৭৫পৃ.) বলেছেন ঃ আবূ জুময়া ও বায়হাকী প্রমুখ হাদীসটির موقوف হওয়া—কোন সাহাবীর উক্তি হওয়াটাকে অধিক ঠিক মনে করেছেন। বাজ্জারও সে মত দিয়েছেন। দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মাল —তা থেকে বরকত ধ্বংসকারী এবং পরকালে আযাবের ব্যবস্থাকারী হচ্ছে তা-ই, যা আল্লাহ্‌র অধিকার বিনষ্টকারীর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

৩. হাকিম লিখেছেনঃ (১মখণ্ড, ৩৯০পৃ.) হাদীসটি বুখারীর শর্তের ভিত্তিতে সহীহ। যাবরী তা সমর্থন করেছেন। হাদীসটির সনদে আপত্তি আছে। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় 'অলংকারের যাকাত' পর্যায়ে এ বিষয়ে কথা বলে এসেছি, তা দ্রষ্টব্য।

তার অন্যান্য বর্ণনায় এ কথা রয়েছে ঃ যে মালের পরিমাণ যাকাত হওয়ার যোগ্য হবে তার যাকাত দিয়ে দেয়া হলে তা নিষিদ্ধ পুঁজি হবে না।[১]

এ কথায় একথা প্রমাণিত হয় যে, মাল-সম্পদ পুঁজিকরণের ওপর আযাবের যে সব ধমক এসেছে, তা যাকাত আদায়কারীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। যাকাত ছাড়া মালে অন্য কোন ফরযও যদি থাকত, তাহলে এ আযাবের ধমক থেকে সে নিষ্কৃতি পেত না।

এ মতের কোন কোন লোক উপরিউক্ত আলোচনার পর অতিরিক্ত কথাও বলেছেন। তাঁরা নবী করীম (স) থেকে একটা সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন ঃ ধন-মালের ওপর যাকাত ছাড়া আর কোন হক নেই।[২]

এ সমস্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ এ গ্রহণ করা হয় যে, ধন-মালের ওপর যাকাত ছাড়া আর কোন হক ধার্য নেই। আর প্রথমোক্ত হাদীস দুটো সহীহ্ হাদীসসমূহের অন্যতম। আর যথার্থতার ওপর কোন দোষারোপ নেই।

তৃতীয় হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলা হয়েছে। আর চতুর্থ হাদীসটি সাহাবীর ওপর موقوف—কোন সাহাবীর উক্তি হওয়াটই ঠিক। আর পঞ্চম হাদীসটির সনদে আপত্তি আছে।

তবে যে হাদীসটি 'ধন-মালে যাকাত ছাড়া কোন হক্ক নেই' বলছে, সেটি যারপরনাই রকমের যয়ীফ, প্রত্যাখ্যাত নিঃসন্দেহে। বরং তা ভুল এবং বিকৃত, পরিবর্তিত। সহীহ হাদীস দুটিই তার প্রতিবন্ধক।

বিপরীতধর্মী দলিলসমূহ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য

যে সব হাদীস ধন-মালের ওপর যাকাত ছাড়াও 'হক্' আছে বলে প্রমাণ করছে, উক্ত মতের লোকেরা তার ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন যে, ওগুলোতে মুস্তাহাব হিসেবে যাকাত বহির্ভুত দানের কথা বলা হয়েছে, তা ওয়াজিব নয় এবং বাধ্যতামূলকও নয়।

অথবা তাঁরা বলেছেন, হ্যাঁ, যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে যে হক্ ছিল, যাকাত ফরয

---

১. হাদীসটি আবু দাঊদ কর্তৃক উদ্ধৃত।

২. হাদীসটি ইবনে মাযাহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত। কিন্তু নবরী তাঁর المجموع। গ্রন্থে লিখেছেনঃ হাদীসটি খুবই 'যয়ীফ' অপরিচিত (৫ম খণ্ড ৩৩২ পৃ.)। পূর্বে বায়হাকী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'আমাদের লোকেরা এ হাদীসটি تعليق -এর মধ্যে বর্ণনা করেন। আমি ওর কোন সনদ মুখস্থ করিনি السنن। الكبرى ج ٤ ص ١٨। হাফেয আল এর ওপর আপত্তি তুলেছেন ইবনে মাযাহ্র বর্ণনা দিয়ে যে, তাঁর সুনানে এ ভাষায়ই উদ্ধৃত হয়েছে। তার পুত্র হাফেয আবু জুরয়া উল্লেখ করেছেন ঃ হাদীসটি তাঁর মতে ইবনে মাযাহ্য় এ ভাষায় রয়েছে ঃ ধন-মালে হক আছে যাকাত ছাড়াও তিরমিযীর ভাষাও এই। ইবনে মাযাহ্র কোন কোন সংস্করণে রয়েছে ঃ ধন-মালের যাকাত ছাড়া আর কোন হক নেই। طرح التثريب ج ٤ ص ١٨। তার অর্থ—'নেই' কথাটি হাদীসে লেখকের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে লেখা হয়েছে। পরে এই ভুলটা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আল্লামা শায়খ আহমাদ শাকের (র) التعليق। لاثر। গ্রন্থের তাফসীরে তাবারীর (৩য়খণ্ড, ৩৪৩-৩৪৪ পৃ. আল-মায়ারিফ) লিখেছেনঃ ইবনে মাযাহ্র গ্রন্থে এ ভুলটি সংঘটিত হওয়ার প্রমাণসমূহ এই ঃ

হওয়া পর বাতিল ও মনসুখ হয়ে গেছে পূর্বে যত অধিকার ছিল তা সবই। ঠিক যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ -

'এবং দাও তার হক্ তা কর্তনের দিন।

অথবা তাঁরা তার কোন-না-কোন ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, তা ওয়াজিব হবে নিতান্ত প্রয়োজন কালে। লোকেরা الماعون। সম্পর্কে বলেছেন। কেউ কেউ الماعون।-এর তাফসীর করেছেন 'যাকাত'। কোন কোন সাহাবী থেকে তা বর্ণিত। কিন্তু তাতে যাকাতের পরও কোন হক্ ধার্য হতে পারে, তার প্রমাণ নেই।

তিরমিযী ফাতিমা বিনতে কাইস থেকে রাসূলে করীম (স)-এর কথা হিসেবে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে ঃ

ধন-মালে যাকাত ছাড়াও অধিকার আছে।[১]

তিরমিযী এই হাদীসটিকে 'যয়ীফ' বলেছেন। কেননা এটি আবূ হামজী মাইসুন আল-আওযার আল-কাসসাব সূত্রে বর্ণিত।[২] আর হাদীসবিদদের নজরে লোকটি খুব বেশী যয়ীফ। ফলে তার বর্ণনা দলিল হতে পারে না।

ক. তাবারী উক্ত হাদীসটি (২৫২৭ নম্বর) মূল ইয়াহইয়া ইবনে আদমের সূত্রে—যে সূত্রে ইবনে মাজাহ হাদীসটি নিয়েছেন উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে হাদীসটির ভাষা হচ্ছে ঃ ধন-মালের যাকাত ছাড়াও হক্ রয়েছে।

খ. ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা উভয় থেকে নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নাবলিসী তাঁর ذخائرالمواريث ১১৬৯৯ গ্রন্থে তাই করেছেন। একই হাদীস হিসেবে উভয়ের প্রতি নিসবাত করেছেন।

গ. বায়হাকীর কথা—যেমন পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে—আমি এর সনদ মুখস্থ করিনি—ইবনে মাজাতে যদি এ ভাষায়ই উদ্ধৃত যাকাত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ বলতেন না। নববীর কথা—পরিচিত নয়—এ পর্যায়েরই আবূ জুরয়া যা বলেছেন, শায়খ শাকের সেদিকে ইঙ্গিত করেন নি। সম্ভবত তিনি তা জানতেই পরেন নি।

'হাদীসটিতে ওলট পালট (اضطراب) হয়েছে, বলার পরিবর্তে উপরিউক্ত বিশ্লেষণই অধিক যথার্থ ও সঠিক। কেননা দেখা যায় হাদীসটি একই সূত্রে দুই রকম পরস্পর বিপরীত ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। এটাই প্রচারিত।

১. এ হাদীসটি সম্পর্কে তিরমিযী বলেছেন ঃ এটির সনদ ওরূপ নয়। আবূ মামুন আল-আওয়ার হাদীসটিকে যয়ীফ করেছে। তাবারীও এ হাদীসটি এনেছেন (৩য় খণ্ড, ১৭৬-১৭৭পৃ.) ২৫২৭ ও ২৫৩০ উভয় হাদীসে। দারেমী (১ম খণ্ড, ৩৮৫পৃ.) ও ইবনে মাজা ১৭৮৬ ইয়াহইয়া ইবনে আদম সূত্রে। আর বায়হাকী السنن الكبرى। (৪র্থ খণ্ড, ৮৪পৃ.)

২. ইবনে হাজার التهذيب। গ্রন্থে এবং বুখারী التاريخ الكبير ج ٤ ص ٣٤٢। তে। আর ইবনে আবূ হাতিম الجرح والتعديل ج ٤ ص ٢٣٥ - ٢٣٦

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধন-মালের যাকাত ছাড়া অধিকার আছে–এই কথায় বিশ্বাসীদের মত

সাহাবী ও তাবেয়ীনের সময় থেকেই কিছু লোক এ মত পোষণ করে আসছেন যে, লোকদের ধন-মালে যাকাত ছাড়াও অধিকার রয়েছে। হযরত উমর, আলী, আবূযর আয়েশা, ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা, হাসান ইবনে আলী এবং ফাতিমা বিনতে কাইস প্রমুখ সাহাবী (রা) এ মত পোষণ করতেন।

আর শবী, মুজাহিদ, তায়ূস, আতা প্রমুখ তাবেয়ীরও এ ব্যাপারে এ মতই ছিল।

তাঁদের দলিল

তাঁরা দলিল হিসেবে প্রথমত পেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলার এ আয়াত ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْ هَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَا ئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ - وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَا كِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ - وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ - وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِ هِمْ اِذَا عَاهَدُوْا - وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَ قُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমরা মুখ করে থাকবে এটাই কোন পূণ্যময় কাজ নয়। প্রকৃত পূণ্যময় কাজ সে করেছে, যে ঈমান এসেছে আল্লাহ্র প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতার প্রতি, কিতাবের প্রতি, নবীগণের প্রতি এবং দিয়েছে মাল তাঁরই ভালোবাসায় নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, প্রার্থী ভিক্ষুক ও দাসদের জন্যে আর কায়েম করেছে নামায, দিয়েছে যাকাত এবং নিজেদের ওয়াদা পূরণকারী হয়েছে যখন তারা ওয়াদা করেছে আর ধৈর্যধারণকারী হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যকালে ও অভাব অনটনের সময়ে এবং ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। এ লোকেরাই সত্যতা প্রমাণকারী এবং এরাই মুত্তাকী।

তিরমিযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) নিজে এ আয়াত কয়টি পাঠ করে উল্লিখিত বিধানের দলিল পেশ করেছেন। ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি অথবা কেউ রাসূলে করীম (স) কে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ

اِنَّ فِى لْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ -

নিশ্চয়ই ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক রয়েছে।

পরে সূরা আল-বাকারার উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেছেন।

এ হাদীসে যদি কোন দুর্বলতা থেকে থাকে—যেমন তিরমিযী বলেছেন—তাহলেও উপরিউক্ত আয়াতটি তাকে শক্তিশালী করে তুলছে। দাবিটাকে অনস্বীকার্য বানাচ্ছে। এ আয়াতই এককভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের দলিল। কেননা আয়াতে পরম পূণ্যময় কাজের البر। শাখা ও উপকরণ বানানো হয়েছে 'তাঁর ভালোবাসায় নিকটাত্মীয় ইয়াতীম মিসকীন নিঃস্ব পথিক ইত্যাদিকে অর্থদানের কাজকে।' এরই ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করার কথা। বলার ভঙ্গীরই দুটো আলাদা জিনিসরূপে দাঁড় করে দিচ্ছে। ফলে প্রমাণিত হল, প্রথমে মাল দান ও পরে যাকাত দান—এক নয় ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কুরতুবী উক্ত হাদীসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেনঃ হাদীসটিতে আপত্তি থাকলেও তার বক্তব্য যে সহীহ তা মূল আয়াতে বলা 'এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান' কথাটিই প্রমাণ করছে। এখানে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এটা প্রমাণ করছে ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ -

আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় মাল দান ও ফরয যাকাত—এ দুটো জিনিস। অন্যথায় একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়।

(আর কুরআনে তা শোভন বা সম্ভব নয়)[১]

---

১. তাবারী লিখেছেন, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ধন-মালের যাকাত ছাড়াও ফরয হিসেবে দান করার কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি? বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছে ঃ ধন-মালের যাকাত ছাড়াও এমন সব অধিকার আছে যা দেয়া ওয়াজিব। তাঁরা উপরিউক্ত আয়াতকে দলিলরূপে পেশ করেছেন। আল্লাহই যখন বললেন ঃ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى এবং অন্যান্য যার যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন এ সাথে তার পরে বলেছেন ঃ 'নামায কায়েম করে ও যাকাত দিয়েছে'। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মুমিনদের পরিচিতিস্বরূপ নিকটাত্মীয় ও অন্যান্যদের যে মালদানের কথা বলা হয়েছে, তা সেই যাকাত নয় যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে শেষে। কেননা এ যদি একই মাল হতো তাহলে এভাবে দু'বার বলার কোন অর্থ হতো না। তারা এও বলেছেন ঃ আল্লাহ অর্থহীন কোন কথা বলবেন, এটা যখন জায়েয নয়। তখন আমরা জানত পারলাম যে, প্রথম মাল দানের কথাটি যাকাত থেকে ভিন্নতরও স্বতন্ত্র একটা জিনিস। আর তারপরে যে যাকাতের কথা হয়েছে তা ভিন্ন জিনিস।

তাঁরা এও বলেছেন ঃ পরন্তু আমরা যা বলেছি, ব্যাখ্যাকারগণ তার সত্যতা স্বীকার করেছেন। অন্যরা বলেছেন ঃ প্রথমে যে মালের কথা বলা হয়েছে তা যাকাত।... ইমাম তাবারীর উক্ত কথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি প্রথম কথাটি সমর্থনের প্রবণতা রাখেন।

প্রথমে যে দান করার—দেয়ার কথা—বলা হয়েছে তা নিতান্ত নফল দান, আত্মীয়তা রক্ষা করার দান, ওয়াজিব নয়, এরূপ কথা বলা যেতে পারে না। কেননা আয়াতটি হচ্ছে বাহ্যিক প্রকাশ ও সুরত ধারণকারী ইয়াহুদীদের নীতির প্রতিবাদ এবং প্রকৃত সত্য পরম পুণ্য কাজ ও সত্য দ্বীন বর্ণনা। এরূপ ক্ষেত্রে কেবল মৌলিক বিষয়েরই অবতারণা করা শোভন, সম্পূরক বিষয়াদি বলার ক্ষেত্র এটা নয়। কেবল ফরয কাজের কথাই বলতে হয়, নফল, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়ের কথা নয়। প্রকৃত بر পরম পুণ্যময় কাজেরও ব্যাখ্যাস্বরূপ। আয়াতটিতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে, ফেরেশতা, কিতাব ও নীবগণের প্রতি ঈমান এবং নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, ওয়াদা পূরণ করা, সুখ-দুঃখে এবং শক্তি-সামর্থ্যকালে ধৈর্য ধারণ—এ সবগুলোই মৌলিক উপাদান পর্যায়ের। এগুলো ছাড়া আকিদা বা ইবাদত অথবা নৈতিক চরিত্র—কোন একটি দিক দিয়েও 'পরম পুণ্যময় কাজ' البر। বাস্তবায়িত হতে পারে না। তালে শুধু নিকটাত্মীয়দের ধন-মাল দেয়া আল্লাহ্র ভালোবাসায়ই একটি একক নফল বা মুস্তাহাব কাজ গণ্য হবে—গোটা আয়াতটির মধ্যে?....এটা মেনে নেয়া যায় না।

আবূ উবাইদ উল্লেখ করেছেন, তাবেয়ীনের মধ্যে কোন কোন লোক—যেমন দহহাক—মনে করে যে, এ আয়াতটি মনসুখ হয়ে গেছে। যাকাত কুরআনে উল্লিখিত সব 'সাদকা'কেই প্রত্যাহার করিয়ে দিয়েছে।[১] কিন্তু এ ধরনের কথা বলা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার দাবি। কোন দলিল বা প্রায় দলিলও এ কথার সমর্থন দেবে না। কেবল মৌলিক দাবির জোরেই তো আল-কুরআন মনসুখ করা যায় না; দহহাকের কথাই যদি সহীহ্ হত তাহলে আয়াতের واتى الزكاة কথাটাই মনসুখকারী হত واتى المال على حبهএ কথার। তাতে আয়াতের একটা অংশ অপর অংশের মনসুখ হওয়ার হুকুমদাতা মনে করা হত। কিন্তু এ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

তাছাড়া আয়াতটিতে একটি আছে সংবাদ আর আছে বির্ ও তাকওয়াধারী লোকদের গুণ পরিচিতি। সংবাদ কখনও মনসুখ হতে পারে না। মনসুখ হলে তা সংবাদদাতাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে। আল্লাহ্ তাঁর উর্ধ্বে মহান পবিত্র এই দোষারোপ থেকে।

আবূ উবাইদ এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'উক্ত আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছিল যখন ইসলামের ফরযসমূহ নাযিল হয়েছিল, দণ্ড বিধান কার্যকর হয়েছিল এবং লোকদেরকে তদানুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[২]

অতএব তা একটি সুদৃঢ় অকাট্য আয়াত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেখুন ঃ تفسير القرطبى ج ٢ ص ٣٢ وتفسير الطبرى ج ص ٣٤٨ ط المعارف -

১. الاموال ص ٣٥٧ . ٣٥٨

২. الاموال ص ٣٥٨

দ্বিতীয় দলিল ঃ কাটাকালে ফসলের হক্

তাদের আর একটি দলিল হচ্ছে সূরা আল আন'আমের একটি আয়াত। আল্লাহ তা'আলা বাগ-বাগিচা, খেজুর বাগান, কৃষি ফসল, জয়তুন ও আনার—পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ—সৃষ্টি করে তাঁর বান্দাদের প্রতি যে অসীম-অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, সেই কথার উল্লেখ করার পর বলেছে ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

তোমরা খাও তার ফল, যখন তা ধারণ করবে এবং দাও তার হক্ কাটার দিন এবং সীমা লঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পসন্দ করেন না।

তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, এ আয়াতে যে হক্ দিতে হয়েছে তা যাকাত থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। এ কথাটি কয়েকটি দিক দিয়েই সুস্পষ্ট ও প্রকট ঃ

১. এ আয়াতটি মক্কী, মদীনায় ওশর ফরয হওয়ার পূর্বেই নাজিল হয়েছে। তার মক্কী হওয়ার প্রমাণ এই যে, গোটা সূরাই মক্কায় এক সাথে নাজিল হয়েছিল। এ পর্যায়ে বহু কয়টি প্রসিদ্ধ বর্ণনাও উদ্ধৃত হয়েছে। (পূর্বে সে কথা আমরা বলে এসেছি) কেবলমাত্র এই আয়াতটি মাদানী এ কথা বলা দলিলহীন দাবিমাত্র।

২. আয়াতটির দাবি হচ্ছে, ফল ও ফসলের হক্ দাও তা কাটার দিন। কিন্তু তা ওশর যাকাতের বেলায় হয় না। ওশর তো ফসল পরিচ্ছন্ন ও ঝারা-পোছার পর। অন্যকথা প্রকৃত প্রাপ্তি পরিমাণ নির্ভুলভাবে জানা যাবে না। তার পরই 'ওশর' দিতে হয়—অথবা অর্ধ ওশরে।

৩. আয়াতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ এবং সীমালঙ্ঘন করোনা, কেননা আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পসন্দ করেন না' যাকাতে তো কোন সীমালঙ্ঘন নেই। কেননা তা তো শরীয়াতদাতা কর্তৃক পরিমাণ নির্দিষ্ট, সুপরিমিত। তার একবিন্দু কম করা বা বেশী করার কোন অধিকার নেই করোর।[১]

যিনি বলেন, উক্ত আয়াত যে 'হক্' টি দিতে বলা হয়েছে, তা প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে তা মনসুখ হয়ে গেছে। তার প্রতিবাদ করে এ লোকেরা বলেছেন, মনসুখ হওয়াটা শুধু সম্ভাব্যতা ও মৌখিক দাবির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় না। ইবনে হাজম বলেছেন ঃ যে লোক দাবি করে যে, তা মনসুখ হয়ে গেছে, তার এ কথা সত্য হতে পারে কেবলমাত্র এমন এক অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে, যা রাসূলে করীম (স)-এর কাছে থেকে পাওয়া গেছে। অন্যথায় যে কোন ব্যক্তি যে কোন আয়াত সম্পর্কে এরূপ দাবি করে বসতে পারে, যে কোন হাদীসকে মনসুখ বলে তা মানতে অস্বীকার করতে পারে। কোন

১. দেখুন ঃ المحلى لابن حزم ج ٥ ص ٢١٦ - ٢١٧

কিছুর মনসুখ হওয়ার দাবি সেই দলিলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দেয়া আদেশ মানার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করার শামিল। এটা কোন সহীহ্ সনদে প্রমাণিত অকাট্য দলিল ছাড়া জায়েয হতে পারে না।[১]

ইবনে হাজম বলেছেন ঃ যদি বলা হয় যে, উক্ত আয়াতে কোন্ কাজটি ফরয করা হয়েছে? আমরা বলব ফরয করা হয়েছে এমন একটি হক্ দেয়া যা যাকাত ছাড়া অন্য কিছু। আর তা হচ্ছে এ যে, ফসল কাটাইকারী ফসল কাটার সময় যা মন চায় তাই দান করবে। এটা জরুরী কিন্তু পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। এটা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্য। আগেরকালের বেশ কিছু মনীষী এ কথাই বলেছেন।[২]

এ কারণে ইবনে উমর (রা) থেকে এ হক্ حق -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে ঃ তখনকার লোকেরা এমন পরিমাণ দিত যা যাকাত ওশর থেকে আলাদা।

আতা বলেছেন ঃ সেই সময় উপস্থিত গরীব-মিসকীনদের যা সম্ভব হয় দেবে। কিন্তু তা 'ওশর' গণ্য হবে না।

মুজাহিদ বলেছেন ঃ মিসকীন লোকেরা উপস্থিত হলে তা থেকে (যা সম্ভব) তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে দেবে। তিনি আরও বলেছেন ঃ ফসল ফেলার সময় এক মুঠি দেবে, কাটার সময় এক মুঠি দেবে এবং কাটাইকালে যা পড়ে থাকবে তা কুড়িয়ে নেবার তাদের সুযোগ দেবে।

ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন ঃ পার্সেল পাঠাবার মত দেবে।[৩] আবূল আলীয়া, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আলী ইবনে হুসাইন, রুবাই, ইবনে আনাস প্রমুখও উপরিউক্ত ধরনের কথা বলেছেন।[৪]

ইবনে কাসীর বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করেছেন সেই লোকদের যারা ফসল কাটে, কিন্তু তা থেকে সাদকা করে না। যেমন সূরা ن -এ বাগান মালিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।[৫]

এ আয়াতে 'হক্' বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা নির্ধারণে এবং যাকাতের দ্বারা তার মনসুখ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দান পর্যায়ে যে মত-পার্থক্য রয়েছে, তা ইতিপূর্বে সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মনসূখ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে এবং ইবনে উমর (রা)-এর ন্যায় একজন মহাসম্মানিত সাহাবী এবং আতা মুজাহিদ ও নখয়ী প্রমুখ তাবেয়ী ফিকাহ্ বিশারদগণের এক বিরাট জামায়াত এ আয়াত থেকে যে তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন, তা হচ্ছে ঃ ধন-মালে যাকাত ছাড়াও অধিকার আছে।

---

১. ও ২. المحلى الابن حزم ج ٥ ص ٢١٦ - ٢١٧
৩ ও ৪. المحلى ابن حزم ج ٥ ص ٢١٧
৫. দেখুন تفسير ابن كثير ج ٢

তৃতীয় দলিলঃ গবাদিপশুর ও ঘোড়ার 'হক্'

তাঁদের তৃতীয় দলিল হচ্ছে সে সব সহীহ্ হাদীস যাতে উট ও ঘোড়ার বিশেষ অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত ও বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত। তা হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) উট তার মালিকের কাছে আসবে তার সুস্থ সবল দেহ নিয়ে। দেখা যাবে যে, তার ব্যাপারে যে হক্ ধার্য ছিল, তা আদায় করা হয়নি। তখন সে তার ক্ষুর দিয়ে সেই মালিককে দলন করবে। এ ছাড়া ছাগল আসবে তার সুস্থ সবল দেহ নিয়ে। সহসা দেখা যাবে, তার ব্যাপারে যে হক্ ধার্য ছিল তা দেয়া হয়নি। তখন সে তার ক্ষুর দিয়ে তাকে দলন করবে ও শিং দিয়ে তাকে গুতোবে। বললেন ঃ তার হক্ ছিল, দুধ দোহনের সময়ে উপস্থিত মিসকীনদেরকে তার অংশ দান।[১] 'তার অধিকার এই যে, তা দোহন করা হবে পানির ওপর' কথাটি উট ও ছাগল উভয়কেই শামিল করে। মুসলিম ও আবূ দাউদের বর্ণনায় তা উটের উল্লেখের পর স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ বর্ণনাটি এই ঃ উটের মালিকই তার হক্ দেবে না.....আর তার হক্ হচ্ছে তার পানির কাছে আসার নির্দিষ্ট দিনে দোহন করা।[২]

এই শেষের বাক্যটি আবূ হুরায়রার শামিল করা অংশ নয়, যেমন কেউ কেউ ধারণা করেছে। আসলে তা রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসেরই অংশ। বুখারী একটি বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ বাক্যটি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর উক্তির মধ্যে শামিল রয়েছে। যেমন ঃ বুখারীর كتاب المساقاة এর باب حالب الابل علي الماء। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সনদে নবী করীম (স) থেকেই বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

উটের অধিকার হচ্ছে, তা দোহন করতে হবে পানির স্থানে।[৩] নাসায়ী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ উট, গরু ও ছাগলের যে মালিক তার হক্ দেয় না, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন একটি সমতল রুক্ষ স্থানে দাড় করিয়ে দেবেন। দুই ভাগে বিভক্ত ক্ষুরধারীরা তাকে পদদলিত করবে এবং শিংধারী জন্তুরা তাকে শিং দিয়ে গুতোবে। সেদিন কোন জন্তুই শিংহীন হবে না, কোনটি শিং ভাঙ্গাও হবে না। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওদের হক্ কি? বললেন ঃ তার বলদকে যে চাইবে তাকে ধারস্বরূপ দেয়া তার বালতিটা ধার দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে তার ওপর বোঝা চাপানো।.......[৪]

মুসলিম শরীফেও হযরত জাবির থেকেই অনুরূপ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

---

১. বুখারী الزكاة - باب اثم مانع الزكاة দেখুন ফতহুল বারী ৩য় খণ্ড ১৭২—১৭৩ পৃ.

২. বুখারী কিতাবুয যাকাত اثم مانع الزكاة অধ্যায় দেখুন ঃ ফতহুল বারী ৩য়খণ্ড ১৭২ — ১৭৩ পৃ.

৩. صحيح البخارى بحاشية السندى ج ٢ ص ٣٤

৪. سنن النسائى مع شرح السيوطى وحاشية السندى ج ٥ ص ٢٧
দেখুন ঃ طرح التثريب ج ٤ ص ١١-١٢

তাঁরই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ উটের হক্ কি? বললেন ঃ তার গলায় নহর করা, তার বলদকে ধার দেয়া এবং তা দোহানো পানি খাওয়ার দিন।[১]

শরীদ থেকে বর্ণিত, বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে উট সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তার গলায় নহর করা (ছুরি মেরে জবাই করা), তার মধ্যে যেটা উত্তম স্বাস্থ্যবান সেটিতে চড়—বোঝা চাপাও এবং তা যবেহ কর তার পানি খাওয়ার দিন।[২]

এসব কয়টি বর্ণনাই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, এই কথাটি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর। অন্য কারোর কোন কথা তাতে যুক্ত হয়নি। হাফেয ইরাকী একে আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, এতে তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদও রয়েছে।

বালতি ধার দেয়ার অর্থ, কারো যদি বালতি না থাকে এবং কূপ থেকে পানি তোলার জন্য বালতি ধার চায়, তাহলে তা দিতে হবে। আর আল্লাহ্র পথে তার ওপর বোঝা চাপানোর অর্থ, যে সব মুজাহিদের জিহাদে যাওয়ার সওয়ারী নেই, তাদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দেয়া।

এ সব হাদীস মূল উদ্দেশ্য প্রমাণ করছে যথার্থভাবে। যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা পালন না করলে সেজন্যে কঠোর আযাবের ধমকও আছে তাতে। এ থেকে প্রমাণিত হল, এ সব হক্ আদায় করা ওয়াজিব। আর এ সব হক্ যাকাত ছাড়া ভিন্নতর জিনিস।

এ কারণে ইবনে হাজম বলেছেন[৩] প্রত্যেক উট-গরু-ছাগলের মালিকের কর্তব্য হচ্ছে, তা দোহাবে তার পানির স্থানে উপস্থিত হওয়ার দিন এবং তার দুধ থেকে যা তার মন চাইবে সাদকা করে দেবে।

ইবনে হাজম্ বুখারী উদ্ধৃত ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। পরে বলেছেন, যে লোক বলবে, ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কোন হক্ নেই, সে বাতিল কথা বলবে। তার কথার সত্যতা প্রমাণের কোনই দলিল নেই, কুরআন হাদীসের কোন সহীহ দলিল বা কোন ইজমাও তার পক্ষে উল্লেখ করার মত নেই। আর রাসূলে করীম (স) ধন-মালে যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা ওয়াজিব। বালতি ধার বাবদ দেয়া এবং বলদকে অন্য লোকের প্রয়োজনীয় কাজে দেয়া এ দুটিই আল্লাহ্র কথা ويمنعون الماعون অর্থাৎ পরকালে অবিশ্বাসী সে সব ব্যক্তি 'যারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পারস্পরিক দেয়া নেয়া বন্ধ করে[৪]—এর অন্তর্ভুক্ত।

---

১. مجمع الزوائ গ্রন্থে বলা হয়েছে (৩য় খণ্ড, ১০৭ পৃ.) তাবরানী এ হাদীসটি الاوسط গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তার বর্ণনাকারীরা সহীহ সিকাহ তাবরানী শায়খ ছাড়া ইবনে আবূ হাতিম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাকে কেউই যয়ীফ বলেনি।

২. তাবরানী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন الكبير গ্রন্থে, সনদ উত্তম। المصدر السابق

৩. المحلى ج ٦ ص ٥٠. ৪. سورة الماعون - ٣

উট ও ছাগলের 'হক্' পর্যায়ে যেমন হাদীসমূহ সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, অনুরূপভাবে ঘোড়ার হক্ পর্যায়েও সহীহ হাদীসসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন; রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ ঘোড়া তার মালিকের জন্যে শুভ পূণ্যফল, তার মালিকের আবরণ এবং অপর ব্যক্তির ওপর তা পাপ, যার জন্যে তা শুভ পূণ্যফল, সে সেই ব্যক্তি যে তা আল্লাহ্র পথে, অর্থাৎ জিহাদের কাছে নিযুক্ত করল। শেষ পর্যন্ত বললেন ঃ এবং সেই ব্যক্তি যে তা নিযুক্ত করল সম্পদস্বরূপ, আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে, পরে তার গলার দিকে ও পিঠের দিকে আল্লাহ্র যে হক্ ধার্য রয়েছে তা সে ভুলে যায়নি। তার জন্যে তা আবরণ। আর যে লোক তার গৌরব প্রকাশের কাজে নিযুক্ত করবে, লোকদের বাহাদুরী দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে মুসলিমদের বিরোধিতায়, তার ওপর তা পাপের বোঝাস্বরূপ।[১]

চতুর্থ দলিল ঃ অতিথির অধিকার

সেই ফিকাহবিদগণ চতুর্থ পর্যায়ের দলিলস্বরূপ পেশ করেছেন সে সব হাদীস, যাতে মেহমানের হক্—যার কাছে মেহমান আসে—তার ওপর ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আবূ শুরাইহ—খুয়াইলদ ইবেন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছন, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানদার সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। এ সম্মান পাওয়া তার বৈধ অধিকার একদিন ও এক রাত। আর মেহমানদারীতে শেষ মুদ্দাত তিন দিন। তার পরও যা হবে, তা হবে তার সাদকা।[২]

মেহমানকে সম্মান দেখাবার এ আদেশ ওয়াজিব প্রমাণ করে। কেননা ঈমানকে তার সাথে সম্পর্কশীল বা নির্ভরশীল বানানো হয়েছে। আরও দলিল এই যে, তিনদিনের পর এ পর্যায়ের যা হবে, তা হবে সাদকা বলা হয়েছে (যা নফল)।

রাসূলে করীম (স) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কে যা বলেছিলেন তাও উক্ত কথার সমর্থন করে। তা হচ্ছে—নিশ্চয়ই তোমার দেহের হক্ রয়েছে তোমার ওপর[৩] এবং তোমার সাথে সাক্ষাতকারীরাও তোমার মেহমান। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসেও তা সমর্থন করে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে মেহমানই কোন লোকের কাছে আসবে, সে মেহমান যদি বঞ্চিত হয়, তাহলে তার অধিকার আছে তার এক বেলার খোরাক সে গ্রহণ করবে, তাতে তার কোন দোষ হবে না।[৪]

মিকদাম ইবনে সা'দী করচ আল-কিন্দী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)

---

১. বুখারী হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থের من باب شرب الناس والدواب كتاب المساقام এর بخارى مع حاشية السندى ج ٢ ص ٣٢ ঃ দেখুন। উদ্ধৃত করেছেন। الانهار

২. হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন মালিক, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মা'জা كمافى الترغيب ج ٣ ص ٢٤١

৩. বুখারী, মুসলিম প্রণীত।

৪. আহমাদ উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর বর্ণনাকারীর সকলেই সিকাহ। হাকেম উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ সনদসম্পন্ন। المصدر السابق

বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিই কোন লোকের কাছে মেহমান হলো—পরে সে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, এ ব্যক্তির সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমেরই দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত সে তার রাতের খাবার পরিমাণ তার কৃষি ফসল ও মাল থেকে নিতে পারবে।[১] তার মাধ্যমেই নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত মেহমানের এক রাত প্রত্যেক মুসলমানের হক্। তাই যে লোক তার আঙ্গিনায় সকাল বেলা পৌছল, তখন সে তার ওপর ঋণ—হাদীস।[২]

ইবনে হাজম মুসলিমের সূত্রে উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমরা বললাম ঃ হে রাসূল! আপনি আমাদের বিভিন্ন স্থানে পাঠান। তখন আমরা বিভিন্ন লোকদের কাছে অবস্থান করি, কিন্তু তারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এমতাবস্থায় আমরা কি করব, আপনি আমাদের কি উপদেশ দেন ? রাসূলে করীম (স) তখন বললেনঃ তোমরা যদি কোন লোকের গ্রামে বা শহরে গিয়ে উপস্থিত হও এবং তারা যদি তোমাদের জন্যে সেই সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করে যা মেহমানের জন্যে করা বাঞ্ছনীয় তাহলে তা গ্রহণ কর। আর যদি তারা তা না করে তাহলে তাদের কাছ থেকে মেহমানের হক্ নিয়ে নাও—যা তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

বুখারীর সূত্রে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর পর্যন্তকার সনদে বলা হয়েছে, সুফফার লোকেরা খুবই দরিদ্র ছিলেন এবং নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যার কাছে দুজনের খাদ্য আছে সে যেন তৃতীয় একজন সঙ্গে নিয়ে যায়। আর যার কাছে পাঁচ জনের খাবার আছে সে যেন ষষ্ঠ জনকে সাথে নিয়ে যায় অথবা যেমন তিনি বলেছেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা) তিনজনকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। আর রাসূলে করীম (স) দশজনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন।

এসব হাদীসের সমষ্টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, সমাগত মেহমানের একটা হক্ আছে খুবই তাকীদপূর্ণ তার সে মুসলিম ভাইয়েরা ধন-মালে, যার কাছে সে মেহমান হয়েছে। এমন কি গোটা সমাজের ওপরঃতার সাহায্য-সহযোগিতা করা কর্তব্য—যেন সে তাগিদপূর্ণ হকটা সে পেয়ে যেতে পারে। সেই সাথে একথাও স্পষ্ট যে, এ হক্ যাকাতের বাইরে—যাকাত ছাড়া অন্য হক্। কেননা যাকাত একটা বিশেষ সময় ধার্য হয় ও ফরয হয়—বছর পূর্তির ফসল কাটা ইত্যাদির সময়ে অথচ মেহমান তো যে কোন সময়ে এসে যেতে পারে। এ জন্যে ইবনে হাজম বলেছেন ঃ 'মেহমানদারী তো ফরয শহর-নগরবাসী-মরুবাসী-ফিকাহবিদ ও মূর্খ সকলেরই ওপর—এক দিন একরাত পুণ্যময় আচরণ ও উপঢৌকন হিসেবে।' পরে তিন দিন মেহমানদারী হিসেবে। এর অধিক নয়। তার পরও যদি কেউ থাকে তাহলে তখন আতিথ্য রক্ষা করা জরুরী বা বাধ্যতামূলক বলা যায় না। তবে সে নিজেই মেহমানদারী উত্তমভাবে দীর্ঘায়িত করতে চায়, তাহলে তা ভালই। কিন্তু ওয়াজিব মেহমানদারী যদি করতে অস্বীকার করে, তাহলে তা জোর করে বা যেমন করেই সম্ভব গ্রহণ করার তার অধিকার আছে। তাতে তার পক্ষেই বিচারের রায়ও দেয়া হবে।[৩]

---

১. আবূ দাঊদ ও হাকেম উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ।

২. আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত করেছেন। দেখুনঃ ৩ الترغيب والترهيب ج ٣।
المحلى ج ٩ ص ١٧٤ ৩ ص ٢٤١ ٢٤٢।

ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

মেহমানের অধিকার পর্যায়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব।

জুমহুর ফিকাহবিদগণ বলেছেন, মেহমানদারী করা ভাল নৈতিকতার শুভ আচরণের অন্তর্ভুক্ত কাজ। দ্বীনদারীর সৌন্দর্যও তাই। তা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। লাইস ইবনে সায়াদ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এক রাতের জন্যে মেহমানদারী ওয়াজিব।

জমহুর ফিকাহবিদদের দলিল হচ্ছে সেই হাদীস যা বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত। তা হচ্ছে ঃ যে লোক আল্লাহ্‌র ও পরকালে বিশ্বাসী, সে যেন তার মেহমানকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'যথোপযুক্ত' বলতে কি বোঝায় হে রাসূল ? বললেন ঃ এক দিন ও রাত। আর মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত চলতে পারে। এর বেশী হলে তা হবে সাদকা—সাধারণ দান বিশেষ। (আল-হাদীস)

হাদীসের শব্দ جائزته বলতে বোঝায়, মেহমানদারী একটা মুস্তাহাব কাজ কেননা তা হচ্ছে একটা দান, আত্মীয়তা রক্ষা—যা মূলত মুস্তাহাব। এ শব্দটি ওয়াজিব বোঝাবার জন্যে খুব কমই ব্যবহৃত হয়। উক্ত হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, মেহমানকে আদর যত্ন করতে হব প্রথম দিন ও রাত। আর তাকে উপহার উপঢৌকন সাধ্যমত দান করা অতীব উন্নতমানের দানশীলতা, বদান্যতা ও অনুগ্রহ—স্নেহ-বাৎসল্যের ব্যাপার।[১] তারা সে সব হাদীসকেও দলিল হিসেবে নিয়েছেন, যে সব হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির ধন-মাল তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। সে সব হাদীসকেও তাঁরা পেশ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, ধন-মালে যাকাত ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্য নেই।

মেহমানের অধিকার পর্যায়ে যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, সে সব বিষয়ে তাঁদের ভিন্ন মত রয়েছে।

খাত্তাবী বলেছেন, আসলে তা রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় বাধ্যতামূলক ছিল। কেননা তখন বায়তুলমাল ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে তাদের রিযিক যোগানোর দায়িত্ব বায়তুলমালের ওপর অর্পিত। মুসলমানদের ধনমালে তাদের অধিকার নেই।

অনেকেই মনে করেছেন, এসব হাদীস ইসলামের প্রাথমিক যুগে কার্যকর ছিল। তখন পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছিল ওয়াজিব। পরে ইসলাম যখন সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল, তখন তা বাতিল হয়ে গেছে।[২]

শাওকানী বলেছেন ঃ সত্যি কথা হচ্ছে, মেহমানদারী কয়েকটি কারণে ওয়াজিব ঃ

---

১. نيل الاوطار ج ٨ ص ١٦٢ - ١٢٣ ط الحلبى

২. نيل الاوطار ج ٨ ص ١٦٢

প্রথমঃ যে লোক মেহমানদারী করল না, তার শাস্তিস্বরূপ তার মাল গ্রহণ জায়েয। ওয়াজিব নয়—এমন কাজে এরূপ শাস্তির বিধান হয়নি।

দ্বিতীয়ঃ মেহমানদারীকে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের শাখা বানিয়ে ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত মাত্রায় তাগিদপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় যে, যে লোক তা করল না সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয় বলে মনে হয়। আর একথা তো জানাই আছে যে, ঈমানের শাখা-প্রশাখারূপে চিহ্নিত কার্যাবলীও আদেশকৃত। তা ছাড়া তাকে সম্মান প্রদর্শনের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তা সাধারণ মেহমানদারীরও ঊর্ধ্বের এক বিশেষ কাজ। তা থেকে বোঝা যায় যে, তা অবশ্যই বাধ্যাতামূলক হবে।

তৃতীয় ঃ রাসূলের কথা ঃ 'তার অতিরিক্ত সাধারণ সাদকা' স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তী কথা সাধারণ সাদকার পর্যায়ের নয়; বরং তা শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব।

চতুর্থ ঃ তাঁর কথা لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ —মেহমানের রাত ওয়াজিব অধিকার। এ থেকেও নিঃসন্দেহে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এর অপর কোন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়নি।

পঞ্চম ঃ রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ 'কেননা তার সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানেরই দায়িত্ব' স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তার সাহায্য করা ওয়াজিব। আর এ কথাই মেহমানদারী ওয়াজিব হওয়ার ফলশ্রুতি।

বলেছেন ঃ এ কথা যখন অকাট্যভাবে স্পষ্ট হল, তখন জমহুর ফিকাহবিদদের মাযহাবের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠল। আর মেহমানদারী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিশেষত্ব প্রমাণকারী সন্তুষ্টি ছাড়া ধন-মাল নেয়া হারাম হওয়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহের তুলনায়। আর 'মালে যাকাত ছাড়া আর কোন অধিকার নেই'—এ হাদীসের তুলনায়ও।

মেহমানদারী সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে শুধু জান বাঁচানো পরিমাণের মধ্যে সীমিত মনে করা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার।

কেননা তা প্রমাণকারী কোন দলিলই পাওয়া যায়নি। আর তার প্রয়োজনও কিছু নেই।

কেবল গ্রাম-মরুবাসীদের জন্যে তা খাস করা এবং শহর-নগরবাসীদের তা থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের ব্যাপারটিও অনুরূপ।[১]

পঞ্চম দলিলঃনিত্য ব্যবহার্য জিনিসের হক্

পঞ্চম পর্যায়ে তাঁরা দলিলরূপে উপস্থাপিত করেছেন কুরআন মজীদের সে আয়াতটি, যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যাদি পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে অসম্মত লোকদের প্রতি আযাবের হুমকি ধ্বণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

---

১. نيل الاوطار ج ٨ ص ١٦٢

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

'সে সব নামাযীদের জন্যে দুঃখ—আযাব, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উপেক্ষা-আলস্য প্রদর্শন করে, তারা সে লোকই যারা লোক দেখানো কাজ করে ও তা নিত্যপ্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যাদিও পারস্পরিক আদান-প্রদান করে না।[১]

আবূ দাউদ কিতাবুয যাকাতের حقوق المال অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)—এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স)-এর জামানায় 'মা-য়ূন' বলতে আমরা বুঝতাম পানি তোলার বালতি ও তৈজসপত্র ধার দেয়া।[২]

তার অর্থ, সামাজিক জীবনে মানুষ পরস্পরের কাছে যেসব ছোট-খাটো জিনিসের জন্যে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তা ধার বাবদ দেয়া ওয়াজিব। সে সব জিনিস দিতে যে লোক অস্বীকার করে সে নিন্দিত ও আযাব পাওয়ার যোগ্য সে লোকের মতই যে নামাযের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে ও লোক দেখানো নামায পড়ে। আর কেবলমাত্র কোন ওয়াজিব কাজ তরক করলেই যে আযাব বা তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে, একথা সকলেরই জানা।

এসব জিনিস 'ধার' বাবদ দেয়া যখন ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে, অথচ তা যাকাতের বাইরের কাজ, তখন একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, নিশ্চয়ই ধন-মালের যাকাত ছাড়াও হক্ বা অধিকার আছে।

ইবনে হাজম তাঁর সনদে ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন ঃ الماعون। হচ্ছে সে সব জিনিস যা সামাজিক মানুষ পারস্পরিকভাবে 'ধার' বাবদ দেয়া-নেয়া করে থাকে সাধারণভাবে। তা হচ্ছে কোদাল, ভাণ্ড-পাত্র-তৈজসপত্র ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস।[৩] আয়াতে উদ্ধৃত الماعون। এর তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে ঘরের জিনিসপত্র। তাঁর থেকে এও বর্ণিত ঃ ধার দেয়া-নেয়া।[৪] আলী ইবনে আবূ তালিব থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে।[৫] উম্মে আতীয়া বর্ণিত ঃ তা হচ্ছে কাজ ও ব্যবসায়, যা লোকেরা পারস্পরিকভাবে নেয়া-দেয়া করে।[৬]

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিতঃ তা হচ্ছে সেই মাল, যার হক্ দিতে অস্বীকার করা হয়। ইবনে হাজম বলেছেন ঃ আমরা যা বলে এসেছি তা এ কথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তা ইকরামা ও ইবরাহীম প্রমুখেরও মত। কোন সাহাবী থেকেই তার বিপরীত কথা আমরা জানতে পাইনি।[৭]

---

১. سورة الماعون ٤ –٧

২. আবূ দাউদ ও মুনযেরী হাদীসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। مختصر السنن ج ٢ ص ٢٤٧। ج ص ١٨٣ বায়হাকীও তা উদ্ধৃত করেছেন।

৩. ইবনে হাজম এ কথার উল্লেখ করেছেন المحلى ج ٩ ص ١٦٨। গ্রন্থের ইবনে আবূ শায়বার সূত্রে।

৪.. ঐ — বায়হাকী ঃ ৪র্থ খণ্ড, ১৮৩—১৮৪ পৃ.। ৫. ৬.ও ৭. المحلى المذ كور।

ইবনে হাজম যেমন বলেছেন, এ সব কিছুই আভিধানিক প্রমাণ। الماعون-এর তাফসীরে তাঁদের সকলের মতই সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন—যেমন পূর্বে বলেছি।

ইবনে হাজম বলেছেন, যদি বলা হয়, হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা যাকাত, তা হলে আমরা বলব, হ্যাঁ তবে তা 'ধার' বাবদ দেয়া নয় এমন কথা বলেননি। তা ছাড়া তাঁর থেকেই বর্ণনা পাওয়া গেছে যে, তা 'ধার' বাবদ দেয়া-নেয়া।' অতএব তাঁর দুটি কথার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।[১]

আবূ দাউদে ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসটি কার্যত 'মরফূ' রাসূলের কথা হিসেবে গণ্য মুহাদ্দিসীনের কাছে। কেননা তাতে রাসূলের সময়ে الماعون-এর তাফসীরের কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। যদি তখন এতে কোন ভুল করা হয়, তাহলে 'অহী' তা নিশ্চয়ই সংশোধন করে দিত। কেননা আল্লাহ্র কিতাব অনুধাবনে ভুল অসংশোধিত থাকতে পারত না।

ষষ্ঠ দলিল ঃ মুসলিম সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ কর্তব্য

ষষ্ঠ পর্যায়ে তাঁরা দলিল হিসেবে এনেছেন সে সব অকাট্য প্রমাণ, যা মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, একের অপরের দায়িত্ব গ্রহণ ও দয়া অনুগ্রহকে ওয়াজিব প্রমাণ করে এবং মিসকীনকে খাবার দেয়া ও দিতে উৎসাহিত করা ফরয করে। আর এ কাজকে ভ্রাতৃত্বের ফলশ্রুতি—ঈমান ও ইসলামের স্বাভাবিক দাবি গণ্য করে।

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

তোমরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতা কর পরম পুণ্যময় ও আল্লাহ্ ভীতির কাজে এবং কোনরূপ সহযোগিতা করো না গুনাহ ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে।[২]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের গুণ-পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও অনুগ্রহসম্পন্ন।[৩]

সেই ঘাঁটির কথাও বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অতিক্রম করা প্রত্যেকটা মানুষেরই কর্তব্য—যেন তারা 'ডানপন্থী' গণ্য হতে পারে। বলেছেন ঃ

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ - وَمَا اَدْرَاكَ مَالْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ - اَوْاِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَامَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ - اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ -

১. المحلى المذكور ২. ٢ - المائده سورة ৩. اخرسورة الفتح

কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটি পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জানো সেই দুর্গম ঘাঁটির পথ কি?... কোন গলা দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করা কিংবা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধুলি-মলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো। সেই সঙ্গে শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।... সেই লোকই দক্ষিণপন্থী।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -

এবং দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক্ এবং মিসকীন ও ইবনে সাবীলকে।[২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু আরও বলেছেন ঃ

وَبِالْوَا لِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ -

এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ, নিকটাত্মীয় ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বে থাকা প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, নিঃস্ব পথিক এবং দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে (ক্রীতদাস)-এর সাথে।[৩]

ইতিপূর্বে আমরা [illegible] বহু সংখ্যক আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি, যা মিসকীনকে খাবার দেয়া ও সেজন্যে উৎসাহদান ঈমানের নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তা না করাকে কুফর ও পরকাল অবিশ্বাসের লক্ষণ বলে নির্দিষ্ট করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ্র এ কথাটি ঃ

أَرَاَيْتَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

তুমি কি দেখেছ সেই লোককে, যে পরকালকে অবিশ্বাস করে ? সে তো সেই, যে ইয়াতীমকে গরা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিবার জন্যে উৎসাহ দেয় না।[৪]

অপরাধী লোকদের জাহান্নামী হওয়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

قَالُوْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ -

---

১. سورة البلد ১১-১৯ ২. الاسراء - ২৬

৩. النساء - ৩৬ ৪. سورة الماعون

তারা বলবে, আমরা নামাযীদের মধ্যে ছিলাম না, আমরা মিসকীনকে খাওয়াতাম না।[১]

যে লোক বাম হাতে আমলনামা পাওয়ার দরুন জাহান্নামে যাওয়ার ও আযাব পাওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

انَّهٗ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ - وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

সে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার ছিল না এবং মিসকীনকে খাবার দেবার জন্যে উৎসাহও দিত না।[২]

রাসূলে করীম (স) ইসলামী সমাজের প্রকৃত ও যথার্থ রূপ এবং একে অপরের দায়িত্ব গ্রহণ পারস্পরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এবং সংহতির চূড়ান্ত মান তুলে ধরেছেন তাঁর হাদীসসমূহের মাধ্যমে। বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا -

মুমিন মুমিনের জন্যে প্রাচীরের ইটের মত—একজন অপরজনকে শক্তিশালী করে।[৩]

তার অর্থ মুসলমানদের সমাজ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন-নিঃসম্পর্ক ইটের মত নয়। অন্য কথায়, মুসলিম জাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকা লোকদের সমষ্টি নয়। সেখানে কেউ অন্য একজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে না। বরং

مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنُ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تُدَاعِىْ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمّٰى والسَّهُرِ -

মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, স্নেহ-বাৎসল্য ও পারস্পরিক দয়া-সহানুভূতির দৃষ্টান্ত যেমন একটা অভিন্ন দেহ। তার কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে সমগ্র দেহে সেই কারণে জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৪]

একটি দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতির তুলনায় অধিক কোন শক্তিশালী সংহতি সম্পর্ক হতে পারে কি? এগুলো পূর্ণ সহযোগিতা ও একাত্মতার মাধ্যমের পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করছে, একটি অপরটির কাছ থেকে শক্তি পাচ্ছে, উপকৃত হচ্ছে। তার একটিতে যন্ত্রণার উদ্রেক হলে গোটা দেহসত্তাই তদ্দরুন যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

যে লোক খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশে থেকেও অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায় সে মুমিন নয়।[৫]

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

---

১. المدثر ٤٣ - ٤٤ ২. الحاقه ٣٣ - ٣٤

৩ ও ৪. বুখারী ও মুসলিম। ৫. رواه الطبرانى والبيهقى واسناده حسن

আলাহ তা'আলা মুসলিম ধনী লোকদের ধন-সম্পদে অতটা পরিমাণই ধার্য করেছেন, যতটা তাদের গরীব লোকদের জন্যে সংকুলান হয়। দরিদ্ররা ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন হয়ে যে কষ্ট পায় তা কেবলমাত্র তাদের ধনী লোকদের কৃতকর্মের দরুন। সাবধান হও, আলাহ তাদের কঠিনভাবে হিসেব নেবেন এবং তাদের উৎপীড়ক আযাবে নিমজ্জিত করবেন।[১]

ইবনে হাজম এ মতটির পক্ষাবলম্বন করেছেন

এ মাযহাবের পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং কুরআন-হাদীস-সাহাবী-তাবেয়ীনের মত ইত্যাদি অসংখ্য দলিল দিয়ে এ মতটিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছেন, আমরা এমন কাউকে পাইনি। কেবলমাত্র ইবনে হাজম এর ব্যতিক্রম। তিনি চূড়ান্ত মাত্রায় ও অধিক স্পষ্টভাবে জাহিরী ফিকাহবিদ হিসেবে উক্ত কাজটি করেছেন। তিনি তাঁর المحلى। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ[২]

প্রত্যেক দেশ-স্থানের ধনী লোকদের ওপর ফরয করা হয়েছে যে, তারা সেখানকার গরীব জনগণের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়াবে। সরকার তাদেরকে এজন্যে বাধ্য করবে। যাকাত যদি তাদের জন্যে যথেষ্ট না হয় এবং মুসলমানদের "ফাই' সম্পদ যদি প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয়, তাহলে তাদের জন্যে অপরিহার্য যে খাদ্য তারা খায়, শীত ও গ্রীষ্মের যে পোশাক তারা পরে, যে ঘর তাদেরকে বৃষ্টি, শীত, সূর্যতাপ ও পথিকদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারে, তাই দিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।

কুরআনী দলিল

এ কথার কুরআনী দলিল হল ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -

এবং দাও নিকটাত্মীয়কে—মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে—তার হক।[৩]

আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

---

১. আল-মুনযেরী الترغيب والترهيب। গ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসটি তাবরানী الاوسط। ও الصغير। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন ঃ সাবিত ইবনে মুহাম্মাদ জাহেদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুনযেরী বলেছেন ঃ সাবিত সিকাহ, সত্যবাদী, বুখারী ও অন্যান্যরা তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এর অন্যান্য বর্ণনাকারীদেরও কোন ত্রুটি নেই। হাদীসটি হযরত আলীর কথা হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে এবং তা-ই সম্ভব(الترغيب ج ١ الزكاة) ইবনে হাজম হাদীসটি 'মওকুফ' হিসেবে المحلى। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ١٥٨ ج ص সায়ীদ ইবনে মনসুরের সূত্রে।

২. ১৫৭ – ١٥٦ المحلى ٦ ص।—তিনি যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, আমরা তা সনদ ছাড়াই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছি।

৩. الاسراء –٢٦

এবং পিতামাতার সাথে অতীব ভালো ব্যবহার এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী প্রতিবেশী, নিঃস্ব পথিক এবং ক্রীতদাসেরও।

আল্লাহ্ তা'আলা মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের হক্ নিকটাত্মীয়ের হকের সাথে সমান মানের গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং পিতামাতার প্রতি অতীব উত্তম ব্যবহার—নিকটাত্মীয়, মিসকীন, প্রতিবেশী ও ক্রীতদাসদের সাথে ভালো আচরণ গ্রহণ একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। এ ভালো আচরণ বলতে সে সবই বোঝায়, যা পূর্বে বলেছি এবং তা না করা নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ কাজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ - قَالُوْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ -

তোমাদেরকে কোন্ জিনিস জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিল? তারা বলবে ঃ আমরা নামাযী ছিলাম না এবং আমরা মিসকীনকে খাবার খাওয়াতাম না।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নামায ফরয হওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর কথা বলেছেন।

হাদীসের দলিল

রাসূলে করীম (স) থেকে চূড়ান্ত মাত্রার বহু সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেছেন ঃ 'যে লোক লোকদের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার ওপর দয়া রহম করেন না।'[২] আর যে লোক প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-মালের মালিক এবং সে তার এক মুসলমান ভাইকে ক্ষুধার্ত বস্ত্রহীন ধ্বংসমুখী দেখতে পেল; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার সাহায্যে এগিয়ে এল না, নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন না।

আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, ছুফ্ফা বাসীরা ছিল খুবই দরিদ্র লোক। রাসূলে করীম (স) ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন, যার কাছে দুইজনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় একজন নিয়ে যায়, আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ জনকে নিয়ে যায়।[৩]

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই,

---

১. المدثر ٤٢-٤٣

২. হাদীসটি আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এবং আহমাদ ও তিরমিযী আবূ সায়ীদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। বিভিন্ন শব্দে এ হাদীস সহীহ প্রমাণিত। এর সূত্রও অনেক, তা মুতাওয়াতির মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (كمافى التيسير للسندى ج٢ ص٤٤١)

৩. হাদীসটি আহমাদ উদ্ধৃত করেছেন ১ম খণ্ড—১৯৭, ১৯৮, ১৯৯ পৃষ্ঠায় এবং বুখারী তা উদ্ধৃত করেছেন 'কিতাবুল মাওয়াকীত' ও 'কিতাবুল মানাকিব' তার গ্রন্থের এ দুই অধ্যায়ে।

সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে ধ্বংস হওয়ার জন্যে ছেড়েও দেয় না।'[১] যে লোক তাকে না খেয়ে বা বস্ত্রহীন হয়ে মরে যাওয়ার জন্যে অসহায় করে ছেড়ে দিল—তাকে খাবার ও পরার বস্ত্র দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, সে তাকে চরমভাবে লজ্জিত করল।

আবূ সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স)বলেছেন ঃ যার কাছে দুপুরবেলার খাবার আছে সে যেন তাতে সে ব্যক্তিকে শরীক করে যার দুপুর বেলার খাবার নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় রয়েছে, সে যেন তা পাথেয়হীন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়। বলেছেন ঃ অতঃপর রাসূলে করীম (স) কয়েক প্রকারের মালের উল্লেখ করেছেন, শেষ পর্যন্ত আমরা মনে করলাম যে, অতিরিক্তের ওপর আমাদের নিজেদের কারোর কোন হক্ নেই।[২]

তার অর্থ এটা সাহাবাগণ (রা)-এর ইজমা। আবূ সায়ীদ এ সংবাদ জানিয়েছেন। আর প্রত্যেকটি সংবাদেই আমরা তাই বলি।

আবূ মূসা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (স)-এর কথা এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা সকলে বুভুক্ষুকে খাবার দাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর।[৩] বলেছেন ঃ এ পর্যায়ে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অসংখ্য রয়েছে।

সাহাবিগণের উক্তি

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি যদি আমার কোন কাজে অগ্রসর হই তাহলে কখনই পিছনে হটব না। আমি নিশ্চয়ই ধনী লোকদের উদ্বৃত্ত ধন-মাল নিয়ে তা গরীব মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেব।[৪]

এবং হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা ধনী লোকদের ধন-মালে সে পরিমাণ ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের গরীব লোকদের জন্যে যথেষ্ট হয়। এক্ষণে এ দরিদ্র লোকেরা যদি অভুক্ত থাকে কিংবা বস্ত্রহীন নগ্ন হয়ে থাকে এবং এভাবে কষ্ট পায়, তাহলে তা শুধু ধনী লোকদের সেই পরিমাণ সম্পদ তাদেরকে না দেয়ার কারনে মাত্র। আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত রয়েছে, কিয়ামতের দিন তিনি তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইবেন, হিসেব নেবেন এবং সেজন্যে তিনি তাদের আযাব দেবেন।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ধন-মালের যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রয়েছে।

---

১. হাদীসটি আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ২য় খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় এবং ৪র্থ খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায়, বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের আল-মাজালিস ও ইকরাহ অধ্যায়ে, মুসলিম আল-বির-এ, আবূ দাউদ আল-আদব-এ এবং তিরমিযী 'সিফাতুল কিয়ামাহ' অধ্যায়ে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

২. মুসলিম আন্-নিকাহ ও আল-লুকতাহ অধ্যায়ে, আবূ দাউদ কিতাবুয্যাকাত-এ এবং 'আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

৩. বুখারীও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে অতিরিক্ত কথা 'বুভুক্ষুকে খাবার দাও'–এর পর রয়েছে ঃ 'রোগীকে দেখতে যাও'।

৪. ইবনে হাজম এ উক্তির সনদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ উক্তির সনদ চূড়ান্তভাবে সহীহ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা), হাসান ইবনে আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা সকলে বলেছেন ঃ 'তাদের সকলেই তার জন্যে যে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবে। তুমি যদি জিজ্ঞাসিত হও কোন বেদনাদায়ক রক্তে কিংবা কোন লজ্জাষ্কর জরিমানায় অথবা কষ্টদায়ক দারিদ্র্যের ব্যাপারে, তা হলে বুঝবে, তোমার প্রাপ্যটা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

আবূ উবায়দাতা ইবনুল জার্‌রাহ্ ও তিনশ' জন সাহাবী (রা) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একবার বিদেশ সফরে তাদের সকলের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবূ উবায়দাহ তাদের সকলের পাথেয় দুটি পাত্রে একত্র করে তাদের সকলকে সমান মানে ও পরিমাণে খাবার দিতে শুরু করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এটা সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামষ্টিক ইজমা, এর বিপরীত মতের কেউ নেই।

শবী, মুজাহিদ, তায়ূস ও অন্যান্যদের থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই বলেছেন ঃ ধন-মালে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রয়েছে।

ভিন্ন মতের লোকদের ইবনে হাজমের সমালোচনা

আবূ মুহাম্মাদ বলেছেন, উপরিউক্ত মতের বিপরীত মতের কোন লোক আছে বলে আমরা জানি না। তবে দহহাক ইবনে মুজাহিম ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন ঃ ধন-মালে অন্য যত প্রাপ্যই (হক্) ছিল, যাকাত তা সবই মনসুখ করে দিয়েছে। কিন্তু দহহাকের বর্ণনাই সহীহ নয় যখন, তখন তাঁর মত কি করে গ্রহণ করা যেতে পারে ?[১]

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এটাকে যে লোক দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তিনিই এর প্রথম নম্বরের বিরোধী। তিনি ধন-মালে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য আছে বলে মনে করেন সে প্রাপ্য যেমন, অভাবগ্রস্ত পিতামাতার খরচ বহন, স্ত্রীর, ক্রীতদাস-দাসীর, গবাদি পশুর জন্যে ব্যয় করা, ঋণ ও জখম করার প্রতি মূল্য দান ইত্যাদি। দেখা গেল, এদের মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে।

তাঁরা বলেন, যার পিপাসা লেগেছে এবং আংশকা দেখা দিয়েছে যে, সে এখনই পানি পান না করলে তার মৃত্যু অনিবার্য, তাহলে তখন তার যেখান থেকেই সে পারে পানি পান করার তার অধিকার রয়েছে। এমন কি সেজন্যে যুদ্ধ করতে হলেও তা সে করবে।

অর্থাৎ পিপাসার দরুন মৃত্যু ঘনিয়ে এলে যে তাকে পানি দেবে না, তার বিরুদ্ধে

---

১. আমি যদ্দূর জানি, দহহাককে কেউ যয়ীফ বলেনি, একমাত্র ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন ছাড়া। আহমাদ তাকে 'সিকাহ' বলেছেন, ইবনে মুয়ীন, আবূজ্জরয়া, আল-আজালী, ও দারে কুতনীও তাঁকে সিকাহ বলেছেন, ইবনে হাব্বান তাঁকে সিকাহ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে হাজার التقريب গ্রন্থে বলেছেন ঃ সত্যবাদী বটে, তবে খুব বেশী 'মুরসাল' হাদীসের বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই রাসূলের কথা বর্ণনা করেছেন।
ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٢٥ - ٣٢٦
تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٤٥٣ - ٤٥٤ —তা ছাড়া কোন বর্ণনা যয়ীফ প্রমাণিত হলেই অভিমতেরও যয়ীফ প্রমাণিত হয়ে যায় না। ইবনে হাজম তাই দাবি করেছেন। হাদীসবিশারদগণ ইবনে আবূ লাইলাকে যয়ীফ বলেছেন; অথচ ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি ইমাম রূপে মান্য।

লড়াই করা যদি জায়েয হয়ে থাকে, তাহলে যে খাদ্য বস্ত্র না হলে তা নিবৃত্তকারী জিনিস—যারা দিতে চাচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তার পক্ষে জায়েয হবে না কেন, যার তা নেই ?...... এ দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ?... এটা ইজমা, কুরআন, সুন্নাত ও কিয়াসেরও পরিপন্থী।

আবূ মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পৌঁছে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে তার সঙ্গী মুসলমান বা যিম্মীর কাছে অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া সত্ত্বেও মৃত লাশ কিংবা শূকরের গোশত ভক্ষণ করে প্রাণ বাঁচানো জায়েয হতে পারে না। কেননা খাদ্য যার কাছে আছে তার ওপর ফরয হচ্ছে সে বুভুক্ষুকে খাবার দেবে। কিন্তু ব্যাপার যদি উপরিউক্ত রূপ হয়, তাহলে ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ব্যক্তির মৃত লাশ বা শূকরের গোশত খাওয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। তওফীক দেয়ার মালিক আল্লাহ্। এ ব্যাপারে তার যুদ্ধ করারও অধিকার আছে। তাতে যদি যে নিহত হয়, তাহলে হত্যাকারীর কিসাস করতে হবে আর দিতে অস্বীকারকারী নিহত হলে সে আল্লাহ্র অভিসম্পাতে পড়বে। কেননা সে একটা হক্ দিতে অস্বীকার করেছে, সে বিদ্রোহী দলে গণ্য।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللهِ -

তাদের দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের ওপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করে, তাহলে তোমরা সে পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যে পক্ষ সীমালঙ্ঘন করেছে—যদ্দিন না সে পক্ষ আল্লাহ্র মীমাংসার দিকে ফিরে আসে।[১]

অধিকার দিতে অস্বীকারকারী তার সে ভাইয়ের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী, যার হক্ তার ওপর ধার্য হয়ে আছে। এ কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।[২]

---

১. سورة الحجرت - ৯

২. المحلى لابن حزم ج ٦ ص ১৫৭—শায়খ আহমাদ শাকের ইবনে হাজমের এ মতের ওপর দীর্ঘ টীকা লিখেছেন। খুবই মূল্যবান সে টীকা। তা এখানে উল্লেখ করা খুবই উত্তম হবে। তাতে যেমন শিক্ষা আছে, তেমনি উপদেশ নসীহতও। তিনি বলেছেন—'এ কথা ও ইসলামী শরীয়াতের অনুরূপ কথার ভিত্তিতে গ্রন্থকার মনে করেন; ইসলামী আইন প্রণয়ন খুবই উচ্চতর মানের যুক্তিবত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের যেসব ভাই মানব রচিত আইন পেয়ে খুবই মুগ্ধ ও গৌরবান্বিত মনে করেন—যাদের মন-মগজ তাতেই ডুবে আছে, তারা যদি ইসলামী আইন সম্পর্কে অবহিত হত ও তার মূলে নিহিত গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হত, তাহলে কতই না ভালো হত! তাহলে তারা বুঝতে পারত যে, ইসলামী শরীয়াত পৃথিবীর বুকে সবচাইতে উন্নত ও উত্তম আইন বিধান। তাতে হৃদয় ও মগজ পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। তা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশেই বাস্তবায়িত হতে ও কল্যাণ দান করতে সক্ষম। কেননা আসলে তা অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। মুসলমানগণ যদি দ্বীন-ইসলামের আইন বিধানের গভীর সূক্ষ্ম তাৎপর্য বুঝতে পারত ও নির্মল উৎস—সুমিষ্ট-সুস্বাদু পানীয়—কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তা বের করতে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুক্তকরণ ও অগ্রাধিকার দান

দুই পক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র উদ্ঘাটন

দুই পক্ষের বক্তব্য এবং তাদের প্রত্যেকের মতের সমর্থনে উপস্থাপিত দলিল প্রমাণ পেশ ও পর্যালোচনার পর আমার মনে হচ্ছে, তাদের দুই দলের মধ্যকার বিরোধ-বিভক্তি অতটা বিশাল নয়, যতটা আমরা মনে করি। সন্দেহ নেই, তাদের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্রও বহু রয়েছে। তাতে উভয়ের কেউই পরস্পরের সাথে বিরোধ ও মতপার্থক্য করে না।

ক. পিতামাতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে এবং তাদের সন্তান সচ্ছল থাকলে তাদের খরচ বহন সন্তানের কর্তব্য এবং তাদের অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। এ ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব বা মতপার্থক্য নেই।

খ. নিকটবর্তীর হক্‌ও অনুরূপভাবে মতপার্থক্য মুক্ত—সূচনা হিসেবে। অবশ্য নৈকট্যের মাত্রায় বাধ্যতা সৃষ্টিকারী মাত্রায় সচ্ছল ও অসচ্ছল লোকদের পার্থক্যের দরুন তাদের মতও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

গ. খাদ্যাভাবে আক্রান্ত বা বস্ত্রহীনদের নগ্নতা অথবা আশ্রয় বঞ্চিত ব্যক্তির অধিকার আছে খবার পাওয়ার, এ ব্যাপারেও কোন মতপার্থক্য নেই। আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আসলে ফরয হচ্ছে যাকাত দেয়া। তবে সেখানে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়, যা পারস্পরিক সহানুভূতি ও দান-প্রদান ওয়াজিব করে দেয়। যেমন

সচেষ্ট হত, আদেশসমূহ যথাযথ পালন করত, তাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় তা লালন-পালন করত, যাবতীয় কার্যাবলীতে তা অনুসরণ করে চলত এবং তাদের সামষ্টিক জীবন–পরিবেশে তা বাস্তবায়িত করত, তাহলে তারাই হত দুনিয়ার সেরা জাতি! প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ায় যত ধ্বংসাত্মক ও বিপর্যয়কারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে—সর্বাত্মক বিধ্বংসী ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে তা প্রায় সবই কি গরীবদের ওপর ধনীকুলের জুলুম-পীড়ন-বঞ্চনার ফলে হয়নি? এক শ্রেণীর লোক দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে সুখ, মাধুর্য লুঠছে আর তারই পাশে তারই ভাই উলংগ থাকছে ও না খেয়ে ধুকে ধুকে মরছে। এর দৃষ্টান্ত তো ভুরি ভুরি দেয়া যায়। এমতাবস্থায় ধনী লোকেরা যদি অবস্থার নাজুকতা অনুধাবন করত তাহলে তারা নিঃসন্দেহে জানতে ও বুঝতে পারত যে, গরীব জনগণের কল্যাণ সাধনই হতে পারে তাদের জান মালের প্রথম রক্ষা কবচ। আল্লাহ্ তাদের জন্যে যা কিছু দেয়া ফরয করেছেন তাদের ওপর, তা যদি তারা যতারীতি আদায় করতে থাকে তাহলেই তারা রক্ষা পেতে পারে। অতএব তাদের একথা বোঝা উচিত, জানা উচিত দুনিয়ায় আবর্তন বিবর্তনের কথা এবং আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দিন!...... এ একটি সত্যের আওয়াজ, শায়খ এ আওয়াজ তুলেছেন। অন্যান্য বহু মানব দরদীরা যেমন আহমানকাল ধরেই এ আওয়াজ দিচ্ছেন। কিন্তু তা শোনা হয়নি। তাই পরিণাম যা হবার তাই হয়েছে।

বুভুক্ষু—চূড়ান্ত মাত্রার এবং বস্ত্রহীন—চূড়ান্ত মাত্রার অথবা এমন মৃত ব্যক্তি, যার কাফন-দাফনের কেউ নেই।[১]

এরূপ ঠেকায় পড়া ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বালতি, কোদাল ও তৈজষপত্র ইত্যাদি ধার বাবদ লওয়ার জন্যে যে ঠেকায় পড়ে সে এ জিনিসগুলো الماعون। পর্যায় ভুক্ত। কেননা মুসলিম ব্যক্তির ক্ষতি ঠেকা দূর করা সর্বসম্মতভাবে ফরয।

ঘ. মুসলিম সমাজ সমষ্টিকে সাধারণভাবে ঘনীভূত হয়ে আসা সর্বাত্মক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা—শত্রুর আক্রমণের আশংকা, কাফিরদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারকরণ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির প্রতিরোধ প্রভৃতি এ বিপদের পর্যায়ে পড়ে। এ সব অবস্থায় ব্যক্তির অধিকারের ওপর সমষ্টির অধিকার সর্বাগ্রগণ্য, এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর এসব কঠিন অবস্থার মধ্যে পারস্পরিক অংশ ভাগাভাগি করে নেয়াই যে ওয়াজিব, তা সমস্ত মুসলিম আলিমগণের কাছে সর্বসম্মত।

'আল-মিনহাজ'-এর (শারাহ) গ্রন্থে রমলী লিখেছেন ঃ

মুসলমানদের বিপদ প্রতিরোধ—যেমন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, বুভুক্ষুকে খাদ্যদান ইত্যাদি। যদি যাকাত ও বায়তুলমালের সম্পদ তা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে সক্ষম-সমর্থ লোকদের জন্যে ফরযে কেফায়া। আর সক্ষম সমর্থ লোক বলতে বোঝায় সে সব লোককে, যাদের কাছে এক বছরকালের জন্যে তাদের ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণেরও অধিক সম্পদ মওজুদ আছে। আর উল্লিখিত ক্ষতি প্রতিরোধ বলতে কি বোঝায়? তা কি শুধু প্রাণটা বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য দান, না সর্ববিচারে যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে?....এর জবাবে দুটি কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে সহীহতম কথা হচ্ছে এ শেষোক্তটি। কাপড় দান এমন পরিমাণ হতে হবে যা শীত-গ্রীষ্মজনিত অবস্থায় প্রয়োজনীয় মানে গোটা দেহ আবৃত করতে সক্ষম হয়। আর খাদ্য ও বস্ত্র বলতে যা বোঝায় তাই দিতে হবে। চিকিৎসকের ভিজিট, ঔষধের মূল্য, কাজে সাহায্যকারী একজন খাদেম ইত্যাদিও তার অন্তর্ভুক্তি হবে। একথা সকলের কাছে স্পষ্ট।[২]

পূর্বে যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র পর্যায়ে 'সাবীলিল্লাহ'র অংশ সম্পর্কে ইমাম নববী ও শাফেয়ী মাযহাবের অন্যান্য আলিমের মতের উল্লেখ আমরা করেছি। তা হচ্ছে সুশৃংখল সেনাবাহিনীর বেতন দান যদি বায়তুলমাল থেকে সম্ভবপর না হয়, তাহলে তা দেয়া সমাজের ধনী লোকদের দায়িত্ব হবে। তা যাকাতের বাইরে থেকে দিতে হবে।

মালিকী ফিকাহবিদ কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাঁর احكام القران। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ধন-মালে যাকাত ভিন্ন আর কিছু পাওনা নেই। কিন্তু যাকাত দিয়ে দেয়ার পর যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেজন্যে অর্থদান করা ধনী লোকদের কর্তব্য হবে, এতে সমস্ত আলিম একমত।

---

١. نهاية المحتاج ٧ ص ١٩٤ ٢. احكام القران للجصاص ج ٣ ص ١٣١

ইমাম মালিক বলেছেন ঃ সমস্ত মুসলমানের ওপর কর্তব্য, ওয়াজিব হচ্ছে কাফিরদের হস্তে তাদের লোক বন্দী হলে তা মুক্ত করা। তাতে তাদের সমস্ত ধন-মাল ব্যয় হলেও তা করতে হবে।

অনুরূপভাবে প্রশাসক যদি যাকাত সংগ্রহ্ করার পর তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টন না করে, তখনও কি গরীবদের সচ্ছল বানানো কর্তব্য হবে ধনী লোকদের?.... খুবই বিবেচ্য বিষয়। আমার মতে, হ্যাঁ, তা তাদের ওপর ওয়াজিব হবে।[১]

কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ বিষয়টির ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লিখেছেন ঃ মুসলিম জনসমষ্টির ওপর কোন বিপদ বা অভাব দেখা দিলে—যাকাত দিয়ে দেয়ার পর—সেজন্যে অর্থ ব্যয় করা ধনী লোকদের জন্যে ওয়াজিব। ইমাম মালিক (র)-ও এ কথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ লোকদের ওপর ওয়াজিব তাদের বন্দীদের 'ফেদিয়া' দিয়ে মুক্ত করা। তাতে তাদের সব মাল নিঃশেষ হয়ে গেলেও। তারপরে বলেছেন ঃ এটা ইজমাও বটে! তাতে আমাদের মতই শক্তি পায়।[২]

মালিকী পন্থী শাতেবী তাঁর অনন্য গ্রন্থ الاعتصام-এ লিখেছেন ঃ 'বায়তুল মাল যখন শূন্য হয়ে যাবে, তখন যদি সেনাবাহিনীর জন্যে আরও ধন-মালের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সুবিচারক রাষ্ট্র-নায়কের অধিকার আছে, সে ধনী লোকদের ওপর মাসিক হারে সেই টাকা ধার্য করে দেবে কররূপে যা অবস্থার অনুপাতে যথেষ্ট হবে এবং তা বায়তুলমালে নতুন করে সম্পদ আসা পর্যন্ত চলতে থাকবে।[৩]

এসব অকাট্য স্পষ্ট মত হচ্ছে সে ফিকাহবিদদের, যাঁরা ধন-মালের ওপর যাকাত-বহির্ভূত কোন হক্ ধার্য হতে পারে বলে মনে করেন না। এ থেকে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাঁরা এ মত পোষণ করেন, তাঁরা আসলে অত্যাচারমূলক কর ধার্যকরণেরই বিরোধিতা করেছেন। কেননা শাসক প্রশাসকরা সাধারণত এরূপ করই ধার্য করে থাকে—তাদের নিজেদের এবং তাদের অনুসারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিপুলতা ও বিশালতা বিধানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার ফলে গোটা জাতির জীবন কঠিনভাবে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যদিও এরূপ কর ধার্যকরণের ফলে বিশেষ কোন প্রয়োজন পূরণ হয় না, সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যেও তা প্রয়োজনীয় হয় না। সম্ভবত এ আলিমগণ ভয় পেয়েছেন এই ভেবে যে, যাকাতের বাইরেও প্রাপ্য বা দেয় আছে, এ মত দিলে অত্যাচারী শাসকরা আনধিকারভাবে কর ধার্য করা ও অত্যাচারমূলক অর্থ আদায়ে তাদের এ মতকে একটা মাধ্যম বানিয়ে নেবে। এ কারণে তারা তাদের এ জুলুমমূলক কার্যের পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বলে দিয়েছেন যে, না যাকাতের বাইরে কিছুই নেয়ার বা পাওয়ার কোন অধিকার নেই।[৪]

---

১. تفسير القرطبى ج ٢ ص ٢٢٣ ২ احكام القران القسم الاول ٥٩ - ٦٠.

৩. الاعتصام ج ١ ص ١١٢

৪. নবম অধ্যায়ে — 'যাকাত ও কর' শীর্ষক সপ্তম পরিচ্ছেদে অধিক বিস্তারিত আলোচনা দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এখানে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষ প্রকৃত মতদ্বৈততার মধ্যে পড়ে গেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রেরও নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

ক. কাটাকালে কৃষি ফসল ও ফলের ওপর হক্;

খ. মেহমানের অধিকার;

গ. সধারণ ব্যবহার্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের الماعون। হক্ ।

দ্বিতীয় মতের লোকদের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত সবগুলোই ধন-মালে ওয়াজিব হক্। তা আদায় করতে ত্রুটি করা হলে মুসলমান গুনাহগার হবে এবং সেজন্যে আল্লাহ্র কাছে কঠিন আযাব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে প্রথম মতের লোকদের দৃষ্টিতে এগুলো মুস্তাহাব হক্। করলে আল্লাহ্র কাছে সওয়াব পাওয়া যাবে আর না করলে কোন গুনাহ্ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার বাস্তবিক প্রয়োজন দেখা না দেবে। তা দেখা দিলে তো তা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। জাসসাস বালতি তৈজসপত্র, ভাণ্ড–বাটি, কোদাল ইত্যাদি 'ধার' বাবদ দেয়া পর্যায়ে এ কথাই বলেছেন।[১] এসব জিনিস 'ধার' বাবদ দেয়া প্রয়োজনকালে তো ওয়াজিব। দিতে অস্বীকার করলে সে ঘৃণা ও তিরস্কারের যোগ্য হবে। প্রয়োজন ব্যতিরেকে তা দিতে অস্বীকার করা হলে নিশ্চয়ই তা অপরাধ এবং মুসলিম সমাজের রীতিনীতি চরিত্রের বিরোধিতা হবে অথচ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি তো উত্তম ও মহান চরিত্রাবলীকে পূর্ণত্ব দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।[২]

ঙ. এ পর্যন্ত আংশিক অধিকার পর্যায়ে যা কিছুই বলেছি, তা ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব লোকদের অধিকার সম্পর্কে বলেছি। দ্বিতীয় মাযহাব পন্থীদের দৃষ্টিতে এ অধিকারগুলো ওয়াজিব। প্রত্যেক দেশ–শহ্র স্থানের ধনী লোকদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে দিয়ে গরীবদের পার্শ্বে দাঁড়াবে। এ ছাড়াও আরও যা যা প্রয়োজন তাও এর মধ্যে গণ্য। এজন্যে প্রশাসন ধনীদেরকে বাধ্য করবে, যদি যাকাত ও বায়তুলমালের অন্যান্য আয় থেকে তা পূরণ না হয়।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান

এ অধিকারসমূহ যথেষ্ট বিরোধী—বিশেষ করে এ শেষোক্তটি। এ জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এখানে কিছুটা স্থিতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

১. কাটাইর সময় ফসল ও ফলের হক্ পর্যায়ে 'ফসল ও ফলের যাকাত' শীর্ষক আলোচনায় এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি যে, এ 'হকে'র অর্থ হচ্ছে 'ওশর' ও 'অর্ধ ওশর'। পূর্বের কিছু লোক এ মতই দিয়েছেন, তাতে আয়াতটির মক্কী হওয়ার পথে

---

১. احكام القران للجصاص ج ٣ ص ٥٨٤।

২. বুখারী এ হাদীসটি ادب المفرد এ উদ্ধৃত করেছেন এবং ইবনে সায়াদ الطبقات। গ্রন্থে হাকেম المستدرك। গ্রন্থে, বায়হাকী المشرب। এ আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। হাদীসটির সনদ সহীহ ব্যাখ্যা كما فى التيسير ج ١ ص ٣٦٢

কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। মক্কী যুগে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত হক্ আদায় সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি নির্দেশ দিয়েছেন। পরে মদীনায় এসে রাসূলে করীম (স)-এর জবানীতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়েছেন। ফলে তা এমন সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি কথা যার বিস্তারিত আল্লাহই বলে দিয়েছেন। আগের কালের কেউ কেউ যে মনসূখের কথা তুলেছেন, এটা তারও ব্যাখ্যা।

২. মেহমানের হক্ পর্যায়ের হাদীসসমূহ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, তার অর্থ, এমন বিদেশী লোক, যে কোন দূরবর্তী স্থান থেকে এখানে এসেছে। সে তখন নিঃস্ব পথিক (ইবনুস সাবীল) পর্যায়ে গণ্য। এ কারণে ইবনে আব্বাস ও তাবেয়ীদের একটি দল বলেছেন ঃ ইবনুস সাবীল বলতে মেহমান বুঝিয়েছে।[১] হাদীসসমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, মেহমানের আসলে তার মেহমানদারী পাওয়ার অধিকার আছে। আর এটা নিঃসন্দেহ যে, এ ব্যবস্থা যাকাতের বাইরে এবং অতিরিক্ত।

৩. الماعون। সাধারণ ব্যবহার্য জরুরী জিনিসপত্রের অধিকার বা তার ওপর জনগণের হক্ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার যৌক্তিকতা এই যে, যদি তা ওয়াজিব না হত, তাহলে তা তরক করার দরুন আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হত না, কুরআনে জাহান্নামের হুমকি দেয়া হত না। যাঁরা এ الماعون।এর অর্থ যাকাত করেছেন, তাঁরাও একথা বলেন নি যে, ঘরের সাধরণ জিনিসপত্র, যা লোকেরা পারস্পরিক ধার ও দেয়া-নেয়া করে। এ থেকে তা বোঝা যায় না।

৪. ধনী লোকদের ধন-মালে ফকীর-মিসকীনের যে হক্ আছে এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহের ব্যবহার করাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে ওয়াজিব করেছেন, তাদের খাওয়া-পরা ইত্যাদি প্রয়োজনসমূহ পূরণের যে তাগিদ আছে তা এতই স্পষ্ট ও প্রকট যে, তা একটা বা দুটো আয়াতে কিংবা একটা বা দুটো হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলিষ্ঠ করে তোলার কোন প্রয়োজনই নেই। তবে আলিমগণ ليس البر। আয়াতটি এবং ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক্ আছে'-এ হাদীস উল্লেখ করার পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা শুধু প্রথম ভিত্তি স্থাপন ও স্বরূপ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মাত্র। আর তা হচ্ছে ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক্ আছে। কিন্তু মূল বিষয়টি সম্পর্কে দলিল-প্রমাণসমূহ নবীন উষার রক্তিম আলোকছটার চাইতেও অধিক স্পষ্ট ও প্রকট। কেননা ইসলামী ব্যবস্থার প্রকৃতি কুরআনের মক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহের আলোকে যেভাবে গড়ে উঠেছে এবং রাসূলে করীম (স)-এর সহীহ হাসান হাদীসসমূহ যেভাবে তার লালন করেছে, তাতে সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ ও নিরাপত্তা বিধান অবশ্য কর্তব্য হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহৃদয়তা-সংহতি ওয়াজিব, তা রক্ষা করা একান্তই কর্তব্য। তার এ সমজে শক্তিমান দুর্ধর্ষ দুর্বল হতে বাধ্য, ধনী দরিদ্রের হাত ধরে তুলতে বাধ্য ও নিকটাত্মীয়তার নৈকট্য রক্ষা করে চলতে বাধ্য। প্রতিবেশীদের পারস্পরিক অনুগ্রহের আদান-প্রদান অনিবার্য। যে লোক ইসলামের এসব মহান উচ্চশিক্ষার ও আদর্শ অগ্রাহ্য করবে, তার

---

১. দেখুন ঃ تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٠٨ من تفسير ايت "ليس البر"

জন্যে ইসলামেও কিছু নেই, রাসূল (স)-এর কাছেও কিছু নেই। সে আল্লাহ থেকে নিঃসম্পর্ক আল্লাহও নিঃসম্পর্ক তর সাথে।

বনু তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বিপুল ধন-সম্পদের মালিক। আমার পরিবারবর্গও আছে, আমার কাছে উপস্থিতও হয় অনেক লোক। এখন বলুন, আমি আমার ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যয় করব? আমাকে জানিয়ে দিন, আমি কেমন করব? তিনি বললেন ঃ তোমার মালের যাকাত দিয়ে দেবে। কেননা তা পবিত্রকারী—তোমাকে পবিত্র করবে। তোমার নিকটাত্মীয়দের সাথে 'ছেলায়ে রেহমী' কর, ভিক্ষা প্রার্থীর, প্রতিবেশীর ও মিসকীনের হক্ আছে জানবে।[১]

এ বাণীতে ভিক্ষাপ্রার্থী, প্রতিবেশী ও মিসকীনের হক্ আছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা যাকাতের পরের কথা। যাকাতের পর নিকটাত্মীয়দের 'হকের' কথা বলা হয়েছে। এ কথাটি ঠিক কুরআনের আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ 'এবং দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক্ এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের। অন্য হাদীসের সাথেও তার পূর্ণ সঙ্গতি বিদ্যমান—ভিক্ষাপ্রার্থীর অধিকার আছে—অবশ্যই স্বীকৃতব্য, সে অশ্বারোহী হয়ে এলেও।'[২]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না।[৩]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা কখ্খনই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তোমরা পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ কর। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ 'হে রাসূল' আমরা প্রত্যেকেই দয়াসম্পন্ন। বললেন ঃ তোমাদের পারস্পরিক দয়া-অনুগ্রহের কথাই বলছিলাম।[৪] এ ধরনের আরও অনেক হাদীস।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ যে পারস্পরিক দয়া-অনুগ্রহ, সহযোগিতা, দায়িত্ব গ্রহণ ও সহমর্মিতার নির্দেশ দেয়, তা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল তখন, যখন এ সমাজের সমান মানের অনুকূল অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার ও তার পরিবারবর্গে

---

১. আহমদ আনাস থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এর বর্ণনাকারী সকলেই সিকাহ সহীহ। ط المنيريه - الترغيب الترهيب ج ١ ص ٢٦٣ —আবূ উবাইদ ও ইবনুল মুনযিরও তা উদ্ধৃত করেছেন। الدر المنثور ج ١ ص ٤٩

২. হাদীসটি আহমদ মুসনাদুল হুসাইন ইবনে আলীতে উদ্ধৃত করেছেন। আবূ দাঊদ কিতাবুয্যাকাত-এ باب حق السائل—হাফেয ইরাকী বলেছেন, এর সনদ খুবই উত্তম। বর্ণনাকারীরাও সিকাহ كمافى الالى للسيوطى ج ٢ ص ١٤٠ এ শায়খ আহমদ শাকের তাঁর মুসনাদের ওপর লিখিত টীকায় হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (ج ٢ ص ١٧٣)

৩. বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। পূর্বেও এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে।

৪. তাবারানী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন আবূ মূসা থেকে। সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীরাই এর বর্ণনাকারী। মুনযেরী তাই বলেছেন ترغيب ৩য় খণ্ড كتاب القضا -তে।

খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, বাসস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস পায়—তার কেন একটি থেকেও বঞ্চিত না হয়।

রাষ্ট্রের যাকাত সম্পদ ও বায়তুলমালের আয় যদি এরূপ সমমানের অর্থ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে তো ভালই। তখন মুমিন লোকেরা গরীব-মিসকীনের অপরাপর অধিকার আদায়ের জন্যে চেষ্টিত হবে। কিন্তু যাকাত সম্পদ ও ন্যায্য আয় যদি দারিদ্র মোচনে যথেষ্ট মাত্রায় সক্ষম না হয়, গরীব লোকদের সচ্ছল বানাতে না পারে, তা হলে সক্ষম ধনী লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে এ গরীবদের প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণের জন্য তারা চেষ্টানুবর্তী হবে। প্রত্যেকেই তার নিকটাত্মীয়তার সীমার মধ্যে কাজ করবে, ছেলায়ে রেহমী রক্ষা করবে। তাদের কিছু লোক যখন এ কর্তব্য পালন করে তাদের ঈমান রক্ষায় উঠে পড়ে লাগবে, যার ফলে অভাবগ্রস্ত লোকেরা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে, তখন অন্যরাও গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায় রাষ্ট্রশাসকের দায়িত্ব হবে ইসলামের নামে এ কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং অক্ষম গরীব লোকদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাস্বরূপ ধনী লোকদের ওপর মাসিক হারে সাহায্য ধার্য করে দেয়া।

দুনিয়ার বহু লোকই যখন এই অগ্রবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তখনও ইউরোপ এ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। ইউরোপ এ সেদিন মাত্র এ ধরনের কল্যাণকর ব্যবস্থা সম্পর্কে অবিহিত হতে পেরেছে অথচ ইসলামের কুরআন ও সুন্নাহ্ এ ব্যবস্থা সেদিন থেকেই কার্যকরভাবে চালু করেছে, যেদিন ইসলামের সূর্য দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিল, রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ কোনরূপ অস্পষ্টতা ও ধারণাহীনতা ছাড়াই এ কাজকে চালু করে দিয়েছিলেন।

ভিন্ন মতের লোকদের দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হাদীসসমূহের তাৎপর্য

এক্ষণে প্রশ্ন জাগে, সে সব হাদীসের কি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা বাহ্যতা প্রকাশ করছে যে, ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই নফল দান-সাদকা ছাড়া এবং যে লোক যাকাত দিয়ে দিল সে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করে বসেছে?

এসব হাদীসের মধ্যে যে কয়টি সহীহ্ প্রমাণিত হয়েছে[১] তা থেকে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যাকাত হচ্ছে আবর্তনশীল দায়িত্ব ও কর্তব্য—তা সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ীভাবে ধন-মালে ধার্য হয়। প্রত্যক্ষভাবে স্থায়ী রূপ নিয়ে তা সরাসরি ধন-মালের ওপর কার্যকর। তা দিয়ে আল্লাহ্র নিয়ামত দানের শোকর আদায় করা হয়। ব্যক্তির নিজের মন-মানসিকতা ও ধন-মালের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জন করা হয়। এটা এমন একটা হক্ যা আদায় না করে কোন উপায় নেই। কখনও যদি এমন হয় যে, যাকাত গ্রহণের জন্যে একজন ফকীর বা মিসকীনও পাওয়া যাচ্ছে না, যার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা যেতে পারে কিংবা যাকাতের অংশ ব্যয় করার যদি আদৌ কোন প্রয়োজনই না থাকে, তবুও তা দিতে হবে।

---

১. এ অধ্যায়ের শুরুতে এ হাদীসসমূহের মর্যাদা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

এ পর্যায়ে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মলিক মুসলিম ব্যক্তির কাছে সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় যাকাত ছাড়া আর কিছুই দাবি করা যাবে না, একথা ঠিক এবং সে যখন এ যাকাত দিয়ে দিল, তখন তার ধন-মলের ওপর ধার্যকৃত দায়িত্ব পালন করে বসল—তার ধন-মলের ওপর থেকে অন্যায় ও পাপকে দূর করে দিল। অতঃপর সে যদি নফলস্বরূপ কিছু দান-সদকা করে, তা হলে সে কথা স্বতন্ত্র, তাছাড়া তার আর কোন দায়িত্ব থাকে না।—হাদীসে যেমন বলা হয়েছে, এটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক অবস্থার স্থায়ী ব্যবস্থা।

কিন্তু অন্যান্য যেসব হক্-হকুকের কথা বলা হয়েছে, তা যাকাতের মত স্থায়ীভাবে ধার্যকৃত কোন জিনিস নয়। তার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণও নেই—যেমন যাকাতের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। এ শেষোক্ত হক্-হকুক অবস্থার ও প্রয়োজনের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং অবস্থা, যুগ-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনে তা পরিবর্তিতও হয়।

এসব হক্-হকুক সাধারণত মূল সম্পদের ওপর ধার্য হয় না, সেই হিসেবেও হয় না। তা হয় সামর্থ্যানুপাতে এবং কিছু লোক যখন তাও পালন করে—আদায় করে, তখন অন্যদের ওপর থেকেও সে দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়। অনেক সময় তা নির্দিষ্ট হয় এভাবে যে, একজন এক ব্যক্তিকে খুব সাংঘাতিক দূরবস্থায় পড়ে দেখতে পেল, সে তার এ দূরবস্থা দূর করতে পারে বলে মনে করল তখন তা করা তর জন্যে কর্তব্য অথবা কারোর প্রতিবেশী অভুক্ত কিংবা বস্ত্রহীন থাকলে এবং তাকে খাদ্য ও বস্ত্র সে দিতে সক্ষম হলে তাও তার করা কর্তব্য। সধারণভাবে এসব হক্-হকুক আদায় করার ব্যাপারটি ব্যক্তিদের ঈমান ও দায়িত্ব জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করা হয়—কোনরূপ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার ছাড়াই ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আঞ্জাম দেয়, সেটিই চওয়া হয়। কিন্তু কোন মুসলিম শসক যদি মনে করে যে, এ ঈমানী ওয়াজিব কাজটিকে আইনের শক্তিতে কার্যকর করা কর্তব্য—বিশেষ করে ব্যক্তিগণের অভাব যখন তীব্রতর হয়ে দেখা দেয় কিংবা রাষ্ট্রের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব-পরিধি বেড়ে যায়—একালে যেমন ঘটেছে—এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রকে তাতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এটা তার জন্যে একটা বাধ্যবাধকতা বিশেষ।

ইবনে তাইমিয়া 'ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য নেই' কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এর অর্থ—ধন-মালে এমন কোন হক্ বা প্রাপ্য নেই যাকাত ছাড়া, যা কেবলমাত্র ধন-মালের দরুনই ওয়াজিব হয়ে থকে। অন্যথায় এমন বহু দায়িত্ব ও কর্তব্যই রয়েছে, যা কেবল ধন-মালের দরুন ওয়াজিব হয় না। যেমন নিকটাত্মীয়, স্ত্রী, দাস ও গবাদিপশুর প্রতি কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে পড়ে। অনেক সময় রক্ত মূল্য দেয়ারও দায়িত্ব আসে। ঋণ শোধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিপদকালে দান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বুভুক্ষুকে খাবার খওয়ানো, বস্ত্রহীনকে পরিধেয় দেয়া ফরযে কেফায়া হিসেবে জরুরী হয়ে পড়ে।

এগুলোও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব হলেও তা অস্থায়ী কারণের দরুন। ধন-মাল হল ওয়াজিব হওয়ার শর্ত—যেমন হজ্জ পালনে সামর্থ্য একটা শর্ত। এখানে দেহ বা স্বাস্থ্য হজ্জ ফরয হওয়ার জন্যে জরুরী আর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ ধন-মাল থাকা শর্ত। তা কারণও বটে। এমন কি, সে স্থানে যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক পাওয়া না গেলেও তা ফরযই থাকবে, তবে অন্যত্র নিয়ে বণ্টন করতে হবে। এটা আল্লাহ্র হক্- আল্লাহ্রই নির্দেশে তা ফরয হয়েছে।[১]

---

১. مجموع الفتاوى - كتاب الايمان - الكبير ص ٣١٦

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাকত ও কর

- *কর-এর মৌল তত্ত্ব ও যাকাতের মৌল তত্ত্ব।*
- *কর ধরার আদর্শিক ভিত্তি এবং যাকাত ধার্য করার ভিত্তি।*
- *কর-এর ক্ষেত্র এবং যাকাতের ক্ষেত্র ।*
- *কর ও যাকাতের মধ্যে ন্যায়পরতার প্রাথমিক নীতি*
- *কর ও যাকাতের মধ্যে আপেক্ষিকতা ও হার উচ্চতা ।*
- *কর-এর নিরাপত্তা ও যাকাতের নিরাপত্তা।*
- *যাকাতের সঙ্গে কর ধার্যকরণ কি বিধিসম্মত?*
- *কর ধার্যকরণে যাকাত ফরয হওয়ার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে যায়?*

যাকাত ও কর

এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামী শরীয়াতের বিধান করা যাকাত এবং মানুষ প্রবর্তিত কর-এর মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা করেছি। আধুনিক চিন্তাধারা ও অর্থ ব্যবস্থা এ পর্যায়ে বিরাট অবদান উপস্থাপিত করেছে।

আমরা অবশ্য যাকাতকে কর-এর সাথে তুলনা করব না রোমান ও পারস্য সভ্যতার বা মধ্যযুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা সেসব যুগের প্রেক্ষিতে যাকাত ও কর-এর মধ্যে তুলনা করার কোন সাধ্যই আমাদের নেই। আমরা যাকাতের তুলনা করব কর-এর সাথে তার আধুনিক অবস্থা ও রূপের পরিপ্রেক্ষিতে—বহু বিবর্তন ও পরিবর্তনের স্তর পার হয়ে আসার পর। এখন তাতে বহু সুসমতা, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য বিধানের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। যুগান্তরের অভিজ্ঞতা তার দোষ-ত্রুটি জঞ্জাল অনেক কিছুই দূরীভূত করে তাকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ও পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে বহু বড় বড় বিদ্ধান-বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তার বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তা পরিপক্কতা লাভ করে নিজের শক্ত কণ্ডের ওপর মাথাও তুলে দাঁড়তে সক্ষম হয়েছে।

এ অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যাকাত ও আধুনিক কর-ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও অভিন্নতার দিকগুলো তুলে ধরব, যার ফলে উভয়েরই প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত হবে। যাকাত একটা অর্থনৈতিক ও বিশেষ প্রকৃতিসম্পন্ন ফরয হিসেবে প্রতিভাত হবে। জানা যাবে, তার মূল দর্শনও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । তার প্রকৃতি ও মৌল ভিত্তি অন্য সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—আলদা তার আয়ের সূত্র এবং ব্যয়ের খাতসমূহ ও তার মাত্রার পরিমাণ। অনুরূপভাবে তা স্বতন্ত্র তার সূচনা বা প্রাথমিক পদক্ষেপ ও চূড়ান্ত লক্ষ্যসমূহ, নিরাপত্তা দানের যোগ্যতা বা ততোধিক শতাব্দী পূর্বে বিধিবদ্ধ হয়েছে, এ যুগের অর্থনৈতিক ও কর সংক্রান্ত চিন্তা মৌলনীতি ও বিধি-বিধানের দিক দিয়ে যতদূর উন্নীত হয়েছে, যাকাত তাও ছাড়িয়ে গেছে। যাকাতে নিহিত তাৎপর্য—বিশেষত্ব লাভ করতে কর চিরদিনই অসমর্থ থাকবে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হল ? তাও আলোচিত হবে।

এই অধ্যায়ে আটটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হচ্ছে

১. কর-এর মৌল তত্ত্ব ও যাকাতের মৌল তত্ত্ব
২. কর ধার্য করণ ও যাকাত ধার্য করণের দার্শনিক ভিত্তি
৩. কর-এর ক্ষেত্র-সামর্থ্য ও যাকাতের ক্ষেত্র-সামর্থ্য
৪. কর ও যাকাতের মধ্যে সুবিচারের মৌল নীতি
৫. কর ও যাকাতের মধ্যে আপেক্ষিক ও উর্ধ্বতার হার
৬. কর-এর নিরাপত্তা বিধান এবং যাকাতের নিরাপত্তা বিধান
৭. যাকাতের পাশে কর বিধিবদ্ধকরণ
৮. কর ধার্য করণ যাকাতকে অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করে না

প্রথম পরিচ্ছেদ

কর-এর মৌল তত্ত্ব ও যাকাতের মৌল তত্ত্ব

অর্থনীতিবিদগণ জানেন, কর হচ্ছে একটা অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। ধনী ব্যক্তি তা রাষ্ট্রের কাছে দিয়ে যেতে থাকে। অবশ্য দেয়ার মত সামর্থ্য যদি তার থাকে। রাষ্ট্র সাধাণরভাবে যেসব কল্যাণমূলক কাজ করে তার মাধ্যমে যেসব সুযোগ সুবিধা করদাতা লাভ করে, সেদিকে তেমনটা দৃষ্টি দেয়া হয় না। অবশ্য রাষ্ট্র সরকার তার আয়ের দ্বারা একদিকে যেমন প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন করে তেমনি অপরদিক দিয়ে রাষ্ট্র যেসব অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় তার বাস্তবায়ন করে অপরদিকে।[১]

আর যাকাত শরীয়াত পারদর্শীদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী একটা সুনির্দিষ্ট অধিকার যা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের ধন-মালে ধার্য করেছেন। তাঁর কিতাবে ঘোষিত ফকীর-মিসকীন ও অন্যান্য পাওয়ার যোগ্য লোকদের জন্যে, আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে এবং মালের মালিকের মন-মানসিকতার এবং তার ধন-মালের পরিশুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে।

যাকাত ও কর-এর পারস্পরিক একত্বের কতিপয় দিক

উপরে যাকাত ও কর-এর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্যের কতগুলো দিক রয়েছে এবং রয়েছে কর ও যাকাতের মধ্যে কতিপয় সাদৃশ্যের দিকও। প্রথমে সাদৃশ্য ও অভিন্নতার দিক কয়টি তুলে ধরছি ঃ

ক. বাধ্যকরণ ও জোরপূর্বক আদায় করা—যা না হলে সাধারণত কর আদায় হয় না—এর ব্যবস্থা বা সুযোগ যাকাতেও রয়েছে, যদি কেউ ঈমান ও ইসলামের দাবি ও তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে না দেয়। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করেও তা আদায় করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এর চাইতে অধিক জোর-জবরদস্তির ও বাধ্যকরণের উপায় আর কি হতে পারে ? যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তলোয়ারের খাপ মুক্ত করতে যিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তিনি অতি বড় শক্তির অধিকারী ছিলেন।

খ. কর-এর বিশেষত্ব হল, তা সাধারণ ধন-ভাণ্ডারে—কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে

---

১. ডঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ ইব্রাহীম লিখিত আরবী গ্রন্থ مبادی علم المالیه -এর প্রথম খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। তাতে এ সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে কর প্রভৃতি গড়ে ওঠার রূপ এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কিতা আলোচনার সার হিসেবে।

অর্পণ করা হয়। স্থানীয় সরকারও বাদ যায় না।[১] যাকাতও এ রকমই। কেননা যাকাত মূলত সরকারের কাছেই দেয়। তা দিতে হয় কুরআন ঘোষিত العاملين عليه। যাকাত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের মাধ্যমে। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ. কর ব্যবস্থার মৌলনীতি হচ্ছে তার বিনিময়ে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট কিছু না পাওয়া। যার ওপর কর ধার্য হয়েছে সে বিশেষ সমাজ সমষ্টির অংশ হিসেবেই কর দেবে। সে উপকৃত হয় কর-এর বিভিন্ন ব্যবহার ও তৎপরতার দরুন। যাকাত দানের মুকাবিলায়ও দাতা কোন বিশেষ ফায়দা পাওয়ার লক্ষ্যে তা দেয় না। সে যেহেতু এমন একটি মুসলিম সমাজের অংশ যার সাহায্য-সমর্থন দায়িত্ব গ্রহণ ও ভ্রাতৃত্বের সুফল সে লাভ করে। এ কারনে সমাজের লোকদের সাহায্য কাজে অংশ গ্রহণ করা তার কর্তব্য হয়ে পড়ে। যাকাত সমাজের লোকদের নিরাপত্তা দেয় দারিদ্র্য অক্ষমতা ও জীবনের দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে। এও তার কর্তব্য যে মুসলিম উম্মতের সাধারণ কল্যাণে সে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে। কেননা এ উম্মতের মাধ্যমেই তো আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ হবে, দুনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হবে। যাকাত দানের ফলে সে নিজে কোন ফায়দা বা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন কিছুতেই সামনে আসবে না।

ঘ. আধুনিক প্রবণতায় কর-এর একটা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। তা নিছক আর্থিক লক্ষ্যেরও অনেক উর্ধ্বে। যাকাতেরও একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে যা দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। তার শিকড় খুব বেশী গভীরে নিহিত। উপরোল্লেখিত দিকগুলোতে যেমন তেমনি তা ছাড়াও আরও অনেক দিকে। ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে তার প্রভাবও অত্যন্ত প্রকট ও সক্রিয়।

যাকাত ও কর-এর মধ্যে পার্থ্যকের দিকসমূহ

উপরে সাদৃশ্য ও অভিন্নতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এর পর অনৈক্য ও পার্থক্যের দিকগুলো তুলে ধরছি। এ পার্থক্যের দিকসমূহ অনেক। নিম্নোদ্ধৃত বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

১. নাম ও শিরোনাম

যাকাত ও কর এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য প্রথম দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়ে পড়ে উভয়ের নাম ও শিরোনাম দর্শনে। প্রত্যেকটি নামেরই একটা তাৎপর্য আছে, একটা ইঙ্গিত-ইশারাও রয়েছে।

'যাকাত' শব্দটিই আভিধানিক অর্থে পবিত্রতা প্রবৃদ্ধি ও বাড়তি প্রবণতা বোঝায়। বলা হয় زَكَّتْ نَفْسُهُ তার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়েছে। زَكَا الزَّرْعُ কৃষি চাড়া বড় হয়েছে। زَكَتِ الْبُقْعَةُ স্থানটি পবিত্র হয়েছে।

---

১. কর প্রসংগে এ শর্তটি আরোপ করা হয়েছে মধ্যযুগে ইউরোপে কৃষকরা জমির মালিককে কর দিত—সে অবস্থা এড়াবার লক্ষ্যে।

ইসলামী শরীয়াত যাকাতের এ নামকরণ করেছে এ উদ্দেশ্যে যে, ফকির মিসকীনকে যে মাল দেয়া ফরয করা হয়েছে শরীয়াত সম্মত কাজে যা কিছু ব্যয় করা হয় তা সবই যেন এ নাম দ্বারা বোঝা যায় এবং নামটি শোনা মাত্রই যেন মনে একটা পবিত্রতার ভাবধারা জেগে ওঠে। কিন্তু 'কর' বা ট্যাক্স শব্দটি এরূপ নয়।

'কর' বলতেই সাধারণত জরিমানা, খারাজ—ভূমিকর কিংবা জিযিয়া ইত্যাদি বোঝা যায় অর্থাৎ তা ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া এক প্রকারের বাধ্যবাধকতা বিশেষ। প্রত্যেকেই বুঝে নেয় যে, এ বোঝা তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহন করে যেতে হবে। যেমন তাদের—ইয়াহুদীদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে—কুরআনের আয়াত।[১]

এ কারণে মানুষমাত্রই তাকে 'জরিমানা'র মত চাপিয়ে দেয়া দুর্বহ বোঝা মনে করে।

কিন্তু 'যাকাত' الزكاة। শব্দটি এবং তার পবিত্রকরণ, প্রবৃদ্ধি সাধন ও বরকত দানের ভাবধারা মানুষের মনে এ অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, মালিক যে মাল পুঁজি করে রাখে কিংবা নিজের ভোগ-ব্যবহারে লাগায় এবং তা থেকে আল্লাহ্র ধার্য করা হক্ আদায় করে না, তা এক্ষণে চরমভাবে অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত হয়ে পড়েছে। 'যাকাত'ই তা পবিত্র করতে পারে, লোভ ও কার্পণ্যের মলিনতা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন পবিত্র ও স্বচ্ছ নির্মল করতে পারে।

সেই সাথে একথাও মনে জাগিয়ে দেয় যে, যাকাতে বাহ্যত মাল হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তা তার মনে জাগে যে, এটা কেবল চর্মচোখ দিয়েই দেখা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাই পবিত্র করে, প্রবৃদ্ধি প্রদান করে ও পরিমাণে বেড়ে যায়। এটা তার চোখে ধরা পড়ে যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে সে দৃষ্টিতে। আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই বলেছেন এ আয়াতে ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ -

আল্লাহ্ সুদকে নিঃশেষ করেন এবং দানসমূহকে বাড়িয়ে দেন।[২]

বলেছেন ঃ তোমরা যা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর তিনিই তার স্থলাভিষিক্ত এনে দেন।[৩]

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যাকাত দেয়ার মাল কখনই কমে যায় না।[৪]

অনুরূপভাবে মনে এ ভাবও জাগিয়ে দেয় যে, পবিত্র, প্রবৃদ্ধি ও বরকত কেবল মালই পায় না; বরং যাকাতদাতা ব্যক্তিও পায়, তার গ্রহণকারীও সেই ভাবধারায় সিক্ত হয়। যাকাত পাওয়ার যোগ্য ও গ্রহণকারী লোকের মন যাকাতের দরুন হিংসা ও শত্রুতার ভাব থেকে পবিত্র হয় এবং তার জীবিকা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। কেননা তাও তার পরিবারবর্গের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণ সে পেয়েই গেছে।

---

১. আল-বাকারা ঃ ৬১ আয়াত। ২. আল -বাকারা—২৭৬ আয়াত। ৩. ٣٩ - سبا

৪. হাদীসটি তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন।

আর যাকাতদাতার মন নিষ্কৃতি পায় লোভ ও কার্পণ্যের কলুষতা থেকে। ত্যাগ-তিতিক্ষা দান ও ব্যয় বহন দ্বারা তার মন পবিত্র হয়ে ওঠে। এর কারণে তার মনে-পরিবারে ও ধন-মালে বিপুলতা এসে যায়। কুরআন মজীদ একথা বোঝাবার জন্যই বলেছে ঃ

তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি তাদের পবিত্র কর, পরিশুদ্ধ কর তার দ্বারা।[১]

২. মৌলতত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্র

যাকাত ও কর-এর মধ্যে পার্থক্যের দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে যাকাত হচ্ছে একটা ইবাদত যা মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয করা হয়েছে আল্লাহ্র শোকর আদায়স্বরূপ তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু 'কর' এরূপ নয়। তা নিছক একটা সামাজিক বাধ্যবাধকতা, ইবাদত বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কোন ভাবধারাই তাতে নেই। এ কারণে যাকাত আদায় করার জন্যে এবং তা আল্লাহ্র কাছে কবুল হওয়ার জন্যে 'নিয়ত' একটা জরুরী শর্ত। কেননা নিয়ত ছাড়া কোন ইবাদতই হয় না। 'আমলসমূহের মূল্যায়ন নিয়তের ভিত্তিতেই হয়—হাদীসের কথা এবং 'লোকদের শুধু এ আদেশই করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্যে খালেছ ও একনিষ্ঠ করে'। —কুরআনের ঘোষণা।[২]

এ কারণেই বলা হয় যে, যাকাত ইসলামী ফিকাহ্য় এক প্রকারের ইবাদত বিশেষরূপে গণ্য। এ কথা কুরআন ও সুন্নাহ্র কথার তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। কেননা উভয় দলিলেই যাকাতকে নামাযের পাশেই উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের মক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের প্রায় বিশটি স্থানে এরূপ লক্ষ্য করা যায়। আর হাদীসের যে কত স্থানে তা রয়েছে তা গুনে শেষ করা যায় না। প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরীল–এ তাই রয়েছে ঃ 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর সংস্থাপিত' এ হাদীসে এবং এরূপ অন্যান্য হাদীসেও তাই হয়েছে। এ দুটোই ইসলামের পাঁচটি রুকন-এর মধ্যে শামিল এবং ইসলামের চারটি মৌলিক ইবাদতের অন্যতম।

আর যাকাত যখন একটা ইবাদত, একটা বিশেষ বিশেষত্বসম্পন্ন সংস্কৃতি, ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটা দ্বীনী রুকন যা কেবল মুসলমানের ওপরই ফরয করা হয়েছে। এজন্যে মহান শরীয়াত অমুসলিম নাগরিকদের ওপর ইবাদতের প্রকৃতি দ্বীনী বিশেষত্বসম্পন্ন একটা আর্থিক দায়িত্ব অমুসলমানের ওপর চাপানো হয়নি। কিন্তু 'কর' সেরূপ নয়। তা মুসলিম অমুসলিম উভয়ের ওপর—তাদের দেয়ার সামর্থ্যানুপাতে ধার্য হয়ে থাকে।

৩. নিসাব পরিমাণ নির্ধারণে

যাকাত একটা পরিমিতিসম্পন্ন ও শরীয়াত নির্ধারিত ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি মালের

---

১. التوبه – ١٠٣ ২. البينة – ٥

একটা নিসাব নির্দিষ্ট রয়েছে। সেই পরিমাণের কম মালের মালিকদের তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তা থেকে দেয় পরিমাণটাও নির্দিষ্ট রয়েছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে দশ ভাগের এক-ভাগ পর্যন্ত—তার অর্ধেকও হতে পারে। দশ ভাগের এক ভাগের এক দশমাংশও একটা পরিমাণ। শরীয়াত এই যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে, তাতে এক বিন্দু পরিবর্তন করার কারোর কিছুমাত্র অধিকার নেই। না তার বেশী ধার্য করা যায়, না কম। যারা যাকাতের ফরয পরিমাণ বৃদ্ধির ডাক দিয়েছে, আধুনিক কালের অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক-সামাজিক পরিবর্তনসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা আসলে আমাদেরকে একটা মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

'কর' এরূপ নয়। তার ক্ষেত্র, তার নিসাব পরিমাণ, তার মূল্যায়ন ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি সব কাজই রাষ্ট্র-সরকারের চিন্তা-ভাবনা ও প্রশাসকদের পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। রবং রাষ্ট্র-সরকারের প্রয়োজন অনুপাতে পরিমাণ নির্ধারণের ওপরই তার স্থিতি ও অস্থিতি একান্তভাবে নির্ভরশীল।

৪. স্থিতি ও স্থায়িত্বের দিক দিয়ে

এ আলোকে বলা যায়, যাকাত একটি স্থিতিশীল ও চিরন্তন ব্যবস্থা। এ পৃথিবীর বুকে যদ্দিন ইসলাম ও মুসলমান থাকবে, এ ব্যবস্থাও ততদিন কার্যকর থাকবে। কোন অত্যাচারী প্রাশসকও তা নাকচ করতে পারে না, সুবিচারের নাম করেও তাতে কেউ কোন পরিবর্তন আনবার অধিকারী নয়। তা নামাযের বিশেষত্বসম্পন্ন। নামায হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি স্তম্ভ আর যাকাত হচ্ছে ইসলামের পুলযোগসূত্র। কিন্তু কর ব্যবস্থায় এরূপ স্থিতিশীলতা ও চিরন্তনতার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তার প্রকার, তার নিসাব ও পরিমাণ নির্ধারণেও কোন স্থিতিশীলতা নেই। প্রত্যেকটি সরকারই তাতে হস্তক্ষেপ করতে, তার পরিমাণ যেমন-ইচ্ছা নির্ধারণ করতে পারে অথবা সরকারী দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা তাতে যে কোন পরিবর্তনও আনতে পারে। তাকে চালু রাখাও তাদেরই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। পূর্বে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। তা অস্থায়ী ব্যবস্থা। তা প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ধার্য হয়, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাও শেষ হয়ে যায়।

৫. ব্যয়ের ক্ষেত্রে

যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার কিতাবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। রাসূলে করীম (স) তাঁর কথা দিয়ে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং কাজ দিয়ে তা বাস্তবায়িত করেছেন—এ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ব্যয়খাত সমূহ। মুসলিম ব্যক্তিমাত্রই তা জানতে ও বুঝতে পারে, পারে নিজস্বভাবে তার সব অথবা তার একটা বড় অংশ বিতরণ করে দিতে যখন তার প্রয়োজন দেখা দেবে। এ ব্যয়খাতসমূহ যেমন মানবিক তেমনি ইসলামসম্মতও। কিন্তু 'কর' রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়াজনসমূহ পূরণার্থে ব্যয় করা হয়ে থাকে এবং সে খাতসমূহ সরকারই নির্ধারণ করে থাকে।

যাকাতের বাজেট পরিকল্পনা রাষ্ট্র-সরকারের সাধারণ বাজেট পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেসব খাতে ব্যয় করা সুনির্দিষ্ট—যা কুরআন কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত, কেবলমাত্র তাতেই তা ব্যয় করা যাবে—'আল্লাহ্‌র ধার্য করা ফরয'—কুরআন।[১]

৬. রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে

এ থেকেই জানা যায়, 'কর' আদায়ের ব্যাপারটি সম্পদ মালিক ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপার। প্রশাসন কর্তৃপক্ষই তা আরোপ করে, তা-ই ব্যক্তিদের কাছে থেকে আদায় করে, দেয় করের হার তাই নির্ধারণ করে। তারই অধিকার আছে তার পরিমাণ কম করার। তার কোন অংশ মাফও করে দিতে পারে বিশেষ কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ও বিশেষ কোন কারণে অথবা স্থায়ীভাবে কাউকে নিষ্কৃতিও দিতে পারে। তা যে কোন কর ধার্যকরণের বা প্রত্যাহার করার অথবা সর্বপ্রকারের কর সম্পূর্ণ বাদ দেয়ারও অধিকারী। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যদি তা ছেড়ে দেয় অথবা তা আদায় করতে বিলম্ব করে তাহলে তাতে করদাতার কোন অপরাধ হবে না। তার কাছে কিছুই চাওয়া হবে না। কিন্তু যাকাতের অবস্থা ভিন্নতর। প্রথমত তা যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে তার ও তার আল্লাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপার। কেননা তিনিই তো ধন-মাল দিয়েছেন। তিনিই তা থেকে যাকাত দেবার হুকুম দিয়েছেন—তাঁর নির্দেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তা দেয়া হয়। তিনিই তার পরিমাণ জানিয়ে দিয়েছেন, তা ব্যয় করার খাতসমূহও তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন। যাকাত সংগ্রহকারী ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বন্টনকারী মুসলিম রাষ্ট্র যদি না রাখে তা হলে মুসলিম ব্যক্তির ওপর তার দ্বীন এ দায়িত্ব অর্পন করে যে সে নিজেই তা বন্টন করবে। তা থেকে সে কোন অবস্থায়ই নিষ্কৃতি পাবে না। এ ব্যাপারে তা ঠিক নামাযের মতই। মুসলমান যদি এমন স্থানে থাকে যেখানে মসজিদ নেই, নামায পড়াবার ইমাম নেই, তাহলে তার পক্ষে যে রকমেই সম্ভব নামায পড়ে নেবে। তার নিজের ঘরে বা অন্য কোথাও পড়তে পারে। কেননা মুসলমানের জন্যে গোটা জমিনই মসজিদতুল্য। কোনক্রমেই নামায তরক করা যাবে না। আর এ নামাযেরই বোন হচ্ছে যাকাত।

এ কারণে মুসলিম ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে, সে অন্তরের সন্তুষ্টি সহকারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত দিয়ে দেবে, অবশ্য দেয় হিসেবে আদায় করবে, আল্লাহ যেন তা কবুল করেন, তা প্রত্যাখ্যান না করেন, মনের এ ঐকান্তিক কামনা নিয়ে যাকাত প্রদান করবে। আল্লাহ্‌র কাছে তা কবুল করার জন্যে দো'আ করাও তার কর্তব্য। যেমন একটি দো'আর নমুনা হচ্ছেঃ 'হে আমাদের আল্লাহ! তুমি এ যাকাতকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্টি সহকারে দেয়া রূপে গণ্য কর, জরিমানার মত জোর করে আদায় করা জিনিস বানিও না।'

এই প্রেক্ষিতেই মুসলিম ব্যক্তি যাকাত প্রদানে অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে থাকে। তা ফাঁকি দিতে চায় না কখনই। যেমন সাধারণ মানুষ কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে থাকে

১. সূরা তওবার ৬ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

সাধারণভাবে। যদি তারা ফাঁকি নাও দেয় তবু তারা দেয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন তার কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করা হচ্ছে। না দিয়ে পারলেই যেন বাঁচত এমনি ভাব। কিন্তু যাকাতের ব্যাপার ভিন্ন। মুসলমানরা যতটা যাকাত ফরয, তার চাইতেও অনেক বেশী দিয়ে থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায়, তাঁর কাছ থেকে সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে। নবী করীম (স)-এর যুগে এবং তার পরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। কর ও যাকাতের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

৭. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে

যাকাতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। কর ব্যবস্থা সে পর্যন্ত পৌঁছার কথা চিন্তাও করতে পারে না। আমাদের 'যাকাত' শব্দ সংক্রান্ত আলোচনায় এসব উচ্চ মহান লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছি। তার তাৎপর্য ও ভাবধারার কথাও বলেছি। 'যাকাতের লক্ষ্য ও তার প্রভাব' পর্যায়েও আমরা বিস্তারিত কথা বলে এসেছি। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যাকাত দিতে বাধ্য ধন-মালে মালিকদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন যাকাতের লক্ষ্য নির্ধারণে তার উল্লেখই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন ঃ তাদের ধনমাল থেকে যাকাত নাও—তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর তার দ্বারা এবং তাদের জন্যে পূর্ণ রহমতের দো'আ কর। কেননা তোমার এ দো'আ তাদের জন্যে সান্ত্বনার কারণ। এ কারণেই নবী করীম (স) যাকাত দাতার জন্যে সব সময় দো'আ করতেন তার মন ও ধন-মালে বরকত আসার জন্যে। যাকাত বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীর জন্যেও পসন্দনীয়—নবী করীম (স)-এর অনুসরণ করতে গিয়ে অনুরূপ দো'আ করবে। এমন কি কোন কোন ফিকাহবিদ এতটা বলেছেন যে, এ দো'আ করা ওয়াজিব। কেননা উক্ত আয়াতে সেজন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এরূপ নির্দেশ তো ওয়াজিব প্রমাণ করে।

কিন্তু কর ব্যবস্থা এরূপ লক্ষ্যের দিকে তাকাতেও পারে না। অর্থনীতিবিদরা তো দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের কোষাগারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা ছাড়া কর-এর আরও কোন লক্ষ্য থাকতে পারে বলে বিশ্বাসই করতে পারে নি। তারা এটার নাম দিয়েছেন 'কর সংক্রান্ত প্রবনতার মত'। পরে চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে; সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। লক্ষ্যহীনতার মতের পরাজয় ঘটেছে এবং 'কর'-কে একটা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় মনে করার এবং সেই কাজে তা বিনিয়োগ করার আহ্বান প্রবল হয়ে ওঠেছে। যেমন ব্যয়ের জন্যে উৎসাহ দান কিংবা পূর্ণত্ব ব্যয় কম বা সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ দান করার উপদেশ দান অথবা সমাজের লোকদের মধ্যকার পার্থক্য দূর করণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা 'কর'-এর অর্থনৈতিক লক্ষ্যের কাছাকাছি কথা। আর এটাই প্রথম লক্ষ্য।

কিন্তু কর ধার্যকারীরা সাধারণ অর্থনীতিবিদরা এবং চিন্তাবিদগণ তাকে বস্তুবাদী লক্ষ্যের বাইরে নিয়ে আসতে সক্ষম হননি। তার চাইতে প্রশস্ততর ও সুদূর লক্ষ্যাভিসারী

পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে যাকাত ফরয করা হয়েছে, সে লক্ষ্যে কর ব্যবস্থার পুনর্গঠন এখনো সুদূরপরাহত ব্যাপার।

৮. এ দুটির ধার্যকরণে চিন্তাগত ভিত্তির দিক দিয়ে

যাকাত ও কর-এর মধ্যে অধিক স্পষ্ট ও প্রকট পার্থক্যের দিক হচ্ছে তার ভিত্তির দিক, যার ওপর নির্ভর করে এ দুটির প্রত্যেকটি ধার্য করা হয়। 'কর' ধার্যকরণের আইনগত বা চিন্তাগত ভিত্তি নির্ধারণে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে তা চিন্তা ও মতবাদের পার্থক্যের কারণে। পরে আমরা তার উল্লেখ করব। কিন্তু যাকাতের ভিত্তি তো সুস্পষ্ট। তার ফরযরূপে ধার্যকারী ও পরিমাণ নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। চারটি মতবাদের মাধ্যমে আমরা তা স্পষ্ট করে তুলব। কিন্তু এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং তার কোনটি অপর কোনটিকে শক্তিশালী করে তোলে। আমি অবশ্য এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে একটা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ গ্রহণের পক্ষপাতী, তাহলেই সম্যক আলোচনা করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

যাকাত, ইবাদত ও কর—এক সাথে

এখানে আমরা বলতে পারি যে, যাকাত যেমন ইবাদত তেমনি একটি করও বটে। তা 'কর' এ হিসেবে যে, তা একটা সুপরিজ্ঞাত অর্থনৈতিক অধিকার বিশেষ। রাষ্ট্রই তা আদায় করার অধিকারী। ইচ্ছা করে না দিলে রাষ্ট্র জোর করে তা নেবে ও তা ব্যয় করবে এমন সব লক্ষ্যে যার কল্যাণ গোটা সমাজই পাবে।

তার পূর্বে তা হচ্ছে একটা ইবাদত, ইসলামের বিশেষত্বসম্পন্ন ব্যবস্থা। মুসলমান তা দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে এবং আদায় করলে তার মনে এ চেতনা জেগে ওঠে যে, সে ইসলামের রুকন পালন করছে। তা ঈমানের একটা অন্যতম শাখা বিশেষ। সে যাকে তা প্রদান করে, তাকে তা প্রদান করে আল্লাহ্র ইবাদতের কাজে তাকে সাহায্য করার লক্ষ্যে। এজন্যে তা প্রদান করা আল্লাহনুগত্য ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদন। তা না দেয়া সুস্পষ্টনরূপে আল্লাহ্র বিধান লংঘন। আর তার ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফরী। তা আল্লাহ্র হক্। তার আদায়কারী তা আদায়ে বিলম্ব করলে প্রশাসক তার প্রতি উপেক্ষা দেখালেও তা দেয়ার কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না ক্রমাগত কয়ক বছর না দিলেও তা ফরয এবং অবশ্য দেয়ই থেকে যাবে। তা কর-এর মত নয়। কর তো সরকার চাইলে দেয়া কর্তব্য হয় আর না চাইলে তা নাকচ হয়ে যায়।

এখানে যে কথাটির উল্লেখ করা জরুরী মনে হয়, তা হচ্ছে, আমাদের আলিমগণ (র) নিজেরা অবহিত ছিলেন —লোকদেরও অবহিত করেছেন যে, যাকাত এ দুটি অর্থেরই সমন্বয়—কর হওয়া ও ইবাদত হওয়া। যদিও তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় যাকাতকে 'কর' বলেন নি কখনও। কেননা এটা শেষেরদিকে পাওয়া পরিভাষা। তবে তারা এটাকে 'হক্ক' বলেছেন এ অর্থে যে, তা ধনীদের ধন-মালে গরীব-মিসকীনদের প্রাপ্য ও অবশ্য দেয়

অধিকার।[১] তারা অবশ্য যাকাতকে 'সিলায়ে রেহমী'র অর্থাৎ মানবতা ও ইসলামিকতাসম্পন্ন ব্যবস্থা বলেছেন আর এ দিক দিয়ে তা ইবাদতের ভাবধারাসম্পন্ন।

আমরা এই যে তাৎপর্যের কথা বললাম, الروض النضير। গ্রন্থ প্রণেতা যা বলেছেন, তা থেকে উক্ত কথার যৌক্তিকতা অধিক স্পষ্ট করে বোঝায়। তাতে যাকাতের তত্ত্ব ও যৌক্তিকতা পর্যায়ে বিশেষ আলিমগণের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা বলেছেন ঃ

> আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের ধন-মালে যাকাত ফরয করেছেন তাদের গরীব ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনস্বরূপ, ভাইদের প্রাপ্য অধিকার আদায় এবং প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ওয়াজিব কাজ করা হিসেবে। আল্লাহ্ তা'আলা যে সাহায্য দান ও ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছেন, তদনুযায়ী আমল করাই এর লক্ষ্য। তা ছাড়া এতে ধন-মালের মালিকদের পরীক্ষা করাও উদ্দেশ্য। কেননা ধন-মাল হচ্ছে মালিকদের কলিজার টুকরা। দৈহিক ইবাদতের হুকুম দিয়ে যেমন দৈহিক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে তাদের, এও তেমনি। তা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা রক্ষারও একটা ব্যবস্থা। তাতেও ইবাদতের দিকটি লক্ষ্যণীয়। আর ইবাদতের দিকটির কারণেই তাতে নিয়তের শর্ত আরোপিত হয়েছে। তাতে কোনরূপ নাফরমানী ইত্যাদির সংযোগ হওয়া নিষিদ্ধ।

তা সম্পর্ক রক্ষার একটা মাধ্যম বলে তাতে প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। সেজন্যে বল প্রয়োগ করাও সহীহ। রাষ্ট্রপ্রধান যখন তা মালের মালিকের কাছ থেকে জোর করে গ্রহণ করে তখন সেই মালিকের নিয়তের প্রতিনিধিত্ব করবে। মরে যাওয়া ব্যক্তি অসিয়ত করে না গেলেও তার মাল থেকে তা গ্রহণ করবে তাতে সম্পর্ক রক্ষার দিকটি প্রকট হওয়ার দরুন তাতে ফকীর–মিসকীনের অধিকতর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। না-বালেগের মাল থেকেও তা নেয়া হবে। আর যেহেতু সত্যানুভূতি জানানোই বড় লক্ষ্য বলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কেবল বিপুল সম্পদের ওপরই ফরয করেছেন। তাঁর নির্ধারিত নিসাবই হচ্ছে সেই পরিমাণের সম্পদ। বর্ধনশীল মাল ছাড়া অন্য জিনিসের ওপর তা ধার্য করা হয়নি। আর তা হচ্ছে নগদ টাকা, ব্যবসায় পণ্য, গবাদি পশু, জমির ফসল। শরীয়াতে প্রত্যেকটি ধরনের মালে নিসাব আলাদা–আলাদাভাবে নির্ধারিত হয়েছে, যা দ্বারা এ সহানুভূতি জ্ঞাপন সম্ভব হয়। শ্রম ও কষ্ট স্বীকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই ওয়াজিব পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই অ–সেচ ব্যবস্থার অধীন জমির ফসলের এক দশমাংশ আর সেচ ব্যবস্থাধীন জমির ফসলে তার অর্ধেক ধার্য হয়েছে।[২]

এ এক অতীব উত্তম বিশ্লেষণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা তা বিস্তারিত বলেছি।

---

১. দেখুন ঃ بداية المجتهد لابن رشد ج ١ ص ٢٣٧ - ط مطبعة الاستقامة

২. الروض النضير ج ٢ ص ٣٨٩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর ধার্যকরণ ও যাকাত ফরযকরণের দার্শনিক ভিত্তি

সম্ভবত যাকাতের নিগূঢ় তত্ত্ব স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এ কালের অর্থনীতিবিদগণ 'কর' ব্যবস্থা রূপায়ণ ও প্রবর্তন পর্যায়ে যা কিছু বলেছেন, তার উল্লেখ এখানে করা যথেষ্ট হবে। আইনত যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে তা ধার্য করা হয়, তার উল্লেখও প্রয়োজন। এ তুলনামূলক আলোচনার ফলে যাকাতের প্রকৃতি এবং তার আল্লাহ্ প্রদত্ত ফরয হওয়ার—পবিত্র কর হওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে। যাকাতের যে একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি রয়েছে, একটা বিশেষ দর্শন রয়েছে, তাও স্পষ্ট হবে।

'কর' ধার্য করণের আইনগত ভিত্তি

আলোচনাকারী ও চিন্তাবিদগণ আইনগত প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন। অন্য কথায়, লোকদের ওপর কর ধার্যকরণের আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত মতবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকগণ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, কর ধার্যকরণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যকার চুক্তির ওপর ভিত্তিশীল। এ মতের সমর্থকরা মনে করেন, রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক যেসব কাজ করে দেশবাসী ও রাষ্ট্রের মধ্যকার অকাট্য চুক্তির দরুন এবং যার ফায়দা ধনশালী লোকেরা পেয়ে থাকে, তারই বিনিময়স্বরূপ এ 'কর ' দেয়া হয়। এ মতটি জন-লক-রুশোর রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত সামাজিক চুক্তির (Social Contract)-এর সাথে সংগতিসম্পন্ন।

রাষ্ট্র ও করদাতাদের মধ্যে অকাট্য চুক্তি রূপায়ণে 'সামাজিক চুক্তি' মতের সমর্থকরা বহু মত প্রকাশ করেছেন।

'মিরাবু বলেছেন ঃ কর হচ্ছে নগদ মূল্যদান। ব্যক্তি এর মাধ্যমে সমাজ সমষ্টির সমর্থন ও প্রতিরোধ ক্রয় করে। তার অর্থ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার অকাট্য চুক্তিটি আসলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি।

অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, এ চুক্তিটা আসলে কাজ ভাড়ায় লাগানোর চুক্তি। রাষ্ট্র দেশবাসীর কল্যাণমূলক কাজকর্ম আঞ্জাম দেয় আর দেশবাসী এসব কাজের মজুরী হিসেবে কর দিয়ে থাকে।

মন্টেস্কো ও হবস বলেছেন ঃ এটা আসলে একটা বীমা চুক্তি বিশেষ। কর হচ্ছে এ বীমার কিস্তি, টাকার মালিক তার ধন-মালের অবশিষ্ট অংশের সংরক্ষণ মজুরী হিসেবে কর দিয়ে থাকে।

অবশ্য সমালোচকগণ স্পষ্ট করে বলেছেন, কর সম্পর্কে এ ধারণা মূলতই ভুল। কেননা রাষ্ট্র যেসব জনহিতকর কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকে এবং যার ফায়দাটা করদাতা পায়, এ দুটোর মধ্যে ভরসাম্যপূর্ণ বিনিময় হওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেহেতু দেশের জনগণের জন্যে যে সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ রাষ্ট্র আঞ্জাম দেয়, তাতে ভিন্নভাবে এক একজন নাগরিক কতটা কল্যাণ পেল, তার মূল্য নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়। যেমন নিরাপত্তা সংরক্ষণ, বিচার বিভাগ পরিচালন, শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা—সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষা। এসব কল্যাণমূলক নির্ধারণ তো আদৌ সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হত তাহলেও এ মতবাদটি অত্যাচারময় ফলাফলের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে দিত। কেননা গরীব শ্রেণীর লোকেরাই রাষ্ট্রের কল্যাণময় আনুকূল্য পাওয়ায় ধনীদের তুলনায় অধিক মুখাপেক্ষী। বিনিময় বা মজুরী প্রদান এ মতাদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে রক্ষার জন্যে কর-এর বিরাট বোঝা বহন করা তাদের জন্যেও কর্তব্য হয়ে পড়ে।

যেমন 'বীমা' মতবাদটি দুটো দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। একটি—এ মতটি রাষ্ট্রের কাজকে নিছক শান্তিরক্ষা পার্যন্তই সীমাবদ্ধ করে দেয়। কিন্তু তা বাস্তবতা পরিপন্থী। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে—বীমা চুক্তি বীমাকারীর স্কন্ধে সমস্ত খেসারতের বিনিময়ের বোঝা বহনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। অথচ রাষ্ট্রের যা কিছু ক্ষতি–লোকসান হয়, তার বিনিময় দেয়ার জন্যে ব্যক্তিগণকে বাধ্য করা হয় না।

রাষ্ট্রের প্রাধান্যের মতবাদ

উপরিউক্ত কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদটি কর ধার্যকরণের ভিত্তি হতে পারে না। এ কারণেই দ্বিতীয় মতাদর্শটি আত্মপ্রকাশ করেছে—তা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাধান্য।

এ মতবাদটির ভিত্তি হচ্ছে, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন করে সামাজিক–সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণার্থে। তাতে বিশেষ ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধনই তার লক্ষ্যভূত হয় না। কেননা সাধারণ জনকল্যাণ বিশেষ ব্যক্তিদের ওপর অধিক প্রভাবশালী ও ব্যাপক এবং বর্তমানের জনগণ ও ভবিষ্যতের জনগণের মধ্যে জাতীয় দায়িত্ব গ্রহণ ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী হচ্ছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

এ সব দায়িত্ব পালনের জন্যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। তাই রাষ্ট্রের এ অধিকার আছে যে, তার ছায়াতলে বসবাসকারী সমস্ত মনুষকেই এ ব্যয়ভার বহনের জন্যে বাধ্য করবে। কেননা তার রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের অধিকার। রাষ্ট্র এ বোঝা জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেবে প্রত্যেকেরই পক্ষে সহজ বহনের মাত্রা অনুযায়ী। তা হলেই সামষ্টিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হবে, আধুনিককালের রাজনৈতিক সমাজ এ দায়িত্বই পালন করে থাকে।[১]

---

১. এ আলোচনা লেখার জন্য আমরা ডঃ মুহাম্মাদ হলমী মুরাদ লিখিত বই ميزانية الدولة-এর ওপর নির্ভর করেছি (৭২-৭৫ পৃ.)। نهضة مصر কর্তৃক ১৯৫৫ সনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলোচনার শিরোনাম হচ্ছে ঃ الاساس القانونى العربعة।

যাকাত ফরয করার ভিত্তি

যাকাত ফরয করা এবং সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক অধিকার নির্ধারণ সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণপ্রসূত। এখানে তার বিশ্লেষণ দিচ্ছি ঃ

শরীয়াত পালনে বাধ্য করার সাধারণ দৃষ্টিকোণ

প্রথম, শরীয়াত পালনে বাধ্য করার সাধারণ দৃষ্টিকোণ। এ দৃষ্টিকোণ বা মতাদর্শের ভিত্তি হচ্ছে—নেয়ামতদাতা সৃষ্টিকর্তার অধিকার আছে তিনি তার বান্দাহগণকে নিজের ইচ্ছামত দৈহিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবেন। তাতে তাঁর হক্ আদায় হবে ও তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের শোকরও আদায় করা যাবে। তাদের মধ্যে কে উত্তম কর্মঠ, তা আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করতে পারবেন। তাদের মনে ও মানসিকতায় কি ভাবধারা রয়েছে তারও যাচাই-বাছাই হয় যাবে। তাদের অন্তরে নিহিত গোপন কথা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কে রাসূল (স)- এর অনুসরণ করছে, আর কে তা করছে না তাও দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে যাবে। এতে করে আল্লাহ্ ভালোকে মন্দ থেকে, অনুগতকে পাপী থেকে আলাদা করে নিতে পারবেন। তাদের আমলের পূর্ণ ফল দিতে পারবেন—তাতে তাদের একবিন্দু ঠকানো হবে না।

বস্তুত মানুষকে তো উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন করে সৃষ্টি করেন নি, বেকার ছেড়ে দেয়া হয়নি তাদের এ পৃথিবীর উম্মুক্ত প্রান্তরে। আল্লাহ্ই বলেছেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ -

তোমরা কি মনে করে নিয়েছ, আমরা তোমাদের নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি এবং শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমাদের নিকট ফিরে আসতে হবে না ?[১]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى -

মানুষ কি মনে করেছে, তাকে খুব সহজেই ছেড়ে দেয়া হবে ?[২]

না, তা কখনই হতে পারে না। আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, তাঁরা সুসংবাদ দিয়েছেন, আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। ফলে তারা আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ জানতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কি অধিকার বান্দাদের ওপর, বান্দাদের কর্তব্য কি তাঁর প্রতি—এ সবই জানা সম্ভব হয়েছে। এক্ষণে 'যারা খারাপ আমল করবে, তাদের তিনি শাস্তি দেবেন এবং যারা নেক আমল করেছে তাদের তিনি উত্তম শুভ ফল দেবেন।[৩] এটাই শুভনীতি।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান মাত্রকেই নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এটা হচ্ছে দৈনিক পালনীয় ফরয। দিন-রাতের মধ্যে পাঁচবার তা পড়তে হয় তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে। তা যেমন অলসতা ভাংগে, তেমনি খাহেশে নফসের উত্তেজনাও দমন করে।

---

১. المؤمنون - ١١٥ ২. القيامة - ٣٦ ৩. النجم - ٣١

উপেক্ষা ও অসতর্কতার অন্ধকার দূর করে। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মানুষকে মুক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ -

নামায অবশ্য খুব বড়—কঠিন কাজ—তবে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত লোকদের জন্যে তা নয়।[১]

আল্লাহ তা'আলা রোযা পালন ফরয করেছেন। এটা বার্ষিক—প্রতিবর্ষে আবর্তিত হওয়া ফরয। একটি পূর্ণ মাস মানুষ দিনের বেলা জঠর ও যৌন কামনা-লোভ চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ বান্দা আমারই জন্যে খাবার ত্যাগ করে আমারই জন্যে পানীয় পরিহার করে এবং আমারই জন্যে যৌন স্বাদ আস্বাদন ত্যাগ করে।'[২]

হজ্জ পালনও ফরয করেছেন। তা সারা জীবনের জন্যে একবার ফরয। মুসলমান হজ্জ করার জন্যে নিজের পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ও স্বদেশ ত্যাগ করে গাছপালা শস্যক্ষেত শূন্য মরু প্রান্তরের দিকে যাত্রা করে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের তা'জীম করা, আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করাই লক্ষ্য। ফলে সে সদ্যজাত শিশুর মতই নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানকে নামায ও রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটির প্রত্যেকটিই দৈহিক ইবাদত। ফরয করেছেন হজ্জ পালন, তা যেমন শারীরিক ইবাদত, তেমনি অর্থনৈতিকও। হুকুম দিয়েছেন যাকাত দেয়ার জন্যে। তা খালেসভাবে অর্থনৈতিক ইবাদত। তাতে নিজের কলিজার টুকরা ধন-মাল ব্যয় করতে হয়। তা জীবনের সার নির্যাস, তা-ই আবার দুনিয়ার ফিত্না। এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জনতে চান তাঁর প্রকৃত বান্দকে, কে তার নিজের সবকিছু আল্লাহ্র জন্যে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আর কে ধন-মালের বন্দেগী করে দুনিয়ার বন্দেগীতে লিপ্ত। আল্লাহ্র সন্তুষ্ট লাভের উর্ধ্বে দুনিয়াকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰـٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

যে লোক তার নফসের লোভ-লালসাকে দমন করতে পারল, প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম।[৩]

খলিফা বানানোর মত

দ্বিতীয় মতাদর্শ হচ্ছে, আল্লাহ্র ধন-মালে খলীফা নিয়োগ। এ মতাদর্শের ভিত্তি হচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় ধন-মালের নিরংকুশ ও মৌলিক মালিক হচ্ছেন মহান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ

১. البقرة – ٤٥

২. ইবনে খুজায়মা হাদীসটি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আসলে তা খুবারী মুসলিমে উদ্ধৃত। দেখুন ঃ الترغيب والترهيب للمنذرى ج ٢ كتاب الصيام

৩. الحشر – ٩

তা'আলা। মানুষ তাতে তাঁরই নিয়োজিত খলীফা। বিশ্বলোকের সব কিছুই—এর জমি, এর আকাশমণ্ডল সবই আল্লাহ্‌র মালিকানা। তিনিই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاللّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ -

যা কিছু আকাশমণ্ডলে রয়েছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই আল্লাহ্‌রই জন্যে।[১]

لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى لْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى -

যা কিছু আকাশমণ্ডলে, যা কিছু পৃথিবীতে এবং যা মাটির তলায় তা সবই আল্লাহ্‌রই জন্যে।[২]

• এক কথায় যা কিছু আছে, উর্ধ্বলোকে কি নিম্নের দিকে, তা সবই খালেসভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানা। তার কোন এক বিন্দুতেও তাঁর শরীক কেউ নেই। বলেছেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج لَايَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى لْاَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَالَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ -

বল, তোমরা ডাক সে সব লোকদের, যাদেরকে আলাহ ছাড়া প্রভু মালিক মনে কর, তারা আসমান জমিনের এক বিন্দু জিনিসেরও মালিক নয়, তাতে তাদের কোন অংশীদারীত্বও নেই এবং তাদের থেকে তার কোন পৃষ্টপোষকও নেই।[৩]

এ মালিকত্ব এই ভিত্তিতে যে, তিনিই এ সবের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই এ সব কিছুর সংরক্ষকও ঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ وَكِيْلُ -

আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক।[৪]

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا -

তিনি প্রত্যেকটি জিনিসই সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন।[৫]

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَو اجْتَمَعُوْالَهٗ -

তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের ডাক, তারা কস্মিন কালেও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না-তারা সকলে একত্রিত হলেও।[৬]

---

১. النجم – ٣١ ২. طه – ٦
৩. سبا – ٢٢ ৪. الزمر – ٦٢
৫. الفرقان ৬. الحج – ٧٣

সমস্ত ধন-মালের মালিক এক আল্লাহ, তিনিই তা তাঁর বান্দাদের দান করেছেন নিয়ামত হিসেবে। তিনিই সে সবের একক ও অনন্য স্রষ্টা ও উদ্ভাবক, উৎপত্তিকারক। মানুষের কাজ হচ্ছে উৎপাদন। এ উৎপাদন তো আল্লাহ্র সৃষ্টি বস্তুকে কেন্দ্র করে, যে বস্তুকে আল্লাহ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন ঃ উৎপাদন হচ্ছে বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি, বস্তু সৃষ্টি নয়। তার অর্থ, মানুষের শ্রম বস্তুতে রূপান্তরিত করে প্রয়োজনে ব্যবহারের লক্ষ্যে, তার পরই তা ব্যবহার করা বা তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভবপর।[১]

মানুষ যা কিছুই উৎপাদন করে, তাতে মূল বস্তুর প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণকে পরিবর্তিত করতে পারে না। বড়জোর তা তার আসল স্থান থেকে বের করে নিয়ে আসে উদ্ভাবন বা শিকারের মাধ্যমে অথবা যেখানে একটির বস্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত বিধায় তা এমন স্থানে নিয় যাওয়া হল যেখানে তার প্রয়োজন রয়েছে অথবা তার সংরক্ষণ করে, গুদামজাত রাখে ভবিষ্যতে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে অথবা তা কোন কোন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যাপারের জন্যে সেই বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে তা রেখে দেয়া হয় অথবা তা একটি আকৃতি ও বাহ্যিক রূপ থেকে পরিবর্তিত করে ভিন্নতর রূপদান করে তূলোধুনো করে বা বয়নে লাগিয়ে, অংকন বা পেষণ করে গুড়া বানানোর মাধ্যমে। অথবা দ্রব্য সামগ্রীকে একত্র করে একটা নতুন জিনিস তৈরী করা হল। এটা উপাদানসমূহে নিছক পরিবর্তন সাধনমাত্র—স্থানান্তর রূপান্তরকরণ। এমন কি এমন এক নতুন সম্পদ সৃষ্টি—যা পূর্বে ছিল না। যেমন কৃষি ফসল, পশু পালন। এক কথায় মানুষ বাহ্যিকভাবে অপর একটা জিনিস উৎপাদন করার ক্ষেত্রেই কাজ করে, শ্রম লাগায়।[২]

উৎপাদনে মানুষের ভূমিকা কতটা অর্থদর্শনের দিকপাল তার বর্ণনা এভাবেই দিয়েছেন। তা হচ্ছে নিছক মুক্তকরণ, অবস্থান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তর মাত্র। কিন্তু সে জিনিসের উদ্ভাবক কে ? তিনি হচ্ছেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -

আমাদের সেই রব্ব যিনি প্রত্যেকটি জিনিসই সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি দিয়েছেন।[৩]

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ

১. দেখুন ঃ ডঃ রফয়াত আল মাহজুব লিখিত الاقتصاد السياسي ১ম খন্ড ১৯১-১৯২ পৃ.

২. দেখুন ঃ ডঃ আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফীকৃত الاقتصاد السياسي গ্রন্থ ৭৪-৭৬ পৃ. পঞ্চম সংস্করণ।

৩. طه - ٥٠

لَكُمُ الْاَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ -وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ ط وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا-

আল্লাহ্ তো তিনি যিনি আকামণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং উর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষিয়েছেন, তার দ্বারা বিভিন্ন ফল-ফসল উৎপাদন করান তোমাদের রিযিকস্বরূপ। তিনি তোমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করেছেন নৌকা-জাহাজ, যেন তা নদী-সমুদ্রে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে। তিনি তোমাদের জন্যে খাল-নদীও নিয়ন্ত্রিত করেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে সূর্য এবং চন্দ্রকেও নিয়ন্ত্রিত করেছেন আবর্তনশীল অবস্থায় রাত এবং দিনকেও তোমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং তোমাদের সেসব জিনিসই তিনি দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছিলে, যার প্রয়োজন তোমরা বুঝেছিলে। তোমরা যদি আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তাহলে তা কখনই পারবে না।[১]

এমন কি এ পরিবর্তন ও মুক্তকরণ কর্মের সহজ পন্থা গ্রহণ ও তা করার শক্তি-বৃদ্ধি ও ক্ষমতা দান এবং এ পথে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থাও সেই আল্লাহই করে দিয়েছেন, যিনি আমাদের রব্ব, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অথচ মানুষ এর পূর্বে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। মানুষ যা জনতো না, তাও তাকে তিনিই জানিয়ে দিয়েছেন।

এ কথাটি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এখানে দৃষ্টান্তের অবতরণা করা হচ্ছে ঃ

মানুষ যখন চাষাবাদ করে বীজ বপন করে, সে বীজে গাছ হয় ও দানার ছড়া বের হয়ে আসে অথবা বৃক্ষরোপণ করে, তাতে ফল ধরে। এক্ষণে প্রশ্ন এ ফসল ফলানোয় ও ফল ধরানোয়—পানি নিষ্কাশন ইত্যাদিতে মানুষের শ্রম কতটা লেগেছে আল্লাহ্র কাজের মুকাবিলায় তুলনামূলকভাবে—যেখানে আল্লাহ্ জমিনকে বিনয়ী চাষযোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন, বাতাসের প্রবাহ চালিয়েছেন, মেঘ নিয়ন্ত্রণ করে উর্ধ্বলোক থেকে বৃষ্টি বর্ষিয়েছেন অথবা জমিনে খাল-ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন, প্রয়োজন পরিমাণ রৌদ্র ও তাপ দান করিয়েছেন, চন্দ্রের জ্যোতি প্রতিফলিত করেছেন, বাতস প্রবাহিত করেছেন, দানাকে মাঠির অভ্যন্তর থেকে খাদ্য গ্রহণে সক্ষম বানিয়েছেন বহু প্রকারের উপাদান থেকে। শেষ পর্যন্ত এক-একটা গাছ গড়ে ওঠেছে—শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব-ফুল ও ফল সমন্বিত।

স্পষ্ট দেখা যায়, মহান আল্লাহ্র অবদানের তুলনায় মানুষের কাজ ও শ্রমের যোগ তো খুব সামান্যই।

তাছাড়া মানুষ যে কাজ করে, আল্লাহ যদি তাকে বিবেক-বুদ্ধি চিন্তাশক্তি ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা না দিতেন, কার্যকর করার ক্ষমতা না দিতেন, কাজ করার হাতিয়ার না দিতেন, তা হলে মানুষ কি করে কাজ করত, কি করে উৎপাদন করত?

---

১. ابراهيم ٣٢ - ٣٤

মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র এ অশেষ দয়া ও অনুগ্রহের কথা কুরআন মজীদে বলা হয়েছে। তাদের সম্মুখে মহাসত্য উদ্ঘাটিত করার প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ - ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ - لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ - اِنَّالَمُغْرَمُوْنَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ - اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ - ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ - لَوْنَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَاتَشْكُرُوْنَ -

তোমরা যে চাষাবাদ কর, সে বিষয়টি কি কখনো ভেবে দেখেছ? তোমরা চাষাবাদ কর, ফসল ফলাও, না আমরা প্রকৃতপক্ষে চাষাবাদ করে ফসল ফলানোর কাজটি আঞ্জাম দিই? আমরা চাইলে সমস্ত ফসলকে ভুসি ও টুকরা-টুকরা বানিয়ে দিতাম, তখন তো তোমরা নানারূপ কথা রটাতে থাকতে যে, আমাদের ওপরই চাবুকটা পড়ল। বরং বলবে আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ হয়ে গেছে। তোমরা কি কখনও চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছ, যে পানি পান কর, তা কি তোমরাই মেঘ থেকে বর্ষিয়েছ কিংবা তার বর্ষণকারী আমরা ? আমরা ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত বানাতে পারতাম। (কিন্তু বনাই নি) তা সত্ত্বেও তোমরা শোকর কর না কেন ?[১]

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ - اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا - فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا -

মানুষের উচিত তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। আমরাই পানি ঢেলেছি, পরে জমিকে আমরাই দীর্ণ করেছি, তার ফলে তাতে উৎপাদন করেছি দানা, আংগুর তরিতরকারি।[২]

তৃতীয় একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ - وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ - لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَاعَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ -

তাদের জন্যে একটা নিদর্শন হচ্ছে মৃত জমি, আমরাই তা পুনরুজ্জীবিত করি এবং তা থেকে বের করি দানা, তার কোন কোনটি তারা খায়। আর পৃথিবীতে খেজুর ও

---

১. الواقعه ٦٣ - ٧٠ ২. عبس ٢٤ - ٢٨

আংগুরের ঘন সন্নিবেশিত বাগান বানিয়েছি এবং তার বুকে খাল-ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি, যেন তারা তার ফল ও তাদের হাতের কাজের ফসল খেতে পারে, তারা কি শোকর করবে না।[১]

হ্যাঁ এটাই প্রশ্ন, তারা শোকর করবে কিনা ? তারা তো এমন সব ফল-ফাঁকড়াও খায়, যা ফলানোর জন্যে তারা কোন শ্রম করেনি, যত্ন নেয়নি। তা ফলেছে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনে। তিনিই মৃত জমিন পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তা থেকে দানা বের করেছেন, বাগান রচনা করেছেন এবং ঝর্ণাধরাসমূহ প্রবাহিত করেছেন।

কেবল কৃষিক্ষেত্রেই আল্লাহ্র কুদরতী কাজ করেনি—করেছে সর্বব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে, জীবনের সব দিকে ও বিভাগে। তা কৃষি হোক, কি ব্যবসায় অথবা শিল্প কিংবা অন্য কিছু। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিল্পের কথা বলা যায়। আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসেবে কাঁচামাল আমরা পাই, তা মানুষের উৎপাদন নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা লৌহ বা ইস্পাত বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

এবং আমরা লৌহ নামিয়ে দিয়েছি, তাতে কঠিন শক্তি নিহিত এবং জনগণের জন্যে অশেষ কল্যাণ।[২]

আয়াতের انزلنا। শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ 'নাযিল করেছি'। তার ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহ্র কোন নৈসর্গিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লৌহ সৃষ্টি করেছেন, তাতে মানুষের কিছুই করবার ছিল না—ক্ষমতাও নেই।

আল্লাহ্র কুদরতের সৃষ্টি হিসেবেই ইন্ধন ও গতিশীল শক্তিসমূহ আমরা পেয়েছি। মানুষ না কয়লা সৃষ্টি করেছে, না পেট্রোল, না বিদ্যুৎ। মানুষ এগুলো আবিষ্কার করেছে মাত্র। কিন্তু বিশ্বলোক গর্ভে তা নিহিত করে রেখেছেন তো একমাত্র মহান আল্লাহই।

শিল্পোদ্ভাবনের পন্থা মানুষ আল্লাহ্র কাছ থেকে 'ইলহাম' হিসেবে জানতে পেরেছে। তিনিই মানুষকে এসব কিছুই শিখিয়েছেন অথচ মানুষ এ সবের কিছুই জনতো না। আল্লাহ নিজেই হযরত দাঊদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ ج فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ -

এবং তাকে আমরা পোশাক নির্মাণ শিল্প শিক্ষা দিলাম তোমাদের জন্যেই, যেন তোমাদেরকে তা রক্ষা করতে পারে তোমাদের অসুবিধা থেকে। তোমরা কি শোকর গুজার হবে ?[৩]

এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, সর্বপ্রকারের ধনমাল আল্লাহ্র সৃষ্ট, তিনি তা স্বীয় অনুগ্রহ ও দানস্বরূপ মানুষকে দিয়েছেন। তা আল্লাহ্র দেয়া রিযিক। তাই

১. ৩৫ - ٣٣ يسن   ২. ٢٥ - الحديد   ৩. ٨٠ - الانبياء

মনুষ যখনই স্বীয় কর্ম ও শ্রমের কথা স্মরণ করবে, তার পূর্বে স্মরণ করা উচিত এ সব জিনিসের সৃষ্টি ও উদ্ভাবনে আল্লাহ্র কুদরতের অবদানকে।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ -

তোমাদের কাছে যে নিয়ামতই রয়েছে, তা তো আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া।[১]

এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্র বান্দারা আল্লাহ্র কাছ থেকে বিপুল ধন-সম্পদ পেয়ে তার কিছুটা অংশ সে আল্লাহ্রই পথে, আল্লাহ্র কালেমা বুলন্দ ও প্রচারের কাজে এবং তারই অপর ভাই আল্লাহ্র বান্দদের জন্যে ব্যয় করবে, তা আর বিচিত্র কি ?

তাহলেই দাতার শোকর আদায় করা সম্ভবপর হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ -

তোমরা সেসব ধন-মাল থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, যা আমরা রিযিক হিসেবে তোমাদের দিয়েছি।[২]

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে।[৩]

ঘোষণা করেছেন যে, ধনমালই আল্লাহ্র। মানুষ তাতে আল্লাহ্র নিয়োজিত খলীফা ছাড়া আর কিছুই নয় অথবা বলা যায়, এসব ধন-মালের প্রবৃদ্ধি সাধন ও তা ব্যয়-ব্যবহারের জন্যে নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল মাত্র। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتَاكُمْ -

দাও তাদের আল্লাহ্র সেই মাল থেকে, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন।[৪]

বলেছেন ঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَشَرٌّ لَّهُمْ -

আল্লাহ্র অনুগ্রহস্বরূপ ধন-সম্পদে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্যে ভালো। না, বরং তা তাদের জন্যে খুব খারাপ।[৫]

তারা তাদের মাল নিয়ে কার্পণ্য করে—একথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, আল্লাহ্র স্বীয় অণুগ্রহস্বরূপ দেয়া মালে কার্পণ্য করে যেন মানুষ এ সত্য সব সময়ই মনে রাখে যে, ধন-মাল তার নয়, আল্লাহ্র এবং সে তা আল্লাহ্র অনুগ্রহের অবদান হিসেবেই পেয়েছে।

---

১. النحل - ٥٣ ২. البقره - ٢٥٤ ৩. البقره - ٤
৪. النور - ٣٣ ৫. ال عمران - ١٨٠

বলেছেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ -

এবং ব্যয় কর সে মাল থেকে যাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন।[১]

প্রমাণিত হল, মানুষ আসলে ধন-মালের মালিক নয়, সে প্রকৃত মালিকের খলীফা মাত্র। প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। মানুষ তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারকারী মাত্র। মানুষ আল্লাহ্‌র উকীল।[২]

'তাফসীরুল কাশ্‌শাফ' লেখক 'আর তোমরা ব্যয় কর সেই জিনিস থেকে যাতে তিনি তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন' আল্লাহ্‌র এ কথার তাফসীরে লিখেছেন ঃ তোমাদের হাতে যেসব ধন-মাল রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাঁরই উদ্ভাবিত বলে তা সবই আল্লাহ্‌র। তিনিই তা তোমাদের দানকারী। তা ব্যবহার করার ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে তিনিই তোমাদেরে সুযোগ করে দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি সেসব ধন-মালে হস্তক্ষেপ ও ব্যয় ব্যবহার করার জন্যে খলীফা বানিয়েছেন তোমাদেরকে। অতএব তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ধন-মাল নয়। তার ব্যাপারে তোমরা শুধুমাত্র উকীল ও নায়েব। অতএব তোমরা তা থেকে আল্লাহ্‌র অধিকার আদায়ে ব্যয় কর, তা থেকে ব্যয় করার তোমাদের অধিকার রয়েছে। যেমন অপর কারোর ধনা-মাল ব্যয়-ব্যবহার করার সেই পেতে পারে, যাকে তা করার জন্যে অনুমতি দেয়া হবে।[৩]

ধন-মাল আল্লাহ্‌র, মানুষ তাতে নায়েব বা উকীলমাত্র—এ কথাটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট নয়। তা ব্যয় ও দান করা সহজ হওয়ার জন্যে অনুমতি পেলে অপরের ধন-মালে হস্তক্ষেপ করা সাধারণত সহজই হয়ে থাকে। বরং সে সাথে এ নিগূঢ় তত্ত্বও জানতে হবে যে, মানুষ ধন-মালের প্রকৃত মালিকের ইচ্ছাকে মেনে চলতে বাধ্য। কেননা 'উকীল' তো তাকেই বলা হয়, যে মোয়াক্কেলের ইচ্ছায় প্রতিভূ হয়ে থাকে। তিনি যা চান, তাকে কার্যকর করাও তার দায়িত্ব। তার মন যা বা যে রকম চাইবে, সেরকম হস্তক্ষেপ করার কোন ব্যক্তিগত বা স্বতন্ত্র অধিকার কারোরই নেই। অন্যথায় তার উকিল হওয়াটাই বাতিল হয়ে যাবে। সুযোগ পেয়ে খারাপ আচরণ গ্রহণের দরুন অতঃপর সে খলীফা হওয়ার যোগ্যই বিবেচিত হবে না।

---

১. الحديد – ৭

২. ইবনুল কাইয়্যেম প্রশ্ন তুলেছেন, কোন লোককে আল্লাহ্‌র উকীল বলা যায় কিনা? তিনি নিজে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে 'না'সূচক'। কেননা উকীল মোয়াক্কেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কর্তৃত্ব করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন নায়েব নেই। তাঁর স্থলাভিষিক্ত কেউ হতে পারে না। তিনিই বরং বান্দার স্থলাভিষিক্ত। যেমন নবী করীম (স)-এর একটি দো'আর ভাষা হচ্ছে ঃ হে আল্লাহ্, তুমি সফরে সঙ্গী এবং বংশ পরিবারে খলীফা। পরে বলেছেন, তবে এ কথাটি যদি এ অর্থে নেয়া হয় যে, মানুষ নির্দেশিত আল্লাহ্‌র অর্পিত জিনিসগুলোর সংরক্ষণে তার দেখাশুনা ও লালন-পালনের জন্যে, তাহলে তা যথার্থ কথা।

مطبع للنسة المحمديه مدارج السالكين ج ٢ ص ١٢٩ -١٢٧

৩. الكشاف ج ٣ ص ٢٠٠

আমাদের মনীষী ও বিশেষজ্ঞগণ ধন-মালে আল্লাহ্র হক্ বা অধিকার কি, তা খুবই উন্নত ও বলিষ্ঠ ভাষায় বিবৃত করেছেন। ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

গরীব দরিদ্র লোকেরা আল্লাহ্র পরিবারভুক্ত। ধনী লোকেরা হচ্ছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডারের ধারক বা রক্ষী কেননা তাদের কাছে যেসব ধন-মাল রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্র ধন-মাল। এরূপ অবস্থায় ধন-মালের মালিক যদি তার ধনরক্ষীকে বলে যে—ভাণ্ডারে যে ধন-মাল রয়েছে তার একটা অংশ আমার পরিবারের অভাবগস্ত লোকদের জন্যে ব্যয় কর, তবে তা বিচিত্র কিছু নয়।[১]

কাযী ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উচ্চতর বুদ্ধিসত্তা এবং মহান কার্যকর আইন-বিধানের ভিত্তিতে কিছু লোককে বিশেষভাবে ধন-মাল দিয়েছেন, অপর কিছু লোককে দেন নি। এ দেয়াটা হচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামত। আর এ নেয়ামতের শোকরের পন্থা বানিয়েছেন এই যে, তার মালের একটা অংশ তাকে দেবে যার ধন-মাল নেই। এটা মহান আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বস্বরূপ সেক্ষেত্রে, যেখানে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেছেন।

وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

পৃথিবীর বুকে যত প্রাণীই আছে, সকলেরই রিযিক দেয়া দায়িত্ব আল্লাহ্র।[২]

ধনী লোক আল্লাহ্র খাজাঞ্চী—ধন-মালের আমানতদার। সে এ মাল আল্লাহ্র পরিবারের জন্যে ব্যয় করার জন্যে দায়ী। এক্ষণে সে যদি আল্লাহ্র এ ধন-মাল নিজেই ভক্ষণ করতে শুরু করে, অন্য কাউকে এ নেয়ামতের শরীক না করে, তাহলে সে আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়বে।

আল্লাহ্র কথা হিসেবে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসী জনগণের মধ্যে ব্যাপাক প্রচার লাভ করেছে। তা হচ্ছে ঃ

মাল আমার, গরীবরা সব আমার পরিবার, ধনী লোকেরা আমার উকিল—ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। আমার উকলরা যদি কার্পণ্য করে আমার পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণে, তাহলে আমি তাদের আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করার, তাতে আমি কারোরই পরোয়া করব না।[৩]

উপরিউক্ত হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে অপ্রমাণিত হলেও এর তাৎপর্য মোটামুটি যথার্থ এবং সঠিক। হাদীসটি সর্বসাধারণ মুসলমানের কাছে খুব বেশী পরিচিত বলে মনে

---

১. التفسير الكبير ج ١٦ ص ١٠٣ ২. ৫ - سورة هود

৩. অনেক অনুসন্ধান করেও এ কথার সত্যতার প্রমাণ আমি পাইনি। এ কথাটি কার তাও জানা যায়নি।
—গ্রন্থকার

করা যায়, আল্লাহ্‌র ধন-মালে মানুষের খলীফা হওয়ার ধারণাটি খুব বেশী মজবুত এবং সুদৃঢ়। চিন্তার ক্ষেত্রে তা খুব বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তার গভীর শিকড় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোর বহু ভিক্ষাপ্রার্থী ও ধার চাওয়ার লোক এ মতামতটির সাথে খুব বেশী পরিচিত এবং তারা সক্ষম-সমর্থ লোকদের অনুগ্রহের দৃষ্টি আকর্ষণে, তাদের কাছ থেকে মোটা রকমের দান-সাদকা হাসিল করার উদ্দশ্যে খুব বেশী ব্যবহার বা উচ্চরণ করে থাকে। তাদের অনেকেরই মুখে ধ্বণিত হয় ঃ ধন-মাল তো আল্লাহ্‌র। ...... কথাটা তো ঠিক, কিন্তু তা ব্যবহার করা হয় মন্দ উদ্দেশ্যে।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন ফকীরদের মুকাবিলায় ধনী লোকদের জন্যে হবে 'অয়ল' দোযখ। সেদিন গরীব লোকেরা ফরিয়াদ করবে ঃ হে আমাদের রব্ব! ধনীরা আমাদের হক্ না দিয়ে আমাদের ওপর জুলুম করেছে, তুমিই এ সব হক্ তাদের ওপর ফরয করে দিয়েছিলে আমাদের দেয়ার জন্যে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমার মর্যাদা, আমার মহানত্বের শপথ! আজ আমি তোমাদেরকে আমার কাছে স্থান দেব এবং ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখব।[১]

ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার দায়িত্ব গ্রহণের মতবাদ

তৃতীয় মতাদর্শ হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত মতবাদ।

সমাজ দার্শনিকদের কাছে এটা সর্ববাদীসমর্থিত যে, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক। প্রাচীন দর্শনিকরা বলেছেন, মানুষ সামাজিক জীব। আর আধুনিকরা বলেছেন, মানুষ সমাজের মধ্যে বসবাস ছাড়া যথার্থ মনব জীবন যাপন করতে সক্ষম হতে পারে না। একথাও চূড়ান্তভাবে সমর্থিত যে, ব্যক্তি সমষ্টির কাছে ঋণী তার বহু প্রকারের জ্ঞান, তত্ত্ব ও মর্যাদা বিশেষত্ব লাভের জন্যে। কেননা ব্যক্তি জীবনের সূচনা থেকেই সমাজ সমষ্টির প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে ও জীবন যাপন করতে পারে না। সমাজই হয় ব্যক্তির জীবন ও স্থিতির ধারক—অতন্দ্র প্রহরী। তা না হলে মানুষ তার দোলনাতেই মরে পড়ে থাকত। সমাজ-সমষ্টিই ব্যক্তিকে সভ্যতার উপাদান ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত করে। তার আচার-আচরণ শালীন ও দায়িত্বপূর্ণ বানায়, সামষ্টিক উত্তরাধিকারের মৌল নীতিসমূহও সমাজই তাকে জানিয়ে দেয়। ভাষা, আচার-আচরণ, প্রচলন, কথা, প্রবচন, অনুসরণের প্রবণতা, রীতি-নীতি, বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও পারস্পরিক লেন-দেন, কার্যকলাপ ইত্যাদি সবই তো সমাজসমষ্টি ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করে।

বস্তুত সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন না হলে ব্যক্তিরা বোবা পশু হয়ে যেত। বৈষয়িক বিষয়াদি সম্পর্কে সে কিছুই জানতে পারত না অথবা হত এমন শিশু যে, তার জন্যে ক্ষতিকর কি আর উপকারী কি, তা জানতেই পারত না। সমাজ-সমষ্টিই তার

১. তাবারানী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন الصغير ও الاوسط গ্রন্থে আনাস থেকে। হাদীসটির সনদ যয়ীফ। جمع الفوائد ج ١ ص ١٤٢

আচার-আচরণ ভারসাম্যপূর্ণ করে, বিভিন্ন দিকে ও ক্ষেত্রে জীবন রূপায়ণে সহায়তা করে।

ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তখন তার বিবেক–বুদ্ধি থাকে সাদা দাগ-চিহ্নহীন প্রস্তর ফলকের মত। পরে সমাজ-সমষ্টি সামাজিক উত্তরাধিকারের কার্যকারণ দিয়ে তাকে লালন পালন করতে থাকে। আর তা পূর্বসূরিরা উত্তরসূরিদের জন্যেই রেখে গেছে। ভাষা, সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস অনুসরণ, এ সবই এ পর্যায়ে পড়ে।[১]

অতএব ব্যক্তি সমাজ-সমষ্টির কাছে ঋণী, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। এ কথা যেমন সত্য হয় ব্যক্তির আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতা সংক্রান্ত উপার্জনের ক্ষেত্রে, তেমনি সত্য হয় তার বস্তুগত ও অর্থনৈতিক আয় উপার্জনের ব্যাপারেও।

কাজেই ব্যক্তি যদিও বহু স্বভাবজাত গুণ–বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে তাকে, তবুও এ কথায় সন্দেহ নেই যে, সে যা কিছু উপার্জন করে তা তার একক চেষ্টা-সাধনার ফলেই উপার্জন করে না। তাতে শরীক রয়েছে বহু মানুষের চেষ্টা, চিন্তা ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাতের শক্তি, যা গুণে শেষ করা যাবে না কোনটি অংশ গ্রহণ করেছে কাছে থেকে এবং কোনটি করেছে দূর থেকে, কোনটি স্বেচ্ছায় আবার কোনটি অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে। ধন-মাল তার মালিকের হাতে পৌঁছানোর এসব হচ্ছে কার্যকারণ আর এ কার্যকারণ সমূহই তাতে পুরামাত্রায় শরীক রয়েছে।

যে কৃষক গমের ফসল কেটে ঘরে নিয়ে এলো সে কি করে তা লাভ করল, তা চিন্তা করলেই উপরের কথার যথার্থতা বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে সমাজ সমষ্টির চেষ্টার তুলনায় ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনার মূল্য কত? সমাজই খাল কেটেছে, জমিতে দখল দিয়েছে, সেচের ব্যবস্থা করেছে, চাষ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছে এবং এ সময় যে খোরাক-পোশাক ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয়েছিল, তা তাকে যোগাড় করে দিয়েছে। সর্বোপরি দেশে ও সমাজে শান্তি-শৃংখলা ইত্যাদি সামাজিক আনুকূল্য এত বেশী পেয়েছে, যা গুণে শেষ করা যাবে না।

একজন ব্যবসায়ীর কথা চিন্তা করা যায়। সে কি করে মূলধন সংগ্রহ করল ? কি করে সে কামাই রোজগার করল ? তার ওপরও তো সমাজের বহু অনুগ্রহের অবদান রয়েছে। সে অবদান বিরাট, অসামান্য। কে তার কাছে পণ্য বিক্রয় করে, তার কাছ থেকে কে তা ক্রয় করে ? কে সেসব পণ্য তৈয়ার করে ? সমাজ-সমষ্টির আনুকূল্য না পেলে তার কোন্ কাজটা চলত?

কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বেতনভুক কর্মচারী, প্রত্যেক পেশা ও প্রত্যেক ধরনের মালের মালিক সম্পর্কেই এ কথা সত্য।

তাই মালের মালিকের ধন-সম্পদের পরিমাণ যখন বিপুল হয়, ব্যাপক হয় তার অর্থ

---

১. দেখুন ডঃ আহমাদ আল্খাশ্শাব লিখিত গ্রন্থ الفرد فى المجتمع – علم الاجتماع -৩৬ পৃ.

ও সম্পত্তি, তখন সমাজ–সমষ্টির চেষ্টা সাধনার ব্যাপারটি অধিক প্রকাশমান এবং বড় হয়ে ওঠে। ব্যক্তির অংশ সেখানে খুব সামন্য এবং ক্ষীণ পরিলক্ষিত হয়। কেননা ব্যক্তির কর্মক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ। তাকে তার শক্তি-সমার্থ্যের, সময়ের ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা নিয়েই থাকতে ও চলতে হয়।

বিশাল কৃষি খামার বা বিরাট শিল্প কারখানা অথবা বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক কতখানি চেষ্টা চালিয়ে থাকে ? কাজটা যখন প্রাতিষ্ঠানিক হয়, তখন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চেষ্টার স্থান তো খুব নগণ্যই হয়ে থাকে। অপরদিকে থাকে তার সাথে কাজে শরীক শত সহস্র মানুষের চেষ্টার সংযোগ। সেজন্যে তাদের মাথার ঘাম, চোখের দৃষ্টি এবং চিরন্তন শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে অপরিমেয়।

এ কারণে এক ব্যক্তি যে ধন-মাল রোজগার করে, যাকে সে নিজের ধন-মাল বলে দাবি করে ও সেজন্যে অহম বোধ করে, তা আসলে সমাজ ও সমষ্টির সম্পদ। সমাজের সম্পদ বলেও তা গণ্য হবে, তার হিসেব সমাজের খাতায়ও লেখা হবে। তার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্যে সমাজকেই দায়ী করা হবে।

এ কারণেই কুরআন মজীদে মুসলিম সমাজকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

এবং তোমরা তোমাদের ধনমাল কম বুদ্ধির লোকদেরে দিও না, যে ধন-মালকে আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্থিতির মাধ্যম বানিয়েছেন।[১]

ফিকাহবিদগণ এ আয়াতের ভিত্তিতেই নির্বোধ ও বেহুদা খরচকারী, অপচয়কারীদের ওপর তাদের ধন-সম্পদ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিধান বের করেছেন। বাহ্যত সে ধন-মাল তাদের কর্তৃত্ব ও দখলে থাকলেও এবং তারা তার মালিক হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সমাজ-সমষ্টির মালিকানা সম্পদ। তা বৃদ্ধি পেয়েছে, সংরক্ষিত হয়েছে সমাজের ব্যবস্থাপনায়। তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তার ক্ষতিটা সমাজ–সমষ্টিকেই ভোগ করতে হয়।

এ দৃষ্টিকোণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত কথা এবং তাতে সমাজ-সমষ্টিকে সম্বোধন করার তাৎপর্য খুব পরিস্কার বুঝতে পারা যায়। 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল নির্বোদ লোকদের দিও না' বলা হয়েছে, তাদের ধন-মাল বলা হয়নি। এ থেকে মালিকানা স্বত্বের অধিকারী সম্পর্কে একটা আল্লাহ্র ঘোষণা পাওয়া যাচ্ছে। পরেও যা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে স্থিতির মাধ্যম বানিয়েছেন, বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছেঃ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে স্থিতির মাধ্যম বানিয়েছেন। তার অর্থ—ধন-মাল যদিও তাদের দখলে ও মালিকানাধীন, তবুও তা গোটা সমাজ সমষ্টির জন্যে স্থিতির মাধ্যম, সামষ্টিক জীবনের মেরুদণ্ড।

---

১. سورة النساء – ٥

কুরআন আরও বলছে ঃ

يَـٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاْكُلُوْٓا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا -

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক ক্ষেত্রে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায় হয় এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি দয়াবান।[১]

এ আয়াত মুমিনদের পারস্পরিকভাবে ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করতে নিষেধ করছে। যেমন নিষেধ করছে পরস্পরকে হত্যা করতে। আয়াতে 'তোমাদর ধন-মাল' এবং 'তোমাদের নিজেদের' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে—এ চেতনা জাগিয়ে দাও যে, তাদের কতিপয়ের ধন-মাল আসলে তাদের সমষ্টির ধন-মাল। একজনের নফস—সত্তা-সমষ্টির আত্মসত্তার মতই।

মুসলিম উম্মত তাদের অধিকার রক্ষা, তাদের কল্যাণ—তাদের নফস ও ধন-মাল সব কিছুর জন্যে দায়িত্বশীল। এমতাবস্থায় কেউ যদি অন্য কারোর মাল ভক্ষণ করে, সে যেন তার নিজের ধন-মাল ভক্ষণ করে অথবা ভক্ষণ করে গোটা সমাজ-সমষ্টির ধন-মাল। এক্ষণে কেউ যদি তার ভাইয়ের জানের ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে সে যেন নিজেকেই হত্যা করল অথবা গোটা সমাজকে হত্যা করল। অন্য আয়াতে সেকথাই বলা হয়েছে ঃ

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢبِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَ نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَ نَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -

যে লোক কোন মানুষকে হত্যা করল অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যার শাস্তির হিসেব ছাড়াই অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতিরেকেই, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। পক্ষান্তরে যে লোক একটি মানুষকে বাঁচালো, সে যেন সমস্ত মানুষকেই বাঁচাল।[২]

কুরআন মজীদের মর্যাদা-মাহাত্ম্য এবং তার মুজিযা অসাধারণ। তার একটি কথা বা তার অংশ দ্বারা এক মহা ও বিরাট সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে যদ্দ্বারা এক মহামূল্য মৌলনীতি উদ্ঘাটিত হয়। যেমন সূরা নিসার উপরিউক্ত আয়াতটি ঃ 'তোমরা খেয়ো না তোমাদের মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল উপায়ে। এখানে ধন-মালকে সমস্ত মুসলমানের মূল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'তারা যেন পরস্পর পরস্পরের মাল না খায়' এ কথা বলা

---

১. النساء – ٢٩ ২. المائده — ٣٢

হয়নি। এ থেকে জানিয়ে দেয়া হল যে, গোটা মুসলিম সমাজ এক অবিভাজ্য ইউনিট, প্রতিটি ব্যাপারেই তারা পরস্পরের ধারক ও রক্ষক। যেন বলা হল ঃ

আমাদের ধন-মাল প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ধন-মাল। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির ধন-মাল, প্রকৃতপক্ষে গোটা সমাজের ধন-মাল।

সাইয়্যেদ রশীদ রিজা এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন ইসলামে অংশীদারিত্বের নীতি নির্ধারণ করে, যার দিকে একালের কমিউনিস্ট-সমাজতন্ত্রীরা ইংগিত করে থাকে অথচ এ ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুবিচারমূলক নীতি রয়েছে, তা তারা জানতে ও বুঝতে পারে না। তারা যদি ইসলামে সে জিনিসের সন্ধান করে, তাহলে তারা তা অবশ্যই পাবে। কেননা ইসলাম তার অনুসারী প্রত্যেক ব্যক্তির ধন-মালকে সম্পূর্ণরূপে গোটা উম্মতের ধন-মাল বলে ঘোষণা করেছে যদিও ব্যক্তিগত দখল ও মালিকানা পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত, ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষিত। তা প্রত্যেক বিপুল মালের অধিকারীর ওপর সমষ্টির কল্যাণে সুনির্দিষ্ট অধিকার আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছে, যেমন তার ও প্রত্যেক অল্প মালের মালিকের ওপর অপর কিছু বিপদগ্রস্ত জনগণের অধিকার ধার্য করা হয়েছে। এভাবে গোটা মানবজাতিকে অধিকারের দৃঢ় রজ্জুতে পরস্পরের সাথে কঠিনভাবে বেধে দেয়া হয়েছে। আর সর্বোপরি সমস্ত মানুষকে পরম পূণ্যময় কাজ, সর্বোচ্চ কল্যাণ ও অনুগ্রহ, স্থায়ী ও সাময়িক সাদকা ও হাদিয়া দানের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে।[১]

উপরোদ্ধৃত সমস্ত কথার সার নির্যাস হচ্ছে, ব্যক্তির ধন-মালে সমষ্টির খুব বেশী তাগিদপূর্ণ অধিকার রয়েছে। তা এমন অধিকার, যা আদায় করার পথে কারোর শরীয়াতসম্মত মালিকত্বও বাধা হয়ে দাড়াতে পারে না। বরং ব্যক্তির মালিকানাতেই সমষ্টির কল্যাণের জন্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ সব সময়ই ধার্য হয়ে থাকে। তার চাইতেও বড় কথা, প্রয়োজনের সময় সামগ্রিক কল্যাণের তাগিদে সমষ্টির অধিকার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রই সমষ্টির ওপর কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিভু, সমষ্টির কল্যাণের ব্যবস্থা রাষ্ট্রেই করে। প্রত্যেক মালদারের ধন-মালে সেই সমষ্টির জন্যে একটা অংশ নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। সে অংশ খরচ হবে এমন এমন কাজে, যার প্রত্যক্ষ ফায়দা সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত হবে। সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষা পাবে ও দায়িত্ব পালিত হবে, সর্বপ্রকারের বিদ্রোহ ও সীমালংঘন প্রতিরুদ্ধ হবে।

মুসলিম সমাজে যদি অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যক্তি না থাকে, তাহলেও মুসলিম ব্যক্তিকে তার যাকাত দিতে হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। তখন তা গোটা ইসলামী সমাজ—মুসলিম মিল্লাতের সম্পদ হবে। সে পর্যায়ের প্রয়োজনে তা ব্যয় করা হবে, 'আল্লাহ্‌র পথে' গুণসম্পন্ন কার্যাবলীতে তা ব্যয় হবে। আর তা এমন একটা ব্যয় খাত, যা সাধারণভাবে কার্যকর থাকবে ততদিন, যতদিন পৃথিবীর বুকে ইসলাম থাকবে।

---

১. تفسير المنار ج ٥ ص ٣٩ ط ثانيه

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব

চতুর্থ মতাদর্শ ঃ ভ্রাতৃত্বের মতবাদ

ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণের তুলনায় ভ্রাতৃত্ব একটা গভীর তাৎপর্য ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের অধিকারী। 'ভ্রাতৃত্ব' কথাটিতে স্বার্থ ও সুবিধার পারস্পরিক বিনিময়ের স্থান নেই। গ্রহণের মুকাবিলায় দানের প্রশ্নও নয় এটা। এটা গভীর মানবিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। তা মৌল মানবিকতার অন্তর্নিহিত ভাবধারা থেকে উৎসারিত। ভ্রাতৃত্বের দাবি হচ্ছে, ভাইকে দাও. তার কাছ থেকে না নেয়া হলেও দাও। ভাইয়ের সাহায্যে অগ্রসর হও, সে তার মুখাপেক্ষী না হলেও। নিজের জন্যে যা পসন্দ কর, ভালোবাস, ভাইয়ের জন্যেও ঠিক তাই ভালোবাস, পসন্দ কর। না এখানেই শেষ নয়, ভাইকে নিজেরও ওপর অগ্রাধিকার দাও।

ইসলাম দুই ধরনের ভ্রাতৃত্ব উপস্থাপিত করেছে অথবা বলা যায়, ইসলাম উপস্থাপিত ভ্রাতৃত্বের দুটি পর্যায়। একটি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে মানবিকতায় অংশীদারিত্ব। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাসে একাত্মতার ভ্রাতৃত্ব।

প্রথমটি মানুষের বর্ণ, ভাষা, দেশ, শ্রেণী—প্রভৃতি দিক দিয়ে তারা যতই বিভিন্ন ও পরস্পর সাংঘর্ষিক হোক না কেন, সমস্ত মানুষ এক ও অভিন্ন মূলের শাখা-প্রশাখা। একই পিতার সন্তান। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করেছেন يابنى ادم—'হে আদম সন্তান' 'আদম বংশজাত' বলে।[১] যেমন সম্বোধন এসেছে ياايها الناس—'হে মানুষ' বলে[২] অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রক্ত-সম্পর্ক এবং ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ রক্ত-সম্পর্কের মানবিকতার অধিকারের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের মানবিকতার ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নিসার শুরুতেই বলেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسَآءَلُوْنَ بِه وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রব্বকে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই প্রাণীসত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি এবং এ উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী। আরও তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছে চাওয়ার কাজ কর এবং ভয় কর রক্ত সম্পর্ক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রহরী।[৩]

---

১. এ ডাকটি কুরআনে পাঁচটি স্থানে এসেছে। চারটি হচ্ছে সূরা আ'রাফে এবং একটি সূরা ইয়াসীনে ।

২. সূরা নিসাতে প্রথম। পরে বারে বারে। ৩. সূরা আন্-নিসা শুরু ।

হে মানুষ' বলে ডাক দেয়ার পর ارحام-এর উল্লেখ এবং তাদেরকে একই প্রাণীসত্তা আদম সত্তা থেকে সৃষ্টি করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার স্পষ্ট তাৎপর্য হচ্ছে সাধারণ মানবিক নৈকট্য ও একাত্মতা।

ইসলামের নবী (স) এ ভ্রাতৃত্বের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এ ভ্রাতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

كُونُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

তেমরা সকলে আল্লাহ্‌র বন্দা ভাই হও।[১]

শুধু তাই নয়, নবী করীম (স) এ মানবিক ভ্রাতৃত্বকে একটা অন্যতম আকীদার মধ্যে গণ্য করেছেন, যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। নবী করীম (স) সমস্ত মানুষকে সেই আকীদা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের পরে এই বলে দো'আ করতেন ঃ

হে আমাদের আল্লাহ! আমাদের রব্ব, রব্ব সব জিনিসের, মালিক সে সব জিনিসেরই। আমি সাক্ষী তুমিই আল্লাহ্ একক, তোমার শরীক কেউ নেই। হে আমাদের আল্লাহ্, আমাদের রব্ব, রব্ব সব জিনিসের, মালিকও। আমি সাক্ষী—মুহাম্মাদ তোমার বান্দা এবং তোমার রাসূল। হে আমাদের আল্লাহ! আমাদের রব্ব, রব্ব সব জিনিসেরই মালিকও। আমী সাক্ষী সমস্ত বান্দাই পরস্পর ভাই।'[২]

মানুষ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের শিরোনাম ও পরিচিতি হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব, পরস্পরের ভাই হওয়া। এ ভ্রাতৃত্বের কতগুলো ফলশ্রুতি আছে, আছে কতগুলো দাবি। এ ভ্রতৃত্বের অন্যতম দাবি হচ্ছে—কোন মানুষই তার অন্য ভাইকে বাদ দিয়ে—বঞ্চিত করে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও নিয়ামতের নিজেকেই একমাত্র অধিকারী মনে করবে না। অন্য ভাইয়ের তুলনায় নিজেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মনে করে নেবে না। বস্তুত যে লোক নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, এ দুনিয়ায় তার জন্ম নেয়ারই কোন অধিকার নেই।

আরব কবি আল-মুয়াররা কি সুন্দর বলেছেন ঃ

আমি যদিও চিরন্তন তাকে এককভাবে ভলোবাসি না।

নিশ্চয়ই আমি আমার একার চিরশূন্যতা ভালোবাসি না।

যে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে শহর-নগর গড়ল না,

সে আমার ওপর বৃষ্টি বর্ষালো না, না আমার জমিনের ওপর।

এই সাধারণ ভ্রাতৃত্বের উর্ধ্বে আর একটি ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, যা এর চাইতেও অধিক গভীর প্রভাবশালী, অধিক মর্মস্পর্শী। তা হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাসের একাত্মতার ভ্রাতৃত্ব। এটাকেই 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' বলা হয়। এ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মুমিন লোকদেরকে চিন্তা ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে এমনভাবে বাঁধে, যা কখনই ছিন্ন হয় না। এ

১. বুখারী, মুসলিম। ২. আহমাদ ও আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন।

ভ্রাতৃত্ব—আকীদা-বিশ্বাসের একত্বের—এ ভ্রাতৃত্ব অন্তর, হৃদয় ও চিন্তার দিক দিয়ে, অধিকতর নিকটবর্তী। পারস্পারিক সাহায্য ও ঔদার্য গ্রহণে প্রত্যেককে অধিক আগ্রহী বানায় এবং এ আগ্রহের ব্যাপারটি রক্ত-বংশের ভাইয়ের প্রতি যা হয় তার চাইতেও অধিক তীব্র, বেশী প্রভাবশালী হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

মুমিনরা পরস্পরের ভাই—এ ছাড়া কিছু নয়।[১]

এ আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব ও এ বিশ্বাসগত সৌহার্দ্য—সৌহৃদ্যপূর্ণ সম্পর্কের অধিকার হচ্ছে, কার্যত পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটতে হবে। অন্যথায় সে ভ্রাতৃত্ব অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে।

এ ভ্রাতৃত্বের অধিকার আরও তাগিদপূর্ণ হয়ে পড়ে যখন মুমিনগণ একই সমাজভুক্ত হয়ে বসবাস করতে থাকে। এক্ষেত্রে একই দেশে বসবাসজনিত সম্পর্কটা সমন্বয়কারী ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সাথে যুক্ত হবে। আর একথা পূর্বেই সপ্রমাণিত যে, দারুল ইসলাম—ইসলামী রাজ্য তার বিশাল বিস্তৃতিসহ সমগ্র মুসলিমের এক ও অভিন্ন আবাসভূমি। ইসলামে বিশ্বাসী সব মানুষই এ দেশে একই সমাজভুক্ত—সর্বতোভাবে অভিন্ন।

রাসূলে করীম (স) এ ভ্রাতৃত্বের অধিকারের কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন, যা বহু কয়টি হাদীসে সন্নিবেশিত রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

একজন মুমিন অপর একজন মুমিনের জন্যে ঠিক সেরূপ যেমন একটি প্রাচীরে একটি ইট অপর ইটকে শক্ত করে।[২]

মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুতা দয়া-সহানুভূতির দৃষ্টান্ত একটি অখণ্ড দেহের মত। দেহের একটি অংগ যদি অসুস্থ হয়, সে কারণে গোটা দেহ উত্তাপও অনিদ্রায় ভোগে।[৩]

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করতে পারে না, সে তাকে অসহায় করে ছেড়েও দিতে পারে না।[৪]

যে ব্যক্তি তার ভাইকে ক্ষুধার্ত বস্ত্রহীন ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় ফেলে রাখে অথচ সে তাকে এ ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা ও রোগ থেকে নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম, সে তাকে বাস্তবিকভাবেই অসহায় করে ছেড়ে দিল, তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করল। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

---

১. الحجرات - ١٠.

২. বুখরী, মুসলিম, আবূ মূসা বর্ণিত। ৩. বুখারী, মুসলিম নূমান ইবনে বশীর বর্ণিত।

৪. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ—তারগীব-তারহীব, ৩য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃ. হালবী প্রকাশিত।

যে লোক খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাতে ঘুমালো অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশেই রাত কাটাল অভুক্ত অবস্থায়, এ কথা তার জানাও ছিল, সে তো আমার প্রতি ঈমানই আনেনি।[১]

এ সব হাদীসে ইসলামী সমাজের যথার্থ চিত্র অংকিত হয়েছে। এ সমাজের ব্যক্তিরা 'সিসা ঢেলে সুদৃঢ় বাঁধনে তৈরী করা প্রাচীরসদৃশ। একজন অপরজনকে দুর্বল করে না, শক্ত ও দৃঢ় করে। গোটা ইসলামী সমাজ একটি অখণ্ড পরিবার। এখানে প্রত্যেকটি ভাই অপর প্রত্যেকটি ভাইয়ের দায়িত্বশীল হয়ে দাঁড়ায়। এ একটি অখণ্ড দেহসত্তা যেন। তার একটি অঙ্গ—ব্যক্তি—অসুস্থ হলে গোটা দেহ সত্তা সমাজ -সমষ্টি অসুস্থ বোধ করে।

অতএব যে মুসলিম ব্যক্তি কাজ করতে পারে না কিংবা কাজ তো করতে পারে; কিন্তু কাজ পায় না অথবা কাজ তো করে; কিন্তু সে কাজ দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করতে পারে না বা সবই ঠিক কিন্তু এমন বিপদ ঘটেছে যা তাকে সাহায্যের মুখাপেক্ষী বানিয়েছে—হয় তার ঘর-বাড়ি জ্বলে গেছে, ধন-মাল বা শস্য বন্যায় ভেসে গেছে, ফসল নষ্ঠ হয়ে গেছে, ব্যবসা অচল বা মন্দা হয়ে পড়েছে অথবা এ ধরনেরই অন্য কিছু ঘটেছে, যার দরুন তার পরিবারবর্গসহ সে বিপদে পড়েগেছে, পথের মধ্যেই সে তার ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে—এ সকল লোকেরই অধিকার আছে সাহায্য পাওয়ার। তখন তাকে সাহায্য করা তাদের ভেঙ্গে পড়া মেরুদণ্ডকে সোজা ও শক্ত করা, তাকে হাত ধরে দাঁড় করে দেয়া—যেন উঠতে ও চলতে পারে জীবনের চলমন কাফেলার সাথে শরীক থেকে—আল্লাহ্র সম্মানিত মানুষ হিসেবে, গোটা সমাজ সমষ্টিরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। নতুবা মানুষ যখন তারই ভাই, তারই মত অপর একজন মানুষকে লাঞ্ছিত করে, লাঞ্ছিত হতে দেয় এবং আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ধ্বংস হবার সুযোগ দেয়, তখন সত্যি কথা এই যে, কল্যাণ এবং মঙ্গল বলতে কোথাও কিছু থাকে না।

এ সব কিছু থেকেই আমাদের সম্মুখে যাকাত ফরয হওয়ার দার্শনিক ভিত্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তা যে কর ধার্য করার দার্শনিক ভিত্তির তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর এবং চিরস্থায়ী ও শাশ্বত , তাতে কেন সন্দেহ থাকে না। অবশ্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে যাকাত ও কর-এর দৃষ্টিকোণ অভিন্ন হতে পারে; কিন্তু অপর তিনটি মতাদর্শের দিক দিয়ে যাকাত ফরয করার ব্যাপারটি অত্যন্ত বিশিষ্টতা পূর্ণ ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তা সর্বতোভাবে সন্দেহাতীত।

---

১. তাবারানী ও বাজ্জার আনাস থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদ উত্তম। তাবারানী ও আবূ ইয়ালাও তা উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে। হাকেম উদ্ধৃত করেছেন আয়েশা থেকে। الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٢٥٨।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর ধার্যের ক্ষেত্র বনাম যাকাত ধার্যের ক্ষেত্র

কর ধার্যের ক্ষেত্র—যা কর ধার্যের সুযোগ করে দেয়, কেউ কেউ বলেন উৎস, আবার কেউ কেউ বলেছেন নিক্ষেপ স্থান।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদগণ উল্লেখ করেছেন ঃ করসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিভক্তি আর ক্ষেত্রের দিক দিয়ে তা নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত ঃ

১. মূলধনের ওপর কর

২. আয় ও আমদানীর ওপর কর

৩. ব্যক্তিদের ওপর মাথাপিছু কর

৪. ভোগ্য ব্যবহার্য জিনিসের ওপর কর

অবশ্য ইসলামে এ শেষোক্ত ভোগ্য ব্যবহার্য জিনিসের ওপর কর ধার্যকরণ যাকাত অধ্যায়ে পরিচিত নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে যাকাত ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণীয় কর, যা গরীব-মিসকীন এবং দ্বীন ও জাতির জন্যে সাধারণ কল্যাণের নিমিত্ত তা ব্যয় হয়। আর ভোগ ব্যবহারকারী যেমন গরীব লোক হয়, তেমনি হয় ধনী লোকেরাও। তখন এ করের যারা আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা তা করে প্রাপ্তির বিপুলত্য ও প্রাচুর্যের জন্যে। কিন্তু তার ও অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে ইসলামে অন্যান্য প্রকারের কর পরিচিত। মূলধনের ওপর যেমন, আয়ের ওপরও তেমন এবং ব্যক্তিদের ব্যাপারেও তাই।

এ পরিচ্ছেদের আলোচনাসমূহে আমরা এ তিন ধরনের যাকাতের উল্লেখ করার ইচ্ছা রাখি। সাথে সাথে সে কয়টির ও তার মত অন্যান্য করসমূহের মধ্যে তুলনা করা হবে, কিন্তু তাতে খুব বিরক্তিকর দীর্ঘতা যেমন গ্রহণ করা হবে না, তেমনি অঙ্গহানিকর সংক্ষিপ্ততাকেও প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

প্রথম আলোচনা

মূলধনে যাকাত

যে সব ধন-মালে যাকাত ধার্য হয় এবং ইসলাম তার যে পরিমাণসমূহ নির্ধারণ করেছে সে বিষয়ে যে লোকই সামান্য চিন্তা করবে তার সম্মুখে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইসলামী শরীয়াত কেবলমাত্র কর ধার্যকরণের ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি—বিভিন্ন যুগের কোন কোন অর্থনীতি চিন্তাবিদ যেমন মনে করেছেন। বরং যাকাতের অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

যাকাত কখনও ধার্য হয় মূলধনের ওপর, যেমন গৃহপালিত পশু সম্পদ, স্বর্ণ ও রৌপ্য—নগদ সম্পদ এবং ব্যবসায় সম্পদের ওপর ধার্য হয়ে থাকে।

কখনও আবার তা ধার্য হয় আয়-আমদানির ওপর, কিন্তু সর্ব প্রকারের আয়-আমদানীর ওপর নয়; বিভিন্ন ধরনের আয়ের শাখা-প্রশাখার ওপর। তার প্রথম হচ্ছে, কৃষি ফসলের আমদানির ওপর, তারপর খনিজ উৎপাদনের আয়ের ওপর, তারপর কার্যত ভাড়ায় লাগানো নির্মিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর, তারপর কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির ওপর মুনাফাদায়ক প্রত্যেক মূলধনের আয়ের ওপর—অব্যবসায়ী। তারপর শ্রম ও উপার্জনের ওপর, নিয়মিত মাসিক বা সাপ্তাহিক-বার্ষিক বেতন, বেতনভুকদের ও শ্রমিকদের মজুরীর ওপর। স্বাধীন পেশার লোকদের আয়ের ওপরও তা ধার্য হয়। এ গ্রন্থের যথাস্থানে এ সব খাতের কথাই সুবিন্যস্তভাবে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি।

যাকাতে মূলধন করের বৈশিষ্ট্য আছে, দোষ-ত্রুটি নেই

ইসলামী শরীয়াত মূলধনের—পশু, ব্যবসায় পণ্য ও নগদ সম্পদের ওপর যখন যাকাত ধার্য করে তখন তা খুব অভিনব ও বিস্ময়োদ্দীপক ব্যাপার হয় না। কেননা কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রবাদী ও অপরাপর অর্থব্যবস্থাপন্থীরা তার বহু পূর্বেই মূলধনের ওপর নানা প্রকারের কর ধার্য করে বসেছে। অনেকে তো এতখানি বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা দাবি করেছে যে, এটাই হবে একমাত্র কর যার ওপর গোটা অর্থ ব্যবস্থা সীমিত থাকবে এবং তার মূলধন পরিব্যাপ্ত হবে অন্য কিছু ছাড়া।[১]

মূলধনের ওপর কর ধার্যের বৈশিষ্ট্য—তার সমর্থকদের দৃষ্টিতে

মূলধনের ওপর কর ধার্য করার সমর্থন করা তার পক্ষে বহু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে। এখানে তার কিছু অংশ পেশ করা হচ্ছে ঃ

---

১. علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص ٣٥٢

১. মূলধনের মালিকত্ব তার মালিককে বহু প্রকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধা দান করে। তন্মধ্যে উপার্জনের অবাধ সুযোগ-সুবিধা অন্যদের তুলানায় সে-ই অনেক বেশী পেয়ে থাকে। তাছাড়া ধন-সম্পদের কারণ তাদের মনে একটা নিশ্চিন্ততা ও মানসিক স্বস্তি লাভ করে থাকে, যা মূলধনহীন লোকদের বেলা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। এ সুফল মূলধনের আবর্তনশীল আমদানীর একটা বড় অবদান।

২. মূলধনের ওপর কর ধার্য করা হলে সকল ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধন-সম্পদকেও পরিব্যাপ্তি করে। এমন কি যে মূলধন কোন আয় দেয় না এবং পরবর্তী পর্যায়ে আয়ের ওপর কর ধার্যেরও সুযোগ করে দেয় না—হয় স্বভাবতই কোন আয়-আমদানী আনে না, যেমন মহামূল্যবান উপঢৌকনের বিলাস দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট হীরা-জহরতের অলংকারাদি কিংবা তার মালিকদের কারণে—যেমন নগদ ধন-মাল।

৩. এ করের আওতায় পড়ে ধন-সম্পদের সর্বপ্রকারের উপাদান। যেসব ধন-সম্পদ বেকার পড়ে আছে (আজকের ভাষায় 'কালো টাকা') তার ওপরও এর আঘাত পড়ে এবং তার মুনাফা আনয়নকে ত্বরান্বিত করে। ফলে বারবারের কর ধার্যকরণের সে মূলধনকে নিঃশেষ করে দেয় না। কিন্তু আয়-আমদানীর ওপর ধার্য কর ভিন্ন রকমের। তা কেবলমাত্র মুনাফা লাভের কাজে নিয়োজিত ধন-মালের ওপরই ধার্য হয়। লুকিয়ে রাখা মূলধন তার আঘাত থেকে বেমালুম রক্ষা পেয়ে যায়।

৪. মূলধনের ওপর ধার্য এ কর ধন-মালের মালিকদের বেশী বেশী উৎপাদনে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে। কেননা তাদেরকে কর দিতে হবে এ চেতনা তাদের ওপর চাবুকের মত কাজ করে—তাদের মূলধন উৎপাদন বাড়ল কি বাড়ল না অথবা উৎপাদন কম হল কি বেশী হল, কর তাদের দিতেই হবে এ চেতনা।

৫. এ কর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন উচ্চতর হার ও সেই দুর্বহ পরিমাণ—যে পর্যন্ত আমদানী কর পৌঁছতে পারে—তার পশ্চাতে থেকে যে বিপুল ও প্রচুর পরিমাণ আয় হয়, তার কারণে যে হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে তাতে বিরাট অংশ গ্রহণ করে থাকে। তার ফলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব আমদানী কর-এর অত্যধিক ঊর্ধ্বমুখিতা থেকে একটা মান পর্যন্ত কমিয়ে আনে।

৬. মূলধনের ওপর কর ধার্যকরণ—তার নামটা দ্বারা যেমন বোঝা যায়—মালিকানাহীন বা বিত্ত-সম্পত্তিহীন শ্রেণীকে স্পর্শ করে না। কেননা এ শ্রেণীর লোকেরা শ্রমজীবীমাত্র। এ কারণে তা সংস্কারবাদী কমিউনিজম (সমাজতন্ত্র) এ ধার্য কররূপে গণ্য হতে পারে।[১]

মূলধনের ওপর কর ধার্যকরণ সমর্থনকারীদের মতে এগুলোই হল এ ব্যবস্থার

১. এ সব বিশেষত্ব পর্যায়ে দেখুন ঃ ডঃ রশীদ দকর লিখিত علم المالية গ্রন্থের ২য় মুদ্রণ—জামে সুরীয় প্রেস ৩৪৭ পৃ. এবং ডঃ সায়াদ মাহের হামজা লিখিত موارد الدولة গ্রন্থ, ১৬৬ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা।

বিশেষত্ব এবং এসব কারণেই তারা সমর্থন করে থাকে। আর এরা সকলে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার লোক।

মূলধনের ওপর কর ধার্যকরণ বিরোধীদের বক্তব্য

উপরিউক্ত লোকদের প্রতিকূলে রয়েছে সেসব লোক, যারা মূলধনের ওপর কর ধার্যকরণের পরিপন্থী। তাদের অধিকাংশই হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমর্থক। তারা উপরিউক্ত যুক্তিসমূহ অর্থহীন মনে করে বর্ণিত বিশেষত্বসমূহ থেকে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা পেয়েছে। তারা বলেছে ঃ

১. মূলধনের ওপর যে কোন ধরনের কর ধার্যকরণের ফলেই প্রায়শই এবং সাধারণভাবেই সঞ্চয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহ ম্লান ও ক্ষীণ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, উৎপাদনের শক্তিই হ্রাসপ্রাপ্তি হবে। আর তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। কেননা জমি ও কারখানা প্রভৃতি চলমান মূলধনকে কর ধার্যকরণের ক্ষেত্র বানালে তা সঞ্চয়কারীদের উৎসাহে ভাটা লাগিয়ে দেবে এবং দৃঢ় মৌল খাতে সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিবর্তে তা সমস্ত আয় ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে আগ্রহী বানাবে।

২. কর ধার্যকরণ উপযোগী মূলধনকে কোন একটি স্থানে সীমিতকরণ খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কেননা মূলধনের সংজ্ঞা ও তার প্রকৃতি নির্ধারণে আবহমানকাল থেকেই বিভিন্ন প্রকারের মতামত চলে এসেছে। এক ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদ-সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণও খুবই কঠিন ব্যাপার। অনেক সময় সে পরিমাণ নির্ধারণ বাস্তবের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হতে পারে খুব বেশী কষ্ট স্বীকারের পর, কখনও নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় মূলধন মালিকদের স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু তা আদৌ যথেষ্ট নয়। অনেকে হয়ত অসত্য হিসেবে অগ্রিম পেশ করার পন্থার আশ্রয় নিতে পারে। তা ছাড়া এমন মূলধন রয়েছে যা গোপন রাখা খুবই সহজ।

৩. মূলধনের ওপর বার্ষিক নিয়মে কর ধার্য করা হলে গোটা মূলধনই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে অথচ তা আয়ের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অতএব আয় নয়—মূলধন খুব সুসংবদ্ধভাবে নিত্য নতুন রূপ বা আকার ধারণ করে না। বরং তা থেকে যে অংশটাই কর্তিত হবে, সেই পরিমাণ সঞ্চয় করে তা পূর্ণ করা অসম্ভব হবে। আর কোন রাষ্ট্র যদি কেবল এ ধরনের কর ধার্যকরণের ওপর নিরন্তরভাবে নির্ভরশীল হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে বিশেষ ধন-মাল তার নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস হবে। আর তার পরিণতিতে করলব্ধ আয় খুবই কম হয়ে পড়বে এবং ব্যক্তিগত উৎপাদন তৎপরতা নির্মূল হয়ে যাবে।[১]

মূলধনের ওপর কর ধার্যকরণ কালে অবশ্য গ্রহণীয় সতর্কতা

এ প্রেক্ষিতে কোন কোন অর্থনীতিবিদ মূলধনের ওপর কর ধার্যকরণকালে তার যেসব

---

১. موارد الدولة গ্রন্থের ১৬৮ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠা।

বিশেষত্ব রয়েছে তার কোন কোনটি থেকে ফায়দা লাভের উপদেশ দিয়েছেন এবং সেজন্যে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য আরোপ করতে বলেছেন ঃ

১. মূলধনের একটা বিরাট অংশকে আলাদা করে তার ওপর এ কর ধার্য না করাই উত্তম, তার হার ভারসাম্যপূর্ণ হওয়াই উত্তম। এবং তা এভাবে যে, মূলধন থেকে প্রাপ্ত আমদানী থেকেই তা দিয়ে দেয়া হবে পুরামাত্রায় এবং মূলধনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে না।

২. কর ব্যবস্থায় কেবলমাত্র কর ধার্য না করা, কর ধার্যের অন্যান্য দিকের ওপর সম্পূরক কর ধার্য করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে আয়ের কর।[১]

৩.একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের কম সম্পদের মালিককে কর অব্যাহতি দিতে হবে অথবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়ের কম পরিমাণের আয়শীল ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দিতে হবে করের বোঝা থেকে।

৪. ঋণ বা বন্ধক ইত্যাদি ধরনের সম্পদের ওপর কর ধার্যকরণ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য হবে।

যাকাত ফরযকরণের এই বিষয়গুলোর ওপর লক্ষ্য আরোপে ইসলামের অগ্রবর্তীতা

মূলধনের ওপর ইসলামের আরোপিত যাকাত ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে—আল্লাহ্র শোকর—আমরা উপরিউক্ত বিশেষত্বসমূহের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে বলে বুঝতে পারি। আর অর্থনীতিবিদরা যেসব দোষত্রুটির সমালোচনা করেছেন, তা থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্র পাচ্ছি এবং তাঁরা সেসব উত্তম উপদেশ দিয়েছেন তার সমন্বিত রূপ লক্ষ্য করতে পারছি।

১. ইসলাম সকল প্রকারের মূলধনের ওপর যাকাত ধার্য করেনি, করেছে কেবলমাত্র প্রবৃদ্ধিশীল ও মুনফাদায়ক মূলধনের ওপর। 'প্রবৃদ্ধিশীল' বলতে সেসব মূলধনই ধরা হয়েছে যার মধ্যে প্রবৃদ্ধি লাভের বিশেষত্ব আছে—তার মালিক তা বেকার ফেলে রাখলেও তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আর প্রবৃদ্ধির শর্ত করা হয়েছে সম্পদে, যেন বাড়তি ও বৃদ্ধি থেকে যাকাত গ্রহণ করা যায় এবং ঠিক আসলটা অক্ষত অবস্থায় থেকে যেতে পারে। আরবী ভাষায় 'যাকাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থই হচ্ছে 'প্রবৃদ্ধি'। এ কারণে অর্থনীতিবিদগণ এ অর্থনৈতিক কর ধার্যকরণে তার প্রয়োগকরণে যে কারণ দেখিয়েছেন, তা হচ্ছে তার আওতায় কেবলমাত্র ক্রমবর্ধনশীল ধন-মালই আসে।[২]

এ প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত মুবাহ অলংকারাদির ওপর যাকাত ধার্য না করার মত যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মত আমরা যথার্থ মনে করছি। কেননা এ জিনিস তো আর প্রবৃদ্ধি লাভ করছে না। কিন্তু তা যদি পুঁজি করা হয় কিংবা তাতে যদি অতিরিক্ত মাত্রায় অপচয় লক্ষ্য

---

১. ডঃ রশীদ দকর রচিত علم الماليه গ্রন্থের ৩৫৫ পৃ. ২য় মুদ্রণ

২. দেখুন ঃ مقدمة كتاب الزكاة - فتح البارى ج ٣ ص ١٦٨

করা যায়, তা স্বাভাবিক অবস্থা ও রীতিনীতি লংঘনকারী হয় তাহলে ভিন্ন কথা। পুরুষরা নিজেদের অলংকার হিসেবে যা ব্যবহার করে অথবা তৈজসপত্র-উপঢৌকন, প্রতিকৃতি ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও অনুরূপ নীতি অবলম্বিত হবে অর্থাৎ তার সব কিছুর ওপর যাকাত ধার্য হবে। কেননা উপরিউক্ত অবস্থাসমূহে বিপুল পরিমাণ মহামূল্য মূলধন সম্পূর্ণ বেকার ও অনুৎপাদক করে ফেলে রাখা হয়, যার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না।

এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, বসবাসের ঘর-বাড়ির ওপর দেহের পোশাক পরিচ্ছদের ওপর, ঘরের আসবাব পত্রের ওপর, যানবাহন ও ব্যবহারের অস্ত্রাদির ওপর, পেশা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও জ্ঞান অর্জনের গ্রন্থাদির ওপরও কোন যাকাত ধার্য হবে না। কেননা এগুলো বর্ধনশীল নয়, এগুলো মালিকের কোন না কোন মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যাপৃত।[১]

অবশ্য কারোর কারোর মত বসবাসের ঘরকে কর ধার্যকরণ থেকে অব্যাহতি না দেয়াই যথার্থ নীতি হতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন আয়ের ওপর তো বটেই সমস্ত অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি এবং মূল্য নির্ধারণ সম্ভব এমন সমস্ত জিনিসপত্র ও ঘরের আসবাবপত্রের ওপরও কর ধার্য হয়ে থাকে।[২]

২. মূলত স্থিতিশীল মূলধনের ওপর ইসলামী শরীয়াত যাকাত ধার্য করেনি—যেমন কল-কারখানা, জমি-জায়গা ইত্যাদি। কর ধার্য করেছে আবর্তনশীল মূলধনের ওপর । তবে স্থিতিশীল মূলধনের আয় ও প্রবৃদ্ধি থেকে অবশ্যই যাকাত গ্রহণ করা হবে। যেমন কৃষি জমি—এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিল বর্তমান। তার সাথে যুক্ত হবে সে সব নির্মিত প্রতিষ্ঠানাদি যার মুনাফা হয়। এর ফলে যাকাত সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ বিনষ্ট করবে না তাদের আয় খরচ করে ফেলার ব্যাপকতা সাধন করতেও বলবে না—স্থিতিশীল মূলধনে রূপান্তরিত হওয়ার আশংকায়। যেমন কোন কোন কর ধার্যকরণের পরিণতিতে তা হতে দেখা যায়।

৩. সর্বপ্রকারের মূলধনে—তা কম হোক কি বেশী—ইসলামী শরীয়াত যাকাত ধার্য করেনি। বরং সেজন্যে একটা বিশেষ নিসাব নির্ধারণ করেছে সর্বপ্রথম। সেই নিসাবকে ধনাঢ্যতার নিম্নতম পরিমাণ গণ্য করা হয়েছে। তার কম পরিমাণ সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে মালিক নিজে নফলভাবে দান-সাদকা করলে ভিন্ন কথা। পূর্বে যেমন বলেছি, এ নিসাবের পরিমাণ ধরা হয়েছে স্বর্ণের ৭৫ গ্রাম নগদ ও ব্যবসায় সম্পদের হার অনুপাতে এ পরিমাণের মালিকানার ওপর একটি বছর অতিবাহিত হলে তবেই তার ওপর যাকাত ধার্য হয়। তারপরও শর্ত এই যে, তা তার মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। আর মৌল প্রয়োজন যে সময়-দেশ-স্থান অবস্থার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন রূপ ধারণা করতে পারে তা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

১. দেখুন ঃ فتح القدير وشرح العناية على الهداية ج ص ٤٨٧ - ٤٨٩

২. علم انمالية للدقر ص ٣٥٥

৪. ইসলামী মূলধন যাকাত ধার্য করে তার মূল্য বাড়িয়ে দেয়নি—তা থেকে একটা বিরাট অংশ বিছিন্ন করে আলাদা ধরা হয় বলে। তা একটা ভারসাম্যপূর্ণ হারে—$২\frac{১}{২}$% হারে নগদ ও ব্যবসায় সম্পদ পরিমাণ নির্ধারণে নির্ধারিত হয়েছে। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে প্রায় এরূপ, যেন তার প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন আয় থেকে তা সহজেই গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। আরও বিশেষ কথা হচ্ছে, এ যাকাতটি আবর্তনশীল।

সত্য কথা হচ্ছে, ইসলাম মূলধনের ওপর কর ধার্য করেছে—নগদ ও ব্যবসায় সম্পদ ও পশু সম্পদে—মূলধনটিকেই ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নয়, বরং তা থেকে প্রাপ্ত আয়কেই সেভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের ফিকাহবিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথার অকাট্যতা ঘোষণা করেছেন ঃ

শায়খুল ইসলাম ইবনে কুদামাহ 'আল মুগনী' গ্রন্থে যে সব ধন-মালে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে এক বছর কাল অতিবাহিত হওয়া শর্তরূপে গণ্য হয়েছে এবং যে সব ধন-মালে তা হয়নি, এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

যেসব মালে এক বছর অতিবাহিত হওয়া নির্ধারিত তা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করার ক্ষেত্র। গাবদি পশু দুগ্ধদান ও বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্র, ব্যবসায়ের পণ্য মুনাফা লাভের ক্ষেত্র। নগদ মূলধনও তাই। তাতে একটি বছরের শর্ত করা হয়েছে। কেননা এ সময়টার মধ্যে প্রবৃদ্ধি লাভ সম্ভব—যেন যাকাতটা মুনাফা থেকে আদায় করা যায়। আর তাই সহজ ও সুগম—যেন একই সময়কালে বহুবার যাকাত ধার্য করার ঘটনা সংঘটিত না হতে পারে। কারণ তাতে মালিকের সব মালই নিঃশেষ হয়ে যাবে।[১]

হানাফী ফিকাহর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

> মালিকানার একটি বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক (যাকাত ফরয হওয়ার জন্য), কেননা এমন একটা সময়ের অবকাশ তাকে দিতেই হবে যার মধ্যে তাতে প্রবৃদ্ধি বাস্তবায়িত হতে পারে। শরীয়াতে এ সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে একটি পূর্ণ বছর। কেননা এ সময়কালের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত ও বিকশিত হতে পারে বলে মনে করা যায়। এ সময় ভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিত, মূল্যের পার্থক্য প্রায়ই এ সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাতেই হুকুম আবর্তিত হবে।

মহামনীষী ইবনুল হুম্মাম 'ফতহুল কাদরী' গ্রন্থে শরীয়াতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে একটি বছর শর্ত করার যৌক্তিকতা ও বৈজ্ঞানিকতা পর্যায়ে অতিরিক্তভাবে বলেছেন ঃ 'তার নিগূঢ় তাৎপর্য হল যাকাতের বিধান করার মৌল লক্ষ্য পরীক্ষা ও যাচাই হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যবহারিক লক্ষ্য হচ্ছে গরীব মিসকীনের সাহায্য-সহানুভূতি এমনভাবে করা, যেন সে নিজে ফকীর হয়ে না যায়—বরং তা করা বিপুল ধন-মালের একটা কম পরিমেয় অংশ দান করার মাধ্যমে। কিন্তু যে মাল ক্রমবর্ধনশীল নয় তার ওপর যাকাত ফরয করা

---

১. المغنى ج ٢ ص ٦٢٥ بتصرف। এবং দেখুন ঃ এ গ্রন্থের ১৬২ পৃ.

হলে প্রতি বছর যাকাত দেয়ার ফলে তার উল্টো ফল দেখা দেবে। সেই সাথে তার নিজের বিশেষ ব্যয়ের ব্যাপারটিও রয়েছে। অতএব ব্যবসায়—ক্রমবৃদ্ধি ও মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে গড়া ব্যবসায়ে এক বছরের শর্ত করা হয়েছে বান্দা থেকে অথবা বিশেষ করে তার জন্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে, যেন তার বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করার সম্ভবপর হয়, ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লক্ষ্যের বিপরীত অবস্থা সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানো সম্ভব হয়।[১]

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মূলত মূলধন থেকে যাকাত গ্রহণই লক্ষ্য ছিল না, যাকাত গ্রহণ করা হবে তার আয় ও প্রবৃদ্ধি থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাকাতটা আয় ও প্রবৃদ্ধি থেকে নেয়া হবে কোন্ কারণে.....

এ জবাব ইবনে কুদামাহ লিখেছেন[২] ঃ প্রকৃত প্রবৃদ্ধিকে গণ্য করা হয়নি। কেননা তা বিভিন্ন এবং তার গণনা সম্ভব। আরও এজন্য যে, যার বাহ্যিক দিকটা গণ্য করা হয়েছে, তা প্রকৃত অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি ঠিক—যেমন কার্য কারণের অনুপাতে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।[৩]

---

১. فتح القدير - شرح الهداية ج ١ ص ٤٨٢

২. المغني ج ٢ ص ٦٢٥

৩. এ কথাটি বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, শরীয়াত তার হুকুম নির্ধারণের নির্ভর সুসংবদ্ধ বাহ্যিক গুণ পরিচিতির ওপর। ফিকাহবিদরা তার নাম দিয়েছেন কারণ ও নিমিত্ত (العلل والاسباب) হুকমটাই শরীয়াতের বিধান হওয়ার আসল কারণ নয়। তার দৃষ্টান্ত যেমন ইসলাম মুসাফিরকে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা বা রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছে, চার রাক'আতে নামায দুই রাকাত পড়ার অনুমতি আছে। এ অনুমতির যৌক্তিকতা বা কারণ 'কষ্ট'। ব্যাপারটি যদি অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ হয় তাহলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। শরীয়াত শুধু কষ্টের কারণটি অর্থাৎ সফরের প্রতিই লক্ষ্য রেখে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

দ্বিতীয় আলোচনা
আয় ও উৎপন্নের ওপর যাকাত

আধুনিককালে 'আয়' ও 'উৎপন্ন'কে কর ধার্য করণের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। আর আয়ের প্রাচীনতম উৎস যখন ভূমি মালিকানা তখন এ কালে আয়ের বহু নতুন ও অভিনব দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এ দ্বারসমূহ হচ্ছে কাজ বা শ্রম কিংবা মূলধন অথবা দুটোই এক সাথে।

শিল্প উৎপাদনের গতি যখন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হল এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় স্রোত তীব্র হল তখন কাজ ও মূলধনের আয়-আমদানী পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেল, বিচিত্র ধরনের হয়ে দাড়াল। ব্যবসায়ী ও শৈল্পিক তৎপরতা খুব লাভবান হয়ে উঠল। শেয়ার ও সার্টিফিকেটের হস্তান্তরযোগ্য মূল্যের আয়ও বৃদ্ধি পেল। অপরদিকে পেশার মুনাফা এবং নির্দিষ্ট বেতনের লোক ও বিভিন্ন ব্যস্ততার কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যককে দেয় মজুরী ও নির্দিষ্ট বেতনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

এদিক দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের বিশেষত্বে সৃষ্ট ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা একদিকে এবং অপরদিকে জমির আয় বহির্ভূত বহু নতুন উৎসের আত্মপ্রকাশ দেখে রাষ্ট্রসমূহ আয়-আমদানীকে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের একটা আয় সূত্র ধরে নিয়ে একালে তার ওপর অব্যাহত কর ধার্য করতে শুরু করেছে। এ কারণে অনব্যাহত কর-এর তুলনামূলক গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। এ পর্যায়ের কর হিসেবে শুল্ক কর ও ভোগ্য কর ইত্যাদি উল্লেখ্য। এ ছাড়াও অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে আয়করসমূহ আধুনিক পরিস্থিতি-পরিবেশে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার অতীব নিকটবর্তী ব্যবস্থারূপে গণ্য। কেননা এ কর ব্যবস্থায় জমি বহির্ভূত আয়ের অধিকারী লোকদের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেই সাথে সাধারণের বোঝা বহনে জমির আমদানীর মালিকরাও শরীক থাকবে।[১]

আয়-এর তাৎপর্য

'আয়' বলতে বোঝায় সেই নতুন ধন-সম্পদ যা কোন স্থিতিশীল পরিজ্ঞাত উৎস থেকে নিঃসৃত বা অর্জিত ও হস্তগত হয়।

ক. তা হলে আয়ের একটা উৎসের প্রয়োজন। তা জমি, অস্থাবর ও নগদ প্রভৃতি ধরনের বস্তুগত হোক কিংবা অবস্তুগত—যেমন শ্রম বা কর্মক্ষমতা (নগদ পারিশ্রমিক দিয়ে যার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব)। অথবা এ দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা উৎস

১. ডঃ সায়াদ মাহের কৃত موارد الدولة ১১৭ পৃ.

অতএব আয়ের উৎস হচ্ছে হয় মূলধন, অথবা কাজ বা শ্রম কিংবা এই উভয়ই এক সাথে।

আর মূলধন জমি ও অস্থাবর সম্পদ উভয়ই হতে পারে। তাই এ উভয় উৎস থেকে যা আয় হবে তা জমি সম্পদ থেকে পাওয়া আয় হবে যেমন, তেমনি স্থানান্তরযোগ্য সম্পদেরও আয় গণ্য হবে।

কিন্তু কাজ বা শ্রমের উৎস থেকে যে আয়টা হবে তা তার মালিক নিজেই ব্যবহার করবে, অন্য কারোর কাছে অর্পণের সম্পর্কের সাথে জড়িত না হয়েই এবং হাতের কাজ বা বুদ্ধি খাটানোর কাজ দ্বারা সে অগ্রসর হবে। এরূপ অবস্থায় তার এ আয়টা পেশাগত কাজের আয়—সে যে পেশায় অভ্যস্ত, তা দিয়েই সে তা লাভ করবে। সে যদি অন্য কারোর সাথে ব্যক্তি বিনিয়োগের চুক্তিতে জড়িত হয়, তাহলে তখন তার এই আয়টা মাসিক নির্ধারিত বেতন বা মজুরী কিংবা ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনমূলক হবে।

তৃতীয় উৎসটি যখন মূলধন ও শ্রম উভয়ে মিশ্রিত হবে তখন তার আয়টা সাধারণত মুনাফা বলে পরিচিত হবে।[১]

আর এ উৎসসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হলে অর্থনীতিবিদদের মতে আয়টা উৎপন্ন, সুবিধা (Benefit), মজুরী ও মুনাফা এ চারটি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হবে।

খ. এসব উৎস সম্পর্কে মূল কথা হল, এগুলোর স্থায়িত্ব ও স্থিতি গুণে গুণান্বিত। তুলনামূলক স্থিতি স্থায়িত্বের কথাই বলা হচ্ছে। স্থিতির নিম্নতম মান হচ্ছে উৎপাদনের দিকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে স্থিতি ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনার দিক দিয়ে এ উৎসসমূহ পরস্পর বিভিন্ন। মূলধন এ দিকগুলোর মধ্যে কাজ বা শ্রমের তুলনায় স্থিতি লাভে অধিক বেশী ক্ষমতাশালী।[২] আয়ের উৎসের স্থিতির মানে এই আপেক্ষিক পার্থক্যসমূহ স্বভাবতই একই কর-এর পার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্র রচনা করে। কাজেই আয়ের উৎসে শুধু ধন-মাল হলে তাতে মূল্য বৃদ্ধি পাবে। আর তা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে যখন উৎস হবে শুধু কাজ বা শ্রম। অপরদিকে মূলধন এবং কাজ উভয়ই আয়ের উৎস হলে বোঝাটা মাঝামাঝি ধরনের হবে। তবে মূলধনের প্রকার অনুপাতে কর মূল্য পার্থক্যপূর্ণও হতে পারে তখন কৃষি জমির আয়ের ওপর ধার্য কর-এর মূল্য উচ্চতর হতে পারে প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ধার্য কর-এর তুলনায়। কেননা প্রতিষ্ঠান তো কিছু কালের পর ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যেতে পারে .... এমনিই চলবে।[৩]

ইসলামী শরীয়াতে আয়ের যাকাত

ইসলাম যেমন পশু সম্পদ, ব্যবসায় ও নগদ—প্রভৃতি মূলধনের ওপর যাকাত ধার্য করেছে, তেমনি যাকাত ধার্য করেছে আয় ও আমদানীর ওপরও। তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইসলাম কৃষি উৎপাদনের আয়ের ওপর ধার্য করেছে 'ফল ও ফসলের যাকাত'

---

১. ডঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ ইবরাহীম কৃত مبادى علم المالية العامة গ্রন্থের ১মখণ্ড ৩২২ পৃ.
২. পূর্বোল্লিখিত সূত্র ৩. موارد الدولة ص ١٢٢

অর্থাৎ তাতে ওশর ও অর্ধ ওশর ধার্য হয়েছে। এ পার্থক্যটা জমি সেচের পার্থক্যের দরুন—হয় তা স্বাভাবিকভাবে হয়, না হয় সেজন্যে সেচ ব্যবস্থা করতে হয় পয়সা ও শ্রম লাগিয়ে—এ কারণে। ইসলাম এখানে আমাদেরকে এমন একটা মৌলনীতি দিয়েছে কর সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে যার একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আর তা হচ্ছে, ব্যয় করা শ্রম বা কষ্ট অনুযায়ী ধার্য দেয়কে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা। ফলে যেখানেই কষ্টের মাত্রা কম, সেখানেই কর-এর হার উচ্চ হবে। পক্ষান্তরে যেখানে কষ্টের মাত্রা বেশী হবে, যেখানে এ হার কম হয়ে যাবে।

এই প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে মাটির তলায় প্রোথিত ধন-সম্পদ যা যখন পাওয়া যাবে, তার এক পঞ্চমাংশ ২০ % দেয় ধার্য করার মাহাত্ম্য এবং আকাশ বা খালের পানিতে সেচ করা ক্ষেত বা বাগানের ফসল ও ফলে ধার্য হয়েছে পাঁচ ভাগের এক ভাগের অর্ধেক অর্থাৎ এক দশমাংশ, আর বিশেষ সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সেচ করা জমির ফসলে-ফলে অর্ধ ওশর ৫% এবং কঠিন শ্রম ও কাজের ফলে অর্জিত—যেমন ব্যবসায় করে পাওয়া নগদ সম্পদ—এক-দশমাংশের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২.৫% ধার্য করা হয়েছে—এ সবের যথার্থতাও।

এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোন কোন ফিকাহবিদ এ মত গ্রহণ করেছেন যে, খনিজ সম্পদে দেয় ধার্য এক পঞ্চমাংশ থেকে শুরু করে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন হারে হতে পারে—কষ্ট ও শ্রম অনুপাতে, যেমন যথাস্থানে বিস্তারিত বলা হয়েছে।[১]

ইসলামে আয়ের যাকাত কয়েক প্রকারের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—বহু সংখ্যক ফিকাহ-পারদর্শী ইমামের মতে—মধুর যাকাত পরিমাণ 'ওশর'—এক-দশমাংশ। এ মতকেই আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। এর ওপরই আমরা জান্তব উৎপাদনকেও কিয়াস করেছি।

খনিজ সম্পদের উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত আয়ের যাকাতও বিভিন্ন পরিমাণের হবে। সামুদ্রিক সম্পদের—মুক্তা, আম্বর ও মৎস্য ইত্যাদি থেকেও অনুরূপ হারে যাকাত দিতে হবে। বহু প্রাচীনকালীন ফিকাহবিদ এ মত দিয়েছেন। আমরাও এ মতকে পছন্দ করেছি ও সমর্থনও দিয়েছি।

যেসব জমি চাষকারীকে নির্দিষ্ট নগদ অর্থের বিনিময়ে ভাড়া দেয়া হয় সে ভাড়া থেকে লব্ধ আয়ের যাকাতও এই হারে দিতে হবে, মালিক দেবে ভাড়ার যাকাত আর চাষী দেবে জমি থেকে লব্ধ ফল ও ফসলের যাকাত—ওশর কিংবা অর্ধ ওশর।

মালিকানাভুক্ত দালান-কোঠা গাড়ী-যানবাহন—এধরনের যে সব জিনিস ভাড়া দেয়া হয় এবং যা থেকে আবর্তনশীলভাবে মালিক ভাড়া পেতে থাকে, সে বাবদ প্রচণ্ড আয়ের যাকাতও অনুরূপই হবে। কোন কোন আলিম তাই বলেছেন, আমরাও যথাস্থানে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

---

২. এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রম বা কাজ ও স্বাধীন পেশা থেকে উপার্জিত আয়ের যাকাতও এমনি হবে। মাসিক হারে প্রাপ্ত বেতন, মজুরী ও লালন-পালন এবং বিভিন্ন পেশা ও কায়-কারবারের মালিক যা কিছু উপার্জন ও আয় করে সেই অর্জিত সম্পদও এ পর্যায়ে গণ্য। এ সব ক্ষেত্রে যথাযথ শর্তানুযায়ী যাকাত ধার্য হবে—যেমন আমরা পূর্বে অগ্রাধিকার দিয়েছি ও বিশ্লেষণ করেছি।

তৃতীয় আলোচনা

ব্যক্তিদের ওপর ধার্য যাকাত

ব্যক্তিদের ওপর ধার্য কর

আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে 'কর' ব্যবস্থা পারদর্শিগণ ক্ষেত্রের পার্থক্য হিসেবে 'কর'কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ মূলধনের ওপর কর, আয়-আমদানীর ওপর কর এবং ব্যক্তিদের ওপর কর। যাকাত হচ্ছে মূলধনের ওপর কর সে বিষয়ে এবং আয় আমদানীর ওপর কর সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। ব্যক্তিগণের ওপর কর পর্যায়ের যে যাকাত সে সম্পর্কিত আলোচনা এখনও অবশিষ্ট বা বাকী রয়ে গেছে। ব্যক্তিগণের কর সরাসরি মালদারের ওপর বর্তে এ হিসেবে যে, সে কর ধার্য হওয়ার একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাতে তার ব্যক্তিগত অবস্থা বিচার্য নয়—সে ধনী কি গরীব। এ কর 'মাথাপিছু কর' নামে পরিচিত। কেননা তা মাথা পিছু হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকেই গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই তা থেকে বাদ যাবে না।

মাথাপিছু এ কর ধার্যকরণের ওপর রাষ্ট্র নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কেননা তা পুরুষ, মেয়েলোক ও শিশু—সকলের ওপর সমানভাবে পড়ে। অথবা যাদের মধ্যে বিশেষ শর্ত বিপুলভাবে পাওয়া যায় সে সব লোকের ওপর তা ধার্য হয়। এ বিশেষ শর্ত হতে পারে রাজনৈতিক যোগ্যতার শর্ত অথবা তা সংখ্যালঘুর ওপর কিংবা আশেপাশের লোকদের ওপর ধার্য হওয়ার নির্দিষ্ট কর।

বিশেষত্ব ও দোষ-ত্রুটি

এ কর-এর বিশেষত্ব বা সুবিধা হচ্ছে 'কর' ধার্য করার উপকরণ নির্ধারণ করায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। সকলকে কর ধার্যের ক্ষেত্ররূপে নির্ধারণ নিরংকুশ সাধারণ নিয়মের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে—যাতে লব্ধ সম্পদ বিপুল হয়—তার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না।

তবে তার ওপর এ কথা ধরে নিতে হবে যে, তা 'কর' বহন ও তা আদায় করার শক্তি, সামর্থের পরিপন্থী হবে যদি সমস্ত মালদার শ্রেণীর লোকদের থেকে একটি পরিমাণ গ্রহণ করা হয়। কেননা তাদের আয় ও সম্পদ একই পরিমাণের নয়।

এ কারণে আধুনিক কালের রাষ্ট্র ব্যক্তিগণের ওপর কর ধার্যকরণ নীতি প্রত্যাহার করেছে। তার পরিবর্তে ধন-মালের ওপর কর ধার্যকরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন কোন আধুনিক রাষ্ট্র এ প্রকারের 'কর' আরোপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, তখন তার উদ্দেশ্য হয় সামাজিক সামষ্টিকতার

চেতনা তীব্র করে তোলার উদ্দেশ্যে যেন তারা সকলেই এ চেতনা লাভ করতে পারে যে, তারা সকলেই সামষ্টিক বোঝা বহনে অংশীদার রয়েছে। আর তার পরিণতিতে রাজনৈতিক অবস্থা ও কার্যকলাপের গুরুত্ব এবং তারা বহু বিদেশে ছড়িয়ে থাকলে 'দেশী' হওয়ার চেতনা জাগানোর লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

লক্ষ্যণীয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কয়টি অঙ্গরাজ্যের প্রায়ই মাথাপিছু কর ধার্য করা হয়ে থাকে—যদি তা লব্ধ সম্পদ বিশেষ কাজে নির্দিষ্ট করা হয়। হয় তা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যয় করার জন্যে অথবা সামাজিক সাহায্য কাজের অগ্রতি সাধনের লক্ষ্যে কিংবা রাস্তা ঘাটের অবস্থা উন্নয়নের জন্যে ধার্য করা হয়।

ফ্রান্সেও এ মাথাপিছু কর অব্যাহত নিয়মে ধার্য হয়ে থাকে। যেমন স্থানীয় কর; আর মালদার মাত্রের ওপর কর। শর্ত এরূপ থাকে যে, বছরের তিনটি দিন রাস্তা নির্মাণ বা সমানকরণ-সংরক্ষণের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাজ করতে হবে।[১]

ফিতরার যাকাতে ব্যক্তিগণের কর এর মতই সুবিধা

ইসলাম যে ফিতরার যাকাত ধার্য করেছে তার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলে দেখা যাবে প্রতি বছর ফরয রোযা থেকে অবসর গ্রহণ এবং ঈদের আগমন কালে একবার করে এ যাকাত দিতে হয়। এ যাকাত ব্যক্তিদের মাথাপিছু ধার্য করা এক প্রকারের কর বিশেষ। এর সুবিধা এবং বিশেষত্ব হচ্ছে তা ধার্য করা যেমন সহজ তেমিন আদায় করাও ঝঞ্ঝাটমুক্ত। আর তা সকল মুসলমান পরিব্যাপ্ত অথচ এ ধরনের কর-এর ব্যাপারে সাধারণত যেসব শ্রম ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এ ফিতরার যাকাতে তার আদৌ কোন আশংকা নেই। কেননা তার পরিমাণটা খুবই হাল্কা। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই মনের খুশীতে তা দিয়ে দেয়াও খুবই সহজ। বিশেষ করে তা একটা ফরয ইবাদতের সাথে যুক্ত বলে তার মর্যাদা অনেক বেশী। তাতে একটা পবিত্রতার তাৎপর্য নিহিত। সেই সাথে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক লক্ষ্যও তার সাথে জড়িত। তবে কেউ যদি তা আদৌ দিতে না পারে তা হলে সমস্ত মুসলমানের সর্বসম্মত মতে সে ক্ষমা ও নিষ্কৃতি পাওয়ার যোগ্য।

ইসলামী শরীয়াত এ যাকাত বার্ষিক হিসেবে প্রত্যেকটি মুসলিমের ওপর ধার্য করেছে—পুরুষ-স্ত্রী বা অল্প বয়স্ক বেশী বয়স্ক নির্বিশেষে। এর মূলে একটা বড় লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিম ব্যক্তি সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায়ই দরিদ্র জনের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে ও ত্যাগ স্বীকার করতে অভ্যস্ত হোক। তা হলে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকালে মানুষের জন্যে অর্থ ব্যয় করবে, তেমনি করবে অভাব অনটনকালেও। প্রত্যেকে অপর সকলের ও প্রত্যেকের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করতে, অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত লোকদের জন্যে স্বীয় দায়িত্বের অনুভূতি রাখতে অভ্যস্ত হবে। বিশেষ করে ঈদ ও ফরয রোযা পালন সমাপ্তিকালীন আনন্দ উৎসবকালে তাদের কথা বেশী করে স্মরণ করবে।

---

১. ডঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ ইবরাহীম কৃত مبادى علم المالية العامة ১ম খণ্ড ৩০৫- ৩০৭ পৃ. 'মাথাপিছু কর' শীর্ষক আলোচনা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কোন লোক নিজেও যদি ফিতরা পাওয়ার যোগ্য হয়, তাও ফিতরা দেয়ার পথে ইসলাম কোন প্রতিবন্ধকতা দেখতে পায় না। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطٰى -

তোমাদের মধ্যে যারা ধনী লোক, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তাযকীয়া—পবিত্র-পরিশুদ্ধ—করবেন ফিতরা দেয়ার দরুন। আর যারা দরিদ্র, তারা যা দিল, আল্লাহ্র তা'আলা তার চাইতেও বেশী তাদের ফিরিয়ে দেবেন।[১]

দুনিয়ার মুসলিম এ ফিতরা আদায় করতে খুব বেশী আগ্রহী লক্ষ্য করা যায়। রোযা পালনে বেহুদা কথা-কাজ এবং গর্হিত আচার-আচরণ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি যা ঘটেছে, এ ফিত্‌রা দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করাই সকলের লক্ষ্য। যদিও তাদের অনেকেই তাদের ধন-মালের যাকাত দিতে খুবই অমনোযোগী পাওয়া যায়—(যা একান্তই অবাঞ্ছনীয়)।

১. ফিতরার যাকাত আলোচনায় এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর ও যাকাতের মধ্যে সুবিচারের ভূমিকা

কর একটা বাধ্যতামূলক ধার্যকৃত ব্যবস্থা। যার ওপর তা ধার্য হবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা দিতে প্রস্তুত না হলে, জোরপূর্বকই তা তার কাছে থেকে আদায় করে নেয়া হবে। এ প্রেক্ষিতে আধুনিক কালের বহু অর্থনীতিবিদ ও করবিশারদ এ আহ্বান জানিয়েছেন যে, এ কর কোনরূপ জোর জববদস্তি ও রূঢ় ব্যবহার ছাড়াই তা আদায় করার কতগুলো নিয়ম ও কায়দা অবলম্বন করতে হবে এবং কর সংক্রান্ত আইন-কানুন এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যেন তা ধার্যকরণ ব্যাপারটি সুবিচার নীতির সাথে পুরাপুরি সংগতিপূর্ণ হয়। যেমন, তা আদায় করার কাজটা একটা অনুকূল সময়ে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে করে করদাতা কোনভাবেই নির্যাতিত হবে না। এ সব হচ্ছে, সেই মৌলনীতি একদিক দিয়ে কর নির্ধারণে বিধায়কের কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট করতে হবে—কর সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকালে এবং অপর দিক দিয়ে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে তার দিকে দিয়ে এ সব মৌলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে, তা যখনই কর ও তা আদায় করার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা করবে।

প্রখ্যাত অর্থনৈতিক দার্শনিক আদম স্মীথ, ফাজিঞ্জস এবং সিসমুন্ডী উপস্থাপিত উপরিউক্ত মৌলনীতিসমূহের তাৎপর্য অনুধাবনে যে লোকই আত্মনিয়োগ করবে, সে-ই জানতে পারবে যে, তা হচ্ছে চারটি ঃ ন্যায়পরতা, দৃঢ় প্রত্যয়, আনুকূল্য এবং মধ্যম নীতি অবলম্বন। এ চারটি মৌলনীতি প্রধানত আদম স্মীথের উদ্ভাবিত বলে জানা যায়।

এ মৌল ভিত্তি, নীতি, নিয়মসমূহ হচ্ছে অর্থনীতির সংবিধান, যা পালন করা একান্তই কর্তব্য। এর কোন একটিরও বিরোধিতা অর্থনীতিতে বাঞ্ছনীয় নয়—বিশেষ করে আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তিদের এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে।[১]

সত্যি কথা হচ্ছে, যাকাত ফরযকরণে ইসলাম এ মৌলনীতিসমূহের প্রতি সর্বাগ্রে ও পূর্ণমাত্রা লক্ষ্য রেখেছে। রেখেছে এমন সময়, যখন আদম স্মীথ দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেননি বরং তাঁরও প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে। পরবর্তী আলোচনা পর্যায়সমূহে আমরা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করব।

---

১. দেখুনঃ ডঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ ইবরাহীম কৃত গ্রন্থ مبادی علم المالية العامة ১ম খণ্ড, ২৬২—২৬৩পৃ.

প্রথম আলোচনা

সুবিচার ও ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে

লোকদের ওপর কর ধার্যকালে যে প্রথম মৌলনীতি অনুসরণ ও পূর্ণমাত্রায় সংক্ষরণ একান্তই অপরিহার্য, তা হচ্ছে সুবিচার ও ন্যায়পরতা। আর আদম স্মীথ[১] এ মৌলনীতির ব্যাখ্য করে বলেছেন ঃ 'সরকারী ব্যয় বহনে রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের অংশীদারিত্ব একান্তই আবশ্যক। প্রত্যেককেই দিতে হবে তার শক্তিসামর্থ্যের সম্ভাব্যতা অনুপাতে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সাহায্য-সযোগিতায় যে যতটা আয় ভোগ করে সে অনুপাতে।[২]

উপরিউক্ত মৌলনীতি সাধারণভাবে ইসলামী শরীয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর বিশেষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ যাকাত কর ধার্যকরণের সাথে।

কেননা ইসলামের যাবাতীয় ব্যাপার সুবিচার ও ন্যায়পরতা একান্তভাবে কাম্য। তা মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যকার একটি বিশেষ গুণও। তাঁর বহু পবিত্র নামের মধ্যকার একটি নামও তাই। আল্লাহ্র সৃষ্টি এ আসমান-জমিন এ ন্যায়পরতা ও সুবিচারের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। নবী রাসূলগণ এ আদর্শসহ প্রেরিত, আসমানী গ্রন্থসমূহ এ আদর্শের বাহন হিসেবে অবতীর্ণ। কুরআন মজীদ এ কথা অতীব সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -

নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি অকাট্য-সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সহকারে। এবং তাঁদের সাথে নাযিল করেছি আল কিতাব ও মানদন্ড, যেন লোকেরা সুবিচার সহকারে বসবাস করতে পারে।[৩]

এ 'সুবিচার'ই কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত।

ইসলামে এ সুবিচার নীতির গুরুত্ব যে কতখানি তা উপরিউক্ত ঘোষণায়ই সুস্পষ্ট। এ নীতিকে যাকাতের ক্ষেত্রে সন্ধান করা হলে আমরা তা এখানে পূর্ণমাত্রায় স্পষ্টরূপে বিরাজিত দেখতে পাব। ইসলামের বহু আইন বিধানেই তা লক্ষ্যণীয়।

---

১. ইংরেজী অর্থনৈতিক দার্শনিক। অষ্টাদশ শতকের বড় অর্থনীতি মনীষী। তাঁর গ্রন্থের নাম ثروة الامم 'জাতীয় সম্পদ'। তিনি ক্লাসিক্যাল বা স্বাধীন অর্থনীতির আদিপিতা নামে খ্যাত।

২. দেখুন ঃ ডঃ আহমাদ সাবিত উয়াইজাহ উপস্থাপিত الاسلام وضع الاسس الحديثة للضرخية শীর্ষক সেমিনার রচনা।

৩. سورة الحديه – ٢٥

প্রথম ঃ যাকাত ফরয হওয়ায় সমতা ও সাম্য

যাকাত প্রত্যেক ধনশালী মুসলিমের ওপরই ফরয হিসেবে ধার্য, তার জাতিত্ব, গায়ের বর্ণ, বংশ তালিকা বা সামাজিক শ্রেণী মর্যাদা যা-ই হোক না কেন। নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, অভিজাত-উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, দুর্বল-নিম্নবংশ, শাসক-প্রজা সাধারণ, রাজা-দাস-নফর—ধার্মিক মানুষ আর দুনিয়াদার মানুষ যা-ই হোক। এ অকাট্য শরীয়াতী ফরয পালনে সকলে সমানভাবে বাধ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের প্রাচীনকালীন আইন প্রণয়নে এ নিরংকুশ সমতা ও সাম্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তথায় ধার্মিক ও সদাচারী লোকেরা কর অব্যাহতি পেয়ে আসছে সব সময়। কেননা—যেমন বলা হয়েছে—তারা তাদের রক্ত ও নামাযসমূহ উপস্থিত করছে।[১] (সে কারণে তাদের ওপর কর ধার্য করা হয় না।)

ইবনে হাজম বলেছেন ঃ যাকাত ফরয পুরুষ ও মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পূর্ণ বয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পাগল নির্বিশেষে সকল মুসলিমের ওপর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি তাদের পবিত্র কর ও তাদের পরিশুদ্ধ কর 'তদ্দ্বারা'। এ নির্দেশ ছোট-বড়, সুস্থ-বিবেকসম্পন্ন ও পাগল সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রকরণের মুখাপেক্ষী। পরিশুদ্ধতা লাভ তাদের সকলের জন্যেই অপরিহার্য। এঁরা সকলেই ঈমানদার লোক। রাসূলে করীম (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে বলেছিলেন ঃ 'তুমি তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।' এ কথাও নির্বিশেষে সব মুসলমান ধনী লোকদের ওপর প্রযোজ্য।[২]

দ্বিতীয় ঃ নিসাবের কম পরিমাণ ধন-মাল বাদ যাবে

যাকাত ধার্যকরণে ইসলামের সুবিচার নীতি হচ্ছে, স্বল্প পরিমাণের ধন-মালকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যাকাত ফরয করা হয়েছে কেবলমাত্র পূর্ণ নিসাব পরিমাণ ধন-মালের ওপর। তার কারণ হচ্ছে, লোকদের পক্ষে কষ্ট না হয় এমন অতিরিক্ত ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ। মানব প্রকৃতির ওপর দুঃসহ চাপ প্রয়োগ শরীয়াতের লক্ষ্য নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (স) কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ -

অতিরিক্ত ধন-মাল (থেকে যাকাত) গ্রহণ কর।[৩]

---

১. ডঃ সাবিত উয়াইজা রচিত 'ইসলাম ও কর' সম্পর্কিত সেমিনার রচনা।

২. المحلى ج ٥ ص ١٩٩ - ٢٠٠ بتصرف

৩. অনেকে العفو-এর তাফসীর করেছেন যাকাত। কেননা তা বিপুল ধন-মাল থেকে খুব সামান্য নেয়া হয়।

এবং লোকদের নির্দেশ দাও প্রচলিত ও সর্বজনপরিচিত ভাল কাজ করার।[১] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ-

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে; তারা কি ব্যয় করবে। হে নবী! তুমি বল ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে العفو। -এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে ঃ 'ধনাঢ্যতার অতিরিক্ত পরিমাণ।'

তৃতীয় ঃ জোড়া যাকাত নিষিদ্ধ

ন্যায়পরতা ও সুবিচারের নীতি বড় প্রকাশমান বাস্তবায়ন হচ্ছে রাসূলে করীম (স) ঘোষিত সে বিধান, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

'যাকাত ধার্যকরণে দ্বৈততা নেই।'[৩]

এ কথার অর্থ হিসেবে আবূ উবাইদ বলেছেন ঃ 'এক বছরে দু'বার যাকাত নেয়া হবে না।'[৪] ইবনে কুদামাহ প্রমুখ এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ঘোষণা করেছেন ঃ 'একই কারণে ও একই বছর দুই যাকাত ধার্য করা জায়েয নয়।'[৫] আধুনিককালে কর ও নব্য অর্থব্যবস্থা অধ্যয়নে এ কথাটি 'জোড়া কর নিষিদ্ধ' নামে পরিচিত।

নবী করীম (স)-এর উপরিউক্ত আইনটির কারণে ইসলামের ফিকাহবিদগণ তাঁদের দৃষ্টি যাবতীয় আইন বিধানে মৌলনীতি ও কারণ নির্ধারণে পুরোপুরি নিবদ্ধ রেখেছেন। এটা এমন একটা অগ্রবর্তিতা, যার দৃষ্টান্ত বিরল। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

ক. ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ ধন-মালের মালিক উট, গরু বা ছাগল—যার যাকাত দেয়া হয়েছে—নগদ সম্পদের নিসাব পরিমাণের সাথে মিলিয়ে গণনা করবে না। তার কারণ এই বলা হয়েছে ঃ 'মিলানো হলে যাকাতে দ্বৈততা দেখা দেবে।' একই বছরে একই ধন-মালের মালিকের ওপর দুবার যাকাত ধার্যকরণই 'দ্বৈততা' এবং হাদীস দ্বারা তা নিষিদ্ধ হয়েছে।[৬]

খ. যে লোক তার নগদ সম্পদের যাকাত দিয়ে দিল, পরে সে তা দিয়ে একটা উট কিংবা অন্য কোন গবাদি পশু ক্রয় করল অথচ যাকাত দিয়ে দেয়া নগদ অর্থ দ্বারা যে ধরনের গবাদি পশু সে ক্রয় করল, অনুরূপ গবাদি পশু তার কাছে আগে থেকেই বর্তমান রয়েছে তখন তার সাথে এই শেষে ক্রয় করাটাকে মেলাবে না—তার যাকাত আবার দেবে না—যখন বছরান্তে সমস্ত গবাদি পশুর যাকাত দেয়া হবে। কেননা সেটিতো সেই

---

১. سورة الاعراف - ١٩٩ ২. البقره - ٢١٩

৩. আবূ উবাইদের উদ্ধৃতি ابن ابى شيبة قد تقدم - كتاب الاموال ص ٣٧٥

৪. الاموال ص ٣٧٥ ৫. المغنى ج ٣ ص ٢٤ - ٣٥

৬. البحر الرائق الابن نديم ج ٢ ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

নগদ সম্পদের বিকল্প, যার যাকাত ইতিপূর্বেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব সেই বছরই সেটির যাকাত পুনরায় দিতে হবে না।[১]

গ. ব্যবসায়ের লক্ষ্যে নিসাব সংখ্যক গবাদি পশু উট গরু ছাগল ইত্যাদি ক্রয় করা হলে ইমাম আবূ হানীফা ও সওরী ও আহমদের মতে তার ব্যবসায়ী যাকাত দিতে হবে। আর মালিক ও শাফেয়ীর নতুন মত হচ্ছে, তার যাকাত দিতে হবে গবাদি পশুর যাকাত, তার কারণ হিসেবে বলেছেন, তার গবাদি পশু গণ্য হওয়াই অধিক শক্তিশালী কথা। এ মতের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ হওয়ার বিশেষত্বের অধিকারীও। অতএব তাই উত্তম। প্রথমোক্ত মতের লোকেরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যবসায়ী যাকাত দেয়া হলে মিসকীনরা বেশী পরিমাণ পেতে পারবে। কেননা তা ফরয হয় সেই মালে, যা হিসেবে অনেক বেশী।[২]

উপরিউক্ত দুটি মতের প্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে, তারা সকলেই একমত হয়েছেন এ কথায় যে, যাকাত কেবলমাত্র একটি দিকের বিচারেই ফরয হয়ে থাকে। হয় ব্যবসায়ের দৃষ্টিতে না হয় কাজের জন্যে ঘরে স্বাধীন মুক্তভাবে পালিত গবাদি পশু হওয়ার কারণে। এখন আলাদা আলাদা উভয় দিকের বিবেচনা করা হলে একই নিসাবের দুটি যাকাত ধার্য হতে হয় অবশ্যম্ভাবীরূপে। কিন্তু তা জায়েয নয়। কেননা তা পূর্বোদ্ধৃত হাদীসের পরিপন্থী।

ঘ. উট ও গরু সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ যা বলেছেন, তাও এ পর্যায়ে গণ্য। এ পশু চাষাবাদ, পানি উত্তোলন ও কৃষি কাজে নিযুক্ত থাকে। এ কারণে জমহুর ফিকাহবিদগণ তার ওপর যাকাত ধার্য না হওয়ায় মত প্রকাশ করেছেন। তার কারণ প্রদর্শন সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন ঃ 'গমে তো যাকাত ধার্য হয়।' আর গম গরু থেকেই।[৩] আবূ উবাইদ এ অর্থটির ওপর তাগিদ জানিয়ে বলেছেন ঃ গরু যখন চাষবাদের কাজ করে, পানি উত্তোলন করে বা টানে, তখন যে দানার ওপর যাকাত ধার্য হয়, তা তো সেই গরুর চাষ, পানি উত্তোলন ও মলনেরই ফসল। এখন ফসলের সাথে সাথে যদি গরুর ওপরও যাকাত ধার্য করা হয় তাহলে লোকদের ওপর দ্বিগুণ বা দ্বৈত যাকাত ধার্য করা হবে।[৪]

ঙ. সুবিচার নীতি প্রয়োগ ও দ্বৈত যাকাত ধার্য না করা মতের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ খারাজী জমি (যার গোটা খণ্ডের ওপর বার্ষিক সুনির্দিষ্ট কর ধার্য হয়) থেকে ওশর নেয়া হবে না। এভাবেই একই জমির ওপর ওশর ও খারাজ উভয়ই একত্রে ধার্য হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। যেমন একই মালে ব্যবসায় যাকাত ও গবাদি পশুর যাকাত একত্রিত হতে পারে না।[৫]

চ. উক্ত মৌলনীতির আরও প্রয়োগ এভাবে হয়েছে যে, জমহুর ফিকাহবিদগণ শর্ত করেছেন, নিসাব পরিমাণ সম্পদ ঋণমুক্ত হলে তবেই তার ওপর বান্দা হিসেবে দাবি-দাওয়া চাপানো যায়। কেননা যে মাল ঋণ বাবদ দেয় তা না থাকার সমতুল্য।

---

১. ঐ এবং দেখুন ঃ المختار ج ٢ ص ٢١ ২. المغنى السابق।

৩ ও ৪. الاموال ص ٣٨١ ৫. بدائ الصنائع ج ٢ ص ٥٧

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ শোধ করে দিলে তার পর তা নিসাবের পরিমাণ সম্পদের মালিকত্ব অবশিষ্ট না থাকলে সে 'ধনী ব্যক্তি' গণ্য হবে না; বরং তখন সে অভাবগ্রস্ত গণ্য হবে। এতে প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান ধন-মাল অভিন্ন হবে—যেমন আগেই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের কারণে যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ প্রদর্শনস্বরূপ কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ যা বলেছেন, তা অবশ্যই স্মরণীয়। কেউ বলেছেন, ঋণদাতা তার উপর চেপে বসে বলে ঋণগ্রস্তের মালিকত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার কেউ বলেছেন, ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার অধিকারী লোককে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত দিতে হবে। এরূপ অবস্থায় ঋণগ্রস্তের উপরও যাকাত ফরয করা হলে একই মালে দুবার যাকাত ধার্য হয়ে পড়ে।[১] আর হাদীস তা নিষেধ করেছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন অবস্থায়ই দ্বৈত যাকাত ধার্য হতে পারে না।

চতুর্থ ঃ কষ্টের পার্থক্যের দরুন যাকাত পরিমাণে পার্থক্য

ইসলামের সুবিচারমূলক অবদান এ-ও যে, সম্পদ উৎপাদনে মানুষের নিয়োজিত কষ্টের পরিমাণ বা মাত্রায় পার্থক্যের দরুন যাকাতের ধার্য পরিমাণেও পার্থক্য করা হয়। তবে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে জমি স্বতন্ত্র সেচ ব্যবস্থা ছাড়াই ফল ও ফসল দেয়, তাতে ওশর ধার্য হয় এবং যে জমিতে স্বতন্ত্রভাবে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় ফসল ফলানোর জন্যে, তাতে অর্ধ ওশর ধার্য হয়। যেমন এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হয় মানুষ যে সব গচ্ছিত ও খনিজ সম্পদ লাভ করে শ্রম ছাড়াই তাতে। কেননা তাতে নিয়োজিত শ্রম ও কষ্ট সে সম্পদের তুলনায় কম যা দিয়ে তা হাসিল করা হয়।

বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়াত ছাড়া এ মৌল ন্যায়পরতাপূর্ণ নীতির প্রতি আর কেউই ভ্রূক্ষেপমাত্র করেনি। অথচ আমাদের জ্ঞানমতে তা অবশ্য রক্ষণীয় ও লক্ষ্যণীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সাধারণত অর্থনীতিবিশারদ ব্যক্তিবর্গের অবশ্য কর্তব্য সেদিকে নজর দেয়া, তা দিয়ে উপকৃত হওয়া। কিন্তু তারা তা রক্ষা বা প্রয়োগ করেছেন আয়ের ওপর কর ধার্যকরণে কেবল তার উৎসের প্রতি; কিন্তু তাতে যে কষ্ট ও চেষ্টা নিয়োজিত হয়, তার প্রতি একবিন্দু গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তার পার্থক্যকেও যথাযথ মূল্য দেয়া হয়নি।

পঞ্চম ঃ করদাতার ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য দান

যাকাত অন্যান্য সব দিক দিয়েও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করেছে। ধনশালী লোকদের পরস্পরের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে তার খুব বেশী গুরুত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যাকাতদাতা ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা। যাকাত শুধুমাত্র ধনের পরিমাণের ওপরই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখেনি। অর্থনীতি

---

১. المجموع ج ٥ ص ٤٣٦

বিশারদগণ দুই প্রকারের কর-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর, যা মূলধন মালের ওপর ধার্য করা হয়। মালদারের ব্যক্তিগত অবস্থার ওপর কোন দৃষ্টিই দেয়া হয় না। তার ওপর কি বোঝা চাপানো হচ্ছে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয় না। তার ঋণ বা অন্যান্য আরও বহু প্রকারের দায়িত্ব কর্তব্য থাকলে তাও কোন গুরুত্ব পায় না। আর একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত কর। তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর নজর রাখা হয় ঃ

১. ব্যক্তির জন্যে প্রয়োজন পরিমাণকে কর থেকে অব্যাহতি দেয়া

২. আয়ের উৎসের প্রতি খেয়াল রাখা;

৩. যাবতীয় জরুরী খরচ ও দায়দায়িত্ব বাদ দিয়ে তার পর খালেস আয় থেকে কর গ্রহণ;

৪. পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও বোঝাকে রেয়াত দান

৫. ঋণসমূহকেও রেয়াত দান।

ইসলাম যাকাত ফরযকরণের এ সব কয়টি বিষয়ের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে সবকিছুর আগে। আর তার চাইতেও বড় কথা, ইসলাম তা করেছে তখন; যখন মানুষ প্রত্যক্ষ কর ও ব্যক্তিগত কর-এর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যের কথা আদৌ জানতো না।

ক. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, নিসাব পরিমাণের কম বিত্তের ওপর যাকাত ফরয করা হয়নি। তার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, ইসলাম তো যাকাত ফরয করেছে কেবল ধনী লোকদের ওপর, যেন তা তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। নিসাব হচ্ছে নিম্নতম পরিমাণ সম্পদ, শরীয়াতের দৃষ্টিতে যার ওপর যাকাত হতে পারে। যে লোক এ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়, সে যাকাত ফরয হতে পারে এমন পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় বলে তার ওপর তা ধার্য হবে না। সীমিত পরিমাণ সম্পদের মালিকদের ওপর কর-এর বোঝা না চাপানোর মানবীয় চিন্তার বহু শতাব্দী পূর্বে ইসলাম এ অবদান রেখেছে।[১]

খ. ব্যক্তির ও তার পরিবারের নিম্নতম পরিমাণ জীবিকাকে অব্যাহতি দান। এ পরিমাণটা নির্ধারিত হয় তার মৌল প্রয়োজনাবলীর ভিত্তিতে। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ শর্ত করেছেন যে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিককে মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। এ পর্যায়ে আমরা কুরআন সুন্নাহ ও উম্মতের ফিকাহবিদদের উক্তি প্রভৃতি থেকে অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই সাথে চিন্তা-বিবেচনাপূর্ণ যুক্তি দিয়েও তার সমর্থন যুগিয়েছি। যদিও আল্লাহ্র এ কথাটিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট ঃ

وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ؟ قُلِ الْعَفْوَ –

লোকেরা হে নবী—আপনাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিনঃ যা কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত, তা।

১. এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ঃ 'যে ধনের ওপর যাকাত ফরয হয় তার শর্ত; ১২৬-১৬৩ পৃ.

আয়াতের العفو। শব্দটির অর্থ জমহুর আলিমগণের তাফসীর অনুযায়ী 'মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত।'[১] রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'যাকাত দিতে হবে শুধু ধনাঢ্যতার প্রকাশ থেকে।' এবং শুধু কর তোমার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের থেকে।'

গ. ঋণগ্রস্তকে অব্যাহতি দান এ পর্যায়েরই উল্লেখ্য ব্যাপার। আর তা হবে যদি ঋণটা নিসাবের সামান হয় অথবা ঋণের দরুন নিসাব পরিমাণ সম্পদ না হয়। জমহুর আলিমগণের এটাই মত। শরীয়াতের অকাট্য দলীল তার নিয়ামবলীর এবং তার সাধারণ ভাবধারাও তারই সমর্থন করে। পূর্বে তা আমরা স্পষ্ট করে আলোচনা করেছি।[২]

এ পর্যায়ে হানাফী আলিমগণের বক্তব্য সুবিন্যস্তভাবে উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে মনে করি। তাঁরা বলেছেন, যার ঋণ এতটা হবে যতটা তার ধন-মাল বান্দা হিসেবে তার ওপর আরও দায়-দায়িত্ব আছে তা—আল্লাহ্র জন্যে হোক যেমন যাকাত; কিংবা মানুষের জন্যে হোক—যেমন ঋণ, ক্রয়ের মূল্য, হারানোর ক্ষতিপূরণ, স্ত্রীর মোহরানা প্রভৃতি। অথচ নগদ অর্থ হোক কি অন্য কিছু—তাতে কোন পার্থক্য নেই। ওপরন্তু তা তাৎক্ষণিক হোক, বিলম্বিত মেয়াদের হোক—তাহলে তার ওপর যাকাত ধার্য হবে না।

তা এ জন্যে যে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ তো ঋণগ্রস্তের মৌল প্রয়োজন পূরণেই নিয়োজিত অর্থাৎ তা প্রস্তুত হয়ে আছে তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে—প্রকৃতই হোক অথবা পরিমাণগতভাবেই হোক। কেননা সে তো তার ঋণ শোধের জন্যে তারই ওপর নির্ভরশীল। পাওনাদারের তাগাদার চাপ এবং পরিণতিতে কারাবরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার তার আর কোন উপায় নেই। অপরদিকে আল্লাহ্র কাছে পাকড়াও থেকেই রেহাই পাওয়ারও এটাই তার একমাত্র উপায়। কেননা তার এ ঋণ তার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। তাহলে এর চাইতেও বড় প্রয়োজন তার আর কি হতে পারে ? এক্ষণে তা পিপাসা নিবৃত্তকারী পানি, ব্যবহার্য পোশাক ইত্যাদির মত হয়ে গেছে। আর এরূপ অবস্থায় তা না থাকার মতই। কেননা এরূপ হলে পানি থাকা সত্ত্বেও তৈয়ম্মুম করা জায়েয। অতএব এ লোকের ওপর যাকাত ফরয হবে না। দানের পোশাক যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবুও।[১]

চ. জরুরী ব্যয় ও দায়-দায়িত্বও বাদ দিতে হবে, যেন যাকাতটা খালেস আমদানী বা সম্পদ থেকে দেয়া সম্ভব হয়, আমরা এ মতটি গ্রহণ করেছি। আতা'র মতও তাই। তিনি জমির ফসল বা ফল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

তোমরা খরচাদি বাদ দাও, তার পর যা থাকে তা থেকেই যাকাত দাও।

ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা)ও খরচ বাদ দেয়ার—যদি তা ঋণ করে করা হয়ে থাকে—পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

---

১. ও ২. এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ—'যাকাত ফরয হয় যে মালে, তার সাধারণ শর্ত' শীর্ষক আলোচনা।

৩. দেখুন ঃ شرح العناية على الهداية فتح القدير ج ١ص ٤٨٦

ইমাম আহমদ থেকেও খরচটা ঋণ হয়ে থাকলে উক্তরূপ মতই বর্ণিত হয়েছে। যেমন বীজের মূল্য যদি বাকি থেকে থাকে—বাকিতে নেয়া হয়ে থাকে ব্যাংক থেকে, তাহলে সে ঋণ পরিমাণ সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

অনুরূপভাবে খারাজ বাদ দেয়ার পরই ফসল ও ফলের যাকাত বা ওশর দিতে হবে বলে তিনি মত দিয়েছেন। খারাজকে জমির ওপর ঋণ ধরা হয়েছে। কৃষি ফসল ইত্যাদিকে দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানা ইত্যাদির ওপর কিয়াস করা হয়েছে।[১]

ব্যবসায়ে তো কার্যত খরচাদি বাদ দেয়াই হবে। কেননা যাকাত নেয়া হবে বছরের শেষে যে আসল ও মুনাফা অবশিষ্ট থাকবে, তা থেকে। যা খরচ, তা তো পুষিয়ে নেয়া হয়েছে—অবশ্য যদি তা ঋণ হয়ে না থাকে, যেমন দোকান ভাড়া যা দেয়া হয়নি। তখন হিসেবে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে।

ঙ. পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ আয়ের উৎসের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা যা উল্লেখ করেছি, তাও এখানে উল্লেখ্য। অতএব যে আয়ের উৎস স্থায়ী অ-আবর্তনশীল মূলধন—যেমন কৃষিজমির আয়, তা থেকে ওশর বা অর্ধ-ওশর গ্রহণ করা হবে। আর যে আয়ের উৎস শ্রম বা কাজ—যেমন মাসিক বেতন, মজুরী, স্বাধীন পেশার লোকদের আয় ইত্যাদি, তা থেকে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ ঃ সঙ্গতি বিধানে সুবিচার

ইসলামের শরীয়াত সুবিচার রক্ষার ব্যাপারে তার অকাট্য দলিলসমূহ যতটা পরিব্যাপ্ত, ইসলাম সে উজ্জ্বলতম দিকগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকাকেই যথেষ্ট মনে করেনি। তাৎপর্যের দিক দিয়ে তা আরও অনেক দূরে পৌঁছে গেছে। এ আইন প্রণয়নের বাস্তবায়নের সাথে সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখাকেও যোগ করেছে। তাকে খুবই উত্তমভাবে বাস্তবায়িত করেছে ও কার্যকর করে তুলেছে। এ কারণে যাকাতের জন্যে কর্মচারী নিয়োগের ও বাছাইকরণের জন্যে খুব বেশী উৎসাহ দান করেছে। তাদেরকে ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হওয়ার ও নিজেদেরকে তার আবরণে সুরক্ষিত করার জন্যেও উপদেশ দিয়েছে। তাদের জানিয়েছে ও বুঝিয়েছে যে, আইনের মজবুত ধারায় সুবিচারের নীতি যদি স্বীকৃত থাকে, কিন্তু সে আইন যারা কার্যকর করার জন্যে দায়িত্বশীল তাদের মনে-মগজে চরিত্রে যদি তা প্রকট না থাকে, তাহলে তা লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে, সাদা কাগজে লেখা থাকবে অথচ বাস্তবতাশূন্য হয়ে দাঁড়াবে।

এ পর্যায়ে ইমাম আবূ ইউসুফ খলীফা হারুন-অর-রশীদকে বলেছিলেন ঃ হে খলীফাতুল মুসলেমীন! আপনি এমন একজন লোক নিযুক্ত করার আদেশ করুন, যে হবে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, অতীব পবিত্র চরিত্রের অধিকারী কল্যাণকামী, আপনার ও আপনার

---

১. এ পর্যায়ে 'কৃষি সম্পদের যাকাত' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। শেষ পর্যন্ত আমি অবহিত হয়েছি যে, জা'ফরী মাযহাবই হচ্ছে ফিকাহবিদ আতা'র মত الفقيه ৷ الكلام مصاج ৷ جواهر গ্রন্থদ্বয় থেকে এ কথা الامام جعفر ৷ فقه গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৮০-৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রজা-সাধারণের পক্ষে বিপদ আশংকামুক্ত। এবং এ ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দিন। তাকে এ আদেশ করুন, যেন সে বিভিন্ন স্থানে এমন সব লোক নিয়োজিত করে যারা হবে তার পসন্দনীয়, মনোনীত। তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, নিয়ম-পদ্ধতি ও আমানতদারী সম্পর্কে জানতে চাইবে। তবেই তারা নানা স্থান থেকে যাকাত সংগ্রহ করে তার কাছে জমা করে দেবে।

'আমি জানতে পেরেছি, খারাজ আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের পক্ষ থেকে এমন সব লোককে যাকাত আদায়ের জন্যে পাঠিয়ে থাকে, যারা জনগণের ওপর জুলুম করে, খুব রূঢ় ও অশালীন ব্যবহার করে এবং এমন মাল নিয়ে আসে যা হালাল নয়, যা সংকুলানও হয় না। আসলে যাকাত আদায়ের জন্যে পবিত্র চরিত্রের কল্যাণকামী লোক নিযুক্ত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।[১]

রাসূলে করীম (স) যাকাতের জন্যে ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্রের ও শরীয়াতের বিধান পালনকারী কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। এজন্যে তিনি বলেছেন ঃ যাকাতের কাজে নিযুক্ত লোক যদি ন্যায়পরতা ও সমতার সাথে কাজ করে তবে সে আল্লাহ্‌র পথের গাজীর মর্যাদাশীল হবে।[২] নবী করীম (স) তাঁর একজন কর্মচারীকে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহকে ভয় কর, হে আবুল অলীদ! কিয়ামতের দিন তুমি যেন এমন উট বহন করে নিয়ে না আস, যা বিকট ধ্বনি করবে, বা এমন গরু নিয়ে না আস যা হাম্বা রব তুলবে এবং এমন ছাগী নিয়ে না আস যা চ চ করবে"।[৩]

---

১. الخراج الابى يوسف ص ٨٠.

২. আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও ইবনে খুজায়মা উদ্ধৃত। তিরিমিযী হাদীসটিকে 'হসান' বলেছেন। الترغيب والترهيب ج ١ ص ٥٥٩ ط الحلبى- الحاكم ج ١ص ٤٠٦ হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলে অবিহিত করেছেন এবং যাহরী তা সমর্থন করেছেন।

৩. তাবারানী الكبير। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদ সহীহ (نفس المصدر ص ٥٩٢)

দ্বিতীয় আলোচনা

দৃঢ় প্রত্যয়

কর আরোপে সুবিচার প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় মৌলনীতি হচ্ছে দৃঢ় প্রত্যয়।

এখানে 'দৃঢ় প্রত্যয়' বলতে বোঝায়, যার ওপর কর ধার্য হয়, যে সচ্ছল লোককে কর দিতে বাধ্য করা হয় তার মনে এ কর-এর পক্ষে একটা দৃঢ় প্রত্যয় বিরাজমান থাকা একান্তই আবশ্যক। তাতে যেন কোনরূপ অজ্ঞতার অন্ধকার বা অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়। তেমনি তা নিছক জবরদস্তিমূলকও হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কর দেয়ার মেয়াদ, পন্থা ও সময়াদি সকলের কাছে সুস্পষ্টরূপে জানা থাকতে হবে এবং শেষ কদ্দিনে চলবে, তাও অজানা থাকলে চলবে না। কর সংশ্লিষ্ট সকল লোকেরই এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অবহিত থাকতে হবে।

অর্থনীতির গুরু আদম স্মীথ এ দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ ধনশালী ব্যক্তির যা কিছু বাধ্যবাধকতা এবং তার ওপর যে কর্তব্য আরোপিত, সেই বিষয়ে তার মনে অকাট্য সন্দেহমুক্ত জ্ঞান থাকার গুরুত্ব বাস্তবিকই অনস্বীকার্য। কেননা যে কোন কর ব্যবস্থায় দৃঢ় প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি কর বোঝা বন্টনের সুবিচার না হওয়ার কঠিন বিপদ ডেকে আনতে পারে।

উপরন্তু কর ব্যবস্থার স্থিতির সাথে দৃঢ় প্রত্যয় খুব বেশি গভীরভাবে সংযুক্ত ও সম্পর্কশীল, এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ধনশালী ব্যক্তি যদি একটা নির্দিষ্ট কর দিতে অভ্যস্ত হয় এবং তার আইন বিধানসমূহ সুসংকলিত থাকে, তা হলে বোঝা যাবে, সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে। এই প্রেক্ষিতে কানার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার এতদূর বলেছেন, 'প্রত্যেকটি প্রাচীন করই খুবই উত্তম পবিত্র কর।'

পারস্পরিক ব্যাপারসমূহের স্থিতির বিশেষত্ব এই যে, তা অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ বাস্তবায়িত করে। কর সম্পর্কেও এরূপ 'কিয়াস' করা যায়। তাতে খুব বেশী ও বারবার পরিবর্তন কর-বিধানকে ভেঙ্গে চুরে দেয় এবং তা সন্দেহের পর্যায় অতিক্রম করে স্থিতি ও প্রত্যয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। উপরন্তু 'কর' আরোপকারীর মনোভাব সম্পর্কে জনমনে প্রবল সংশয় জেগে ওঠে।[১]

বস্তুত ঃ এ দৃঢ় প্রত্যয়ের যাবতীয় নিয়ম-কানুন যাকাত ফরযকরণে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত। আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর কিতাবে সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে ফরয

---

১. ড. ফুয়াদ ইবরাহীম লিখিত مبادى علم المالية العامة গ্রন্থ থেকে ২৬৭ পৃ.

করেছেন। তাঁর রাসূলে করীম (স)-এর জবানীতে তার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিশ্লেষণে ইমাম সাহেবগণ বিরাট মহামূল্য ফিকহী জ্ঞানের সমাহার রেখে গেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম-আহকাম শিক্ষা করা এ হিসেবে যে, তা তার দ্বীনের একটা জরুরী অংশ বিশেষ। তা এক স্থায়ী ও স্থিতিশীল ফরয, তাতে খুব বেশী পরিবর্তন পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। এ কালের অন্যান্য সমাজের বিবিধ কর-এর সততা নিত্য পরিবর্তনশীল নয়। যাকাতের কোন কোন আইনে যে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, রাষ্ট্র যখন যাকাত সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করবে, তখন তন্মধ্যে যে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

তৃতীয় আলোচনা

আনুকূল্য রক্ষায়

আদম স্মীথ 'কর' ব্যবস্থার সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৃতীয় যে মৌলনীতি উপস্থাপিত করেছেন, তা হচ্ছে অবস্থার সাথে আনুকূল্য রক্ষা।

এ মৌলনীতির সারনির্যাস হচ্ছে, কর নির্ধারণ বা আরোপে ধনশালী ব্যক্তির দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তার প্রতি নম্রতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন যেন সে স্বীয় মনের ঐকান্তিক সন্তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততা সহকারে কর আদায় করে দিতে প্রস্তুত হয়। এ ব্যাপারে তার যেন কোনরূপ অভিযোগ না থাকে। অথবা কোন রূঢ়তা ও কষ্টদানের শিকারে পরিণত না হয়।

ইসলামী আইন প্রণয়ন ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যা আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি ও স্পষ্ট করে তুলেছি—কোন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি লক্ষ্য করবেন যে, ইসলাম এ দিকটির ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। নিম্নে আমরা তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরছি, তা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ

প্রথমত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন, 'মুসলমানদের যাকাত তাদের পানির স্থানসমূহেই আদায় করা হবে।' আহমদ ও আবূ দাউদ উদ্ধৃত অপর বর্ণনায় কথাটি এই ঃ টানাটানি নেই, পার্শ্বে রেখে দেয়া নেই, তাদের যাকাত তাদের স্থান ছাড়া অন্য কোন খানে নেয়া হবে না।'[১]

হাদীসে 'টানাটানি নেই' বলে বোঝানো হয়েছে যে, গবাদি পশুর যাকাত সেগুলোর অবস্থান স্থান থেকেই নেয়া হবে। তা যাকাত গ্রহণকারী কর্মচারী পর্যন্ত টেনে নেয়া যাবে না। খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন ঃ 'পার্শ্বে রেখে দেয়া নেই' বলে বোঝানো হয়েছে যে, ধন-মালের মালিকদেরকে তাদের অবস্থান স্থল থেকে সরিয়ে দিয়ে যাকাতের হিসাব করা বা যাকাতের মাল লওয়া হবে না। এ-ও হতে পারে যে, তাদেরকে পশুর অবস্থান স্থল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া চলবে না, যার ফলে যাকাত আদায়কারীকে তাদের পিছনে

---

১. ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ আবূ দাউদ মুনযেরী ও হাফেয 'তালখীচ' গ্রন্থে এ হাদীসটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রয়েছেন, তিনি عن – عن করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অধ্যায়ের ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন আহমদ আবূ দাউদ নাসায়ী, তিরমিযী ইবনে হাব্বান আবদুর রাজ্জাক। নাসায়ী তাঁর থেকে অপর এক সূত্রে হাদীসটি এনেছেন। ١. الاعثمانية ط ١٥٦ ص ٤ نيل الاوطار ج তাবারানী الاوسط গ্রন্থে হযরত আব্বাস থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ মরুবাসীদের যাকাত তাদের পানির কাছে এবং তাদের আঙিনায় লওয়া হবে। তার সনদ উত্তম। যেমন ٧٤ مجمع الزوائد ج ٣ ص এ রয়েছে।

পিছনে দৌড়াতে ও তাদের খোঁজার শ্রম করতে হতে পারে। সোজা কথা, যাকাত আদায় যেমন আদায়কারীর সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে যাকাতদাতার সুবিধা-অসুবিধা।[১]

কেউ কেউ 'পার্শ্বে রেখে দেয়া নেই'—এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি থাকবে যাকাতদাতাদের থেকে অনেক অনেক দূরে আর তখন তাদেরকে যাকাত গ্রহণকারীর কাছে ডেকে ডুকে হাজির করা হবে—হাদীসে এ কাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[২]

শাওকানী লিখেছেন ঃ হাদীসটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যাকাত গ্রহণকারী—যে যাকাত নিয়ে যেতে এসেছে, সে যাকাতদাতাদের পানির স্থানে—যেখানে তারা অবস্থান করে উপস্থিত হয়ে যাকাত নেবে। কেননা যাকাতদাতাদের পক্ষে সেটাই সুবিধাজনক।[৩]

দ্বিতীয় ঃ মধ্যমমানের জিনিস গ্রহণ ও উত্তম বাছাই করা মাল না নেয়ার নির্দেশ।

হযরত মুয়াযকে ইয়ামেন প্রেরণকালে রাসূলে করীম (স) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণে এ কথাটিও ছিল ঃ 'তুমি নিজেকে বাছাই করা উত্তম মালসমূহ থেকে দূরে রাখবে।' কেননা যাকাতাদাতা লোকেরা সাধারণত এই বাছাই করা উত্তম মালসমূহ খুশীর সাথে দিতে প্রস্তুত হয় না।

উত্তম উষ্ট্রী গ্রহণকারী জনৈক যাকাত কর্মচারীর প্রতি নবী করীম (স) অস্বীকৃতি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, আসলে সেটি দুটি উটের বদলে গ্রহণ করা হয়েছে উটের বিরাট পালের মধ্য থেকে। অবশ্য যাকাতদাতা মুসলিমকেও বেছে বেছে বুড়ো, অক্ষম ও রোগাক্রান্ত উট যাকাত বাবদ দিতে নিষেধ করা হয়েছে, বলেছেন ঃ হ্যাঁ, তোমাদের ধন-মালের মধ্যে মধ্যম মানের জিনিস যাকাত বাবদ দেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বাছাই করা উত্তম মালই দিতে বলেননি যেমন, তেমনি খারাপ নিকৃষ্ট মাল দেবার আদেশও দেন নি।[৪]

তৃতীয়ঃ কৃষি ফসল ও ফল-ফাঁকড় পরিমাণ আন্দাজকরণের কম-সে কম পরিমাণ ধরার নির্দেশ। আবূ দাউদ তিরমিযী ও নাসায়ী উদ্ধৃত রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তোমরা যখন আন্দাজ করে পরিমাণ ধরবে তখন ধার্য পরিমাণ থেকে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে নেবে। যদি এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেয়া সমীচীন মনে না কর তা হলে অন্তত এক চতুর্থাংশ অবশ্যই বাদ দেবে। রাসূল (স)-এর কথা আন্দাজকরণের বোঝা হালকাকরণ নীতি গ্রহণ করা। কেননা ধন-মালের অনেক পরিমাণ গাছ থেকেই খেয়ে ফেলা হয়, ঝড়ে পড়ে যায় ও পোকায় খেয়ে ফেলে।[৫]

---

১. معالم السنن ج ٢ ص ٢٠٥ ২.৩. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٥٦

৪. প্রথম খণ্ডের আলোচনা দ্রষ্টব্য

৫. 'কৃষি ফসল ও ফলের যাকাত' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন ঃ রাসূলের 'এক-তৃতীয়াংশ বাদ এক-চতুর্থাংশ বা দাও' কথাটির ব্যাখ্যায় কোন কোন আলিম বলেছেন ঃ মালের যে অংশ বাদ দেয়া হবে, তা যাকাতদাতার সুবিধা বিধানস্বরূপ। কেননা যদি পুরোমাত্রার প্রাপ্যটা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয় তাহলে তাতে তাদের ক্ষতি সাধিত হবে অথচ ফল-ফসলের অনেক জিনিস পড়ে যায়, পাখী খেয়ে ফেলে, লোকেরা খাবার জন্যে পেড়ে নিয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় পরিমাণ আন্দাজের সময় এক-চতুর্থাংশ বাদ দিয়ে ধরলে তাতে যাকাতদাতাদের পক্ষে খুবই প্রশস্ত ও সুবিধা হয়। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এরূপ আন্দাজ ধরারই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফিকাহবিদদের মধ্যে অনেকে এ মতও দিয়েছেন যে, সমস্ত খেজুর সম্পদই ধরতে হবে, কিছুই বাদ দেয়া চলবে না। বরং কিছু পরিমাণ খেজুর আলাদা করে তাদের দেয়া হবে, যার পরিমাণ অনুমানের সাহায্যে জানা গেছে।[১]

চতুর্থ ঃ যাকাত দেয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ছাড়িয়ে তার পরে বিলম্ব করে তা দেয়া জায়েয আছে। অবশ্য তা পারা যাবে মালের মালিকের খুব বেশী প্রয়োজন দেখা দিলে। যেমন হযরত উমর (রা) দুর্ভিক্ষের বছর তাই করেছিলেন।

এসবই করদাতাদের প্রতি আনুকূল্য দানের অন্তর্ভুক্ত নীতি।

---

১. معالم السنن ج ٢ ص ٢١٢ -- ٢١٣

চতুর্থ আলোচনা

মধ্যম নীতি অনুসরণে

কর ব্যবস্থায় প্রযোজ্য প্রখ্যাত সুবিচার নীতির এটা চতুর্থ নিয়ম।

অর্থনীতিবিদরা কর আদায়ের বাধ্যবাধকতায় মধ্যম নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন মনে করেছেন। সর্বপ্রকারের বাড়াবাড়ি পরিহার করার গুরুত্বও তাঁরা স্বীকার করেছেন।

'কর' সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা পর্যায়ে এখানে মনে করা হয়েছে ঃ রাষ্ট্র বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মজুরীদানে এবং অর্থ বিভাগের জন্য পরিহার্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও ভাণ্ডবাটি যা খরিদ করা হয় তাতে যা কিছু ব্যয় করে তা। এসব অর্থ ব্যয় অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থলে তা বহন করে নিয়ে যাওয়ার কষ্ট ইত্যাদিতে যা ব্যয় করা হয়, তাও এর মধ্যে শামিল। তা হয় তাদের দেয় পৌঁছানোর লক্ষ্যে হোক অথবা তাদের বক্তব্য শোনা ও হিসেব নিয়ে তাদের সাথে বোঝাপড়া করা ইত্যাদির জন্য হোক অথবা তাদের জুলুম-পীড়ন দূর করা বা প্রতিষ্ঠানগত সিদ্ধান্তে দোষ ধরার জন্যই হোক। এ ধরনের বহু কারণেই তাদের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং সেজন্যে তাদের একটা মূল্যবান সময়ও অতিবাহিত হতে পারে। প্রয়োজন হতে পারে কোন কোন ব্যয়ভার বহনে কষ্ট স্বীকার করার।

এতে কোন ভয়ের কারণ নেই যে, সাধারণ মালদার লোকেরা তাদের ওপর ধার্য কর যথারীতি আদায় করে দেবে। যেন রাষ্ট্র সরকার তৎলব্ধ সম্পদ দ্বারা সে সাধারণ ব্যায়াদি সম্পন্ন করতে পারে, যার কিছুটা ফায়দা শেষ পর্যন্ত তাদের দিকেই ফিরে আসবে। মালদার ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, তার নিকট থেকে যে মাল নেয়া হচ্ছে, তা উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করবে না; বরং তার একটা বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন তা অর্থ-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের ভাণ্ডারের দিকে যাওয়ার পথে থাকবে, তখন সে তা আদায় করবে নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তি সহকারে। নাফরমানির পতাকা বহন করতে সে কখনই কুণ্ঠিত হবে না এবং ভবিষ্যতেও সে কর দেয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেই চেষ্টা করবে প্রাণপণে।[১]

'কর' ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা এসব যা কিছুর উল্লেখ করেছেন, ইসলামে এ দিকটি সম্পর্কে আমরা যখন বিবেচনা করি, তখন আমরা সাধারণভাবেই দেখতে পাই যে, তা সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যম নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয় এবং সীমালংঘন ও কার্পণ্য বা সংকীর্ণতা প্রদর্শন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করছে। ব্যক্তির

---

১. দেখুন ঃ مبادى علم المالية العامة ج ١ص ٢٦٦

বিশেষ ধন-মালের ক্ষেত্রে যখন এরূপ গুরুত্ব আরোপ, যখন সাধারণ ধন-মালের বিশেষ করে যাকাত সম্পদে অধিক বেশী গুরুত্ব আরোপিত হবে, সে তো স্বাভাবিক কথা।

নবী করীম (স) যাকাত সংগ্রহে ও যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের ব্যাপার কত তীব্র কঠোরতা ও অনমনীয় নীতি অবলম্বন করেছেন এবং যারা লোকদের কাছ থেকে হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করে তা নিজের মাল মনে করেছে তাদের প্রতি যে কি সাংঘাতিকভাবে ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হয়েছেন, তা কারুরই অজানা নেই!

'যাকাত স্থানান্তরকরণ' শীর্ষক আলোচনায় আমরা দেখেছি, কর্মচারীরা কিভাবে মফস্বলে চলে গেছে, যাকাতের মাল সংগ্রহ করেছে এবং ঠিক হাতে কেবল তাদের নিয়ে যাওয়া চাবুক ও কম্বল সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা রাষ্ট্রের ওপর শুধু ততটুকুর বোঝাই চাপিয়েছে, যতটুকু তারা মজুরী হিসেবে গ্রহণ করেছে। তা-ই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল—হত, কোনরূপ অবমূল্যায়ণ বা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছাড়াই। ইমাম শাফেয়ী শর্ত আরোপ করেছেন—তার সমর্থকরাও—যে, যাকাত সংস্থার কর্মচারীদের আট ভাগের এক ভাগের অধিক দেয়া যাবে না। কেননা কুরআন মজীদই তাদের জন্যে এ অষ্টমাংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অতএব তারা তার চাইতে বেশী পাবে না। এ কথাটি ইমাম শাফেয়ী বলেছেন এজন্য যে, তাঁর মাযহাবে কুরআনে উল্লেখিত আটটি খাতের মধ্যে লব্ধ যাকাত সম্পদ সমান হারে বণ্টন করা অপরিহার্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'কর' ও 'যাকাতের' মধ্যে স্থিতি ও উর্ধ্বগামিতা

স্থিতিশীল কর ও উর্ধ্বগামী কর

'স্থিতিশীল কর' বলতে বোঝায় সেই কর, যার মূল্য স্থিতিশীল থাকে—তার অধীন বস্তুর যতই পরিবর্তন হোক না কেন। যেমন আয়ের ওপর বা কোন সম্পদের ওপর কর ধার্য হল, তার মূল্য হচ্ছে ১০%। এ মূল্যটা সকল প্রকারের আয় ও সম্পদের প্রযোজ্য হবে—তা বড় হোক কি ছোট।

আর উর্ধ্বগামী বা বাড়তি প্রবণতাসম্পন্ন কর হচ্ছে তাই, যার মূল্য বৃদ্ধি পায় তার অধীন বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে। যেমন আয়ের ওপর কর ধার্য হল প্রথম একশত জনীহ (মিশরীয় মুদ্রা)-এর ১০% দুইশতের ওপর ১২% তিন শতের ওপর ১৫%—ইত্যাদি।[১]

এরূপ কর ধার্যকরণের কথাই বলেছেন এ কালের বহুলোক। এতেও যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা আছে, তা বর্ণনায় বহু যুক্তি প্রমাণেরও অবতারণা করেছেন তাঁরা যদিও আপত্তি উত্থাপনকারীদের কোন আপত্তির প্রতিই তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করেননি; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যুক্তি এই ঃ

১. একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ক্রমবৃদ্ধিশীল ফসল—আইনের অনুগত। সে যখনই ধন লাভ করল, তার সম্পদ বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অনুপাতে তার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেল। বরং এ সামর্থটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে বহু কয়টি পরপর হারের চাইতেও অনেক বেশী। এ ধনবান ব্যক্তি উর্ধ্বগামী কর দেয়ার জন্যে কিছুমাত্র কম প্রস্তুত হবে না। কেননা কর-এর বোঝা ঝামেলা বহনের শক্তি তার অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছ।

২. সম্পদ ও আয়ে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য দূর করার একটা খুব সার্থক ও নিকটবর্তী উপায় হচ্ছে উর্ধ্বগামী হারের কর। অতএব যেখানে সম্পদ খুব খারাপভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জাতির জনগণের মধ্যে, সেখানে পরিস্থিতির সুস্থতা বিধানের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বগামী হারের কর ধার্য করে তা করা একান্তই কর্তব্য। এর দ্বারাই এ দূরিতক্রম্য পার্থক্য সীমিত করা এবং ধনী ও গরীবদের মধ্যকার ব্যবধান ও দূরত্ব কম-সে-কম করা সম্ভব হবে।

আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যয়নে আমাদের সম্মুখে এ কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে গেছে, যাকাত কোন উর্ধ্বগামী কর চিন্তার ফসল নয়। ফলে যাকাতের মূল্য বা হার-মাত্রা

---

১. مبادئ النظارية العامة للفريبة ص ١٢١

বৃদ্ধিশীল নয়। অন্য কথায় যাকাতের ফরয পরিমাণের হার তখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে যখন ধন-সম্পদের বা আয়ের পরিমাণ যার ওপর যাকাত ধার্য হয়—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

বস্তুত এ এক স্থিতিশীল ও স্থায়ীভাবে ফরযকৃত যাকাত। কেননা যাকাতে দেয় পরিমাণটা স্থায়ী ও স্থিতিশীল। উপাদান-উপকরণের পরিমাণ বাড়তির দিকে বা কমতির দিকে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন।

অতএব যে লোক বিশটি স্বর্ণ দীনারের মালিক, সে তার দশভাগের এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ দেবে। অনুরূপভাবে যে লোক বিশ হাজার স্বর্ণ দীনারের মালিক হবে, সেও ঠিক সেই এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ প্রদান করবে।

যার জমি পাঁচ অসক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করল অথবা যার খেজুর বাগানে পাঁচ অসাক খেজুরের ফসল ফলল, সে উভয় অবস্থায়ই এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক যাকাত বাবদ দেবে। তেমনি যার হাজার অসাক বা ততোধিক পরিমাণের ফসল লাভ হল, সেও সেই হারেই দেবে।

প্রথম দৃষ্টিতে অনেকের মনে হতে পারে যে, বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশুতে যাকাত বুঝি বিপরীতভাবে ঊর্ধ্বমুখিতা প্রবণ, ছাগলের যাকাতেও বুঝি তাই। যেমন সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ প্রতি চল্লিশটি ছাগীতে একটি ছাগী—একশ বিশটি পর্যন্ত এ হার। তার পরে সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দুশটি পর্যন্ত দুটি ছাগী। আরও অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগী। অতঃপর প্রতি একশতে একটি।

এ থেকে এ কালের কোন কোন আলোচনাকারী চিন্তাবিদ মনে করেছেন যে, পশুর ক্ষেত্রে যাকাত বিপরীত দিকসম্পন্ন ঊর্ধ্বগামী এবং তা পশু সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহদানস্বরূপ বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে। অবশ্য এরূপ ব্যাখ্যার একটা তাৎপর্য রয়েছে। তবে গভীর সূক্ষ্ম অধ্যয়নকারী স্পষ্ট দেখতে পারেন যে, এ সিদ্ধান্তটা অগ্রহণযোগ্য। আর এক-দশমাংশের এক চতুর্থাংশ হার যা ইসলাম সাধারণভাবে গ্রহণ করে থাকে—নগদ ও ব্যবসায়ী মূলধনের যাকাত, ঠিক সেই হারই পশুর যাকাতেও গ্রহণীয়। এটা স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে নৈকট্য বিধানমূলক ব্যবস্থা।

গরু ও উটের বেলা এ কথা স্পষ্ট। এজন্যে হাদীসমূহে প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্যে একটি করে এক বছর বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রী বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে মুসান্না—যেমন উট বিপুল সংখ্যক হলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি দুই বছরে উপনীত বাচ্চা, প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে চার বছরে উপনীত বাচ্চা। অতএব ত্রিশটি গরুতে একটি এক বছর বয়স্ক বাছুর ও চল্লিশটিতে একটি করে মুসান্নাহ আর চল্লিশটিতে চিনতে লবুন, পঞ্চাশটি উটে হুক বা—যখন লক্ষ্য করা যাবে যে, এ সংখ্যার মধ্যে ছোট আছে, মধ্যম আছে, বড় আছে। এ সবই আমাদেরকে নৈকট্য বিধানকারী একটি হার দেয়। আর তা হলে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ।

আর ছাগলের পুরুষ স্ত্রী যা-ই হোক, প্রথম চল্লিশটি বাবদ একটি ছাগী দিতে হবে। কেননা শর্ত এই করা হয়েছে যে, নিসাবটা এমন পরিমাণের হতে হবে যেন তার মালিক

বড় ধনী বলে পরিচিত হতে পারে। যথাস্থানে আমরা এ কথাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি এবং বলেছি যে, চল্লিশটি বা পাঁচটি-এর কম সংখ্যকের মালিক ধনী বিবেচিত হয় না, যার ওপর যাকাত ফরয হতে পারে।

তার অর্থ প্রথম চল্লিশটিতে দেয় ফরযের পরিমাণ এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা। ছাগলের মালিকানা পরিমাণ বিপুল হলে দেয় ফরযের পরিমাণ কম হওয়ার তত্ত্ব আগেই বলেছি যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে অল্প বয়স্ক ছাগল বিপুল সংখ্যক হতে পারে। কেননা ছাগীরা বছরের একাধিকবার বাচ্চা প্রসব করে, আর একবারে একাধিক সংখ্যক বাচ্চা জন্ম দেয়। তার এ সব বাচ্চাই তো হিসেবে ধরতে হয়। হযরত উমর (রা) থেকে সেই বর্ণনা পাওয়া গেছে, তিনি তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ছাগলের বাচ্চাগুলোর হিসেবে গণ্য করে, রাখাল যদি কোনটিকে হাতে করে বহন করে নিয়ে আসে তুবও।

পশুর যাকাতে গৃহীত হার হচ্ছে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ। তার একটি প্রমাণ হচ্ছে, ইবরাহীম নখয়ী ও আবূ হানীফা থেকে ঘোড়ার যাকাত পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তার মূল্য ধরা হবে এবং তার মূল্যের এক-দশমাংশের এক চতুর্থাংশ যাকাত বাবদ দিতে হবে।

যাকাত ঊর্ধ্বমুখী নীতিতে গ্রহণ করা হয় না কেন

প্রশ্ন হচ্ছে, যাকাত একটা স্থায়ী ও স্থিতিশীল হারের কর হল কেন? ঊর্ধ্বমুখী কর হল না কেন? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এ যুগে এ ধরনের কর ধার্যকরণের একটা প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। বহু লোকই এর সমর্থনে ঘোষণা দিয়েছে যে, এর ফলে পার্থক্য দূরীভূত হবে এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষিত হবে।

আমি মনে করি ঊর্ধ্বমুখী চিন্তা প্রসূত নীতিতে যাকাত ধার্য না হওয়ার কতগুলো কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

প্রথম ঃ যাকাত স্বপ্রকৃতিতে একটা দ্বীনী ফরয এবং তা স্থায়ী যদ্দিন মানুষ এ পৃথিবীতে আছে, তদ্দিন। ততদিন ইসলামও টিকে থাকবে, টিকে থাকবে ইসলাম উপস্থাপিত এ যাকাত ব্যবস্থা। ক্ষেত্র, অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের কারণে তা কখনই পরিবর্তিত হবে না। তা চিরদিনই ফরয থাকবে এবং সেজন্যে বান্দা হওয়ার কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবেও। প্রত্যেক ধনশালী মুসলিম ব্যক্তিই প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক অবস্থায় ও পরিবেশেই তা দিতে প্রস্তুত থাকবে।

কিন্তু ঊর্ধ্বমুখীতাপ্রবণ কর এরূপ নয়। রাষ্ট্র বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ দেশে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য তা ধার্য করে থাকে। এ কারণে তার হার কখনো ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে যেমন, তেমনি হতে পারে নিম্নমুখীপ্রবণও। আর প্রয়োজন না থাকলে তা কখনও সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃতও হতে পারে।

ইসলামী শরীয়াত প্রয়োজন দেখা দিলে তার যোগ্য লোকদের ওপর কর ধার্য করতে

রাষ্ট্র প্রধানকে নিষেধ করে না। এ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে, জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য অনেক বেশি এবং বিশাল হয়ে গেল কিংবা বার্ষিক বাজেটের বিরাটত্ব রক্ষার আবশ্যকতা দেখা দিলে। এরূপ অবস্থায় যাকাত ছাড়াও উর্ধ্বমুখী বা অ-উর্ধ্বমুখী কর ধার্য করা যেতে পারে, যা জুলুমকেও প্রতিরোধ করবে, সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করবে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনও পূর্ণ করবে। তবে তার শর্ত হচ্ছে, তা প্রয়োজন পরিমাণ অনুযায়ী হতে হবে—তার অধিক নয় এবং বিবেচক ও উপদেষ্টা পরিষদ তার প্রয়োজন মনে করবে। শুধু তাই নয়, তা হতে হবে, আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব ও মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ—যা তিনি রাসূলগণের মাধ্যমে নাযিল করেছেন জনগণের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় ঃ যাকাতের ব্যয় ক্ষেত্র এবং অন্যান্য যে সব দিকে তা ব্যয় করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, জনগণের মধ্যকার অর্থনৈতিক পার্থক্য বিদূরণ দুর্বল শ্রেণীর লোকদের উচ্চমানে উন্নীতকরণে যাকাত উর্ধ্বমুখী কর এর লক্ষ্য বাস্তবায়িত করে থাকে। কেননা যাকাত থেকে উপকৃত হয় বেশীর ভাগ যেসব লোক যাদের কোনরূপ আয় নেই, যারা সীমিত আয়ের লোক—যেমন ফকীর, মিসকীন, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, ও নিঃস্ব পথিক। কর যখন বেশীর ভাগ ধনী লোকদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা হবে প্রকারান্তরে অপ্রত্যক্ষ হলেও নানা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে তাদের দিকেই তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য, তখন সরকারই তা তাদের প্রতি আদায় করে দিচ্ছে, মনে করা যাবে। যেমন রাষ্ট্র সরকার কৃষিজমির মালিকের কাছ থেকে কর নিচ্ছে, সে তা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে পানি সেচের ব্যবস্থা ও কীটনাশক ছিটিয়ে ইত্যাদিভাবে—যদ্দারা জমি আপদমুক্ত হতে পারে। অনেক সময় প্রাপ্ত কর এর চাইতেও অনেক বেশীই ফেরত দেয়। কিন্তু যাকাত তো এমন কর, যা ধনী লোকদের নিকট থেকে গৃহীত হয় দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং দ্বীন ইসলামের ও ইসলামী রাষ্ট্রের কোন কোন সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে।

এক্ষণে যাকাত নেয়া হয় দরিদ্র জনগণের জীবন মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে। যাকাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে পারস্পরিক অর্থনৈতিক দূরত্ব কম করা ও এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। আর তার ফসল উর্ধ্বমুখী লক্ষ্য অর্জিত হয়, যদিও তার শিরোনাম ও আনুষ্ঠানিক বা সরকারী পরিচিতি তা হয় না।

তৃতীয় ঃ উর্ধ্বমুখী কর-এর পক্ষে যারা বড় বড় কথা বলেন—ভারসাম্য রক্ষা, পারস্পরিক মালিকানা পরিমাণ কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং আয়ের পূনর্বণ্টন ইত্যাদি, এ লক্ষ্যের বেশীর ভাগ অর্জনে ইসলাম ভিন্নতর ও বিশেষ ধরনের পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেছে। ইসলাম সেজন্যে মীরাস বণ্টন ও অসীয়তকরণের পন্থা গ্রহণে করেছে। হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদের প্রতিরোধ করা, সুদ ও সম্পদ মওজুদকরণের হারাম করা ইত্যাদি ব্যবস্থার সাহায্য নেয়া হয় যাকাত ফরয করা ছাড়াও। এর প্রত্যেকটিই মালিকত্বকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার পক্ষে সার্থকভাবে কাজ করে, সম্পদের মালিকত্ব সমান মানে নিয়ে আসে, লোকদের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করে।

চতুর্থ ঃ উর্ধ্বমুখিতার চিন্তার ওপরও বহু আপত্তি রয়েছে। অধিক সংখ্যক লেখক ও অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ তা উত্থাপিত করেছেন। তন্মধ্যে প্রকট ধরনের কতিপয় আপত্তি এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. উর্ধ্বমুখিতার হার নির্ধারণ সম্পন্ন হয় জবরদস্তিমূলকভাবে, তা কোন সুস্থ কর্মোপযোগী ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়। তার পরিণতি সংঘটিত হয় অত্যন্ত রূঢ়তায়, যার নিয়ন্ত্রক যেমন কিছু নেই, তেমনি নেই কোন বাধা-বন্ধন। উর্ধ্বমুখী সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম দিক হচ্ছে ত্যাগ স্বীকারে সমতা বিধান। তা কোন স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন ভিত্তিক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ১ বা ২ কিংবা ততোধিক হারে মূল্য বৃদ্ধির ফলে কি এ সাম্য ও সমতা অর্জিত হবে? উর্ধ্বমুখিতা কি আয়ের বৃদ্ধিহারের সাথে পা মিলিয়ে চলবে, না তার তুলনায় মন্থর গতি হবে? কর দিতে বাধ্য লোকেরা কি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে? কিংবা আয় বণ্টিত হবে নানা খণ্ডে ও অংশে? .... এগুলো বাস্তব অসুবিধা, উর্ধ্বমুখী ব্যবস্থার এসব পরিপন্থী এবং তাতে নির্যাতন ও অবিচারের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করে দেবে।[১]

২. ক্রমাগত ও অব্যাহত উর্ধ্বমুখিতা হিসেবের দিক দিয়ে একটি বাস্তব অসম্ভবতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তা এভাবে যে, উর্ধ্বমুখী কর ১% হারের আয় কখনই—ধর ১০০০ লীরা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, তখন ১২৯% হারে হয়ে যাবে, যখন আয়, ২, ০০০,০০০ মিলিয়ন লীরা পর্যন্ত উঠে যাবে, তখন তার মূল ও আসল আয়টাও অতিক্রম করে চলে যাবে এ কর এবং কার্যত ও বাস্তবভাবে তা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।[২]

৩. কর ব্যবস্থা উর্ধ্বমুখী পদ্ধতি ধনী শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় বিশেষ করে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে এবং এলোমেলোভাবে স্তূপীকৃত মূল-ধনসমূহ গলিয়ে প্রবাহিত করে দেবে।[৩]

৪. উর্ধ্বমুখী কর ধার্যকরণ ব্যবস্থা স্বভাবতই সে পরিমাণ সম্পদ আলাদা করে কেটে নেয়া, যা ধনশালী ব্যক্তি পুঁজিকরণ ও উৎপাদনে পুনর্নিয়োগের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখে। তা ভোগ-ব্যবহার করা হলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। জনগণের সঞ্চয় ও উৎপাদনে পুনর্নিয়োগের উৎসাহে ভাটা পড়ে। এসবেরই পরিণতিতে উৎপাদন তৎপরতা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে, তার পরিমাণ কারোর নিকট অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

---

১. ডঃ রশীদ দকর রচিত علم المالية ص ٢٧٩

২. ও ৩. ঐ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর এর নিশ্চয়তা যাকাতের নিশ্চয়তা

'কর' ফাঁকি দেয়া

'কর' মানুষের অতীব প্রিয় জিনিসের ওপর ধার্য করা হয়ে থাকে, তা এমন ধন-মাল, যার ভালোবাসা মানুষের কাছে খুবই চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণে বহু মানুষই নানাভাবে নানা উপায়ে ও কৌশলে কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। এমনকি স্বাভাবিকভাবেও যারা পারস্পরিক লেন-দেন আমানত রক্ষার শুভ গুণে অলংকৃত, তারা পর্যন্ত সরকারের সাথে লেন-দেনে এ গুণকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। এটা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অপর এক ব্যক্তি সত্ত্বা, এ সত্তার অস্তিত্ব অননুভূতভাবে স্বীকৃতব্য।

'কর' ফাঁকি দেয়ার কারণ

'কর' ফাঁকি দেয়ার কারণসমূহের অধিকাংশই মনস্তাত্ত্বিক। যেমন মালের মালিকের মনে ধন-মালের মায়া। সকলেই চায় তার ধন-মাল তার হাতেই থাকুক অথবা হয়ত মনে করে যে, কর ধার্য করাই অন্যায়-অবিচারমূলক কিংবা সে হয়ত মনে করে, 'কর' দেয়ার বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার যে ফায়দা সে পাবে, তা খুবই সামান্য। কেউ কেউ এমন ধারণাও পোষণ করতে পারে যে, প্রদত্ত কর সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে না অথবা এ ধারণা হতে পারে যে, রাষ্ট্র তাকে যা দেয়, তার চাইতে বেশী তার কাছে দাবি করা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার অন্য লোকদেরকে কর ফাঁকি দিতে দেখে সে-ও কর না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যেন কর না দেয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা বজায় থাকে। এরূপ অবস্থাও লক্ষ্য করা যায় যে, একটা সুনির্দিষ্ট কর ফাঁকি দেয় শুধু এজন্যে, যেন অপর একটি জুলুমমূলকভাবে দেয়া কর-এর ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। এ ধরনের বহু কারণই হতে পারে।

কর ফাঁকি দেয়ার ধরন ও পদ্ধতি

কর যদি ভারী ও দুর্বহ হয় তাহলে কর ফাঁকি দেয়ার ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত হয়ে পড়ে?। 'কর'কে সুবিচারপূর্ণ মনে না করা একদিকের কারণ। আর অপরদিকের কারণ হচ্ছে, করলব্ধ সম্পদ উত্তমভাবে ব্যয় হওয়ার ব্যাপারে করদাতার মনে আস্থা ও নিশ্চিন্ততা না থাকা।

'কর' ফাঁকি দেয়ার পন্থা ও পদ্ধতি অনেক, বিভিন্ন। 'কর'দাতা ব্যক্তি অনেক সময় 'কর' সংক্রান্ত আইনে যেসব ফাঁক রয়েছে, তারই আশ্রয় নিয়ে থাকে। এটাকে 'বিধিবদ্ধভাবে কর এড়ানো' বলা চলে অর্থাৎ এ ফাঁকের ফলে লোকটি আইনের প্যাঁচে পড়ে না।

অনেক সময় আগাম অসত্য হিসেব দিয়েও 'কর' এড়িয়ে যাওয়া হয়। তাতে ভুল বিবৃতি দেয়া থাকে, যেন তার ওপর ভিত্তি করে কর-এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এ আগাম স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত থেকেও অনেক সময় কর এড়ানো হয় এ আশায় যে, কর ধার্যকারী প্রতিষ্ঠানের লোকেরা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না, তার ওপর কর ধার্যই হবে না অথবা তার ওপর যে পরিমাণ ধার্য হওয়া উচিত, তার চাইতে কম ধার্য করা হবে। অনেক সময় যন্ত্রপাতির ক্ষয় তার মূল্যের চাইতেও বেশী হয়ে যায় এবং অনেক সময় কর ধার্য করার ক্ষেত্র বিষয়ে গোপন করেও কর এড়ানো হয়ে থাকে।

কর ফাঁকি দেয়ার ক্ষতি

কর ফাঁকি দেয়ার কারণ বা পন্থা পদ্ধতি যা-ই হোক, বহু কয়টি কারণে তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে থাকে ঃ

ক. তা রাজভান্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা কর বাবদ আয় কম হয়ে পড়ে।

খ. অন্যান্য মালদার লোকদেরও তা ক্ষতি করে যারা ফাঁকি দিতে পারে না কিংবা ফাঁকি দিতে প্রস্তুত হয় না। ফলে তারা এককভাবে কর-এর বোঝা ঝামেলা বহন করতে বাধ্য হয় অথচ অন্য কিছু লোক কর এড়াতে সক্ষম হয়। তার ফলে দেশের সকলের ওপর অর্থনৈতিক বোঝা বহনের দায়িত্ব বন্টনে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়।

গ. অনেক সময় তদ্দরুণ বর্তমন কর-এর মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটায়, অথবা নতুন করে কর ধার্যকরণের প্রয়োজন সৃষ্টি করে, যেন কর ফাঁকি দেয়ার দরুন সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়।

ঘ. একটা চরিত্রবান পরিশুদ্ধ সমাজের পক্ষেও তা ক্ষতিকর। কেননা জাতীয় ধন-ভাণ্ডার শূন্য বা অপূর্ণ থাকে বলে বহু জনকল্যাণমূলক প্রকল্প প্রত্যাহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ঙ. এ সবের পরে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের ক্ষতি। কেননা ফাঁকি দান তৎপরতা মন-মানসিকতার চরমতম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী থাকে না, এক অভিন্ন উম্মতের ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

ফাঁকি প্রতিরোধ ও কর দেয়া নিশ্চিতকরণ

উপরিউক্ত কারণে আধুনিক অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নকারীরা কর ফাঁকি প্রথা রোধ কল্পে কতিপয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. অর্থবিভাগের ব্যক্তিদেরকে ধনীদের গোপনকৃত সম্পদ এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দলিল দস্তাবেজ সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবহিতকরণ।

২. প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে তার সেসব ধন-মাল সম্পর্কে অগ্রিম জানান দিতে বাধ্য করা—সে সব ধন-মালের ওপর কর ধার্য হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সেসব ধন-মালের বর্তমান থাকা জরুরী শর্ত বটে। কোন রাষ্ট্রের আইনে 'হলফ' করে স্বীয় স্বীকৃতির সমর্থন জানানোরও বিধান রাখা হয়েছে। যদি সে হলফ অসত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে মিথ্যা হলফ করার বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৩. মিথ্যা স্বীকৃতিদাতা সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদদানকারীকে পুরস্কৃতকরণ।

৪. 'কর' কে তার উৎসে আটকে দেয়া। যেমন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের বেতনের ওপর ধার্য কর প্রাপকদের হাতে সে বেতন পৌঁছার পূর্বেই কর্তন করে রাখা।

৫. কর ফাঁকিদাতাদের ওপর জরিমানা ও শাস্তি বিধান করা।

৬. ঋণগ্রস্তদের ধন-মালে কর ধার্য করে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তা অপরাপর প্রাপকের পূর্বে আদায় করার ব্যবস্থা করা।[১]

এ সব সত্ত্বেও অর্থ বিভাগের লোকেরা অনেক সময় কর ফাঁকি দানের প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা ঘোষণা করে থাকে। বিশেষ করে যখন সুনির্দিষ্ট ধন-মাল সবটাই অথবা আংশিক গোপন করা সম্ভব হয়। এরূপ অবস্থায় এ রোগের চিকিৎসার জন্যে আইন প্রয়োগের পূর্বে মন-মানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য।

ইসলামী শরীয়াতে যাকাতের নিশ্চয়তা

কর ধার্যকরণের পরিণতি যখন এরূপ—শরীয়াত পালনে বাধ্য বহু লোক যখন যথেষ্ট রাজনৈতিক পরিপক্কতা পায়নি এবং সাধারণ কল্যাণমূলক কাজের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদাও জানতে পারেনি এ প্রেক্ষিতে যাকাত ধার্যকরণের অবস্থাটা কর ধার্যকরণের অবস্থা থেকে বহু দিক দিয়েই সম্পূর্ণ—ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র। মানুষ যে দৃষ্টিতে 'কর'কে দেখে, সেই দৃষ্টিতে যাকাতকে কেউই দেখে না।

দ্বীনী ও নৈতিক নিশ্চয়তা

মুসলিম ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করে যে, যাকাত তার ও তার সরকার বা আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী সম্পর্কেই ব্যাপার নয়। বরং সবকিছুর পূর্বে তা তার ও তার আল্লাহ্র মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপার। আর বস্তুত তাই হচ্ছে ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য, যে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে বিস্তারিত কথা বলেছি।

আমাদের ফিকাহবিদগণ এ তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায়। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী আল মালিকী লিখেছেন ঃ প্রকৃত পাওনাদার তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু তিনি তাঁর এ পাওনার অধিকারটা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাদের রিযিকের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এই বলে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ الاَعَلَى اللهِ رِزْقُهَا -

পৃথিবীতে যে কোন প্রাণীই রয়েছে, তারই রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্র ওপর বর্তেছে।[২]

---

১. এ আলোচনার জন্যে আমরা ডঃ আবদুল হাকীম রিফায়ী ও ডঃ হুসাইন খাল্লাফ লিখিত مبادى النظرية العامة للضريبة নহদাতুল মিসরীয়া কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।

২. سورة هود - ٦

'আলিমকুল শিরোমনি' উপাধি প্রাপ্ত হানাফী ফিকাহবিদ আল-কাসানী লিখেছেন ঃ যাকাতের মূল কথা হচ্ছে ধন-মালের নিসাব পরিমাণ থেকে একটা অংশ আল্লাহ্র জন্যে বের করে দেয়া এবং তা তারই উদ্দেশ্যে সমর্পিত করা। আর তাতে মালিকের হাত তার ওপর থেকে তুলে নিয়ে কোন ফকীরকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া, তা হস্তান্তর করা অথবা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বকারীর হস্তে সোপর্দ করা ফকীরকে মালিক বানানো ও তার কাছে সমর্পণ করার লক্ষ্যে। তার দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ -

এ লোকেরা কি জানে না যে, আল্লাহ নিজেই তওবা কবুল করে থাকেন তাঁর বান্দাগণের পক্ষ থেকে এবং সাদকা-দান গ্রহণ করেন।[১]

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দান আল্লাহ্র হাতে পড়ে ফকীরের হাতে পড়ার আগেই।[২]

আর যেহেতু যাকাত একটি 'ইবাদত' আর ইবাদত হচ্ছে একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্যেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা।[৩] এ কারণে তা এড়াতে খুব কম লোকই চাইতে পারে।

যাকাত দিতে বাধ্য ব্যক্তি তার ওপর কোনরূপ জুলুম করা হচ্ছে—এমন কথা আনুভব করে না। মনে করে না যে, যাকাত দিতে বাধ্য করে তার ওপর কোনরূপ অবিচার করা হয়েছে। কেননা এর বিধান প্রবর্তনকারী কোন মানুষ তো নয় যে, সে পক্ষপাতিত্ব করবে বা অবিচার করবে। তিনি সুবিচারপূর্ণ বিধান প্রবর্তক, যিনি বান্দাদের ওপর জুলুম করেন না। কেননা তিনিই তো রব্বুল ইবাদ—সমস্ত মানুষের মাবুদ ও রব্ব।

আর যাকাত যখন ব্যক্তি ও তার আল্লাহ্র মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম সর্বোচ্চ পর্যায়ে, তখন সে লোক কি করে যাকাত ফাঁকি দিতে পারে তাঁর বিধান অমান্য করে, যাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না, যিনি গোপন প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন, সে লোক এও জানে যে, আল্লাহ তার হিসেব নেবেন পুংখানুপুংখভাবে সেইদিন, যেদিন মানুষ রাব্বুল আলামীনের সমীপে দাড়িয়ে যাবে?

সহীহ ইসলামী প্রশিক্ষণ মুসলিম ব্যক্তির মনে-মগজে যে ইসলামী চরিত্রের বীজ

---

১. سورة التوبة - ١٠٤

২. ইবনে জরীর এ হাদীসটি তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবে বিভিন্ন কাছাকাছি ভাষা ও শব্দে যেমন ১৭১৬৩—১৭১৬৬ নম্বর আসার, তাফসীরে তাবারী ১৪ খণ্ড ৪৫৯—৪৬১ পৃ. ط المعارف। হযরত আয়েশা থেকে রাসূল (স)-এর উক্তি হিসেবে ঃ এক ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটা দান করে। আর আল্লাহ তো পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণই করেন না। তখন আল্লাহ মহান তা নিজ হাতে কবুল করে থাকেন। পরে সে তা দেখতে পায় তার পুরুষ অশ্ব শাবক বা তার ভৃত্যকে বা তার প্রাচীর।' হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন বাহার, বর্ণনাকারী সকলে সিকাহ। مجمع الزوائد ج ٢ ص ١١٢ গ্রন্থেও তা উদ্ধৃত হয়েছে।

৩. البدائع ج ٢ ص ٣٩

বপন করে, তা-ই হচ্ছে রীতিমত যাকাত আদায় হওয়ার অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র।

মুসলিম ব্যক্তির লালন-প্রশিক্ষণ হয় দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির ভাবধারায় এবং পরকালীন কল্যাণের প্রতি আগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টির মাধ্যমে। আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা পাওয়াই হয় তাঁর বড় কামনা ও বাসনা। এজন্যে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকেও সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দিতে সে সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। কোন সময় যদি এমন হয় যে, দুনিয়া ও তাতে কল্যাণ, সম্পর্ক-স্বাদ আনন্দ-স্ফূর্তি—মানুষের লোভনীয়, আকর্ষণীয় সমস্ত কিছু একদিকে আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা এবং তার পথে জিহাদ অপরদিকে—দুটির একটি মাত্র গ্রহণ করা যাবে—তাহলে মুমিন বান্দা আল্লাহ্র রাসূল এবং পরকালের দিকটি গ্রহণ করতে কখনই কুণ্ঠিত হবে না—ইতস্তত করবে না।

কুরআনের বিপ্লবী সুস্পষ্টরূপে ও চূড়ান্তভাবে সম্পর্ক ছিন্নকারী ঘোষণা এই প্রেক্ষিতে অনুধাবনীয়। তাতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَـاؤُكُمْ وَاَبْنَـاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَ فْتُمُوْ هَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَ هَاوَمَسَاكِنُ تَرْضَوْ نَهَـا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَ بَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

বল, তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী, তোমাদের বংশ-গোত্র, ধন-মাল যা তোমরা সংগ্রহ-সঞ্চয় করেছ ও ব্যবসায়—যার মন্দ ভাবকে তোমরা সব সময় ভয় কর, ঘর-বাড়ী—যা তোমরা পসন্দ কর—যদি অধিক প্রিয় হয় তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের তুলনায় তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরে হেদায়েত দান করেন না।[১]

এ প্রশিক্ষণ মুসলিম ব্যক্তিকে এই চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে যে, তার কাছে যে ধন-মাল রয়েছে সে তার আমানতদার মাত্র। সে এক্ষণে প্রশ্ন করছে, সে কি ব্যয় করবে? তার কাছে রক্ষিত ধন-মাল নিয়ে সে কি করবে ? কোন কাজে লাগাবে ?

কুরআন মজীদেই বলা হয়েছে মুমিন লোকেরা রাসূলে করীম (স) কে দুই-দুইবার জিজ্ঞেস করেছে, তারা কি ব্যয় করবে ? কুরআন একবার তার জবাব দিয়েছে খরচের জিনিস সম্পর্কে বলে আর দ্বিতীয়বার তার ব্যয়ের খাত বলে দিয়ে।

---

১. سورة التوبه - ٢٤

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ؟ قُلِ الْعَفْوَ -

লোকেরা তোমার কাছে জানতে চায়, তারা কি ব্যয় করবে? বল : যা কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত।[১]

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

লোকেরা জানতে চায়, তারা কিসে ব্যয় করবে ? বলঃ যে ধন-মাল তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতামাতা নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্যে। আর তোমরা যে ভাল কাজই করবে আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরামাত্রায় অবহিত।[২]

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত, তিনি বলেছেন : বনূ তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে এসে বললে : হে রাসূল,আমার বিপুল ধন-সম্পদ রয়েছে। সেই সাথে আছে অনেক পরিজন, ধন-মাল ও উপস্থিত লোকজন। এখন আমাকে জানান, আমি কি করব? কিভাবে তা ব্যয় করব? তখন রাসূলে করীম (স) বললেন : তোমার ধন-মালের যাকাত দিয়ে দেবে। তা তোমাকে পবিত্র করবে। তোমার নিকটাত্মীয়দের সাথে ছেলায়ে রেহমী রক্ষা করবে এবং মিসকীন, প্রতিবেশী ও ভিক্ষাপ্রার্থীর যে হক আছে তা অবশ্যই জানবে। লোকটি বলল : হে রাসূল! আমার জন্যে ব্যাপারটি কম করে দিন। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন : নিকটাত্মীয়কে তার হক দাও, মিসকীন, নিঃস্ব পথিককেও। আর বেহুদা খরচ করো না। লোকটি বলল : হে রাসূল! আমি যদি আপনার প্রতিনিধির কাছে যাকাত আদায় করে দিই, তাহলে কি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে দায়িত্বমুক্ত হতে পারব ? রাসূলে করীম (স) বললেন : হ্যাঁ তুমি তা আমার প্রতিনিধির হাতে দিয়ে দিলে তার দায়-দায়িত্ব থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কোন গুনাহ হলে তা হবে তার যে তা পরিবর্তন করবে।[৩]

ব্যাপারটি কেবল বিপুল ধন সম্পদের মালিকদের পর্যন্তই ঠেকে থাকেনি। বহু সংখ্যক অল্প ধন-মালের মালিকও রাসূলের করীম (স)-এর কাছে এসে 'তা নিয়ে কি করা যাবে ? বলে প্রশ্ন করেছে।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি বলল : হে রাসূল! আমার কাছে একটি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। আমি তা কি করব ? বললেন : তুমি সেটি তোমার নিজের জন্যে ব্যয় কর। বললে : আমার কাছে আরও একটি আছে, এখন ? বললেন, তা ব্যয় কর

---

১. البقره - ٢١٩ ২. البقرة - ٢١٥

৩. হায়সামী বলেছেন : مجمع الزوائد ৩য় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায়ঃ হাদীসটি আহমাদ এবং তাবরানী الاوسط। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এর বর্ণনাকারী সকলেই সহীহ সিকাহ।

তোমার সন্তানের জন্য। বলল, আমার কাছে আরও একটি রয়েছে? বললেন, সেটি ব্যয় কর তোমার খাদেমের জন্যে। বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি আছে, বললেন ঃ তখন তুমি বিবেচনা করে যা করার করবে।[১]

শুধু তাই নয়, যার কাছে ধন-মাল জমেছে, এমন ব্যক্তিও সব কিছু সঙ্গে নিয়ে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে এলে তার উপযুক্ত ব্যয় ক্ষেত্রে তা ব্যয় করার উদ্দেশ্যে, যদিও তা তার নিজের জন্যেই প্রয়োজন। তখন নবী করীম (স) তাকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাকে ধমক দিয়েছেন। হযরত জাবির (রা) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি ডিমের মত স্বর্ণপিণ্ড নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। বলল ঃ হে রাসূল ঃ আমি এইটা খনি থেকে পেয়েছি। আপনি এটি গ্রহণ করুন। এটি আমি দান করলাম। অবশ্য এটি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। নবী করীম (স) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে লোকটি তাঁর দক্ষিণ পাশ দিয়ে তাঁর সম্মুখে এলো ও পূর্বরূপ কথা বলল। তখনও তিনি তার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পরে আবার বাম দিক থেকে তাঁর সম্মুখে এসে সেই কথা বললে। তখনও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে পিছন থেকে বলল। তখন নবী করীম (স) পিণ্ডটি তার হাত থেকে নিয়ে লোকটিকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন এমনভাবে যে, তা তার গায়ে লাগলে সে ব্যথা পেত, তাকে আহত করত। পরে তিনি বললেন ঃ তোমাদের এক-একজন তার সব মালিকানা সম্পদ নিয়ে আসে, বলে, এটা দান। পরে সে-ই লোকদের ধর-পাকড় করতে থাকে ভিক্ষা পাওয়ার জন্যে। আসলে উত্তম দান তো তা যা ধনাঢ্যতার প্রকাশ থেকে দেয়া হয়।[২]

বস্তুত এ হচ্ছে সহীহ্ সঠিক সত্য ঈমানের লক্ষণ আর তা ইসলামী প্রশিক্ষণেরই ফসল। তা মুসলিমকে এমন বানিয়েছে যে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দায়িত্বশীলের কাছে উপস্থিত হয়ে দাবি জানিয়েছে, তার মালের যাকাত—যার কেউ দাবি জানায়নি—গ্রহণ করা ও নিয়ে নেয়া হোক। কিছু সংখ্যক সিরিয়াবাসী নিজেদের ইচ্ছায় হযরত উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে দাবি জানাচ্ছে, তাদের কাছে থেকে ঘোড়ার যাকাত নিয়ে নেয়া হোক। তারা বলে ঃ আমরা বহু ধন-মাল পেয়েছি—ঘোড়া ও ক্রীতদাস থেকে। আমরা পসন্দ করি, তাতে যাকাত ধার্য হোক ও তা আমাদের জন্যে পবিত্রতার মাধ্যম হোক।[৩]

একজন এল মধুর যাকাত সঙ্গে নিয়ে। সে বললে, 'যে মালের যাকাত দেয়া হয়নি, তাতে কোন কল্যাণ নেই।'[৪]

---

১. হাদীসটি আবূ দাউদ নাসায়ী ও হাকেম উদ্ধৃত করেছেন এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলে মত দিয়েছেন। যাহবী তা সমর্থন করেছেন। المستدرك। ১ম খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা আছে।

২. আবূ দাউদ ও হাকেম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং মুসলিমের শর্তে সহীহ্ বলে মত দিয়েছেন। যাহবী তা সমর্থন করেছেন। ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা।

৩. আহমাদ ও তাবারানী الكبير। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন. বর্ণনাকারী সকলে সিকাহ। যেমন مجمع الزوائد ج ٣ ص ٦٧। এতে উদ্ধৃত করেছেন (ج ١ ص ٤٠٠ - ٤٠١) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যাহবী তা সমর্থন করেছেন। وقد تقدم

৪. বাজ্জার ও তাবারানী الكبير। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। মুনীর ইবনে আবদুল্লাহ্ এর একজন বর্ণনাকারী যয়ীফ। যেমন مجمع الزوائد ج ٢ ص ٨٨ তে বলা হয়েছে।

ইবনে মাসউদ আর একজন লোক। তিনি তাঁর কৃষি ফসলের ওশর কিংবা অর্ধ-ওশর দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি ফল তিন ভাগ করেন। এক ভাগ পরিবারবর্গের জন্যে জমা রাখেন। এক ভাগ জমির বীজ হিসেবে ফিরিয়ে দেন। আর অপর একভাগ দান করে দেন।[১]

মুসলিম ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, তিনি যাকাত দিয়েই নিজেকে এবং তাঁর ধন-মাল পবিত্র করে নিতে পারেন। এ যাকাতই হচ্ছে তার ধন-মাল ও তার প্রবৃদ্ধির রক্ষা দুর্গ, বাহ্যত, তাতে পরিমাণ হ্রাস যতই সূচিত হোক না কেন। এ পর্যায়েই কুরআন মজীদ বলেছে ঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

তোমরা যে যাকাত দিচ্ছ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, জেনে রাখ, এরাই সম্পদ বৃদ্ধিকারী।

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُ كُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং নিজেই কাজের আদেশ করে অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দেন তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা ও আনুগ্রহ পাওয়ার।

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ - وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

তোমরা যা ব্যয় কর, তার পরিপূরক তিনিই এনে দেন এবং তিনি উত্তম রিযিক দানকারী।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, বহু মুসলিমই এমন আছে, যাদের কাছে যা চাওয়া হয়, মনের খুশীতে তাঁরা তার চাইতেও অনেক বেশী দিতে থাকেন। এতেই তাঁদের চক্ষুর শীতলতা।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর যুগের দুটি বাস্তব দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তা থেকে ঈমান ও আকীদাহ প্রসূত দ্বীনী নিশ্চয়তার প্রমাণ পাওয়া যাবে অবিলম্বে ফরয যাকাত আদায় করার ব্যাপারে। বরং যা ফরয, তার চাইতেও বেশী দিয়ে দেয়ার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

আবূ দাউদ তাঁর সনদে সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি ভ্রমণ করেছি (অথবা বলেছেন, তিনি ভ্রমণ করেছেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন), নবী করীম (স) নিয়োজিত একজন যাকাত আদায়কারীর সঙ্গী হয়ে। নবী করীম (স)-এর সময়ই দেখলাম ঃ তুমি দুগ্ধদানকারী (জন্তু) গ্রহণ করবে না, দুই বিছিন্নকে একত্রিত করবে না এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করবে না। আর সে পানির কাছে উপস্থিত হত, যখন

---

১. তাবরানী উদ্ধৃত করেছেন الكبير। গ্রন্থে, মাসরুক থেকে। এর বর্ণনাকারী যেমন مجمع الزوائد গ্রন্থে (ج ٢ ص ٦٨) উল্লিখিত হয়েছে।

ছাগলগুলো তথায় উপস্থিত করা হত। বলত ঃ তোমরা তোমাদের মালের যাকাত দিয়ে দাও। তখন একজন লোক তার ঝুটিধারী উষ্ট্রীকে দেবার সংকল্প করল। বললেন, আমি বললাম ঃ সে আবূ সালেহ্, ঝুটিধারী কি ? বললেন ঃ বড় ঝুটিধারী উষ্ট্রী। বললেন ঃ পরে সে লোক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। পরে তার চাইতে নিম্ন মানের একটাকে লাগাম বেঁধে দিল। সে সেটি গ্রহণ করল। বলল ঃ আমি এটি গ্রহণ করছি। আমি ভয় করছি, রাসূলে করীম (স) আমাকে এজন্যে পাকড়াও করবেন। আমাকে বললেন ঃ তুমি এক ব্যক্তির বাছাই করা উট ইচ্ছা করে নিয়েছ।[১]

উবাইদ ইবনে কায়াব (রা) থেকে বর্ণিত, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাকে যাকাত আদায়কারী বানিয়ে পাঠালেন। আমি এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। আমার সম্মুখে তার সব মাল যখন একত্রিত করা হল তখন তাতে একটা দুই বছরে উপনীত উষ্ট্রী শাবক ছাড়া আর কিছুই গ্রহণীয় পেলাম না। তখন আমি তাকে বললাম ঃ তুমি এ শাবকটি দিয়ে দাও, এটিই তোমার যাকাত। লোকটি বলল ঃ এটি ? এটির তো দুধও নেই পিঠও নেই। কিন্তু অপর একটি যৌবন বয়সের বিরাট চর্বিদার উট আছে। বলল ঃ আপনি বরং সেটিই নিন। আমি বললাম ঃ আমি সেটি নেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হচ্ছি। নবী করীম (স) তোমার কাছেই রয়েছেন। তুমি ইচ্ছা করলে এটি রাসূলে করীম (স)-এর কাছে নিয়ে যাও এবং আমাকে যেমন দেখিয়েছ ও নিতে বলছ তেমনি তাঁকেও দেখাও এবং নিতে বল। তিনি যদি এটি তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন, তাহলে আমি তা নিয়ে যাব। অতঃপর লোকটি আমার সাথে চলল। যে উটটি আমাকে দেখিয়েছিল সেটিও সঙ্গে নিয়ে রওয়ান হল। শেষ পর্যন্ত আমরা রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। লোকটি বলল ঃ হে রাসূল (স)! আমার কাছে আপনার প্রেরিত লোক আমার মালের যাকাত নেবার জন্যে এসেছিল। আল্লাহ্‌র কসম! এর পূর্বে আমার মালের কাছে রাসূলে করীম কিংবা তাঁর প্রেরিত কেউ এসে দাঁড়ায়নি কখনই। আমি তার সম্মুখে আমার সব মাল উপস্থিত করেছিলাম। লোকটি মনে করল সে মালে আমার কাছে একটি দুই বছরে উপনীতা শাবকমাত্র ফরয। কিন্তু সেটির যেমন দুধ নেই, তেমনি পিঠও নেই। তার সম্মুখে আমি একটি বিরাট যুবক বয়সের চর্বিদার উট পেশ করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, সে সেটি গ্রহণ করবে। কিন্তু সে অস্বীকার করল ও আমাকে ফিরিয়ে দিল। সেই কথিত উটটি এখানে আপনার সম্মুখে রয়েছে। আমি ওটিকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি গ্রহণ করুন। তখন নবী করীম (স) তাকে বললেন ঃ এটিই তোমার দেয়। তুমি যদি অতি উত্তম জিনিস নফল হিসেবে দান কর, তাহলে আল্লাহই তোমাকে সেজন্যে পুরস্কৃত করবেন। আমি ওটিক তোমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করলাম। বলল ঃ ঠিক আছে, ওটি

---

১. মুনযেরী বলেছেন, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদে হিলাল ইবনে হুবাব রয়েছেন, একাধিক বিশেষজ্ঞ তাকে সিকাহ্ বলেছেন। তবে কেউ কেউ তার সম্পর্কে আপত্তিও তুলেছেন। (مختصر السنن ج ٢ ص ١٩٦) দারে কুতনী ও বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন, যেমন نيل الاوطار ج ٤ ص ١٣٢ ط العثمانيه তে বলা হয়েছে।

আপনার সম্মুখেই রয়েছে হে রাসূল। আমি দেবার জন্যেই নিয়ে এসেছি, আপনি ওটি গ্রহণ করুন। পরে রাসূলে করীম (স) সেটি নিয়ে নেয়ার জন্যে আদেশ করলেন। এবং তার জন্যে, তার ধন-মালের বরকতের জন্যে দো'আ করলেন।[১]

আহমাদ হাদীসের বর্ণনা এনেছেন এভাবেঃ লোকিট বলল ঃ আমি আল্লাহকে এমন জন্তু 'করয' দেব না, যার দুধ নেই, পিঠও নেই।[২]

সে লোক বিশ্বাস করত যে, তার ও আল্লাহ্র মধ্যকার সম্পর্ক সর্বাগ্রে। সে আল্লাহকে সে উট 'করয' দিতে লজ্জাবোধ করছিল, যার দ্বারা কোন ফায়দা পাওয়া যাবে না। সেটির পিঠ নেই বলে পৃষ্ঠে সওয়ার হওয়া চলবে না, ওলান নেই বলে দুধও দোহানো যাবে না।

বস্তুত এ দ্বীনী নিশ্চয়তাই হচ্ছে যাকাত ফাঁকি দেয়া থেকে বাঁচাতে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ অথচ পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ ফাঁকিই হচ্ছে এখানকার একমাত্র 'গৌরবের' বিষয়। ফ্রান্সের মঁসিয়ে ফানসান উরিতন ১৯৩৬ সনে ঘোষণা করেছিলেন, যদি ফাঁকি না চলত, তাহলে কর-এর হার অনেক হ্রাস পেত।' মঁসিয়ে সিরী বলেছিলেন, ফাঁকি না দেয়া হলে কর বাবদ আয় অনেক বেশী হত।' রাষ্ট্রপ্রধান রুজভেল্টও এ ফাঁকি দানের দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেছিলেন ঃ যারা কর ফাঁকি দেয় তারা এমন সব উপায়ের আশ্রয় নেয়, যার কতকটা আইনসম্মত আর অপর কতকটা আইন বিরোধী। তিনি মনে করেন, এ সব উপায় আইনের মৌল ভাবধারা পরিপন্থী। তার প্রতিরোধ একান্তই আবশ্যক। ইংরেজী 'টাইম' পত্রিকা ইঙ্গিত করেছে ঃ অর্থনৈতিক ফাঁকিরোধ করার বাস্তব পন্থা উদ্ঘাটনে অর্থমন্ত্রী সক্ষম হলে বাজেটের অক্ষমতা অনেকখানি দূর করা সম্ভবপর হত।[৩]

আইনগত ও সাংগঠনিক নিশ্চয়তা

এসব দ্বীনী ও নৈতিক নিশ্চয়তার প্রধানত নির্ভর হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা ও ঈমানের ওপর। ইসলামী শরীয়াত এসব ছাড়াও অন্যান্য আইনগত ও সাংগঠনিক নিশ্চয়তার বিধান করেছে। ইসলামী রাষ্ট্র যাকাতের নিশ্চয়তার জন্যে তাও কাজে

---

১ ও ২. হাদীসটি আহমদ, আবূ দাউদ ও হাকেম উদ্ধৃত করেছেন। হাকেম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন্। যাহবী তা সমর্থন করেছেন (ج ١ ص ٣٩٩ - ٤٠٠) হাদীসটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করণে ইমামগণের মধ্যে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে—যখন তা عن - عن করে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এখানে স্পষ্ট ভাষায় حدثنا বলে বর্ণনা করেছেন। نيل الاوطار ج ٤ ص ١١٥ ط الحلب صطف - مختصر। নববী المجموع গ্রন্থে (ج ٤ ص ٤٢٧) লিখেছেন ঃ আহমাদ ও আবূ দাউদ হাদীসটি সহীহ বা হাসান সনদে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আহমাদ তাঁর পিতার মুসনাদে বাড়তি বলেছেন ঃ বর্ণনাকারী উবাইদ ইবনে কায়াব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হচ্ছেন উমারাতা ইবনে আমর ইবনে হাজম। মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে তাঁকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল। তখন সে ব্যক্তির কাছ থেকে এক হাজার পাঁচশত উষ্ট্রের যাকাত বাবদ ত্রিশটি উষ্ট্র গ্রহণ করা হয়েছিল। আল্লাহ ধন-মালে বরকতের জন্যে তাঁর রাসূলের দো'আ কবুল করেছিলেন। السنن ج ٢ ص ١٩٨ - ١٩٩

৩. من محاضرة الاسلام وضع الاسس الحديثة للضريبة

লাগায়। বিশেষ করে কিছু লোকের ঈমান যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে এ উপায়েও নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে। তন্মধ্যে উল্লেখ্য ঃ

যাকাত সংগ্রহকারীদের সহযোগিতা করা ও কোন জিনিস গোপন না করার নির্দেশ

এপর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস এসেছে, যার কোন কোনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়েরই একটি হাদীস হচ্ছে—রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'তোমাদের কাছে এমন সব অশ্বারোহীরা আসবে, যাদের ওপর তোমরা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ থাকবে। তারা যখনই তোমাদের কাছে আসবে তাদের প্রতি শুভাগমন জানাবে এবং তারা যে উদ্দেশ্যে আসবে তার ও তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক দূর করে দেবে। তারা যদি সুবিচার করে, তবে তাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণ হবে। আর তারা জুলুম করলে তার খারাপ পরিণতি তাদেরই ভোগ করতে হবে। তোমাদের যাকাত পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দিলে তাদের সন্তুষ্টি ঘটবে, তখন তারা অবশ্যই তোমাদের কল্যাণের জন্যে দো'আ করবে।[১]

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আরব বেদুঈনদের কিছু লোক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ যাকাত আদায়কারী—সংগ্রহকারী লোকেরা আমাদের কাছে আসে, তারা আমাদের ওপর জুলুম করে। নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের কাছে আগত যাকাত আদায়কারী লোকদের সন্তুষ্ট করে দাও। তারা বলল ঃ তারা আমাদের ওপর জুলুম করলেও কি আমার তাই করব ? রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ হ্যাঁ তোমরা যাকাত আদায়কারী লোকদের সন্তুষ্ট করে দাও। জরীর বললেন ঃ রাসূলে করীম (স)-এর এ কথা শোনার পর যে যাকাত আদায়কারীই আমাদের কাছে এসেছে, সেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।[২]

বুশাইর ইবনে খাচাচিয়া থেকে বর্ণিত ঃ আমরা বললাম, হে রাসূল! যাকাত আদায়কারীদের কিছু লোক আমাদের ওপর অনেক বাড়াবাড়ি করে। তারা যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করে সেই পরিমাণ ধন-মাল কি আমরা তাদের থেকে গোপন করব ? বললেন, 'না'।[৩]

---

১. আবূ দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ باب رضا الصدق হাদীসটির সনদে আবুল গবন—তিনি হচ্ছেন সাবিত ইবনে কাইস আল মাদানী আল গিফারী—স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে সমালোচিত বর্ণনাকারী। তা সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ তাঁকে সিকাহ বলেছেন। مختصر السنن ج ٢ ص ٢٠٢

২. হাদীসটি আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন, উপরে সে বর্ণনারই তরজমা দেয়া হয়েছে। মুসলিম ও নাসায়ী হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। المصدر نفسه।

৩. হাদীসটি আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বা আল-মুনযেরী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। আবদুর রাজ্জাকও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর সনদে দাইসম সদূসী রয়েছেন। ইবনে হাব্বাস তাঁকে সিকাহ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। التقريب। গ্রন্থে বলেছেনঃ তিনি গ্রহণযোগ্য। كماف نيل الاوطارج ٤ ج ص ١٥٦ ط العثمانية

এ সব কয়টি হাদীস স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, কতিপয় সরকারী কর্মচারীর যাকাত আদায়ে কঠোরতা কিংবা আংশিক জোর-জুলুম তাদের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকাকে কিছুমাত্র সমর্থনযোগ্য বানায় না। তাদের থেকে মাল গোপন করা বৈধ হয় না। কেননা তা রাষ্ট্রের অর্থ ভাণ্ডারকে শূন্যতার মধ্যে ঠেলে দেবে। তার বাজেট ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। বিশেষ করে এজন্যে যে, কিছু লোক তাদের মতের মূল্যায়নের খুব বেশী বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজ করে থাকে। অপর লোকের মূল্যায়নের প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না।

এ সব কথাই প্রযোজ্য, আনুসরণীয়—যদি তা সুস্পষ্ট জুলুমের রূপ পরিগ্রহ না করে, যার কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না বা জুলুম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। যদি তা-ই হয়ে পড়ে, তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ আদায় না করার ও জুলুম সহ্য না করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ব্যক্তির। হযরত আনাসের যাকাত 'ফরয পরিমাণ' পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসে তাই বলা হয়েছে। তাহল ঃ যেলোক মুসলমানদের কাছে তা চাইবে যথাযথভাবে , তাকে যেন তা অবশ্যই দেয়া হয়। আর যে তার অতিরিক্ত চাইবে, তা সে দেবে না। এটা এজন্যে যে, নবী করীম (স) তো প্রত্যেকটির ফরয পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সকল মুসলমানই তা জানেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তা লঙ্ঘন করে তাহলে তা গ্রাহ্য করা চলবে না।

যাকাত এড়ানোর কৌশল অবলম্বন নিষিদ্ধ

যাকাত এড়ানোর লক্ষ্যে যে কোন প্রকারের কৌশল অবলম্বন ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়েছে—বাহ্যত সে কৌশল অবলম্বন যতই শরীয়াত সম্মত ও জায়েয মনে করা হোক না কেন। একটি প্রচলিত কৌশল এরকম হতে পারে যে, একটি বছর পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে মালিক তার যাবতীয় ধন-সম্পদ তার স্ত্রীকে 'হেবা' করে দিল—যেন বছরটা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। পরে স্ত্রী আবার তাকেই সব 'হেবা' করে দিল এবং সে তা সব তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিল। এ ধরনের পন্থা অবলম্বনকে পাশ্চাত্যে আইনসম্মত পন্থায় 'কর ফাঁকি' বলে অভিহিত করা হয়। আর কোন কোন ফিকাহবিদ একে 'শরীয়াতসম্মত হীলা গ্রহণ' নামে অভিহিত করেছেন।

এটা যে হারাম তার অকাট্য দলিল হচ্ছে, এ সহীহ্ হাদীস ঃ

সমস্ত আমলের মূল্যায়ন হবে নিয়ত আনুযায়ী। প্রত্যেকেই তাই পাবে যা পাওয়ার সে নিয়ত করেছে।

ইমাম বুখারী এ সব 'হীলা' অবলম্বনকে বাতিল পন্থা বলে অভিহিত করেছেন এবং তার দলিল হিসেবে 'যাকাত ফরযকরণ' পর্যায়ে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ একত্রিতকে ভিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং বিচ্ছিন্নকে একত্রিত করা যাবে না—যাকাত ফরয হওয়ার ভয়ে।'[১]

---

১. ইবনুল কাইয়্যেম এ হাদীসটি اغاثة الكهفان গ্রন্থে (ج ١ ص ٢٧٦) উদ্ধৃত করেছেন। এ গ্রন্থে এবং اعلام الموقعين গ্রন্থে (ج ٣) ইবনুল জাওযীর 'হীলা' মতের অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদ শীর্ষক আলোচনা করেছেন।

ইমাম মালিক বলেছেন ঃ তার অর্থ তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেরই মালিকানায় চল্লিশটি করে ছাগল থাকবে। ফলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে, কিন্তু তার সবগুলো একত্রিত করা হলে সে সবের ওপর মাত্র একটি ছাগী ফরয হবে অথবা দুই শরীকের প্রত্যেকেরই একশ একটি করে ছাগল আছে, তাতে তাদের উভয়ের ওপর তিনটি ছাগী ধার্য হবে। কিন্তু হিসেবের সময় তা বিভক্ত করে গণনা করা হলে উভয়ের প্রত্যেকের ওপর মাত্র একটি করে ছাগী ফরয হবে।[১]

ইমাম আবূ ইউসূফের কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। তাহল ঃ 'আল্লাহও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন ব্যক্তির পক্ষে যাকাত না দেয়া যাকাত দিতে অস্বীকার করা আদৌ জায়েয বা হালাল নয়। তা নিজের মালিকানা থেকে বের করে কোন সামষ্টিক মালিকানায় দিয়ে দেয়া—যেন তা ভিন্ন ভিন্ন হিসেবে করা হয় এবং যাকাত ফরয হতে না পারে—তা করাও জায়েয নয়।' যেমন উট, গরু-ছাগলের এমন সংখ্যার মালিক প্রত্যেকে হবে, যার ফলে যাকাত ফরয হতে পারবে না। কোনভাবে ও কোন কারণ সৃষ্টি করে যাকাত বাতিল করার জন্যে হীলা করা যাবে না।[২]

ইমাম আবূ ইউসূফ লিখিত 'কিতাবুল খারাজ' থেকে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। যারা মনে করে যে, যাকাত ফরয না হওয়ার জন্যে কৌশল অবলম্বন করা জায়েয, উক্ত উদ্ধৃতি তার তীব্র প্রতিবাদ করে। এ কাজটা সম্পূর্ণ হারাম, এ ব্যাপারে উক্ত বক্তব্য পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট। কিন্তু সম্ভবত আইনের ভিত্তিতে এ কাজকে বাতিল প্রমাণ করা সম্ভবপর হবে না। কেননা বিচারক তো বাহ্যিক অবস্থানুযায়ীই বিচার করবে। কারোর নিয়ত বা গোপন তত্ত্বকথার দিকে কোন কৌতুহল দেখাবে না, তা বের করারও চেষ্টা করবে না। অতএব সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবের ফিকাহ্বিদগণ এ ধরনের হীলা' কৌশল ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আইনের বলে বন্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। হাম্বলী ফিকাহ্র কিতাবে লিখিত রয়েছে, যাকাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে যে লোক বেশী বেশী জমি ক্রয় করবে, তার মূল্যের ওপর যাকাত ধার্য করতে হবে, তার উদ্দেশ্যটা বানচাল করার লক্ষ্যে। যেমন বিক্রয় বা অন্য কিছুর সাহায্যে যাকাত এড়ানো।[৩] আর মালিকী মাযহাবের কিতাবেও আনুরূপ কথাই লিখিত রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এসব কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি।

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর অপরাধ ও আর্থিক দণ্ড

যাকাত দিতে অস্বীকারকারী কিংবা যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকা লোককে আর্থিক শাস্তি দেয়ার কথা হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। আহমাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী উদ্ধৃত

---

১. الموطاء কিতাবুয্যাকাত باب صدقة الخلطاء بتحقيق محمد فواد عبد الباق ط الحلب ج ١ ص ٢٦٤

২. الخراج الاب يوسف ص ٨٠ ط السلفية

৩. شرح غاية المنتهى ج ١ ص ١٠١ القواعد النورانية ص ٨٩

করেছেন ঃ প্রতি গৃহপালিত উটের প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে দুই বছরের উপনীত উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে। হিসেবে কোন একটি উট আলাদা করা যাবে না। আর যদি কেউ তা দেয় শুভ ফল পাওয়ার আশায়, সে শুভ ফল সে পাবে। আর যে তা দেয়া থেকে বিরত থাকবে, আমি তার কাছে থেকে তা অবশ্যই আদায় করে নেব এবং তার উটের অর্ধেক—আমাদের মহান আল্লাহ্‌র ধার্য করা অধিকারসমূহের মধ্যে থেকে একটি অধিকার হিসেবে। মুহাম্মাদের বংশের লোকদের জন্যে তার এক বিন্দু হালাল নয়। 'মুনতাকাল আখ্‌বার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদীসটি যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর কাছ থেকে তা নিয়ে নেওয়ার ও যথাস্থানে তা পৌঁছাবার অকাট্য দলিল।[১]

দিতে অস্বীকৃত উটের অর্ধেক নেয়া, অন্য কথায় যে মালের যাকাত দিতে অস্বীকার করা হয়েছে তার অর্ধেক বাজেয়াপ্ত করা এক ধরনের আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিতকরণ। এটা তাদের কৃতপাপের শাস্তি প্রদানের জন্যে রাষ্ট্র প্রধানের একটা অবলম্বন। রাষ্ট্রপ্রধান এ দ্বারাই সে সব লোককে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে কিংবা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। এটাকে তা'জীরী শাস্তি বলা হয়, যা সুনির্দিষ্ট নয়। বরং দায়িত্বশীল ও উপদেষ্টা পরিষদের লোকেরা ইসলামী সমাজে থেকে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করবে। তার অর্থ, এ একটা অবাধ্যতামূলক শাস্তি, সাধারণভাবে প্রচলিতও নয়। বরং এ শাস্তি যেমন দেয়া যায়, তেমনি নাও দেয়া যেতে পারে।

কোন কোন ইমাম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মাল নিয়ে শাস্তি দেয়া জায়েয বা শুভ কাজ নয়। প্রথমদিকে এ নিয়ম চালু করা হয়েছিল, পরে তা বাতিল হয়ে গেছে। আসলে এটা মালিকত্বের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে কঠোরতা মাত্র। একটি হাদীসের ওপর নির্ভরতারও আছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন-মাল—পারস্পরিক'।[২] যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত নেননি কখনই। কিন্তু এখানে উদ্ধৃত হাদীসটি তার বিপরীত কথা প্রমাণ করে। এ কারণে কেউ কেউ হাদীসের সনদে দোষ ধরেছেন অথবা তার সনদে ধরবার মত কোন ত্রুটি নেই। কেউ কেউ হাদীসটিকে মনসুখও বলেছেন; কিন্তু তারও কোন দলিল নেই। বহু দলিলেই আর্থিকভাবে শাস্তি দানের কথার প্রমাণ রয়েছে।[৩]

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের কেবল জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত করেই ক্ষান্ত হওয়া হয়নি, অস্ত্র চালানো হয়েছে এবং যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এবং প্রার্থী ও বঞ্চিতের 'হক' আদায়ের পথে বাধাদানকারীদের দমন করাই ছিল তার লক্ষ্য। হযরত আবূ বকর এবং তাঁর সঙ্গের সাহাবীবৃন্দ (রা) ও যাকাত অস্বীকারকারীদের

---

১. نيل الاوطار ج ٤ ص ١٢٢ ২. رواه مسلم

৩. ইবনুল কাইয়্যেম الطرق الحكميه গ্রন্থে নবী করীম (স)-এর এবং খলীফাগণের ১৫টি বিচারের উল্লেখ করেছেন। তাতে আর্থিক জরিমানার শাস্তি দেয়া হয়েছে ২৮৭ পৃ. طالمدن এবং এ কিতাবের ৭৭৯-৭৮২ পৃ. দ্রষ্টব্য।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম, ওরা যদি রাসূলের সময়ে দেয়া একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে সে জন্যে যুদ্ধ করব।[১]

ইবনে হাজম বলেছেন ঃ যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর জন্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তার কাছ থেকে তা অবশ্যই নিতে হবে। সে তা পছন্দ করুক আর না-ই করুক। কেননা যে লোক তা অস্বীকার করে, সে তো যুদ্ধ ঘোষণাকারী। আর সে যদি মিথ্যা বলে, তাহলে সে মুর্তদা—দ্বীন ত্যাগকারী। আর যদি সে মাল গোপন করে—সরাসরিভাবে দিতে অস্বীকার নাও করে, তাহলেও সে একটা বড় পাপ করে, সে জন্যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে, প্রয়োজন হলে মারতে হবে, যেন সে দিয়ে দেয় অথবা মার খেতে খেতে মরে যায়—আল্লাহ্র হক না দেয়ার অপরাধে নিহত হয়ে আল্লাহ্র কাছে অভিশপ্ত হবে সে। রাসূলে করীম (স) তাই বলেছেন ঃ তোমাদের যে লোক কোন পাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা শক্তি বলে বদলে দেয়—যদি তার সামর্থ্য থাকে। আর যাকাত না দেয়া যে একটি বড় অপরাধ, এ অপরাধ যে করবে, যার সামর্থ্য আছে সে তা শক্তি বলে বদলে দেবে, আদায় করে নেবে। এটাই স্বাভাবিক। যেমন পূর্বে বলেছি। আর তওফীক দান তো আল্লাহ্র হাতে।[২]

'যাকাত আদায়ের পন্থা' অধ্যায়ের আমরা বলে এসেছি যে, যাকাত একটি প্রমাণিত অধিকার। অগ্রবর্তিতা বা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার দরুন তা প্রত্যাহৃত হতে পারে না। যার ওপর তা ফরয হয়েছে, তার মৃত্যু হলেও নয়। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং অপরাপর ঋণের আগেই তা আদায় করে নেয়া হবে। কেননা না দেয়া যাকাতে দুটি ব্যাপার জড়িত হয়ে পড়েছে। একে তো তা আল্লাহ্র হক, দ্বিতীয়ত, তা আল্লাহ্র ফকীর মিসকীন অভাবগ্রস্ত বান্দাদের হক।

---

১. প্রথম অধ্যায়ের যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২. المحلى ج ١١ ص ٢١٢।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাকাতের পরও কি কর ধার্য হবে

ইসলাম মুসলমানদের ধন-মালে একটা সুস্পষ্ট সুপরিজ্ঞাত হক হিসেবে ধার্য করেছে যাকাত। তা একটা কর বিশেষ, মুসলিম সরকার তা সংগ্রহ ও ব্যয়—উভয় কাজের জন্যেই দায়িত্বশীল। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, ধনী লোকদের ওপর যাকাতের পাশাপাশি জাতীয় সাধারণ কল্যাণমূলক কাজের জন্যে অন্যান্য করও কি ধার্য করা যাবে যা রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয় প্রয়োজন পূরণে বিনিয়োগ করা হবে কিংবা যাকাতই হচ্ছে একক ও অনন্য অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব যে, এ ছাড়া আর কিছুই মুসলমানদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে না?

ইসলামী শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে চিন্তা করলেই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পূর্ণমাত্রায়। আমরা তিনটি আলোচনা পর্যায়ে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই ঃ

প্রথম আলোচনা ঃ কর কার্যকরণ জায়েয হওয়ার দলিল;

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ কর ধার্যকরণ অবশ্য লক্ষ্যণীয় শর্তাবলী;

তৃতীয় আলোচনা ঃ কর ধার্য করার বিরোধীদের সংশয় এবং তার জবাব;

পর্যায়ক্রমে আমরা এ তিনটি বিষয়ের বক্তব্য পেশ করছি।

প্রথম আলোচনা

যাকাতের পাশাপাশি কর ধার্যকরণ জায়েয হওয়ার দলিল

ন্যায়পরতাভিত্তিক কর ধার্যকরণ বৈধ হওয়ার দলিলসমূহ আমরা নিম্নোক্তভাবে সুস্পষ্ট করে তুলতে চাচ্ছি ঃ

প্রথম ঃ সামষ্টিক দায়িত্ব গ্রহণ কর্তব্য

'ধন-মালে যাকাত ছাড়াও কোন অধিকার আছে কি' অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা যে সব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু কথা বলাই যথেষ্ট যে, মুসলমান জনগণের প্রয়োজন দেখা দিলে যাকাতের পরও কর ধার্য করা জায়েয, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। কেননা সামষ্টিক প্রয়োজন কখনই অপূর্ণ রাখা যেতে পারে না। তাতে যত ধন-মালই লাগুক না কেন। এমন কি, যাঁরা বলেন 'ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই' তাঁরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, প্রয়োজন দেখা দিলে যাকাতের বাইরেও অর্থ আদায় করা যাবে। 'সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান' ও ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত মতাদর্শের ব্যবস্থায় আমরা যা বলে এসেছি তাও এ মতকেই বলিষ্ঠ করে। কেননা তাই হচ্ছে যাকাত ফরয হওয়ার আদর্শিক ভিত্তি। ধন-মালে যাকাতের পরও কোন হক ধার্য হওয়ার জন্যে তাই ভিত্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

দ্বিতীয়ঃ যাকাত ব্যয় ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট, রাষ্ট্রের আর্থিক দায়িত্ব বহু

একথাও আমরা জানি যে, যাকাত হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্ধারিত কর বিশেষ। তা অবশ্য সামষ্টিক, নৈতিক, দ্বীনী ও রাজনৈতিক লক্ষ্যও বটে। পূর্বে যেমন বলে এসেছি। আর যাকাতের লক্ষ্য নিছক অর্থনৈতিকই নয় অর্থাৎ শুধু ধন-মাল সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের সুবিধা মত ব্যয় করার উদ্দেশ্যে—তাও নয়। যদিও কারো কারো মতে তার 'সাবীলিল্লাহ' খাতটি সর্বপ্রকারের আল্লাহনুগত্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে পরিব্যাপ্ত বটে। কিন্তু তা আয়াত ও হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থী, জমহুর ফিকাহবিদগণও সে মত গ্রহণ করেননি।

তাই বলতে হচ্ছে, যাকাত ব্যায়ের খাত আটটি ভাগে বিভক্ত। কুরআন মজীদই তা দৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাতে এক সাথে দুটি দিক সমন্বিত। মুসলমানদের মধ্যকার অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য পীড়িত ফকীর, মিসকীন, ক্রীতদাস, নিজেদের দরুন ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব পথিক লোকেরা একদিকে। আর অপরদিকে মুসলমানরা যাদের মুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদ, মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম, যাকাত সংস্থায় নিয়োজিত কর্মচারী এবং সামষ্টিক কল্যাণে ঋণগ্রস্ত লোকজন।

এ কারণে যাকাতের জন্যে স্বতন্ত্র ও বিশেষ বায়তুলমাল গঠন করা হয়েছিল, তার বাজেট সম্পূর্ণ আলাদা। যাকাতের মাল রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের ধন-মালের সাথে মিশ্রিত করা ফিকাহবিদ মতে জায়েয নয়। কেননা যাকাত তো শরীয়াত কর্তৃক সুনির্দিষ্ট খাতেই শুধু ব্যয় করা যাবে, অন্য কোন খাতে নয়। আর সামষ্টিক দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে তার প্রথম দায়িত্বের কাজ।

এ কারণে ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, খারাজের মাল যাকাতের মালের সাথে মিশ্রিত করা জায়েয নয়। কেননা খারাজ হচ্ছে মুসলিম জনগণের সামষ্টিক সম্পদ আর যাকাত হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্যে ব্যয় করার সম্পদ।[১]

এ জন্যে তাঁরা আরও বলেছেন, পুল বা রাস্তা নির্মাণে যাকাত সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। খাল কাটা, মসজিদ, মুসাফিরখানা, মাদ্রাসা, পানি পানের জন্যে ঝর্ণধারা প্রবাহিতকরণ প্রভৃতি কাজেও ব্যয় করা হবে না।[২]

অথচ এ কাজগুলো ইসলামী রাষ্ট্রই শুধু নয়, সকল রাষ্ট্রের জন্যেই একান্তভাবে জরুরী। তাহলে এসব কাজে অর্থ ব্যয় করা যাবে কোত্থেকে, যখন এ সব কল্যাণমূলক কাজেও যাকাত ব্যয় করা জায়েয হচ্ছে না?

জবাব এই যে, আগের কালে এসব জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যুদ্ধমান শত্রুর কাছ থেকে মুসলমানদের অর্জিত গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ থেকে অথবা যুদ্ধ ও রক্তপাত ছাড়াই মুশরিকদের ধন-মাল থেকে 'ফাই' বাবদ যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা দিয়ে দিতেন তা থেকে। প্রথম যুগের ইসলাম বিজয়কালে এ দুটো আয় উৎস বা আয় সূত্র জাতীয় ধনভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দিত। ফলে তখন যাকাত ছাড়া ভিন্নতর কোন কর লোকদের ওপর ধার্য করার কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না। তাছাড়া একথাও স্মরণীয় যে, তখনকার সময়ে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল অনেক সীমিত। কিন্তু আমাদের এ যুগে উপরিউক্ত সূত্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ ও বন্ধ হয়ে গেছে। এক্ষণে জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের জন্যে অন্য কোন সূত্র অবশিষ্ট নেই। তাই ধনীদের ওপর কর ধার্যকরণ কিংবা মাসিক দেয় নির্ধারণ ছাড়া এজন্যে আর কোন উপায়ই থাকতে পারে না। তাই সার্বিক কল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণ কর অবশ্যই ধার্য করতে হবে, 'যা ব্যতীত কর্তব্য পূর্ণভাবে পালিত হয় না, তা দেয়া ওয়াজিব'—এ মৌলনীতি আনুযায়ীই এ কর ধার্য করা হবে।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের এ মত আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, রিযিকপ্রাপ্ত যোদ্ধা—ফাই সম্পদে যাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে কিংবা শৃংখলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর যেসব লোক জাতীয় ধনভাণ্ডার থেকে মাসিক বেতন পায় তাদের জন্যে যাকাত সম্পদ থেকে এক পয়সাও ব্যয় করা যাবে না। তবে 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের সম্পদ পাবে নফল হিসেবে জিহাদে যোগদানকারী মুজাহিদরা। কিন্তু এই শাফেয়ী ফিকাহবিদরাই এ

---

১. كتاب الخراج ص ٩٥ ২. المغن ج ٢ ص ٦٦٨

আলোচনাও তুলেছেন যে, জাতীয় ধনভাণ্ডার নিয়মিত ও বেতনভূক সেনাবাহিনীর জন্যে ব্যয় করার যখন কিছুই থাকবে না অথচ কাফির শত্রুদের উস্কানী প্রতিরোধের জন্যে লোক তৈরী রাখা মুসলমানদের জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন মুসলমানদের এ প্রয়োজন পূরণে দাড়িয়ে যাওয়া লোকদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদির ব্যয় কোত্থেকে চালানো হবে?

নববী প্রমুখ শাফেয়ী ইমামগণ অগ্রাধিকার নীতির আলোকে বলেছেন, এরূপ অবস্থায় মুসলমান ধনী ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে যাকাতের মালের বাইরের সম্পদ দিয়ে তাদের সাহায্য করা।[১]

তৃতীয় ঃ শরীয়াতের সর্বাত্মক নিয়ম

'যা ব্যতীত ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন হয় না, তা ওয়াজিব'—এ মূলনীতির ওপরই গোটা ব্যাপার একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়। এ পর্যায়ে রয়েছে একটা সর্বাত্মক মৌলনীতি—শরীয়াতের সাধারণ নিয়ম। শরীয়াতের অকাট্য সুস্পষ্ট দলিলসমূহের আলোকে ইসলামের বিশেষজ্ঞ মণীষিগণ তার ভিত্তি রচনা করেছেন। সেজন্যে খুঁটিনাটি হুকুম-আহকামও নিঙড়ানো হয়েছে। তার পরিনতিতে আইন প্রণয়নের একটা মৌলনীতি গড়ে উঠেছে, যার ওপর ভিত্তি করা চলে, তার ভিত্তিতে কর্মনীতি নির্ধারণ সম্ভব। আইন প্রণয়ন কিংবা ফতোয়া দান অথবা বিচারকালে তা থেকে হেদায়েত পাওয়া যেতে পারে।

এ পর্যায়ের মৌলনীতি হচ্ছে ঃ জনকল্যাণের দাবি পূরণ—বিপর্যয় রোধ কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ওপরে অগ্রাধিকার পাবে। দুটি কল্যাণের মধ্যে সাধারণ বা নিম্নমানেরটা বিনষ্ট করা উচ্চমানেরটা লাভের উদ্দেশ্যে, সাধারণ ক্ষতি প্রতিরোধের জন্যে বিশেষ ক্ষতি গ্রাহ্য হবে।[২]

শরীয়াতের এ মৌলনীতি কার্যকর করা হলে শুধু কর ধার্যকরণই বৈধ প্রমাণিত হবে না, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা ধার্যকরণ ও গ্রহণ অকাট্য ও অপরিহার্যও প্রমাণিত হবে। কেননা জাতীয় বিপর্যয় ক্ষতি ও বিপদ প্রতিরোধ এছাড়া সম্ভব নয়। তবে অন্যান্য সূত্রের যেমন পেট্রোল বা অন্য কিছুর আয় যদি সেজন্যে যথেষ্ট হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাও যদি কিছু না থাকে এবং এরূপ অবস্থায় আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রকে কর ধার্য করার অধিকার দেয়া না হয়, তাহলে কিছুদিন চলার পর সে রাষ্ট্রটি যে ধড়াস করে ভূমিসাৎ হবে, চতুর্দিক থেকে তার অক্ষমতা প্রকট হয়ে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা দেখা দেবে এবং সর্বোপরি সামরিক অভ্যুত্থানের বিপদ ঘণীভূত হবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

এ কারণে বিভিন্ন যুগের আমিলগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, বায়তুলমালকে শক্তিশালী

১. দেখুন ঃ تحفة المختاج ج ٣ ص ٩٦ - الروضة ج ٢ ص ٣٢١

২. এ মৌলনীতির জন্যে দেখুন ঃ الاشباه والنظائر الابن نجيم قسم القواعد এবং اصول التشريع للخضر

করার উদ্দেশ্যে মুসলিম প্রশাসক যে করই ধার্য করবে, তা যথারীতি দেয়া একান্তই কর্তব্য। অন্যথায় বিপদ প্রতিরোধ ও প্রয়োজন পূরণ অসম্ভব থেকে যাবে।

শাফেয়ী মতের ইমাম গাযযালী সাধারণ কল্যাণে অতিরিক্ত ধন-মাল নেয়ার বিপক্ষে। কিন্তু তিনিও লিখেছেন ঃ হাত যখন ধন-মাল শূন্য হয়ে পড়বে, সাধারণ কল্যাণের ধন-মাল ততটা অবশিষ্ট থাকবে না যদ্দারা সাময়িক ব্যয়ভার বহন করা চলে এবং এ সময় ইসলামী রাজ্যে শত্রুর ঢুকে পড়ার আশংকা দেখা দিলে কিংবা দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে বিপর্যয়মূলক তৎপরতা মারাত্মক হয়ে উঠলে সেনাবাহিনীর জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধন-মাল ধনী লোকদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে জায়েয হবে। কেননা আমরা জানি, দুই দুষ্কৃতি বা ক্ষতি এক সাথে দেখা দিলে ও সাংঘর্ষিক হলে দুটির মধ্যে কঠিনতর ও অধিক বড় দুষ্কৃতি দমন করাই শরীয়াতের লক্ষ্য। কেননা এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যা কিছু দেবে তা জানমালের ওপর ঘনিয়ে আসা বিপদের তুলনায় খুবই সামান্য। ইসলামের দেশে যদি শক্তিশালী প্রশাসক না থাকে, যে সামষ্টিক প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করবে ও দুষ্কৃতির মূল উৎপাটিত করবে, (তাহলে তো বিপদটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে)।[১]

মালিকী মতের ইমাম শাতেবী লিখেছেন ঃ আমরা যদি এমন রাষ্ট্রপ্রধান দাঁড় করাই, যার আনুগত্য করা হবে, সে যদি বিপ্লব দমনের জন্যে বিপুল সংখক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করা এবং বিপুল বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রের সংরক্ষণের জন্যে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে—বায়তুলমাল শূন্য হয়ে যায় এবং সৈন্যদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ ধন-মালের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে ন্যায়পন্থী রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট হয়—এমন পরিমাণ ধন-মাল ধনী লোকদের ওপর ধার্য করা জায়েয হবে এবং যতদিন না বায়তুলমাল ধন-মালে সমৃদ্ধ হচ্ছে, তা নিতে পারবে। উত্তরকালে তা ফসল ও ফল ইত্যাদির ওপরও ধার্য করা তার জন্যে জায়েয হবে।

তবে এ কথা প্রাথমিক ইসলামী যুগের লোকদের থেকে আমরা জানতে পারিনি। কেননা সে যুগে বায়তুলমাল স্বতঃই সমৃদ্ধ ছিল, যা আমাদের যুগে নেই। এক্ষণে রাষ্ট্রপ্রধান যদি এ নীতি গ্রহণ না করেন, তাহলে তার জাঁকজমক ও দাপট-প্রতাপ সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশ কুফরী শক্তির অভ্যুত্থানের শিকারে পরিণত হবে। তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হতে পারে রাষ্ট্রের প্রধানের শক্তি ও দাপট। এমতাবস্থায়ও যারা ধার্য কর ফাঁকি দেয়—যার ফলে রাষ্ট্রের শক্তি ও দাপট লোপ পেয়ে যেতে পারে—তাদের এমন ক্ষতি সাধিত হবে যার তুলনায় ধন-মাল দেয়ার ক্ষতিকে তারাই নগণ্য মনে করবে। তার পরিমাণ সামান্য হলে তো বটেই। এ বিরাট ক্ষতির মুকাবিলায় সামান্য মাল গ্রহণজনিত ক্ষতি যখন খুবই নগণ্য হবে, তখন প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির ওপর অগ্রাধিকার দানের প্রয়োজনীয়তায় কারোরই একবিন্দু সন্দেহ থাকবে না।[২]

---

١. المستصفى ج ١ ص ٣٠٣ ٢. الاعتهام ج ٢ ص ١٠٤ بتصرف

বস্তুত গাযযালী ও শাতেবী উভয়ের বক্তব্য হল, উপরিউক্ত অবস্থায় ধনী লোকদের ওপর কর বা মাসিক দেয় ধার্য করা সম্পূর্ণ জায়েয। এ ঘোষণাটি একটি মৌলনীতির ওপর ভিত্তিশীল। আর তা হচ্ছে ঃ 'সাধারণ বা নগণ্য ক্ষতি সহ্য করে কঠিন ও মারাত্মক ক্ষতি প্রতিরোধ করা।'

চতুর্থ ঃ মাল দিয়ে জিহাদ এবং বড় পরিমাণ ব্যয়ের দাবি

ইসলাম মুসলমানদের জন্যে ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাকে ফরয করেছে। আল্লাহ্র নির্দেশ ঃ

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তোমরা সকলে বের হয়ে পড় হালকাভাবে, কি ভারীভাবে এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর।[১]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰۤئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

মুমিন কেবলমাত্র তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী।[২]

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ -

তোমরা আল্লাহ্র ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর তোমাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে।[৩]

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْاج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

এবং তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্র পথে এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে না। আর অতীব উত্তম নীতি অবলম্বন কর। কেননা আল্লাহ্ এ অতীব উত্তম নীতি অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।[৪]

সন্দেহ নেই, মাল দ্বারা জিহাদ করার এ আদেশ পালন করা ফরয এবং তা যাকাতের বাইরে আর একটি কর্তব্য। মুসলিম সমাজের মধ্যে অর্থ দ্বারা জিহাদ করার বোঝা বহনের সামর্থ্য কে কতটা রাখবে—কে কতটা অংশ বহনের দায়িত্ব নেবে, তা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এবং অধিকারের ব্যাপারে। ইবনে তাইমিয়া উপরিউক্ত কথাটি غياث الامم গ্রন্থকার থেকে উদ্ধৃত করেছেন—পরে এ বিষয়ে বলা হবে।

---

১. سورة التوبة - ٤١ ২. الحجرات-١٥ ৩. الصف - ١١ ৪. البقرة ١٩٥

আমাদের এ যুগের সশস্ত্র সেনাবাহিনী গঠন ও তাদের ব্যয়ভার বহনের জন্যে বিরাট ও ভয়াবহ পরিমাণের অর্থ সম্পদের প্রয়োজন, তা সত্ত্বেও শক্তি সঞ্চয় শুধুমাত্র অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল নয়। সেই সাথে বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের বহুবিধ দিকে ও বিভাগে শক্তি, প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভও একান্ত অপরিহার্য। আর এসবই ব্যাপক অর্থ-সম্ভার ও সমৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা অর্থ দ্বারা জিহাদ হিসেবে ব্যাপক কর ধার্যকরণের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সম্পদ সংগ্রহ ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। ব্যক্তি এ কর দিয়েই সমষ্টিকে সমৃদ্ধি ও শক্তিশালী করতে পারে। পারে রাষ্ট্রকে প্রকৃত সহায়তা দিতে। তার ফলে সে নিজেও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তার দ্বীন, রক্ত, ধন-মাল ও ইজ্জত সংরক্ষিত হবে।

পঞ্চম ঃ জনসম্পদে লাভবান হওয়া

কর প্রভৃতি বাবদ যে সম্পদ সংগৃহীত হবে, তা ব্যয় করা হবে সামষ্টিক কল্যাণকর কার্যাবলীতে। তার ফায়দাটা সমাজের সমস্ত ব্যক্তিদের কাছেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে আসবে। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে দেশ রক্ষা, শান্তি-শৃংখলা, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহন ও যোগাযোগ, পানি সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ সবই এমন সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজ, যদ্দারা সমষ্টিগত ঘোটা মুসলিম জনতাই ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। কাছ থেকে বা দূর থেকে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে ব্যক্তি বিশেষভাবে উপকৃত হয় এবং তারই কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি-শৃংখলা-নিরাপত্তা প্রভৃতি সামষ্টিক কল্যাণকর কাজের সুফল ভোগ করে। অতএব ব্যক্তির কর্তব্য ধন-মাল দিয়ে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলা ও রাখা—যে তা তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

ব্যক্তি যেমন সমষ্টি থেকে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন আশা-আকাংখা প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রে, তা মুকাবিলায় প্রতিদানস্বরূপ কর ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এই মৌলনীতির বাস্তবায়ন করা একান্ত কর্তব্য, যা ফিকাহবিদগণ পরিভাষা হিসেবে বলেছেন। الغرم بالغنم।

দ্বিতীয় আলোচনা

কর ধার্যকরণে অবশ্য পালনীয় শর্তাবলী

কিন্তু যে ধরনের কর ধার্য করার আনুমতি ইসলামী শরীয়াত দিয়েছে, যে-ধরনের কর-এর প্রতি ইসলাম সন্তুষ্ট তাতে নিম্নোদ্ধৃত শর্তাবলী অবশ্যই রক্ষিত হতে হবে ঃ

প্রথমত শর্ত ঃ অর্থের প্রকৃত প্রয়োজন—অন্য কোন আয়সূত্র না থাকা।

প্রথম শর্ত হচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রকৃত পক্ষেই অর্থের প্রয়োজন হবে, যা পূরণের জন্যে অপর কোন আয়ের সূত্রও নেই যদ্দ্বারা সরকার তার লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে পারে। লোকদের ওপর অতিরিক্ত করভার চাপিয়ে কষ্ট না দিয়েও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব (অর্থাৎ এরূপ যদি না হয়), কেবলমাত্র তখনই অতিরিক্ত কর ধার্য করাকে ইসলাম সমর্থন করে।

তা এ কারণে যে, ধন-মালের ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে, তা নেয়া হারাম। লোকদের ওপর অর্থনৈতিক কি অ-অর্থনীতিক অতিরিক্ত অনাহূত চাপ দেয়া থেকে নিষ্কৃতি দান। কাজেই কারো মালিকানার মর্যাদা অকারণ বিনষ্ট করা, তার মালিকানা থেকে ধন-মাল নিয়ে নেয়া এবং তার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেয়া কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তবে যদি অবশ্য বাধ্যকারী কোন প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। তাই যদি প্রয়োজন তীব্র না হয় কিংবা প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তা পরিপূরণের জন্যে স্বয়ং সরকারের হাতেই ধন-মাল রয়েছে, আয়ের সূত্র বা আমদানী এমন আছে যদ্দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে এবং লোকদের কর ধার্য করার বাস্তবিকই অপেক্ষা না থাকে, তাহলে এরূপ অবস্থায় কর ধার্য করা বৈধ হবে না।

মুসলিম মনীষী ও ফতোয়াদানকারী বিশেষজ্ঞগণ এ শর্তটি রক্ষার ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা এ জন্যে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার কথাও বলেছেন। কেউ কেউ শর্ত করেছেন, বায়তুলমাল সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে যেতে হবে, তখনই কর ধার্য করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। তাঁদের এরূপ মত হওয়ার কারণ, সাধারণত শাসক-প্রশাসকগণ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহে মত্ত হয়ে থাকে। জনগণকে এমন সব অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত করে তোলে, যা বহন করার সাধ্য-সামর্থ্য তাদের প্রকৃত পক্ষেই থাকে না। এটা অত্যন্ত জুলুমমূলক আচরণ' সন্দেহ নেই।

সত্যি কথা, ইসলামের ইতিহাস এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তাবলী উপস্থাপিত করেছে। আমাদের আলিমগণ সব সময়ই জাতীয় কল্যাণের চিন্তা করেছেন, তাদের অন্যায় ও বাড়াবাড়িমূলক নীতির আনুসরণ করতে তাঁরা সব সময়ই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

মিসর অধিপতি কতজ (قطز) যখন তদানীন্তন হলব ও সিরিয়া অধিপতি মালিক নাসেরের দাবিতে সাড়া দিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্যে বিচারপতি, আইনবিদ ও নগর প্রধানদের একত্রিত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাতারদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় ধনসম্পদও লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি উপরিউক্ত লোকদেরকে পর্বত-দুর্গে একত্রিত করেছিলেন। তখন সেখানে শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম, কাযী বদরুদ্দীন আস্‌য়ঞ্জারী—মিসর অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ বহু আলিম ও প্রখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপক পর্যালোচনা করলেন, ইবনে আবদুস সালামের মতে সকলেই একত্রিত ও একমত হলেন। তিনি বাদশাহ 'কতজ'কে যা বলেছিলেন তার সারনির্যাস হচ্ছে, শত্রু বাহিনী যখন মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়ে এসেছে, তখন সকলেরই কর্তব্য হয়ে পড়েছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাতে সন্দেহ নেই এবং এ জিহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদও আপনি জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন, তা পূর্ণভাবে জায়েযও বটে। তবে সেজন্যে শর্ত হচ্ছে, বায়তুলমালে যদি কিছুই অবশিষ্ট না থেকে থাকে, তবেই জনগণের কাছ থাকে অর্থ সাহায্য নেয়ার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন হলে আপনি স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদাদি এবং মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে দিতে পারেন।[১] প্রত্যেকটি সৈনিক স্বীয় যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করবে। তাদের জীবনমান জনসাধারণের সাথে সমান ও পার্থক্যশূন্য হতে হবে। সৈনিকদের হাতে ধন-মাল ও মূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ সরঞ্জামাদি বর্তমান থাকা অবস্থায় জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। এ কথার পরই বৈঠক শেষ হয়ে যায়।[২]

অসমসাহসী ইমাম নববী ঠিক আনুরূপ কথাই বলেছিলেন জাহের বেবিরসের সম্মুখে।

উত্তরকালে জাহের যখন সিরিয়ায় তাতার শক্তির মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু বায়তুলমাল ছিল সম্পূর্ণ শূন্য; সৈন্য সজ্জিতকরণ এবং যোদ্ধাদের জন্যে ব্যয় করার মত অর্থ-সম্পদ কিছুই ছিল না। তখন তিনি জনগণের ওপর কর ধার্য করা সম্পর্কে সিরীয় আলিমগণের কাছে ফতোয়া চাইলেন। কেননা বাদশাহকে সাহায্য করা শত্রুদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের যুদ্ধ করার এবং তাতে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই আলিমগণ প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পাদনের প্রেক্ষিতে তা জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এ মর্মে ফতোয়া লিখেও দিয়েছিলেন। এ সময় ইমাম নববী উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ

---

১. মূলের শব্দ হচ্ছে الحوائص এক বচনে حياصة তা স্বর্ণখচিত এক প্রকার মূল্যবান পরিচ্ছদ, যা বাদশাহ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে রাজন্যেবর্গের মধ্যে বিতরণ করেন।

২. দেখুন ঃ طبقلت الشافعية الابن السبك ف ترجمة الشيخ
عزالدين - والسلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٤١٦ - ٤١٧
النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٧٢ - ٧٣

যখন আলিমগণকে জিজ্ঞেস করলেন, ফতোয়ায় স্বাক্ষর করতে কেউ বাকী রয়ে গেছেন কি না? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ, শায়খ মুহীউদ্দীন আন-নববী এখনও রয়ে গেছেন। পরে তাঁকে ডেকে উপস্থিত করা হয় এবং তাঁকে বলা হয় ঃ আপনিও অন্যান্য আলিম ফিকাহ্‌বিদদের সাথে স্বাক্ষর দিন। শায়খ নববী স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বাদশাহ তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি জানি আপনি আমীর বন্দকদারের ক্রীতদাস ছিলেন। আপনার ধন-মাল কিছুই ছিল না। পরে আল্লাহ্ আপনার ওপর অনেক আনুগ্রহ করেছেন, তিনি আপনাকে বাদশাহ বানিয়েছেন। আমি শুনেছি আপনার মালিকানায় এক সহস্র ক্রীতদাস রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ রয়েছে। আপনার কাছে আরও দুই শত ক্রীতদাসী রয়েছে, তাদের রয়েছে মহামূল্য স্বর্ণালংকার। আপনি যদি এ সবকিছু বিক্রয় করে দেন এবং আপনার ক্রীতদাসরা স্বর্ণখচিত পোশাকের পরিবর্তে মোটা পশমের পোশাক ধারণ করে—ক্রীতদাসীরা শুধু কাপড় পরে, অলংকারহীনা থাকে, তাহলেই আমি প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে কর ধরে অর্থ গ্রহণের সমর্থনে দেয়া ফতোয়ায় স্বাক্ষর দিতে পারি।

জাহের তাঁর একথা শুনে ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ এ দামেশক শহর থেকে তুমি এখনই বের হয়ে যাও। ইমাম নববী বললেন ঃ আপনার নির্দেশ অবশ্য পালনীয়া এই বলে তিনি তার 'নাওয়া' গ্রামের চলে গেলেন।

তখন ফিকাহ্‌বিদগণ বাদশাহ্‌কে বললেন ঃ এ লোকটি দেশের বড় আলিম ও শ্রেষ্ঠ লোকদের একজন। সকলেই তাকে মানে। তাঁকে দামেশকে ফিরিয়ে আনুন। তখন জাহের তাকে ফিরে আসার আনুমতি দেন। কিন্তু শায়খ ফিরে আসতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ জাহের ওখানে থাকা অবস্থায় আমি কিছুতেই সেখানে যাব না। প্রায় একমাসকাল পর জাহের মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১]

ইমাম নববী সুলতান জাহের বেবিরসকে উপদেশ দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি শরীয়াতের বিধান ব্যাখ্যা করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ

বায়তুলমালে কিছু বর্তমান থাকা অবস্থায়—তা নগদ সম্পদ হোক, সামগ্রী হোক, জমি হোক, বিক্রয়যোগ্য সরঞ্জাম বা অন্য কিছু—প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে আর কিছু গ্রহণ করা হালাল নয়। বাদশাহ্‌র দেশের—আল্লাহ তার সাহায্যকারীদের সম্মানিত করুন—সব মুসলিম আলিমই এ মতে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। বায়তুলমাল তো এখন—আল্লাহ শোকর—খুবই সমৃদ্ধ, ভরপুর। আল্লাহ তার প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি, প্রশস্ততা এবং খায়র ও বরকত আরও বাড়িয়ে দিন।[২]

---

১. আল-উস্তায মুহাম্মাদ আল-গাযালী লিখিত الاسلام المفتر عليه গ্রন্থের ২২২- ২২৩ পৃষ্ঠা থেকে, পঞ্চম ছাপা।

২. হাফেয সালাভী লিখিত ইমাম নববীর জীবনী। مطبعة جمعية النشر والتاليف بالازهر سنة ١٩٥ م -

দ্বিতীয় শর্ত ঃ কর-এর বোঝা ইনসাফ সহকারে বণ্টন

অতিরিক্ত ধন-মাল অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে এবং করধার্য করা ছাড়া এ প্রয়োজন পূরণের আর কোন সূত্র বা উপায় থাকবে না, তখন কর ধার্য করা শুধু জায়েযই নয়, ফরযও। তবে শর্ত এই যে, লোকদের ওপর কর এর বোঝা সুবিচার ও ন্যায়পরতার ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে যেন এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর কারণে নিপীড়িত না হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা যেন ক্ষমতা পেয়ে গিয়ে অপর শ্রেণীর লোকদেরই দ্বিগুণ তিনগুণ বেশী চাপের নীচে পড়তে না হয়—তা দাবিকারী কোন প্রয়োজন ছাড়াই।

'সুবিচার' বা 'ন্যায়পরতা' বলতে আমরা 'সমান পরিমাণ' মনে করছি না। কেননা দুই পার্থক্যপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে সমতা করতে যাওয়া জুলুম ছাড়া কিছু নয়। তাই সকলের কাছ থেকে গ্রহণীয় একই হারের হওয়া উচিত নয়। বরং অর্থনৈতিক সামাজিকতার দিক দিয়ে এ হার বিভিন্ন হওয়া উচিত। ফলে কারো কাছ থেকে বেশী আর কারো কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে কম নেয়া বাঞ্ছনীয়।

আবূ উবাইদ তার সনদে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উপরিউক্ত কথার সমর্থন করে। বর্ণনাটি এই ঃ হযরত উমর (রা) 'নবত' গোষ্ঠীর লোকদের কাছ থেকে জয়তুন ও গম বাবদ অর্ধ-ওশর গ্রহণ করতেন—যেন মদীনার দিকে পরিবেশন বেশী বেশী হয় এবং 'কুত্নীয়া' থেকে ওশর গ্রহণ করতেন।[১]

'নবত' বলতে একদল ব্যবসায়ী বোঝায়, যারা যুধ্যমান লোকদের মধ্য থেকে ইসলামী রাজ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তারা বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্য ও খাদ্য মদীনায় আমদানী করত। হযরত উমর (রা) নিয়ম করেছিলেন—যেমন আনাস ইবনে মালিক তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, যুধ্যমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এক-দমাংশ শুল্ক গ্রহণ করতেন আর যিম্মী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক নিতেন অর্ধ-ওশর। আর মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিতেন এক-দশাংশের এক-চতুর্থাংশ।[২]

এটা হতো একদেশ থেকে দেশান্তরে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া বা আনার সময়ে। সীমান্তে শুল্ক আদায়ে দায়িত্বশীলরূপে নিয়োজিত লোকেরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এ কর গ্রহণ করত। তার বিনিময়ে তারা এক বছর কাল ব্যবসা করার সুযোগ পেত। এটা আধুনিককালের শুল্ক কর-এর মত ব্যবস্থা। বিদেশী আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ শুল্ক গ্রহণ করা হতো সমান 'সমান নীতি গ্রহণ' আনুযায়ী। কেননা বিদেশী যুধ্যমানরা মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই এক-দশমাংশই গ্রহণ করত। হযরত আবূ মূসা হযরত উমর ফারুক (রা)-কে তা-ই লিখে জানিয়েছিলেন।[৩] তিনি যিম্মী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্ধ-ওশর গ্রহণ করতেন, কেননা তাদের সাথে এ শর্তে সন্ধি হয়েছিল এবং তাতেই তারা রাজী ছিল।[৪] তবে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা

---

১ ও ২. الاموال ص ٥٣٢ ৩. الاموال ص ١٧٢ ৪. كتاب الخراج يح ابن ادم ص ٥٣٢

হতো কেবলমাত্র একদেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যাওয়ার সময়। মুসলমানদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর, তারা নিজ দেশে ব্যবসা চালালেও তাদের ব্যবসার যাকাত দিতে হতো। যেমন যিম্মীদের কৃষি ফসল, ফল, গবাদি পশু ও অন্যান্য এমন সব মালের—মুসলমানদের কাছ থেকে যার ওপর যাকাত নেয়া হয়—কোন অংশ দাবি করা হতো না। তবে এ ব্যবস্থাও খৃস্টান বনূ তগ্‌লব গোত্র ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। কেননা এ খৃস্টান গোত্রটি হযরত উমরের সাথে বিশেষ শর্তে সন্ধি করেছিল বলে তারা স্বতন্ত্র ও বিশেষ আচরণ পেত।[১]

মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ নেয়া হতো। কেননা এটাই তাদের ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাত। উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপরিউক্ত 'নব্‌ত' গোত্রের লোকদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ নেয়াই ছিল নিয়ম—যেমন সায়েব ইবনে ইয়াজীদ বলেছেন ঃ আমি হযরত উমরের যুগে মদীনার বাজারে কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমি 'নব্‌ত' গোত্রের লোকদের কাছ থেকে 'ওশর' গ্রহণ করতাম।[২]

কিন্তু হযরত উমর (রা) কর-এর মূল্য হ্রাস করার ইচ্ছা করলেন এবং অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনায় তা ১০%থেকে ৫% পর্যন্ত নামিয়ে দিলেন। এটা ছিল তদানীন্তন ইসলামী রাজ্যের রাজধানী মদীনা নগরের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি অন্যান্য পণ্যের তুলনায় বেশী বেশী আমদানী কাজে তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত। তখনকার সময়ে মদীনায় জয়তুন ও গম আমদানী করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—কলাইর ডাল, গোশত খণ্ড ইত্যাদির তুলনায়। একালের প্রায় সব রাষ্ট্রেই শুল্ক নীতি এমনিভাবেই গড়ে তুলে থাকে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে শুল্কের হারকম করে কখনও উঁচুও করে দেয়। সুনির্দিষ্ট আমদানীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই তা করা হয়, দেশী শিল্পজাত পণ্যকে সংরক্ষণ দেয়া অথবা পূর্ণ পরিণত পরিপক্ক শিল্প-পণ্যের আমদানী হ্রাস করার সিদ্ধান্তের ফলেই তা করা হয়। এভাবে আরও অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

আবূ উবাইদ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ হযরত উমর 'নব্‌ত' লোকদের থেকে জয়তুন ও গম বাবদ অর্ধ-ওশর গ্রহণ করতেন—যেন মদীনায় আমদানী বেশী হয় এবং কুতনিয়ার কাছ থেকে নিতেন 'ওশর'।[৩]

হযরত উমরের এ নীতি আমাদেরকে শুল্ক কর-এর হার বাড়ানো বা কমানের একটা দলিল বা পথপ্রদর্শন দিচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালকের বিবেচনা মত জাতীয় কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতেই তা করা যাবে।

পূর্বে আমরা বলে এসেছি, সমাজ জীবনে ও অর্থনীতিতে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, জাতীয় সম্পদ তার মধ্য থেকে মুষ্টিময় লোকদের হস্তে পুঞ্জীভূত হয়ে যাবে না, অন্যদের তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ কারণে ইসলাম অধিকাংশ সক্ষম লোকদের মধ্যে জাতীয় সম্পদ বিতরণের নীতি আনুযায়ী কাজ করে, লোকদের পরস্পরের বড় বড় ফাঁক

---

১. এজন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২. الاموال ص ٥٣٢ ৩. الاموال ص ٥٣٢

ও পার্থক্য দূর করা এবং জনগণকে আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে পরস্পরের সমান ও নিকটতর মানে নিয়ে আসা তারই দায়িত্ব। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা 'ফাই' সম্পদ বন্টনের এ মৌল নীতি ঘোষণা করেছেন ঃ

كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

যেন ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের মধ্যকার ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে।[১]

তাই ঊর্ধ্বমুখী কর ছাড়া অন্য কোন উপায় যখন থাকবে না তখন পরিণতি এই দেখা দেবে ঃ ধন-সম্পদ কেবলমাত্র ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে না। ধনী একটা মানে নেমে আসবে এবং দরিদ্ররা একটি মানে উন্নীত হবে, উভয়ই পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাবে। ইসলাম এই নীতিকেই সমর্থন করে, এ নীতিরই আনুকূল্য করতে প্রস্তুত।

তা করা হবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন-জীবিকা, পরিবারের দায়-দায়িত্ব এবং ঋণসমূহ ফেরত দান ইত্যাদি যথাযথভাবে পালনের সুযোগ দেয়ার পর। এছাড়াও পূর্বে যে সব কথার উল্লেখ করেছি, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

তৃতীয় শর্তঃ জাতীয় কল্যাণে ব্যয় করতে হবে, পাপ ও নির্লজ্জতার কাজে নয়

'কর' ইনসাফ সহকারে গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, তার বোঝাসহ লোকের ওপর ইনসাফ সহকারে বন্টন করাই একমাত্র দায়িত্ব নয়। সে বাবদ লব্ধ সম্পদ জাতীয় সাধারণ কল্যাণমূলক কার্যাবলীতে ব্যয় ও নিয়োগ করতে হবে। শাসক-প্রশাসকদের অভিলাষ-লালসা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যয় করা চলবে না। তাদের পরিবারের সুখ-সুবিধা-বিলাসিতা পূরণের জন্যেও নয়। তাদের আনুসারী দলীয় লোক এবং সহযাত্রী সাথীদের আনন্দস্ফূর্তি বিধানের জন্যেও নয়।

এ কারণে কুরআন মজীদ যাকাত ব্যয়ের খাত সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাতে কোনরূপ দলীয় রাজনীতির খেলা খেলবার একবিন্দু অবকাশ রাখা হয়নি। পাওয়ার যোগ্য লোক ছাড়া অন্যদের জন্যে তার এক ক্রান্তিও ব্যয় করা চলবে না।

খুলাফায়ে রাশেদুন এবং তাঁদের সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম ও জনগণের ধন-সম্পদ তার জন্যে শরীয়াত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার ওপর খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। 'খিলাফতে রাশেদা' ও অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ্র মধ্যে এটাই তো পার্থক্য। প্রথমোক্তরা দেশ শাসন করেন আল্লাহ্র দেয়া বিধানের ভিত্তিতে আর শেষোক্তরা দুনিয়ার প্রচলন বা নিজেদের ইচ্ছা-কামনা আনুযায়ী।

ইবনে সায়াদ الطبقات। গ্রন্থে সালমান থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা)

---

১. سورة الحشر –٧

তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি বাদশাহ্ না খলীফা ?' সালমান তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি মুসলমানের জমি থেকে একটি বা তার কম কিংবা বেশী দিরহাম কর গ্রহণ করেন, অতঃপর তা তার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র ব্যয় বা বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি বাদশাহ্—খলীফা নন।' এ কথা শুনে হযরত উমর কেঁদে ফেললেন।[১]

সুফিয়ান ইবনে আবুল আওজা থেকে বর্ণিত, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম আমি জানি না—আমি খলীফা না বাদশাহ্। আমি যদি বাদশাহ্ হই, তাহলে এটা একটা ভয়ানক ব্যাপার। একজন লোক বলল ঃ হে আমিরুল মুমিনীন। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। জিজ্ঞেস করলেন কি ? বলল ঃ খলীফা ন্যায়সঙ্গতভাবেই গ্রহণ করে এবং তা ব্যয় করে শুধু উপযুক্ত স্থানে। আল্লাহ্র শোকর, আপনি তো তাই করেন। আর বাদশাহ্ তো সীমালঙ্ঘন করে। সে নিজ ইচ্ছামত গ্রহণ করে ও ইচ্ছামতোই ব্যয় করে। হযরত উমর এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন।[২]

তাবারী বর্ণনা করেছেন, হযরত উমরের সাথে এক ব্যক্তির নিকটাত্মীয়তা ছিল। সে তাঁর কাছে কিছু চাইল। হযরত উমর তাকে ধমক দিয়ে বের করে দিলেন। এ নিয়ে কথা হয়। পরে একজন বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! অমুক ব্যক্তি আপনার কাছে কিছু চেয়েছিল। কিন্তু আপনি তাকে তা না দিয়ে বের করে দিয়েছেন ? তখন তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, লোকটি আমার কাছে আল্লাহ্র—(সামষ্টির, রাষ্ট্রের) মাল চেয়েছিল। আমি যদি তাকে তা দিতাম, তাহলে আল্লাহ্র কাছে আমার ওজর পেশ করার কিছুই থাকত না। আমি বিশ্বাসভঙ্গকারী বাদশাহ্ হিসেবেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে বাধ্য হতাম।[৩]

চতুর্থ শর্ত ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ও জনমতের সামঞ্জস্য রক্ষা

রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের মতকে অগ্রাহ্য করে তার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কেবলমাত্র নিজের মতের ভিত্তিতে কর ধার্য করবেন, তা আদৌ জায়েয নয়। তার পরিমাণও একক মতের জোরে করতে পারবেন না। জনগণের ওপর কোনরূপ কর ধার্য করতে হলে উপদেষ্টা পরিষদের লোকজন এবং গণপ্রতিনিধিদের সাথে মতের সামাঞ্জস্য বিধান করেই তা করতে হবে। আমরা বলেছি, ব্যক্তিগণের ধন-মালের ব্যাপারে মৌলিক কথা হল তা গ্রহণ করা হারাম। এটা ব্যক্তি মালিকানার মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা। আর জনগণের ওপর কোনরূপ দায়িত্ব না চাপানো সর্বপ্রকারে বোঝা থেকে মুক্তি নিষ্কৃতিও আসল কথা। তবে প্রয়োজন ও জনকল্যাণের দাবি যখন জনগণের দখল থেকে কিছু মাল নিয়ে নিতে বাধ্য করবে, তাদের ওপর কিছুটা আর্থিক দায়িত্বের বোঝা চাপানো অপরিহার্য হয়ে পড়বে, তখন ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। তখন আনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত মতামত দানের জন্যে দায়িত্বশীল ও কর্মকর্তাদের রায়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

১. طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٠٦-٣٠٧ ط بيروت

২. طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ط بيروت

৩. تاريخ الطبر ج ٥ ص ٩١ المطبعة الحسنية بمصر

তারাই পূর্বোদ্ধৃত শর্তসমূহের প্রতি নজর রেখে কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। তারা কর ধার্য করার প্রয়োজনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবে। অন্যান্য আয়ের সূত্র এ প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট কিনা, তাও তারাই আনুধাবন করতে পারবে এবং জনগণের মধ্যে করের বোঝা সুবিচারপূর্ণ নীতিতে বন্টন করতে সক্ষম সংগঠন কায়েম করাও তাদের পক্ষেই সম্ভব হবে। তারাই সংবাদদাতা বা অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ও বিশেষত্বসম্পন্ন লোকদের সাহায্যও নিতে পারবে। উপরন্তু যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ ধার্যকৃত কর বাবদ লব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে—যে জনকল্যাণমূলক, উৎপাদনমুখী ও খেদমতের কাজ করার ইচ্ছা, সেই কাজেই তা ব্যয় হচ্ছে কি না তার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদেরই দায়িত্ব।

পরামর্শ করা কুরআন সুন্নাহ্‌র প্রমাণে ফরয

পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাটি—যা আমরা বলেছি, তা আমাদের নিজস্ব কথা নয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

কুরআনের আয়াতে তো পরামর্শ গ্রহণকে ইসলামী সমাজ গঠনের একটা মৌল ও ভিত্তিগত উপকরণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ –

আর যারা তাদের আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের জাতীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমরা যা রিযিক বাবদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে...।[১]

আয়াতটিতে পারস্পরিক পরামর্শকে আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দেয়ার, নামায কায়েম করার এবং আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা মক্কী যুগের কথা। এ যুগে ইসলামের মৌল নীতিসমূহই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সাধারণ স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবে গুণ ও প্রশংসাকীর্তন স্বরূপ সে বিষয়ে বলা হয়েছে। কুরআনে কখনও মন্দ বলা ও তিরস্কারস্বরূপও এ পর্যায়ের কথা বলা হয়।

পরে মদীনার যুগে নাযিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَاعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ –

এবং তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর জাতীয় সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে। পরে তুমি যখন সংকল্প গ্রহণই করে ফেললে, তখন আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা কর।[২]

মাদানী যুগটি হচ্ছে ইসলামী সমাজের জন্যে আইন প্রণয়ন ও সংগঠন গড়ে তোলা পর্যায়। এখানে আয়াতটিতে নির্দেশের ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। আর সাধারণ স্বাভাবিক রীতি হচ্ছে—হয় আদেশ হবে, না হয় নিষেধ হবে।

---

১. سورة الشور – ٣٨ ২. سورة ال عمران – ١٥٩

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উক্ত আয়াতটি ওহোদ যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ যুদ্ধের সূচনাতেই রাসূলে করীম (স) সাহাবাদের সাথে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করেছিলেন এ বিষয়ে যে, শহরের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করা হবে, না অগ্রসর হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করা হবে? সাধারণভাবে সাহাবিগণ শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। ফলে তিনি বের হয়েছিলেন, কিন্তু এটা তার একার মতের ভিত্তিতে ছিল না। যদিও পরিণামে সত্তরজন সাহাবী আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এরূপ পরিণতি সত্ত্বেও উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়ে পরামর্শ করারই তাগিদ করেছে। স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে সেজন্যে এবং 'তাদের সাথে পরামর্শ কর' বলে অর্থাৎ তোমাকে এ পরামর্শ করা নীতি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। পরামর্শের পরিণতি যতই মর্মান্তিক হোক, তা পরিহার করা চলবে না। কেননা একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, 'যে পরামর্শ করেছে সে কখনও লজ্জিত হয়নি।'

সুন্নাত বা হাদীসও এব্যাপারে স্পষ্টভাষী। নবী করীম (স) যাবতীয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করতেন—বিশেষ করে সে ব্যাপারে, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত নিয়ে অহী নাযিল হয়নি। বদর যুদ্ধে 'ঈর' পর্বত পর্যন্ত যাওয়ার ব্যাপারেও তিনি পরামর্শ করেছিলেন। কেবল মুহাজির-সাহাবীদের পরামর্শকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। আনসার সাহাবিগণের মতের সাথে সঙ্গতি হওয়ার ফলেই তিনি স্বস্তি পেয়েছিলেন। মনযিল কোথায় হবে তা নিয়েও পরার্শ করেছেন। হুবাব ইবনুল মুনযিরের পরামর্শের ভিত্তিতে সে মনযিল ঠিক করা হয়। ওহোদের দিন—যেমন বলেছি—শহরের বাইরে যাওয়াটা পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত আনুযায়ী হয়েছিল। খন্দকের দিন আহজাবের সাথে এক বছরের জন্যে মদীনার ফলের এক তৃতীয়াংশ নেয়ার ভিত্তিতে সন্ধি করার ব্যাপারেও পরামর্শ করেছেন। কিন্তু সায়াদ ইবনে উবাদা ও সায়াদ ইবনে মুয়ায তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে তা পরিত্যক্ত হয়। হুদায়বিয়ার দিনও পরামর্শ করেছিলেন মুশরিকদের সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে কি করা যাবে, তা নিয়ে। তখন হযরত সিদ্দীক (রা) বললেনঃ আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি উমরা করার নিয়তে। তিনি একথা দিয়েই জবাব দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের ঘটনায়ও নবী করীম (স) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেনঃ হে মুসলিম জনগণ, যে লোকেরা আমার পরিবারের ওপর দোষারোপ করেছে,[১] খারাপ কথা চালিয়ে দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। হযরত আলী ও উসমান (রা)-এর কাছে হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারেও পরামর্শ চেয়েছিলেন।[২]

ইবনে কাসীর এ সব পরামর্শ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেছেন ঃ নবী করীম (স) যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। এ প্রেক্ষিতে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে মতভেদে পড়েছেন যে, পরামর্শ গ্রহণ তাঁর জন্যে ফরয ছিল কিংবা লোকদের মন রক্ষার্থে তা করা মুস্তাহাব ছিল। ফিকাহবিদদের কথা এ দুভাগে বিভক্ত।

---

১. ابنوا অর্থ 'তুহমাত'—দোষ আরোপ করেছে। কেউ যখন কাউকে খার।

২. تفسير ابن كصير ج ١ ص ٤٢٠ ط الحلب

রাসূলে করীম (স) মাসুম ও অহীর মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর অন্য পরামর্শের ব্যাপার কি ছিল,-তা নিয়ে মতভেদ জায়েয হলেও তাঁর পরবর্তী খলীফা ও ইমাম রাষ্ট্রপ্রধানগণের ব্যাপারে এ নিয়ে কোনরূপ মতভেদ করা আদৌ সঙ্গত নয়। কেননা আয়াতটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। এ সুস্পষ্ট আদেশ ফরয প্রমাণ করে। নবী করীম (স) নিজে সর্বপ্রকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ কার্যকর করার জন্যে উৎসাহিত করেছেন। তাতেও তা ওয়াজিব বা ফরয প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে মুসলিম উম্মতের দীর্ঘ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা স্বৈরতন্ত্রীদের আচরণের প্রেক্ষিতে—স্বৈরতন্ত্রের যে অভিশাপ ও দুঃখ-বিপর্যয়ে মুসলিম জনগণ বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছে, সে দৃষ্টিতেও কুরআনের আয়াতের নির্দেশ আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় বানিয়ে দেয়।

পরামর্শ কি জ্ঞানদানকারী না বাধ্যতামূলক

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হচ্ছে, এ পরামর্শ কি রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে বাধ্যতামূলক।

এর জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তার দলিল হচ্ছে, নবী করীম (স) নিজে পরামর্শ গ্রহণের পর নিজের মত পরিহার করে অধিকাংশ সাহাবীর পরামর্শ আনুযায়ী কাজ করতেন। পূর্বে বহু কয়েকটি স্থানে আমরা তার উল্লেখ করেছি।

ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন, ইবনে মারদুইয়া হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তুমি যখন দৃঢ় সংকল্প করলে তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর।

এ আয়াতে যে عزم বা দৃঢ় সংকল্প-এর কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ মত দিতে পারে এমন লোকদের সাথে পরামর্শ করা এবং পরে তাদের পরামর্শ মেনে নেয়াই হচ্ছে তার তাৎপর্য।[১]

পরামর্শের ফল যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে তার কোন গুরুত্ব বা মূল্যাই থাকে না। দুনিয়ার স্বৈরতন্ত্রীরা এ পরামর্শকে একটা হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করেছে। তারা তা নিয়ে লোকদের সামনে হাস্যরস ও তামাসা করে। তারাও পরামর্শ করে বটে, কিন্তু কাজ করে নিজেদের ইচ্ছেমত অথবা পরামর্শ করে কিন্তু বিরোধিতা করে যেমন তারা মেয়েদের ব্যাপারে ধারণা পোষণ করে।[২]

---

১. تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٢٠. ১

২. কতক লোকের মুখে একথাটি খুব শোনা যায় ঃ মেয়েদের সাথে পরামর্শ কর; কিন্তু করে তার বিপরীত। তারা মনে করে এটা বুঝি রাসূলের হাদীস। কিন্তু তা যে সত্য নয়, তা প্রমাণের জন্যে দলিল হিসেবে আল্লাহ্‌র একথাটিই যথেষ্ট যা তিনি বলেছেন পিতা-মাতা সম্পর্কে দুগ্ধপোষ্য সন্তান প্রসঙ্গেঃ 'তাদের দু'জনের পারস্পরিক পরামর্শ ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যদি দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের কোন দোষ হবে না' (আল-বাকারা ; ২৩৩ আয়াত)। 'সওরী প্রমুখ বলেছেনঃ তাদের একজনের পক্ষে অপরজনের সাথে পরামর্শ না করে স্বৈরাচার চালায়, তবে তা জায়েয হবে না। (ইবনে কাসীর , ১ মখণ্ড, ৫৮৪পৃ.)

তাছাড়া জাতির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের এরূপ শর্ত করার অধিকার আছে যে, রাষ্ট্র প্রধান তাদের সাথে প্রতিটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বাধ্যতামূলকভাবে পরামর্শ করবে। কর ধার্য করা এ পর্যায়েরই একটা কাজ এবং অধিকাংশের মত মেনে নিতে সে বাধ্য থাকবে। সে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং এ শর্তের ওপর 'বয়আত' পূর্ণত্ব পাবে, তখন তা ভঙ্গ করা তার পক্ষে জায়েয হবে না, সম্ভব হবে না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ المسلمون عل شروطهم। মুসলমানরা তাদের শর্তের ওপর থাকবে।[১] ওয়াদা পূরণ করা সুনিশ্চিতভাবে ওয়াজিব। এখন আমরা 'পরামর্শ' ওয়াজিব না মুস্তাহাব; তা বাধ্যতামূলক না জ্ঞান দানকারী—এ কথা বলা পার্থক্যহীন।

এ হাদীস এবং উপরিউক্ত কোন্ সব বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে, তা চিহ্নিত করে দেয়নি। শুধু একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ الامر-এর উল্লেখ হয়েছে। এ শব্দটি শামিল করে সর্বপ্রকারের সাধারণ ব্যাপার যা জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের কল্যাণ ও অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ও তার ওপর প্রভাবশালী যেমন যুদ্ধ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার।

সন্দেহ নেই, কর ধার্য করা জাতির জনগণের ওপর একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জাতীয় জীবনে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ কারণে সকল আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের মতের সাথে সঙ্গতি স্থাপন না করে জনগণের ওপর কোন প্রকারেরই কর ধার্য করে না।

---

১. হাদীসটি আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন كتاب الاقضية তে। ইবনে মাজাহ الاحكام-এ এবং হাকেম আবূ হুরায়রা থেকে। বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীস সহীহ বলেছেন। ইবনে আব্বাসও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আউফ আল-মুজানী তাঁর পিতা থেকে—তাঁর দাদা থেকে—এ সূত্রে। তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। তার ভাষা এইঃ المسلمون عندد شروطهم الاشرطا حرم حلالا او احل حراما। 'মুসলমানরা তাদের শর্তের ওপর স্থির থাকবে। তবে কোন শর্ত হালালকে হারাম করে যা হারামকে হালাল করে (তবে তা রক্ষা করা যাবে না।')—এর ওপর আপত্তি তুলেছন যে, বর্ণনাকারী 'কাসীর' খুব বেশী যয়ীফ। ইবনে হাজার তার ওযর পেশ করেছেন ঃ বলেছেন সম্ভবত তিনি হাদীসটি বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়াকে গণ্য করেছেন। তা এভাবে যে, হাকেম তা আনাস ও আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদ নেহায়েত বাজে, তাবরানী বর্ণনা করেছেন রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে। তার সনদ উত্তম —যেমন আল-মুভীক 'আত-তাইমীর' গ্রন্থে বলা হয়েছে ২য় খণ্ড, ৪৫৭ পৃ.) শাওকানী তাঁর বহু কয়টি বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেনঃ 'একথা স্পষ্ট যে, এ হাদীসসমূহ ও সূত্রসমূহ পরস্পরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই এর কম-সে-কম অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে মূল কথার ওপর সকলেই একত্রিত, তা 'হাসান' গণ্য হবে।

দেখুন كشف الخفاء ج ٢ ص ٢.٩

فيض القدير ج ٦ ص ٢٧٢ -- نيل الاوطار ج ٥ ص ٢٥٤ –

তৃতীয় আলোচনা

কর ধার্যের বিরোধীদের সংশয়

বেশ কিছু লোক মনে করেন, যাকাত ধার্য হওয়ার দরুন আর কোন কর ধার্যের আদৌ প্রয়োজন নেই। অতঃপর অন্য কোন কর ধার্য করা জায়েযও নয়। তাদের এ কথার সমর্থনে ও প্রমাণের জন্যে যে সব সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেছেন, তার কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে।

প্রথম সংশয় ঃ ধন-মালের যাকাত ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য নেই

ফিকাহবিদদের ব্যাপারে একথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁরা এ মত পোষণ করেন যে, ধন-মালে যাকাত ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য নেই এবং ধন-মালের ওপর হক বা প্রাপ্য হিসেবে চিরকাল এ যাকাতই শুধু ধার্য হতে পারবে। এছাড়া আর কিছুই ধার্য করা যাবে না। অতএব 'কর' বা অন্য কিছুর নামে জনগণের ধনমাল থেকে কিছুই নেয়া জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় সংশয় ঃ ব্যক্তিগত মালিকানার মর্যাদা রক্ষা

ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানাকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ধন-মালের ওপর অন্য সকলের তুলানায় অধিক অধিকারী বানিয়ে দিয়েছে। ধন-মাল পারস্পরিক নেয়া হারাম করে দিয়েছে, যেমন হারাম করেছে রক্ত ও মান-সম্মান। এমন কি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, 'যে লোক তার ধন-মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে, সে শহীদ গণ্য হবে।'[১] অতএব কোন ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি বা সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে কারো ধন-মাল নেয়া হালাল নয়।

'কর' সম্পর্কে তার সমর্থকরা তার দোষমুক্ত হওয়া ও তার ব্যাখ্যায় যত কিছুই বলুক না কেন, তা ধন-মালের একটি অংশ তার মালিকদের হাত থেকে জোরপূর্বক ও তাদের মনে আঘাত দিয়ে নিয়ে নেয়া ছাড়া আর তা কিছুই নয়।

তৃতীয় সংশয় ঃ কর ও শুল্ক ধার্যকরণের বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীস

নবী করীম(স)-এর বহু সংখ্যক হাদীসে শুল্ক ইত্যাদি ধার্যকরণ ও তা আদায়ে নিযুক্ত লোকদের মন্দ বলা হয়েছে এবং তার জাহান্নামে যাওয়ার ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে।

---

১. বহু কয়কজন মুহাদ্দিস হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

আবূ খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ মুসলিমা ইবনে মুখাল্লাদ মিসরে নিযুক্ত 'আমীর'(শাসনকর্তা) ছিলেন। তিনি রুয়াইফা ইবনে সাবেত (রা)-এর কাছে দাবি করলেন যে, তাঁকে দশমাংশ কর আদায়ের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হোক। তখন তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, রাসূল করীম (স) বলছিলেন ঃ 'কর' আদায়কারী জাহান্নামী।'[১]

উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল করীম (স) কে বলতে শুনেছেন ঃ কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২]

এ হাদীসটি এবং তার পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসটি সম্পর্কে যদিও কথা উঠেছে, তবু এ দুটির সমর্থন করছে মুসলিমের গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসটি। সেটি গামেদীয়া মহিলার প্রসঙ্গে বর্ণিত। মেয়েলোকটি জ্বেনার ফলে গর্ভবতী হয়েছিল। নবী করীম (স) তার ওপর শরীয়াতের দণ্ড কার্যকর করেছিলেন। কেননা সে নিজেই তা স্বীকার করেছিল। এ দন্ড কার্যকর করা হয়েছিল সন্তান প্রসব ও তার দুধ ছাড়ানোর পর। এ হাদীসটিতে রয়েছে এই কথাটুকু, 'সে নিশ্চয় তওবা করেছে এমন তওবা যে, কর আদায়কারীও যদি এরূপ তওবা করত, তাহলে তাকেও মাফ করা হত।'

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, কর আদায়কারীর গুনাহ বিবাহিতা হয়ে জ্বেনার দরুন গর্ভবতী হলে যে গুনাহ হয়, সে রকম কঠিন গুনাহ। আর এটা কর আদায় প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠিন আযারেব ধমক।

العشارين। 'অতিরিক্ত কর আদায়কারীদের' তিরস্কার করে বলা হাদীসসমূহ 'সহীহ' বা 'হাসান' নামে অভিহিত হতে না পারলেও তা পরস্পরকে শক্তিশালী করছে।

তাবরানী الكبير। গ্রন্থে উসমান ইবনে আবুল আচ থেকে নবী করীম (স) থেকে—এ সনদে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, তাও এ পর্যায়ে গণ্য। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কাছে আসেন। অতঃপর ক্ষমা করেন, যে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু যে লোক তার যৌন স্থানের সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং যে অতিরিক্ত কর আদায়কারী—এ দুজন ছাড়া।[৩]

---

১. আহমাদ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে লাহিয়ার বর্ণনা থেকে। তাবারানীও অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। الترغيب والترهيب ج ١ ص ٥٦٨) العاشر ط الحلبي

২. আবূ দাউদ ও ইবনে খুজায়মা তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং হাকেম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা সকলেই মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা দিয়েছেন। হাকেম বলেছেন ঃ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। মুনযেরী বলেছেন ঃ এ কথাই বলেছেন আর মুসলিম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে المتابعات। এর উদ্ধৃত করেছেন। (المصدر السابق ج ١ ص ٥٦٦ – ٥٦٧)

৩.. হাদীসটি مجمع الزوائد গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে এমন ভাষায় যা الابير والاوسط এবং আহমাদ থেকেও আলাদা। আহমাদের বর্ণনাকারীরা সহীহ তবে তাদের মধ্যে রয়েছে আলী ইবনে যায়দ। তার ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও তাকে সিকাহ বলা হয়েছে •

ইবনুল আসীর النهاية।[১] গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীসের শব্দ المكس। একটা 'কর' বিশেষ, যা কর আদায়কারী গ্রহণ করে থাকে। আর عشار বলতেও তাই বোঝায়।

বগাভী বলেছেন ঃ কর আদায়কারী বলতে এ সব হাদীসে সে লোক বুঝিয়েছে, যে লোক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যখন তারা এক স্থান থেকে অন্যত্র যায়—এক-দশমাংশের নামে এ مكس আদায় করে।[২] আল মুনযেরী বলেছেন ঃ এক্ষণে বা একালে مكس গ্রহণ করে 'ওশর'-এর নামে। এ ছাড়া নাম ছাড়াও বহু কর গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এভাবে যা যা গ্রহণ করা হয়, তা সবই হারাম। এবং ঘুষ বিশেষ। এসব নিয়ে তারা আসলে পেটের মধ্যে আগুন ভরছে। তাদের পক্ষের সব দলিল প্রমাণ তাদের আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য এবং তাদের ওপর ক্রোধ এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।[৩]

কর আদায়কারী সম্পর্কে আল মুনভী লিখেছেন ঃ তারাই হচ্ছে ওশর—এক-দশমাংশ কর আদায়কারী। এরা লোকদের কাছ থেকে তা (জোরপূর্বক ও অন্যায়ভাবে) গ্রহণ করে থাকে। তাইয়্যেবীর কথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'অতিরিক্ত ও অন্যায়ভাবে নেয়া কর' বড় বড় ধ্বংসকারী গুনাহের মধ্যে একটা। যাহবী এ কাজকে কবীরা গুনাহ্ বলেছেন।[৪] পরে বলেছেন এরূপ কর আদায় ডাকাতির মত কাজ। আদায়কারী চোরের চাইতেও নিকৃষ্ট ও দুষ্কৃতকারী। সে যদি লোকদের ওপর অবিচার করে ও নিত্য নতুন কর তাদের ওপর ধার্য করে তাহলে সে বড় জালিম। যে লোক ধার্যকৃত কর-এর অর্ধেক গ্রহণ করে প্রজাগণের সাথে দয়ার আচরণ করে তার অপেক্ষাও সে অধিক জুলুমকারী। আর অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী, তার লেখক, হিসাবরক্ষক এবং পুলিশ বা সৈন্যদের মধ্য থেকে যে তা গ্রহণ করে, যে তার মুরব্বীগিরি করে ও পার্শ্বের সমর্থক হয়, মূল গুনাহে এরা সকলেই শরীক, এরা সবাই ঘুষখোর।[৫]

উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহের সাথে যুক্ত হচ্ছে সে সব হাদীসও যাতে মুসলমানদের কাছ থেকে العشور। অন্যায়ভাবে এক-দশমাংশ গ্রহণ পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন সায়ীদ ইবনে যায়েদের বর্ণনা। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূল করীম (স) কে বলতে শুনেছি ঃ

---

১. النهاية فى غريب الحديث ج٤ ص ١١٠ ط المطبعة الخيريه

২. الترغيب والترهيب ج ١ ص ٥٦٧

৩. ঐ ৫৬৭ পৃ.।

৪. যাহবীর الكبائر।-গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় তাই উল্লেখ করা হয়েছে। مطبعة البيان -بيروت কিন্তু যাহবী المكس। কি তা কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লেখেননি। বরং বলেছেনঃ অতিরিক্ত কর আদায়কারী জালিম লোকদের বড় বড় সহায়কদের মধ্যে গণ্য। আসলে সে নিজেই বড় জালিম। কেননা সে এমন জিনিস আদায় করে নেয়, যা পাওয়ার অধিকারী সে নয় এবং তা দেয় এমন লোককে, যে তা পেতে পারে না। (১১৯পৃ.)। ইবনে হাজার আল—হায়সামী এ কথাগুলোকে ধমক ও ভয় প্রদর্শন পর্যায়ে গণ্য করেছেন।

৫. فيض القدير ج ٦ ص ٤٤٩

হে আরব জনগণ, তোমরা মহান আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় কর, যিনি তোমাদেরকে العشور। থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।[১]

আর এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ العشور। অতিরিক্ত করভার ধার্য হবে ইয়াহুদ খৃস্টানদের ওপর। মুসলমানদের ওপর العسر। ধার্য হতে পারে না। অন্য এক সূত্রের বর্ণনার ভাষা ইসলামী সমাজের লোকদের উপরে العشور। ধার্য হতে পারে না।[২]

এ হাদীসটি শরাহ আল-মুসাভী العشور। গ্রন্থে লিখেছেন ঃ العشور। (শুল্ক) তো কেবল ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ওপর ধার্য হতে পারে। তারা যখন সন্ধি সংঘটিত হওয়ার সময় সিদ্ধান্ত করবে কিংবা আমাদের দেশে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবে, তখন এ দশমাংশ তারা দেবে। এটা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। কিন্তু মুসলমানদের ওপর العشور। ধার্য করা যাবে না—যাকাত কর ব্যতীত। মুসলমানদের কাছ থেকে 'কর' গ্রহণ হারাম হওয়ার এটাই মূল ভিত্তি।[৩]

এগুলোই সংশয়ের কারণ। এজন্যেই তারা যাকাতের পাশাপাশি কর ধার্য করা জায়েয মনে করেন না।

---

১. مجمع الزوائد এর ৩য় খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ হাদীসটি আহমাদ, আবূ ইয়ালা ও বাজ্জার উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একজন বর্ণনাকারীর নাম বলা হয়নি। তা ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই সিকাহ।

২. হাদীসটি আহমাদ (৩য় খণ্ড, ৪৭৪ পৃ.) আতা ইবনুস সায়ের থেকে বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে—তার খালু থেকে এ সূত্র উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন, আমি বললাম ঃ 'হে রাসূল! আমি কি আমার লোকজনের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করব? তিনি বললেনঃ অতিরিক্ত কর ধার্যকরণ ...। উক্ত আতা হরব ইবনে উবায়দুল্লাহ আসসাকাফী থেকে —তার খালু থেকে—এ সূত্রেও উদ্ধৃত হয়েছে। আর আতা হরব ইবনে হিলাল আস-সাকাফী আবূ উমাইয়্যাতা থেকে—(অনুরূপ) বনূ তগলবের এক ব্যক্তি—তিনি নবী করীম (স) কে বলতে শুনেছেন ঃ 'মুসলমানদের ওপর العشور। নেই......... আবূ দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হরব ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমাইর তার নানা—মায়ের বাপ থেকে, তার বাবা থেকে যিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন—এ সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। দেখুনঃ
مختصر السنن الاحاديث ٢٩٢٤ – ٢٩٢٥
٢٩٢٦ –٢٩٢٧ – ج ٤ ص ٢٥٣ – ٥٥٤ وكلام المنذرى عليها

আবদুল হক বলেছেন ঃ এ হাদীসটি সনদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তা এমন সূত্রে আমার কাছে আসেনি যাকে দলিল বানানো যেতে পারে। ইনবুল কাতান বলেছেন ঃ এ হরব সম্পর্কে ইবনে মুয়ীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন ঃ প্রখ্যাত, সর্বপরিচিত। কিন্তু তাকে প্রমাণিত করার জন্যে এইটুকু কথা যথেষ্ট নয়। কত প্রখ্যাত ব্যক্তিই আছেন, যাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না। তবে তার নানা—তার মায়ের পিতা—আদৌ পরিচিত নয়। তাহলে তার পিতা সম্পর্কে বলা যায়? আল-মুসাভী লিখেছেন ঃ হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখুল কবীর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বর্ণনাকারীদের ওলট-পালট অবস্থা রয়েছে। বলেছেন ঃ এর সমর্থক নেই। তিরমিযী হাদীসটি যাকাত প্রসঙ্গে। باب ليس على المسلمين جزية –এ উদ্ধৃত করেছেন সনদ ছাড়া, আহমাদ তাঁর মুসনাদে উক্ত ব্যক্তি থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন ঃ তার একজন বর্ণনাকারী আতা ইবনে সায়েব, সে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে ফেলেছে। অন্যান্য সব বর্ণনাকারী সিকাহ। বিস্ময়ের কথা, আর মুসাভী এটি الفيض।-এ উদ্ধৃত করেছেন। الفيض ٢ ص ٥٦١।

৩. التيشير ج ١ ص ٣٥٨

এ পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট আলোচনা করছি। এক্ষণে আমরা এর জবাব দেব।

প্রথম সংশয়ের জবাব

প্রথম সংশয়টি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বের অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এ মতটি প্রত্যাখ্যান করেছি। এ জন্যে আমরা অকাট্য দলিলসমূহ পেশ করেছি। আমরা প্রমাণ করেছি ধন-মালে যাকাত ছাড়া হক প্রাপ্য আছে। এ কথাটি প্রকৃতপক্ষেই সর্বসম্মত।

দ্বিতীয় সংশয়ের জবাব

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার মর্যাদা স্বীকার করেছে। তাতে তার ওপর অন্যান্য হক ধার্য হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। দরিদ্র অক্ষম লোকদের হক রয়েছে মালদার লোকদের ধন-মালে তাদের ভ্রাতৃত্বের এবং দ্বীনী ও মানবিক সম্পর্কের দিক দিয়েও। তাদের যারা উপার্জনে অক্ষম বা যারা উপার্জন করে অভাব থেকে মুক্ত হয় না, যাদের কোন আয় নেই, এসব লোকের যে হক আছে, তা আমরা ইতিপূর্বে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে এসেছি।

বস্তুত ব্যক্তির ধন-মালে সমষ্টির অধিকার আছে—অবশ্য স্বীকৃতব্য। কেননা ব্যক্তি সমষ্টির সহায়তা ছাড়া তা উপার্জন করতে পারেনি। এ সমষ্টিই তার সাথে সহযোগিতা করেছে কাছে থেকে কিংবা দূরে থেকে ইচ্ছা করে কিংবা কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই। ধনীর সম্পদ এমনিভাবেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সমষ্টি ছাড়া ব্যক্তির জীবন ও জীবিকা কখনই পূর্ণত্ব পায়নি। সামাজিক মানুষের অবস্থাই তাই। আর মানুষ যে সামাজিক জীব, তা তো জানা কথাই। সব সমাজ বিজ্ঞানীই তা বলেছেন।

এসবের উপরে পূর্বে ধন-মালে আল্লাহ্র হক স্বীকৃতব্য। তিনিই তার স্রষ্টা, দাতা-উদ্ভাতা। তার পথ সুগমকারী। সকল ধন-মাল প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। মানুষ তো তার আমানতদার, তাঁর প্রতিনিধি। আর আমানতদার বা প্রতিনিধি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনই সে জিনিসের নিরংকুশ কর্তা হয় না, যার দায়িত্ব বা আমানত তার কাছে অর্পণ করা হয়েছে। বরং সে তো আসল মালিকের দাবি বা নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করতে বাধ্য, তার পরিমাণ কম হোক, কি বেশী।

ইসলামী রাষ্ট্রে এমন অভাবগ্রস্ত লোক যদি থাকে, যাকাতও যাদের সচ্ছল করতে পারেনি; সামাজিক কল্যাণের দাবি প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিলে অথবা সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রকে বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে অধিক অর্থের প্রয়োজন হলে কিংবা আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্যে বেশি টাকার দরকার হলে, ইসলাম এ দৃঢ় ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা দিয়েছে যে, ধনী লোকদের কাছ থেকে এতটা পরিমাণ অর্থ নিতে হবে, যা এসব কাজের জন্যে একান্তই অপরিহার্য বিবেচিত হবে। কেননা উপরিউক্ত কাজগুলো বাস্তবায়িত করা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের

জন্যেই একান্ত জরুরী। কিন্তু এসব কাজ সমাধা করা বিপুল অর্থ সম্পদ ছাড়া সম্ভবপর নয়। আর সে অর্থ কর ধার্য করা ছাড়া কোথাও থেকে পাওয়ার উপায় নেই। পরন্তু প্রকৃত কর্তব্য পালন যে জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়, সে জিনিস ওয়াজিব—অবশ্য দেয় হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় সংশয়ের জবাবঃ শুল্ক কর শরীয়াতসম্মত কর নয়

المكس। শুল্ক বা নগর শুল্ক ইত্যাদির দোষ বর্ণনায় যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই সহীহ প্রমাণিত হয়নি। পূর্বে আমরা তা দেখেছি। যা-ও বা সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, তা কর ধার্যকরণের প্রতিবন্ধক নয়। কেননা المكس। বলতে অভিধান ও শরীয়াতের দিক দিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ মনে করা যায় না।

'লিসানুল আরব' অভিধান গ্রন্থে المكس।এর পরিচিতি স্বরূপ লিখিত হয়েছে ঃ সে সব অর্থ যা জাহিলিয়াতের যুগে হাট-বাজারে পণ্য বিক্রয়কারীর কাছ থেকে গ্রহণ করা হতো। তাতেই লিখিত আছে ঃ مكس তা যা কর আদায়কারীরা গ্রহণ করে। ইবনুল এরাবী বলেছেন ঃ مكس হচ্ছে সে অর্থ, যা যাকাত সংগ্রহণকারী কাজ সম্পন্ন করার পর গ্রহণ করে। এরপর এ হাদীসটির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ مكس গ্রহণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাতে এ-ও রয়েছে ঃ مكس সে কর বা ট্যাক্স, যা ট্যাক্স আদায়কারী নিয়ে থাকে। তার মূল হল জোরপূর্বক সংগ্রহ করা। তাতে আরও বলা হয়েছে ঃ المكس। অর্থ النقص। আর المكس। হচ্ছে বিক্রয়ে মূল্য খাটো বা ক্ষতিগ্রস্ত করা خذ। المكس।—এ ধরনেরই কথা।[১]

বায়হাকী বলেছেন ঃ المكس। মানে ক্ষতি বা হ্রাস করা। কর্মচারী যদি যাকাত প্রাপকদের হক কম করে, তাহলে সে صاحب مكس নামে অভিহিত হবে।[২]

এই প্রেক্ষিতে যাকাত আদায়ে নিযুক্ত বেতনভুক্ত কর্মচারীকে صاحب مكس বলা চলে—যে তার কাজে জুলুম করে এবং মালদার লোকদের ওপর খুব বেশী বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে, তাদের কাছ থেকে তা নেয়, যা তার পাওনা নয় অথবা আল্লাহ্‌র মালে ধোঁকাবাজি করে, এমন মাল সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে, যা তার নয় যা গরীব-মিসকীন ও পাওয়ার যোগ্য অন্যান্য লোকদের যা প্রাপ্য। المعاشر। -এর ব্যাখ্যায় কোন কোন বর্ণনাকারী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে المعاشر। সে, যে যাকাত গ্রহণ করে বিনা অধিকারে—এ কথাও তা সমর্থন করে।[৩] যেমন আবূ দাউদ তাঁর গ্রন্থের باب المسعايه على الصدقة। —এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছে।

যে সব হাদীসে যাকাতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কঠোর হুমকির বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাও উপরিউক্ত কথার সমর্থনে স্মরণীয়। আমরা যাকাত

---

১. দেখুন ঃ لسان العرب - ماده - م ك س

২. فيض القدير ج ٦ ص ٤٤٩

৩. দেখুন مجمع الزوائد ج ٣ ص ٨٧

ব্যয়ের খাত—যাকাত কর্মচারীদের পর্যায়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে অনেক কথাই বলে এসেছি। এ কারণে হযরত সায়াদ ইবনে উবায়দা, আবূ মাসউদ, উবাদাতা, ইবনুসসামেত প্রমুখ সাহাবী (রা) নবী করীম (স) এর কাছে যাকাত আদায়ের দায়িত্বশীল কর্মচারী হওয়া থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলেন। কেননা এ কাজে যে সব কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন। ফলে তাদের জাহান্নামী হতে হবে, এ ভয়ে খুব বেশী ভীত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূল করীম (স) তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন এবং অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

المكس। শব্দের আরও একটি ব্যবহার রয়েছে, সম্ভবত তা অধিক প্রকাশমান। তার অর্থ সে সব অত্যাচারমূলক কর, যা ইসলামের অভ্যুদয় কালে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে জারী ছিল। তখন তা নিতান্ত অন্যায়ভাবে কোনরূপ অধিকার ছাড়াই নেয়া হতো এবং তা ব্যয়ও করা হতো অন্যায় পথে। তৎলব্ধ সম্পদ জনগণের মধ্যে ইনসাফ সহকারে বন্টন করে দেয়া হতো না। এ সব কর বাবদ সঞ্চিত সম্পদ জনগণের কল্যাণে আদৌ ব্যয় বা প্রয়োগ-নিয়োগও করা হতো না। ব্যয় করা হতো রাজা-বাদশাহ, প্রশাসক ও রাজন্যবর্গের কল্যাণে, তাদের অনুসারী সমর্থকরাও তার অংশ পেত। দেশবাসীর কাছ থেকে তা তাদের দেয়ার সাধ্য ও ক্ষমতা অনুপাতে নেয়া হতো না। ইচ্ছামত বহু ধনী লোককেই তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো। আর নিতান্ত শত্রুতাবশত গরীব লোকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করে নেয়া হতো। বহু আলিমই المكس।-এর এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

হানাফী মাযহাবের কিতাব التبين। গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ 'কর' আদায়কারীদের খারাপ পরিণতি যা কিছু বলা হয়েছে, তার প্রয়োগ হবে সেই লোকের ওপর, যে জুলুম করে লোকদের ধন-মাল নিয়ে নেয়। আজকের দিনের জালিমরা তাই করছে।[১]

'দুররুল মুখতার' প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে।[২]

এ সব ধরনের 'কর' 'আল-মাকস' নামে অভিহিত হওয়াই উত্তম। কেননা এ مكس সম্পর্কেই কঠিন আযাবের ধমক এসেছে। العشار। অতিরিক্ত কর আদায়কারীদের তিরস্কার পর্যায়ে যা বলা হয়েছে, তা ঠিক সেই কর সংগ্রহকারীদের সম্পর্কে, যারা জুলুম করে নেয় বলে তাদের জন্যে আযাবের চাবুক তৈরী হয়ে আছে। কেননা তারা জনগণের ওপর এমন আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয় যা বহন করার সাধ্য তাদের নেই। জালিম লোকেরা তাই করে এবং সংগৃহীত সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় এবং চেষ্টাকারী ও মজলুম জনতার নামে উড়ানো হয়।

ইমাম যাহবী কবীরা গুনাহ সম্পর্কে যা বলেছেন, উপরিউক্ত কথা তার সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, অত্যাচারী কর আদায়কারী জালিমদের বড় সাহায্যকারী, বরং তারা

---

১. দেখুন ঃ البحر الرائق ج ٢ ص ٢٤٩

২. الدر المختار وحاشية ج ٢ ص ٤٢

নিজেরাই জালিম। কেননা তারা এমন সব ধন-মাল নেয়, যা নেয়ার কোন অধিকার তাদের নেই এবং তা দেয় এমন লোককে, যার তা পাওয়ার কোন অধিকার নেই।[১]

তবে আমাদের পূর্বোদ্ধৃত শর্তের ভিত্তিতে যে সব কর ধার্য হবে জাতীয় বাজেটের ব্যয়-প্রয়োজন পূরণ এবং উৎপাদন ও জনসেবামূলক কার্যাবলীতে দেশের অভাব মোচনের লক্ষ্যে, যা সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের জাতীয় কল্যাণসমূহ কাজে ব্যয় করা হবে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি সাধন, মূর্খকে জ্ঞান শিক্ষাদান, বেকারের কর্মসংস্থান, ক্ষুধার্তের ক্ষুণ্নিবৃত্তি, ভীত-সন্ত্রস্তকে নিরাপত্তা দান, রোগীর চিকিৎসা, প্রসূতির তত্ত্বাবধানের জন্যে যেসব কর ধার্য করা হবে—ইসলামের জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে, এ কর সম্পূর্ণ জায়েয। শুধু জায়েয নয়, তা ওয়াজিব—দেয়া একান্ত কর্তব্য। ইসলামী সরকারের তা ধার্য করার অধিকার আছে যেমন, তেমনি তা কল্যাণ ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রহণ করারও অধিকার আছে।

মুসলমানদের عشور মুক্তি সংক্রান্ত হাদীসের তাৎপর্য

যে হাদীসটিতে عشور অর্থাৎ নানাবিধ করের বোঝা থেকে মুসলমানদের নিষ্কৃতি দানের কথা বলা হয়েছে, একে তো সে হাদীসটি সহীহ নয় এবং তাদের বক্তব্যে তা খুব স্পষ্টও নয়। তার অনেক কয়টি সহীহ অর্থ হতে পারে এবং তা অতি সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে কোনরূপ কৃত্রিমতা বা অবিচার ছাড়াই।

আবূ উবাইদের ব্যাখ্যা

কর আদায়কারী (صاحب المكس والعاشر) সম্পর্কে আযাবের হুমকির উল্লেখসহ যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, সাহাবীদের কথায় তার যে সমর্থন পাওয়ার যায় তা সবই উল্লেখ করার পর ইমাম আবূ উবাইদ বলেছেন ঃ 'আমরা এই যে সব হাদীসের উল্লেখ করলাম, যাতে কর আদায়কারীর উল্লেখ রয়েছে, যাতে কর আদায় করাকে অপসন্দ করার কথা বলা হয়েছে ও কঠোরতা প্রকাশ করা হয়েছে আসলে এগুলোর মূল রয়েছে জাহিলিয়াতের যুগে। তখনকার আরব-অনারব রাজা-বাদশা সকলেই এ ধরনের কর আদায় করত। তাদের নিয়ম ছিল তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের ধন-মালের এক-দশমাংশ নিত, যখন তারা তাদের দেশে ব্যবসা করার জন্যে আসত। নবী করীম (স)-এর লিখিত প্রেরিত পত্রাদি থেকেও আমরা এরই প্রমাণ পাই। এ সব চিঠি তিনি বিভিন্ন এলাকা ও দেশের লোকজনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ তাদেরকে একত্রিত করা হবে না, তাদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ নেয়া হবে না—এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এটা জাহিলিয়াতের জামানার রীতি ছিল। এ পর্যায়ে অবশ্য বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও ইসলামের সাহায্যে তা বাতিল করিয়ে দিয়েছেন এবং যাকাত ফরয করেছেন এক-দশমাংশের এক চতুর্থাংশ ধার্য করে। প্রতি দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম। যে লোক তাদের কাছ থেকে এ ফরয বাবদ ধার্য অংশ নেবে, সে হাদীসে কথিত কর

---

১. الكبائر ص ١١٩ الكبيرة السابعة والعشرون

আদায়কারী গণ্য হবে না। কেননা সে এক-দশমাংশ নিচ্ছে না। সে যা গ্রহণ করেছে, তা এক-চতুর্থাংশ। হাদীসে এই ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে এই বলে যে, মুসলমানদের ওপর عشور নেই। عشور হবে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ওপর। যে হাদীস মরফু উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেও এ কথাই বলা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, العشر। বলা হয়েছে তাকে, 'যে লোকদের কাছ থেকে সাদকা গ্রহণ করে কোনরূপ অধিকার ছাড়াই। ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যাও তাই। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ আপনি কি জানেন হযরত উমর মুসলমানদের কাছ থেকে 'এক-দশমাংশ' গ্রহণকারী ছিলেন? বললেন ঃ না, আমি তা জানি না। জিয়াদ ইবনে হুদাইর বর্ণিত হাদীসও অনুরূপ। তিনি বলেছেন ঃ আমরা মুসলমান ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ নিতাম না। একথা বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ঃ আমরা মুলমানদের কাছে থেকে এক-দশমাংশের এক—চতুর্থাশ নিতাম। আর যিম্মীদের কাছ থেকে অর্ধ-ওশর।

এ প্রেক্ষিতে মুসলমানদের ওপর থেকে العشور। তুলে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায়—তাদের ওপর অবশ্য যে দেয় হিসেবে ধার্যের পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে সেই হার থেকে, যা জাহিলিয়াতের যুগের আরব-অনারব রাজা-বাদশাহরা আদায় করত এবং এক্ষণে তার পরিমাণ এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ধার্য হয়েছে, ইসলাম ব্যবসাপণ্যে যাকাত হিসেবে এ পরিমাণটা ধার্য করেছে। হাদীসে এ ইয়াহুদী ও খৃস্টান বলত সেকালের বিশেষ করে যুদ্ধরত লোকদেরই বুঝিয়েছে। যেমন আবূ উবাইদ আবদুর রহমান ইবনে মাকাল থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি জিয়াদ ইবনে হুদাইরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনারা এক-দশমাংশ নিতেন কাদের কাছ থেকে? বললেন ঃ আমরা মুসলমান কিংবা চুক্তিবদ্ধ লোকদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ নিতাম না। বললাম ঃ তাহলে কাদের কাছ থেকে নিতেন? বললেন ঃ অমুসলিম যুদ্ধরত (জাতির যে সব লোক দারুল ইসলামে ব্যবসা করে সেই) ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে—যেমন করে তারা আমাদের কাছ থেকে নিত, যখন আমরা তাদের দেশে যেতাম।[১]

এটা বিজাতীয় লোকদের প্রতি গৃহীত আচরণ পর্যায়ের ব্যাপার অর্থাৎ লোকদের সাথে সেরূপ আচরণ গ্রহণ, যেমন তাদের রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের প্রতি আচরণ করত। এ এমন একটা মৌল নীতি, যা আজ পর্যন্ত অনুসরণ করা হচ্ছে।

তবে ইয়াহুদী-খৃস্টানদের মধ্যে যারা যিম্মী হয়েছিল, তাদের কাছ থেকেও এক-দশমাংশ নেয়া হত না, যেমন নেয়া হত যুদ্ধরত জাতির লোকদের কাছ থেকে। তার এক-চতুর্থাংশও নেয়া হত না, যেমন তা নেয়া হত মুসলমানদের কাজ থেকে। তাদের কাছ থেকে নেয়া হত অর্ধ-ওশর। আবূ উবায়েদের কাছে এটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। প্রথমত তিনি এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। পরে আমি গভীরভাবে হযরত উমর সংক্রান্ত হাদীসটি বুঝতে চেষ্টা করি। আমি দেখতে পাই, তিনি তাদের সাথে এই শর্তে একটা চুক্তি করেছিলেন। এটা মাথাপিছু জিযিয়া ও জমির খারাজ দেয়ার বাইরের

---

১. الاموال ص ৭.৮৭.৭ دار الشرق

ব্যাপার। এমনিভাবে হাদীসটি চলেছে। পরে বলেছেন ঃ আমি দেখলাম, তাদের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গ্রহণটাই ছিল সন্ধির মূল কথা। এক্ষণে তা তাদের ওপর মুসলমানদের প্রাপ্য অধিকার।[১]

সম্ভবত এ বৃদ্ধিকরণ যা তাদের ব্যবসায়ীরা বহন করত,—এটা ছাড়া তাদের গবাদি পশু ও সঞ্চিত নগদ সম্পদ থেকে কিছু কিছুই নেয়া হত না বলেই হয়েছিল অথচ মুসলমানদের এ সম্পদেরও যাকাত দিতে হয়।[২]

তিরমিযীর ব্যাখ্যা

হাদীসে যে عشور উল্লেখিত হয়েছে, তার আরও একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হল, এটা জিযিয়া । আবূ দাউদ কর্তৃক উদ্ধৃত কোন কোন বর্ণনায় সে কথা এসেছে এভাবে ঃ মুসলমানদের ওপর খারাজ নেই। কেননা জিযিয়াকেও 'মাথা পিছু খারাজ' বলা হত তখনকার সময়ে।

ইমাম তিরমিযী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ নবী করীম (স) এর কথা ঃ 'মুসলমানদের ওপর عشور নেই' তার অর্থ 'মাথা পিছু জিযিয়া'। এ ব্যাখ্যাটা মূল হাদীসেই রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ عشور কেবলমাত্র ইয়াহুদী খৃস্টানদের ওপর, মুসলমানদের ওপর عشور নেই।[৩]

এ দলিলের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, যিম্মী যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তার ওপর থেকে জিযিয়া প্রত্যাহৃত হবে।

আল-মুনাভীর অভিমত ও তার পর্যালোচনা

আশ্চর্যের বিষয়, আল্লামা আল-মুনাভীর তাঁর التيسير। গ্রন্থে হাদীসটিকে মুসলমানের কাছ থেকে 'কর গ্রহণ হারাম হওয়ার মূল ভিত্তি' ঘোষণা করার পর লিখেছেন ঃ সম্ভবত এ হাদীসটি হযরত উমর পাননি। তাই তিনি مكس গ্রহণ করেছেন। মুকারেজী প্রমুখ বলেছেন ঃ হযরত উমর জানতে পারলেন যে, যে মুসলমান ব্যবসায়ীরা ভারত আগমন করে, তাদের কাছ থেকে এক-দশমাংশ নেয়া হয়। তখন তিনি বসরার শাসনকর্তা হযরত আবূ মূসা আল-আশয়ারীকে লিখছেন ঃ তোমার এলাকায় যে মুসলিম ব্যবসায়ী আসে তাদের কাছ থেকে প্রতি দু'শ দিরহামে পাঁচ দিরহাম এবং চুক্তিবদ্ধ যিম্মী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি বিশ দিরহামে এক দিরহাম গ্রহণ কর। পরে উমর ইবনে আবদুল আজীজ তা লোকদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নেন।[৪]

---

১. الاموال ৭০৯ – ৭১০

২. দেখুন ঃ احكام الذميين والمستاء منين فى دار الاسلام – فصل الضرائب التجارية

৩. سنن الترمذى ، كتاب الزكاة – باب ماجاء : ليس على المسلمين جزية ط حمص ج ٢ ص ٣٩٩–

৪. التيسير : شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٣٦٨

এ বর্ণনা থেকে জানা গেল, তিনি জানতে পেরেছেন, হযরত উমর তাঁর একজন প্রাদেশিক গভর্নরকে লিখেছিলেন ঃ লোকদের ওপর থেকে مكس প্রত্যাহার করা হোক। আর অপর একজনের কাছে লিখেছিলেন, 'সওয়ার হয়ে بيت المكس 'ট্যাক্স ঘরের' দিকে যাও এবং সেটিকে ধূলিসাৎ করে দাও।'[১]

সত্যি কথা এই যে, আল-মুনাভীর উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সত্যানুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

ক. তিনি عشور সংক্রান্ত হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সহীহ নয় হাসানও নয়। তিনি নিজেই তা فيض القدير গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

খ. তিনি ধরে নিয়েছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে যে হাদীসটি সহীহ ও সপ্রমাণিত , হযরত উমর তার বিপরীত কাছ করেছেন এবং তাঁর সময়ে কোন সাহাবীই তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেননি। যদিও তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী বর্তমান ছিলেন এবং দ্বীনী ব্যাপারে তাঁরা খুবই সচেতন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির সাথেও তারা গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তা বিপুল জনগণের সাথে কোনক্রমেই গোপন থাকতে পারে না।

গ. হযরত উমর (রা) যা করেছেন, সাহাবিগণও যার প্রতিবাদ করেন নি—বহাল রেখছেন, লেখক তাকে একটা অন্যায়—বরং কবীরা গুনাহ্ গণ্য করেছেন। কেননা তিনি مكس নিয়েছেন, যা নিলে সে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ কথাটি বিরোধী হয়ে পড়ে খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের অনুসরণ করার যে নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার। কেননা হযরত উমর (রা) সর্বসম্মতভাবে তাঁদেরই একজন।

ঘ. তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, উমর ইবনে আবদুল আজীজ হযরত উমর ফারুক প্রবর্তিত একটি জুলুমের ব্যবস্থা লোকদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করেছেন অথচ ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করে যে, উমর ইবনে আবদুল আজীজ হযরত উমরেরই সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণে তাঁর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। উমর ইবনে আবদুল আজীজ তো বনু উমাইয়া প্রবর্তিত জুলুম ও শোষণমূলক ব্যবস্থাবলীর মূলোৎপাটন করেছেন। তারা তাঁরই বংশের লোক ছিল। কেননা তাঁর কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ওদের তুলনায় অধিক প্রিয় ছিলেন।

এ আলোচনা থেকে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উমর ইবনে আবদুল আজীজ যা উৎখাত করেছেন, তা হচ্ছে অবিচার, জুলুম, মানুষকে কষ্টদান, শরীয়াত অর্পিত দায়িত্ব ও অধিকার লঙ্ঘন এবং যে সব শর্ত ও সীমা স্বীকার করে নেয়া হতো তা রক্ষা না করা। কার কাছ থেকে কি নেয়া হবে, কি কাজে নেয়া হবে, কখন নেয়া হবে, কি ভাবে নেয়া হবে—এ বিষয়ে পূর্বে কিছুই ঠিক-ঠিকানা ছিল না। ফলে জনগণ খুব খারাপভাবে কর আদায় করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কর আদায়কারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে। পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ এগুলো শক্ত হস্তে দূর করেছিলেন।

---

১. الاموال - السابق - ٧٠٤

ইবনে হাজম উদ্ধৃত একটি কাহিনী—যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে একবার করেছি—উপরিউক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ করে। জুরাইক[১] ইবনে হায়ান আদ-দেমাশকী মিসরের প্রবেশ পথে দায়িত্বশীল কর্মচারী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমাকে লিখছেন ঃ নজর দাও তোমার কাছে যে মুসলমানই যাবে, তাদের প্রকাশমান ধন-মল যা তারা ব্যবসায়ে আনা-নেয়া করে, তার প্রতি চল্লিশ দীনারের এক দীনার গ্রহণ করবে। তার কম হলে অনুরূপ হিসেবের হার নিতে হবে।[২]

এখানে আমার মনে হচ্ছে, 'মুসলমানদের ওপর عشور নেই' এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একথা প্রমাণ করে না যে, মুসলমানদের কাছ থেকে সুবিচারপূর্ণ কর গ্রহণও হারাম—মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দিলেও। তা প্রমাণের দিক দিয়েও যথার্থ নয় এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও তা প্রমাণ করে না।

চার মাযহাবের ফিকাহবিদগণ সুবিচারপূর্ণ কর জায়েয মনে করেন

পূর্ববর্তী আলোচনায় সব শোবাহ সন্দেহ দূর হয়ে গেছে বলে মনে করি। সুবিচারপূর্ণ কর ধার্যের বিরোধীরা এ সব শোবাহ ও সন্দেহেরই আশ্রয় নিত। এ পরিচ্ছেদে আমরা যা বিশ্লেষণ করেছি তার তাগিদ অনুযায়ী এ কথা বলা প্রয়োজন যে, ইসলামী ফিকাহ যাকাত ছাড়াও—যাকাতের বাইরেও কর ধার্যকরণের সাথে যথার্থভাবে পরিচিত অর্থাৎ সুবিচারমূলক কর ধার্যের বৈধতা চার অনুসৃত মাযহাবের ফিকাহবিদগণ স্বীকার করেছেন। অবিচারমূলক কর সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত। সে বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন হুকুম-আহকাম প্রণয়ন ও সংকলন করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটি ওটির ওপর الضرائب। 'কর' নাম আরোপ করেননি। মালিকী ফিকাহর কেউ কেউ তার নাম দিয়েছেন الوظائف। অথবা الخراج। 'আল-খারাজ'

হানাফীদের কেউ কেউ তার নাম দিয়েছেন النوائب। এক বচনে نائبة ব্যক্তি শাসকের দিক থেকে যে প্রতিনিধিত্ব করে—সত্যভাবে কিংবা বাতিল ভাবে, তারই নাম হচ্ছে ঃ نائبل

হাম্বলী মাযহাবের কেউ কেউ তার নাম দিয়েছেন الكلف السلطانيه। 'রাষ্ট্র অর্পিত দায়িত্ব' অর্থাৎ সে সব অর্থনৈতিক দায়িত্ব, যা রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক জনগণের ওপর কিংবা এক শ্রেণীর লোকের ওপর জারী করে দেয়।

হানাফী ফিকাহতে

হানাফী ফিকাহতে তাদের প্রাচীন ও শেষের দিকের ফিকাহবিদগণ এ সুবিচারমূলক কর ধার্য করা এবং তার শরীয়াতসম্মত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন, দেখতে পাই।

---

১. زريق-ز পেশ ر জবর—আবূ উবাইদ ।الاموال গ্রন্থের ১৬৬১ পৃষ্ঠায় এ পাঠই গ্রহণ করেছেন। কেননা মিসর ও সিরিয়াবাসীরা এভাবেই বলে, তারাই এ বিষয়ে ভাল জানে। বুখারী, যাহবী প্রমুখ প্রথমে ر লিখেছেন।

২. দেখুন المحلى ج ٦ ص ٦٦।

আল্লামা ইবনে আবেদীন উল্লেখ করছেন ঃ 'নাওয়ায়েব' সত্যভিত্তিকও হয়ে থাকে। যেমন, সংযুক্ত খালের ভাড়া লওয়া, মহল্লার পাহারাদারের মজুরী—মিসর দেশে তার নাম 'আল-খফীর', রাষ্ট্রপতিকে 'অযায়েফ' দেয়া, যেন সে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করতে পারে, বন্দীদের মুক্তিপণ দেয়া যদি তার প্রয়োজন দেখা দেয়, বায়তুলমালে কিছুই যদি না থাকে, তাহলে তা জনগণের কাছ থেকেই পেতে হবে। وظف عليهم অর্থ তাদের ওপর আবর্তিত ভাবে ফরয করে দেয়া হবে।

কোন কোন 'নাওয়ায়েব' অকারণ ও অন্যায়ভাবেও হয়ে থাকে। ইবনে আবেদীন বলেন ঃ যেমন আমাদের একালের বিভিন্ন নামে ও খাতে কর আদায় করা।[১]

হানাফী কিতাব 'আল-ফন্নিয়া'য় বলা হয়েছে ঃ

আবূ জাফর আল-বালখী বলেছেন ঃ রাষ্ট্র জনগণের ওপর তাদের কল্যাণার্থে যা কিছু ধার্য করে[২], তা দ্বীনী কর্তব্য হয়ে পড়ে এবং সত্যভিত্তিক অধিকার বলে বিবেচিত হবে—যেমন খারাজ। আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ওপর যা কিছু ধার্য করবে, তা তাদের কল্যাণের জন্য হয়েছে মনে করতে হবে। তার জবাবও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন কি রাস্তাঘাটে চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে নিযুক্ত পাহারাদারদের মজুরী, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পথসমূহের দ্বার নির্মাণ এ কথা শুধু জানতে হবে, প্রচার করা চলবে না, ফেতনার ভয় আছে। সামষ্টিক কল্যাণের কাজ। পরে লিখেছেন ঃ এই আলোকে বলা যায়, খাওয়ারিজমে জীহুন বারবজ নদী সংস্কারের জন্যে জনগণের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়, তা সাধারণের কল্যাণের জন্যে অবশ্য দেয়। তা দিতে অস্বীকার করা জায়েয নয়। এটা জুলুম নয়। কিন্তু জানা যায়, এ জবাব তদানুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্র ও এ কাজে নিয়োজিত তার কর্মচারীদের সম্পর্কে মানুষের মুখকে বিরত রাখার জন্যে—ব্যাপক প্রচারের জন্যে নয় যেন প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণের চাইতে বেশী নেবার দুঃসাহস না দেখায় অর্থাৎ উক্ত ফতোয়াটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং জনগণকে সাধারণভাবে জানানোই উদ্দেশ্য নয়।

ইবনে আবেদীন তাঁর ردالمختار টীকায় উপরিউক্ত কথা উদ্ধৃত করেছেন। পরে বলেছেন, উক্ত কথাটিকে এ শর্তের মধ্যে রাখা আবশ্যক যে, তা ধার্য করা যাবে এবং দেয়া ওয়াজিব হবে যদি বায়তুলমালে তার জন্যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ মওজুদ না থাকে।[৩]

উপরে যে প্রমাণটা উদ্ধৃত হল, তা আমাদের বক্তব্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। উপরিউক্ত ফিকাহবিদগণ এইটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে যা কিছু কর ধার্য করে তা দ্বীনী ওয়াজিব, ন্যায্য অধিকার হিসেবেই তা প্রাপ্য। এতদসত্ত্বেও তাঁরা উক্ত কথার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন তাদের এ কথা ঃ এ ব্যাপারটি বুঝতে হবে, ব্যাপক

---

১. حاشية ابن عابدين (ردالمختار) ج ٢ ص ৫৮

২. يضربه শব্দটি ضرب থেকে এবং তা থেকেই الضريبة। নিসৃত অর্থাৎ কর ধার্য করা।

৩. رد المختار ج ٢ ص ৫৯

প্রচার করা যাবে না। কেননা ফেতনা ফাসাদের ভয় আছে। তার অর্থ—তাঁরা মনে করেন, উক্ত ফতোয়াটি ফিকাহবিদ এবং তাঁদের ছাত্রদের বিশেষ পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। শাসক এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ সমর্থক-সাহায্যকারীদের মধ্যে তা প্রচার করা যাবে না। কেননা তারা প্রকৃত প্রাপ্য পরিমাণের ওপর অধিক চাপিয়ে দেয়ার দুঃসাহস করতে পারে। তাতে জনগণ অর্থনৈতিক চাপে কষ্ট পাবে—কারণে বা অকারণে।

অবশিষ্ট তিনটি মাযহাবের ফিকাহতে

মালিকী মাযহাবের শায়খ আল-মালিক বলেছেন ঃ মুসলিম জনগণের ওপর 'খারাজ' ধার্যকরণ সাধারণ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের মধ্যে গণ্য। তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের এ কালে অধিক প্রয়োজনের দরুন আন্দালুসীয় দেশে তা ধার্য করার কল্যাণ প্রকাশিত হয়েছে। শত্রুরা মুসলমানদের কাছ থেকে তা নিচ্ছে—জনগণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও বায়তুলমালের দুর্বলতা অনুপাতে। তা এক্ষণে আন্দালুসিয়ায় নিঃসন্দেহে জায়েয। যে পরিমাণ প্রয়োজন, তার ওপর নজর রাখতে হবে, তা রাষ্ট্র প্রধানের ওপর সমর্পিত।[১]

পূর্বে আমরা দুজন ইমামের (আল-গাযযালী ও শাতেবীর) মত উদ্ধৃত করেছি। তাঁরা দুজনই এ খারাজ ধার্য করা জায়েয বলেছেন—যদি বায়তুলমাল শূন্য হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রয়োজন মনে করে।

সরকার কর্তৃক চাপানো দায়িত্ব এবং যুক্তভাবে করা জুলুম পর্যায়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কালাম একটু পরই উদ্ধৃত করা হবে। তিনি রাষ্ট্র যা গ্রহণ করে তার অনেকটা মাল দ্বারা জিহাদ হিসেবে জায়েয মনে করেছেন। তা ধনীদের ওপর দেয় কর্তব্য হবে। যেমন غياث الامم গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।[২]

শেষ পর্যন্ত চারটি মাযহাবের প্রত্যেকটি মযহাবের আলিম ও সম্মানিত ইমামগণ সুবিচারপূর্ণ কর ধার্য করাকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন যদিও তাঁদের কেউ সরকারী কর্মচারীদের বাড়াবাড়ি করার ও জনগণের ওপর জুলুম করার ভয়ে এ ফতোয়ার ব্যাপক প্রচার সংরক্ষিত রাখার পক্ষপাতী।

অত্যাচারমূলক কর পর্যায়ে ফিকহী খুঁটিনাটি

রাষ্ট্র সরকার জুলুমমূলক ও অন্যায়ভাবে যে সব কর কার্য করে, তা 'নাওয়ায়েব' কিংবা সরকার চাপানো দায়িত্ব বা 'অযায়েফ' বলে পরিচিত।

---

১. تهذيب الفروق والقواعد المنيه تاليف الشيخ محمدعلى بن الشيخ حسين مفتى المالكيه وهو مطبوع بهامش الفروق للقر افى ج ١ ص ١٤١

২. غياث الامم কাশফুজ্জুনুন ২-১২১৩ তে যেমন উদ্ধৃত হয়েছে। كتاب فى الامامة الامام الحرمين الجوينى الشافعى المتوفى سنه ٤٧٨ هجر –

এ জুলুমমূলক কর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাব বহু খুঁটিনাটিও প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে ঃ

ক. এ ধরনের কর দ্বারা দায়িত্ব গ্রহণের কাজ করা যেতে পারে যদিও তা না হক ভাবে ধার্য হয়েছে অর্থাৎ কোন লোক যদি কর বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা অন্য কারোর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে তা ফিরিয়ে দিতে পারে। কেননা জালিম তা তার কাছ থেকে নিয়েছে। এ অর্থে নয় যে, জালিম দায়িত্ব গ্রহণকারীর কাছ থেকে তা দাবি করে নেয়ার অধিকার রাখে—তা প্রমাণিত হচ্ছে না।[১]

খ. যে লোক কর-এর বোঝা বন্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা করবে, তাকে সেজন্যে সওয়াব দেয়া হবে, যদি মূলত তা গ্রহণ বাতিল ও জুলুম হয়, তবুও। তাঁরা বলেছেন ঃ ফিকাহ্ ভাষায় العدل। অর্থ পারস্পরিক সুবিচারমূলক আচরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার সাধ্য অনুপাতে আর্থিক বোঝা চাপানো। কেননা কর পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব যদি জালিমের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে অনেক সময় তাদের কেউ কেউ জনগণের ওপর তাদের সাধ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। তখন জুলুমের ওপর জুলুম করা হবে। এমতাবস্থায় যদি কোন ওয়কিফহাল ব্যক্তি কর-বোঝা সুবিচারের সাথে বন্টন করার দায়িত্ব নেয়, তাহলে জুলুমের মাত্রা কম হবে বলে আশা করা যায়। এ কারণে তাকে সওয়াব দেয়া হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।[২]

গ. এসব 'নওয়ায়েব' ও কর আদায় ইত্যাদি যা অন্যায়ভাবে চাপানো হয়, তার প্রতিরোধ করা—কোনরূপ কৌশল বা সুপারিশ কিংবা এ ধরনের অন্য কিছুর সাহায্যে তা এড়িয়ে যাওয়া জায়েয হবে—যদি তার ভাগের করটা অবশিষ্টদের ওপর চাপানো না হয়। যদি অবশিষ্টদের তার বোঝা বহন করতে হয়, তাহলে তা এড়ানো উচিত হবে না।

কেউ কেউ একটা সমস্যা হিসেবে বলেছেন, এভাবে ধার্য করা কর দেয়া হলে তাতে বরং জালিমের জুলুম কাজে সাহায্য করা হবে। তাই যার পক্ষে জুলুমকে নিজের থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, তা করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক হওয়া উচিত।

অন্যরা এ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এই বলে যে, তাঁর নিজের থেকে এ জুলুম প্রতিরোধের ফলে সমাজের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের ওপর নানাবিধ জুলুম নির্যাতন চালানোর আশংকা দেখা দিতে পারে, যা থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোন কৌশল উপায় বা সুপারিশ অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।[৩] একথাটি খুবই যথার্থ।

এ অত্যাচারমূলক কর-বোঝা বহন করার ব্যাপারে ধনী লোকদের মধ্যে সমতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া অতীব উত্তম কালাম পেশ

১. حاشية ردالمختار ج ٢ ص ٥٨ – ٥٩
২. حاشية ردالمختار ج ٢ ص ٥٩
৩. حاشية ردالمختار ج ٢ ص ٨٥

করেছেন। তিনি 'সামষ্টিক ও সম্মিলিত জুলুমমূলক কর'—যা একটা গ্রাম বা শহরের শরীক সব মানুষের কাছ থেকেই দাবি করা হবে—সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

'যখন তাদের সকলের কাছ থেকে কোন জিনিস দাবি করা—নিতে চাওয়া হবে, যা তাদের ধন-মাল থেকে মাথাপিছু গ্রহণ করা হবে—যেমন সরকারী আর্থিক চাপ, যা তাদের সকলের ওপর চাপানো হবে—হয় তাদের মাথা গুণতি হিসেবে অথবা তাদের যানবাহনের সংখ্যানুপাতে কিংবা তাদের গাছের সংখ্যা হিসেবে বা তাদের ধন-মালের পরিমাণ হিসেবে—যেমন তাদের অধিকাংশ থেকে শরীয়াতের ফরয যাকাত নেয়া হয়, শরীয়াতী ওয়াজিব খারাজ নেয়া হয় কিংবা শরীয়াতী জিনিসের বাইরে সরকারের চাপানো অর্থ নেয়া হয় কিংবা শরীয়াতী জিনিসের বাইরে সরকারের চাপানো অর্থ নেয়া হয়—যেমন খাদ্য-পোশাক-যানবাহন ফল-ফাকড়া ইত্যাদি ক্রয়কারী ও বিক্রেতার ওপর ধার্য করা হয়—যদিও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের মাল দ্বারা জিহাদ করা স্বরূপ ধার্য করা হয়েছে—জিহাদের এসব জিনিস যদি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে—যেমন غياث الامم -এর লেখক উল্লেখ করেছেন, তাতে যে জুলুম প্রবেশ করেছে, যার কোন যৌক্তিকতাই আলিমগণের কাছে স্বীকৃত নয় এবং যেমন সম্রাটের আগমন বা তার সন্তান হওয়া প্রভৃতি সাময়িক কাজ উপলক্ষে যা সংগ্রহ করা হয়—হয় তাদের ওপর একটা পণ্য নিক্ষেপ করা হবে তার মূল্যের চাইতেও বেশী দামে—তার নাম রাখা হয়েছে الحطائط। এবং যেমন একটি কাফেলার লোকদের মাথা পিছু কিছু দাবি করা হবে অথবা তাদের জন্তুর সংখ্যা বা ধন-মালের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা তাদের সকলেরই কাছ থেকে চাওয়া হবে—

.... এসব নিপীড়িত লোকেরা যারা এসব খাতে মাল দিতে বাধ্য হয়, তাদের কাছ থেকে যা চাওয়া হবে তাতে সুবিচারকে অপরিহার্য করে নেয়া। এ ব্যাপারে তাদের পারস্পরিকভাবে একের অপরের ওপর জুলুম করা উচিত নয় বরং তাদের উচিত তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে যা নেয়া হচ্ছে তাতে বাধ্যতামূলকভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। যেমন উচিত ন্যায়সঙ্গতভাবে যা নেয়া হচ্ছে তাতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা এই যা কিছু সরকারী অর্থনৈতিক দাবি তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া হচ্ছে তাদের লোকসংখ্যা ও তাদের ধন-মালের দরুন, তা তাদের তুলনায় ভিন্নতর। তার অবস্থা বিভিন্ন হয় গ্রহণের দিক দিয়ে। কখনও গ্রহণকারী ন্যায়সঙ্গতভাবে নেয় আর কখনও তা বাতিলভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু যাদের কাছে তা দাবি করা হয়েছে, এসব সরকার অর্পিত দেয় তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে তাদের লোকসংখ্যা ও ধন-মালের কারণে। অতএব তাদের পরস্পরের উচিত নয় পরস্পরের ওপর জুলুম করা। বরং সর্বাবস্থায় পরস্পরের ওপর সুবিচার করাই প্রত্যেকের কর্তব্য। জুলুম কোন অবস্থায়ই বিধিসম্মত হতে পারে না।

অতএব উপরিউক্ত শরীক লোকদের এ অধিকার নেই যে, অন্যরা যেভাবে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েছে, তারাও তা-ই হবে। বরং হয় সে তার অংশের দেয় দেবে—তাহলে সে সুবিচারকারী বিবেচিত হবে অথবা তার অংশের চাইতে অতিরিক্ত দেবে—তাহলে সে তার শরীক লোকদের সাহায্য করতে পারবে তাদের কাছ থেকে যা

নেয়া হয়েছে, তাতে এবং সে অতীব ন্যায়কারী গণ্য হবে। তার পক্ষে সেই মালে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ দিতে অস্বীকার করা ঠিক হবে না, যা অন্য সমস্ত শরীক থেকে নিয়ে নেয়া হবে। তাহলে তাদের ওপর দ্বিগুণ জুলুম করা হবে। কেননা ধার্য মাল তো নেয়া হবেই অনিবার্যভাবে। তাই কেউ যদি স্বীয় মর্যাদা বা ঘুষ বা এ ধরনের অন্য কিছুর সুযোগ তা দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশের মাল যার কাছ থেকে নেয়া হবে, সে তার ওপর জুলুমকারী হবে। তার ওপর থেকে জুলুম প্রতিরোধ করার ফলে অন্য ব্যক্তির ওপর জুলুম করা হবে অনিবার্যভাবে যদি অন্যদের ওপর জুলুম না হয়, তাহলে তা হবে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ দেয়া থেকে বিরত থাকার মত। তাহলে তা তার কাছ থেকে যেমন নেয়া হবে না তেমনি নেয়া হবে না অন্যদের কাছ থেকেও। তাহলে এটা জায়েয হবে।

এমতাবস্থায় সমস্ত শরীকেরই ধার্য মাল দিয়ে দেয়া ওয়াজিব হবে। প্রত্যেকেই তার সে অংশ দেবে যার সে প্রতিনিধিত্ব করে—যখন না-দেয়া অংশ শরীকদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়া হবে। আর যে লোক অন্যের অংশ তার পক্ষ থেকে দিয়ে দেবে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়াই, তা তার কাছ থেকে ফেরত নেয়ার তার অধিকার আছে। তার পক্ষ থেকে সে যে দিয়ে দিল, এ কারণেই সে অতীব নেক আমলকারী গণ্য হবে। তখন সে যে দিয়েছে, তা তাকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত হবে। ঠিক যেমন কর্জে হাসানা দাতা। আর যে লোক অনুপস্থিত থাকল, দিল না, ফলে উপস্থিত লোকেরাই তা দিয়ে দিল, তারা যে পরিমাণ দিয়েছে সে পরিমাণ তাদেরকে তার দেয়া কর্তব্য হবে। আর যে লোক তার পক্ষ থেকে আদায়কারীর কাছ থেকে নিয়ে নিল এবং আদায়কারীকে দিয়ে দিল, তার তা গ্রহণ করা জায়েয হবে—যার জন্যে আদায় করা বাধ্যাতামূলক সে প্রথম জালিম হোক, কি অন্য কেউ। এ কারণে সে যা অন্যের পক্ষ থেকে দিয়ে দিয়েছে, তার দাবি করার তার অধিকার আছে। যেমন ঋণ ফেরত দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয় আর তার মালের বিকল্প গ্রহণে গ্রহণকারীর জন্যে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যাকাতের পর কর ধার্যের প্রয়োজন হবে না

একটি প্রশ্ন, যার জবাব চাওয়া হচ্ছে—

বহু মুসলমানের চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে। সে জবাব না দিয়ে নিস্তার নেই। প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই যে, ধন-মালের মালিকরা সরকারী ভাণ্ডারে আপেক্ষিক ও উর্ধ্বমুখী উভয় প্রকারের কর এত পরিমাণের দিয়ে থাকে, যা অনেক সময় শরীয়াতের ফরয করা যাকাতের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হয়ে থাকে। এভাবে বিপুল ধন-মাল সরকারের ভান্ডারে চলে যায়, যা বাজেটে বর্ণিত খাতসমূহে ব্যয়িত হয়। আর বাজেটের কোন কোন ব্যয়খাত যাকাতেরই ব্যয় খাতরূপে গণ্য হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন অক্ষম লোকদের সাহায্য, বেকার লোকদের কর্মসংস্থান বাস্তুহারা, ভাসমান ও পড়ে পাওয়া লোকদের আশ্রয়দান ইত্যাদি সরকারী জনকল্যাণ বিভাগের কাজ বলে গণ্য হয়। দরিদ্রদের জন্যে বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও এপর্যায়ের কাজ। মুসলমানরা এসব কাজের জন্যে সরকারকে যে কর দেয়, তার পরও কি যাকাত দেয়ার প্রয়োজন থাকে? সরকার কি দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণ এবং যাকাতের খাতসমূহে সাধারণভাবে ব্যয় করার জন্যে দায়ী হবে অথবা এসব বিপুল পরিমাণের হওয়া সত্ত্বেও এবং তা দেয়ার পরও যাকাত থেকে নিষ্কৃতি নেই যাকাত তবুও দিতে হবে? মুসলমানরা যাকাতের নামে তার বিশেষ খাতে এবং বিশেষ পরিমাণেই তা আদায় করতে বাধ্য থাকবে?

এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব দেয়ার জন্যে একথা উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক যে, 'যাকাত' যাকাত হয়েছে তিনটি কারণেঃ

১. সে বিশেষ পরিমাণ, যা শরীয়াত নির্দিষ্ট করেছে—এক-দশমাংশ থেকে অর্ধ-ওশর ও এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

২. বিশেষ নিয়ত—আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা ও সংকল্প এবং আল্লাহ্‌র ফরয করা যাকাত—যে বিষয়ে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, সে আদেশ পালন করা।

৩. বিশেষ ব্যয় খাত—তা আট প্রকারের, কুরআনুল করীমই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

সাধারণভাবে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর দ্বারা কি এ তিনটি কারণ বাস্তবায়িত হয়?

প্রথমে পরিমাণের কথাই বলা যাক। একথা প্রমাণিত যে, কর কোন শরীয়াত

নির্ধারিত পরিমাণের বাধ্যাবাধকতা স্বীকার করে না। অনেক সময় তা অনেক বেশী নিয়ে নেয়। কখনও আবার তার চাইতে কম। কখনও এমন পরিমাণ মাল থেকে কিছুই গ্রহণ করা হয় না, যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ যাতে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। যেমন কৃষি ফসল ও ফল ফাঁকড়া। কখনও এমন পরিমাণ মাল থেকেও কর নেয়া হয়, যা যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে শরীয়াতসম্মত ও উপযুক্ত পরিমাণ নয়। কেননা তাতে যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণ হয়নি।

এ পর্যায়ে বলা হয়ে থাকে, বিশেষভাবে কথা হচ্ছে নগদ সম্পদ থেকে যা কিছু নেয়া হয় সে বিষয়ে। তা এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ ফরযেরও বেশী। বেশী হলে তো কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। আর যদি ধরে নিই তা তার চাইতে কম, তাহলে অবশিষ্ট পরিমাণ ব্যয় করা মুসলমানের কর্তব্য

আর নিয়ত কি বাস্তবায়িত হবে শুধু এভাবে যে, করদাতা মনে করবে যে, এটা কর নয়—যাকাত ?

একথার ওপর প্রশ্ন তোলা হয় যে, এরূপ স্থানে ইবাদতের নিয়ত করা খালেস ও একনিষ্ঠ হতে পারে না অথচ যাকাত একটা ইবাদত বিশেষ। তাই তার জন্যে খালেস নিয়তের শর্ত করা হয়েছে। কুরআনে তাই বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ -

তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু এই যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে খালেস মনোভাব এবং অন্য সব দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে আল্লাহ্‌রই জন্যে আনুগত্য সুনির্দিষ্ট করে।

উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, নিয়তে গণনার বিষয় হচ্ছে, ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে মাল বের করে দিয়ে দেয়া। এখানে তা অর্জিত। প্রত্যেক ব্যক্তি তো তা-ই পারে, যার সে নিয়ত করবে।

আর ব্যয়ের খাত পর্যায়ে বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমান তার যাকাত পাওয়ার যোগ্য আটটি খাতের যে কোন একটিতে ব্যয় করবে প্রত্যক্ষভাবে অথবা যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীকে দিয়ে দেবে—এটাই ফরয। এ কর্মচারী সে, যাকে রাষ্ট্রপ্রধান যাকাত গ্রহণ ও তার জন্যে নির্দিষ্ট খাতসমূহে তা ব্যয় করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছে। ফলে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন পাওয়ার যোগ্য লোকদের উকীল। সে ধনী লোকদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে বন্টন করবে—করার ব্যবস্থা কার্যকর করবে।

তার অর্থ, রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর প্রতিনিধি যাকাত যথানিয়মে ও তার নামেই গ্রহণ করবে, যেন তা শরীয়াত নির্ধারিত বিশেষ খাতসমূহে ব্যয় করা যায়। তা যথানিয়মে ও তাঁর নামেই যাকাত গ্রহণের শর্ত করেছে এজন্যে যে, যাকাত হচ্ছে ইসলামের বড় বড় নিদর্শনের মধ্যের একটি। আর নিদর্শনাদিকে অবশ্যই তার নাম-পরিচিতিসহ চালু, কার্যকর ও জীবন্ত থাকতে হবে। অন্যাথায় নিদর্শন হওয়ার তাৎপর্যই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ কারণে—পূর্বে যেমন বলেছি—মালিকী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ দৃঢ় মত প্রকশ করেছেন যে, অত্যাচারী শাসকগণ যা কিছুই গ্রহণ করে, তাতেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে—যদি তা যাকাতের নামে গ্রহণ করা হয়। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য ফিকাহবিদের কথা থেকেও তা-ই বোঝা যায়—যদিও অনেকে স্পষ্ট করে তা বলেননি।

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, সরকারসমূহ প্রাচীন مكس অন্যায়ভাবে ধার্যকৃত কর হিসেবে যা কিছুই নেয়, আর আধুনিক সরকারসমূহ কর বা ট্যাক্স নামে যা গ্রহণ করে, তা যাকাতের স্থলাভিষিক্ত—যাকাতের বিকল্প হতে পারে না। তা যাকাতের হিসেবেও গণ্য হবে না। কেননা তা যাকাতের নামে গ্রহণ করা হয়নি, গ্রহণ করা হয় অন্য নামে, অন্য খাত হিসেবে। তা নিশ্চয়ই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের—যা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন—একটি নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। আর তা ব্যয়ও করা হয় এমন সব খাতে, যার সব কয়টাই কুরআন সুন্নাহ্ নির্ধারিত ও শরীয়াতসম্মত ব্যয় খাত নয়।

প্রথমোক্ত সওয়াবের জবাবে এ বক্তব্যই আমার। কিন্তু এ জবাবের ওপর আবার কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দ্বীনদার মুসলমান এককভাবেই বহু বিচিত্র ধরনের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বের সম্মুখীন হয়ে থাকে। সেও সরকার নির্ধারিত কর দেয় যেমন অন্যরা তা দিয়ে থাকে। পরে আরও ধার্য হয়, তাও সে দেয়—একাই এবং তা হচ্ছে তার মালের যাকাত। এ ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই দুঃসহ, কঠিন ও কষ্টদায়ক সন্দেহ নেই, অথচ ইসলামী শরীয়াত জনগণের ওপর থেকে সর্বপ্রকার অসুবিধা ও কষ্টদায়ক ব্যবস্থা দুরীভূত করার জন্যে প্রবর্তিত হয়েছে। মানুষের জীবনে সহজতা বিধান ও ক্ষতি কষ্ট প্রতিরোধই তার লক্ষ্য।

এই অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের কষ্ট বহু মুসলমানকে বারবার এ কথা উত্থাপিত করতে বাধ্য করে যে, কর বাবদ দেয়া অর্থকেই ফরয যাকাতের খাতে গণ্য করা হোক। ... তা হবে না কেন?

মুসলিম জীবনের বাস্তব বৈপরীত্য

মুসলিম জীবনে বাস্তব বৈপরীত্য না থাকলে এরূপ কথা বলা হত না, একথা জোর করেই বলা চলে। কেননা তারা একটি জাতি হিসেবে চিরকালই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে ও তা পালন করে চলতে প্রস্তুত ছিল। তারা চিরদিনই এ বিশ্বাসের ধারক ছিল যে, যাকাত ফরয এবং একটা ইবাদত। বরং বহু মুসলিম রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রীয় দ্বীন ছিল এ ইসলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী বিধান সেখানে কার্যকর ও অর্থবহ নয়। সে সব অঞ্চলে ইসলামী আইন প্রণয়ন একটা অপরিচিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তারা জনগণের জীবন থেকে তা আজ বহিষ্কৃত, পরিত্যক্ত, অবশ্য বর্তমান যুগের পূর্বে এরূপ বৈপরীত্য তাদের জীবনে কখনই ছিল না।

যাকাত সম্পর্কে পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাই, তা সর্বকালে প্রায় সব দেশে ও সমাজেই একটি মহান পবিত্র ও বাধ্যতামূলক ফরয হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। বহু ধন-মাল থেকে সরকার—প্রশাসক তা সংগ্রহ ও আদায় করে নিয়েছে। মুসলিম

জনগণ যাকাত ধার্য হতে পারে—এমন সব ধন-মাল থেকেই তা বাধ্যতামূলকভাবে ও নিয়মিত আদায় করে দিয়েছে। সেই সাথে একথাও অবশ্য সত্য যে, কোন কোন দেশ ও সমাজ এ ব্যাপারে আদর্শচ্যুত হয়েছে, তা সংগ্রহ বা ব্যয় অথবা উভয় ক্ষেত্রেই চরম দুর্নীতি ও অত্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। অনেক মুসলিম ব্যক্তি এমন দেখা গেছে, যাদের ধন-মালের মায়া ও প্রেম ফরয যাকাত আদায় করতে বাধা দিয়েছে। আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহের প্রতি তারা কার্পণ্য করেছে। যাকাত দেয়া থেকে বিরত রয়েছে, দিতে অস্বীকার করেছে অথবা তা দিতে চরম গাফিলতি প্রদর্শন করেছে. কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন মুসলিম রাজ্য ফরয যাকাতের গোটা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো অচল করে রেখেছে—ইসলাম একটা মনঃপূত দ্বীন হওয়ার মর্যাদা মুসলিম জনগণের কাছে হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রকাশ্যভাবে যাকাত পরিহার বা অস্বীকার করেছে, এমনটা বড় একটা দেখা যায়নি।

এই বৈপরীত্য সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব

কিন্তু আমাদের এ যুগে অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বহু ইসলামী দেশেই যাকাত সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে না। এ অবস্থা ইচ্ছা করে সৃষ্টি করা হয়নি। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়েছে সমগ্র মুসলিম জাহান। তারই পরিণতিতে এরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা ও তার বস্তুবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তি তাৎপর্যগতভাবেই ইসলাম জগতের জনজীবনকে পাশ্চাত্য নাস্তিক্যবাদী ভিত্তিতে গড়ে তুলেছে। বহু সংখ্যক মুসলমানই ইসলামী পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংশয়বাদী হয়ে পড়েছে। বহু লোকের জীবনে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও ফরযসমূহ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন কি, শেষ পর্যন্ত মুসলিম দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরও তার কুপ্রভাব থেকে দেশ ও দেশবাসী মুক্ত হতে পারেনি। তার কারণ, সাম্রাজ্যবাদের শুধু সেনাবাহিনীই হয়ত দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে; কিন্তু তার চিন্তা, মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব কার্যের মধ্যে বিরোধী ভাবধারা প্রবলভাবে এখনও বিরাজ করছে। কেননা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রেখে গেছে গভীর ব্যাপক সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ক, আইনগত ও প্রশাসনিক, নৈতিক ও আচার-আচরণমূলক কুপ্রভাব—যা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইসলামের ফৌজদারী আইন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে রাখা হয়েছিল। ফলে লাম্পট্য, জ্বেনা-ব্যাভিচার, মদ্যপান ও সর্বপ্রকারের ফিসকে-ফুজুরী মুসলিম সমাজেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল।

ইসলামের তমদ্দুনিক আইন-বিধান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে সুদ, ঘুষ এখনও ব্যাপকভাবে চালু হয়ে রয়েছে। ইহুদী সংশয়বাদীরা মুসলিম মানসে জাগিয়ে দিয়েছে ইসলামের প্রতি সংশয়, অবিশ্বাস। মুসলিম উম্মতের লোকেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অনুরূপভাবে ইসলামের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে

গেছে। ফলে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ—যাকাত ব্যবস্থা—অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তাদের ওপর চেপে বসেছে বিচিত্র ধরনের তমদ্দুনিক কর ব্যবস্থা। এমন কি যাকাত আইনের খসড়া কোন কোন যুগে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হলে নামধারী মুসলমানরাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। তারাই তার প্রতিবাদ করেছে। কেননা তাতে করে ধর্মনিরপেক্ষবাদের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চালানোর প্রচেষ্টা সফল হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। আর তা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছিল। কেননা এরা ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধ অনুসারী। আর তথায় বহুদিন পূর্বেই রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বহিষ্কৃত এবং রাষ্ট্র ধর্মচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

আজ একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক শক্তি আরব ও মুসলিম জাহান থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু পশ্চাতে রেখে গেছে তাদের অসংখ্য একনিষ্ঠ শিষ্য শাগরিদ। তাদেরকে তারা নিজেদের মতই গড়ে তুলেছিল, তাদের চোখের সামনে তাদের বিশেষ ও যত্ন লালনে তাদেরকে তাদের প্রতিনিধিত্বের গুণে গুণান্বিত করে গড়েছিল। তাদের নাস্তিক্যবাদী দর্শন, সংস্কৃতি ও চিন্তা-বিশ্বাসের খাঁটি দুগ্ধ তাদের সেবন করিয়েছিল। তাদের পরিত্যক্ত আসনে তাদের বসিয়ে দিয়ে তাদের পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত করে—তারা চলে গেছে। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলাম ও তার মূল্যমানকে সম্পূর্ণ অকেজো, পশ্চাদপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য করে। পক্ষান্তরে যা কিছুই পশ্চিম দেশসমূহ থেকে আসে—সে সব দেশে ও সমাজে সম্পূর্ণ পুরাতন ও পরিত্যক্ত হওয়ার পরই আসুক না-কেন—তা-ই আধুনিকতা, অগ্রবর্তিতা, সভ্যতা ও ক্রমোন্নতি বলে বিবেচিত হয় ও সাদরে সযত্নে অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয়।

ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যাকাত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। আমাদের আর্থিক ও সামষ্টিক আইন প্রণয়নে ও পরিকল্পনা রচনায় তার কোন স্থান—কোন ভূমিকাই স্বীকৃত হচ্ছে না। আর কোন কোন মুসলিম ব্যক্তির এবং কোন কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের অবিরাম চেষ্টা কার্যকর না থাকলে মুসলিম জীবন থেকে তা সম্পূর্ণরূপে যে বিলীন, নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

যাকাতের ব্যাপারে ইসলামী সরকারের দায়িত্ব

সত্যি কথা—যাতে কোন সংশয় নেই, মতপার্থক্য নেই—হচ্ছে, যাকাত একটি ইসলামী ফরয, দ্বীন-ইসলামে তার স্থান অতিশয় পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম মানসে তার গুরুত্ব তীব্রভাবে স্বীকৃত। তাদের জীবনে ইতিহাসে তার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য ধার্যকৃত কর-এর পাশাপাশি যাকাতও স্থায়ী হয়ে থাকবে তার স্ব-নামে, স্ব-পরিচিতিতে, স্ব-পরিমাণ ও স্ব-ব্যয় খাতসমূহ সহকারে। তা কখনই পরিত্যক্ত হতে পারে না। সরকার অন্যান্য সাধারণ ব্যয়ভার বহনের জন্যে যে কর ধার্য করে—ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যয়ের বাজেট অনুযায়ী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে, তা থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

এ যুগের ইসলামী বিধানভিত্তিক প্রত্যেকটি সরকারকে যাকাতের ব্যাপারে বিশেষ

দায়িত্বশীল ও কর্মতৎপর হতে হবে। সর্বত্র এমন একটা প্রতিষ্ঠান, কল্যাণ ব্যবস্থা যা ফাউণ্ডেশন গড়ে তোলা আবশ্যক—নাম তার যা-ই দেয়া হোক—যা আল্লাহ্‌র বিধান হিসেবেই যাকাত সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্‌র শরীয়াত নির্দেশিত পথে ও পন্থায় তা ব্যয় ও বন্টন করার দায়িত্ব পালন করবে। এ বাবদ সংগৃহীত সম্পদ স্বতন্ত্র মর্যাদায় রাখতে হবে। অন্যান্য খাতের জন্যে সংগৃহীত অর্থ বা সম্পদের সাথে তা জড়িত বা মিশ্রিত হতে পারবে না। সাধারণ বাজেটে শামিল হয়ে গিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হতেও দেয়া যাবে না।

সর্বশেষ কথা, শরীয়াতের ফিকাহবিদ ও অর্থনীতিবিদ, সাংগঠনিক পারদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটা সূক্ষ্ম কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের কর ও ফরয যাকাতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। তারা উভয়ের সংমিশ্রণ ও অরাজকতা প্রতিরোধ করবে। অবস্থা যেন এমন না হতে পারে যে, দ্বীনদার মুসলমান তো এককভাবে যাকাতের বোঝা বহন করতে বাধ্য হবে, আর দ্বীনী দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত নয় এমন মুসলমানরা যাকাত আদায়ের বাধ্যাবাধকতা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

ইসলামের দিকে অগ্রগতি গ্রহণকারী রাষ্ট্রমাত্রের জন্যেই এটা একান্ত পালনীয় ফরয। গোটা মুসলিম জাতিরও তা-ই কর্তব্য—তা পালন করতে হবে তার প্রতিনিধি সভা বা সংসদের মাধ্যমে যাকাত আদায়কারী বন্টনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে।

এটা কেবল যাকাতের বেলায়ই কর্তব্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী শরীয়াতের প্রতিটি বিধান বাস্তবায়িত করার জন্যেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।

সরকার যাকাত না নিলে ব্যক্তির দায়িত্ব কি

সরকার যদি যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্ব পালন না করে—অন্য কথায়, সরকার যদি ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণ করে না চলে যাকাত আদায় ও বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর না করে, সরকার যদি ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও ইসলামী শরীয়াতকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী হয়, যাকাতকে তার হিসেবের খাতা থেকে সম্পূর্ণ বর্জন ও বহিষ্কার করে দেয় এবং নিজ ইচ্ছেমত কর ধার্যকরণের ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়, তবে তার দ্বারাই যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে ও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী কার্যাদি সম্পন্ন করে—যেমন আধুনিককালের রাষ্ট্রগুলো করছে, তা হলে এখানে এ প্রশ্নটি তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে, মুসলিম ব্যক্তিকে যেখানে বহু প্রকারের কর দিতে হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তাকে যাকাত দিয়ে যেতে হবে কিংবা এ সব কর দেয়ার মাধ্যমে যাকাত আদায় করা হয়ে যাবে ও আলাদাভাবে যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে? দেবার সময় যাকাতের নিয়ত করলেই কি তা যথেষ্ট হবে না যাকাত আদায়ের জন্যে?... তাহলেই না মুসলিম ব্যক্তি একই মাল থেকে দুই ধরনের অধিকার দেয়ার দায়িত্ব ও ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

কর দিয়েই যাকাতের দায়িত্ব থেকে মুক্তির ফতোয়া

এখানে একটি ফতোয়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন কোন যুগে কোন কোন ফিকাহবিদের দেয়া ফতোয়ার সাথে তার মিল রয়েছে। আর তা হচ্ছে, হ্যাঁ, কর দিয়েই যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে—

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য মত হচ্ছে ইমাম নববীর। তিনি লিখেছেন ঃ শাফেয়ী ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, জুলুমস্বরূপ যে খারাজ গৃহীত হয়, তা ওশর-এর বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। শাসক যদি তা ওশর-এর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তাতে ফরয ওশর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। সহীহ কথা হচ্ছে, তাতে ফরয খারাজ আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি হবে। কিন্তু তাতে যদি ওশর পরিমাণের কম দেয়া হয়, তাহলে অবশিষ্ট্যটা দিতে হবে।[১]

কথাটি বোঝা গেল এভাবে যে, ওশরী জমি থেকে—যার ওপর ওশর ফরয যাকাতরূপে ধার্য হয়েছে—যদি খারাজ নেয়া হয় ফরয ওশরের বিকল্প হিসেবে, তাহলে যে সব মালে যাকাত ফরয হয়, তা থেকে কর গ্রহণের মতই অবস্থাটা দাঁড়াবে এ হিসেবে যে, তা যাকাতের বিকল্প, যাকাত দেয়ার প্রয়োজন পূরণকারী। আর যে খারাজ বা করই সাধারণ জনকল্যাণে ব্যয়িত হবে, তা সবই সমাজ সমষ্টির জন্যে।

কিন্তু এরূপ ধারণার ওপর প্রশ্ন জাগে যে, সরকার প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে যে করাদি গ্রহণ করে, তা যাকাতের বিকল্প কিছুতেই গণ্য হতে পারে না। এজন্যেই তো তা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকেই গৃহীত হয়ে থাকে এবং তা ব্যয় করা হয় এমন সাধারণ খাতসমূহে, যার অনেকটাই যাকাতের খাত নয় নিশ্চিতভাবেই।

হাম্বলী মাযহাবের কিতাবসমূহে ইমাম আহমদ থেকে যে কথাটির উল্লেখ হয়েছে, তা প্রায় এরকমই। তা হচ্ছে, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে চুক্তিবদ্ধ জমি থেকে সরকার অর্ধেক ফসল নিয়ে নেয়, তার সম্পর্কে কি হুকুম ? তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'সরকারের এরূপ নেয়ার অধিকার নেই, এটা জুলুম।' তাঁকে বলা হল, 'জমির মালিকের হাতে যে ফসল অবশিষ্ট থকে, তার যাকাত সে দেবে ?' বললেন, 'সরকার যা নিচ্ছে, তা-ই যাকাতের বিকল্প গণ্য হবে অর্থাৎ মালিক যদি তার নিয়ত করে।'[২]

এ পর্যায়ে ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধান যা কর-এর নামে নিচ্ছে, তা-ই যাকাতের নিয়তে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। যাকাতের দায়িত্ব চলে যাবে, যদিও ঠিক যাকাত হিসেবে নেয়া হয় না।[৩]

---

১. المجموع ج ٥ ص ٥٤١ - ٥٤٢

২. شرح غاية المنتهى ج ٢ ص ١٣٢

৩. ইমাম আহমাদ এ কথাটি মুহাম্মাদ আল মনসুর রচিত الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة গ্রন্থের ১মখণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করেছেন (ط المكتب الاسلامى بدمشق)

এ কথাটির সাথে স্মরণীয়, ইমাম তাঁর ফতোয়ায় যা স্পষ্ট করে লিখেছেন, তা উপরোদ্ধৃত কথার সাথে সাংঘর্ষিক। ফতোয়ায় লিখেছেন ঃ রাষ্ট্রের শাসক-প্রশাসকরা যাকাতের নাম না নিয়ে যা কিছু নিচ্ছে, তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না।[১]

এক্ষণে বিবেচ্য ও যাচাই করার যোগ্য—এ দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে কোন্‌টি অধিক সহীহ এবং প্রমাণিত। যদি দুটিই সহীহ প্রমাণত হয়, তাহলে প্রশ্ন কোন্‌টি তাঁর শেষ পর্যায়ের কথা?

ব্যাপার যা-ই হোক এ একটা বিশেষ ফতোয়া। বহু ফিকাহবিদ নিজ নিজ সময়ে লোকদেরকে তদানুযায়ী ফতোয়া দিতে বাধ্য হয়েছেন,—যেন মুসলমানদের কষ্ট দূর হয়ে যায়। তাদের ওপর এমন দায়িত্ব চাপানো না হয়, যা তাদের পৃষ্ঠকে ন্যুব্জ করে দেবে। আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি সহজ করেই বিধান করতে চেয়েছে, কঠোরতা ও কষ্ট আরোপ করতে চান নি। এ ফতোয়া সম্পর্কে এটা লক্ষ্যণীয় যে, তার ভিত্তি রাখা হয়েছে এমন সব কর ও مكس-এর ওপর যা শাসক জুলুম করেও না-হকভাবে নিয়ে থাকে। এ কারণে ফতোয়াদাতা তা দেয়ার সময় যাকাত দিচ্ছে বলে মনে করলে যাকাত হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এরূপ নিয়ত করা জরুরী বলেছেন। মনে করেছেন, এতে করে তাদের ওপর বোঝা হালকা হবে, তারা রাগ হতে পারে এবং মুসলমানদের ওপর থেকে জুলুম প্রতিরোধ করা হবে।

কিন্তু আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয়ে ধরে নিচ্ছি, আমরা কথা বলছি সুবিচারমূলক কর সম্পর্কে, যা একালে একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার বহনের জন্যে।

শরীয়তে অনুসৃত মাযহাবগুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যা বলেছি তা থেকে বোঝা যায় সে সব কর, যা লোকদের ওপর চাপানো হয় 'নাওয়ায়েব' نوائب নামে; কি খারাজ বা সরকার আরোপিত কর প্রভৃতির নামে তা বাধ্যতামূলক ব্যাপার, তা এমন একটা ঋণ যা ফেরত পাওয়ার অধিকারী—ফরয যাকাতের পাশাপাশি। অতএব তা যাকাতের বিকল্প নয়, তা যাকাতের বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত করে না, তা যাকাতের বদলে আরোপিত বলেও গণ্য নয়।

অধিকাংশ আলিম কর বা مكس -কে যাকাত পর্যায়ের মনে করেন না

জমহুর আলিমগণ مكس -কে কখনই এবং কোন অবস্থায়ই যাকাত পর্যায়ের জিনিস বলে মনে করেন না। মুসলমানদের মধ্য থেকে যে লোক এ مكس ধার্য করে কিংবা তা জায়েয বলে ফতোয়া দেয়, তার ওপর তাঁরা কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আল হায়সামী শাফেয়ী কৃত الزواجر। গ্রন্থে রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

---

১. مجموع الفتاوى ج ٢ ص ٩٣ ط الرياض

ইবনে হাজার হায়সামীর বক্তব্য

‘জেনে রাখ, কোন কোন ফাসিক ব্যবসায়ী মনে করে যে, তাদের কাছ থেকে শুল্ক ইত্যাদি কর বাবদ যা কিছু নেয়া হয়, তাতেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে—যদি তার নিয়ত করা হয়,—এ ধারণাটা সম্পূর্ণ বাতিল। শাফেয়ী মাযহাবে এর কোন সনদ নেই। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান শুল্ক আদায়কারীদেরকে যাদের ওপর যাকাত ফরয কেবল তাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের কাজে নিযুক্ত করেনি। তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে عشور গ্রহণের জন্যে, তা যে মালেরই তারা পাক—পরিমাণ কম হোক কি বেশী—তাতে যাকাত ফরয হোক, আর না-ই হোক। ধারণা করা হয়েছে যে, তাদেরকে তা গ্রহণের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে মুসলমানদের কল্যাণে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ওপর ব্যয় করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে এ ধারণা প্রযোজ্য নয়। কেননা আমরা যদি ধরে নিই যে, তা তার শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বায়তুলমালে কিছুই থাকবে না যখন, রাষ্ট্রপ্রধান ধনীদের কাছ থেকে মাল নিতে বাধ্য হবে, এ অবস্থাও তা ফরয যাকাত প্রত্যাহকারী নয়। কেননা তা যাকাতের নামে গ্রহণ করা হয়নি।

কোন কোন ব্যবসায়ী আমাকে বলেছে, কর আদায়কারীকে মাল দেয়ার সময় যদি নিয়ত করে যে, তা যাকাত বাবদ দিচ্ছে, তা হলে مكس আদায়কারীকে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। তা সে অন্যকে দিয়ে সেই জিনিসকেও বিনষ্ট করবে। এ কথাটিও আলোচ্য বিষয়ে কোন ফায়দা দিচ্ছে না। কেননা কর আদায়কারী এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের মধ্যে যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক পাওয়ার তো কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা তাদের সবাইর শিল্প কারখানা গড়া বিপুল উপার্জন করার ক্ষমতা রয়েছে। তাদের শক্তি আছে, জোর প্রয়োগ করতে পারে, তারা যদি হালাল উপার্জনে তাদের শ্রম নিয়োগ করে, তাহলে তারা এ নির্লজ্জ বীভৎস কুশ্রী কাজ থেকে বেঁচে যেতে পারে। এরূপ যাদের অবস্থা, তাদেরকে কি করে যাকাত দেয়া যেতে পারে—তারা তা নিতেই বা পারে কিভাবে ? কিন্তু ব্যবসায়ীদের ধন-মালের প্রেম তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সত্য তারা দেখতে পায় না। শুনতে পায় না তারা সে সব কথা, যা তাদের দ্বীনের দিক দিয়ে তাদেরকে কল্যাণ দিতে পারে—শয়তানের ফেরেবে পড়ে ভুলে গেছে তারা। শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এই বলে যে, এই মাল তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ও জুলুমমূলকভাবে নেয়া হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় তারা যাকাত দেবে কিভাবে ? আল্লাহ যে তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, তা তারা হয়ত টেরই পায়নি। তাই তারা তা খুব সহজ ও বৈধভাবে না দিয়ে দিলে তারা এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। আর তারা যে নির্যাতিত হয়েছে, সে জন্যে তাদের নামে অনেক নেকী লিখিত হওয়ার এবং তাদের মর্যাদা উচ্চ হওয়াই যথেষ্ট হবে।

আলিমগণ এসব কর আদায়কারীদের চোর ডাকাত বলে—বরং তার চাইতেও খারাপভাবে অভিহিত করেছেন ঃ কোন ডাকাত যদি তোমার মাল নেয়, আর তুমি নিয়ত কর যে, যাকাত দিলাম, তা হলে তাতে আদৌ কোন ফায়দা হবে কি? এটা যখন

তোমাকে কোন ফায়দা দেবে না, কোন জিনিস তোমার বাড়িয়েও দেবে না, তখন সে বিষয়ে সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল।

যেসব মূর্খ লোক মনে করে যে, জোরপূর্বক কর আদায়কারীদেরকে টাকা দিয়ে যাকাত দেয়ার নিয়ত করা হলে তা যাকাত বাবদই গৃহীত হবে, আলিমগণ তীব্র ভাষায় তাদের মন্দ বলেছেন। এ কথাটির প্রতিবাদে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রমাণে তাঁরা দীর্ঘ আলোচনাও করেছেন। বাস্তবিকই উক্তরূপ মতের লোক নিশ্চয়ই মূর্খ, তাদের কথা না বলাই মঙ্গল। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অতএব চিন্তা-বিবেচনা কর, আল্লাহ তোমাকে সমৃদ্ধ করবেন।[১]

ইবনে আবেদীনের বক্তব্য

হানাফী ফিকাহবিদ ইবনে আবেদীন তাঁর الدر المختار -এর ওপর লিখিত হাশিয়ায় ইবনে হাজারের কিছু কথা উদ্ধৃত করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন ঃ 'তবে জুলুমমূলক কর গ্রহণকারী রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এমন জিনিস দিয়ে যা সে তাকেই দেয় এবং নিজের আমলনামায় জুলুম ও আল্লাহ বিরোধিতা লিখিয়ে নেয়। ব্যবসায়ী তার বা অপর কোন অনুরূপ কর গ্রহণকারীর কাছে যাতায়াত করে, একই বছরে বহু কয়বার তা গ্রহণ করে, যদিও তার ওপর যাকাত ফরয হয়নি। এ থেকে এ-ও জানা গেল যে, তা হানাফীদের কাছে যাকাত বলে গণ্য হবে না। কেননা সে তো সেই দশমাংশ গ্রহণকারী নয়, যাকে রাষ্ট্র-প্রধান পথের ওপর কর্মে নিযুক্ত করেছেন যাকাত গ্রহণের উদ্দেশ্যে। ... বাজ্জাবিয়া উদ্ধৃত করেছেন ঃ مكس কে যাকাতরূপে নিয়ত করা হলে—সত্যি কথা এই যে, তাতে যাকাত দেয়া হবে না। ইমাম সরখসীও তাই বলেছেন।

ইবনে আবেদীন সহীহভাবে এ কথাটির দিকে ইশারা করেছেন যে, مكس দেয়ার সময় তা مكس আদায়কারীকে দান বলে নিয়ত করলে তা জায়েয হবে। কেননা সে তো ফকীর এজন্যে যে, তার ওপর অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে।'[২]

শায়খ আলী শের ফতোয়া

শায়খ আলী শের মালিকী মাযহাব অনুযায়ী দেয়া ফতোয়ায় লিখিত হয়েছে ঃ যে লোক গবাদি পশুর নিসাব সংখ্যকের মালিক, সে তার বিষয়ে ফতোয়া চেয়েছিলেন। প্রশাসক তার ওপর প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা ধার্য করে দিয়েছিল। তা সে নিয়ে নিত যাকাতের নাম না করেই। এরূপ অবস্থায় কি তা যাকাত বলে নিয়ত করা শোভন ও সমীচীন হবে? এবং যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কি যাবে না? শায়খ জবাবে বলেছেন ঃ না, তাতে তার যাকাতের নিয়ত করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে

---

১. الزواجر عن اتتراف الكبائر لابن حجر الهيثمى ج ١ ص ١٤٩

২. حاشية ردالمختار ج ٢ ص ٤٢

না। আর তার নিয়ত করলেও তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে না—নাচেরুল্লাকানী ও আল-হাত্তাব এরূপই ফতোয়া দিয়েছেন।[১]

সাইয়্যেদ রশীদ রিজার ফতোয়া

তদানীন্তন ভারতীয় কোন মুসলমান ভারতে ইংরেজ শাসকরা জমিবাবদ যা আদায় করে—তার ফসলের অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ—তা শরীয়াত অনুযায়ী ফরযস্বরূপ দেয় বলে গণ্য করা যাবে কিনা, এ বিষয়ে মিসরীয় মনীষী সাইয়্যেদ রশীদ রিজাকে প্রশ্ন করেছিলেন। স্মরণীয় যে, শরীয়াত মত তো দেয়া হচ্ছে ওশর কিংবা অর্ধ-ওশর।

সাইয়্যেদ রিজা তাঁর জবাব আল-মানার[২] পত্রিকায় নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছিলেনঃ

'জমির ফসলের ওশর বা অর্ধ-ওশর—যা ফরয হয়, তা যাকাত পর্যায়ের মাল। তা কুরআন ঘোষিত আটটি খাতে বা যে কয়টি পাওয়া যায়, তাতে ব্যয় করা ফরয। দারুল-ইসলামে কোন সরকারী কর্মচারী তা গ্রহণ করে থাকলে তাতে জমির মালিক তা থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। তখন রাষ্ট্র প্রধানের বা তার কর্মচারীর দায়িত্ব হবে তা পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে ব্যয় বা বণ্টন করা। আর সরকারী কর্মচারী যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে মালিকের কর্তব্য হবে আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক তা যথাস্থানে স্থাপন করা। আর খৃস্টান শাসক বা অন্য কেউ বিজিত জমি থেকে যা নেয়, তা কররূপ গণ্য হবে, তা দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে না—যাকাত দেয়ার দায়িত্ব পালিত হবে না। অতএব মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, অবশিষ্ট ফসল থেকে তার শর্তানুযায়ী যাকাত আদায় করে দেয়া।[৩]

এ ফতোয়ার সাক্ষী হচ্ছে শায়খের কথা—যদিও তা অমুসলিম শাসকের গ্রহণের ব্যাপার বলা হয়েছিল। কথাটি হচ্ছে, খৃস্টান ও অন্যান্যরা যা নেয়, তা কররূপে গণ্য হবে, তাতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে না। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, যা কর পর্যায়ের, তা কখনই যাকাত গণ্য হবে না।

শায়খ শালতুতের ফতোয়া

প্রাক্তন শায়খুল-আজহার শায়খ শালতুতকে অন্যায়ভাবে ধার্য করা কর বাবদ দেয়া সম্পদকে যাকাত গণ্য করা যায় কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি এ প্রশ্নের খুব সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে রহমত দান করুন—তিনি যাকাতের নিগূঢ় সত্যতা পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করার পর বলেছেন, যাকাত কোন কর পর্যায়ের নয়, তা সব কিছুর পূর্বে একটা আর্থিক ইবাদত বিশেষ। তবে এটা সত্য যে, কোন কোন দিক দিয়ে তার ও কর-এর মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তা অনেকগুলো দিক দিয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। প্রথম আইনগত উৎসের দিক দিয়েই তা ভিন্ন জিনিস। ফরয হওয়ার ভিত্তির দিক দিয়েও তা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও

---

১. فتح العلى المالك ج ١ ص ١٣٩ - ١٤٠. ২. ج ٧ - ١٩.٤ ع ص ٥٧٦
৩. فتاوى الامام محمد رشيد رضا ج ١ ص ٢٢٩ - ٢٣٠.

উভয়ের মধ্যে কোন মিল নেই। হার ও পরিমাণের ক্ষেত্রেও পূর্ণ বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ব্যয়ের ক্ষেত্রও উভয়ের আলাদা আলাদা। ... এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যেমন আমরা বর্ণনা করেছি।

পরে বলেছেন, যাকাত যখন স্বয়ং আল্লাহ্ প্রবর্তিত একটা ঈমানী ফরয বিশেষ, তার প্রয়োজন দেখা দিক আর না-ই দিক, তা আদায় করা ফরয। এরূপ অবস্থায় তা ফকীর মিসকীনদের জন্যে একটা স্থায়ী আয়ের উৎস সমতুল্য। কোন জাতি বা উম্মত কখনই ফকীর-মিসকীন শূন্য হয় না। পক্ষান্তরে কর হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত। তাই একথা স্পষ্ট যে, দু'য়ের একটা অপরটার জন্যে যথেষ্ট নয়। আইনগত উৎসের দিক দিয়েও এ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হক। আর লক্ষ্য পরিমাণ, স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বের দিক দিয়েও দুটি এক নয়।

এ কারণে কর দেয়া তো বাধ্যতামূলক কর্তব্য। তা এমন একটা ঋণ পর্যায়ের যা নিয়ে ধন-মাল মশগুল হয়। যা অবশিষ্ট তা যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় এবং তাতে যাকাতের শর্তাদি পুরাপুরি বাস্তবায়িত হয়—তা হচ্ছে মৌল প্রয়োজন পূরণ থেকে অবসর পাওয়া এবং তার ওপর যদি একটা বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহলে তার যাকাত দেয়া একটা দ্বীনী ফরয হয়ে দাঁড়ায়।

জনগণের ওপর যে কর ধার্য হয়, তাতে মানুষ নিজেদেরকে নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত মনে করে। কেননা তৎলব্ধ সম্পদ ফকীর মিসকীনরা আল্লাহ্র ধার্য করা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে লাভ করে না। তার পথ হচ্ছে সরকারের অর্থনৈতিক দাবি, যা তার বিশেষ ব্যয়ক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে। তার হিসেবে-নিকেশ ও তার সংগ্রহ ও ব্যয়ের পথে চলবে।

আর সরকার কর্তৃক তার সাধারণ কার্যক্রমের হিসেব গ্রহণের ব্যাপারটি সম্পর্কে ইসলামের মৌল নীতিসমূহ সাক্ষ্য দেয়। তাতে সাধারণ সামষ্টিক কল্যাণ সাধিত হয়। দ্বীন-ইসলাম তাকে প্রথম স্থানে বসিয়েছে।[১]

শায়খ আবূ জুহরার অভিমত

শায়খ আবূ জুহরা তাঁর تنظيم الاسلام للمجتمع গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়টি—যাকাতের সাথে কর-এর সম্পর্ক—শামিল করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

কোন কোন আলোচনাকারী এ চিন্তাটি তুলে ধরেছেন ঃ যাকাত কি ওসব কর-এর সাথে চিরকালই ফরয হয়ে থাকবে?

তার জবাবে তিনি বলেছেন ঃ আমরা বলব, এ সব কর এখানকার সময় পর্যন্ত সামষ্টিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে কোন মূল্যবান পরিমাণ আলাদা করে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়নি অথচ যাকাতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে সামষ্টিক অভাব মেটানো। তা সব কিছুর পূর্বেই কাম্য। কোন কোন কর অবশ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়;

---

১. الفتاوى ص ١١٦-١١٨

কিন্তু কর যে স্থায়ীভাবেই থাকবে, তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। এ-ও সন্দেহাতীত কথা। কেননা আজ পর্যন্ত তা ফকীর মিসকীনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনি অথচ তা পূরণ হওয়া আবশ্যক।[১]

শায়খ আবূ জুহরার এ জবাবে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেননা তাঁর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি হয়ত মনে করেন, কর যদি তার একটা বিশেষ মূল্যবান অংশ সামষ্টিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ফকীর-মিসকীনের প্রয়োজন মিটে যায়, তা হলে আর যাকাত দেয়া প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না।

অথচ প্রকৃত কথা হচ্ছে, যাকাতকে কোন কিছুই প্রত্যাহার করাতে পারে না। কোন জিনিসই তার বিকল্প হতে—তার প্রয়োজন খতম করতে পারে না। তা মহান আল্লাহ্র ধার্য করা বিশেষ ফরয। বান্দারা তা বাতিলও করতে পারে না, তাকে অচল করেও রাখতে পারে না। যাকাত তার নামে তার নিয়ম-কানুন সহকারে, তার পরিমাণ ও শর্ত অনুযায়ী আদায় হতে হবে এবং আল্লাহ্র নির্দিষ্ট করা খাতসমূহেই তা ব্যয় হতে হবে, যা তাঁর কিতাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

আমরা যদি এমন একটা দেশ বা স্থানের কথা মনে করি যার ধন ঐশ্বর্যের বিপুলতা ও উৎপাদনের আধিক্যের কারণে গরীব জনগণও সচ্ছল হয়ে গেছে—অন্যান্য কারণেও তা হতে পারে—তাহলেও সেখানে ধনী মুসলমানদের কাছ থেকে 'আল্লাহ্র পথে, আল্লাহ্র বাণী প্রচার এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি লোকদের মন আকৃষ্ট করার কাজে ব্যয় করার লক্ষ্যে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। কোন অবস্থায়ই তা প্রত্যাহৃত হবে না।

তার একটা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন সরকার যদি করলব্ধ সম্পদ থেকে একটা বিরাট পরিমাণ সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলেও সেখানে যাকাত কিছুমাত্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে না। কেননা তা একটা ইবাদত সুনির্দিষ্ট নিদর্শন বিশেষ।

অতএব যাকাত চিরকালই কার্যকর থাকবে, থাকবে যদ্দিন এ পৃথিবীতে কুরআন মজীদ থাকবে—কুরআন মুসলমান মাত্রকেই সম্বোধন করে বলতে থাকবে ঃ

اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ -

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও।

সম্ভবত শায়খ আবূ জুহরা খুব তাড়াহুড়া করে প্রশ্নের জবাব লিখেছেন। তিনি তাঁর উক্ত কথার গভীর তত্ত্ব ও তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য দিতে পারেন নি।

সার কথা

শায়খ শালতুত এবং তাঁর পূর্ববর্তী আলিমগণের ফতোয়া ঃ 'কর যাকাতের বিকল্প

---

১. تنظيم الاسلام للمجتمع ص ١٦٥

হতে পারে না'—ফতোয়াদাতা ও ফতোয়াপ্রার্থী সকলেরই জন্যে সান্ত্বনাদায়ক। কেননা তাতে সহীহ্ শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি বাস্তবায়িত। তা সর্বাবস্থায়ই মুসলিম ব্যক্তির দ্বীনদারীর পক্ষে সর্বাধিক নিরাপদ মত। সেই সাথে এ ফরযটি স্থায়িত্বেরও নিয়ামক। মুসলমানদের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক রক্ষার জন্যে তা অধিক কার্যকর। কর-এর নামে এ ফরযের কথা কখনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। হাওয়া তা উড়িয়ে নিতে পারে না।

অবশ্য একথা সত্য যে, মুসলমানদের এতে খুব বেশী কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করতে হয়। অন্যরা যে অর্থনৈতিক বোঝা বহন করে না, মুসলমানকে তা বহন করতে হয়। কিন্তু সেটা তো ঈমানে দাবি। ইসলাম অর্পিত দায়িত্ব। বিশেষ করে ফেতনা-ফাসাদের দিকগুলোতে, যখন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তিও দিশা হারিয়ে ফেলে। এ সময় দ্বীনী ব্যবস্থা ধারণকারী ব্যক্তির অবস্থা হয়—সে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে। সর্বাবস্থায় মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে বিপর্যস্ত অবস্থাকে সুস্থ ও সঠিক করার জন্যে অবিশ্রান্ত কাজ করতে থাকা, জিহাদ করতে থাকা। বেঁকে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক করে গড়ে তোলা—ইসলামী কর্মপন্থার দিকে সবকিছুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, ইসলামী ব্যবস্থা—ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত করা।

তা করা সম্ভব না হলে মুসলিম ব্যক্তি সব সময়ই অর্থনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক ও সামষ্টিক নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে থাকবে। কেননা এখন সে এমন একটা সামাজিক পরিবেশে বসবাস করছে, যেখানে সে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিপদে বিরোধিতার ও আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে। তার হাত ধরে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। এটা একটা সাধারণ ও ব্যাপক মুসিবত—জীবনের সর্বক্ষেত্রে । অথচ ইসলামের দাবি হচ্ছে তার বিশ্বাসীরা সর্বাবস্থায় শরীয়াত পালন করে চলবে, কেবল যাকাতের ব্যাপারেই নয়, সকল ক্ষেত্রে।

মুসলমান যখন দেখবে যে, রাষ্ট্র গরীব-মিসকীনের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং তার চারপাশে যাকাত পাওয়ার যোগ্য কোন অভাবগ্রস্ত মুসলমান বর্তমান নেই,—আমেরিকার মুসলমানদের এ পর্যায়ে গণ্য করা যায়—তবুও সে যেন মনে না করে যে, যাকাত তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কেননা যাকাতের আরও তো বহু কয়টি ব্যয়খাত রয়েছে—যা এরপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে—যেমন ইসলামের দাওয়াত প্রচার ইসলামের দিকে—ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দেয়া, লোকদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা ও রাখা, ইসলামী দাওয়াত প্রচারক সংগঠন এবং ইসলামী কেন্দ্র কায়েম ও পরিচালনা করা। আল্লাহ্র কলেমা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বাস্তব ও সুসংগঠিত জিহাদের সূচনা করা। এগুলো কুরআন ঘোষিত 'আল-মুয়াল্লাফাতু কুলূবহুম' পর্যায়ের ফী সাবলিল্লাহ্ পর্যায়ের কাজ। এসব কাজও যদি কোন দেশে করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে যাকাত নিকটবর্তী কোন দেশে—যেখানে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করা সম্ভব—পাঠিয়ে দিতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া তাঁর পূর্বে নব্বী এবং এ দু'জনের পূর্বে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত

যে সব কথা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, তার সাথে আমাদের বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই, তা আমাদের কালের ব্যাপারও নয়। তা এমন সময়ের কথা, যখন ফরয যাকাত পূর্ণ মর্যাদা সহকারে কার্যকর ছিল। যখন দরুল ইসলামে রাষ্ট্রই যাকাত সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করত এবং জাতির জনগণ সাধারণভাবেই তা দিয়ে দিত। তারা যদি আমাদের একালে হতেন, তাহলে তাঁরা অন্য রকম ফতোয়া দিতেন। কেননা এমন অবস্থা ও কালের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন তাঁরা জমহুর ফিকাহবিদদের সাথেই একাত্মতা প্রকাশ করতেন।

আমাদের ব্যক্তিগণের কাছ থেকে নানা নামে যা কিছু নেয়া হয়, তাকে যদি আমরা যাকাত গণ্য করে অনুমতি দিই তাহলে তো এ দ্বীনী ফরযটির চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়া হবে। আর তাহলে ব্যক্তি জীবনে যাও বা ইসলামের নামচিহ্ন আছে, তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে—সরকারী পর্যায়ে ইসলামী জীবন যেমন করে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলিম জাহানের কোন কালের কোন স্থানের কোন আলিমই তার সাথে একমত হতে পারেন না। والله اعلم

উপসংহার

ইসলামের যাকাত এক অভিনব ও অনন্য ব্যবস্থা

যাকাত সংক্রান্ত এ বিশাল বিস্তারিত আলোচনা থেকে এর বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে লেখা কথাগুলো থেকে আমাদের সম্মুখে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করি যে, ইসলাম মদীনা শরীফ পর্যায়ে যে যাকাত ফরয করেছে এবং তার সীমা, পরিমাণ ও বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে, তা বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এক অভিনব ও অনন্য ব্যবস্থা। কোন আসমানী বিধানেই ইতিপূর্বে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, কোন মানব রচিত মতবাদ বা জীবন বিধানেও তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়ার যাবে না।

যাকাত একটা অর্থনৈতিক বিধান যেমন, তেমনি সামাজিক, সামষ্টিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও দ্বীনী ব্যবস্থা—এক সাথে এ সবই।

যাকাত একটা আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

কেননা তা একটা সুনির্দিষ্ট আর্থিক কর বিশেষ। কখনও তা মাথাপিছু ধার্য হয়—যেমন ফিতরার যাকাত, কখনও ধন-মালের ওপর আরোপিত হয়, মওজুদ মাল ও আমদানীর ওপর। সাধারণ যাকাত ব্যবস্থার এটা নিয়ম। ইসলামে বায়তুলমালের আয়ের উৎস হিসেবে তা একটা চিরন্তন অর্থনৈতিক উৎস। ব্যক্তিদেরকে অভাব-দারিদ্র্য থেকে মুক্তকরণ এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পরিপূরণের জন্যে ব্যয়িত হয়। উপরন্তু তা পুঁজিকরণ এবং ধন-মালের স্বাভাবিক আবর্তন ও উৎপাদনে বিনিয়োগ বন্ধকরণের বিরুদ্ধে এক কার্যকর আঘাত বিশেষ।

তা একটা সামাজিক ব্যবস্থাও। কেননা তা সমাজের লোকদেরকে তাদের প্রকৃত ও সম্ভাব্য অক্ষমতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দানের কাজ করে। আকস্মিক বিপদ ও দুর্দশার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা খুবই কার্যকর। তা লোকদের মধ্যে একটা মানবিক নিরাপত্তা গড়ে তোলে, যেখানে 'আছে'র দলের লোকেরা 'নেই' দলের লোকদেরকে সাহায্য করে। শক্তিশালী দুর্বলের হাত ধরে ওপরে তোলে। মিসকীন, নিঃস্ব পথিক নিরাপত্তা লাভ করে। ধনী ও গরীবের মধ্যকার পার্থক্য-দূরত্ব হ্রাস করে। সক্ষম ও অক্ষমদের মধ্যকার পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতার অগ্নি নির্বাপিত করে। লোকদের মধ্যে যারা পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার কাজ করে এবং তা করতে গিয়ে অনেক আর্থিক ঝুঁকিতে পড়ে যায়, যাকাত ব্যবস্থা তাদের সাহায্য করে এবং তারা সাধারণ কল্যাণের পথে যে ঋণ মাথায় চাপিয়ে নেয়, তা শোধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করে। অনুরূপভাবে বহু প্রকারের সামাজিক সমস্যার সমাধান করে দেয়, তার অতি উচ্চ কল্যাণকর লক্ষ্য বাস্তবায়নে, তার সম্মুখবর্তী পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণ কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করে।

তা একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা

কেননা যাকাতের ব্যাপরে মূল কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রই তা সংগ্রহ ও তার খাতসমূহে বন্টনের জন্যে দায়িত্বশীল। তাতে তাকে সুবিচার ও ন্যায়পরতার নীতি কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করতে হয়। প্রয়োজনসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দান তার দায়িত্বের অনর্ভুক্ত। আর তা করতে হবে এটা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, যা হবে—কুরআনের ভাষায় সংরক্ষক, অভিজ্ঞ, অবহিত। এ ধরনের কর্মচারীও তাতে নিযুক্ত করে নিতে হবে। সরকারের নিজস্ব দায়িত্বে কয়েকটি ক্ষেত্রে যাকাত ব্যয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যেমন 'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' এবং 'ফী সাবীলিল্লাহ'।

তা একটা নৈতিক ব্যবস্থাও

কেননা তার লক্ষ্য হচ্ছে ধনী লোকদের মন-মানসকে ধ্বংসকারী লোভ-কার্পণ্য এবং কলুষিত আত্মম্ভরিতার ময়লা ও আবর্জনা থেকে পবিত্র করা এবং বদান্যতা-দানশীলতা ও কল্যাণ-প্রেমে তাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধতায় ভরপুর করে দেয়া। অন্য লোকদের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতি ও দয়ামায়া সহকারে তাদের সাথে একাত্ম করে তোলা। বঞ্চিতদের অন্তরে যে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তা নির্বাপনে বিরাট কাজ করে এবং অন্য লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে জীবনের মহামূল্য সামগ্রী ও সুখ সম্পদ ভরে দিয়েছেন, তা দেখে তাদের চোখ টাটায়—যাকাত তা শীতল করে দেয়। লোকদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে।

সর্বোপরি তা একটা দ্বীনী ব্যবস্থা

কেননা যাকাত প্রদান করা ঈমানের দিক দিয়ে সাহায্যকারী কর্মসমূহের অন্যতম। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। অতীব কার্যকর একটি ইবাদত, যা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে খুবই শাণিত। কেননা অভাবগ্রস্ত লোককে তা দেয়ার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের প্রতি তার ঈমানকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করা, অল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতকরণে, তাঁর নির্দেশাবলী কার্যকরকরণে তার সাহায্য ও সহযোগিতা করা। কেননা যে দ্বীন এ মহান ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে, সে দ্বীনই তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আইন-বিধান, পরিমাণ ও তার ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও প্রতিভাত করে দিয়েছে। তার একটা অংশ অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব-দারিদ্র্য মোচনে ব্যবহার করার জন্যে নির্দিষ্ট করেছে। তার অপর একটা নির্দিষ্ট করেছে লোকদের হৃদয় সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট করার ও তার সাহায্য করার কাজে ব্যয় করার জন্যে। তার দ্বীনের কালেমা সর্বত্র প্রচার করা এবং পৃথিবীর বুকে দ্বীনের দাওয়াত ও বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োগ করার জন্যে—যেন কোথাও আল্লাহহীন ব্যবস্থা ও আল্লাহ্র শক্তির আনুগত্য ও অধীনতা অবশিষ্ট না থাকে এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীন পুরামাত্রায় কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বস্তুত এ-ই হচ্ছে যাকাত। ইসলামও এ যাকাতকেই জারী ও কার্যকর করেছে শরীয়াতসম্মতভাবে—যদিও আজকের এ শেষ যুগের মুসলমানরা তার এ নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্যের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। তা রীতিমত আদায় করা ছেড়ে দিয়েছে, বহুলোক অবশ্য এ পর্যায়ে এখনও গণ্য নয়; কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের সংখ্যা বেশী নয়।

এ যাকাতই এককভাবে প্রমাণ করেছে যে, এ দ্বীন ও এ শরীয়াত বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্র কাছ থেকেই অবতীর্ণ। উম্মী মুহাম্মাদ (স)-এর কোন সাধ্যই ছিল না নিজস্বভাবে এ একক-অনন্য সুবিচারমূলক জীবন বিধান দুনিয়ায় পেশ করা ও বিশ্বমানবকে তা গ্রহণের জন্যে পথ দেখানো। এ দ্বীন তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল নয়, তাঁর জ্ঞান-তথ্য সমৃদ্ধ বা নিঃসৃত নয়—যদি না আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষভাবে অহীযোগে এ ক্ষমতা ও সুযোগ দিতেন, তাহলে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। আল্লাহ্ই তাঁর প্রতি আয়াত নাযিল করেছেন, লোকদের জন্যে হেদায়েতের বিধান দিয়েছেন, হেদায়েত ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী অকাট্য নিদর্শনাদিও দিয়েছেন। তিনি যা জানতেন না, আল্লাহ্ই তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ছিল আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমত ও অতুলনীয় অনুগ্রহ।

যাকাতের পক্ষে ভিন্নমতের লোকদের সাক্ষ্য

যাকাতের এ তুলনাহীন ব্যবস্থার মাহাত্ম্য এবং মহত্ত্ব বহু মুসলমানই হয়ত বুঝে উঠতে পারছে না। বরং যাকাতকে বিকৃত করেছে এবং ইসলামে বিশ্বাসী বলে দাবি করা সত্ত্বেও যাকাতকে তারা নানাভাবে গালমন্দ করেছে। তারা কিন্তু মুসলমানী নাম যথারীতি বহন করে চলেছে অথচ পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যেও এমন লোক প্রচুর রয়েছে যারা যাকাত ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, মানুষের কল্যাণের জন্যে এরূপ একটা মহান ব্যবস্থা কার্যকরকরণে সারা দুনিয়ার আধুনিক জীবন ব্যবস্থার সর্বাগ্রে ইসলামই যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সে কথাও তাঁরা অকপটে স্বীকার করেছেন।

অরনোল্ড তাঁর ' ইসলামী দাওয়াত' নামের গ্রন্থে ইসলামের প্রধান নিদর্শনাদি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ইসলামী হজ্জ এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, তার মহান লক্ষ্য সম্পন্ন ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উল্লেখ করেছেন। পরে যাকাত সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> হজ্জ ব্যবস্থার পাশাপাশি আমরা আর একটা ফরয কাজ হিসেবে পাচ্ছি যাকাত প্রদান ব্যবস্থা। মুসলমানরা আল্লাহ্র এ কথাটি স্মরণ করে ঃ 'মুমিনরা সব ভাই ভাই' এটি একটা দ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গী, অতি উজ্জ্বলরূপে তা বাস্তবায়িত হয় উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে। তা খুব বিস্ময়করভাবে হালকা বৃষ্টিবর্ষণ করে ইসলামী সমাজের মধ্যে। নও-মুসলিমদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা প্রদর্শনের উজ্জ্বলতর ভূমিকা পালন করে—তার জাতীয়তা, তার বর্ণ, তার পূর্ব বংশ যা-ই হোক না কেন—সে-ই মুমিন

সমাজে সাদরে গৃহীত হয় এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে সমান মর্যাদায় সে উপযুক্ত স্থান লাভ করে।[১]

লিউড্রোশ বলেন ঃ যে দুটো কঠিন সামাজিক সমস্যা গোটা বিশ্বকে জর্জরিত করে তুলেছে, তার সমাধান আমি ইসলামে পেয়েছি। প্রথম—আল্লাহ্র ঘোষণা 'সব মুমিন ভাই ভাই।' সামাজিকভাবে মৌল বিধানের সংক্ষিপ্ত ঘোষণা এটা। আর দ্বিতীয়—প্রত্যেক মালদারের ওপরই যাকাত ফরয করা। এমনি গরীবদেরকে তাদের প্রাপ্য জোরপূর্বক নিয়ে নেয়ার সুযোগ দান—যদি ধনীরা তা দিতে ইচ্ছুক না হয়, দিতে অস্বীকার করে। এটাই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার পন্থা।

অপর একজন বিজাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত গ্রন্থে যাকাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, উস্তাদ কুরদে আলী তা আমাদের জন্যে উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে ঃ

এ 'কর'টি একটা দ্বীনী ফরয কাজ। সকলের পক্ষেই তা দেয়া বাধ্যতামূলক। তা দ্বীনী ফরয হওয়া ছাড়াও যাকাত একটা সামষ্টিক বিধান—সর্বসাধারণ ও নির্বিশেষ। এমন একটা উৎস, মুহাম্মাদী বিধান অনুসারী রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা সম্পদ সংগ্রহ করে এবং তদ্দ্বারা গরীব, মিসকীনকে সাহায্য করে তাদের সচ্ছল বানায়। আর এটা করা হয় একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে, স্বৈরতান্ত্রিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়—নয় কোন অস্থায়ী উড়ন্ত পন্থার মাধ্যমে।'[২]

'এ অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামই প্রথম অবদান রেখেছে। মানব ইতিহাসে সাধারণভাবেই তার ভিত্তি ইসলাম কর্তৃকই সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়েছে। অতএব যাকাত কর, মালিক-ব্যবসায়ী ধনী শ্রেণী লোকদের তা দিতে বাধ্য করা হত, যেন সরকার বা রাষ্ট্র গরীব অক্ষম লোকদের জন্যে ব্যয় করতে পারে। এ ব্যবস্থা সেই প্রাচীরকে ধূলিস্মাৎ ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে, যা একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করত। আর এর দ্বারা সামাজিক সুবিচারের পরিমণ্ডলের গোটা উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এ কারণে ইসলামী ব্যবস্থা প্রমাণ করেছে যে, তা কোন বিদ্বেষ হিংসার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে গঠিত হয়নি।'[৩]

প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ মাসিনিউন-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

দ্বীন ইসলামের জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা তা-ই, যা সাম্যের চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। আর তা করা হয় যাকাত ফরয করার সাহায্যে, যা প্রত্যেক ব্যক্তি বায়তুলমালে জমা করে। তা সুদী ব্যবস্থা ও অপ্রত্যক্ষ করসমূহ—যা জরুরী ও প্রাথমিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ধার্য করা হয়—কে উৎপাটিত

---

১. الدعوة الى الاسلام لتوماس ارنلد ص ٤٥٧ ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن وزميله ص ١٧٦

২. من كتاب الاسلام والجضارة الغربية كرد على مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ط - ثانيه -

৩. ঐ ৭৬-৭৭ পৃ.

করে। সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যবসায়ী মূলধনকে ঠেকিয়ে দেয় আর এর সাহায্যে ইসলাম দ্বিতীয়বার পুঁজিবাদী বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও বলশেভিক কমিউনিস্ট ব্যবস্থার মাঝখানে একটা সম্মানজনক স্থান দখল করে নেয়।[১]

ইটালী লেখিকা ডঃ ফাগৃলীরী তাঁর গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে دفاع عن الاسلام নামে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

'আমি মোটামুটি সব ধর্মে আরোপিত নৈতিক মহান সামাজিক গুরুত্ব—যা সাদকা দান দেয়ার ব্যবস্থা পেশ করেছে—স্বীকার করি এবং আমি তার ভাল দিককে দয়া-অনুগ্রহের বাস্তব ব্যাখ্যা বলে গণ্য করি। কিন্তু ইসলাম সাদকাকে বাধ্যতামূলককরণে একক আদর্শ মর্যাদা ভোগ করেছে—মসীহর শিক্ষাকে। দুনিয়ার ব্যাপারস্বরূপ এবং এখান থেকেই তা বাস্তবায়িত করার দরুন। তাই প্রত্যেকটি মুসলমান তার সম্পদের একটা অংশ ফকির পথিক মিসকীনের কল্যাণের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য। আর এ দ্বীনী ফরয পালন করানোর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির মানবিকতার গভীর অনুভূতির যাচাই করা হয়। তার অন্তর ও আত্মা লোভ-কার্পণ্য থেকে পবিত্র হয় এবং মহান আল্লাহ্র কাছ থেকে শুভ কর্মফল লাভে আশা-আকাঙ্ক্ষার সফলতা পায়।[২]

মুসলিম সমাজ সংস্কারকদের কথা

উপরে প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য মনীষীদের যাকাতের সৌন্দর্য মাহাত্ম্য সংক্রান্ত ইনসাফপূর্ণ কথাসমূহ উদ্ধৃত করেছি। এখন আমরা কতিপয় মুসলিম সমাজ সংস্কারকের কথা উল্লেখ করব। তাঁরা যাকাত সম্পর্কে এ সব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কথা বলেছেন। সম্ভবত এসব কথা থেকে অনেকে হেদায়েত এবং নসীহত লাভ করতে পারবেন।

ইসলামের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করাই যথেষ্ট

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ রশীদ রিজা (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

'যাকাত দেয়া ফরয করার দরুন দ্বীন ইসলাম অন্যান্য সব ধর্ম ও মতের ওপর বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। সারা দুনিয়ার সুধী ও সমজ বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেছেন। মুসলমানরা যদি তাদের দ্বীনের এ রুকনটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, তা হলে আল্লাহ্ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং রিযিকে বিপুল প্রশস্ততা দিয়েছেন—এ সত্ত্বেও যে গরীব লোক পাওয়া যাচ্ছে, তা আদৌ দেখা যেত না। পাওয়া যেত না ভয়াবহ ঋণের ভারে ন্যুজ কোন লোক। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ ফরযটি পালন করা ত্যাগ করেছে। এর দরুন তারা তাদের দ্বীন ও জাতির কাছে মহা অপরাধ করছে। আর এর কারণে তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক দিয়ে দুনিয়ার জাতিসমূহের তুলনায় অত্যন্ত খারাপ এবং নিকৃষ্ট হয়ে আছে। তারা তাদের রাজত্ব

---

১. دفاع عن الاسلام ص ٦٩

২. دفاع عن الاسلام – ص ٦٩

হারিয়েছে, ইজ্জত খুইয়েছে, মর্যাদা হারা হয়েছে। ফলে অপরাপর জাতির ওপর তারা তখন বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে। এমন কি তাদের সন্তানদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করছে। তারা তাদেকে খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি করে দেয় অথবা নাস্তিকদের শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। ফলে তাদের দ্বীনী বিপর্যস্ত হয় দুনিয়াও তাদের বিনষ্ট হয়। তাদের জাতীয় ও মিল্লাতী সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারা বিজাতীয়দের কাছে নিকৃষ্টহীন দাস প্রমাণিত হয়। তাদের যখন বলা হয় ঃ তোমরা ওসব পাদ্রী মিশনারী এবং নাস্তিক কমিউনিস্টদের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল না কেন? তখন তারা বলে ঃ সেজন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। কিন্তু একথা সত্য নয়। আসলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। উচ্চতর সাহস-হিম্মত নেই। আত্মমর্যাদাবোধও তারা হারিয়েছে। ফলে তারা সে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

তারা অন্যান্য জাতির লোকদের দেখে, তারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কল্যাণকর সংস্থা-সমিতি ও রাজনীতি গড়ে তুলছে, যা করতে তাদের ধর্ম তাদের বাধ্য করছে না। তাদের বিবেক-বুদ্ধি, জাতিত্ববোধ ও আত্মচেতনাই তাদের এজন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা এসব দেখেও লজ্জাবোধ করছে না। তারা ওসব জাতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতেই ভালবাসে। এরা এদের দ্বীন পরিহার করেছে, ফলে তারা দুনিয়াও হারিয়েছে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে ভুলে গেছে তারা নিজেদেরকেও। এরাই হচ্ছে নীতি সীমালংঘনকারী লোক।

অতএব মুসলিম সমাজ সংস্কারকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের দ্বীনদারী ও মর্যাদাবোধের যতটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, তার থেকেই সংশোধনী প্রচেষ্টার সূচনা করা। এজন্যে যাকাত সংগ্রহ করার এবং সর্বাগ্রে এ সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের অবস্থার সংশোধন এবং তাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে সর্বপ্রথম ব্যয় করা কর্তব্য, অন্যদের ব্যাপারে পরে দেখা যাবে। এরূপ একটা সংস্থা গড়ে তোলা ও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যাকাত, 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুবুহুম' খাতের একটা বিশেষ ব্যয় ক্ষেত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ কবলিত জাতিসমূহকে দাসত্বের শৃংখলমুক্ত করা যদি ব্যক্তিদের মুক্ত করার জন্যে ব্যয় করার সুযোগ না থাকে। আর 'সাবীলিল্লাহ' অংশের ব্যয় ক্ষেত্র হচ্ছে ইসলামী জীবন-বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চেষ্টা আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করা। এই জিহাদের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ—কুফরী শক্তির অত্যাচার জুলুম ও নিষ্পেষণ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে। লেখনী ও বক্তৃতা-ভাষণের সাহায্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং ইসলামের ওপর আক্রমণসমূহের সমুচিত জবাব দান ইসলামের প্রতিরক্ষা তার আর একটি ব্যয় ক্ষেত্র। —যখন তরবারি ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে প্রতিরক্ষার কাজ চালানোর কঠিন বা অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে।

জেনে রাখ, সমস্ত মুসলমানদের কিংবা তাদের অধিকাংশের যাকাত দান এবং তা একটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয় করাই ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্যে যথেষ্ট। বরং অন্যরা দারুল ইসলাম থেকে যা কিছু হরণ করে নিয়ে গেছে তা ফিরিয়ে আনা এবং

কাফিরদের দাসত্ব থেকে মুসলমানদের মুক্তিদানের জন্যে এটা একান্তই অপরিহার্য। বস্তুত ধনী লোকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে শুধু ওশর বা ওশরের এক-চতুর্থাংশ দেয়াই যাকাত নয়।

আমরা লক্ষ্য করছি, মুসলমানদের বিশ্বের সেরা জাতি হওয়ার মর্যাদা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এক্ষণে যেসব জাতি মুসলমানদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তারা তাদের জাতি ও মিল্লাতের জন্যে অনেক বেশী ব্যয় ও ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করছে অথচ তা তাদের ওপর তাদের আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ফরয করা হয়নি।[১]

যাকাত উম্মতের কাছ থেকে ও তাদের প্রতি

মরহুম শায়খ মাহমুদ শালতুত—জামে আজহারের প্রাক্তন শায়খ হযরত মুয়ায বর্ণিত হাদীসের ওপর টীকা লিখেছেন, যে হাদীস নবী করীম (স) তাঁকে বলেছেন ঃ

লোকদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধন-মালে তাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই দরিদ্রদের ওপর ব্যয় করা হবে।

এ হাদীসের টীকায় তিনি লিখেছেন ঃ

নবী করীম (স)-এর এ মহান শিক্ষা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত উম্মতের ধনী লোকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের প্রতিনিধিত্বস্বরূপ সে জাতির জন্যেই ব্যয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য কথায় উম্মতের ধন-মাল তাদেরই কিছু লোকদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই অন্যদের জন্যে ব্যয় করা। প্রথম হাত দাতার, আল্লাহ তাকে ধন-মালের সংরক্ষণ, তার প্রবৃদ্ধি সাধন এবং তা দিয়ে কাজ করার জন্যে খলীফা বানিয়েছেন। এটা ধনী লোকদের হাত। আর অন্য হাতটি হচ্ছে শ্রমজীবী কর্মীদের হাত। তাদের শ্রম ও কাজ তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ আয় করতে পারছে না কিংবা কাজ করতেই অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং তার রিযিক ধনীদের ধন-মালে রেখে দেয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে ফকীর-মিসকীনদের হাত।[২]

মুসলিম সমাজে যাকাতের ভূমিকা

ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা আল-মওদূদী যাকাতের দায়িত্ব ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় তার স্থান ও ভূমিকা পর্যায়ে তাঁর اسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصره নামের গ্রন্থে[৩] লিখেছেন ঃ পূর্বে যেমন বলেছি, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম চায় সমাজের কোন স্থানেও যেন ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে না ওঠে। যারা ধন-সম্পদের উত্তম অংশ পাওয়া কিংবা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত যথেষ্ট পরিমাণে লাভ

---

১. تفسير المنار ج ٢٠

২. من كتاب الاسلام عقيدة وشريعة - للشلتوت

৩. اسس الاقتصاد فى الاسلام ص ١٢٨ - ١٣١

করার দরুন সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তারা যেন তা জমা করে না রাখে, তা ব্যয় করা বন্ধ করে না দেয়। বরং তাদের কর্তব্য হচ্ছে তা ব্যয় করা এমনভাবে ও পথে, যার ফলে যারা সমাজের সম্পদ থেকে তার আবর্তন ধারা তাদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেনি তাদের তা পাওয়া সম্ভবপর হয়।

'এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে তার উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা ও প্রভাবশালী আগ্রহ সৃষ্টি ও ভয় প্রদর্শনের সাহায্যে জনগণের মধ্যে বদান্যতা, দানশীলতা ও প্রকৃত সামাজিক সহযোগিতার ভাবধারা জাগিয়ে দিতে চায় যেন মানুষ তাদের প্রকৃতিগত প্রবণতার দরুন ধনসম্পদ একত্রিত ও পুঁজিকরণ থেকে বিরত থাকে এবং নিজেদের থেকেই তা ব্যয় করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর অপরদিকে এমন আইনও রচনা করেছে যা লোকদের ধন-মাল থেকে একটা নির্দিষ্ট ও জানা পরিমাণ নিয়ে নেয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে সমষ্টির কল্যাণ ও সৌভাগ্য গড়ে তোলার জন্যে। এ জানা পরিমাণটা লোকদের কাছ থেকে নেয়া, এটাই যাকাত। আর ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় এ যাকাতের যে কি বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকা উচিত নয়। তা নামাযের পর ইসলামের অধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এমন কি, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, যে লোক ধন-মাল পুঁজি করবে, সে তার যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার জন্যে তা হালাল হবে না। বলেছে ঃ তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত নাও, তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে।[১]

'যাকাত' শব্দটিই বোঝায় যে, মানুষ যে ধন-সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে তাতে অপবিত্রতা ও ময়লা-আবর্জনা রয়েছে, তা থেকে আড়াই পার্সেন্ট সম্পদ প্রতি বছর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তা কখনই পবিত্র হবে না। আল্লাহ নিজে তো মহাসম্পদশালী, তোমাদের ধন—মাল তাঁর কাছে পৌছায় না, তার কোন প্রয়োজনও নেই। তাই 'সাবীলিল্লাহ' হচ্ছে ফকীর-মিসকীনদের সচ্ছল-স্বাচ্ছন্দ্য বানানোর জন্যে চেষ্টা করা, এমন সব কল্যাণকর কাজের উৎকর্ষ সাধন, যার ফায়দাটা জাতির সর্বশ্রেণীর লোকেরাই পাবে। এ কারণে বলেছে ঃ 'যাকাত কেবলমাত্র ফকীর, মিসকীন, তার জন্যে নিয়োজিত কর্মচারী, মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্তদের জন্যে এবং আল্লাহ্‌র পথে ও নিস্বঃ পথিকের জন্যে।[২]

সামাজিক সামষ্টিক সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যে এটাই হচ্ছে মুসলিমদের সংস্থা। সামাজিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে এটাই তাদের ঐক্যবদ্ধতা। আর এটাই তাদের সতর্কতামূলক ধন-মাল।

এ ধন-সম্পদই সমাজের বেকার লোকদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থাপক, তাদের ইয়াতীম, বিধবা, অক্ষম ও রোগাক্রান্ত লোকদের সাহায্য করার জন্যে একটা বড় মাধ্যম। তাদের প্রতি সহানুভূতি জানানোর ও তাদের অবস্থার উন্নয়নের এটা একটা বড় উপায়। সর্বোপরি তা প্রত্যেক মুসলিমের ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে মুক্তির একমাত্র

---

১. التوبه - ١٠٣
২. التوبه - ٦٠

অবলম্বন। অতএব স্বভাবসম্মত ইসলামী নীতি হচ্ছে ঃ তুমি যদি আজ ধনী ব্যক্তি হও, তা হলে অন্যকে সাহায্য কর। তাহলে কাল তুমি যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে তখন সেই 'অন্য লোক' তোমাকে সাহায্য করবে। তাহলে ভবিষ্যতে তুমি যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে, চরম, দুর্গতির মধ্যে পড়ে যাবে এ আশংকায় আজ তোমাকে অস্থির হওয়ার কোন কারণ থাকবে না কিংবা তুমি যখন মরে যাবে—পরকালের মহাযাত্রায় রওয়ানা হয়ে যাবে, তখন তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কি অবস্থা হবে অথবা তোমার ওপর যখন কঠিন বিপদ আপতিত হবে বা তুমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে—তোমার যথাসর্বস্ব জ্বলে পড়ে গেল, কি বন্যায় ভেসে গেল, তখন তুমি কিভাবে মুক্তি পাবে। তুমি যখন বিদেশ সফরে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়বে, তখন তুমি কি করবে, যাকাত তোমাকে এ সব বিপদাশংকা থেকে মুক্তি দিচ্ছে। যাকাত ব্যবস্থা যথাযথভাবে চালু থাকলে কাউকেই এরূপ চিন্তায় কাতর হতে হবে না। চিরদিনের তরে তা থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃত পেয়ে যাবে।

তোমার দায়িত্ব শুধু সঞ্চিত সম্পদের শতকরা আড়াই হারে নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠানে জমা করে দেয়া। তাতেই তুমি সর্বপ্রকারের বিপদ-আপদ—যা তোমার ওপর আসতে পারে—থেকে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। অজ তোমার সম্পদের যে অংশটি তোমার প্রয়োজনীয় নয় তা দিয়ে দাও তাদের, যারা তার মুখাপেক্ষী। তারা তা ব্যয় করবে, নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করবে। পরে তোমার কাছে এ সম্পদই ফিরে আসবে সম্পূর্ণ মাত্রায়। বরং তার তুলনায় অধিক পরিমাণে—যদি তুমি বা তোমার সন্তানরা দরিদ্র হয়ে পড়ে।

এ ব্যবস্থাপনায়ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলনীতি এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলনীতির মধ্যকার পার্থক্য ও বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদের দাবি হচ্ছে, ব্যক্তির সম্পদ পুঁজি করবে, তা সুদে বিনিয়োগ করবে, যেন তা শোষণ করে সমাজের অন্যদের হাতে সমস্ত সম্পদ তার পকেটে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এ তৎপরতা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। ইসলাম তো নির্দেশ দেয়, কোন ঝিলে সম্পদ পুঞ্জিত হলে তা থেকে খাল কেটে তার 'পানি' চারপাশের মৃত ক্ষেত-খামারে প্রবাহিত করতে হবে, যেন তাতে জীবনের পুনরুদ্গাম হয়। পুঁজিবাদে সম্পদের আবর্তন বন্ধ, স্তব্ধ। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় তা উন্মুক্ত। পুঁজিবাদের বদ্ধকূপ থেকে পানি নিতে হলে তোমার কাছে পূর্বে থেকেই পানির 'স্টক' মওজুদ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তুমি কিছুই পেতে পারবে না—কোন অবস্থাতেই; একটা ফোটাও নয়। কিন্তু ইসলামের পানি ভাণ্ডারে মৌল নীতি হচ্ছে, যার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত, 'পানি' রয়েছে সে যেন তা এ ভাণ্ডারে ঢেলে দেয়, তখন যার যার প্রয়োজন সে সে এ ভান্ডার থেকে নিজ নিজ প্রয়োজন মত পানি পেয়ে যাবে—নিতে পারবে। অতএব বাহ্যতঃ এ দুটি ব্যবস্থাই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, পরিপন্থী। এ দুটির মূল ও প্রকৃতি কোন দিক দিয়েই পরস্পরের সাথে একবিন্দু সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এ দুটি ব্যবস্থাকে একত্রিত বা সমন্বিত করতে চেষ্টা করা প্রকৃতপক্ষে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যবস্থাকে একত্রিত করতে চাওয়ার চেষ্টা মাত্র। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোকই তা সম্ভব বলে মনে করতে পারে না।

ইসলামে যাকাতের উজ্জ্বলতম দিক

মহান ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর الاركان الاربعة গ্রন্থে ইসলামী যাকাতের উজ্জ্বলতম দিকসমূহ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'যাকাতের উজ্জ্বলতম ও গভীরতম প্রভাবের দিক—যা এ ফরয কাজটির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, তা হচ্ছে ঈমান ও চেতনার দিক। তা সে প্রাণশক্তি যা সরকার ধার্যকৃত কর থেকে তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী বানায়। তার অপর গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর স্পষ্ট দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ[১]

'যাকাতের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম দিক—যার দরুন যাকাত সেসব কর ইত্যাদি থেকে স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা পায়, যা রাজা-বাদশাহর যুগে, ব্যক্তিগত শাসনের যুগে বা আধুনিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় সরকারের আমলে ধার্য হয়। সূচনা, চূড়ান্ত পরিণতি ও **ফলশ্রুতি—সর্বক্ষেত্রেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দেখা দেয়, তা হচ্ছে, যাকাত শরীয়াত** প্রবর্তিত ব্যবস্থা। রাসূলে করীম (স) তাঁর বিজ্ঞতাপূর্ণ মুজিযার ভাষায় সূক্ষ্ম নবুয়ত বিশ্লেষণে—যাঁকে 'জামেউল কালাম' গণ্য করা হয়—বলেছেন ঃ তা গ্রহণ করা হবে তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে এবং তা ফিরিয়ে দেয়া হবে তাদেরই গরীব লোকদের ওপর।' **শরীয়াত প্রবর্তিত যাকাতের মূল তত্ত্বই হচ্ছে তাই। এ ব্যবস্থা চিরদিনই** চলবে—যদ্দিন না আল্লাহ্ পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরস্থ সবকিছুর উত্তরাধিকারী হচ্ছেন। তা সে সব ধনী লোকের কাছ থেকে আদায় করা হবে, যাদের ওপর তা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ পুরামাত্রায় পাওয়া যাবে, শরীয়াত নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে এবং তা ব্যয় করা হবে আল্লাহ্র নির্ধারিত ব্যয়খাতসমূহে—যা কুরআন শরীফে ঘোষিত হয়েছে, যা কোন মানবীয় বিধান রচয়িতার বা আইন প্রণয়নকারীর রায় বা অভিমতের ওপর নির্ভরশীল হয়নি, কোন মানবীয় প্রশাসক বা আলিম যা প্রবর্তিত করেন নি। কুরআনে উদ্ধৃত আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছে ঃ

انما الصدقات للفقراء ....الخ -

যাকাত কেবলমাত্র ফকীর-মিসকীনদের জন্যে...

শরীয়াত ও নবী করীম (স)-এর হাদীসসমূহ অগ্রাধিকার দিয়েছে এ যকাত স্থানীয় গরীব-মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করাকে, যেখান থেকে তা সংগৃহীত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যাকাত ব্যবস্থা এমনিভাবেই কার্যকর ছিল। সে সব শাসন প্রশাসনেও যা খুব বেশী সূক্ষ্ম বা কঠিন ছিল না, পুরাপুরিভাবে শরীয়াতী বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল বা আমানতদারও ছিল না, শাসন-আইন ও রাজনীতির দিক দিয়ে উচ্চতর ইসলামী আদর্শ হিসেবেও তা গণ্য ছিল না। এ ধরনের রাষ্ট্রের ফকীর-মিসকীনরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডবিধানসমূহও পুরাপুরিভাবে অকেজো

---

১. الاركان الابعة ص ١٢٠ - ١٢١

করে রাখা হয়নি সেখানে।[১] যদিও বহু স্বার্থান্বেষী ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদ পর্যালোচক এসব শাসন ব্যবস্থার নিন্দাবাদে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। তখনকার সময়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যে বহু বিচ্যুতি ঘটেছিল তারও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। বরং ইসলামের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করতেও কসুর করা হয়নি—যেমন তাঁরা সাধারণত করেই থাকেন।

যে সব কর, ট্যাক্স বা কাস্টম ডিউটি—যা আজকের সরকার ধার্য করে থাকে, তা তার বিপরীত। তা যাকাতের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। এ কর যাকাতের বিপরীতমুখী, বিদ্বেষাত্মক—তার তুলনায় ক্ষুদ্র পরিসরও হয় এবং হয় তার চাইতে অনেক বিরাট। তা যেমন গরীব মানুষের কাছ থেকে নেয়া হয়, তেমনি মধ্যবিত্তদের কাছ থেকেও নেয়া হয় এবং ধনী সেরা শ্রেণী ও শক্তিশালী লোকদের কাছে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়। তা সংগ্রহ করা হয় চাষী-কৃষক শ্রমিক-শিল্পীদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা সম্পদ। যে সব ব্যবসায়ী দিন-রাত তাদের ব্যবসায় কেন্দ্রে দোকানে ব্যতিব্যস্ত থেকে অর্থোপার্জন করে, তারাও এ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। এসব অর্থ খুবই উদার হস্তে ব্যয় করা হয়, অত্যন্ত নির্মমভাবে অত্যন্ত বেশী নির্লজ্জভাবে। প্রজাতন্ত্রের প্রধানরা দেশ-বিদেশে বিলাসভ্রমণে গিয়ে সে টাকার অপচয় করেন। এক হাজার এক রাতের স্বাপ্নিক রূপকথার সাথে তুল্য বড় বড় দাওয়াত-জিয়াফতে তা উড়ানো হয়। আর কখনও কখনও যে জাতীয় উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ও তার আলোকসজ্জা-জাঁকজমকে ক্ষয় করা হয়। বিভিন্ন দেশে যেসব রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করা হয় এবং তার যে দূতাবাস খোলা হয় যেখানে মদের বন্যা প্রবাহিত হয়, নারী পুরুষের যৌন নৃত্যের ঝড় ছোটে, তাতে ভেসে যায় তার বিরাট অংশ। সরকারী পর্যায়ে ঝগড়া-বিবাদে জাতীয় আয় নিঃশেষ হয়ে যায়। তার রক্ত শুষে নেয়, জাতির ব্যক্তি ও তার শক্তির মধ্যে এ দ্বন্দ্ব আবর্তিত হতে থাকে, বিদেশী পত্র-পত্রিকায় কৃত্রিম প্রচার-প্রোপাগান্ডায় সাংবাদিক ওকালতিতে উচ্চাঙ্গের প্রচারকদের—যারা সংবাদ রচনায় নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করেন, পক্ষের-বিপক্ষের লোকদের মধ্যে ব্যাখ্যাদানে, সংবাদপত্র যা সেনাবাহিনীর অপেক্ষাও অনেক শক্তিশালী ও উপকারী বলে বিবেচিত—পরিচালনায়, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন-নির্মাণে জনগণের রক্ত পানি করে উপার্জন করা টাকা ব্যয় হয়ে যায়। প্রত্যেকটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জাতির রক্ত শোষণ করে, ব্লটিং কাগজ যেমন শুয়ে নেয় কালি এবং জাতিটিকে ঝগড়া-বিবাদ ও রাজনৈতিক ঘুষ-রিষওয়াতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, সাংবাদিক মিথ্যা প্রবঞ্চনায় পড়ে, অপরাধী ও নিরপরাধ বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলাকরণে পড়ে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে।

এসব কর—আজকের সরকারসমূহ যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে—সম্পর্কে

---

১. বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিত كتاب الخراج তার ভূমিকা বিশেষভাবে আব্বাসী শাসনে খারাজ, যাকাত ও সাদকাত সম্পর্কে যতটা গুরুত্ব সহকারের আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করা হত, তা উপরিউক্ত, কথার স্পষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কিতাবখানি আমিরুল মুমিনীন হারুন রশীদের প্রস্তাবক্রমে লিখিত হয়েছিল।

অধিক সূক্ষ্ম লেখনী চিত্রাংকন এবং পরিচিতি অধিক সত্য প্রকাশক কথা এটাই হতে পারে ঃ

تُوْخَذُ مِنْ فُقَرَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى اَغْنِيَا ئِهِمْ -

গরীব লোকদের কাছ থেকে তা নেয়া হয় এবং তুলে দেয়া হয় তাদেরই ধনী লোকদের হাতে।

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী যাকাত ফরযরূপে ধার্য করেছেন তাঁর সচ্ছল বান্দাদের ওপর গোটা জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও বাৎসল্যস্বরূপ। তা নবুয়তের নিয়ামতের ফসলও বটে, যে নিয়ামতের ওপরে আর কোন নিয়ামত হতে পারে না। এ যাকাতকে যদি প্রয়োজন হয় 'কর' বলার, তাহলে তা পরিমাণের দিক দিয়ে সর্বপ্রকারের কর-এর তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ, অতি সামান্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু বরকত ও প্রতিফলের দিক দিয়ে অতীব বিরাট। ফায়দা অনেক ব্যাপক। কেননা তা 'নেয়া হয় তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে এবং ফিরিয়ে দেয়া হয় তাদেরই গরীবদের হাতে'।

শেষ কথা

আমি এ বিরাট পাঠ উপঢৌকনস্বরূপ উপস্থাপিত করছি দুনিয়ার চিন্তাবিদ এবং অর্থনৈতিক ও কর বিশারদ ব্যক্তিদের সমীপে। তাঁরা এ থেকে জানতে পারবেন, কর ও আধুনিক আর্থিক সংস্থা ও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলাম সর্বাগ্রবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলাম এ যাকাত বিভাগ গড়ে তুলেছে সর্বাগ্রে। তাতে রয়েছে অতীব উত্তম সব মৌল নীতি। তার আইন বিধানসমূহ পুরাপুরিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। তার লক্ষ্য অতুলনীয়—তার নিশ্চয়তা অত্যন্ত শক্তিশালী। অতঃপর তারা যেন তাদের ধর্ম বা মতবাদপ্রদত্ত বিধানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে, বাস্তবভাবে যে পরিস্থিতির মধ্যে তারা জীবন যাপন করছে, তারও যেন যাচাই করে দেখে। তার পরে যেন সে জাতির আকীদা-বিশ্বাসগুলো পর্যবেক্ষণ করে, যাদের জন্যে তারা আইন বিধান রচনা করছে। তারপরে তারা যেন তাদের প্রবর্তিত করসমূহের অগ্রভাগে রাখে এ মহান পবিত্র কর—যাকাত। অতঃপর উর্ধ্বমুখী ও স্থিতিশীল করসমূহের তুলনামূলকভাবে যাচাই করে দেখে।

আমি এ বিরাট অধ্যয়ন উপঢৌকন দিচ্ছি সামষ্টিক গ্রহণকারী ব্যক্তিদের, যেন তারা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানতে পারেন যে, এ ফরযটা মানুষের ইতিহাসের সমাজের অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্যে সর্বপ্রথম সাহায্য ব্যবস্থা, যা সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। না, বরং তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা ও সর্বজনপরিজ্ঞাত অধিকার—মহান আল্লাহ্র ধার্যকৃত ফরয এটাই প্রথম। সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীন দুর্বল অক্ষম অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের ইতিহাস যেমন বলা হয়েছে—সপ্তদশ শতকের পূর্বে শুরু হয়নি—অনুরূপভাবে সামষ্টিক দায়িত্ব গ্রহণ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য প্রবর্তিত নয়, আধুনিক যুগের উদ্ভাবনও নয় তা। আসলে তা একটা ইসলামী ব্যবস্থা। ইসলামই তা মুসলিম ও অমুসলিম সকলেরই জন্যে কার্যকর করেছে।

আমি এ বিরাট বিশাল আলোচনা পেশ করছি একালের বিদগ্ধ ও সংস্কৃতিবান লোকদের সম্মুখে, যাঁরা সুনাম ও সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন আরব দেশ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহে কিংবা যারা ইউরোপীয়, আমেরিকান বা রুশীয়, চীনা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী এবং পরিচিতির দিক দিয়ে ইসলাম ধর্মের ধারক রয়েছেন। আসলে তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। তাঁদের কাছে এ তত্ত্বও থ্যপূর্ণ গ্রন্থ পেশ করছি এ উদ্দেশ্যে, যেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জানত পারেন যে, ইসলা কোন সন্ন্যাসীর মত বা পাদ্রীর গীর্জার ধর্ম নয়। তা দ্বীন এবং রাষ্ট্র উভয়ই। আকীদা-বিশ্বাস এবং জীবন বিধান—এক সাথে ও অবিচ্ছিন্নভাবে। তা যেমন ইলম—জ্ঞ ও বিদ্যা তেমনি বাস্তব কর্মের বিধানও। তা ইহকাল ও পরকালব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন দ্বীন বিধান। তাতে যেমন স্বাধীনতা স্বীকৃত, তেমনি সুবিচার ও ন্যায়পরতাও কার্যকর তাতে একদিকে অধিকার স্বীকৃত, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্যও ঘোষিত। আর তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ যাকাত ব্যবস্থা।

আমি এ গ্রন্থটি উপহার দিচ্ছি দুনিয়ার মুসলিম জাতিসমূহকে—তাদের সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সরকারসমূহকে যেন তাঁরা ইসলামী শরীয়াতের ও ার বিবিধ ব্যবস্থার প্রতি নিজেদের কর্তব্য পুনঃনির্ধারণ করতে পারেন। যাকাত তারমধ্যে প্রধান। এ ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হলে তাদের জীবনে যে বৈপরীত্য ভয়াব ও প্রকট হয়ে রয়েছে তা দূরে হয়ে যাবে। তাদের শাসন সংবিধান ও আইন-কানুনের ক্ষেত্র হতে আইনের সাম্রাজ্যবাদ ও বৈদেশিক দাসত্ব দূরীভূত হবে—যেমন তাদের ওপর থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক সাম্রাজ্যবাদ তিরোহিত হয়েছে এবং তথায় ইসাম পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে তার দ্বীন, তার আইন-কানুন এবং তার কার্যকর ব্যবস্থাপনাসমূহ।

সর্বশেষে আমি এ গ্রন্থখানি উপহার দিচ্ছি ইসলামী ব্যবহারিক আইন-বিধান—ফিকাহ শাস্ত্রে ও ইসলামী সংস্কৃতিতে আত্মনিয়োগকারী লোকদের—যাঁরা ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সচেষ্ট। সম্ভবত তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে তৈরী এ ফিকহী অধ্যয়নে এমন জিনিস পাবেন, যা তাদের ঈমানকে শক্তি ও সমৃদ্ধি দান করবে, এ বিশ্বাস তাদের মনে জন্মাবে যে, কালের বিবর্তনের মুকাবিলা করতে দ্বীন-ইসলাম পুরোপুরি সক্ষম, নতুন করে কালের নেতৃত্ব দানও সম্ভব তার পক্ষে। জীবনের গতিকে সত্য, কল্যাণ ও সুবিচারের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা পুরোপুরি রয়েছে তার সবুজ শ্যামল সতেজ শরীয়াতের বিধানে। তা সর্বকালের ও সকল স্থানের মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পূর্ণমাত্রায় উপযুক্ততার অধিকারী।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

---